শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
চতুর্দশ পর্ব

(Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তগৃহে

প্রথম পরিচ্ছেদ
শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের মন্দিরে রাখাল মাস্টার প্রভৃতির সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে এসেছেন। ২৫শে জুন, ১৮৮৩ (১২ই আষাঢ়), সোমবার (পৃঃ ২২৮)। এই জায়গাতে মনে হয় এক পাতা উপর-নীচ হয়েছে, কারণ এখানে ২৫শে জুন, আষাঢ় মাস বলছেন, তারপরের পরিচ্ছেদে জ্যৈষ্ঠ মাস বলছেন। ঠিকই আছে, ঠাকুরেরই কথা, মিছরির রুটি আড় করেই খান আর সিধে করেই খান মিষ্টি লাগবে। এখানেও আগের পাতা পরে পড়ুন, পরের পাতা আগে পড়ুন, মিষ্টিই লাগবে।

মাস্টার মশাই বলছেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে আছেন। আমাদের কাছে আসলে এগুলোর কোন তফাৎ মনে হয় না যে, ঠাকুর স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলছেন, না ভাবাবস্থায় কথা বলছেন। তবে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যখন ভাবের মধ্যে আছেন, তখন যেন অর্ধবাহ্যদশা, ঈশ্বরের মধ্যে যেন অনেকটা ডুবে আছেন। সেখান থেকে ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন, বেদে ঋষিদের কথাগুলোকে আমরা যেভাবে নিয়ে থাকি, এখানেও ঠাকুরের কথাগুলো একেবারে পরিষ্কার যেন সেভাবেই আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট) –দেখ, আন্তরিক ডাকলে স্ব-স্বরূপকে দেখা যায়। কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়। আপনারা যাঁরা এতদিন কথামৃত শুনছেন, আশা করি আপনাদের কাছে বিষয়টা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর ইউটিউব চ্যানেলের সৌজন্যে আমরা মোটামুটি সব শাস্ত্রই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা চারশ পাঁচশটা ভিডিও দেখেছেন, আশা করি তাঁদের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু জিনিস আছে, যেটার ব্যাখ্যা করা দরকার। এখানে ঠাকুর বলছেন 'স্ব-স্বরূপ'। স্বরূপ বললেই হয়ে যায়, কিন্তু বলছেন 'স্ব-স্বরূপ', এত সুন্দর শব্দ, আত্মার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। বলছেন, স্ব-স্বরূপকে দেখা যায়। 'দেখা যায়' কথাটা ঠাকুর আমাদের ভাষায় বলছেন। 'দেখা যায়' এই অর্থে না যে, আত্মাকে যেন অবজেক্ট রূপে আমরা বাইরে কোথাও দেখছি। আসলে আত্মাকে বোধ বোধ করা হয়, আগে আগে আমরা এর উপর অনেকবার আলোচনা করেছি। স্ব-স্বরূপকে বোধে বোধ করার জন্য পুরো একশ শতাংশ আন্তরিক হতে হয়।

যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে –ঠাকুরের এই বাক্যটাও আমাদের গভীর ভাবে বোঝা দরকার। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এই যে আমি আপনাদের সামনে ক্লাশ নিচ্ছি, আমার সামনে ক্যামেরা আছে, মাইক্রোফোন আছে, টেবিল আছে, আমরা মনে করি এই বস্তুগুলোর কোন সত্তা নেই, আসলে এগুলো সবই আত্মা। কিন্তু আমরা তো আত্মা দেখছি না। কেন দেখছি না? আমার যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা আছে ততটুকু কম পড়ে গিয়ে জিনিসটাকে এ-ভাবে দেখাচ্ছে। আর আমার ভিতরে যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানে আমি আবদ্ধ। জ্ঞানী পুরুষ দেখেন শুদ্ধ আত্মাই আছেন, বাকি যা কিছু দেখেন সব নামরূপের খেলা। জ্ঞানী যখন এই জগতে কাজ করেন, বিচরণ করেন তখনও তিনি দেখেন সব নামরূপের খেলা। সংসার চালানোর জন্য তিনি ওই নাম আর রূপ যতটুকু দেখবেন, তিনি ওই নাম আর

রূপেতে আবদ্ধ হন না। তাহলে আমি আপনি কি দেখছি না? দেখছি, ওই যতক্ষণ জ্ঞানীদের মত আমরা যখন আন্তরিক ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে জপধ্যান করছি, ততক্ষণ আমাদের কাছে এই জগৎ, এই সংসারটা কেমন যেন অসার বলে বোধ হয়। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরই আবার এই জগৎ, সংসার সব ফেরত চলে আসে। বুদ্ধি থেকে যদিও মনে হয় এটা সত্য, মন কিন্তু মানে না।

আমরা এভাবে যদি একটা কল্পনা করতে পারি, আপনি কোন গ্রামদেশে গেছেন, যে গ্রামটা আপনার দেশের বাড়ি, যেখানে লোকেরা আপনাকে জানে, আপনাকে সম্মান করে। ধরুন আপনি এই সমস্ত কথা; আত্মাই সত্য, বাকি সব নামরূপের খেলা, এগুলো বুঝে নিয়েছেন। এখন লোকজনরা সবাই বসে আছে, আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন। আপনি বলছেন, জানো তো ভাই আত্মাই সত্য, আর তুমি সেই আত্মা। আপনার সম্মানার্থে তারা সবাই ঘাড় নেড়ে দেবে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ একজন উঠে পড়ল আর বলতে লাগল যে, 'দেখুন কিছু মনে করবেন না, আমাকে চাষবাশ করতে হয়, এখন চাষবাশের সময় চলছে, আমার এই মুহুর্তে মাঠে জল দেওয়ার সময় হয়েছে, আমাকে তাই ক্ষেতে যেতে হবে'। আপনার কথাগুলো শুনতে তার হয়ত ভালই লাগছিল, কিন্তু ধৈর্য ধরে শুনতে পারবে না, কারণ তাকে সংসার দেখতে হবে।

কিন্তু একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী বলবে, সংসার চুলোয় যাক। এই কথা একমাত্র সন্ন্যাসীই বলতে এবং করতে পারেন, নিজেকে জীবনমুক্ত করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে পারেন। সংসারে যিনি আছেন তিনি কখনই 'সংসার চুলোয় যাক' বলে সব ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন, এই জিনিস পারবেন না। আশা করি এই ব্যাপারটা আপনারা বোঝেন, বেশি ব্যাখ্যার দরকার নেই। তবে আন্তরিক হয়ে আমরা যখন বলি, তখন ওই আন্তরিকতাটা কখন ইমোশানাল হয়ে যায়, আর কখন যে আন্তরিকতার নামে নিজেকে ঠকাচ্ছি, পরকে ঠকাচ্ছি তার কোন ঠিক নেই। এমন কি কোন বিপদে পড়লাম বা এমন কোন পরিস্থিতি হয়ে গেল যে, সব কিছু আন্তরিক হয়ে গেল। কিন্তু যেমনি বিপদটা কেটে গেল বা পরিস্থিতিটা পাল্টে গেল, তখন আবার জগতের দিকে বা অন্য জিনিসের দিকে ঢলে পড়ে।

যদিও প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে ততটা মিল নেই, তাও এই মজার গল্পটা বলা যেতে পারে। গল্পটা আমার খুব ভাল লাগে, কারণ গল্পটিতে আমাদের অবস্থাকে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। একটা মেন্টাল রিহ্যাবিলেটাশান সেন্টার আছে, সেখানে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার্থে রাখা হয়। বিশাল ক্যাম্পাস, খুব সুন্দর সাজানো গোছানো। একজন মানসিক রোগী ছিল, যে কিনা এখন অনেকটা ভাল হয়ে গেছে। ডাক্তাররাও লক্ষ্য করেছেন। কিছুটা আমাদের মত, সংসার থেকে সরে কিছুটা ধর্মের দিকে গেছি। একদিন একটা রব উঠল যে, একজন রোগী জলে ডুবে গেছে। তখন এই রোগী, যিনি এখন অনেকটা ভাল হয়েছেন, তিনি জলে ঝাঁপ মেরে ডুবে যাওয়া রোগীটিকে বাঁচিয়েছেন। ডাক্তাররা তাঁকে বলছেন, 'আপনি তো দেখছি আগের থেকে অনেক ভাল হয়ে গেছেন। আপনার এই বোধ এসে গেছে যে, যে ডুবে যাচ্ছে তাকে বাঁচাতে হয়, আর আপনি তাই করলেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবার আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব'।

ডাক্তার তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'জলে ঝাঁপ দেওয়ার পর ওকে জল থেকে তুলে আপনি কি করলেন'? 'না, ও তো জলে ভিজে গিয়েছিল, সেইজন্য গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছি যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়'। ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে দেখে লোকটাকে কোমড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বানানো হাসির গল্প। মানসিক রোগে একটু সুস্থ হওয়া রোগীদের নিয়ে মজা করা হয়েছে। তবে এভাবে মানসিক রোগীদের নিয়ে হাসি-তামাশা করাটা উচিত না। কারুর দুরবস্থাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে নেই।

আমাদের অবস্থা ঠিক তাই, কোন কারণে একটা জায়গায় হয়ত ঠিকঠাক কাজ করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গায় একটা গোলমাল করে বসব। যে ডুবে যাচ্ছিল তাকে বাঁচিয়ে দিলাম ঠিকই,

তারপর তাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেব। কেন? ওকে শুকোতে দিতে হবে। আমরা যদি নিজেদের জীবনের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, কিভাবে কিছু কাজ আমরা ঈশ্বরই সত্য ভেবে একজন সাধুপুরুষের মত করি, আবার কিছু কাজ উন্মত্ত-প্রমত্তবৎ করি। আন্তরিক হওয়া মানে আপনার ব্যক্তিত্ব একশ শতাংশ সমান, এক রস, কোথাও এতটুকু এলেমেলো নেই। পুরো unified। এই রকম আন্তরিক হওয়া প্রায় অসম্ভব, হওয়া যায় না। এর জন্য আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক সাধন-ভজন করতে হবে।

আন্তরিক জিনিসটাকে বোঝাতে গিয়ে মাস্টারমশাই বলছেন, **আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন ঝাঁপ দিতে হয়**।

ঠাকুর শুনে খুব খুশি, **(আনন্দিত হইয়া) –ইয়া**।

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে।

সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে –এই বাক্যটা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলে, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে। হিন্দুরা কখন বৈষম্য করে না, কোন ভেদভাব রাখে না। অন্যান্য ধর্মে বলে, আমার কথা যদি না মানো, তবে তোমার জন্য নরকের দ্বার খোলা আছে। যীশু খ্রীষ্টের জীবনী আমাদের কাছে এক গভীর ভাল লাগার জিনিস। ঈশ্বরকে কিভাবে ভালবাসতে হয় তিনি মানুষকে শেখালেন, তোমরা ঈশ্বরকে ভালবাস, জীবনকে মৃদু কর। কিন্তু কি আশ্চর্যের! তাঁর আপনজনরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে দিলেন। কিসের জন্য? আমার বাপ-ঠাকুরদার দেওয়া ধর্মের বিরোধিতা করছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল। তার দুশ-তিনশ বছর পর থেকে ধীরে ধীরে খ্রীশ্চনরা ক্ষমতায় এসে গেল। এরপর সেই খ্রীশ্চানরা, যাদের কাছে যীশু হলেন ঈশ্বরপুত্র, যিনি কিনা সবাইকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, এরাই এবার জুহুদিদের মেরে মেরে শেষ করতে শুরু করে দিল, এখনও মেরে যাচ্ছে। কিসের তোমাদের ভালবাসার ধর্ম। তোমার ভালবাসা ধর্মের নিদর্শন –যে তোমাদের ধর্ম মানবে না, তাকে নরকে পাঠাবে। হিন্দু ধর্মদর্শন এই ধরণের কোন বৈষম্য করে না।

আমরা অনেকবার বলেছি, বর্তমানকালে সোস্যাল মিডিয়ায় কিছু দুষ্ট লোক সামাজিক ব্যবস্থাকে ধর্মের সাথে মিলিয়ে ফেলছে। আর কিছু কিছু কথাকে যেখানে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করছে, সেখানে বেশি জোর দিচ্ছে। আপনি আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে গেলেন, সেদিন আইনস্টাইনের প্রচণ্ড পেটের গণ্ডগোল। দেখা করতে পারলেন না বলে আপনি ফিরে এসে বলে দিলেন, আইনস্টাইন তো একটা পেটরোগা মানুষ। আইনস্টাইনকে ঠিক ঠিক জানতে হলে তার বেস্ট থিয়োরি দেখতে হবে। এমন কি যে জায়গাটায় তিনি ভুল থিয়োরি দিয়েছেন সেটাও না, বেস্ট যেটা দিয়েছেন সেটাকে দেখতে হবে। ঠিক তেমনি হিন্দু ধর্ম যে শ্রেষ্ঠ কথাগুলো বলে, সেগুলোকে দেখতে হয়। আমার অপরাধ নেবেন না, এই কথাগুলো জনমানসে ছড়ানো আপনাদেরও দায়ীত্ব। একজন বড় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে যান, আপনার কাছে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বলতে শুরু করবেন। পদার্থ বিজ্ঞানের বাইরে অন্য কোন সে-রকম প্রসঙ্গ এলে তিনি অতটুকু বলে দেবেন, যতটুকুতে আমরা বুঝে নিতে পারব। লোকেরা যেন আপনাকে দেখে মনে করেন, কি গভীর জ্ঞান। বাচ্চারা যখন নূতন কিছু শিখে আসে, সবাইকে সেটা শেখাতে থাকে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা সবাইকে দিয়ে যান, বোঝা যায় ইনি একজন বিজ্ঞানী পুরুষ। লোকেরা আপনাকেও দেখে যেন বুঝতে পারেন আপনি একজন জ্ঞানী পুরুষ।

মাস্টারমশাই হলেন কথামৃতকার, তাঁকে সবাই প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন, আমিও প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি। তিন-চার বছর ঠাকুরের সঙ্গে আছেন, অনেক কিছু শুনেছেন, দেখেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম

জিনিসগুলিকে ধরতে মানুষ কিভাবে ভুল করে বসে, এখানেই ভাল বোঝা যায়। দ্বিতীয় কথা হল, মাস্টারমশাইয়ের এটা মহত্ত্ব যে, তিনি নিজের নামে লিখেছেন যে তিনি ভুল কথা বলেছেন। তত্ত্ব কথাকে ধারণা করা বাস্তবিক অত্যন্ত কঠিন। মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথাই উল্লেখ করে বলছেন, ঠাকুরের কাছেই শুনেছিলেন।

মাস্টার –আজ্ঞা, তবে ঈশ্বর কর্তা, তিনি যে-ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারুকে চৈতন্য করেছেন, কারুকে অজ্ঞান করে রেখেছেন।

বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতেই বলছেন –কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে করো অধোগামী। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইর কথাকে আটকে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –না। সরাসরি ঠাকুর না করে দিলেন। দয়া করে এই জায়গাটা আপনারা মন দিয়ে খেয়াল করবেন। আমরা যে দিনরাত বলছি ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুর এটা করেছেন, ঠাকুর ওটা করেছেন; আমার বদমাইসি, আমার বাঁদরামো, সব ঠাকুর আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন –এর সবটাই এক উত্তর –না। সংসারের এত ব্যাখ্যার কি দরকার। আমার একটা প্রিয় ঘটনা মনে পড়ে, কয়েকবার ক্লাশে বলেছি। শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এক সময় মঠের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। মঠের জেনারেল সেক্রেটারী হয়ে একটা সময় অনেক কাজ করলেন, অনেকদিন কাজ করার পর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি রাঁচীতে গিয়ে থাকতে লাগলেন। কখন রাঁচী মঠ কখন বেলুড় মঠ এইভাবে থাকতেন। উনি অন্য কোন সেন্টারে যেতে চাইতেন না। রাঁচী সেন্টারে কিছু গোলমাল হয়েছিল। বেলুড় মঠ থেকে কর্তারা গেছেন সামলাবার জন্য। মহারাজের সেক্রেটারী স্বামী আত্মারামানন্দজী নিজেই আমাকে ঘটনাটা বলেছিলেন। আত্মারামানন্দজী বলছেন, 'মহারাজ! অমুক মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে এসেছেন'। মহারাজ বললেন, 'ও'। 'তিনদিন থাকবেন'। 'ও'। 'এখানে কিছু গোলমাল হয়েছে'। মহারাজ বলছেন –I don't know, I don't care to know। এই ধরণের মহাপুরুষদের কথাগুলো যদি আমাদের কখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন কোন বিষম পরিস্থিতি এলে এই কথাগুলো খুব কাজে দেয়। গম্ভীর মহারাজ কি সুন্দর বলছেন –I don't know, I don't care to know। আমি জানি না, আমি জানতে চাইও না।

ঠাকুর এটাকেই বলছেন, মায়ের ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছা, মা যে তাঁকে হাত দিয়ে করাচ্ছেন তা না, এর অর্থ হল, –I don't know, I don't care to know। আমার এখন বয়স হয়ে গেছে, দিনে দিনে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। অনেক সময় কেউ হয়ত এসে কিছু বলছেন, আমি শুধু এই একটি কথাই বলি –'ও তাই'। এটা আমার নিজস্ব ভাষা –ও তাই। আমার এতটা বলার সাহস নেই –I don't know, I don't care to know। ঠাকুরের মত বলার দম নেই –মায়ের ইচ্ছা। এটা হল সংসারের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম। *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*। গীতার এই একটা শ্লোকের অর্দ্ধার্ধ যেটাকে আমি আমার জীবনের মন্ত্র করার চেষ্টা করছি –যত লোক আছে, স্বর্গলোক, পাতাললোক, মর্ত্যলোক সব অনিত্য –এটাকে ভাল করে জানো, বোঝ আর আমাকে (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়ার চেষ্টা কর। আর আমাকে জানলে সবটাই জানতে পারবে। ঠাকুর যখন বলছেন, মা সব করাচ্ছেন; আবার বলছেন, মা ওকে অমন বুদ্ধি দিলি কেন, এটা হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থ হল, আমি বুঝতে পারব না, আমি বুঝতে চাই না। কারণ আমার চাই মাকে, আমার চাই তোমাকে, আমার চাই ঈশ্বরকে। ঈশ্বরের কাজ আমি বুঝতে চাই না, আমি ঈশ্বরকে চাই। বাচ্চা যেমন জানে না তার বাবা কি কাজ করে।

কদিন আগে মধ্যপ্রদেশের কোন একজন নেতার বাচ্চা মেয়ে, তিন-চার বছরের হবে। কিভাবে প্রধনমন্ত্রীর সাথে দেখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাচ্চা মেয়েটিকে সবাই যেমন আদর করে, উনিও করলেন। বাচ্চা মেয়েটি বলছে –'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাকে চিনি'। উনি মজা করে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি জান আমি কি কাজ করি'? 'হ্যাঁ জানি তো, আপনি লোকসভার টেলিভিশনে কাজ করেন'। বাড়িতে

লোকসভা চ্যানেলের টিভিতে প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীকে দেখে, মেয়েটির মাথায় বসে গেছে যে ইনি এই চ্যানেলে কাজ করেন। বাচ্চারা, they don't care। আমরা সংসারের শিশু, আমাদের সংসারের এত কিছু জানার কি দরকার। কিন্তু এটাকে আপনি যদি ব্যাখ্যা রূপে নিয়ে নেন, তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি রকম? আমি সাধন-ভজন করি না। কেন করেন না? ঠাকুরের ইচ্ছে। আমি বাঁদরামি, বদমাইসি করছি। কেন করছেন? ঠাকুরের ইচ্ছে। এখানে তা বলা হচ্ছে না।

আমাদের একজন মহারাজ খুব সুন্দর বলতেন, 'সন্ন্যাসী যিনি, যিনি ধর্মপথে যেতে চান তাঁরা সংসারের ব্যাপারটা ছেড়ে দেন ঠাকুরের উপরে; আর নিজের যে চেষ্টা, এটাকে পুরোপুরি লাগাবেন ঈশ্বরজ্ঞানের দিকে। সংসারী লোকেরা ঠিক এর উল্টোটা করে। সংসারে সাফল্য পাওয়ার জন্য পুরো চেষ্টা ওতেই লাগিয়ে দেয়, আর ধর্মপথে এগোবার জন্য নিজে চেষ্টা না করে পুরোটাই ঠাকুরের উপর ছেড়ে দেয়'। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, একজন সংসারী আর একজন সাধুর কি তফাৎ? অতি সাধারণ তফাৎ, সংসারী সংসারের ব্যাপারে সমস্ত রকম চেষ্টা করে, ঈশ্বরের দিকে এগোবার ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়। যিনি সাধু, তিনি ঈশ্বরের দিকে এগোনর জন্য পুরো চেষ্টা করেন আর জাগতিক যা কিছু সব তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। আপনি বিচার করে দেখতে পারেন, আপনার যত চেষ্টা আছে, সব চেষ্টা কোন দিকে লাগিয়েছেন। এই যে এত গান আছে, বা ঠাকুর যেটা বলছেন, শুধু এটাকেই বোঝানর জন্য। এই সংসার অনিত্য আর সুখহীন, *অনিত্যমসুখম্*। তুমি ধর্ম পথে আছ, তুমি সেটাকে বোঝার চেষ্টা করতে যেও না, সেটাকে হাতে পাওয়ার চেষ্টা করো না, কোন লাভ নেই। যারা সংসারী তারা করুক। আপনার যতটুকু দরকার সেটা ভগবানই দেখবেন। কিন্তু আপনার ভিতর কামনা-বাসনা আছে, আর ভাবছেন সেটা ঠাকুর মেটাবেন, সেটা হবে না; তখন সব এলেমেলো হয়ে যাবে। আশা করি আপনাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ –না। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আবার সেই আন্তরিকতা নিয়ে আসছেন। বলছেন, **আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন**।

কথামৃতে ঠাকুর এই জিনিসটাকে অনেকবার এনেছেন, বোঝাবার জন্য কখন এই উদাহরণ, কখন সেই উদাহরণ দিয়েছেন। আবার এটাও তিনি বলছেন, সময় না হলে হয় না, তবে শুনে যেতে হয়। কেন বলছেন? কারণ ভিতরে কামনা-বাসনা এত গিজগিজ করছে, প্রার্থনা করলেও কিছু হয় না। কিন্তু শুনতে শুনতে বা শাস্ত্রাদি পড়ে পড়ে, তাতেও যদি একটা ধারণা এসে যায়, আর মেকানিক্যালিই যদি সেখান থেকে শুরু করে, এরপর করতে করতে কোন দিন যে এটাই আন্তরিক হয়ে যাবে বলা মুশকিল। আন্তরিক হয়ে যাওয়া মানে, চব্বিশ ঘন্টা ওই একটাই মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করতে থাকবে। তারপর থেকে দেখবেন, আপনার কাজকর্মের প্রতি স্পৃহা, ভোগের ইচ্ছা, এগুলো কমতে শুরু হয়ে যাবে। ধরুন একজন জ্যোতিষ, এটা আমরা থিয়োরেটিক্যালি বলছি, সত্য নয়; তিনি যদি বলেন, আপনার এতদিন লাগবে, কিন্তু আন্তরিক প্রার্থনা হতে যদি শুরু হয়, সময়টা কমে যাবে। বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে, কিন্তু ফিলজফিক্যালি কি হয় সেটাকেই এখানে স্পষ্ট করা হল। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন। আন্তরিক হতে হয়, মুখের কথা দিয়ে হয় না। আমরা মনে করছি আন্তরিক, কিন্তু বাইএর রোগীর মত। এখানে একটা ভাল করছি, ওখানে একটা মন্দ করছি, প্রথমের দিকে যে গল্পটা বলা হল। আপনাদের মধ্যে হয়ত কুড়ি-পঁচিশ বছরের শ্রোতা আছেন, তাঁদের জন্য বলছি, এটা আপনাদের সময় নয়; প্রথমে জীবনে একটা স্থিতি আনতে হয়। পঞ্চাশের পরে পুরো দমে কমাতে চেষ্টা করতে হয়; না হলে সত্তর বছর আসতে আসতে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে। একদিকে তখন ইচ্ছাগুলো অপূর্ণ থেকে যায়, অন্য দিকে ভোগের ক্ষমতা থাকে না, মন ছটফট করে।

একজন ভক্ত –আজ্ঞা হাঁ, 'আমি' যে রয়েছে, তাই প্রার্থনা করতে হবে। 'আমি' মানে বলতে চাইছেন আমিত্বের বোধ, এই আমিত্বের বোধ যতক্ষণ আছে প্রার্থনা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্যদর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি-ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত।

আগেও এই প্রসঙ্গ এসেছে আর না বোঝারও কিছু নেই। তবে এখানে একটা সহজ জিনিস আছে যেটাকে বোঝান দরকার। ইংরাজীতে এর একটা খুব সুন্দর শব্দ রয়েছে –Personal and Impersonal। ঈশ্বর দর্শনে সব কিছু personal, সংসারে সব কিছু impersonal। আমরা যখন কোন বই পড়ি, বা কোন বিষয়ের দিকে যাই তখন আমাদের ওই অতটুকুই জ্ঞান হয়। আত্মা হলেন জ্ঞানস্বরূপ। যিনি পার্সোনাল জ্ঞান থেকে ইমপার্সোনাল জ্ঞানে চলে যান, তিনিই হলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। ভালবাসার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও ভাল বোঝা যায়। আমি একজনকে ভালবাসি, পার্সোনাল হয়ে গেলাম। কিন্তু যখন ভালবাসাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম, তার মানে আমি এখন সবাইকেই ভালবাসছি।

আমার আমিত্বকে আমি ভালবাসি, আমি বেঁচে থাকতে চাই, আমি সুখে থাকতে চাই; এটাই লীলা। এখান থেকে যখন এই ভাব আসবে –আসলে আমি তো শুদ্ধ সত্তা, pure existence, তখন কি হবে? শরীরের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো অনন্ত; এই ভাবই আমাকে জ্ঞানী পুরুষে উত্তীর্ণ করে দেবে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই যে তিনটেকে নিয়ে বলা হল; একবার যখন ওই সৎ, চিৎ ও আনন্দে চলে এলেন এবং তারপর আপনি আবার এই সংসারে ফেরৎ এলেন। এরপর আপনি যদি ব্যক্তিগত কিছু করেন, তাতে আপনার কোন দোষ নেই, কারণ আপনি জেনে গেছেন পুরো জিনিসটাই ইমপার্সোনাল।

বাচ্চারা অনেক সময় বায়না করে ওই থালাতে খাব, ওই গ্লাশে জল খাব; কিন্তু যার কাছে খাওয়াটাই উদ্দেশ্য, পেট ভরানোটাই যার কাছে মুখ্য, তার কাছে কোন গ্লাশে জল দিল, কোন থালায় খেতে দিল, এগুলো কোন ব্যাপার না। আমরা আমাদের আচার ব্যবহারে যত ইমপার্সোনাল হব, তত শান্তি লাভ করব। খেতে বসে বলছেন, আমি এটা খাব না, আমি ওটা খাব; আপনি পার্সোনাল হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যেমনি আপনি মনে করছেন, আমি খাচ্ছি, আমাকে পেট ভরাতে হবে, আমার শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে, আপনি অনেকটা ইমপার্সোনাল হয়ে গেলেন। এই জিনিসটাকে এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে বোঝান হল। ঠিক তেমনি, আপনার হয়ত একটা পুকুর আছে, পুকুরে যে জল, যে মাছ আছে; সেই জল আপনিই ব্যবহার করবেন, সেই মাছ আপনিই ধরতে পারেন, আর কেউ ধরতে পারবে না; আপনি হয়ে গেলেন পার্সোনাল। পুকুরের জল আপনি গ্রামের সবার ব্যবহারের জন্য খুলে দিলেন, গ্রামের সবাই পুকুরে মাছ ধরতে পারে; আপনি হয়ে গেলেন ইমপার্সোনাল। আপনার আশেপাশে যা কিছু আছে, সেটার সাহায্যেই আপনাকে উপরে যেতে হবে। আপনার আশেপাশে যা আছে, এটাই লীলা; এই লীলাকে ধরে নিত্যে যাওয়া।

তাঁর নানারূপ, নানালীলা –ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা; তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন, প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতর তাঁর প্রেম, ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা –কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।

ঠাকুর নিত্য আর লীলার কথা বলছেন; উদ্দেশ্য নিত্যে পৌঁছান। নিত্য মানে ইটার্নাল, সব সময় যেটা আছে। নিত্যে না পৌঁছান পর্যন্ত আমাদের আসল ভক্তি, আসল প্রেম, আসল মুক্তি হবে না। কিন্তু নিত্যে আপনাকে যেতে হবে লীলাকে ধরে। ঠাকুর ছাদের উদাহরণ দিয়ে এবার দুধের উদাহরণ দিলেন। দুধ দরকার, দুধ আসে গাভীর বাঁট দিয়ে। কালো গরু, সাদা গরু, কোন গরুর দুধ নিলেন সেটার কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল দুধ পাওয়া। ঠাকুর বলছেন, অবতার গাভীর বাঁট। দুধের ব্যাপারে কেউ যদি জানতে চায়, যেমনি দেখবে গাভীর বাঁট থেকে দুধ আসছে, সেখান থেকে সে জেনে যাবে দুধ এভাবে

হয়, ওই ভাবে আসে, আস্তে আস্তে দুধের ব্যাপারটা পুরো জেনে গেল। ঠাকুর কোন একটা লীলাকে ধরতে বলছেন। ঠাকুর কত রকম লীলার কথা বলছেন। কত রকমের লীলা? জগৎলীলা, তার সঙ্গে বলছেন নরলীলা, দেবলীলা, ঈশ্বরলীলা; এগুলো লীলা, এর কোন একটা লীলাকে যদি ধরে নেন, আপনি নিত্যে পৌঁছে যাবেন।

আপনাদের আমি একটি অতি সাধারণ কথা বলছি। এই যে আমরা আলোচনা করছি, আলোচনা শুনতে শুনতে আপনি একজন কারুর কথা ভাবুন, যাকে আপনি ভালবাসেন। তা তিনি ঠাকুর হতে পারেন, টাকা হতে পারে, মানুষ হতে পারে, আপনার সন্তান হতে পারে, স্বামী বা স্ত্রী হতে পারে, যে কেউ হতে পারে। এক্ষণের জন্য ভাবুন, ঠাকুর এই রূপে লীলা করছেন, আসলে ঠাকুর আমার সন্তান রূপে লীলা করছেন। এক সেকেণ্ডের জন্য যদি ভাবতে পারেন, আপনার তাক লেগে যাবে। আমার কথা বলা কিছুক্ষণের জন্য থামাচ্ছি, একটু ভাবুন। স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। যেখানেই লীলা, যেখানেই কার্য, সেটা তিনি, এই রূপে লীলা করছেন। আমার যে অর্থে সৃষ্টির কথায় বলি, তিনি সৃষ্টি করেন না; আসলে লীলা করছেন। আপনি যাকে ভালবাসছেন, ভগবান সেই ব্যক্তি হয়ে আছেন, ওটাকে ধরে যদি এগোন, এটাই লীলা থেকে নিত্য। কিন্তু আমরা সন্তানকে সন্তান রূপে জানি, স্ত্রীকে স্ত্রী রূপে, স্বামীকে স্বামী রূপে দেখছি। ওই জায়গাতে সমস্যা হয়ে যায়। এই সমস্যা বেদের ঋষিদেরও হয়েছিল। বেদের ঋষিরা ভগবানের বর্ণনা করার জন্য নিলেন ইন্দ্রকে। কিন্তু ইন্দ্রের মধ্যে অনেক মানবিক গুণ ছিল। ইন্দ্রের কখন ওই মেয়ের দিকে, কখন কোন ঋষির স্ত্রীর দিকে নজর চলে যেত, আর তার উপর সুরাপান তো আছেই। কিন্তু সাংঘাতিক ক্ষমতা ইন্দ্রের। ইন্দ্র তাঁর দেবত্বকে ছেড়ে মানবিক গুণে নেমে গেলেন। কিন্তু বললেন, থাক থাক, আমার আর এই খেলা লাগবে না।

মানুষকে ভালবেসে লীলা রূপে দেখে নিত্যে যাওয়া খুব কঠিন। সেইজন্য দেখতে হয় অবতারকে। অবতারকে নিলে এই সমস্যা কেটে যায়। ঠাকুর নিজের সময় কেন বিখ্যাত ছিলেন না? যীশু খ্রীষ্টকে কেন ক্রুশিফাইড করা হল? কারণ সবাই তাঁকে দেখল মানুষ রূপে। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষিং তনুমাশ্রিতম্,* সাধারণ মানুষ, মুর্খ মানুষ আমাকে দেহধারী রূপে মনে করে। আমি তা নই। ঠাকুর আসার পর একশ বছর হয়ে গেছে, এখনও ঠাকুর শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের মত একটা মিথিক্যাল ফিগার হয়ে যাননি। আবার এতটাও কাছে নন যে, তাঁকে মানুষ বলে মনে করব। আমি বারবার মনে করি, আমি আপনি সবাই ধন্য, এমন একটা দূরত্বে আমরা এসেছি যে, ঠাকুরকে অবতার রূপে দেখতে পাচ্ছি। তিনি এখনও পৌরাণিক কাহিনী হয়ে যাননি। মানুষ রূপে তাঁকে ভাবতে যে সংশয় হবে, সেটাও চলে গেছে। এবার ঠাকুরকে যদি ধরা হয়, ঠাকুরকে ধরা মানে অবতারলীলা, এখন এই অবতারলীলাকে ধরলে সাঁ করে নিত্যে পৌঁছে যাওয়া অত্যন্ত সহজ।

আবার বেদের যত দেবতারা আছেন, সেই দেবলীলাকে ধরেও নিত্যে পৌঁছান যায়। আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা দেবতাদের মাধ্যমে উঁচুতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও সমস্যা ছিল, কারণ দেবতাদের মধ্যে এমন কিছু কিছু মানবিক আচরণ ছিল, যেটা মানুষের ভাল লাগেনি। আমরা যে ঠাকুরকে ভালবাসি, ঠাকুরের যে ব্যক্তিত্ব, যে দেহধারী রূপ, ওদিকে দৃষ্টি দিতে নেই। ঠাকুরের ধ্যান করার সময়, ঠাকুরকে নিয়ে চিন্তন করার সময় তখন ঠাকুরের দিব্যরূপকে নিয়েই ধ্যান-চিন্তন করতে হবে। দয়া করে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমরা যখন বলি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার তখন আমরা যেমন বলি অমুক লোক প্রধানমন্ত্রী, অমুক লোক মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীরামকৃষ্ণ ওই ভাবে অবতার নন। বক্তব্য হল, অবতার কোন উপাধি নয়। ভগবান, যিনি অনন্ত, সর্বশক্তিমান, তিনিই মানবরূপ ধারণ করে অবতার হয়ে লীলা করেছেন, এটা কোন উপাধি না, স্বয়ং তিনিই এই রূপে উপস্থিত। ঠিক সেইভাবে মনে রাখবেন, তিনি কিন্তু আপনার সন্তান হয়েও লীলা করছেন। সন্তানকে আপনি যদি ইষ্টরূপে দেখে এগোতে চান, তাতে আবার অনেক সমস্যা এসে যাবে। যিনি প্রেম, ভক্তির শিক্ষা দিচ্ছেন, ভক্তি কিভাবে করতে হয়, ঈশ্বরকে প্রেম কিভাবে করতে হয়, সেখানে জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

সবটাই লীলা, আপনি যদি নিজের স্ত্রীকে ভগবতী রূপে দেখেন, তখন ভগবতী রূপেই দেখতে হবে; স্বামীকে যদি নারায়ণ রূপে দেখেন, তখন নারায়ণ রূপেই দেখতে হবে –ঈশ্বর লীলা করছেন, ফল আপনি একই পাবেন; কিন্তু মুশকিল।

এই ব্যাপারটা আরও মুশকিল হয়, যখন নিজের গুরুর অনেক সঙ্গ করা হয়, সঙ্গ করতে করতে একটা সময় গুরুর প্রতি মানুষ বোধ এসে যায়। গুরুর প্রতি মানুষ বোধ কখনই আসতে দিতে নেই, তা নাহলে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। গুরুতে মানুষ বোধ করতে নেই। যার জন্য দেখা যায়, গুরু যদি শিষ্যের ভাল করতে চান, তিনি তাকে তাঁর বেশি কাছে আসতে দেন না। বেশি সঙ্গ করলে কি হয়, তখন মনে হবে, ও ইনিও আমার মতই। যখনই মনে হবে, ইনি আমার মতই, তখনই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে। একজন লোক বন দিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে দেখছে বাবলা গাছ। বাবলা গাছ দেখে তার মাথায় এলো, এই সেই বাবলা গাছ! এই গাছের ডাল দিয়ে কোদালের বাঁট হবে, সেই কোদাল দিয়ে শ্যামসুন্দরের বাগান চাষ হবে, চাষে যে সবজী হবে সেই সবজী দিয়ে মহাপ্রভুর সেবা হবে। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুতে মন চলে গেল। আপনি দেখতে পেলেন ময়রার দোকানে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে পড়ে গেল, কামারপুকুরে জিলিপি ভাজে, ঠাকুর জিলিপি ভালবাসতেন। সেখান থেকে আপনার মন ঠাকুরের মধ্যে ডুবে গেল। আমাদের উল্টো হয়ে যায়। কামারপুকুরে গিয়ে আগে খোঁজ নিতে হবে ঠাকুর কোন দোকানের জিলিপি খেতেন; এখানেই ঠাকুরকে আপনি মানুষ বানিয়ে দিলেন। এখানে বারবার বলা হচ্ছে লীলাকে ধরে নিত্যে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা লীলাকে ধরে এমন মানুষের অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি যে, তারপর আবার বলবে, মহারাজ, বলুন ভক্তি কিসে হয়? যাই হোক আমরা এবার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রবেশ করছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তমন্দিরে

এখানে পাতার কোন গোলমাল হয়ে থাকতে পারে। কেননা আগের পরিচ্ছেদে আষাঢ় মাসের কথা বলছেন, আর এখানে শুরু করছেন –**জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৮৮৩, খুব গরম পড়িয়াছে**। মাস্টারমশাই ঠাকুরের জন্য বরফ নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর বরফ খুব ভালবাসতেন। লোকেদের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে, সাধু, সন্ত, মহাত্মাদের যেন শরীরের কোন কষ্ট হয় না। লোকেরা জানে না যে, যাঁর বুদ্ধি যত সূক্ষ্ম হয়, তাঁদের শরীরে তত কষ্ট হয়। কারণ তাঁদের ইন্দ্রিয় এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, যার জন্য লুচি ছিড়তে গিয়ে ঠাকুরের হাত কেটে যেত, শরীর এত কোমল হয়ে যায়। রমতা যোগী, যাঁরা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান তাঁদের শরীর আবার অন্য রকম; কেন অন্য রকম হয়, ওই আলোচনাতে আমরা যাচ্ছি না। গীতাতে আলোচনা করা হয়েছে, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হলে কিভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে যায়। ফলে কম বয়সী সন্ন্যাসীরা কঠোর করতে পারেন। আমি যখন জয়েন করি, প্রথম দশ বছর আমি উলের কোন কিছু ব্যবহার করিনি। দেওঘরে জয়েন করেছিলাম, সেখান শীতের সময় তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রিতে নেমে যায়, ওই ঠাণ্ডায় আমার পায়ে মোজা থাকত না, উত্তরীয়কে গলায় পেঁচিয়ে মাফলারের কাজ করতাম। আমাদের একটা মোটা উলিকটের গেঞ্জি আর খদ্দরের একটা চাদর দেওয়া হত, ওতেই ওই ঠাণ্ডাকে জব্দ করে দিতাম। এখন ওই ভাবে আমাকে থাকতে বললে ঠাণ্ডায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের লড়াই করার ক্ষমতাটাও কমে যায়। আমিও নূতন ব্রহ্মচারীরা জয়েন করার পর বলি, এখন বয়স কম যত পার কঠোরতা করে নাও। বয়স হয়ে গেলে কঠোরতা করা যাবে না, এটা স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –মণি মল্লিকের নাতজামাই এসেছিল। সে কি বই-এ পড়েছে, ঈশ্বরকে তেমন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ বলে বোধ হয় না। তাহলে এত দুঃখ কেন? আর এই যে জীবের মৃত্যু হয়,

একেবারে মেরে ফেললেই হয়, ক্রমে ক্রমে অনেক কষ্ট দিয়ে মারা কেন? যে বই লিখেছে সে নাকি বলেছে যে, আমি হলে এর চেয়ে ভাল সৃষ্টি করতে পারতাম। ফুটনোটে জন স্টুয়ার্ট মিলের বই বলছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল তখন খুব বিখ্যাত ছিলেন। তা যিনিই এই কথাগুলো বলে থাকুন, কথাগুলোকে বোকা বোকা মনে হয়। কারণ আমরা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে ভগবানকে বিচার করছি; এ-ভাবে ভগবানকে বিচার করা যায় না। আমি হলে এর চেয়ে ভাল সৃষ্টি করতে পারতাম, এগুলোও পুরনো কথা, অনেকবার বলা হয়েছে। স্বামীজীও এক সময় রেগেমেগে এই ধরণের কথা বলেছিলেন।

মাস্টার হাঁ করিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছেন ও চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –তাঁকে কি বুঝা যায় গা। ঠাকুরের এই 'গা' শব্দটা যে কি মিষ্টি লাগে; আমরা হ্যাঁ গো বলি, ঠাকুর বলবেন হ্যাঁ গা। স্ব-স্বরূপকে জানা যায়, দেখা যায় যেটা বলছেন; আপনি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু তাঁকে কোন দিন জানতে পারবেন না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন, মনগ্রাহ্য বস্তু নন, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য; কি করে তাঁকে বুঝবেন!

আমিও কখন তাঁকে ভাবি ভাল, কখন ভাবি মন্দ। অনেক আগেকার কথা, আমি যখন প্রথম কথামৃত পড়তে শুরু করি, তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ-তেইশ, তখনই এই কথা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরকে তিনি কখন মন্দ ভাবেন –এই কথার অন্তর্নিহিত ভাবটা ধারণা করা খুব কঠিন। গোপীরা থেকে থেকে যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণের নামে নালিশ করছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন অক্রুরের সাথে গোপীদের ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন, গোপীরা তখন কৃষ্ণকে প্রচুর গালাগাল দিচ্ছেন। একটা ভ্রমর নিজের মত গুন্‌গুন্‌ করতে গোপীদের কাছে উড়ছিল, সেই ভ্রমরকেও তাঁরা গালাগাল দিচ্ছেন। বলছেন, তুমিও কৃষ্ণের মত কপট। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন, কখন তাঁকে ভাবি ভাল, কখন ভাবি মন্দ; এখানে গোপীদের ওই ভাব নিয়ে বলছেন না। তবে এই কথার মধ্যে অনেক গভীর ভাব লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন ধর্মে যেমন বলে God is judged, God is love, God is this, আরে না ভাই; এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও ঠাকুর এমন কথা বলছেন না।

কি করে আপনি এটা justify করতে পারেন; জীবন যদি তাঁর, মৃত্যুটাও তাঁর; মিলন যদি তিনি করান, বিচ্ছেদটাও তিনিই করান; শান্তিবার্তা পাঠাচ্ছে সেটাও তাঁর, যুদ্ধবার্তা পাঠাচ্ছে সেটাও তাঁর। আপনার মন যখন যেখানে তখন কখন মনে হবে তিনি ভাল, কখন মনে হবে তিনি মন্দ। আমাদের সমস্যা হল, জগৎকে আমরা যখন বিচার করি তখন আমাদের মনের গঠন অনুযায়ীই বিচার করি। ঠাকুর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। আমরা যেমন সবাইকে আমাদের মনের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে বিচার করি, ঠিক সেইভাবে ভগবানকেও আমরা বিচার করি। ঠাকুর এখানে বলছেন, সে কি বই-এ পড়েছে, তার মানে একটা তাচ্ছিল্য ভাব। এইজন্য ঠাকুর বেশি বইপড়া পছন্দ করতেন না। আমরাও দেখছি, কেউ ওই চ্যানেলের লেকচার শুনছেন, কেউ সেই চ্যালেনের প্রবচন শুনছে, তারপর একগুচ্ছ সংশয় নিয়ে আমাদের কাছে আসেন জট ছাড়াতে। আমাদের ক্লাশের মধ্যেও অনেকে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করেন, আমি বলে দিই –আমরা ক্লাশে যে বিষয়কে নিয়ে বলছি তার বাইরে আমি ব্যাখ্যা করব না।

তাঁর মহামায়ার ভিতর আমাদের রেখেছেন। কখন তিনি হুঁশ করেন, কখন তিনি অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে যায়, আবার ঘিরে ফেলে। পুকুর পানা ঢাকা, ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে।

এখানে ঠাকুর একজন ভক্তরূপে কথাগুলো বলছেন। আপনি কতটুকু জানতে পারবেন? আপনি যদি আত্মজ্ঞানী হয়ে যান, আপনি চৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন, কিন্তু চৈতন্যকে জানতে পারবেন না। ভাগবতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। মৃত্যুর আগে ভীষ্মদেবের চোখে জল, তিনি ভাবছেন, পাণ্ডবদের মধ্যে এত সত্ত্বগুণের আধিক্য, ঈশ্বরের এমন ভক্ত, স্বয়ং ঈশ্বর যাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন, তাঁদেরই কিনা এত কষ্ট। কি করে আপনি এর ব্যাখ্যা করবেন? সেইজন্য অনেকে যখন বলে, ভাল লোক হয়েও যদি এত কষ্ট পেতে হয়, তাহলে ভাল লোক হওয়ার কি দরকার? আমিও তাদের বলি, আপনার ভাল লোক হওয়ার দরকার নেই। ভাল লোক হয়ে ভাল কাজ করতে কেউ তোমাকে দিব্যি দেয়নি। এটা অন্য ধর্মের সমস্যা। অন্য ধর্মে বলবে, তুমি যদি আমাদের ধর্মের আদেশ না মান, আমি তোমার গলা কাটব; আর আমার থেকে যদি বেঁচে যাও তাহলে আমার ভগবান তোমাকে নরকে পাঠাবে। আমাদের এখানে কোন সমস্যা নেই, এটা তোমার, চয়েস তোমার; তোমার যদি মনে হয় চুরি, বাট্‌পারি করে ভাল থাকবে, তাই করেই থাক। কিন্তু এর ফল একদিন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, তুমি বুঝবে, তোমার সন্তান বুঝবে, আর তার সন্তানের সন্তান বুঝবে।

যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু, রোগশোক, দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। এই যে আপনি এত বৈষম্য বৈষম্য দেখছেন, এটা দেখেছেন আপনার দেহবুদ্ধির জন্য। ভগবানের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। জগতের কোন বৈষম্যের মধ্যে তিনি জড়িয়ে নেই। **দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়তো ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন –যেমন প্রসববেদনার পর সন্তানলাভ**। এটা অত্যন্ত জরুরী কথা, অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরী কথা। মৃত্যুর পর কার কি হয় আমরা কেউ জানি না। একজন মারা গেলেন, আপনি কি করে জানবেন যে, ভগবান তাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন না? আপনি কি করে জানবেন যে, ভগবান চাইছেন একে ভাল জায়গায় নিয়ে যাই, এই দেহতে হবে না, দেহটা ফেলে দিতে হবে? আমাদের জানার কোন পথ নেই। তবে এটা ঠিক, যিনি এই মৃত্যুটা দেখছেন, তাঁর এই কষ্টটা হবে, কারণ তাঁর কাছে মৃত্যুটা অত্যন্ত দুঃখের। আপনি কি করে জানেন যে তিনি কোথায় গেলেন? যদি আপনাকে কেউ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেন, আপনি যদি দেখেন, যাকে আপনি হারালেন সে স্বর্গলোকে প্রচুর আনন্দ করছে, *শোকাতিগ মোদতে স্বর্গলোকে*। তখন কি আপনি বলবেন, ওরে তোর জন্য আমরা কত কেঁদেছিলাম, আর দেখছি তুই আমাদের ভুলে ওখানে কত আনন্দ করছিস?

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, যেমন প্রসববেদনার পর সন্তানলাভ। প্রসববেদনা যখন ওঠে তখন মায়েদের কত কষ্ট, কত চেঁচামেচি। জীবনে ওঠার আগে কত কষ্ট হয়। জীবনে যদি আপনি উঠতে চান, তার আগে কত কষ্ট আপনাকে করতে হবে। মৃত্যুটাও ওর মধ্যেই একটা। ওই যে বিরাট একটা শিকল, মৃত্যুটা তারই একটা পাব। **আত্মজ্ঞান হলে সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু –স্বপ্নবৎ বোধ হয়**।

আমরা কি বুঝব, একসের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর খবর দেয় না। গলে মিশে যায়। মূল বক্তব্য, সংসারে আমরা যাবতীয় যা কিছু দেখছি, সব তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। ভাল হচ্ছে না কি মন্দ হচ্ছে; আমরা কি বলব? Judgemental হওয়া যায় না। যীশু আরও ভাল বলছেন, judge not that ye be judged। এটা অবশ্য যীশু অপরের চরিত্রকে নিয়ে বলছেন। কিন্তু আমরা তো ভগবানকেই বিচার করে দিচ্ছি –তিনি অমুক, তিনি তমুক; কতটা মুর্খ হলে মানুষ এমন করতে পারে। শুধু মন্দের ক্ষেত্রেই নয়, ভালটাও যদি বলেন, সেখানেও কিন্তু আপনি Judgemental হচ্ছেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের বিচার করতে নেই। আমাদের জন্য হল, ঠাকুর তুমি যা করছ কর, আমি ওসব কিছু জানতে চাই না, আমার চাই তোমাকে। সংসারের ব্যাপারে I don't know I don't care to know, আমি জানি না, জানতেও চাই না। নবম অধ্যায়ের শেষের দিকে এসে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *অনিত্যমসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, সংসার অনিত্য, এখানে সুখের গন্ধটুকুও নেই; এই জিনিসটাকে ভাল করে বুঝে নিয়ে তুমি আমার ভজনা কর, আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর।

আমরা দেখলাম ঠাকুর আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, ঈশ্বরের ব্যাপারে এক গুচ্ছ প্রশ্ন করা বেকার। কারণ ধারণাই করতে পারবে না, ঠাকুর বলছেন –একসের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে। আমাদের শ্রোতারা আমাদের অনেক প্রশ্ন করেন, রাস্থাঘাটে চলতে গিয়ে ট্রেনে বাসে লোকেরা আমাদের অনেক প্রশ্ন করেন। প্রথমেই আমি বলে রাখি, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যদি কোন প্রশ্ন করেন উত্তর দিতে রাজী আছি। একটা বিষয়কে ধারণা করার জন্য ওই বিষয়ের অনেক কিছু জানা দরকার। যতটুকু জানেন ততটুকু থেকে আপনি এক পা এগোতে পারেন। কারণ যখন আপনি হাঁটেন, তখন আপনি যে জায়গাতে আছেন সেখান থেকে এক পা এগোতে বা পিছোতে পারেন, ডানদিক, বামদিক, কোণাকুনি এক পা পর্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু প্রথমেই যদি বলেন এক কিলোমিটার দূরে চলে যাব; না, সেটা সম্ভব না। ভগবানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়; ভগবানকে আপনি যতটুকু বুঝেছেন, তার থেকে এক পা গিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। সেইজন্য বেশির ভাগ শ্রোতাদের প্রশ্নগুলো বোকা বোকা লাগে, অযথা সময়ের অপচয়। এটাকে এবার আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি। এমনকি ঠাকুর বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর খবর দিতে পারে না, সমুদ্রের জলে গলে মিশে যায়। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলারও যদি থাকে বলতে পারবেন না, কারণ যিনি ঠিক ঠিক জেনে গেছেন তিনি তো লয় হয়ে গেছেন।

ঠাকুর অবতার, মুখোশ যেটা রেখেছেন, সেটা একজন ভক্তের। অবতার যখনই আসেন তিনি একটা মুখোশ রাখেন; শ্রীরামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের, সবারই মুখোশ ছিল। একজন ভক্তের কাছে আমরা যে জিনিসগুলো আশা করি, ঠাকুরের মধ্যে তার সবটাই আছে। কথাবার্তা যখন বলছেন, তখন বেশির ভাগ সময় তিনি যেন একজন ভক্ত যিনি অনেক কিছু জানেন, তাঁর মত কথা বলছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই মুখোশটা খসে পড়ে যাচ্ছে। তখন মনে হবে উনি যেন আমাদের মতই একজন, প্রকৃতপক্ষে তিনি কিন্তু আমাদের থেকে আলাদা কিছু, আমাদের সঙ্গে এক নন।

ঠাকুর একজন ভক্তের সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছে। বলিতেছেন, "প্রত্যুষে ও শেষ রাত্রে ধ্যান করা ভাল ও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর"। কিরূপ ধ্যান করিতে হয় –সাকার ধ্যান, অরূপ ধ্যান, সে-সব বলিতেছেন। সূর্যোদয়ের আগে আর সূর্যাস্তের ঠিক পরে আর ভোর রাতে, তিনটে থেকে চারটের মধ্যে, আবার মাঝ রাতে, এই সময়গুলো ধ্যানের প্রশস্ত সময়। পরম্পরাতে চারটে সন্ধির কথা বলা হয় – সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত। সন্ধ্যার সময় জপ করলে ফল খুব ভাল হয়। এই আলোচনা শুনে হঠাৎ দুম্ করে আজ থেকেই শুরু করে দেবেন না। মাথার অনেক সমস্যা দেখা দেবে। সংসারে যাঁরা আছেন, সংসারে থেকে হঠাৎ যদি বেশি ধর্ম ধর্ম করতে শুরু করেন, মাথার গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। এমনি যাঁরা সন্ন্যাসী, বছরের পর বছর ধর্ম জীবন নিয়ে আছেন, হঠাৎ সংসারের ভাব যদি কিছু দেখে নেন, তাঁদেরও মাথা এলেমেলো হয়ে যায়, ওটা তাঁরা নিতে পারেন না। যিনি যে ধরণের জীবনে আছেন, তাঁকে সেখান থেকে একটু একটু করে বাড়িয়ে এগোতে হয়। হঠাৎ করে কোন কিছু বেশি করতে নেই। জিমে গিয়ে প্রথম দিনেই যদি প্রচুর ব্যায়াম করেন, আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। হঠাৎ একদিনে যদি প্রচুর খাবার খেয়ে নেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। সব কিছুই ধীরে ধীরে, *শনৈঃ শনৈঃ* একটু একটু করে করতে হয়। এইসব কথা বলার পর মাস্টারমশাইকে ঠাকুর খুব সুন্দর কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –দেখ, এখানে যারা যারা আসবে সকলের সংশয় মিটে যাবে, কি বল? এই একটি কথা আমি বুক ঠুকে জোর গলায় আপনাদের সবাইকে বলতে পারি। শাস্ত্র যদি বুঝতে হয়, ধর্ম জগতের ব্যাপার যদি বুঝতে হয়, ঈশ্বরের পুরো ব্যাপারটা যদি বুঝতে হয় –ঠাকুর ছাড়া গতি নেই। সেইজন্য আমি বারবার বলি, যাঁরা কথামৃতের কথা শুনেছেন, লীলাপ্রসঙ্গের কথা শুনেছেন; তাঁরা যদি এই দুটো অধ্যয়ন না করে ধর্মকথা বলেন, তিনি যেই হয়ে থাকুন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক হন, শৈব সম্প্রদায়ের লোক হন, অমুক বাবাজী হন, অমুক ইন্টারনেশানাল অরগানাইজেশান হোক, আপনি জেনে যাবেন তাঁরা ভুল বলছেন। আপনাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, প্রমাণ কি? হিন্দিতে খুব সুন্দর কথা

আছে, হাত-কঙ্গনকো আরশি কেয়া, হাতে বালা আছে তার জন্য আয়না কেন লাগবে। যার হাতে বালা সে নিজেই জানতে পারে আমার হাতে বালা আছে। এটা স্ব-সংবেদ্য, যিনি বোঝেন তিনি বোঝেন; যিনি বোঝেন না, তিনি বোঝেন না। আপনার ভিতর যদি ঠিক ঠিক ধর্ম চেতনা জাগে; ধর্মকে সামাজিকতার দিকে না নিয়ে গিয়ে, ধর্মকে রাজনীতির দিকে না নিয়ে গিয়ে, ধর্মকে অপরের গলা কাটার জন্য না নিয়ে গিয়ে ধর্ম চেতনা জাগলে বুঝতে পারবেন, হিন্দু ভাব আপনার জেগে গেছে। স্পিরিচুয়ালিটি মানেই হিন্দুইজম্। হিন্দু ধর্ম মানেই স্পিরিচুয়ালিটি, আমরা হলাম স্পিরিচুয়ালিটির মাস্টার। বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়বেন, পড়ার পর যদি কথামৃত পড়তে থাকেন, তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন, এবার ওই শাস্ত্রগুলো বোঝা যাচ্ছে। তাই না, ওই শাস্ত্রগুলির যেখানে যেখানে ফাঁক থেকে গেছে, কথামৃতে সেগুলোও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঠাকুর স্বয়ং নিজে যেখানে বসে আছেন, সেখানে যাঁরা যাঁরা আসবেন তাঁদের সকলের সংশয় মিটে যাবে। সংশয় বলতে আবার পরিষ্কার বলছি, নরেন যেভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহাশয়, আপনার কি ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, এই কথা আমি আপনি যদি ঠাকুরকে বলতে যেতাম, ঠাকুর হেসে উড়িয়ে দিতেন। বাচ্চা একটি ছেলে ঠাকুরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁগো তুমি নাকি উপদেশ দাও, আমাকেও একটু দাও না'। ঠাকুর হেসে রামলালকে বলছেন, ওরে রামলাল তাকের উপর উপদেশ রাখা আছে, ওখান থেকে ওকে একটা দুটো উপদেশ দিয়ে দে। তাকে সন্দেশ রাখা ছিল। বাচ্চাটি খেয়ে বলছে, 'ও এটা উপদেশ, খুব ভাল তো'। আমরা যখন ধর্ম নিয়ে জিজ্ঞেস করি, আমরা উপদেশ না, আসলে আমরা সন্দেশ চাইছি, সন্দেশকেই আমরা বুঝতে পারব। সংশয় তাঁদেরই মিটে সাধনা করে, খাটাখাটনি করে যাঁরা একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন, কিন্তু পর্দাটা আর ছিঁড়ে ফেলতে পারছেন না; ঠাকুর তখন পর্দাটা খুলে দেখিয়ে দেন। এটাই আমরা বলতে চাইছি। আপনার প্রস্তুতি যদি না থাকে, বছরের পর বছর অধ্যয়ন যদি না থাকে, বছরের পর বছর সাধনা যদি না করা থাকে, তাহলে জানবেন মনের প্রশ্নগুলি হবে এই ধরণের –শ্বশুর মশাই, আপনার কি বিয়ে হয়েছে? আমাদের বেশির ভাগেরই এই রকম প্রশ্ন হয়ে যায়।

মাস্টার –আজ্ঞা হাঁ।

সেই সময় সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে আপনি কিছুক্ষণ এই দৃশ্যটার চিন্তন করুন – দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যার সময় ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। আর সেই সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে মাঝি নৌকা নিয়ে যেতে যেতে গান ধরেছে। অনেক দূর থেকে যখন কোন গান যদি ভেসে আসে, তখন গানের অনেক দোষ মুছে যায়, শুনতে খুব ভাল লাগে। অনেক দূর থেকে যদি বাঁশির আওয়াজ, কোন বাজনার আওয়াজ ভেসে আসে, শুনতে খুব মধুর লাগে। দূর থেকে ভেসে আসার জন্য বাজনার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে ওগুলো হারিয়ে যায় এবং সুরের সুন্দর লহরী কানে প্রবেশ করে। মাঝির গানও অনেক দূর থেকে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে ভেসে আসছে, মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন –**মধুর অনাহতধ্বনির ন্যায় অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষ যেন স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট।**

যোগীরা যাঁরা গভীর ধ্যান করেন, ধ্যানের মাধ্যমে একটু একটু করে এগোতে থাকেন, নানান রকম দিব্যদর্শন শুরু হয়। হতে হতে এই জগতের যে শেষ সীমানা শব্দব্রহ্ম, ওই জায়গাতে পৌঁছে যান। এবার ওটাকেও ভেদ করতে হয়। ভেদ করার জন্য মনকে আরও সূক্ষ্ম করতে হয়, মন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে গেলে যোগী সেই শব্দব্রহ্মকে ভেদ করে বেরিয়ে যান। এই আওয়াজটা ঘন্টার ঢং আওয়াজের মত। অনেক দূর থেকে ঘন্টার এই ঢং শব্দ ভেসে এলে, তখন মনকে আরও সূক্ষ্ম করলে ওখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাওয়া যায়। এই জিনিসটাকেই ঠাকুর বলছেন –সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁঙ্কারে লয় হয়, তারপর বলছেন, যোগী তাঁর কৃপায় এই অনাহতকে ভেদ করে তাঁকে দর্শন

করতে পারে। অনাহত –যেটা কোন কিছুরে আহত হয়নি, অক্ষত আওয়াজ। যেমন ওঁউম্ম্...... এই যে 'ম্' চলতে চলতে লয় হয়ে যাচ্ছে, এটা অক্ষত। এটাই নানান রকম শব্দে পরিবর্তিত হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন শব্দ তৈরী হয়েছে। এই শব্দগুলিরই মূর্তরূপ হল এই সংসার। এই যে দূর থেকে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে গান ভেসে আসছে, এটাকে মাস্টারমশাই দেখছেন, যেন অনাহত ধ্বণি প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষকে স্পর্শ করে সুরে বাঁধা হয়ে একটা গীত রূপে ভেসে আসছে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। ঠাকুরের পুরো জীবনটা যেন বিরাট বড় ভারি মৌচাকের মত, একটা টোকা লেগে গেলে টপ্‌টপ্ করে মধু ঝরে পড়বে।

গঙ্গাবক্ষে মাঝি গান করতে করতে যাচ্ছে, গানের শব্দ না, গানের সুর না, শুধু দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছে, ঠাকুরের মনকে টেনে নিয়েছে। এখন কি গান ছিল আমাদের জানার উপায় নেই। ঠাকুরের শরীরের সমস্ত রোমকূপ কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে, এখানে কোথাও ঢংঢাং, কোন ন্যাকামো কিছুই নেই।

ঠাকুর বলছেন, **'দেখ দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ'**। মাস্টারমশাই ঠাকুরের সেই প্রেমাবিষ্ট কণ্টকিত দেহ স্পর্শ করে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। মাস্টারমশাই বলছেন, **উপনিষদে কথা আছে যে, তিনি বিশ্বে আকাশে 'ওতপ্রোত হয়ে আছেন'**। মাস্টারমশাই অবাক হয়ে ভাবছেন – **তিনিই কি শব্দরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছেন? এই কি শব্দ ব্রহ্ম?** ঠাকুর আবার কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যারা যারা এখানে আসে তাদের সংস্কার আছে, কি বল?

মাস্টার –আজ্ঞে হাঁ।

সংস্কার জিনিসটাকে আমরা খুব মানি। সংস্কার শব্দকে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা খুব মুশকিল। আপনি যে কর্মগুলো করেছেন, যে কথাগুলো শিখে ভিতরে আত্মসাৎ করেছেন, যে বাড়িতে বড় হয়েছেন সেখানকার যে পরম্পরা, যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন সেখানকার যে পরম্পরা, আপনার আশেপাশে যে লোকজন আছে, যাদের সাথে মেলামেশা করছেন, তাদের যে পরম্পরা; এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে আপনার যে একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরী করছে, এটাই সংস্কার। আমরা সবাই যে সংস্কার নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে কিছু সংস্কারের বৃদ্ধি হয়, কিছু সংস্কারের ক্ষয় হয়, এই ভাবে আমরা আমাদের জীবনরূপ নদী বেয়ে এগিয়ে চলেছি সচ্চিদানন্দরূপ সাগরের দিকে বা মুক্তির পথে। আমরা সবাই মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছি। বদমাইশ, দুষ্ট লোকেরাও মুক্তির পথে, যারা কয়েদী হয়ে জেল খাটছে তারাও মুক্তির পথে। যারা নৃশংস, খুনী তারাও মুক্তির পথে। তাদের মনে হিংসার ভাব এত বেশি, ওই ধরণের জঘন্য হিংসার কাজ করার পর তারা যে মার খাবে, ওই মার খাওয়াটাই তাকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেবে। কয়েক জন্ম এভাবেই চলতে থাকবে, তারপর কোন জন্মে গিয়ে তার মনে শুভ চেতনার উদয় হবে, যখন সে বলবে, আমার আর কিছু লাগবে না, এবার সে নিজেকে পাল্টে নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অধরের সংস্কার ছিল। অধর সেন ঠাকুরের কাছে আসতেন।

মাস্টার –তা আর বলতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সরল হলে ঈশ্বরকে শীঘ্র পাওয়া যায়। আর দুটো পথা আছে –সৎ, অসৎ। সৎপথ দিয়ে চলে যেতে হয়।

সৎপথ শাস্ত্রের পথ, সৎপথ ঈশ্বরের পথ। সৎপথ যেখানে inclusive, যেখানে স্বার্থের গন্ধ থাকে না। স্বার্থপরতাই অপবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতাই পবিত্রতা। কেন আমরা কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে দৌড়াচ্ছি, কারণ আমরা স্বার্থপর। মিথ্যা কথা মানুষ কেন বলে, স্বার্থপর বলে। চুরি-ডাকাতি কেন করে,

স্বার্থপর বলে। ধর্মপথ হল নিঃস্বার্থের পথ, যেখানে মানুষ ত্যাগের পথ অবলম্বন করে। জীবন চালানোর জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই সে নেয়। একটা খুব সুন্দর ও সহজ কথা হল –যে জিনিস মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে, বা ক্ষমতা দিতে পারে, সেই জিনিসটাই জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে জিনিসটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই জিনিসটাকেই জীবনের কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায়।

যেমন ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন। কিন্তু যখন বিবাহ আদি হয়, তখন মনকে পুরো জগৎ থেকে গুটিয়ে এনে একটি জায়গায় রেখে দেয়, এটাই এখন ধর্ম সাধনার পথ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিবাহ আদি সমাজে যেমন একটা সম্মান পায়, কিন্তু এটারই যখন উল্টো হয়ে যায়, যেটাকে আমরা অবৈধ সম্পর্ক বলছি, এটাকে আমরা নোংরা মনে করি। যখন সব কিছুকে একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম করে করা হয়, কম মাত্রায় করা হয়, ওটা তখন মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যায়, কারণ ওখানে ত্যাগ রয়েছে। যেমন সাপ ছোবল দিলে প্রচুর বিষ ঢালে, বিষের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ মারা যায়। সেই বিষের প্রভাব থেকে মুক্ত করার সময় এ্যান্টি ভেনাম নিতে হয়। এ্যান্টি ভেনামেও সেই বিষই রয়েছে, কিন্তু কম মাত্রায় আছে। ভোগ যখন কম মাত্রায় করা হয়, মানুষকে তখন শ্রেষ্ঠ পথের দিকে নিয়ে যায়। এই ভোগই যদি বেশি মাত্রায় করা হয় তখন বেশি খেলে যেমন মানুষের বদহজম হয়ে তাকে অজীর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, তেমনি ভোগ বেশি করলে সমস্ত শুভ সংস্কারগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

মাস্টার –আজ্ঞে হাঁ, সুতোর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –খাবারের সঙ্গে চুল জিবে পড়লে, মুখ থেকে সবসুদ্ধ ফেলে দিতে হয়।

ভোগ বা অসৎ হল খাবারের মধ্যে চুল চলে যাওয়া। খাবারে চুল থাকা বা চুল পড়াকে আমরা হিন্দুরা অত্যন্ত মন্দ দৃষ্টিতে দেখি। মনুস্মৃতিতেও খাবারের মধ্যে চুল পড়ে যাওয়া নিয়ে সাবধান করছেন। বর্তমান কালে হোটেল রেস্টুরেন্ট আদিতে আমরা দেখি যারা রান্না করে, পরিবেশন করে তারা মাথায় একটা কি পড়ে থাকে যাতে খাবারে চুল না পড়ে যায়। কিন্তু আমরা যেভাবে অপবিত্রার ভাব নিয়ে দেখি, এই অপবিত্রার ভাব ইদানিং নূতন যারা তাদের মধ্যে নেই। যত পচা জিনিস, এঁটো জিনিস হবে ওগুলোরই বেশি দাম। হোটেল আদিতে রান্না করতে করতে রান্না থেকে একটু খাবার তুলে জিব দিয়ে চাটলো, সেটাকেই আবার খাবারের মধ্যে মিশিয়ে দিল।

মাস্টার –তবে আপনি যেমন বলেন, যিনি ভগবানদর্শন করেছেন, তাঁকে অসৎসঙ্গে কিছু করতে পারে না। খুব জ্ঞানাগ্নিতে কলাগাছটা পর্যন্ত জ্বলে যায়।

ঠিকই, যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে তাঁর আর সৎ অসৎ কি। এখানে এসে এই প্রসঙ্গটা শেষ হয়ে যায়।

এরপর মাস্টারমশাই আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন অনেকদিন পরের একটি বর্ণনায়। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে একেবারে আষাঢ় মাসে নিয়ে যাচ্ছেন, ৩১শে আষাঢ়, শুক্লা দশমী, ১৪ই জুলাই ১৮৮৩, শনিবার। অনেকদিনের গ্যাপ্।

আর-একদিন ঠাকুর কলিকাতায় বেনেটোলায় অধরের বাড়িতে এসেছেন। কথামৃতের এটা একটা খুব জরুরী অংশ। এখানে কিছু বর্ণনা আছে যেগুলো আমাদের দরকার নেই। **অধর ঠাকুরকে রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান শুনাইবেন। রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন**। রাজনারায়ণের গান হচ্ছে। ঠাকুর কিছুক্ষণ শুনতে শুনতে ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যাঁরা গান করছেন তাঁদের সঙ্গে আখর দিচ্ছেন। গান সমাপ্ত হল, ঠাকুর অধরের দ্বিতল বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে বসলেন এবং নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলতে লাগল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা রাজপথে ভক্তসঙ্গে

এক সপ্তাহ পর, **২১শে জুলাই, ১৮৮৩** খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার বেলা চারটা। দক্ষিণেশ্বর থেকে রওনা হয়ে প্রথমে ঠাকুর অধরের বাড়ি যাবেন। সেখান থেকে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাড়ি আর শেষে খেলাৎ ঘোষের বাড়ি যাবেন। যেতে যেতে ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞেস করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়?

মণি –আজ্ঞে, তাঁর খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে। এগুলো কথার কথা, ঠাকুর তো সবারই ভিতরটা জানতেন। মণি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর পূর্বজন্মের সংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

মণি –আমার পূর্বজন্ম ও সংস্কার এ-সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই, এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে? আমরা এক্ষুণি আলোচনা করলাম, ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, এখানে যারা যারা আসছে তাদের সংস্কার আছে, তোমার কি মনে হয়? মাস্টারমশাই তখন শুধু 'আজ্ঞা হাঁ' বলে আর কিছু বললেন না। কিন্তু এখন বলছেন, পূর্বজন্ম ও সংস্কার এই দুটোতে আমার তেমন বিশ্বাস নাই। আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন অবাক লাগে, মাস্টারমশাই না হলে অনেক কিছু বোঝা যেত না। প্রায় দু-বছর তিনি ঠাকুরের সঙ্গ করছেন, কিন্তু এখনও বলছেন তাঁর পুনর্জন্মে এবং সংস্কারাদিতে তেমন বিশ্বাস নেই। পুনর্জন্ম প্রসঙ্গ কঠোপনিষদে, গীতাতে আছে; আমরাও গীতা ও কঠোপনিষদের ক্লাশে পুনর্জন্মের উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি।

আমার আপনার পুনর্জন্ম যদি না হয়, তাহলে তিনটি সম্ভবনা এসে যাবে। প্রথম সম্ভবনা – মৃত্যুর পর সব শেষ, যেটা হিন্দু ধর্মে কোথাও বলছেন না। দ্বিতীয় সম্ভবনা –একবারই জন্ম হয়েছে, তাতেই মুক্তি হবে। যদি মুক্তি না হয় তাহলে কি হবে? আচ্ছা মানছি যে, তারা এই স্বর্গে সেই স্বর্গে যাবে, কিন্তু তারপর কি হবে? কোথাও এর বর্ণনা নেই। তৃতীয় সম্ভবনা –আর তা নাহলে খ্রীশ্চান, মুসলমানদের মত মৃত্যুর পর পড়ে থাকবে, শেষ দিন যেদিন আসবে সেদিন তাদের বিচার হবে ইত্যাদি। এই তিনটে ছাড়া চতুর্থ কোন সম্ভবনা নেই। আপনারাও একটু বিচার করে দেখবেন।

এখন কি হয়, সমাজে যাঁরা শাস্ত্র পড়েননি, শাস্ত্রে যাঁদের রুচি নেই, তাঁরা এই ধরণের কথা বললে তাও বোঝা যায়। চার্বাকদর্শন বলছে –*যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ*। কিন্তু মাস্টারমশাই তো আসলে তা নন। তিনি রীতিমত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, থেকে থেকে কথামৃতের পাতার নীচে ফুটনোট নিজের বক্তব্য, বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। এরপরেও মাস্টারমশাই যখন বলছেন পুনর্জন্ম মানি না, তখন কথাটা কেমন যেন বেমানান লাগে, অবাক লাগে। আপনি যে শাস্ত্রের এত কোটেশান দিয়ে নিজের জ্ঞান দেখাচ্ছেন, এগুলো তাহলে কি? কারণ পুনর্জন্ম যদি না থাকে তখন তিনটের মধ্যে একটা হয়ে যায় –এই জীবনের কোন অর্থ নেই, গীতায় যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, *অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা*।। জন্মের আগে তুমি ছিলে না, মৃত্যুর পর তুমি থাকবে না; তাহলে মাঝখানের এই কয়েকটা দিনকে নিয়ে এত লম্ফঝম্ফ করার কি দরকার। আরও অবাক লাগে আপনি ঠাকুরকে এত অবতার অবতার বলে যাচ্ছেন, অথচ অবতার শব্দের মধ্যেই পুনর্জন্মবাদ নিহিত হয়ে আছে। পুনর্জন্ম না থাকলে ঠাকুর তো মিথ্যা হয়ে গেলেন, এরপর ঠাকুর আর কিসের অবতার থাকলেন? আর তা নাহলে আপনাকে বলতে হবে, একটাই জন্ম হবে, একটা জন্মেই মুক্তি হবে। এটা তো সম্ভবই না, আর যুক্তিতেও দাঁড়ায় না। কারণ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি সবাই মুক্তির পাত্র নয়। সবাই যদি মুক্তির পাত্র না হয়, তাহলে এরা সবাই মৃত্যুর পর কোথায়

যাবে, ওদের কি অবস্থা হবে? চিরদিনের জন্য কি তারা আটকে থেকে যাবে; এটা কি কোন যুক্তিগ্রাহ্য হবে? তাহলে তো হিন্দু ধর্ম একটা অত্যন্ত নিরাশাবাদী ধর্ম হয়ে যায়। আর তা নাহলে খ্রীশ্চান, মুসলমানদের মত একটা জন্মে যতটা হওয়ার হল, এরপর তুমি ওই ভাবেই পড়ে থাক, ভগবান পরে এসে বিচার করবেন, তখন এই হবে, সেই হবে। এটা তাদের ধর্মে আছে, আমাদের ধর্মে নেই।

অন্য দিকে পুনর্জন্ম মানলে আপনাকে সংস্কার মানতেই হবে। পুনর্জন্ম মানেই কেউ একজন একটার পর একটা জন্ম পেরিয়ে পেরিয়ে চলছে। কিছু দিন আগে আমেরিকার একজন লেখকের একটা লেখা পড়ছিলাম। আমেরিকার লোকেরা জগতের লোকেদের জ্ঞান দিয়ে বেড়ায়, কিছু না বুঝেও জ্ঞান দিয়ে বেড়ায়। ওই লেখাতে বলছেন, প্রথম কয়েকটা জিনিস তোমার নিজের। কি জিনিস? প্রথমটা হল, তুমি কোথায় জন্ম নেবে। দ্বিতীয় জিনিস, তোমার কি লিঙ্গ হবে, পুরুষ না নারী। তৃতীয় জিনিস – তোমার বাবা-মা কি রকম হবে, ইত্যাদি। ভাবলাম মজা করে লিখি যে, এত কিছু আপনার হাতে রয়েছে, তাহলে আপনারা আর খ্রীশ্চান হলেন কোথায়, আর আমেরিকান হলেন কোথায়; এটা তো পুরো হিন্দু ধর্ম থেকে আসছে। ওই কোথায় কিছু একটা শুনেছি, তারপর নিজের মত চিন্তা-ভাবনা করে জগাখিচুরি পাকিয়ে কিছু না বুঝে একটা থিয়োরি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। একটা কথা যখন বলবেন, তখন লজিক্যালি আপনাকে আগে সঠিক হতে হবে।

মাস্টারমশাইর এই কথাগুলো পড়ে সত্যিই আমি চমকে উঠি, কি করে তিনি এই কথাগুলো বললেন? একেবারেই অযৌক্তিক কথা। আর ঠিক এই জিনিসই দেখবেন, বর্তমানকালে যারা হোয়টস-আপ ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট, ফেসবুকে গিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করা, এরা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে নানান রকম কমেন্টস লিখে যাচ্ছে, বেশির ভাগই উল্টোপাল্টা আর এমন নোংরা নোংরা শব্দ লেখে কল্পনা করা যায় না। আমাদের কমেন্টসগুলো ডিলিট করে দিতে হয়। একজন সাধারণ অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবিহীন তারা এ-ধরণের কথা বললে ঠিক আছে, কিন্তু মাস্টারমশাই কিভাবে এই রকম কথা বলছেন, অবাক হয়ে যেতে হয়।

এখানে অত্যন্ত সাধারণ যুক্তি, আপনারা যাঁরা শুনছেন, পরে পরে যাঁরা শুনবেন, হয় আপনাদের মানতে হবে ধর্ম সত্য। ধর্ম যদি সত্য নাই হয়, তাহলে কেন আপনি এগুলো শুনছেন? যদি আপনার ঠাকুরে বিশ্বাস থাকে, যদি আপনার হিন্দু ভাবে বিশ্বাস থাকে, তাহলে প্রথম যে জিনিসটাকে স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বাস করতে হবে, সেটা হল পুনর্জন্ম। কারণ পুনর্জন্ম ছাড়া ধর্ম হতে পারে না। খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম পুনর্জন্ম না মানলেও, এই জীবনটা কোন না কোন রূপে চলতে থাকে, এটাকে তারা বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যাচ্ছে, এই শরীরকে যে ধারণ করে আছে, সেই যায় স্বর্গে। নরকে যে যাচ্ছে, সেই যায় যে এই শরীরকে ধারণ করে আছে। চার-পাঁচজন কয়েকজন নাস্তিক লোক কোটি কোটি লোক যারা ধর্মকে আধার করে চলে, তাদেরকে ডাণ্ডা দিয়ে চালাবে? তা কি কখন হতে পারে? Spiritually chanllanged persons, আদালতে যেমন চ্যালেঞ্জড্ হয়। তেমনি spiritually impairment কার্ল মার্ক্স বলে দিলেন, ধর্ম হল সমাজের আফিং, এবার তার পিছনে খোল-করতাল নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ল –ধর্ম সমাজের আফিং। তাহলে এত এত মহারপুরুষ, যাঁরা ধর্ম নিয়ে এত এত কিছু বলে গেলেন, সেগুলো কিছু না?

একজন লোক কোন দিন ধর্মের অনুশীলন করল না, ধর্মের ভিতরে ঢুকল না, কোন ধর্মীয় পুরুষের সঙ্গ করল না, এরাই ধর্মের বিরুদ্ধে অনর্গল বলে যাচ্ছে। কোন একটা বিষয়ে আমাকে যদি বলতে হয়, সেই বিষয়ের আমি হয়ত ছাত্র নই, সেইজন্য আমাকে সেই বিষয়ের উপর চারটে বই পড়তে হয়, ওই বিষয়ের চারজন বিশেষজ্ঞকে আমার জিজ্ঞেস করার থাকে। আসলে এরা সবাই অযৌক্তিক, কোন যুক্তির ধার ধারে না। কঠোপনিষদে বলছেন, *অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ*, অন্ধ সর্দারের অন্ধ চেলারা। যারা দুটো ইংরাজী বই পড়ে নিয়েছে তাদেরও সেই দুরবস্থা –পুনর্জন্ম, সংস্কার এগুলোতে

আমার তত বিশ্বাস নেই। ঠাকুর তো আর তর্ক করতে যাবেন না। যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি অন্য ধরণের কথা বলেন। আমি তো জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নই, আমার কথা তাই একটু অন্য রকম হবে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, কিন্তু ওটাই বলছেন যেটা আমি ব্যাখ্যা করলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হল। আবার কথা ওটাই এসে যাচ্ছে। যদি আপনি ধর্মপ্রাণ হন, ঈশ্বরে যদি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন, তাহলে এটাও আপনাকে বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর মানেই অনন্ত। তার মানেই হল, যে কোন জিনিস অনন্ত, তাহলেই হল। তার মানে, আপনার এই মতুয়া বুদ্ধি, আপনার এই ছোট্ট বুদ্ধি থেকে আপনি বেরিয়ে আসুন। আপনারা কিছু মনে করবেন না, কাউকে আমি ছোট করছি না; খুব কম ভক্ত দেখেছি যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, নিয়মিত মঠে আসেন, প্রসাদ খান, দৌড়ে দৌড়ে বক্তৃতা শুনতে যান, ধর্ম বোঝেন খুব কম ভক্ত দেখেছি। ওই কিছু এই মহারাজ, কিছু সেই মহারাজের কাছ থেকে দু-চারটে কথা শুনে নিয়েছেন, আর বলবেন আমি ওই মহারাজের বক্তৃতা শুনি, আমি অমুক মহারাজের সঙ্গ করি, অমুক আশ্রমে যাই ইত্যাদি, কিন্তু ভিতরটা পুরো ফাঁপা। ফলে কি হয়, কথা বলতে গেলেই মামার গোয়ালে ঘোড়া নিয়ে আসবেন। কিন্তু ধর্ম আহামরি কিছু না, এটা কোন রকেট সাইন্স না।

তারপরেই ঠাকুর বলছেন, **আমি যা ভাবছি –তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা**। বাংলায় এই জিনিসটা ভর্তি, এখানে সবাই হলেন এক একজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোক। আমি সব জানি, নিজের এই বিশ্বাস, আমি একমাত্র ঠিক, এটা যদি হয় তাহলে সে নোবেল প্রাইজ পাবে, এত আত্মবিশ্বাস। বিহার, ইউপি লোকেদের সুবিধা আছে, ওরা না জেনেই নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করে। কিন্তু অত প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারে না, তর্ক করতে গেলে দমে যায়। কিন্তু এখানে কাউকে তর্কে তার সামনে দাঁড়াতে দেবে না।

ঠাকুর বলছেন, **এরূপ ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন**। তুমি যেটা ভাবছ সেটাই ঠিক, এই মনোভাব একেবারেই ঠিক না। এনসাইক্লোপেডিয়া ওফ ইগনরেন্স নামে একটা খুব সুন্দর বই আছে, খুব মজার বই। সেখানে বলছেন, একটা স্কেল যদি করা হয় আর স্কেলের দুদিকে যদি গর্ত থাকে –একটা গর্ত হল আমি সব জানি, আর-একটা গর্ত হল, আমি কিছু জানি না। প্রত্যেক মানুষ এই দুটো গর্তের লাইনে কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, একদল কিছু জানে, একদল কিছু জানে না। যারা শিখতে চায়, তারা মাথায় রাখে এই গর্তে যেন না পড়ে যাই। যদি আপনি মনে করেন আপনি কিছু জানেন না, এবং সত্যিকারের আপনি কিছু জানেন না, সক্রেটিসের মত না, তাহলে আপনার উপায় নেই। আর যদি মনে করেন আপনি সব জেনে গেছেন, তাহলেও আপনার পথ নেই। শিখতে যদি চান আপনাকে ওই লাইনে কোথাও না কোথাও থাকতে হবে।

তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও-সব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। তাই ও-সব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। এটা আরও খুব দরকারী কথা। জীবনের উদ্দেশ্য শান্তি, শান্তি এই অর্থে যে, নিজেকে জেনে নিলে শান্তি। নিজেকে জেনে নেওয়াটাই আত্মজ্ঞান। উদ্দেশ্য যদি আত্মজ্ঞান হয়, তাহলে আরও দশটা জিনিসকে জানার কি দরকার। তাই বলে যে আমরা কিছু জানার চেষ্টা করব না, তা না; জানতে হবে, তবে অযথা ওর মধ্যে কচকচানি করা, চরকা চালানো বেকার। ঠাকুর হনুমানের উদাহরণ দিচ্ছেন, **হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি, হনুমান বলেছিল, 'আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি'**।

তাঁর কাণ্ড কি কিছু বুঝা যায় গা! কাছে তিনি –অথচ বোঝবার জো নাই। সত্যিই কি অবাক করা ব্যাপার, ভগবান আমাদের ভিতরে আছেন, অথচ কেউ আমরা বুঝতে পারছি না। ঠাকুর বলরামের উদাহরণ দিচ্ছেন, **বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না**। ঠাকুর কলকাতায় ছিলেন, কলকাতার কজন লোক ঠাকুরকে জানতেন। ভগবান কলকাতার রাস্তায় ঘোড়াগাড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যেখানে

সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন, দেখ আমি সেই অবতার; তাও কেউ মানছে না। উল্টে ব্যঙ্গ করে বলছে, পরমহংসের দল চলে প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক। আমরা তো ঠাকুরকে অবতার বলে মানছি, তাহলে আমরা কি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলাম? কিছু না, ঠাকুরকে আমাদের অবতার মনে করা, ভগবান মনে করা, এগুলো কথার কথা মাত্র। যেমন জ্যেঠি খুড়ীদের দেখে বাচ্চারা কোঁদল করে বলে –তোর ঈশ্বরের দিব্যি; এই কথাগুলোও সেই রকম।

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা কি অত সহজ জিনিস? তখনকার দিনের কলকাতার লোকেরা কি মুর্খ ছিলেন, আমাদের থেকে তাঁদের বুদ্ধি কম ছিল? একেবারেই না, একেবারে সমান। শুধু তাঁরা যে কথার কথা বলতেন, আর আমরা যে কথার কথা বলছি, পাল্টে গেছে। কিন্তু কথার কথা দুজনেরই। আজকের দিনেও যদি ঠাকুর আসেন, কজন চিনতে পারবে? মুষ্টিমাত্র শ্রেষ্ঠতম কয়েকজন সাধক চিনতে পারবেন। আমিও পারব না। আমি আমার দু-চারজন আচার্যকে বিশ্বাস করি, তাঁরা আবার তাঁদের দু-চারজন আচার্যদের বিশ্বাস ও ভরসা করতেন, তাঁরা জেনেছিলেন ঠাকুর সত্য, সেই পরম্পরায় বিশ্বাস করি, ব্যস্ এতটুকু; ঠাকুরকে না, আমার আচার্যকে আমি বিশ্বাস করি। আমার আচার্য আমাকে বলে দিয়েছেন ঠাকুর ভগবান, আমার কাছে তাই ঠাকুর ভগবান; এর বেশি না। পুরো ইউপি, পুরো বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ জানে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তাতে কি হয়ে গেলে? যেমন মুর্খ ছিল, তেমন মুর্খই থেকে গেল, তুই যে কলু সেই কলুরে। আপনি জেনে গেলেন ঠাকুর অবতার, তাতে হলটা কি? যারা রামনামে ঢাক পেটাচ্ছে, আর বোকামো করে বেড়াচ্ছে; তাদের সাথে আমাদের কি তফাৎ, কিছুই তফাৎ নেই।

মণি –আজ্ঞা হাঁ! আপনি ভীষ্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন। ভাগবতে এর সুন্দর বর্ণনা আছে। ঠাকুরও জানতে চাইছেন, তিনি কি বলেছিলেন। মাস্টারমশাই সেটাই আবার বর্ণনা করে বলছেন, পাণ্ডবদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবের কাছে দেখা করতে গেছেন। দেখছেন ভীষ্মদেব শরশয্যায় কাঁদছেন। পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, কি আশ্চর্য! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওনাকেই জিজ্ঞেস কর না, কেন কাঁদছেন। ভীষ্মদেব বলছেন, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না, এই ভেবে কাঁদছি। পাণ্ডবরা এত সৎপুরুষ, এত সাত্ত্বিক ভাব, এত ধার্মিক, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এদের এত ভক্তি, ভগবান যাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন, পদে পদে রক্ষা করছেন, তাও দেখ পাণ্ডবদের কত কষ্ট, দুর্দশার অন্ত নেই। এটাই মণি বলছেন, ঠাকুরই এই কথা মণিকে অন্য জায়গায় বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন –কিছু জানতে দেন না। মায়া ঈশ্বরীয় শক্তি। এমন ভাবে ঢেকে রাখে যে, আছে একটা জিনিস কিন্তু দেখায় আর-একটা জিনিস। **কামিনী-কাঞ্চন মায়া**। যিনি কামিনী-কাঞ্চনের বাইরে চলে গেছেন, মায়া তাঁর কাছে আর কিছুই না। **এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন, হঠাত সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটি পুকুর, আর-একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান করলে। জলটি স্ফটিকের মত। দেখালে যে, সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা, –যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়**। এখান থেকে ঠাকুর এবার চৈতন্য নিয়ে আলোচনা করবেন, আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ও এটাই।

চৈতন্য খুব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম বলে অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের জন্য অত্যন্ত সহজ। আমাদের যে বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধি দিয়ে কিছু জিনিস আমরা শিখে নিয়েছি। এই শিখে নেওয়া দিয়ে আমরা জগৎকে এক ভাবে দেখি। যেমন এই কলম আমার হাতে আছে, আমি জানি এই কলমটা জড়। কলম একটা কাজ করে, এর থেকে কালি বের হয়, যেটা দিয়ে আমি লিখতে চাইলে লিখতে পারি। কিন্তু এর মধ্যে চেতনা নেই। আমরা এটাও জানি যে, টেবিলের উপর দিয়ে একটা ছোট্ট পিঁপড়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে, ওই পিঁপড়ের মধ্যে চেতনা আছে। এই যে জড় ও চেতনের মধ্যে যে বিভাজন, এই বিভাজন

আমাদের বুদ্ধি করে। চেতন হচ্ছে যার বুদ্ধি রয়েছে। একটা পাথরকে যখন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়, পাথরও সেই হাতুড়িকে আটকায়। যার জন্য হাতুড়ি ছিটকে ছিটকে যায়, যেটাকে নিউটনের থার্ড ল অফ মোশান বলে। একটা ব্যাকটেরিয়া বা একটা ভাইরাসকে আপনি যখন মারার চেষ্টা করবেন, সে কিছু প্রতিক্রিয়া করে। সেখানে চেতনার একটা অস্ফুট প্রকাশ দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র বোস একশ বছর আগে গাছপালা নিয়ে কত কি বললেন, তখনকার দিনে লোকেরা তাঁর কথা মানতে চাইল না। একশ বছর পর বিদেশীরা হঠাৎ থেকে থেকে যখন কিছু বলে, যেমন বলে কেউ গাছ কাটতে এলে গাছেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অন্য গাছদের সাবধান করে দেয়, তখন আমরা বলি, ঠিক কথাই বলেছে। সাদা চামড়ার লোক যা বলবে সেটাই আমাদের কাছে ঠিক কথা মনে হবে। এই কথাই আমাদের দেশের কোন লোক যদি বলে, তখন বলবে, লোকটার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে –গেঁয়ো যোগী ভীখ পায় না। জগদীশ চন্দ্র বোস যে সম্মান পাওয়ার কথা, তিনি পেলেন না শুধু একজন ভারতীয় বলে। বাইরে তো পেলেনই না, দেশেও পেলেন না, আসলে তিনিই একজন সত্যিকারের ভারতরত্ন। দুশ বছর ধরে ইংরেজদের গোলামী করে করে আমাদের মানসিকতাটাই গোলাম হয়ে গেছে। স্বামীজী বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ভাবে নিন্দা করেছেন।

একটা ব্যাকটেরিয়া বিবর্তিত হয়ে হয়ে যখন পশুতে আসে তখন তার চেতনার ভাব বেড়ে যায়, আর মানুষে এসে চেতনা অনেক বেড়ে যায়। শাস্ত্রে বলে, দেবতাদের চেতনা আরও বেশি। এই চেতনাটা মানুষের ভিতরে চিত্তবৃত্তি রূপে আসে। এই চিত্তবৃত্তিকে যখন পুরো শান্ত করে দেওয়া হয়, তখন গিয়ে ঠিক ঠিক দেখা যায় যে, আসল সত্তাটা হল চৈতন্য। এই চৈতন্যই কিছু জিনিসকে আশ্রয় করে চেতনারূপে দেখাচ্ছে। যেমন আমাদের এখানে আলো জ্বলছে। ইলেক্ট্রিসিটি যখন টিউবের মাঝখান দিয়ে যায়, তাতে টিউবের গ্যাসের কিছু পরিবর্তন হয়, আর সেখান থেকে টিউবের কাচটা আলোকিত হয়ে যায়। টিউবের কাচের নিজস্ব কোন আলো নেই। একটা আয়নাকে দিয়ে সূর্যকে প্রতিবিম্বিত করা হয়, দেখে মনে হবে আয়নাটাই আলোর উৎস, কিন্তু আয়না আলোর উৎস না। আয়নার নিজস্ব কোন আলো নেই। আমাদের যে মন, যে বুদ্ধি, এই মন ও বুদ্ধির নিজস্ব কোন চেতনা নেই, কোন ক্ষমতা নেই। ওই চৈতন্য যখন মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয় তখন মনকে চেতন বলে মনে হয়।

এই চেতনা দিয়ে এখন অনেক কিছু জানা যায়, আর কুকুর, বেড়াল যেভাবে জানে আমরা তাদের থেকে অন্য ভাবে জানি। এ্যমিবা, ব্যাকটেরিয়া এই জিনিসগুলোর চেতনা অনেক কম। পাথরের মধ্যে এই চেতনা আরও কম। ওনারা সেইজন্য ইট, পাথর, কাঠ, এগুলোকে বলছেন, sleeping consciousness। জড় বলে কিছু নেই, আমরা যেটাকে জড় বলে জানছি, আসলে ওর মধ্যে চেতনাটা ঘুমিয়ে আছে। গাছপালার মধ্যে চেতনা standing। প্রাণীর মধ্যে walking। মানুষের মধ্যে thinking। সেই চৈতন্যই এই চার প্রকারে আসে –জড়, উদ্ভিদ, নিম্ন প্রাণী ও মানুষ। মানুষ পুরো আলাদা, কারণ সে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। প্রতিবিম্বিত আলোকে ধরে যদি আলোর উৎসে পৌঁছান যায়, সেটাকে ধরে পৌঁছান যায় আসল আলোতে। জীবনের উদ্দেশ্য এই আসল আলোতে, অর্থাৎ চৈতন্যে পৌঁছান। কেন উদ্দেশ্য? কারণ, আসলে আমি, আপনি, সবাই আসলে এটাই। আমি আসলে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, ওটাই আমার বাড়ি, ওটাই আমার স্বরূপ, ওটাই আমি। কোন অজ্ঞাত কারণে নিজেকে ভালবাসার জন্য এখন আমি নিজেকে দেখতে চাইছি। যেমন অনেক সময় সুন্দরী মেয়ে, চিত্রাভিনেত্রী আয়নার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, কখন এভাবে, কখন সেভাবে আয়নাতে নিজেকে দেখছে। আমি তো সেই শুদ্ধ চৈতন্য, নিজেকে আয়নাতে দেখতে চাইছি।

আয়নাটাই মন। আমার আলো গিয়ে আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে আমাকে দেখছে। এটাই জগত, আমি যে জগৎ দেখছি, আমি তো নিজেকেই দেখছি; নিজের প্রতিবিম্বটাই দেখছি, এ-ছাড়া আর কিছু নেই। আয়নার গঠন যদি বিভিন্ন প্রকার হয়, ডিম্বাকৃতি, লম্বাকৃতি, গোলাকৃতি, আমার ছবিও সেই অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের আসবে। চৈতন্য যখন মনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন –এটাই জগৎ, এছাড়া

আর কিছু না। কেন দেখেন? তাঁর ভাল লাগে দেখতে। আমরা যেমন সিনেমাতে দুঃখের গান ভালবাসি, আনন্দের গান ভালবাসি, নাচ দেখতে ভালবাসি, ফাইটিং দেখতে ভালবাসি, হিরো ভিলেনকে মারছে দেখতে খুব মজা লাগে। এই জগতে যত রকমের রস আছে, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, সিনেমা সব জায়গায় সেই রসের ব্যবহার করে রসালো সাহিত্য, রসালো নাটক, সিনেমা তৈরী করা হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই ছবি। কোথায় সেই ছবি দেখা যায়? মনে। মনটা কি?

এই মন চৈতন্যেরই একটা রূপ। সেই চৈতন্য মন রূপে আয়না হয়ে আসে, সেই আয়নাতে নিজেকে যখন দেখছি চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছি। এই অবাক হয়ে যাওয়ার মত যা কিছু দেখছি –এতেই অবতার আছেন, দেবতারা আছেন, দৈত্য-দানবরা আছে, এতেই মারামারি আছে, এতেই খুনোখুনি আছে। একটা সময় আমরা বলি, আমার এসব কোন কিছুই লাগবে না। যখন বলছি আমার লাগবে না, সেটাও একটা প্রতিবিম্ব। সেখানে ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে ওই যে আয়না রূপী মন, ওটাকে ভেঙে দাও। তখন, আমি যেমন ছিলাম তেমন আছি, আমার আর প্রতিবিম্ব দেখার দরকার নেই। আত্মজ্ঞান মানে এই চৈতন্যকে জানা। চৈতন্যকে একমাত্র চৈতন্যই জানতে পারে, সবাইকে সেই চৈতন্য হয়েই চৈতন্যকে জানতে হবে। সেইজন্য জানা ব্যাপারটা আমরা যে অর্থে মনে করি, সেই অর্থে এখানে জানা হয় না। এই চৈতন্য এই জগতে সব সময় সর্বদা সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছে, ঠাকুর এখানে এটার বর্ণনা করছেন। আবার বলছি, এই আলোচনাটা খুব সূক্ষ্ম; যাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, যাঁরা বুঝতে পারবেন না, তাঁরা পারবেন না।

ঠাকুরের সামনে একটা উদাহরণ ভেসে উঠেছিল, কামারপুকুরের একটি পুকুর, একজন লোক পানা সরিয়ে জলপান করল। জলটি স্ফটিকের মতো। যে জল খেতে চাইছে সে পানাটুকু সরিয়ে দিচ্ছে। জল খাওয়া হয়ে গেল, আবার পানা এসে ঢেকে দিচ্ছে। এই পানাটাই জগৎ, এই পানাটাই মায়া, এই পানাটাই পুরো মন, এই পানাটাই কাল বা সময়। যে শব্দই নিয়ে থাকি; কার্য, কারণ, কাল, মন, যাইই বলা যাক, এটাই পানা। এই পানাকে সরিয়ে সচ্চিদানন্দের দর্শন করা। পানা আছে কারণ পুকুর আছে, পুকুরে জল আছে বলে। পুকুর আছে কিন্তু জল যদি না থাকে পানা থাকবে না। পানা আছে বলে জলকে দেখা যায় না। জলকে দেখতে গেলে পানাকে সরাতে হবে। খুব মজার জিনিস। আমরা যে কি মজার খেলা খেলছি, কি মজার জিনিস করছি, বুঝতেও পারি না। এই সব কিছু তো আমারই সৃষ্টি। যে অবতারকে আমি দেখছি, সেটাও আমারই সৃষ্টি, অন্য কার। শুন, তোমায় অতি গুহ্য কথা বলছি, মাস্টারমশাইকে ঠাকুর বলছেন। আপনাদের আমি সত্যি কথা বলছি, এই যে কয়েকটা গুহ্য জিনিস এখানে ঠাকুর বলছেন, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, মাস্টারমশাই এই কথাগুলো যদি না লিখতেন ভাল হত। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় যদি না লিখতেন, তাহলে ধর্ম জিনিসটা কি আমরা জানতে পারতাম না।

ঠাকুরই বলছেন, **শুন, তোমায় অতি গুহ্য কথা বলছি**, Top Secret। দক্ষিণেশ্বরে উত্তর দিকে যেতে প্রথমে বকুলতালা, পরে পঞ্চবটী, তারপর ঝাউতলা। তখনকার দিনে আজকালকার মত ল্যাট্রিন, বাথরুম ছিল না; স্বাভাবিক ভাবে লোকেরা জঙ্গলের দিকে বা মাঠেঘাটে গিয়ে প্রাকৃতিক ক্রিয়া-কর্মাদি সারতেন। দক্ষিণেশ্বরেও সবাই ঝাউতলার দিকে যেতেন। সেটাই ঠাকুর এখানে বলছেন – **ঝাউতলার দিকে বাহ্যে করতে করতে দেখলাম।** কি অবস্থা! যে জিনিসটা আমরা ধ্যানের সময় একটুও পারি না, ঠাকুর বাহ্য করতে গিয়ে, প্রস্রাব করতে করতে এই জিনিসগুলো দর্শন করছেন। কিছু দিন আগে ইউটিউবে একজন ঠাকুরের নামে কমেন্ট করে বলছে –হাত উঁচু করে যিনি সমাধিস্থ হন, তিনি মুর্খ আর তাঁর শিষ্যরাও মুর্খ। কঠোপনিষদে পুনর্জন্ম নিয়ে আমার ব্যাখ্যা নিয়ে এই কমেন্ট করছে। আমি ডিলিট করে দিলাম। ভাবলাম এই লোকটার কি হবে! ঠাকুরের সমাধি অবস্থাকে এই ভাবে বর্ণনা করছে? কোন ঠাকুরকে নিয়ে বলছেন? বাহ্য, প্রস্রাব করতে গিয়েও যিনি সমাধিতে চলে যাচ্ছেন।

চোর কুঠরির দরজার মত একটা সামনে, কুঠরির ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। আগেকার দিনে যে বাড়িগুলো হত, তাতে অনেক সময় কোন ঘরে খুব কায়দা করে আর-একটা দরজা লাগানো হত। আর ওটাকে এমন ভাবে ঢাকা দেওয়া থাকত যে, বুঝতে পারা যেতে না যে ওই জায়গাতে আর-একটা ঘর আছে। **আমি নরুন দিয়ে ছেঁদা করতে লাগলাম, কিন্তু পারলুম না। ছেঁদা করি কিন্তু আবার পুরে আসে! তারপর একবার এতখানি ছেঁদা হল**। আমাদের যে মন, এই মনের পিছনে চোর কুঠরি আছে, পুরোটা ঢাকা। চোর কুঠরির মধ্যে কি আছে জানার উপায় নাই; দেখার জন্য আপনাকে ছেঁদা করতে হবে। মনকে মন দিয়েই ছেঁদা করতে হবে। কিন্তু অসম্ভব, তার মানে, এই চৈতন্যকে জানা অসম্ভব। ঠাকুর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে গিয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এইবার আবার কথা কহিতেছেন, 'এ-সব বড় উঁচু কথা –এই দেখ আমার মুখ কে যেন চেপে চেপে ধরছে'। আমাদের পুরাণাদিতে অনেক কিছুর বর্ণনা আছে, কিন্তু তার মধ্যে বোঝা যায় না কোনটা তথ্য, কোনটা তত্ত্ব আর কোনটা কাব্যিক বর্ণনা। ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়া, জীব এগুলো বুঝতে তাই একটু কঠিন হয়ে যায়। কথামৃত পড়া না থাকলে সব কিছু বোঝাও যায় না। এত উঁচু কথা যে, বাহ্য করতে গিয়ে ঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছেন, অথচ মাস্টারমশাইকেও বলা যাচ্ছে না। এটাই হল ধর্মের গুহ্য ভাব। যত বড় অবতারই হন, তিনি যীশু হন, বুদ্ধই হন; কারুর পক্ষে সম্ভব না যে, মানুষকে ঈশ্বরতত্ত্ব পরিষ্কার করে বলে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। বলতে গেলে মুখ বন্ধ হয়ে আসবে। কারণ কুণ্ডলিনী কণ্ঠদেশে উঠে আসা পর্যন্ত সব কিছু বর্ণনা করা যায়, কিন্তু তার উপরে যেমনি যাবে স্বাভবিক ভাবেই বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাবে। অনাহত ধ্বণি সম্বন্ধে একটু আগে যেটা বলা হল, অনাহত ধ্বণি কণ্ঠদেশ পর্যন্ত, কোন কোন যোগী তারপর তাঁর কৃপায় ওটাকে ছেদ করে বেরিয়ে যান। কারণ কুণ্ডলিনী মস্তক পর্যন্ত এলে কি হয় বলা যায় না। চৈতন্যের কথা হল এই উপরের কথা। এটা হল একদিকের কথা। একটু আগে আমরা জগদীশচন্দ্র বোসের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমরা চেতনার কথা বললাম। এবার ঠাকুর সেই চেতনার কথা বলছেন।

যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম। –কুকুর-কুক্কুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম। এটা অত্যন্ত নোংরা গালাগাল। কুক্কুরীর যোনিতে যে মৈথুন হচ্ছে, সেই জায়গাতে ঠাকুর দেখছেন সচ্চিদানন্দের বাস, চৈতন্য কিলবিল করছে। আর সেইজন্যই কুকুরের বাচ্চা হয়, তা নাহলে কুক্কুরীগুলো বাচ্চা দিতে পারত না। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে চৈতন্যের বাস, তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। জগতে যা কিছু চৈতন্যের ভাব আছে, মূলে তিনিই আছেন। যার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কোন দিন এই জায়গাতে পৌঁছাতে পারবে না। রজার পেনরোজ থেকে শুরু করে বর্তমান কালের যাঁরা আছেন, আর বৌদ্ধরা চৈতন্যকে নিয়ে, চেতনাকে নিয়ে কি সব উল্টোপাল্টা বলে বেড়াচ্ছে। কথামৃত পড়ুন একবারে চৈতন্য জিনিসটাকে বুঝে নিতে পারবেন। বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আমার যদি যোগাযোগ থাকত, আমি বলে দিতাম, কথামৃত পড়ুন, একবারে বুঝতে পারবেন চৈতন্য জিনিসটা কি। ওনাদের কাছে চেতনা হল ইমোশানস্‌, ইভলিউসান আরও কি কি। চেতনা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার, তোমরা ভাই বুঝতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধি জড়, মন জড়, চিন্তা-ভাবনা জড়, চৈতন্য বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক-একবার দেখি, ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে। মাছ জলে খেলা করছে, ঠাকুর দেখছেন চৈতন্য কিলবিল করছে। এটাকেই আমাদের শাস্ত্রকাররা বলছেন, চৈতন্য ওতপ্রোত ভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঢেকে আছে। আবার চৈতন্য ঢুকে আছে এই প্রাণী সকলের মধ্যে; ঢেকেও রেখেছে আবার ঢুকেও আছে। যেমন বায়ু, বায়ু আমাদের ঢেকে রেখেছে আবার ভিতরে ঢুকে আছে। কি রকম? সেই কথাই ঠাকুর এবার বলবেন।

গাড়ি শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট উপস্থিত হইল। ঠাকুর আবার বলিতেছেনঃ

এক-একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে। –সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে। ফিজিক্সে একটা পার্টিকেল আছে যার নাম নিউট্রিনোস, আপনারা জেনে অবাক হবেন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে আমাদের শরীরের মাঝখান দিয়ে কোটি কোটি বা তার থেকেও বেশি হতে পারে, নিউট্রোন বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, মানে সব সময় নিউট্রোনের বৃষ্টি হচ্ছে। পুরো পৃথিবীকে ছেঁদা করে কোটি কোটি, শত কোটি নিউট্রোন সেকেণ্ডের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এটাকে জানার কোন পথ নেই। ঠিক তেমনি চৈতন্য আমাদের ঘিরে রেখেছে, আমাদের বর্ষণ করছে, কিন্তু আমরা জানতে পারছি না। মনের সাহায্য নিয়ে আমাদের মনকে যদি সূক্ষ্ম করা হয়, মনকে যদি লয় করা যায়, তখন দেখা যায় আমিই সেই চৈতন্য। এই চৈতন্যই ওতপ্রোত ভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ছেয়ে রেখেছে। এই যে ঠাকুর বলছেন, কুকুর-কুক্কুরীর মৈথুনের সময় যোনিতে বাস, ছোট ছোট মাছের মধ্যে চৈতন্য কিলবিল করা, এটা পুরোপুরি সত্য আর এটাই চৈতন্য আলো, এটাই জ্যোতি। এরই বর্ণনা বেদ করছেন, উপনিষদ করছেন। ঠাকুর এরপর মজার কথা বলছেন।

কিন্তু এত তো দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।

গাড়ি শোভাবাজার এসেছে, তার মধ্যে ঠাকুর কথা বলে যাচ্ছেন, কি আশ্চর্য! আমরা যখন রাস্তাঘাটে থাকি, বেশির ভাগ সময় আমরা আলতুফালতু কথা বলি। কিন্তু যাঁরা প্রফেসানাল হন, যে কোন জিনিসে প্রফেসানাল, আর্টিস্ট হতে পারেন, সাহিত্যিক হতে পারেন, এনারা নিজের বিষয়ের ভিতরে এমন ডুবে থাকেন যে ওর মধ্যেই হারিয়ে যান। আশেপাশে কি আছে, কি হচ্ছে, কোন কিছুর দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। ঠাকুরও ওই অবস্থায় বলে যাচ্ছেন –এক-একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে –সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে, ওতপ্রোত ভাবে। মাটি আর জল মিলিয়ে দিলে মাটি কাদা হয়ে যায়, আর তাতে জল ওতপ্রোত ভাবে মিশে থাকে।

তিনটে সত্তা; প্রথম সত্তা পদার্থের, দ্বিতীয় সত্তা মনের আর তৃতীয় সত্তা হল চৈতন্যের। এই তিনটি সত্তা ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। এই যে কলম, দেখে বলে দিচ্ছি এটা কলম। এই কলমেরও তিনটি সত্তা রয়েছে। কলমের পিছনে একটা মন আছে, কিন্তু সেই মন কাজ করবে না; কারণ কলমের মনের অবস্থান, মনের তীক্ষ্ণতা খুব অল্প। এই মনের পিছনে রয়েছে চৈতন্য সত্তা। কলমে যে চৈতন্য বিদ্যমান, তার প্রকাশও অতি অল্প; ঠাকুর বলছেন শক্তি বিশেষ। কিন্তু আছে এই তিনটেই –পদার্থ, মন ও চৈতন্য সত্তা। সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন আর সেখান থেকে বেদান্ত বলে –পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি হল জড়; পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে আসে তখন প্রকৃতি পুরুষের সত্তা পেয়ে যায়; যে জড় তাকে চৈতন্যের মত দেখায়।

প্রকৃতির তিনটি গুণ –সত্ত্ব, রজো ও তমো। এই তিনটি গুণ এখন দেখায় সমষ্টি মন রূপে। এই সমষ্টি মন যেটা দেখাচ্ছে, ওর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন সেই চৈতন্য। কিন্তু চৈতন্য তার থেকে অনেক বেশি। এই যে বিশ্বমন, এটাকে মহৎ হলা হয়। সেখান থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে পঞ্চভূত বেরিয়ে আসে। তার মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, কম হোক বা বেশি হোক, তার মধ্যে মহৎ বা সমষ্টি মন বা বিশ্বমন থাকবেই থাকবে। এর অর্থ কিন্তু খুব গভীর। এই কলমের সামনে কেউ বসে আছে, তার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে সে এই কলমকে দিয়ে কথা বলাবে। কারণ কলমের ভিতরে মন আছে। নিজের মনটাকে এর মধ্যে দিয়ে কলমকে দিয়ে কথা বলাবে, আর সত্যিই কলম কথা বলবে। আমাদের কাছে গাঁজাখুড়ি গালগপ্প মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্য। শুধু তাই না, যিনি কলমের সামনে বসে আছেন, তিনি যদি চান তাহলে কলমকে পুরো চৈতন্য বানিয়ে দিতে পারেন।

ঠাকুরের এ-রকম দুটি ঘটনা আমরা এখানে বলতে পারি। ঠাকুরের যখন অনেক কিছুর দর্শন হচ্ছে, ঠাকুর বলছেন, এই দর্শনগুলো যদি সত্য হয় তাহলে এই পাথর তিনবার লাফাবে। আর সত্যিই

পাথর তিনবার লাফালো। পাথর কি করে জানল যে, আমাকে তিনবার লাফাতে হবে? তার মানে, পাথরের মধ্যে মন রয়েছে। ঠাকুর যেমনি ইচ্ছা করলেন, ঠাকুরের যে মনের শক্তি পাথরের মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য শক্তিমান করে দিল, কিছুক্ষণের জন্য। তাই না, শক্তি তার এত বেশি যে সে লাফাচ্ছে, মনের শক্তিই লাফায়।

ঠাকুর পূজা করার সময় দেখছেন কোশাকুশি সব চৈতন্য; কত জায়গায় কত ভাবে এর বর্ণনা আমরা পাই। স্বামীজীও সব কিছুতে চৈতন্য দেখেছিলেন। ওই অবস্থায় পৌঁছে সবাই এটাই দেখেন। তাহলে কলমটাকেও কি চৈতন্য দেখবেন? কলমকেও দেখবেন। কলমের পিছনে যে মন আছে, সেই মনকেও দেখবেন। আর মনের পিছনে যে চৈতন্য আছে, সেটাও দেখবেন। এর সবচেয়ে দুটি ভাল উদাহরণ আছে। ঠাকুর একদিকে কোশাকুশিকে চৈতন্য দেখছেন, আবার কোশাকুশিও দেখেছেন। ঠাকুর যেদিন নরেনকে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন নরেন সব চৈতন্য দেখছেন। খেতে বসেছেন, ভাত, ডাল, থালা-বাটি, যিনি পরিবেশন করছেন, সব কিছুকে চৈতন্য দেখছেন, স্বামীজী খেতে পারছেন না। স্বামীজীর বাড়ির কাছে হেদুয়া পার্ক। হেদুয়া পার্কে গিয়র সেখানে লোহার রেলিংগুলোকে দেখছেন চৈতন্য। স্বামীজী রেলিংএ মাথা দিয়ে ঠুকছেন, লোহার আঘাতে মাথা ফুলে গেল।

পদার্থের সত্তা, মনের সত্তা আর চৈতন্যের সত্তা, পরিষ্কার এই তিনটে সত্তা থাকে। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের ক্ষমতা এতটাই কম যে, অন্য জিনিসের চৈতন্যকে দেখা দূরের কথা, নিজেকেই চৈতন্য বলে মনে করতে পারি না। পুরো পাশ্চাত্য জগৎ মনের কার্যকে নিয়েই চৈতন্য চৈতন্য করে যাচ্ছে। ঠাকুর, স্বামীজীর এসব ঘটনা শুনলে মনে হবে গাঁজাখুড়ি গল্প, সব আলতুফালতু কথা। কিন্তু এই কথাগুলো এমন মহাজনের মুখ থেকে এসেছে, যাঁকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সন্দেহ সবাইকে করা হয়, সবারই নিন্দা হয়। এই জগতে কেউ এমন আছে যাঁর নামে কোন নিন্দা হয় না? নিন্দা সবারই হয়, সেইজন্য নিন্দার কোন দাম নেই। আপনার যেমনটা চেতনা, ওই চেতনা দিয়ে বুঝে নেবেন এনার যে নিন্দা হয়েছে, এনার যে স্তুতি হয়েছে; কোনটা আমার নেওয়ার মত।

জীবনে যদি কিছু না করতে পারেন, ঠাকুরের কাছে নিয়মিত এই প্রার্থনাটুকু করবেন –হে ঠাকুর, মৃত্যুর পর আপনি যেখানেই আমাকে নিয়ে যান, কিন্তু মৃত্যুর আগে এইটা একটু দেখিয়ে দিন, এই কলমটাও চৈতন্য, এই মাইক্রোফোনটাও চৈতন্য; কিছু না করুন এই এতটুকু শুধু দেখিয়ে দিন। ঠাকুরের কৃপায় যদি দেখে নিতে পারেন, তাহলে জানবেন, আপনার সাময়িক অদ্বৈতজ্ঞান হয়ে গেছে। সাময়িক হলেও, এটা ঠিক পুরো অদ্বৈতজ্ঞান হবে না, পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানের জন্য আর-একটু গভীরে যেতে হবে। তখন আর বস্তুটাও থাকবে না। নিয়মিত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবেন, ঠাকুর, শুনেছি মৃত্যুর পর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে, বিড়াল যেমন নিজের মিউ মিউ করা বাচ্চাকে নিয়ে যায়; কিন্তু নিয়ে যাওয়ার আগে আমার এতটুকু ইচ্ছে, একটু চৈতন্য জিনিসটা দেখিয়ে দিন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যে জরে রয়েছে, চৈতন্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোত ভাবে আবৃত, একবার যেন এই জিনিসটা দেখে নিতে পারি।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এই প্রার্থনা করেন? হ্যাঁ, আমি রোজ এই প্রার্থনা করি –হে ঠাকুর, এই জন্মে হোক, পরের জন্মে হোক কি দু জন্ম পরে হোক মুক্তি তো আমার হবেই হবে, মুক্তি গ্যারান্টি। এবার একটু তোমার ঐশ্বর্যটাও দেখে নিতে চাই। আমার ব্যক্তিগত কথা বলছি, সবার জন্য বলছি না –শুধু বাবুকে পাওয়াতে আমার সন্তুষ্টি নেই, আগ্রহও নেই; আমার ঐশ্বর্য লাগবে। প্রভু, তোমার স্থূল জগতের ঐশ্বর্য তো দেখা হয়ে গেল; কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ সবই দেখা হয়ে গেল, এখানে আর তো কিছু দেখার নেই। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা দেশ দেখার আমার কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ; আর কারণ জগতের যে প্রকাশ এই স্থূল জগতে, এটাকে দেখার খুব ইচ্ছা। দেবতারা কেমন হন, যক্ষরা কেমন হন, সিদ্ধরা কেমন হন, অপ্সরারা কেমন হন, দেখার তো ইচ্ছা আছে। আমি গন্তব্যে বিশ্বাস করি না, আমি যাত্রাতে বিশ্বাস করি। হিমালয় গিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ওখানে

পৌঁছাতে হবে, ওখানে একটু থেকে দৌড়ে দৌড়ে আর-এক জায়গায় যাওয়া, সেখানে গিয়ে ছোলা-বাটোরা খেয়ে দৌড়ে দৌড়ে অন্য একটা গন্তব্যে যাওয়া, এগুলোর জন্য আমি কোথাও যাই না।

আমি যখনই যেখানে যাই সেখানকার প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমি উপভোগ করি, আমার স্বভাবেই এটা আছে। স্টেশনে লোকেদের সাথে বন্ধুত্ব, ট্রেনের সহযাত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব, টিটি, কুলি সবার সাথে বন্ধুত্ব করে নিই। এটা ঠাকুরের সাম্রাজ্য, এর প্রত্যেকটা ঐশ্বর্য আমাকে দেখতে হবে। এই যে শাস্ত্রে বলছে, কোটি কোটি জন্ম ধরে এখানে ঘুরপাক খাচ্ছি, অনেক কিছু দেখেছি; সে তো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান হচ্ছিল। নাকের দড়িটা খুলে দিয়ে সাক্ষী হয়ে এবার দেখতে চাইছি। এখানে ঠাকুর যতগুলো কথা বলেছেন, মাঝে মাঝে এগুলো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবেন –ঠাকুর খুব ইচ্ছে দেখার, এটা একটু দেখাও, ওটাও একটু দেখাও। আর, হে ঠাকুর আমি দীন-হীন কাঙাল, আমাকে কৃপা কর, এই ধরণের প্রার্থনা করলে দীন-হীন কাঙাল হয়েই থেকে যেতে হবে। ওদিকে কক্ষণ পা ফেলছি না। আমি তো রাজার ব্যাটা, আমি তোমার সন্তান, আমার হক্ আছে, আমি এটা দেখব। আমার বাপের জমিদারীতে আমার অধিকার আছে দেখার। এই ভাব যদি ভিতরে না আনতে পারেন তাহলে কথামৃত পড়া ছেড়ে দিন। এগুলো দেখার ইচ্ছা ভিতরে যদি না জাগে, এগুলোকে দেখার চেষ্টা যদি না করেন, তাহলে কথামৃত পড়ে লাভ কি!

ঠাকুরকে জগতের মা এই সব কিছু দেখিয়ে দিলেন, সেটাই এবার ঠাকুর বলছেন –**কিন্তু এত তো দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না**। কথাটা এত সুন্দর কথা না, কি আর বলব। ঠাকুর ঠিক একজন ভক্তের মত বলছেন। এতো আধ্যাত্মিক অনুভূতি পাওয়া কোন সাধকের পক্ষে সম্ভবই না। অসম্ভব। কিন্তু কথাগুলো বলছেন একজন সাধকের মত। আমার আপনার জন্য চিন্তা নেই, অভিমান না হয় একটু হল, ভালই তো। আপনার যদি এই রকম দর্শন হয়ে যায়, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রথমেই আমাকে বলবেন, ‘এই যে মহারাজ, খুব তো উপদেশ দিচ্ছিলেন, আপনার কি এগুলো দর্শন হয়েছে? এই দেখুন আমার হয়েছে’। ‘ভালই তো, যদি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে। তার সঙ্গে ঠাকুর কিন্তু সেই ক্ষমতাও দেবেন যাতে এই দর্শনগুলো চেপে রাখতে পারেন’।

মণি (সহাস্যে) –আপনার আবার অভিমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ –মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়। অভিমান হয় অল্প উপলব্ধিতে। একজন খুব বড়লোক বলছেন, ‘কবে তুমি বুঝবে যে তুমি একজন সত্যিকারের ধনী? যখন তোমার টাকার হিসাব থাকবে না’। আপনার কত উপলব্ধি হয়েছে, এটার হিসাব যদি আপনার থাকে, তখন দেখবেন আপনার অভিমান চলে গেছে। এখানে অভিমান বলছেন, এই অভিমান অহঙ্কারের মধ্যে আসে। আমার প্রথম বই ‘টিয়া’ যখন বেরিয়েছিল, আমার বই বেরিয়েছে, আমার বই বেরিয়েছে বলে বলে আমি তো সবাইকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিলাম। তারপর যখন ডক্টঃ এ.পি.জে আবদুল কালাম তিনি কোথায় টিয়া পড়লেন, পড়ার পর যোগাযোগ করলেন, ফোন করলেন। আমার উত্তেজনার আর শেষ নেই। এখন অনেকগুলো বই লেখা হয়ে গেছে, প্রায় আট-দশটা বই লেখা হয়ে গেছে। এখন আর ওই জিনিসটা নেই। একটা ছোট্ট ইনফরমেশান দিয়ে দিলাম, বই বেরিয়েছে; এর বেশি কিছু না। অহঙ্কার হয় অল্প কিছুকে নিয়ে। যদি কারুর মধ্যে অহঙ্কার দেখেন, বুঝবেন এর উপলব্ধি নেই। সেইজন্য আমাদের খুব নামকরা সংস্কৃত শ্লোকে এই জিনিসটাকেই তুলে ধরা হয়েছে –*বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্*। যার অল্প একটু বিদ্যা, তার অহঙ্কার হয়; কিন্তু যে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, তার অহঙ্কার হয় না। সে এমন জায়গায় চলে যায়, কাউন্টিং ছেড়ে দিয়েছে। যার সত্যিকারের ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা দেখাতে যায় না। যাদের ক্ষমতা নেই, তারাই ক্ষমতা দেখায়। পুলিশের উচ্চপদের যাঁরা, ডিজি, আইজি, এনারা কক্ষণ ক্ষমতা দেখাবেন না। কিন্তু একজন কনস্টেবলের কাছে যান, বাকিটা বুঝে যাবেন।

মণি তখন সক্রেটিসের কথা বলছেন ঠাকুরকে। একবার দৈববাণী হয়েছিল যে, সবার মধ্যে তিনিই জ্ঞানী। সক্রেটিস অবাক হয়ে গেলেন। তারপর নির্জনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বুঝতে পারলেন – আমিই কেবল বুঝেছি যে, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু অন্যান্য সকল লোকে বলে, 'আমার বেশ জ্ঞান হয়েছে'। কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আমি এ-একবার ভাবি যে, আমি কি জানি যে এত লোকে আসে! বৈষ্ণবচরণ খুব পণ্ডিত ছিল। সে বলত, তুমি যে-সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জান? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আসি।

এখানে একটা অতি সাধারণ ব্যাখ্যার দরকার। বৈষ্ণবচরণ একজন বিরাট বড় পণ্ডিত। সব শাস্ত্র তাঁর জানা। ঠাকুর শাস্ত্র কোন দিন পড়েননি, কিছু টুকটাক এদিক ওদিক থেকে শুনেছেন। যেসব সাধুরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তাঁদের মুখে কিছু কথা শুনেছেন; কিন্তু সাক্ষাৎ করেছেন। আগের আগের ঋষিরা যাঁরা সাক্ষাৎ করলেন, সেটাই বেদ হল, সেটাই উপনিষদ হল। সেই বেদ, উপনিষদকে আধার করে, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আবির্ভাব হল। ঠাকুর সেটাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ছোটবেলা বইতে দিল্লি, বোম্বাইর কোন কথা পড়েছি বা শুনেছি। তারপর এমন কোন লোকের সাথে দেখা হয়ে গেলে যিনি ওখানে থাকেন, তাঁকে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকি, আচ্ছা ওখানে এই রকম আছে, ওখানে সেই রকম কিছু আছে তাই না? তারপর যখন প্রথম সেখানে গেলাম, তখন হাঁ করে সব দেখতে থাকি; তাই তো এটারই কথা পড়েছিলাম।

এই জানা জিনিসটা তিনটে স্তরে চলে –এক বই পড়ে, দুই যিনি দেখেছেন তাঁর কথা সরাসরি শুনে; তিন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। বৈষ্ণবচরণ ছিলেন একজন সত্যিকারের ঠাকুরের গুণগ্রাহী, কারণ তিনি শাস্ত্র জানতেন। অন্যদিকে হলধারীও ছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তিনি শাস্ত্র পাঠ করতেন, ঠাকুর শুনতেন, শোনার পর বলতেন, আমি ঠিক এই রকমই দেখেছি। হলধারী রেগে আগুন, 'ওরে রামকৃষ্ণ, এগুলো শাস্ত্রকথা তুই তো আবার বুঝবিও না, তুই কিনা বলছিস এগুলো প্রত্যক্ষ করেছিস, অসহ্য'! বৈষ্ণবচরণের কেমন দেখুন, এই যে কিছুক্ষণ আগে কথা হল, এক সাধারণ উপলব্ধি কি করে মহৎ উপলব্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। বৈষ্ণবচরণের পাণ্ডিত্য এমন জায়গায় চলে গেছে, যখন দেখছেন এই রকম লোক এত উচ্চমানের কথা বলছে। কি বলছেন? সাক্ষাৎ শাস্ত্র, বেদে যত ঋষিরা ছিলেন, সমস্ত ঋষিদের মিলিয়ে ঠাকুর একা একজন। যার জন্য সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়া ফরাসীর বিখ্যাত সাহিত্যিক রোমা রোঁলা যখন ঠাকুর, স্বামীজীর কথা জানলেন, চমকে উঠেছিলেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর উপর খুব সুন্দর বই লিখলেন। যদি কখন সুযোগ পান তাহলে রোমা রোঁলার লেখা ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনী পড়বেন। সেখানে তিনি বলছেন, ভারতের যে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস, সেই ইতিহাস ঠাকুরের জীবনে মূর্তরূপ ধারণ করেছে।

একটু যদি ঠাকুরের পড়াশোনা থাকত, তাহলে ঠাকুরের উপলব্ধি, দর্শন এগুলো যেন সাধারণ হয়ে যেত। কিছু পড়া নেই বলে একেবারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। এই যে বৈষ্ণবচরণ বলছেন, তোমার মুখে সেইগুলো শুনতে আসি, এখানে মনে হতে পারে হয় বৈষ্ণবচরণ কথাগুলো বুঝেছেন, নয়তো বুঝছেন না, এগুলো বলা খুব মুশকিল। কারণ সামনের লোকটি যে একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ, এইটা সবাই বুঝতে পারেন না। তিনি যাঁকে বুঝিয়ে দেবেন তিনিই বুঝতে পারবেন। এখানে শুধু ভাল লাগার ব্যাপারটা নেই, এটা তারও বেশি, এই জিনিসটা বৈষ্ণবচরণকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্র কিন্তু সবাইকে ছোঁয় না। যে কোন শাস্ত্র, আমরা কথামৃত আলোচনা করছি, কথামৃত বছরের পর বছর আপনি পড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাই বলে কথামৃত আপনাকে স্পর্শ করবে, তা নয়। শাস্ত্রের যখন কৃপা হয়, তখন তিনি স্পর্শ করেন। যখন স্পর্শ করেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন, ও এই ব্যাপার, শাস্ত্র কি বলতে চাইছেন সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ঝিনুক সমুদ্রে থাকে, সমুদ্রে জল আছে, বালিও আছে, সমুদ্রে কোটি কোটি ঝিনুক পড়ে আছে। কদাচিৎ কখন কোন ঝিনুকের মধ্যে একটা বালির কণা ঢুকে যায়, সেখান থেকে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার জন্ম হয়। ইদানিং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম ভাবে মুক্তার চাষ করা হচ্ছে, তাতে কোয়ালিটি থাকে না, পরিষ্কার বোঝা যায় কোনটা কৃত্রিম আর কোনটা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী। সেটা অন্য ব্যাপার। কোটি কোটি ঝিনুক কিন্তু একটা দুটোর মধ্যেই কেন মুক্তার দেখা পাওয়া যায়? সব ঝিনুকে মুক্তা দেখা যাবে না; বোঝানর জন্য এটা উদাহরণ দেওয়া হল।

মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হয়। আমরা সারা জীবন প্রচুর শাস্ত্র ঘাটতে পারি, হয়ত একটি মাত্র শাস্ত্রকে নিয়েই আছি, কিন্তু তাতেও তিনি কৃপা করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। বৈষ্ণবচরণের প্রতি শাস্ত্রের কৃপা বর্ষিত হয়েছিল। ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে আলোচনা করার কোন অধিকার ও পাত্রতা আমার নেই, কিন্তু লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে আমরা যতটুকু বুঝেছি তাতে বৈষ্ণবচরণ আর হলধারীর তফাৎ বোঝা যাচ্ছে; পাণ্ডিত্যের তফাৎ না, স্পর্শের তফাৎ, শাস্ত্রকৃপার তফাৎ। ঠাকুরও বুঝতে পারছেন, বৈষ্ণবচরণ শাস্ত্রকৃপার স্পর্শ পেয়েছেন। ঠাকুরের মুখ দিয়ে শাস্ত্রের কথাগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করছেন, নিজের প্রত্যক্ষ হওয়ার সম্ভবনা তো খুব কম; কারণ শাস্ত্রের এইসব কথা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না, খুব উঁচু কথা। কিন্তু ঠাকুরের মুখ দিয়ে যখন কথাগুলো শুনছেন, তখন কথাগুলো যেন তাঁকে স্পর্শ করে যাচ্ছে।

মণি –সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে। নবদ্বীপ গোস্বামীও সেদিন পেনেটীতে সেই কথা বলেছিলেন। আপনি বললেন যে, "গীতা গীতা" বলতে বলতে "ত্যাগী ত্যাগী" হয়ে যায়। বস্তুতঃ তাগী হয়, কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী বললেন, 'তাগী' মানেও যা 'ত্যাগী' মানেও তা, তগ্‌ ধাতু একটা আছে তাই থেকে 'তাগী' হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আমার সঙ্গে কি আর কারু মেল? কোন পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?

ঠাকুরের এই ছোট ছোট কথাগুলো এত সুন্দর, এত কিউট, একেবারে শিশুর মত। ঠাকুর অন্যত্র বলবেন, ঈশ্বরদর্শনের অনেকগুল লক্ষণ আছে, তার মধ্যে একটা লক্ষণ হল বালকবৎ। অহঙ্কারী বলে, I am the best, ঠাকুর একজন শিশুর মত বলছেন, Am I the best? যিনি তাঁর পাশে আছেন, তাঁকে তখন বলতে হবে, yes, yes, you are the best। কিন্তু এখানে কোন অহঙ্কার নেই। একটা কৌতুহল, ধর্ম জগতে এমন কিছু কি আছে যেটা আমার জানা নেই? যদি বুঝে যান ওনার জানা নেই, সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে জানার জন্য নেমে পড়বেন; একটা কৌতুহল। ধর্ম জগতের যাবতীয় যা কিছু আছে জানতে চাইছেন। আপনারা যাঁরা বিদ্যার জগতে আছেন, বিশেষ করে যাঁরা ইংল্যাণ্ড, আমেরিকাতে আছেন, আপনারা হয়ত জানবেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক, যাঁরা একটা বিশেষ ফিল্ডে চলে যান, তাঁরা এই রকম হয়ে যান। ওই ফিল্ডে যা কিছু আছে, তার সব কিছুকে ওনারা জানতে থাকেন, দেখতে থাকেন।

মণি –আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। মাস্টারমশাই খুব সততার সাথে এই কথা বলছেন, অন্যদের মত তিনি বলছেন না যে, আপনিই ভগবান। তারপর মাস্টারমশাই খুব প্রচলিত কথা বলছেন –**অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন –যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে**। মাস্টারমশাই বলতে চাইছেন, আপনি এদের থেকে পুরো আলাদা। ধর্ম জগতের ব্যাপারে যাদের একটু চেতনা জেগেছে, তারা যদি কিছুক্ষণ ঠাকুরকে নিয়ে থাকে, সে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে, ইনি এক অন্য ধরণের মানুষ। যীশু খ্রীষ্ট সাধনা করার জন্য চলে গেলেন, বছর তিনেক পরে কি তার থেকে একটু বেশি, আমার ঠিক জানা নেই, তিনি ফিরে এসেছেন। গ্রামের বাইরে কুয়ো থেকে মেয়েরা জল তুলছে, যীশু তাদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন। ওরা হাঁ করে শুনছে। দৌড়ে গিয়ে অন্যদের বলছে, এই কথাগুলো আগেও শুনেছি কিন্তু, but he is like one who has seen it, বাইবেলের একটা খুব সুন্দর কথা। জুহুদিদের মধ্যে কিছু প্রফেট ছিলেন, প্রফেট মানে যাঁরা মানুষের মধ্যে ধর্মের শিক্ষা

দিতেন। আমাদের এখানে যেমন অনেক সাধুরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ঈশ্বরীয় কথা লোকেদের মধ্যে উপদেশ আকারে বলতেন। সাধুরা যেখানেই যেতেন সেখানে একটু ভিক্ষাও চাইলেন, সাথে একটু ঠাকুরের কথাও বললেন, ভজন শোনালেন, তারপর ভিক্ষা নিয়ে চলে গেলেন। জুহুদিদের মধ্যেও এই ধরণের অনেক প্রফেট ছিলেন, এনারাও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ধর্মকথা বলতেন। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা তাঁদের কথা শুনতেন, কিন্তু আজ তাঁরা এমন একজনের কাছ থেকে ঈশ্বরীয় কথা শুনলেন, সেই অশিক্ষিত লোকেরাও চমকে উঠেছে –এনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইনি সবার থেকে আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে রামলালদিগকে) –ওরে, বলে কিরে! বাচ্চারা মায়ের কাছে, বাবার কাছে প্রশংসা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সবাইকে শোনাতে চাইবে। এই জানো, বাবা আমাকে কি বলেছে, মা আমাকে কি বলেছে?

ঠাকুরের হাসি আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন, মাইরি বলছি, আমার একটুও অভিমান হয় না। ঠাকুর এখানে একেবারে বালকবৎ। আগেও বলেছি, আবারও বলছি –এগুলো ধ্যানের জন্য খুব উপযোগী; বিশেষ করে যাঁরা বেশিক্ষণ ধ্যান করেন। যাঁরা পনের মিনিট কি আধ ঘন্টা জপধ্যান করেন, তাঁদের জন্য না, তাঁদের তো ঠাকুরের রূপধ্যান করতেই পুরো সময়টা চলে যাবে। কিন্তু যাঁরা অনেকক্ষণ ধ্যান করেন, ধ্যান করতে করতে মনকে ছেড়ে দিতে হয়। জপ করার পর মন যখন একটু স্থির হল, তখন ঈশ্বরের যে রূপ, গুরু যে রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন, ওই রূপের ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হয়ে গেল, তখন মনকে ছাড়তে হয়, তখন লীলাচিন্তনে যেতে হয়। এগুলো লীলাচিন্তনের জন্য খুব উপযোগী। লীলাচিন্তনের বৈশিষ্ট্য হল, মন অনেকক্ষণ বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করতে পারে। কারণ আমাদের মন স্বভাবে চঞ্চল, লীলাতে অনেক কিছু হচ্ছে, যেমন এখানে ঠাকুর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন, কিনা তাঁকে বলা হয়েছে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁকে হাতে গড়েছেন, বাকিদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন। এগুলো ধ্যানের জন্য অতি সুন্দর।

মণি –বিদ্যাতে একটা উপকার হয়, এইটি বোধ হয়ে যে, আমি কিছু জানি না, আর আমি কিছুই নই। এটা একটা খুব বিরাট কথা। যত আপনি বিদ্যাতে ঢুকবেন, আকাশে যাওয়ার মত যত আপনি যাবেন, এর তো কোন শেষ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঠিক ঠিক! আমি কিছুই নই! –আমি কিছুই নই! এই 'আমি' ঠাকুর না, এটা আমিত্ব। যত বিদ্যাতে ঢুকবেন, তত আপনার আমিত্বের লয় হতে থাকবে। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না, মানতে চাইবেন না –বেশির ভাগ লোক হল অহঙ্কারের একটা পুটলি। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, আপনারা প্রায় সবাই অহঙ্কারের বড় পুটলি। কিন্তু আপনার মধ্যে যখন বিদ্যা এসে যাবে, বিদ্যা যত আপনার বাড়বে আপনার আমিত্ব তত কমবে। একটা স্থূল উপমা নেওয়া যেতে পারে। একটা খালি ঘট বাতাস দিয়ে পূর্ণ থাকে। ওই ঘটে যত আপনি জল ঢালবেন, তত ঘট থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবে। অহঙ্কার সব সময় মুর্খের হয়, বিদ্যার কখন অহঙ্কার হয় না। যার জন্য দেখা যায়, যেখানে বিদ্যার চর্চা কম, সেখানকার লোকেদের তেজ বেশি।

একটা রাজ্যে আমি অনেক বছর ছিলাম, সেখানে দেখেছি ওখানকার লোকেদের কি দুর্হঙ্কার। কিচ্ছু জানে না, ইংরাজী ছেড়ে দিন হিন্দিটাও ঠিক ভাবে বলতে পারে না, কোন বিষয়ের জ্ঞান নেই; কিন্তু সাংঘাতিক অহঙ্কার। কিন্তু এরাই যখন বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করছে, বিদ্যার্জন করছে, তখন পুরো অন্য রকম; কত নম্র ভদ্র হয়ে যাচ্ছে, কোন অহঙ্কার নেই। কলাই ডালকে জিলিপি করার সময় তেলে ভাজা হয়, ভাজার পর খুব কড়া হয়ে যায়। তারপর সেই ভাজাকে চিনির রসে ফেলে দেওয়া হয়, তারপর সেটা নরম হতে শুরু হয়, এবং শেষে মধুর মত মিষ্টত্ব পেয়ে যায়। রজোগুণ দিয়ে যখন ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় এবং তমোগুণের রস যখন শুকিয়ে গিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেল, এবার বিদ্যা, যেটা সত্ত্বগুণে

আধারিত, তাতে যখন ডোবান হয়, তখন সে রস টানতে শুরু করে; এবার সে ধীরে ধীরে নরম হতে শুরু করে। বিদ্যা যত বাড়বে তত নরম হতে থাকবে। আমাদের কাছে যাঁরা আসেন, দু মিনিট কথা বললেই বোঝা যায় লোকটি হাভাতে, না বিদ্যা আছে। হাভাতে যারা তার বেশ হম্বিতম্বি করে, দেখাবে সে একটা কিছু। কিন্তু যাদের সত্যিকারের বিদ্যা আছে, তারা স্বভাবেই অনেক নরম।

ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞেস করছেন –**আচ্ছা, তোমার ইংরাজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?** ঠাকুর জ্যোতিষ বলতে হয়ত এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নিয়ে বলতে চাইছেন। মাস্টারমশাই ইউরেনাস, নেপচুন আদি কয়েকটি গ্রহের নূতন আবিষ্কার নিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। আবার গ্রহণ গণনা কিভাবে করা হয়, তাই নিয়ে বলছেন। ততক্ষণে ঠাকুরের মন ওখান থেকে সরে গেছে। খুব সামান্য কটি শব্দে বলে দিলেন –**তা হয় বটে**। ঠাকুর অধরের বাড়ি যাচ্ছেন, গাড়ি অধরের বাড়ির কাছে চলে এসেছে, হঠাৎ ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন –

"সত্যতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বরলাভ হবে"। ঠাকুর অনেকবার এই কথা বলেছেন, কখন আবার বলছেন –সত্যই কলিযুগের তপস্যা। আমাদের ভাগবত গ্রন্থাদিতে এই জিনিসটাই ঘুরে-ফিরে আসে, বেদে অনেকবার এসেছে, উপনিষদেও অনেকবার এসেছে –*সত্যমেব জয়তে নানৃতং*। যোগশাস্ত্রেও যখন যম, নিয়ম আলোচনা করা হয়, সেখানে অহিংসা ও সত্য এই দুটোর কথা বলা হয়। কেউ সত্যকে প্রাধান্য দেন, কেউ অহিংসাকে প্রাধান্য দেন, দুটো আলাদা কিছু নয়। একটি কথা বারবার বলা হয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, পদার্থ রূপে দেখুন, মন রূপে দেখুন, বস্তু রূপে দেখুন; সমস্ত কিছুর যখন নাশ হয়ে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়, তখনও কিন্তু সৎ বোধ, 'আছে' এই জিনিসটা থেকে যায়। উপনিষদ আদিতে এই জিনিসটাকে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে।

এই কলম আছে, কলমটা যদি ভেঙে যায়, তখন 'আছে' এই অস্তি বোধটা নাশ হয়ে যায়, কলমটা আর নেই এই নাস্তি বোধ এসে যায়। কিন্তু এই নাস্তি বোধ অন্য একটা অস্তি বোধে চলে যায়। কিভাবে? কলমটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কলমের ওই ভাঙা টুকরোগুলো আছে, অস্তি বোধটা তখন টুকরোর দিকে চলে যায়। এই টুকরোগুলিকেও যদি নাশ করে দেওয়া হয়, তখন টুকরোগুলোতে নাস্তি বোধ এসে যায়, কিন্তু নাস্তি বোধের পিছনে এসে যায় এনার্জির অস্তি বোধ, আইনস্টাইন যেটাকে বলছেন $E=MC^2$। সব সময় দেখা যায় এই নাস্তি বোধ সব সময় 'আছে' এই অস্তি বোধে লয় হয়। পদার্থের দিক থেকে 'হ্যাঁ' 'না' এই দুটোর পিছনে রয়েছে একটি সত্তা, চৈতন্য সত্তা; যে চৈতন্য দুটোকেই বোধ করায়। চৈতন্যের এই দুটোকে বোধ হওয়াটা একটু সূক্ষ্ম; উপনিষদের ক্লাশে এই জিনিসটাকে আমরা অনেকবার ব্যাখ্যা করেছি, সুযোগ হলে আবার করব। সমস্ত কিছুর যখন নাশ হয়ে যায়, লয় হয়ে যায়; তখন এই যে সৎ, এর কখন নাশ হয় না। যখন আপনি বলছেন এই জিনিসটা নেই, সেখানেও একটা সৎ বোধ আছে। সৎ মানে যেটা আছে, যার সত্তা আছে। সত্তা বোধ থাকে, ওই সত্তা বোধের উপর বস্তু আছে, বস্তু নেই এই ব্যাপারটা চলে। একটা হল আধার, আধারের উপর দুটো চলে –একটাতে বস্তু আছে বলে বোধ, আর-একটাতে বস্তুটা নেই বলে বোধ। তার নিচে রয়েছে একটা চৈতন্য সত্তা। এখানে আমরা এর বেশি বিস্তারে যাচ্ছি না।

ওই সৎ, যেখানে সব কিছুকে, সমস্ত মিথ্যাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সমস্ত বস্তুকে যখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সমস্ত আবর্জনাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে; তখন একটা জিনিস থেকে যায় –সৎ। সোনার গয়নাকে যখন গলানো হয়, তখন গয়নার সব ডিজাইন, সমস্ত কিছু গলে গেল, কিন্তু থেকে গেল একটা জিনিস –সোনা। খুব মজার ব্যাপার হল, আমাদের শাস্ত্রে খুব নামকরা কথা আছে –*যৎ ব্রহ্মাণ্ডে তৎ পিণ্ডাণ্ডে*। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, ওটাই পিণ্ডাণ্ডে আছে –এটাই স্বামীজী একেবারে প্রত্যক্ষ করেছেন, সাংঘাতিক উপলব্ধি। বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, একটা এ্যটম আর এ্যটমের ভিতরে যা, একটা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেখানে ঢুকে আছে। বৈজ্ঞানিকরা আজ এই কথা বলছেন –কিন্তু আমরা

চিরদিন এই ব্যাপারটা জানি, বিজ্ঞান জানত না। রাদারফোর্ড আদির সময় থেকে যে বিজ্ঞান শুরু হয়, তখন প্রথম যখন এক্সরে আবিষ্কৃত হল, তখন তাঁরা জানলেন, এতদিন আমরা যেটা জেনে এসেছি এ্যাটমকে ভাঙা যায় না, এ্যাটম সলিড কিছু, যেটা দিয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী; এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল জেনে এসেছে। আমাদের এই পিণ্ডাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড যদি বলতেন; ওরা বলত, জগতে যত ডিম আছে সব ডিম তোমার মাথায় যেন ফাটানো হয়। বিজ্ঞান যে কত সীমিত আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

অর্থ হল, বিরাটে যা রয়েছে, সেটা ছোটতেও আছে। জিওমেট্রিতে প্র্যাক্টল বলে একটা থিয়োরী আছে, তাতে বলা হয় যে, একই প্যাটার্ন যখন বানানো হয় তখন সেটাকে বৃহৎ দেখায়। বৃহৎ যখন দেখায় তখন দেখাচ্ছে অন্য রকম, কিন্তু তার ক্ষুদ্রতম যেটা সেটাও একই। যে ধাতু দিয়ে সচ্চিদানন্দের সৎ, সেই ধাতু দিয়ে আমাদের সত্য, দুটো এক। পিণ্ডাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড, মাইক্রো-ম্যাক্রো –মাইক্রো হল আমাদের স্তরে যখন তখন ওটাকে আমরা বলি সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্তরে যখন চলে আমরা তখন ওটাকে বলছি সচ্চিদানন্দ। আপনাকে যদি সচ্চিদানন্দকে জানতে হয়, সচ্চিদানন্দের উপর মায়ার যে আবরণ রয়েছে, ওই মায়ার আবরণকে উড়িয়ে শেষ করে রেখে দিতে হবে। পুরো বেদান্ত সাধনা এটাকেই নিয়ে, পুরো ভক্তি সাধনাও এটাকেই নিয়ে। যে কোন জিনিস যেটা সচ্চিদানন্দকে ঘিরে রেখেছে, ঈশ্বরকে যেটাই ঘিরে রেখেছে সেটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হয়। কিভাবে? জ্ঞানাগ্নি দিয়ে।

ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে বাস্তবিক যেটা সত্য, সেটাকে কল্পনা ঘিরে রাখে, মিথ্যা ঘিরে রাখে, আমাদের লোভ, কামনার জন্য কোন কিছুকে বাড়িয়ে বলা, কম করে বলা; আর তা যে সব সময় মিথ্যা হয় তা না, ওই একটু ছোট বা বড় করে বলার প্রবণতা, এইভাবে জিনিসটাকে সাধারণ করে দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। এটাই পরে গিয়ে হয়ে দাঁড়ালো সত্যের অপলাপ। সত্যটা যেমন, তেমনটা বলা হল না। সত্যের উপর আমরা এই যে উপাধি লাগিয়ে দিচ্ছি, এই ভাবে আমরা সত্যকে ঢেকে দিলাম। একজন একটা ভাল কাজ করলেন, আমি শুনলাম। কিন্তু লোকটাকে আমি পছন্দ করি না, ও করেছে ঠিক আছে, এমন কিছু না। যেহেতু আমি তাকে পছন্দ করিনা, সেইহেতু আমি ভিতরে ভিতরে একটা বিশ্বাস তৈরী করছি যে, কাজটা এমন কিছু নয়। কিন্তু জিনিসটা তা তো না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা হামেশাই দেখে থাকি, ফিলজফি লাইনেও একই জিনিস দেখা যায়, গণিতে দেখা যায়। একজন লোক একটা কিছু করেছেন, কিন্তু তখনকার যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা তাঁকে স্বীকৃতি দিতে চান না, হাল্কা কিছু একটা বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু সময়ের সাথে তাঁকে মেনে নেওয়া হয়।

এই যে সত্যের উপর নানা রকমের আবরণ রয়েছে, তার মানে দুটো সৎ –একটা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সৎ, অন্যটা হল আমাদের স্তরে আমরা যে কথাগুলো বলছি, যে বস্তুগুলো দেখছি, সেটার যে বাস্তবিকতা, যেটা সত্য; দুটোর উপরেই উপাধি চাপিয়ে দিচ্ছি। আপনি যদি মনে করেন সচ্চিদানন্দের উপর মায়ার যে আবরণ আছে, সেটাকে ঠাকুরের কৃপায় কাটিয়ে দেবেন; কিন্তু তার জন্য তো আপনার দরকার প্রশিক্ষণ। সৈন্যবাহিনীর যাঁরা সীমান্তে পাকিস্থান, চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের বছরের পর বছর ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই ট্রেনিংটা শুরু হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ট্রেনিং দিয়ে। তখন কি হয়, সত্যের উপর যে আবরণগুলো রয়েছে, এটাকে সরানোর অভ্যাস। যেমনটি আছে তেমনটি বলা, যেমনটি আছে তেমনটি ভাবা, যেমনটি আছে তেমনটি বোঝান। তার মানে সত্যের উপর এই যে মিথ্যার আবরণ, সত্যের উপর এই যে কল্পনার আবরণ, সত্যের উপর যত রকম আবরণ হতে পারে, সব কটা আবরণকে আপনি সরিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে আপনার মনটাও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হচ্ছে সাধন জীবনে আপনি কিভাবে এগোবেন।

আমাদের মহাভারতে, মনুস্মৃতিতে এখানে একটা ছোট্ট কথা বলছেন –যাঁরা সংসারে আছেন, তাঁরা নিজেকে বাঁচাবার জন্য, অপরকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারেন। সত্যি কথা বললে নিজের সর্বস্ব হরণ হয়ে যেতে পারে বা অপরের সর্বস্ব হরণ হয়ে যেতে পারে, সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা

যেতে পারে। এই ধরণের কয়েকটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সংসারী মানুষ মিথ্যা কথা বলতে পারেন। মহাভারতে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কাহিনীতে এই ধরণের বিশেষ কয়েকটি পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে এর বর্ণনা আছে। ঠাকুর স্মৃতিকার নন, তিনি ঋষি, তিনি অবতার। ঈশোপনিষদে বলছেন, *তত্ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু,* সাধক সারা জীবন সাধনা করে এসে শেষ বয়েসে সূর্য দেবতাকে প্রার্থনা করছেন –তোমার উপর যে আবরণ রয়েছে, সেই আবরণকে এবার সরিয়ে নাও, আমি সত্যের মুখ দেখতে চাইছি। ঠাকুর আমাদের শেখাতে এসেছেন –সত্যের উপর যে আবরণ রয়েছে সেটাকে কিভাবে সরাতে হয়।

ঠাকুরকে অনেকবার অনেকে জিজ্ঞেস করছেন –সংসারে থেকে কি ঈশ্বরলাভ হবে? হওয়া কি সম্ভব? আপনি যদি সব সময় সত্যি কথা বলেন, আপনার জীবন কি চলবে? সম্ভব কখন? কখন না কখন আপনাকে একটা দুটো মিথ্যা কথা বলতেই হবে। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, রোগীকে, বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা যায়। কিন্তু ঠাকুর কি এই রকম মিথ্যা কথা বলবেন? তবে ওই প্রসঙ্গটা অন্য, কারণ মা তখন যেটা করছেন অন্য ভাব নিয়ে করছেন। কিন্তু সংসারে আপনি শুধু বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য মিথ্যা কথা বলছেন তা তো না। নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অপরকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতে হয়, সত্যে থাকা খুব কঠিন। কিন্তু যিনি সাধনার জীবন বেছে নিয়েছেন এবং পুরোদমে সাধনাতে নেমে গেলেন, তাঁর আর এগুলোর দরকার পড়ে না। আমরা আমাদের বড় মহারাজদের দেখেছি, অনেক এমন কিছু একটা হল যেটা তিনি জানেন, কিন্তু তিনি চান না অন্যরা জানুক। জিজ্ঞেস করলে পরিষ্কার বলে দিতেন, আমি জানি কিন্তু বলব না। 'আমি জানি আমি বলব না', এই কথা বলা অসম্ভব, এই কথা বলার জন্য ক্ষমতা থাকা চাই।

একবার একজন মহারাজকে একটা ঘটনার এনকোয়ারি করতে বলা হয়েছিল। মহারাজ ঘটনার ইতিবৃত্তি সব বার করলেন। যিনি দোষ করেছিলেন, তিনি তখন তাঁর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। ওই মহারাজ পরে তখনকার প্রেসিডেণ্ট মহারাজ গিয়ে সব ঘটনা জানালেন। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ ওনার কাছে নাম জানতে চাইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, 'না মহারাজ নাম বলা যাবে না, আমি বলতে পারব না'। অধ্যক্ষ মহারাজ বললেন, 'না এটা তুমি করতে পার না'। তখন তিনি বলছেন, খুব নামকরা কথা –একজন সাধুকে বাঁচানোর জন্য, তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য আমি প্রেসিডেণ্ট মহারাজের আদেশ উল্লঙ্ঘন করি এবং তার জন্য আমার যে শাস্তি হবে, আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। আমি যখন তাঁকে কথা দিয়েছি তাঁর নাম আমি বলব না, তাই আমি নাম বলতে চাই না। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ খুশি হলেন কথা শুনে। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই রকম বলার জন্য নিজের ব্যক্তিত্বের একটা জোর দরকার। মিথ্যা কথা বলব না, সত্যটাও বলব না। সমাজে এটা সম্ভব না, সমাজে সত্যকে রক্ষা করে চলাটা কঠিন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কথা হল, আপনি যখন ঠিক করে নিয়েছেন, আপনি সত্যই বলবেন, তখন কি হয়, অনেক আজেবাজে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। কারণ এমন কিছু কাজ করছেন, ওই কাজ নিয়ে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি বলতে পারবেন না যে, হ্যাঁ আমি এই কাজ করি। অন্য দিকে মিথ্যা কথাও বলতে পারবেন না যে, না আমি করি না। তার থেকে ভাই, ওই ধরণের কাজ করাটাই বন্ধ করে দিচ্ছি। একজন লোক হয়ত মদ খায়, তার স্ত্রী পছন্দ করে না। একবার দুবার মিথ্যা কথা বলে ম্যানেজ করে নিয়েছে। কিন্তু ঠিক করে নিয়েছে এবার থেকে সত্যি কথা বলবে। বাড়িতে যদি বলে, হ্যাঁ মদ খাই, তাহলে চূড়ান্ত অশান্তি লাগবে; আবার মিথ্যা কথা বললে তার অন্তরাত্মায় দংশন হবে। তখন সে কি করবে? 'দূর, তার থেকে মদ না খেলেই হল, আপদ ছাড়লেই ভাল। এই এতটুকু সাধারণ জিনিসের জন্য কেন আমি মিথ্যা কথা বলতে যাব'।

সত্য বিষয়টা একটা বিরাট বড় বিষয়। সংক্ষেপে সাধনার দিক থেকে পিণ্ডাণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড মনে রাখবেন। ব্রহ্মের উপর যে মায়ার আবরণ, যে মিথ্যার আবরণ, এটাকে যাঁরা সরাতে চান; তাঁকে প্রথম শুরু করতে হয়, জীবনে যেটা চলছে, জীবন চালাতে গিয়ে সত্যের উপর আমরা যে আবরণ দিয়ে দিই, এই আবরণ দেওয়াটা বন্ধ করা থেকে। মণি তখন আর-একটা কথা বলছেন।

মণি –আর-একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য মুগ্ধ করো না! –আমি তোমায় চাই'।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, ওইটি আন্তরিক বলতে হবে। আমরা যে একটু আগে বললাম, হে ঠাকুর, আমি দেখতে চাইছি তোমার ঐশ্বর্য, তার মানে এই না যে আমি তোমার মায়ার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হতে চাইছি। প্রশ্নই নেই মুগ্ধ হওয়ার, আগে আগে তোমার মায়ার ঐশ্বর্যে অনেকবার মুগ্ধ হয়েছি, আর না। আর না। তৃতীয় পরিচ্ছেদ এখানে শেষ হয়ে যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে কীর্তনানন্দে

ঠাকুর যাঁর সাথে কথা বলছেন, যাঁর সঙ্গেই বলুন না কেন, আমরা দেখছি আমাদের সামনে এক একটা আধ্যাত্মিক সত্য খুলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে ঠাকুরের ব্যবহার দেখছি। ব্যবহার কেন? কারণ আমাদেরও ওটাই করতে হবে যেটা ঠাকুরের স্বাভাবিক ব্যবহার। সাধনা মানেই, সিদ্ধ পুরুষরা, ঠাকুরের মত অবতার পুরুষরা যেমন ছিলেন; এনাদের যেটা স্বাভাবিক, আমাদের সেটাই চেষ্টা করে, কষ্ট করে, সাধনা করে দৈনন্দীন জীবনে নামাতে হবে। কথামৃতে আমরা প্রতি পদে পদে সিদ্ধপুরুষের ব্যবহার, কথাবার্তা, আলাপাদি পাই, বেদ ও উপনিষদে আমরা এভাবে পাই না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন, *স্থিতধীঃ কিং প্রভাষতে কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌*, হে প্রভু আপনি এত কিছু বলছেন, কিন্তু আমাকে বলুন মহাপুরুষরা কিভাবে থাকেন, কিভাবে কথা বলেন, ওনারাও কি হাসিমজা করেন?

আমাকে একবার একজন জিজ্ঞেস করছেন, 'মহারাজ, আপনারা চা খান'? আমিও খুব আনন্দ করে বললাম, 'কে খান, কে খান না জানা নেই, আমি কিন্তু তো খুব চা খাই'। সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনধারা লোকেরা জানতে চায়, সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে একটা কৌতুহল মানুষের লেগে থাকে, আমরা সন্ন্যাসীরা একটা আলাদা জাত হয়ে গেছি কিনা। এই কৌতুহল শুধু আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে না, যে কোন ব্যাপারে মানুষ জানতে চায়। মিলিটারিদের ব্যাপারে আমারও জানার খুব আগ্রহ ছিল। একবার আমি গিয়েও ছিলাম, দেখতে মিলিটারিরা কিভাবে ট্রেনিং নেয়, কিভাবে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধর সেনের বাড়ি গেছেন। রামলাল, মাস্টার আর অন্যান্য ভক্তরা ঠাকুরের কাছে বসে আছেন। ঠাকুর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) –কই রাখালকে খবর দাও নাই?

দেখতে হয় নিজের প্রিয়জনরা কেউ সেখানে আছেন কিনা। অবতারেরও অন্তরঙ্গ থাকেন; আপনাদেরও কেউ না কেউ অন্তরঙ্গ থাকবে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে এক সময় আমি প্রিন্সিপাল ছিলাম। প্রত্যেক মাসে টীচারস্‌ মিটিং হত, একবার কোন মিটিংএ একটা প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম –মনে রাখবেন যে শিক্ষক বলেন, আমি সব ছাত্রকে সমান ভালবাসি, জানবেন সে কাউকেই ভালবাসে না। দ্রোণাচার্যেরও প্রিয় শিষ্য ছিল অর্জুন। যে ভাল শিক্ষক তিনি সব সময় উত্তম ছাত্রকে বেশি ভালবাসেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, এনাদেরও অন্তরঙ্গ হয়। এক ভদ্রলোক একদিন আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, উনি এলে তো আবার ওনাকে চা খাওয়ান'। 'ঠিকই, হ্যাঁ খাওয়াই, সে বিশেষ লোক, সে আমাদের ভাব বোঝে, আমাদের কাজে সাহায্য করছে, কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে'। বিশেষ কেউ

না কেউ থাকবেই, না থাকার কিছু নেই, আর থাকবেই বা না কেন। আপনি হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এলেন, এসে বলছেন আপনার সবটাই চাই। বিষয়ী লোকেদের এটা একটা বিশেষ ভাব –কিছুই দেব না, চাই পুরোটা। পরে এই প্রসঙ্গটা আবার আসবে।

অধর –আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে খবর দিয়েছি।

রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালকে আনিতে একটি লোক সঙ্গে নিজের গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

অধর খুব সুন্দর হৃদয়স্পর্শী কথা বলছেন –**আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম, –এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল**।

ঠাকুর এর কাছে ওর কাছে যেতেন, ঠাকুর এইভাবে ধর্মভাব ছড়াচ্ছেন। যেখানেই একটু আধার পাচ্ছেন, উচ্চ আধার ছেড়েই দিন, যেখানে একটু সামান্য আধার পাচ্ছেন সেখানেই ঠাকুর তাঁর কাছে চলে যাচ্ছেন যাতে ভিতরের শক্তিটা একটু জাগ্রত হয়। এর থেকে ভাল আধার যাঁকে পাচ্ছেন, তাঁকে তিনি টেনে নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমন রাখাল, নরেন, তারক, শশী, শরৎ এদের ঠাকুর একেবারে নিজের কাছে টেনে নিলেন। এরপরের যাঁরা আসছেন, তাঁদের এভাবে হয়ত টানছেন না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি চারাগাছে জল দেওয়ার মত আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চার করে দিচ্ছেন। ঠাকুর অধরের কথা শুনে খুব খুশি হয়ে গেছেন। খুব সুন্দর বর্ণনা-

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্যে) –বল কি গো?

আমাকে কেউ চাইছে, এটা যে কত বড় ভাব! অবসাদের রোগী যারা তাদের এটাই সমস্যা, তারা মনে করে, আমাকে কেউ চায় না। এখানে ঠাকুরের ব্যক্তিগত ভাব কিছু নেই। ঠাকুর নিজেই অন্য জায়গায় বলছেন, আমার আমি খুঁজে পাই না। যিনি তাঁর আমি খুঁজে পান না তাঁর আর ব্যক্তিগত ভাব কি করে হবে। এটা অনেকটা এই রকম –একজনের মনে এত ভক্তি, আমাকে না দেখতে পেয়ে কাঁদছে, শিশু যেমন মার জন্য কাঁদে; সাধারণ মানুষ কখন অন্য মানুষের জন্য এইভাবে কাঁদে না। অধর সেনের এই ভাব খুব মর্মস্পর্শী। নিয়মিত তিনি দক্ষিণেশ্বর যান, ঠাকুরও অধরের বাটি মাঝে মাঝে যান। কিন্তু অনেকদিন তিনি অধরের বাটি আসেননি। অধরের ইচ্ছা ঠাকুর অনেকদিন আসেননি, একবার আমার বাড়িতে আসুন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জোড় হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বুঝি মূলমন্ত্র জপ করিলেন। আমি আগেও কয়েকবার জপ প্রসাদরূপে কি করে বিতরণ করতে হয় বলেছি। আপনারা যাঁরা নিয়মিত কথামৃতের কথা শুনছেন, বিশেষ করে আমাদের চ্যানেলের দশখানা লেকচারও যদি শুনে থাকেন, জেনে নিন আপনি সাধারণ নন। কারণ এখানে কোন আমোদ নেই, হাসিঠাট্টা নেই, চটকদারী নেই; শুধু শাস্ত্র, একমাত্র শাস্ত্র যেটা বলেছেন তাঁর আলোচনা। আপনি যেহেতু সাধারণ নন, সেইহেতু আপনার দায়ীত্ব অসাধারণ –ধর্মভাব চারিদিকে ছড়ানো, হিন্দু ধর্মের ভাব চারিদিকে ছড়ানো এবং মানবধর্ম সবার মধ্যে ছড়ানো। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, অটো বা টোটোতে যখনই যাতায়াত করছেন, কোন জায়গায় বা কোন বাড়ি যাচ্ছেন, দু-মিনিট ইষ্টমন্ত্র জপ করুন। যিনিই আপনার ইষ্ট হন, ঠাকুর হন, শ্রীকৃষ্ণ হন, মা কালী হন, শিব হন; ইষ্টমন্ত্র জপ করে দেবেন; দরকার হলে করে জপ করতে পারেন বা কর ছাড়াই করতে পারেন। এতে সেই গৃহস্থের মঙ্গল হবে।

আপনারা হয়ত বিশ্বাস নাও করতে পারেন, ট্রেনে বসে যদি জপ করেন, তাহলে ট্রেনেরও মঙ্গল হবে, হয়ত ট্রেন ঠিক টাইমে চলবে। এই ধরণের কথা শুনে আপনাদের হয়ত মনে হবে, এসব আবার কি আমি মুর্খের মত কথা বলছি, যতসব আজগুবি কথা বলতে শুরু করেছি। কিন্তু একেবারেই তা নয়,

আমি ওটাই বলি যেটাকে আমি সত্য বলে জানি; আগে করে দেখুন তো, তারপর না হয় বিচার করবেন। অপরের মঙ্গলের জন্য যখন জপ করা হয়, ওই জপ শতগুণ ফল দেয়। যখন আপনি নিজের সন্তানের জন্য, পরিবারের লোকেদের জন্য করছেন, সেখানে একটা আপনবোধ থাকে। কিন্তু একজন অজানা, অচেনা মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে, তারজন্য আপনি দু-মিনিট দাঁড়িয়ে জপ করুন আর সাথে এই প্রার্থনা করুন –ঠাকুর পরের জন্মটা যেন এর ভাল হয়; এই জপ ও প্রার্থনা ফল দেবেই। মানুষ স্বভাবে স্বার্থে বাঁধা, নিজেরটুকু ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। অপরের জন্য করে দেখুন, সাংঘাতিক ফল দেবে। আপনি তো ঈশ্বরকেই চাইছেন, আপনি তো আত্মজ্ঞান চাইছেন; আত্মজ্ঞানে এটাই তো দেখবেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছেন এগুলো সব আপনিই হয়েছেন। রাস্তায় যে কাঙালী-ভিখারী দেখছেন, যে ঠেলাওয়ালা-রিক্সাওয়ালদের দেখছেন, সব তো আপনারই রূপ। অধরের বাড়িতে ঠাকুর নিঃশব্দে মূলমন্ত্রে জপ করলেন।

তৎপরে মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, গোবিন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল! হরিবোল! নাম করিতেছেন, আর যেন মধু বর্ষণ হইতেছে। অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে জপ করবেন কিন্তু এগুলো করবেন না, লোকে পাগল ভাববে। অধর ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুর তাঁর ভক্তের বাড়িতে সুমধুর স্বরে ঈশ্বরের নাম করছেন। এগুলো আমাদের অজানা, অচেনা জায়গায় মনে মনে করতে হয়। এতে কি হয়, ওখানকার যে অশুভ তন্মাত্রাগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ওখানে যে অশুভ শক্তিগুলো আছে সেগুলো অপসারিত হয়ে যায়। আমি বেশ কয়েকজন মহারাজদের মুখে শুনেছি, অনেক জায়গায় গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারছেন এখানে কিছু অশুভ শক্তি আছে। কিন্তু কি আর করবেন, ওনারা তখন কিছুক্ষণ ঠাকুরের নাম করে দিলেন। ঠাকুর নিজের ভক্তের বাড়িতে এসেছেন, এখানে তিনি ভক্তের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নাম করছেন। **ভক্তেরা অবাক হইয়া সেই নাম-সুধা পান করিতেছেন**। ঠাকুর যে সব সময় গান করেই ও-রকম করতেন, নৃত্য করতেন তা না, ঈশ্বরের নাম করেও ভক্তদের মধ্যে ভাব জাগিয়ে দিতেন। **শ্রীযুক্ত রামলাল এইবার গান গাইতেছেন**, এবং গানগুলো খুব সুন্দর।

দু-তিনখানা গান পরিবেশনের পর শ্রীযুক্ত রামলাল শেষে কুণ্ডলীনি নিয়ে একটা গান গাইলেন –

তদুর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল।
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজে আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন –

এই শুন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ-দর্শন। বিশুদ্ধচক্র ভেদ হলে সকলি আকাশ। এই গানগুলো যিনি লিখেছেন, কোথাও তাঁর একটা চৈতন্যের বোধ হয়েছিল।

মাস্টার –আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এই মায়া-জীব-জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছানো যায়। নিত্য আর লীলা এই দুটো বিষয়। এই জীব, জগৎ এ-সবই লীলা। **নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয়, আর সমাধি হয়**।

কথামৃতের শুরুতেই মাস্টারমশাই এই জিনিসটাকে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে ঠাকুর বলছিলেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়, আর সে নাদ ভেদ করে সমাধি হয়। এর আগে ঠাকুর অন্য ভাবে বলেছিলেন, সেখানে এই কথাটা বলেছিলেন, 'তাঁর কৃপাতে কেউ কেউ সেই নাদ ভেদ করে

সমাধিতে মনকে লয় করে দেন'। সেখানে আমরা বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু কি হয়, এই জিনিসগুলিকে অনেকবার ব্যাখ্যা করতে হয়।

প্রার্থনা, পূজা, জপধ্যান যা কিছু আমরা করি, সবটাই হল চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধি মানে, মনে যে হাজার রকমের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, যার মধ্যে কিছু চিন্তা-ভাবনা জগৎ থেকে আসে, কিছু কল্পনা থেকে আবার স্বপ্নাবস্থা আছে, নিদ্রাবস্থা আছে, কিছু এমনি ফালতু চিন্তা-ভাবনাও থাকে, আর কিছু চিন্তা-ভাবনা আসে স্মৃতি থেকে। এগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় লাগিয়ে রাখে। কিন্তু যখন সৎকর্ম করা হয়, পূজা, অর্চনা, নামগান, জপ; তখন মনের আবর্জনামূলক চিন্তা-ভাবনাগুলো কমতে থাকে, মন ধীরে ধীরে শান্ত হতে থাকে। সবাই ঈশ্বরের জ্ঞান চাইছে, সবাই ঈশ্বরের ভালবাসা চাইছে; কিন্তু কেউ বোঝার চেষ্টা করে না, এগুলো হয় কি করে।

আগে আগে বলেছি, পরে আবার বলব –প্রথমে মনের তমোগুণকে কাটাতে হয়। তমোগুণ কাটানোর জন্য প্রচুর কাজ করা দরকার, তা যে রকমেরই কাজ হোক, আজেবাজে কাজ করলেও হবে। সেখান থেকে যখন নিষ্কাম কর্ম করা শুরু হয়, ঈশ্বরের পূজা রূপে কাজ করা হয়, এই কাজ করে করে তমো থেকে যখন রজোগুণে এলো, রজো থেকে এবার সত্ত্বগুণে চলে যাবে। সত্ত্বগুণে এলে সেখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপধ্যান আর অন্তরঙ্গ সাধন, এগুলোকে আরও জোড়াল করতে হয়। এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল, এগুলো ছিল বহিরঙ্গ সাধন। চুটিয়ে কাজ করা, নিষ্কাম ভাবে কাজ করে, প্রচুর পূজা অর্চনা করা, এই সমস্ত কিছু হল বহিরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধন হল ধ্যান। যখন সাইক্লোন আসে তখন সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। সরকার থেকে তখন অনেক ধরণের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়, নৌকা যেন সমুদ্রে না যায়, জেলেরা যেন মাছ ধরতে না যায় ইত্যাদি। ঝড় থেমে যাওয়ার পর সমুদ্র শান্ত হয়ে গেলে তখন আর সতর্কবার্তা থাকে না, নিজের ইচ্ছামত নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যায়, জেলেরা মাছ ধরতে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। আমাদের মনটাও সব সময় উত্তাল সমুদ্রের মত। ওই মন যখন একটু শান্ত হয়, তখন কর্ম করে, নিষ্কাম কর্ম ও পূজা আদি করে তারপর ধীরে ধীরে জপধ্যানের দিকে মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। তার মানে মন এখন অনেকটা একাগ্র হল।

একদিনে মন একাগ্র হয় না। নানান ভাবে মনকে একাগ্র করার দিকে নিয়ে যাওয়া শেখানো হয়। প্রথম হল চুটিয়ে কাজ করা, পেট চালানোর কাজ; দ্বিতীয় দায়ীত্ব বোধে কাজ করা, এটা করা আমার দায়ীত্ব তাই করছি, এর বেশি আর কিছু না। তার মানে নিজের ইমোশানকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। তার সঙ্গে নিয়মিত ভাবে পূজা, অর্চনা, জপ চালিয়ে যেতে হবে। মন একটু শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে, শরীরের অঙ্গগুলো একটু স্থির হলে তবে ধ্যান হয়। যখন প্রচুর জপ করা হয়, জপ করতে করতে মন্ত্রটা ধীরে ধীরে ওঁ-এ গিয়ে মনটা স্থির হয়। মন তখন এত একাগ্র হয়ে যায় যে, তখন চেষ্টা করে আর জপ করতে হয় না, স্বাভাবিক জপ হয়। এই স্বাভাবিক জপ আস্তে আস্তে জপের মন্ত্র ওঁ-এ একাগ্র হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সাধক পরিষ্কার নাদধ্বণি শুনতে পান।

নাদ অনেকটা এই রকম –একটা গম্‌কে যদি ঢং করে আওয়াজ করা হয় আর ওই ঢং শব্দটা যদি অনেক দূর থেকে শোনা যায়, তখন একটা ইউনিফর্ম শব্দ ভেসে আসে। এটা হল শেষ অবস্থা। উল্টো দিক থেকে সৃষ্টি যখন হয়, ঠিক এভাবেই হয়। ওঁ যদি দীর্ঘ ভাবে উচ্চারণ করা হয়, ওঁম্‌ম্‌ম্‌, আর ঢং আওয়াজ শেষের দিকে একই রকম শোনাবে। মন ওখান থেকে বেরিয়ে আর উপরে উঠতে পারে না। এরপর তিনি কৃপা না করলে ওই নাদকে ভেদ করা যায় না। তিনি কৃপা করলে ওই নাদ ভেদ হয়ে যায়, অর্থাৎ ওঁ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে; একটা পর্দা যেন সরে গেল, মন তখন লয় হয়ে যায়। ওই নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। তখন আর জীব, জগৎ এই বহু কিছু থাকে না। যেটাকে মাল্টিপ্লিসিটি বলছি, তা যে কোন রূপেই থাকুন না কেন, কিছুই আর তখন থাকে না। মন এবার স্থির হয়ে গেল। সেখানে আর কিছু নেই, ওঁ নেই, রাম নেই, কৃষ্ণ নেই, যা আছে তাই আছে।

ঠাকুর বলছেন, ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয়, আর সমাধি হয়। এই জিনিসটাকেই কুণ্ডলীনি দিয়ে যখন বর্ণনা করা হয়, সেটাই তখন বলা হয়, যেমন যেমন কুণ্ডলীনি উপরের দিকে উঠতে থাকে, তেমন তেমন আপনার বহু বোধ কমে যায়। এগুলো আমরা বলে যাব, কিন্তু উপলব্ধি আপনাকে নিজে করতে হবে, এখানে কারুর কিছু করার নেই।

আবার বলে দিচ্ছি –প্রথমে চুটিয়ে কাজ করা, প্রচুর কাজ করলে ভিতরে যে আবর্জনাগুলো জন্মজন্মান্তর ধরে জমে আছে, সেগুলো পরিষ্কার হয়। সেখান থেকে নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরের পূজা করছি এই ভাব নিয়ে সব কর্ম করা, তখন রজোগুণ শান্ত হয়। রজোগুণ শান্ত হওয়া মানে ইমোশানগুলো শান্ত হয়। আমি জয়ী হব, আমি সেই হব, আমার এটা চাই, আমাকে পেতে হবে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে; এই জিনিসগুলো রজোগুণ শান্ত হয়ে গেলে কমে যায়। রজোগুণ শান্ত হয়ে গেছে, ইমোশানগুলো দমে গেছে, এবার সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হতে শুরু হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি যখন হতে শুরু হয়, তখন প্রচুর জপ, ধ্যান, স্মরণ-মনন করে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির পথকে আরও প্রশস্ত করে দিতে হয়। আগেকার দিনে স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চালানো হত। মাঝে মাঝে কোন স্টেশনে স্টীম ইঞ্জিনে খুব করে কয়লা দেওয়া হত, যাতে প্রচুর পরিমাণে স্টীম তৈরী হয়। সেখান থেকে শুরু হয় অন্তরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনার প্রধান হল ধ্যান, ধ্যান যত গভীর হবে মন তত শান্ত হয়; মন যত শান্ত হবে ধ্যান তত গভীর হয়। হতে হতে শেষে আসে নাদ্, ওঁ; ওইটাকে ভেদ করা প্রায় অসম্ভব। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া নাদকে ভেদ করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যদু মল্লিকের বাড়ি –সিংহবাহিনী সম্মুখে –'সমাধিমন্দিরে'

অধর সেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠাকুর এবার যদু মল্লিকের বাড়ি যাবেন, সেখানে সিংহবাহিনী দর্শন করবেন। যদু মল্লিকের পরিবার বর্তমানে অনেক বড় হয়ে গেছে, সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এক সময় আমি সিমুলিয়ায় স্বামীজীর বাড়িতে ছিলাম। পাশেই যদু মল্লিকের বংশের একজন ছিলেন। শুনেছিলাম ওনাদের পরিবারের এখন নানা রকম বিভাজন হয়ে গেছে। ওনাদের বাড়িতে বছরে একদিন, কি দেড় বছরে একদিন সিংহবাহিনীকে নিয়ে আসা হত। আমরাও দেখতে গিয়েছিলাম, যদিও অন্য জায়গায় দর্শন করেছি।

আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। যে-ঘরে সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন পুষ্প ও পুষ্প-মালা দ্বারা অর্চিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন।(পৃঃ ২৩৭)

নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে পূজাদি করলে বিগ্রহ জ্বলজ্বল করে, বিগ্রহের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ঈশ্বরীয় ভাব যদি বিগ্রহে মূর্ত প্রকাশ হয়, তবেই ফল দেয়। আপনাদের একটা উদাহরণ দিই, বেলুড় মঠে দূর্গাপূজা হয়, আপনারা অনেকেই আসেন পূজা দেখতে। বোধনে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে মায়ের যে পূজা হয়, তখন মাকে দেখবেন, মায়ের বিগ্রহ কেমন ঝকঝক করছে। এটা পরিষ্কার আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন। যেমনি মায়ের দর্পণ বিসর্জন হয়ে গেল, চেহারাটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই একই লাইটিংএর ব্যবস্থা, সেই একই সাজগোজ; কিন্তু চেহারাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, পূজা হচ্ছে মায়ের চেহারা ঝকঝক হয়ে গেল। আপনারা এসে দেখুন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে মা এক রকম আবার দর্পণ বিসর্জন যেই হয়ে গেল, মায়ের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল।

ঠাকুর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজনকে বলছেন, টাকা দিয়ে প্রণাম করতে হয়; কেননা ঠাকুরের কাছে এলে কিছু প্রণামী দিতে হয়। যেখানেই আপনি মন্দিরে যাবেন খালি হাতে কখন যেতে

নেই। ঠাকুর টাকা ছুঁতে পারতেন না, কিন্তু তিনি নিজে এটা করছেন না, সঙ্গে যে আছে তাকে দিয়ে করাচ্ছেন। এক টাকা হোক, দু টাকা হোক; কিছু প্রণামী না দিয়ে কোন মন্দির থেকে চলে আসতে নেই। মূল কথা, খালি হাতে তাঁর কাছে যেতে নেই।

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

এত সুন্দর বর্ণনা! মা কালীর দর্শন ঠাকুরের কত দিন আগে হয়ে গেছে। মা কালী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন, তিনি নিজে দেখছেন, কথা বলছেন। শুধু মা কালী কেন, সমস্ত দেবীদেবতার দর্শন হচ্ছে। অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেছে; তারপরেও তিনি মা সিংহবাহিনী বিগ্রহের সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বর্তমান কালের যাঁরা, ঠাকুরের কথানুসারে ইদানিং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী, ইদানিং কালের ব্রহ্মজ্ঞানী চারিদিকে এত বেশি বেড়ে গেছে যে, আমাদের একজন মহারাজ মজা করে শুধু 'ইদানিং' বলতেন। ঠাকুর যে কালে একজনের বাড়ির সিংহবাহিনীর বিগ্রহকে প্রণাম করছেন, তাতেই বোঝা যায় মূর্তি পূজার কত গুরুত্ব। যাদের ম্লেচ্ছ মানসিকতা, কথায় কথায় এটা কেন হবে, ওটা কেন হবে হাজারটা প্রশ্ন করতে থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলা যায় –ভাই, তোমাদের ধর্মবোধ কি ঠাকুরের থেকেও বেশি? মাস্টারমশাই এমন নিখুঁত বর্ণন করেছেন –

কি আশ্চর্য, দর্শন করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্থ। কোন গান নেই, কোন নৃত্য নেই, শুধু সিংহবাহিনীকে অপলক নয়নে দর্শন করছেন, তাতেই একেবারে সমাধিস্থ। গান শুনে ঠাকুরের ভাব হচ্ছে, আমাদেরও অনেক সময় গান-টান শুনলে মনটা উপরে চলে যায়। এখানে তা না, অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন আর মায়ের ভাবে মনটা লীন হয়ে গেল। **প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূন্য**। অন্য জায়গায় বলছেন নিঃশ্বাস বহিছে কিনা বহিছে বোঝা যাইতেছে না। একেবারে পাথরের মত। কারণ শরীরের যত ক্রিয়া হয়, অঙ্গ সঞ্চালন, সব মন থেকে হয়। অনেক বসে পা নাড়তে থাকে, হাত নাড়তে থাকে, এই যে পা নাড়ানো হচ্ছে, আসলে মন ওখানে সক্রিয় আছে। মনুস্মৃতিতে খুব সুন্দর বলছেন, হস্তচপল, পদচপল, বাকচপল; হাত নড়ছে, পা নাচাচ্ছে, বুঝতে হয় মন এদের চঞ্চল।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, মা, আসি গো। অত্যন্ত গভীর এই কথা। একবার যদি যদু মল্লিকের বাড়ির ঘটনাগুলি চিন্তন করেন, যদু মল্লিকের বাড়ির সিংহবাহিনীর মূর্তি, সেখানে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে ওখান থেকে মনটা নামছে, তারপর শুধু এই কথা –মা, আসি গো। কোন ইমোশান নেই, কোন নাটকীয়তা নেই। একটু যদি চিন্তন করেন, হাত-পা অবশ হয়ে যাবে। ওই বিগ্রহে মায়ের যে উপস্থিতি সেটা চিন্ময়। মাকে বলছেন, মা, আসি গো; ঠাকুর কিন্তু চলতে পারছেন না, স্থির হয়ে গেছেন। তখন ওই ভাবটা কমানোর জন্য এই রকম বলছেন। আগে আগেও তিনি করতেন, শ্রীশ্রীমাকেও শিখিয়েছিলেন।

মা, আসি গো, বলা হল ঠিকই **–কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না –সেই একভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।**

তখন রামলালকে বলিতেছেন –তুমি ওইটি গাও –তবে আমি ভাল হব।

রামলাল গাহিতেছেন, ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। গান শুনে ঠাকুরের মনটা একটু নিচে আসছে। গান শুনে কখন ঠাকুরের মন উপরে যায়, কখন কোন রকমে মনটাকে নিচে নামিয়ে আনেন। ঠাকুরই বলছেন, একুশ দিন সমাধি থাকলে শরীর চলে যায়; এই ভাব থাকলে শরীর চলতেই পারবে না, প্রশ্নই নেই।

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন –ভক্তসঙ্গে। আসিবার সময় মাঝে একবার বলিতেছেন, মা, আমার হৃদয়ে থাক মা। এগুলো অত্যন্ত উচ্চস্তরের বর্ণনা। এই ভাবটাকে যদি আপনাকে বুঝতে হয়, এখানে কি হচ্ছে, আপনাকে তাহলে ভাগবতের রাসলীলাতে যেতে হবে। এগুলোকে ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না, এগুলো নিজেকে অনুভব করতে হবে। যদি অনুভব করতে চান, করা যাবে। দরজা বন্ধ করুন, বাড়ির লোকদের বিরক্ত করতে বারণ করে দিন। কথামৃত খুলুন, এই অংশটা পড়ুন, দৃশ্যটা চিন্তন করুন। এটাও এক ধরণের ধ্যান; শুধু আসনে বসেই ধ্যান হয় না। এই ধ্যানে লীন হয়ে যাওয়া। এখানে যে কোন ধরণের ঢং আছে, তা নয়। এইটুকুতে বোঝা যায়, সিংহবাহিনী দর্শনে কেমন জোর সমাধি হয়েছিল, কেমন জোর ভাব হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক স্বজনসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া। ঠাকুর ভাবেই আছেন, আসিয়া গাহিতেছেন –

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।

মনটাকে আস্তে আস্তে নামানোর জন্য ঠাকুর গান করতেন। **গান সমাপ্ত হইলে আবার ভাবোন্মত্ত হইয়া যদুকে বলিতেছেন, "কি বাবু, কি গাইব? 'মা আমি কি আটাশে ছেলে' –এই গানটি গাইব?"** গান হল। **ভাব একটু উপশম হইলে বলিতেছেন, 'আমি মার প্রসাদ খাব'**। সিংহবাহিনীর প্রসাদ এনে ঠাকুরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতকগুলি বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন।

ঠাকুর এবার আগের থেকে অনেক স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। **যদু মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্যে কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে, মাস্টার ও দুই-একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন**।

ঠাকুর এবার মজা করছেন। আশ্চর্য এই একটু আগে পুরো সমাধিতে ছিলেন, সেই সমাধি থেকে নেমে এসে মজা করে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন? বড়লোকেরা সঙ্গে সব সময় দু-চারজন মোসায়েব রাখেন, লোকেরা দেখে মনে করবে, উনি খুব বড়লোক।

জওহারলাল নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, একজন বিদেশী মহিলা নেহরুজীর সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিকথা লিখেছিলেন, লেখিকা তখন অনেক ছোট ছিলেন। তিনমূর্তি ভবন থেকে নেহরুজি পার্লামেন্টে গাড়িতে একাই যেতেন। একদিন নেহরু পার্লামেন্টে যাবার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। এরা বিদেশী ছিল, এদেরও গাড়ি ছিল। এরাও বেরিয়েছে। তখন লেখিকা বাচ্চা মেয়ে, মজা করে ড্রাইভারকে বলছে, এই গাড়িটা একটু জোরে চালাও। কিছুটা দূর গিয়ে গাড়িতে হর্ণ দিয়ে নেহরুজীর গাড়িকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি খুব সুন্দর বর্ণনা করছে, দেখতাম গাড়িতে নেহরুজী একগাদা ফাইল নিয়ে বসে আছেন, ফাইল দেখে যাচ্ছেন আর সই করে যাচ্ছেন। এখন আমাদের মন্ত্রী থেকে বড় আমলার গাড়ি যদি একা একটা গাড়িতে যায় আর হুটার বাজাতে বাজাতে না যায় কেউ তাকে পাত্তাই দেবে না। গাড়ির আগে পিছে কতগুলো গাড়ি আছে দেখে বোঝা যাবে কত গুরুত্বপূর্ণ লোক। বড়লোকদের, ক্ষমতাবানদের সব সময় তার সাকরেদরা, মোসায়েবরা ঘিরে রাখে।

যদু মল্লিক ঠাকুরকে খুব ভালবাসতেন। যদু মল্লিকের বাড়ি আমি গিয়েছিলাম, তখন আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম। দেখলাম বাড়ির লোকেরাও ঠাকুরকে তাঁদের বাড়ির লোকের মতই ভাবেন। জানিনা এই ভাব এখনও এই পরিবারে আছে কিনা, অনেক আগেকার কথা বলছি। দ্বিতীয় কথা, আমরা আজকে

ঠাকুরকে একজন অবতার রূপে দেখছি, ওনারা ঠাকুরকে সেই ভাব নিয়ে দেখতেন না। ওনাদের কাছে ঠাকুর একজন খুব ভাল মহাত্মা, তার বেশি না। ফলে ঠাকুর ও যদু মল্লিক নিজেরা যখন হাসিমজা করছেন, সেখানে একটা আপন ভাব থাকত।

যদু (সহাস্যে) –ভাঁড় হলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না! যেন বলতে চাইছেন, আমার সঙ্গে যাঁরা আছে, আমাকেও উদ্ধার করতে হবে, এদেরও উদ্ধার করতে হবে। ঠাকুরও মজা করে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না!

ঠাকুর সবাইকে কিছু না কিছু উত্তর দিয়ে দিতেন, এটাই হল sign of intelligence। যাঁরা আধ্যাত্মিক হন, তাঁরা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান হন। হাঁদাভোঁদা যদি কাউকে দেখেন, আর কিছু না হোক বুঝবেন আধ্যাত্মিক তো নয়ই, ধার্মিকও না। যে গুণে মানুষ বুদ্ধিমান হয়, সেই গুণেই মানুষ আধ্যাত্মিক হয়। বুদ্ধিমান লোকেরা যে সব সময় আধ্যাত্মিক হবেন তা না; নিউটন, আইনস্টাইন এনারা কেউই আধ্যাত্মিক ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক তাঁরা বুদ্ধিমান হবেনই হবেন। কারণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে শাস্ত্র ধারণা করা যায় না। বুদ্ধি যদি সূক্ষ্ম না হয়, আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন যাবে না। এর সাথে পড়াশোনার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন লাটু মহারাজ, লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমরা পরম্পরাতে অনেক কাহিনী শুনেছি, একজন বোকা শিষ্য, কিন্তু গুরুকৃপায় দেখা গেল তার বুদ্ধি খুলে গেছে। যাঁরা সত্যিকারের ধর্মজীবনে বা আধ্যাত্মিক জীবনে আছেন, দেখবেন তাঁদের বুদ্ধি প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ। তাঁদের কথাবার্তায় হাস্য থাকবে, মজা থাকবে, কিন্তু কাউকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলবেন না, বুদ্ধি এনাদের প্রচণ্ড শার্প। আমরা শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, কি প্রচণ্ড বুদ্ধি, একেবারে কুশাগ্রের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

যদু ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটীতে চণ্ডীর গান দিবেন। অনেকদিন হইয়া গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কই গো, চণ্ডীর গান?

যদু –নানান কাজ ছিল তাই এতদিন হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সে কি! পুরুষ মানুষের এককথা।

পুরুষ কি বাত, হাতি কি দাঁত।

দক্ষিণেশ্বরে অনেক সাধুবাবারা আসতেন, তাঁদের থেকে ঠাকুর টুকটাক একটু হিন্দি শিখেছিলেন। 'বাত' স্ত্রীলিঙ্গ সেইজন্য পুরুষ কি বাত। দাঁত আবার পুংলিঙ্গ, সেইজন্য হিন্দিতে বলতে গেলে হাতি কে দাঁত বলতে হবে। ঠাকুর ছন্দ মিলিয়ে বলছেন, পুরুষ কি বাত, হাতি কি দাঁত। যেটা বেরিয়ে এসেছে সেটা আর ভিতরে যাবে না। হাতির যে দাঁত বেরিয়ে থাকে, সেটাকে দিয়ে বলছেন, যে কথা দেওয়া হয়েছে, সেই কথা রাখতে হবে।

কেমন, পুরুষের এককথা, কি বল?

আমিও মজা করে ছাত্রদের বলি, ভদ্রলোকের এককথা। কি এককথা? আমি কোন দিন শোধরাব না। ছাত্ররা দুষ্টুমি করে, নিষেধ করার পর আবার সেই দুষ্টুমিই করবে। আমিও মজা করে বলি, ভাই, তোমারাই সত্যিকারের ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের এককথা। এককথা কি? শোধরাব না। যাই হোক, ঠাকুরের কথা শুনে যদু মল্লিক বলছেন –তা বটে। কিন্তু এরপর ঠাকুর যেটা বলছেন, খুব সুন্দর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব করে কাজ কর। আশ্চর্য! ঠাকুর এই সমাধিতে। 'মা আসি গো' বলেই সমাধি! পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে পুরো অন্য ছবি। 'তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব করে কাজ কর।' এই কথাটা কত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে ঠাকুর বলছেন; কতটা দিচ্ছি, তার বিনিময়ে আমি কতটা পাব, তুমি সব হিসেব করে কর।

একটা মজার ঘটনা আছে, এক মহারাজের কাছে শুনেছিলাম। অনেক আগেকার কথা। রবিবার দিন নরেন্দ্রপুরে গার্জেন মিটিং থাকে। বাবা মিটিংএ এসেছেন। সেখান থেকে ছেলের সাথে দেখা করতে গেছে। দেখা করে বাবা এবার ফিরে যাবেন, ছেলে এগিয়ে দিতে এসেছে। সেই সময় দূর থেকে একজন মহারাজ আসছিলেন, বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছেন, 'হ্যাঁ রে এনাকে তোর কাজে লাগবে'? ছেলে বলছে, 'উনি তেমন কেউ নন'। 'ঠিক আছে চল'। দেখলেন আর-একজন মহারাজ আসছেন, 'উনি কি তোর কাজে লাগবেন'? 'হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো আমাদের ক্লাশ-টীচার'। ব্যস্ আর যায় কোথায়, মহারাজ কাছাকাছি আসতেই বাবা দৌড়ে গিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'মহারাজ আর বলবেন না, আমার ছেলে বাড়িতে গেলে খালি আপনারই কথা বলে'। কপাল এমন বাবা ও ছেলের পিছনেই একজন মহারাজ ছিলেন, দুটোই উনি শুনেছিলেন। পরে মহারাজরা মিলে এটাকে নিয়ে খুব মজা করতেন।

সংসারী যাঁরা হন, খুব হিসাবী হন। সাধুদের যদি প্রণামী দেয় সেখানেও তার হিসাব। এই সাধুকে ভাল প্রণামী দিলে প্রসাদের কুপন পাবো কিনা, গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা, স্কুলে এ্যাডমিশান করিয়ে দিতে পারবেন কিনা, হিসাব করতে শুরু করে দেবে। প্রণামী দিয়েই বুঝে নেন, ইনি এমনি সাধু। নরেন্দ্রপুরেরই আর-একটি গল্প, কেউ একজন নরেন্দ্রপুরে ফোন করেছিলেন, ফোনে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনি কি ওখানাকার সেক্রেটারী মহারাজ বলছেন'? 'না না আমি সেক্রেটারী মহারাজ না'। 'ও আপনি কি কলেজের প্রিন্সিপাল বলছেন'? 'না'। 'আপনি কি স্কুলের প্রিন্সিপাল'? 'না, আমি এমনি সাধু'। কি আর করবে সংসারীরা, তাকে গেস্ট হাউসে থাকতে হবে, চিঠি লিখে দিতে হবে, কাউকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে, সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার সুযোগ নিতে হয়ে, এসবের জন্য কয়েকজন মহারাজকে হাতে রাখতে হয়। যেটাই দিক না কেন, সব হিসাব করে দেবে। আমাকেও কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আপনি এখানে কি করেন মহারাজ? আমি বলে দিই, আমি এমনি সাধু। এর বেশি কি আর বলব, আর সতিই আমি এমনি সাধু। এটাই ঠাকুর যদু মল্লিককে বলছেন – অনেক হিসাব করে কাজ কর।

- বামুনের গড্ডী খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে। (সকলের হাস্য) গড্ডী মানে গরু, পুরো জগৎ বামুনের গড্ডী খুঁজে বেড়াচ্ছে। বলছেন, খাবে কম, কিন্তু নাদবে বেশি, আর তার সঙ্গে হুড় হুড় করে দুধ দেবে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের কাছে টাকা-পয়সা থাকত না, ওই যজমানী করে যেটুকু আয় করত তাই দিয়ে সংসার চালাত। কোথাও হয়ত দুটো টাকা বেশি পেয়ে গেল। এরপর যদি গরু কিনতে যায়, প্রথম খোঁজ নেবে, গরুটা যেন কম খায়। কোথা থেকে গরুর ঘাস জোটাবে, কত আর গরুর পিছন পিছন ঘুরবে। আর গোবর যেন প্রচুর দেয়। কারণ তখনকার দিনে বাড়ি গোবর দিয়ে লেপা হত, ঘুঁটে দিয়ে জ্বালানী হত। এখন উঠে গেছে, গ্রামের দিকে এখনও হয়। গোবর দিয়ে লেপা দিলে ঘরদোর জীবানুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে, আর আঙিনা, উঠোন, ঘোরদোর খুব সাফসুতরো থাকে। গোবর দিয়ে আগেকার দিনে ঘুঁটে দেওয়া হত, ঘুঁটে তখন জ্বালানীর একটা বড় আধার ছিল।

আর তাই না, দুধ দেবে হুড়হুড় করে; ঠাকুরের ভাষা এত সুন্দর আর মিষ্টি। তার মানে আমি যেটা করব একেবারে হিসাব করে করব। আমাকে আমার এক বন্ধু বলছিলেন, আপনি আছেন মজার, কোন কিছু দেবেন না, কিন্তু চাই সবটাই। কথা শুনে প্রথমেই আমার এই বামুনের গড্ডী ব্যাপারটা মনে এলো। সাধুদের কাছে আপনি কি আশা করবেন; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের মন ঠাকুরের কথায় বেণে বুদ্ধি, সব সময় দাঁড়িপাল্ল নিয়ে হিসাব করছে, এতটা দিলাম, এবার কতটা পেলাম। এই কথা যদু

মল্লিককে ঠাকুর বলছেন। কিন্তু জানবেন, আমি, আপনি, এ, সে, ও; আমরা সবাই কিন্তু বামুনের গড্ডী খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভগবানও আমাদের কাছে এই বামুনের গড্ডী। এই যে আমরা দেখলাম, ঠাকুর কত কি করছেন –অধর সেনের বাড়িতে গিয়ে জপ করে দিচ্ছেন, এখানে এসে সমাধিস্থ, সমাধিতে নেমে এসে মার সঙ্গে কথা বলছেন; এই যে এত কিছু হচ্ছে, আমরা কি এখান থেকে কিছু নিতে পারি? একেবারেই সম্ভব না। এই যে অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, দু-পয়সার সন্দেশ কিনে ঠাকুরকে দেবে তার মধ্যেই কত রকমের কামনা মিশিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন তীর্থে যাচ্ছে, কত মন্দিরে মন্দিরে যাচ্ছে, কিন্তু কত রকমের কামনা –হে ঠাকুর আমার স্ত্রী/স্বামীর যেন এটা হয়, ছেলের যেন চাকরি হয়, মেয়ের যেন একটা ভাল বিয়ে হয়, কামনার লিস্ট বলে শেষ করা যাবে না।

এখন বিচার করে দেখুন তো, বদলে আমরা ঠাকুরকে কি দিচ্ছি? অন্য সব ছেড়ে দিন, আমরা এত কিছু আলোচনা করলাম, কর্ম, নিষ্কাম কর্ম, জপধ্যান, বহিরঙ্গ সাধন, অন্তরঙ্গ সাধন, সমাধি; সব ছেড়ে দিন, পুরো বিজনেসে নামুন। জুহুদের ধর্ম, এই ধর্ম পুরোপুরি বিজনেসের উপর চলে, সব জায়গায় লেনাদেনা –ভগবান মোজেসকে বললেন, আমি তোমাদের লোকেদের গোলামী থেকে বার করে আনব, বদলে তোমাদের এই এই করতে হবে। যার জন্য ওদের ভগবান বলেন –তোমার লোকজন আমার কথা শুনল না, ঠিক আছে, এই দেখ আমি তোমাদের বন্যা পাঠাচ্ছি, এই দেখ তোমাদের এই এই রোগ পাঠাচ্ছি। আমি তোমাকে ভালবেসেছি, তুমি আমাকে ভালবাসলে না –এই নাও তোমার নরক। আপনাদের কাছে হাতজোড় করে বলছি, একটু বিচার করে দেখুন, ঠাকুরের কাছে যখন প্রার্থনা করছেন, বদলে ঠাকুরকে কি দিচ্ছেন? আপনি বলবেন –আমরা আর ঠাকুরকে কি দিতে পারি – না না এসব পাটোয়ারী ছাড়ুন। পরিষ্কার করে ভাবুন, আপনি ঠাকুরকে কি দিতে পারছেন? জপধ্যান, আর কি দেবেন। আপনি কত জপ করেন, কতটা ধ্যান করেন যে আপনি ঠাকুরের কাছে কামনা করবেন।

বামুনের গড্ডী কথাটা প্রথম যখন শুনেছিলাম খুব হাসি পেয়েছিল। বামুনের গড্ডি উপমাটা আমার খুব প্রিয়, এখনও কথায় কথায় এখানে সেখানে বামুনের গড্ডী ব্যবহার করি। কাজের জন্য আমাদের বিভিন্ন সরকারী অফিসে যেতে হয়। যেতে যেতে ওখানকার কর্মচারীদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ওনারা কিছু কথা বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'আমরা সব সময় বামুনের গড্ডী অফিসার খুঁজি। এমন অফিসার হবে, আমাদের মিশনের কাজগুলো সব করে দেবে আর আমাদের ঘাড়ে এসে বলবে না, মহারাজ বেলুড় মঠে একটু প্রসাদের ব্যবস্থা করে দেবেন'। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কি করব, আমাদেরও কিছু করার নেই। তবে আমরা সমাজের কাজ করছি, নিজের জন্য কিছু করছি না। আজকেও ভারতের সমাজ, হিন্দু সমাজ এত দুর্বস্থায় যায়নি যে সন্ন্যাসী অভুক্ত মারা যাবে। সমাজ আমার খাবার দিয়ে দেবে। এর পরে যেটা হচ্ছে, সেটা আপনাদের জন্যই করা হচ্ছে। বদলে আপনাদের একটু ছায়া প্রদান করা, ওর ছেলের এ্যাডমিশান করিয়ে দেওয়া, ওর গেস্ট হাউস বুক করিয়ে দেওয়া, এই আর কি। তখন আমি হাসতাম। এখন বয়স হয়ে গেছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে। সত্যিই দেখুন, আমরা সবাই বামুনের গড্ডী। হে ঠাকুর এই যে আপনার সামনে এলাম, এই এতটুকু প্রার্থনা আমার, বদলে আমার যেন সব ঠিক থাকে। আমার আশেপাশে চুন্নু-মুন্নু যারা আছে সবাই যেন ঠিক থাকে। শুধু যদু মল্লিক না, আমরা সবাই তাই। আমাদের কাছে ভগবান বামুনের গরু।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে যদুকে বলিতেছেন, বুঝেছি, তুমি রামজীবনপুরের শীলের মতো –আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। তোমার ঈশ্বরেতেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে। আমাদের ক্ষেত্রে যা হয়। এইসব কথা হল। যদুর বাড়িতে ক্ষীর প্রসাদ ইত্যাদি খাওয়া হল। ঠাকুর এবার খেলাৎ ঘোষের বাড়ি যাবেন। খেলাৎ ঘোষকেও ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। রাত তখন প্রায় দশটা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খেলাৎ ঘোষের বাটীতে শুভাগমন –বৈষ্ণবকে নিন্দা

খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে ঠাকুর যখন প্রবেশ করছেন তখন রাত দশটা। কল্পনা করলে কেমন অবাক লাগে; তখন ইলেক্ট্রিসিটি নেই, লণ্ঠনের আলো দিয়ে কাজ চলত, অত রাতে ঠাকুর কলকাতার একজন ভক্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছেন। কলকাতার রাস্তায় কোথাও কোথাও গ্যাসের আলো, ঘোড়া গাড়িতে যাচ্ছেন, গাড়িতে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ১৮৮৩ সালের কথা বলছি, আজ থেকে প্রায় একশ চল্লিশ বছর আগের কথা। রাত দশটা এমনিই লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ে। দৃশ্যগুলি ভাবলে সত্যিই কেমন অবাক অবাক লাগে। মাস্টারমশাইর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন।

বাটী ও বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গন চাঁদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, মাস্টার, আর দু-একটি ভক্ত। বৃহৎ চকমিলান বৈঠকখানাবাড়ি, দ্বিতলায় উঠিয়া বারান্দা দিয়া একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্বদিকে আবার উত্তরাস্য হইয়া অনেকটা আসিয়া, অন্তঃপুরের দিকে যাইতে হয়। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে মনে হচ্ছে বাড়িতে যেন কেউ নেই; সামনে কয়েকটা বড় বড় ঘর, আর ঘরের সামনে দীর্ঘ বারান্দা, কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করা ভাব।

তারপর একজন বয়স্ক লোক এলেন, খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী। ভদ্রলোক বৈষ্ণব, ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। অঙ্গে তিলক ও হাতে হরিনামের ঝোলা। কিন্তু বৈষ্ণবদের যা স্বভাব, যেটা এখনও যায়নি, অপরের খুব নিন্দা করা। মাস্টারমশাই এখানে এটাই বলছেন। **কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা শাক্ত বা জ্ঞানীদিগের বড় নিন্দা করিয়া থাকেন**।

স্বামীজীর দেববাণীর উপর আমাদের ১০৯ খানা লেকচার আছে। সমস্ত বাঙালীদের দেববাণীর ব্যাখ্যা শোনা উচিত, কারণ ওখানে শুধু ধর্ম না, আরও অনেক কিছুকে নিয়ে স্বামীজী গভীর আলোচনা করেছেন। দেববাণী হল বর্তমান কালের গীতা। যে কোন সাকার জিনিসের প্রতি ভালবাসা যখন খুব প্রবল হয়ে যায়, তখন কি হয়, ইমোশানটা বেড়ে যায় এবং যার ফলে বুদ্ধি ভ্রমিত হয়ে যায়। সেখান থেকে শুরু হয় ফ্যানাটিসিজিম্; হয় আমার ধর্মে যোগ দাও, তা নাহলে তোমার গলা কাটা যাবে। কোন কারণে গলা যদি কাটতে না পারি, আমার ভগবান তোমাকে নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বৈষ্ণবরা অত দূর যায় না, গলা কাটাকাটিতে নামে না; কিন্তু বাকি সব কিছু এদেরই মত। দক্ষিণ ভারতে শৈব আর বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সমস্যাটা আছে, যদিও সেখানেও গলাকাটাকাটিটা নেই। তবে ধর্মের আড়ালে অনেক কিছুই হয়ে থাকতে পারে। ঠাকুর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈশ্বরকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, যিনি সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ করেছেন, তার মানে তিনি অনন্তের বোধ করেছেন। ঈশ্বরের রূপ যে কেউ দর্শন করতে পারে। যাদের মাথা খারাপ তাদেরও হ্যালুসিনেশন হতে পারে, আবার যাঁরা সাধনা করেন তাঁরাও রূপ দেখেন, রূপ দেখাটা এমন বড় কিছু না। আর সেটাকে আধার করে একটা ধর্ম দাঁড়িয়ে যেতে পারে, সেটাও এমন কিছু না। কিন্তু সচ্চিদানন্দকে জানা, নির্গুণ নিরাকারকে জানা সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা জিনিস।

এরপর ঠাকুর মত পথ এই জিনিসটাকে নিয়েই বলবেন, এটাকে যদি বুঝতে চাই তাহলে তার আগে কয়েকটা জিনিস আমাদের ভাল করে বুঝে নিতে হবে। আপনারা যাঁরা অনেকদিন ধরে আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনে যাচ্ছেন, আপনারা নিশ্চয় অনেক কিছু জেনে গেছেন। শাস্ত্রের মর্ম তো অল্প একটু। সোস্যাল মিডিয়াতে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বামীজীর অনেক কোটেশান থেকে একটা কোটেশান বলুন যেটা আমাদের কাজে লাগতে পারে। আমি বললাম, স্বামীজীর অনেকগুলো কোটেশান নেই, একটাই কোটেশান আছে যেটা মানুষের কাজে লাগবে, দ্বিতীয় আর কোন কোটেশান নেই। ওই

মাত্র একটি কোটেশান হল –সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান তোমার ভিতরে, ওটাকে প্রকাশিত কর। স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী পড়ে দেখুন, এই একটি কথাই স্বামীজী তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে গেছেন। এই একটি কথার বাইরে অন্য কিছু নেই। এটাকেই বেদান্ত বলছেন, তত্ত্বমসি; পুরো বেদান্তের এই একটিই কথা, অন্য কোন কথা নেই –তত্ত্বমসি। এটাকে ধারণা করা খুব কঠিন।

আপনারা যাঁরা আমাদের এই ক্লাশগুলো নিয়মিত শুনছেন, দেখবেন কয়েকটি কথা ঘুরেফিরে বারবার আলোচনায় আসছে। সেই কথাগুলোর মধ্যে একটি কথা হল –*চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*। বিভিন্ন কারণে আমাদের মনে যে ভাবগুলো সব সময় উঠছে, তার মধ্যে কিছু জিনিস আসছে বাইরের জগতে ক্রিয়া হয়ে মনে প্রতিক্রিয়া তৈরী করছে। আর কিছু জিনিস আছে যেটা মনের ভিতরেই আছে, সেগুলোই ক্রিয়া হয়ে ভিতরেই মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এই যে মনের প্রতিক্রিয়া বলছি, এটাকেই মনের ভাব বলা হয়, বৃত্তি বলা হয়। চিত্তের এই বৃত্তিগুলো যত শান্ত হয় তত মনের শক্তি বাড়ে, মন তত শান্তি পায়। চিত্তবৃত্তি শান্ত করার অনেক উপায় আছে, রাজযোগে বিস্তারে সব বলা হয়েছে।

যখন একটি মাত্র বৃত্তি থেকে যায়, যদিও একটি বৃত্তি থাকে না, যখন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করা হয়, করে করে একটি ভাবকে আলম্বন করে থাকেন; যেমন ধরুন একজন মা তাঁর সন্তানকে খুব ভালবাসেন, হঠাৎ খবর এলো সন্তানটি মারা গেছে, মায়ের মন তখন কিছুক্ষণের জন্য সন্তানের ওই একটি বৃত্তিতে আটকে যায়, মা বেহুঁশ হয়ে যান। আমরা যে সমাধির কথা বলি, এটা কিন্তু সেই সমাধি না। একটা জিনিসকে দীর্ঘকাল অভ্যাস করে করে একটা স্তরে নিয়ে এসেছেন, যা একমাত্র ভগবানকে নিয়ে হতে পারে। সাধারণ প্রার্থনাও যদি কেউ করে, হে প্রভু! জানিনা তুমি কেমন, তুমি কি; তাহলেও একটা বৃত্তিতে মন স্থিত হতে পারে। এই এক বৃত্তি যখন হয়, এটাকেই বলছেন ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরজ্ঞান, ঠিক ঠিক হল ঈশ্বরজ্ঞান। ঠাকুর মা কালীর পূজা করছেন, জপ করছেন, সবই করছেন এবং করতে করতে একটা সময় থেকে মায়ের দর্শনলাভের জন্য তিনি ছটফট করতে শুরু করলেন। মা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না। নিজের গলা কেটে দিতে গেছেন, সেখান থেকে মায়ের দর্শন পেলেন। এই যে মায়ের দর্শন, এটাই মায়ের জ্ঞান।

এখানে কোন হ্যালুসিলেশান নেই, চমাৎকারিতার কিছু নেই। অন্যান্য ধর্মের মহাত্মারা যাঁরা সিদ্ধি পেয়েছেন, তাঁদেরও এই অনুভূতি হয়েছে। সেখান থেকে কেউ কেউ ধর্মান্ধ হয়ে গেছেন, আবার অনেকে তা হননি। যাঁদের ধর্মের পরম্পরা আছে, তাঁরা কখনই ধর্মান্ধ হন না। সেখান থেকে যদি আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়, যেখানে ওই একটি বৃত্তি যেটা, সেটাও বিলীন হয়ে যায়; যা কিনা ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কখন হয় না। একটি বৃত্তিরও লয় কার হয়, কেন হয়; কেউ জানে না। কারণ আসলে বৃত্তিবিহীন অবস্থা আর সাধনা করে একটি বৃত্তিতে আসা, দুটো সমান, জ্ঞান দুটোতেই সমান হয়। এটাকেই বলে নিরাকার দর্শন আর সাকার দর্শন, এটাকেই বলে নিরাকার জ্ঞান আর সাকার জ্ঞান। নিরাকার জ্ঞানে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে, অন্য কোন বৃত্তি নেই; তখন আত্মার সাথে লীন হয়ে যান। ফলে ওটা ঠিক জ্ঞান বলা যায় না; আমরা আত্মজ্ঞান শব্দটা বলি ঠিকই, কিন্তু আসলে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে যখন ফেরত আসছেন, তখন ওখানকার বোধটুকু থাকে।

ঈশপ ফেবেলের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। একজন গরীব ভিখারিনী, বয়স হয়েছে, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা বোতল দেখতে পেল। বোতলটা রাস্থা থেকে তুলে নাকের কাছে নিয়ে যেতে মদের সুগন্ধ পেল। বিদেশে আঙুরের রস দিয়ে বিভিন্ন প্রসেসে মদ তৈরী হত, খুব পুরনো প্রথা। গন্ধটা তার ভাল লাগল, তারপর বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই ভিখারিনী বলছে, ভাল জিনিস শেষ হয়ে যায়, তার সুগন্ধটুকু থেকে যায়। দুর্গন্ধের ক্ষেত্রেও তাই হয়। আত্মজ্ঞানে ঠিক সেই রকমই হয়। আত্মজ্ঞানের ওই অবস্থা থেকে যখন ফেরত আসছেন, ওর যে বোধ, সুগন্ধটা থেকে যায়; এখানে সুগন্ধ

শব্দটা ব্যবহার করছেন। আর জগতের প্রতি তার দৃষ্টি পুরো পাল্টে যায়। কিন্তু এনাদের যে শিষ্যরা আছেন, তাঁদের তো সেই আধার নেই, কোন বোধও নেই।

একবার আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম। আমার কামরাতেই তখনকার একজন নামকরা বাবাজীও কয়েকজন চেলাকে নিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় একটা কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানে যাচ্ছেন। একজন চেলা আমাকে বলছেন, পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল –কুছ পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হোঁতে, ঔর কুছ কো পোঁছা দিয়া যাতা হ্যায়। বাবাজী আমার কথাটা শুনে চমকে উঠেছেন। বড় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই ভাবে –একটা হল রিলিজিয়াস মাফিয়া, ভারতে এটা খুব জোরাল; আর একেবারে সত্যি কথা, রিলিজিয়াস মাফিয়া কোন মনগড়া কথা না। এতে কি করে, কোন সাধুবাবা দেখতে ভাল, খুব সুন্দর কথা বলেন; এই ধরণের সাধুবাবাকে সম্মান দিয়ে নিজের খপ্পরে করে নেয়। তাঁকে সামনে রেখে, প্রবচন করে টাকা-পয়সা আয় করে। দ্বিতীয় হল হুজুগে; একজনের কিভাবে কিভাবে নাম হয়ে গেল, এবার লোকজন সব এর পিছনে দৌড়াবে।

এর মধ্যে যে কোন কমিউনিটির লোক হতে পারে। যারা রিলিজিয়াস মাফিয়া তাদের কথা ছেড়েই দিন। কিন্তু যারা হুজুগে যাচ্ছে, সে যার প্রতিই যাক; এনারা ধর্মের ব্যাপারে, শাস্ত্রের কথা কতটুকু বোঝেন? বাচ্চা বয়স থেকে বাড়ির লোকেদের কাছে যতটুকু শুনে এসেছেন, ততটুকুই বোঝেন। পরিবার থেকে যতটুকু জ্ঞান পেয়ে এসেছেন, ওই জ্ঞানটুকু ছেড়ে বেরিয়ে আর এগিয়ে যাবে না। আমাদের ঠাকুরের ভক্ত যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন, ওই প্রথমের দিকে অল্প একটু যা শিখেছেন, যেভাবেই শিখে থাকুন, কোন বই পড়ে হোক, কোন মহারাজদের সঙ্গ করে হোক, বাড়ির পরম্পরা থেকে হোক; সেখান থেকে কিছুতেই বেরোতে পারে না। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে, ওর বাইরে মস্তিষ্ক যেতে পারে না। মনের একটা স্বভাব, মন খাটতে চায় না। আমরা যখন পড়াশোনা করতাম, আমরা পড়তে চাইতাম না। ধর্মের জ্ঞান আরোহণের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা হয়, এগোতে পারে না। কিন্তু তার অস্তিত্ব, তার সম্মান, তার সমস্ত কিছু দাঁড়িয়ে আছে, যাঁকে সে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। এখান থেকেই এসে যায় ফ্যানাটিসিজিম্।

এর খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখবেন আমাদের গীতা প্রেসের দিকে যদি তাকান। গীতা প্রেস একা হিন্দু ধর্মকে বাঁচিয়ে দিল, এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। কি সাংঘাতিক কাজ করছে গীতা প্রেস কল্পনাই করা যায় না, বাড়ি বাড়ি হিন্দু ধর্মের বইগুলিকে পৌঁছে দিচ্ছে, তাও আবার খুবই কম মূল্যে। আমি একমাত্র গীত প্রেসের বইকেই বিশ্বাস করি, অন্য কারুর অনুবাদকে আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদকে অতটা বিশ্বাস করি না, যতটা গীতা প্রেসকে করি। কিন্তু গীতা প্রেস হল পুরোপুরি মারোয়াড়িদের হাতে। মারোয়াড়িদের ধর্মের ব্যাপারে কতকগুলো নিজস্ব ধারণা হয়ে আছে; সবচেয়ে বড় হল, মাংস খাওয়া চলবে না। যার জন্য যে বইতে মাংসের ব্যাপার আছে, সেই বইএর অনুবাদ পর্যন্ত করবে না। দ্বিতীয়, যদি মাংস খাওয়ার ব্যাপার থাকে, যেমন মহাভারতে আছে, বাল্মীকি রামায়ণে আছে, সেখানে ওর বিচিত্র অর্থ বার করবে। গীতাপ্রেস প্রণম্য, আমার খুব ইচ্ছা যদি কোন দিন গোরক্ষপুর যাই, গীতাপ্রেসে গিয়ে প্রণাম করে আসব, কারণ আমার ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান আপনাদের জন্যই হয়েছে। কিন্তু ওদের ওই গোঁড়ামিটা যাচ্ছে না, কোন দিন যাবেও না, কারণ ওই গোঁড়ামি একটা শক্তি দেয়। ভারতবর্ষে কিছু ধর্ম আছে, যাদের সাংঘাতিক শক্তি, কারণ গোঁড়া। যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন যে এরা প্রচণ্ড গোঁড়া। এরপর এরা আর এগোতে পারবে না। এই জিনিসটাকেই ঠাকুর এবার বলছেন। মূল জিনিসটা বুঝে নিলেন, এবার ঠাকুর কি বলতে চাইছেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে পারবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্ত ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) –আমার ধর্ম ঠিক, আর অপরের ধর্ম ভুল – এ মত ভাল না। একটা হল আত্মবিশ্বাস; আমার মা সবচেয়ে ভাল, এই ভাব মানুষকে একটা শক্তি দেয়। আমার স্ত্রী সবচেয়ে ভাল, এই বোধ থাকলে তার চোখ আর এদিক-সেদিক যাবে না। ইংলিশে

একটা নোংরা শব্দ আছে 'roving eye', চোখ নাচতে থাকে, এর দিকে, ওর দিকে তাকাতে থাকে। একবার যদি এই বিশ্বাস হয়ে যায়, আমার স্ত্রীর মত ভাল স্ত্রী আর নেই, তার চোখ অন্য কোন দিকে কখনই যাবে না। ঠিক তেমনি কোন স্ত্রী যদি স্বামীকে নিয়ে বলে, পতি পরমেশ্বর, ওই স্ত্রীর দৃষ্টি আর কোন দিকে যাবে না। সে হয়ত ভাল স্ত্রী নাও হতে পারে, আমার স্বামী পরমেশ্বর নাও হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তারা এইটাই। ঠাকুর পরম্পরাগত একটা কথা বলছেন –যদিও আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। জিনিসটা ঠিক, কিন্তু সেখান থেকে অপরকে নিন্দা করা, এটা কোন মতেই ঠিক না।

এই যে আমি তথাকথিত গুরুদের কথা বললাম, যাদের পিছনে রিলিজিয়াস মাফিয়ারা আছে, ওনাদেরও কিছু সিদ্ধাই তো আছে, কিছু জপধ্যান করেছেন বলেই আজ তার যতটুকু সিদ্ধাই আছে, যতদিন এই সিদ্ধাইটুকু থাকবে তার নামযশ থাকবে, ততদিন তার অনুগামীরা থাকবে, শিষ্য-শিষ্যা, ভক্ত-ভক্তানি থাকবে। সিদ্ধাই হল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মত, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কমে গেলে আস্তে আস্তে সব সিদ্ধাই বিলীন হয়ে যাবে। আমার তো কোন সিদ্ধাই নেই, সিদ্ধাই থাকলে লোকেরা আমার পিছনে দৌড়াত। কাউকে তো আমার পিছনে দৌড়াতে দেখি না, তার মানেই আমার সিদ্ধাই নেই, তাই নিন্দা করারও আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু জিনিসটা জানি এর মধ্যে কি গোলমাল হয়। ওনার যা হচ্ছে হোক, সেটা ওনার ব্যাপার; কিন্তু ওনার পিছনে পিছনে যাঁরা আছেন, তাঁরা যে কি প্রচণ্ড গোঁড়া হয়ে যায়, কি জঘন্য রকম হিংস্র হয়ে যায় যে, বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজে দেখেছি; আমার বাল্যবন্ধুদের দেখেছি এই গুরু সেই গুরুর পিছনে দৌড়াতে, সেখান থেকে তাঁরা এমন গোঁড়া হয়ে গেছেন যে, আমি কল্পনাই করতে পারি না। এগুলো কখনই ভাল না, আর সেইজন্যই তো ঠাকুর এসেছেন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য; লোকেরা জানুক ধর্ম কি।

ঠাকুর বলছেন, **ঈশ্বর এক বই দুই নাই**। আপনাদের যদি মনে থাকে, এক্ষুণি বলা হল নির্গুণ নিরাকার যিনি তিনি কিভাবে সগুণ সাকার হয়ে দেখা দেন। নির্গুণ নিরাকারকে কখন দেখা যায় না, শুধু বোধে বোধ করা যায়। এই যে সগুণ সাকারের দর্শন হয় –এটা খুব ইন্টারেস্টিং। সগুণ সাকারে আপনার ওটারই দর্শন হবে, যেটা আপনার মন আপনাকে তৈরী করে রেখেছে, আপনার সমাজ আপনাকে যেমনটা তৈরী করে রেখেছে। যার জন্য দেখবেন খ্রীশ্চানদের এক রকম, মুসলমানদের আর-এক রকম, ভগবান বুদ্ধের আবার অন্য রকম, হিন্দুদের যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রকম। আসলে অজান্তে সবাই সেই সগুণ সাকার সচ্চিদানন্দকেই চাইছেন।

প্রথম যখন এ্যটম বোমা ফাটানো হয়েছিল, সেই সময় বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ ঘরে রাখা হয়েছিল, কারণ ওই এ্যটমের ব্রিলিয়েন্স এত বেশি হবে যে খালি চোখে দেখা যাবে না। সেইজন্য সবাইকে বিশেষ চশমা দেওয়া হয়েছিল, যার যেমন চশমা সে তেমন দেখবে। নির্গুণ নিরাকারের ওই অর্থে ব্রিলিয়েন্স থাকে না। আর নির্গুণ নিরাকারের কি ব্যাখ্যা করবে, কারণ যে মন ব্যাখ্যা করবে, সেই মনই তখন থাকে না, তার আগেই মনের লয় হয়ে যায়। যে সমাজে, যে পরিবারে আপনি বড় হয়েছেন, সেখানকার একটা প্রভাব মনের উপর পড়ে। আর আপনি কেমন? আপনার নিজের মন যেমন, এই দুটোকে মিলিয়ে মন একটা রূপ ধারণা করে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ সেই সচ্চিদানন্দকে ওই ধারণা নিয়েই দেখবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর এক বই দুই নাই।

তাহলে আমরা সব কিছু আলাদা দেখছি কেন? আমাদের মনের জন্য। যীশু খ্রীষ্ট এক রকম দেখলেন, প্রফেট মহম্মদ আর-এক রকম দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আর-এক রকম দেখলেন। এনারা কি আলাদা কিছু দেখছেন? অন্যরা বুঝুক না বুঝুক, আর ওরা বুঝবেও না, কারণ ওদের এই বিদ্যার সম্প্রদায় নেই; আমাদের সম্প্রদায় আছে, পরম্পরা আছে, আমরা জানি কেন এই রকম হয়। কিন্তু আমাদের ভাব আমাদেরই ভাব। আমি জানি শিব যা, বিষ্ণুও তাই, রামও তাই, কৃষ্ণও তাই। কিন্তু

আমার ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, তাই বলে অন্যদের মানব না? একেবারেই না, সবাইকে মানি, আমরা সবার সামনে মাথা নত করি। এমন এমন সব গোঁড়া লোক আছে, এটাকে নিয়ে ইউটিউবে ক্রমাগত আক্রমণ করে যাচ্ছে। বলছে, 'আপনারা যীশু খ্রীষ্টের পূজা বন্ধ করুন'। এনাদের প্রথমে বলব, আমি কি করব, কি করব না, আপনি বলার কে? আপনার পছন্দ না হয়, আপনি খ্রীষ্টের পূজা দেখতে আসবেন না। আমাদের প্রথা তো আমরা পাল্টাতে পারব না। কারণ আমরা জানি, যীশুও একজন ধর্মগুরু, তাঁকেও আমার প্রণাম করি।

তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক ডাকে। এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ মন যেখানে আছে সেখানে রূপ এসে গেছে, রূপ এসে যাওয়া মানে নামও এসে গেল। কিছু কিছু ধর্ম খুব নির্গুণ নিরাকারের কথা বলে হিন্দুদের বলবে এরা পৌত্তলিক। অনেক দেশে নিষেধ আছে, সেখানে দূর্গাপূজা করা যাবে না, কারণ আমরা নাকি পৌত্তলিক। আরে ভাই, তুমিও তো তোমার ঈশ্বরকে নাম ধরে ডাকছ, এতে তুমিও তো পৌত্তলিক হয়ে গেলে। অবশ্য এসব জিনিস বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। ধর্মকে বোঝার এত ক্ষমতা যদি তোমার থাকত, তুমি তো তাহলে হিন্দু হয়ে জন্মাতে। যতক্ষণ হিন্দু হয়ে না জন্ম নেবে ততক্ষণ ধর্মকে ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না। একজনকে একবার বিরক্ত হয়ে আমাকে বলতে হল –গরুর মাংস খাবে আর ধর্ম বুঝবে, তা কি কখন সম্ভব। কোন ভাবেই সম্ভব না।

কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে –একঘাটের লোক বলছে জল, আর-একঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর-একঘাটের লোক বলছে পানি –হিন্দু বলছে জল, খ্রীষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি –কিন্তু বস্তু এক। মত –পথ। মত –পথ এই ব্যাপারটা আসে সগুণ সাকার স্তরে, নির্গুণ নিরাকারে থাকে না। দ্বিতীয় যেটা, তা হল, একমাত্র হিন্দুরাই জানেন যে এটা মত–পথ। মত–পথের অর্থ হল, হিন্দিতে খুব সুন্দর দুটো শব্দ আছে পথ –পংথ, অনুস্বারের তফাৎ। পথ বলতে রাস্তা আর পংথ মানে মতুয়ার বুদ্ধি। ঠাকুর এটাই বলতে চাইছেন, বিভিন্ন ধর্ম হল পথ, এটাকে পংথ বানিয়ে দিও না। পংথ বানালে কি হবে, বুদ্ধিটা সীমিত হয়ে গেল, সীমিত বুদ্ধি মানেই কলুষিত বুদ্ধি।

যে কোন জিনিসকে যদি বেঁধে দেওয়া হয়, সেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। সরকার জেলে পাঠায় কেন? আসামীকে একটা বেড়ার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল। বেঁধে দিলে ওর শরীর, মন সব কুঁকড়ে যায়, ধীরে ধীরে ওর বুদ্ধিটাও নষ্ট হয়ে যাবে। বেলুড় মঠে হঠাৎ একবার রব উঠেছিল –we are a sectless sect। Sectless sect এটা আবার কি জিনিস? আমার জানা নেই। এক সময় খুব উঠেছিল, ইদানিং আর কেউ বলে না –আমরা সম্প্রদায়হীন সম্প্রদায়, যেমন বর্তমান কালে ভারতবর্ষে একটা প্রজাতি এসেছে, তার নাম লিবারাল। We are liberal, ওরা নিজেদের ব্যাপারে লিবারাল, অপরের ব্যাপারে গোঁড়া। আসলে নিজেদেরও অতটা বুদ্ধি নেই, যা বুদ্ধি আছে ওটা দিয়ে অপরকে ঠকানোর কাজে লাগে।

এক-একটি ধর্মের মত এক-একটি পথ, –ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়। এখানে ঠাকুর সাগরসঙ্গম যেটা বলছেন, এই সাগরসঙ্গম শব্দ দিয়ে তিনি নির্গুণ নিরাকারকে বলতে চাইছেন। আসলে সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু যেমনি মনের মধ্যে বৃত্তি এসে যায়, তখন এই বৃত্তির জন্য আমরা জগতে বহু দেখি। মনে একটা বৃত্তি যখন থাকে তখন তিনি ঈশ্বর রূপে দেখেন। যখন ওই একটি বৃত্তিও শান্ত হয়ে গেল, তখন দেখবেন, আপনিই সেই; দেখেন না, বোধে বোধ হয়। বহু বৃত্তি যখন থাকে তখন তিনি জগৎ রূপে দেখান। আসলে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই কিনা। আপনার যে সন্তান, সেও ঈশ্বর। আপনি সন্তানকে ঈশ্বররূপে দেখছেন না কেন? কারণ, আপনি যে আরও দশটা জিনিস দেখছেন। আপনার স্বামী/স্ত্রীকে দেখছেন, ভাসুরকে দেখছেন, শ্বশুর শাশুড়িকে দেখছেন, ভাই-বোনকে দেখছেন, জগৎ দেখছেন। যখন বহু

দেখছেন, তখন সেই সচ্চিদানন্দ জগৎ রূপে দেখান। এরপরেই ঠাকুর যে কথাটা বলছেন, এই কথাটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন।

বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদাননদ (শিব)। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।

এই জিনিসটাকে বোঝা একটু কঠিন হবে। ধৈর্য ধরে মন দিয়ে শুনতে থাকলে একটু বুঝলেও বুঝতে পারবেন। আজ থেকে ভারতবর্ষের দশ হাজার বছর পিছনের দিকে যদি চলে যাওয়া যায়, যার ইতিহাস আর আমাদের কাছে নেই আর কোন দিন জানাও যাবে না, যেখান থেকে কেবল মাত্র যেন কয়েকটা পরম্পরা চলে আসছে। যাঁরা শাস্ত্র জানেন, শাস্ত্রের ইতিহাসকে যাঁরা একটু নেড়েচেড়ে দেখেছেন, তাঁরা পরিষ্কার তিনটি পরম্পরাকে দেখতে পান –একটা বেদের পরম্পরা, দ্বিতীয় পুরাণের পরম্পরা আর তৃতীয় তন্ত্রের পরম্পরা। তিনটি পরম্পরার তিনটি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। বেদ হল যজ্ঞ প্রধান, পুরাণ পূজা প্রধান আর তন্ত্র মন্ত্র-যন্ত্র প্রধান। এত আগেকার কথা যে, আমরা এখন গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি না, আগে কে এসেছে, পরে কে এসেছে। তন্ত্র মতে শিব আর শক্তির প্রাধান্য, পুরাণ মতে ভগবান বিষ্ণুর প্রাধান্য আর বেদে বিভিন্ন দেবীদেবতাদের প্রাধান্য।

পুরাণের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর অনেক কাহিনীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তার সাথে বিষ্ণুর একটা বিশেষ ক্ষমতা তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন, এটাকে বর্ণনা করা। এই তিন পরম্পরার মধ্যে বেদের সম্মান সব থেকে বেশি। কম বয়সে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে, যারা ভাল ছাত্র তারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়, কিছু ডাক্তারী পড়তে যেত, কিন্তু আমরা জানতাম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া মানে সে একজন উচ্চমানের ছাত্র। ভারতের আজকের যারা শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের তারা সবাই আইটি ইণ্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে। অন্যান্য জায়গাতেও যাচ্ছে, স্পেস রিসার্চেও যাচ্ছে, কিন্তু আজকে এটা পরিষ্কার যে শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক আইটি ইণ্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে। ঠিক সেইভাবে তখনকার দিনে দেশের বেস্ট ব্রেন মানেই সে বেদের পরম্পরার। বেদ পরম্পরা সবচেয়ে পাওয়ারফুল ছিল।

অন্য দিকে তন্ত্র পরম্পরার সম্মান সব থেকে কম ছিল। কিন্তু তারা যোগ ভোগ সব কিছু দিয়েই যেতেন। আর পুরাণ পরম্পরা, খুব পরিষ্কার করে তাদের কিছু নেই। কিন্তু একটা সময় থেকে মানুষ যজ্ঞ থেকে সরে এসে পূজা, কাহিনীর দিকে বেশি পরিমাণে ঝুঁকতে শুরু করে। পুরাণ একদিকে বেদকে নিচ্ছেন, অন্য দিকে বেদের নিন্দাও করেন। ভাগবত আদি পুরাণের অনেক জায়গায় বেদের অনেক নিন্দা করা হয়েছে। আবার বেদের অনেক কিছু পুরাণ নিয়েছেন। অন্য দিকে তন্ত্রের মতকেও পুরাণ অনেক জায়গায় নিয়েছেন। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন যে, ভারতবর্ষে বেশির ভাগ জায়গায় পৌরাণিক মত ও তন্ত্র মতের প্রাধান্য, বেদ মত উঠেই গেছে। এখানে আমি আপনাদের একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখালাম, এটা আপনি কোন বইতে পাবেন না। অনেক বছর এই জিনিসগুলিকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেছি বলে বুঝে গেছি জিনিসটা কি।

কিন্তু বেদের সম্মান প্রথম থেকে এত বেশি যে, যার জন্য পুরাণ নিজেকে ধীরে ধীরে বেদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। যদিও মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকরা বলবেন পুরাণ হল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, কিন্তু একেবারেই তা নয়। পুরাণ সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র, তবে অনেক কিছু তাঁরা যেমন বেদ থেকে নিয়েছেন, অন্য দিকে তন্ত্র থেকেও কিছু নিলেন। যার জন্য আজকে আমরা যে হিন্দু ধর্মকে দেখছি এটা আসলে পৌরাণিক প্রধান। বেলুড় মঠের আমরা সন্ন্যাসীরা নিজেদের বৈদিক বলি, কিন্তু আসলে পৌরাণিক। যেমন আমাদের এখানে সরস্বতী পূজা পুরোটাই পৌরাণিক নিয়মে হয়ে থাকে। দূর্গাপূজা, পুরো পৌরাণিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়। দূর্গাপূজাতে যে চণ্ডীপাঠ হয়, এটা সরাসরি আসছে পুরাণ থেকে। পূজার অনেক মন্ত্র পুরাণে পাওয়া যায়, কিছুটা আবার তন্ত্র থেকে নেওয়া হয়। কারণ তন্ত্র হল মন্ত্রের খনি। তন্ত্র

পরে কি করলেন, নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তন্ত্র পৌরাণিক পরম্পরায় কিছু কিছু কাহিনী তৈরী করলেন আর বিধি-বিধানগুলিকে বেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিলেন। পুরাণ হল মহাসমুদ্র, সে সবাইকে নিজের ভিতরে শুষে নিচ্ছে। সেখান থেকে হয়ে গেল ব্রহ্মা কেন্দ্রিক পুরণ, বিষ্ণু কেন্দ্রিক পুরাণ, শিব কেন্দ্রিক পুরাণ।

ঠাকুর কোথা থেকে এই জিনিসটা পেলেন বলা খুব মুশকিল, কারণ এটা যে খুব প্রচলিত কথা, তা একেবারেই না। হিন্দুদের যে তিনটে মত –বেদ মত, পুরাণ মত ও তন্ত্র মত; ঠাকুর যখন শাক্ত ও বৈষ্ণব মত বলছেন, আসলে শাক্ত তন্ত্র মত থেকে আসে আর বৈষ্ণব পুরাণ মত থেকে আসে। কিন্তু পুরাণ অন্য দিকে আবার শক্তি জিনিসটাকেও নিয়েছেন, যেমন মার্কেণ্ডেয় পুরাণে এসে গেল শ্রীশ্রীচণ্ডী। এই হল কিছু টেকনিক্যাল আলোচনা। কথামৃত আমাদের মূলগ্রন্থ, মূলগ্রন্থকে সম্যক রূপে বোঝা বা ধারণা করার জন্য মূলগ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আনুষাঙ্গিক অনেক কিছু জানতে হয়। অনেক বলবেন, এত কিছু জানার কি দরকার? তাহলে আর বই পড়ারই বা কি দরকার, ঠাকুরের মন্ত্র পেয়ে গেছেন, আপনি তো ধন্য হয়ে গেলেন, আর বই পড়ার কি দরকার। এক্ষুণি একজন বৈষ্ণবভক্ত বলবেন, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন; তাই এই বইগুলো পড়বই বা কেন, এই ব্যাখ্যাগুলো শুনবই বা কেন, সব একই জিনিস। ঠাকুর এটাই বলছেন, আসলে সবটাই সেই সচ্চিদানান্দ। মহানির্বাণতন্ত্রেও এই ভাব, সেখানে বলছেন –*সচ্চিদেকম্ শিব*।

এই সচ্চিদানন্দকে তিনটে পরম্পরাই কমন করে রাখলেন; পুরাণেও রাখলেন, তন্ত্রেও রাখলেন আর বেদে তো আগে থেকেই ছিল। ঠাকুর এখানে একেবারে একটা প্ল্যাটফর্মে এনে বলে দিলেন – সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব। পুরাণ মতে ভাগবতে কৃষ্ণের কথা বেশি। সেইজন্য দেখবেন, কৃষ্ণনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। মহাভারত, পুরাণেরও অনেক আগে যদিও বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভক্তিভাব নিয়ে বাল্মীকি রামায়ণের রামচন্দ্রের নাম ছড়ালো অনেক পরে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৃথক পৃথক রামায়ণ গ্রন্থের মাধ্যমে রামের নাম ছড়িয়ে গেল। কিন্তু ঠিক ঠিক পৌরাণিক পরম্পরা হল শ্রীকৃষ্ণের। যার জন্য আমাদের পণ্ডিতরা এর নামই দিলেন ইতিহাস-পুরাণ। বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ সব কটাকে মিলিয়ে বলা হয় ইতিহাস-পুরাণ।

অন্য দিকে মনুস্মৃতির মত স্মৃতিমূলক যত শাস্ত্র আছে, ওনারা বেদ ও পুরাণ দুটোকে মিলিয়ে নিজেদের শাস্ত্রে রেখে দিয়েছেন, সেখানে তন্ত্রের কোন স্থান নেই। স্মৃতি যখন লেখা হয়েছিল, তখনও তন্ত্র মূল স্রোতে আসেনি।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এবার বৈষ্ণবভক্ত সেই নামকরা প্রশ্ন করছেন।

বৈষ্ণবভক্ত –মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন? খুব সুন্দর প্রশ্ন। এই যে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বরকে ভাবব কেন, তিনি নিজে কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত। প্রথম যে জিনিসটা আসছে, এটা আপনাদের সবার জন্য খুব দরকারী। এই প্রশ্ন থেকেই আমাদের প্রশ্ন আসবে, কথামৃত পড়বই বা কেন? সেখান থেকে আবার এই প্রশ্ন আসে, মহারাজের এই ব্যাখ্যাগুলো শুনবই বা কেন?

আসলে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে –ঈশ্বর বলতে কি? এক্ষুণি ঠাকুর যেটা বললেন, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। আমাদের অনেকগুলো সত্তা আছে। আমার দেহরূপে সত্তা আছে, ইন্দ্রিয়রূপে সত্তা আছে, মনরূপে সত্তা আছে আর আত্মারূপে সত্তা আছে। দেহ সীমিত, মন দেহের তুলনায় বেশি স্বাধীন, আর আত্মারূপে আমি পূর্ণ স্বাধীন। এই যে ঠাকুর কথা বলছেন, ঠাকুরের যে শরীর, এটা তো মিথ্যা না। ঠাকুরের শরীরকে যদি মিথ্যা বলে মেনে নিই, তাহলে তো সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যাবে। ঠাকুরের যে মন, সেই মন দিয়ে এই কথাগুলো বেরোচ্ছে, মনটাকে, দেহটাকে মিথ্যা বলা যাবে না। কিন্তু আসল ঠাকুর হচ্ছেন, যিনি অনন্ত। শুধু যে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বরই শুধু যে অনন্ত, তা না। ঈশ্বর

হলেন আমার নিজের অনন্ত সত্তা। কোন হিন্দু নেই, যে মানবে না যে, আমার হৃদয়ে অন্তর্যামীর বাস। কিন্তু সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর, ওটাই আসল। এই নয় যে আপনি একটা আর অন্তর্যামী আর-একটা। ধ্যানের গভীরে এই অন্তর্যামীকেই আপনি সাক্ষাৎ করবেন।

আগেকার দিনে, বা এখনও হয়ত থাকতে পারে, অনেক পরিবারে একজন করে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান থাকতেন। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান যে রোগটা সারাতে পারেন না, তখন রোগীর চিকিৎসার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা এমডি ডাক্তারদের কাছে যান। উনিও যদি না পারেন, তখন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। যখন সাধারণ দিয়ে কাজ হয় না, তখন একটু বিশেষে যেতে হয়। ওই বিশেষে যদি কাজ না হয়, তখন সুপার ডুপার স্পেশালিটিতে যেতে হয়। স্বামীজীর একটা নামকরা ঘটনা আছে।

খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা হল, স্বামীজী এক সময় মিঃ লেগেটের সঙ্গে ওনার বাড়িতে ছিলেন। লেগেটের একটা আটটি গর্ত বিশিষ্ট গলফ্ খেলার মাঠ ছিল। স্বামীজী ও লেগেটের ছেলের মধ্যে একটা বেটিং হল। স্বামীজী বললেন, ‘আমি একটা স্ট্রোক মারব আর বলটা অনেক দূরে অষ্টম গর্তে গিয়ে পড়বে’। তিনি মারলেন আর সত্যিই এক স্ট্রোকে গর্তের মধ্যে গিয়ে বল পড়ল। লেগেট তো দেখে অবাক, তিনি জিজ্ঞেস করছেন, ‘স্বামী! আপনি যে যোগগুলো শেখান, এর সাথে কি সেই যোগের কোন সম্পর্ক আছে’? স্বামীজীর উত্তরটা খুব মজার। ‘আমরা যোগকে এত সাধারণ জিনিসে নামাই না’। অতি সুন্দর ও খুব মূল্যবান কথা –যোগকে আমরা এত সাধারণ জিনিসে নামাই না।

স্বামীজী এরপর বলতে লাগলেন, ‘আমি আমার মনকে বললাম, মিস্টার লেগেট দশ ডলারের বাজি লাগিয়েছেন, ওই দশ ডলার যেন আমার পকেটে চলে আসে। আমার মন আমার পেশীকে আদেশ করে দিল, বাকি কাজ পেশী কর দিয়েছে’। খুব মজার ঘটনা। অনেক কিছু আছে যেটা আমরা আমাদের শরীর দিয়ে করি, অনেক সময় যখন আমরা শরীর দিয়ে পারি না, তখন মনকে লাগাতে হয়। যেমন ধরুন, আপনাকে কোন একটা পরিস্থিতিকে নিয়ে প্রশ্ন করা হল; আপনি যদি ওই ব্যাপারে একজন দক্ষ হন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলে দেবেন, এই করে দাও। যদি দক্ষ না হন তাহলে আপনি বলবেন, দাঁড়াও আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে। তার মানে আপনার যে ইনস্ট্যান্ট মন, যে মন দিয়ে সংসার চালানো হয়, সেটা দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না।

ঠিক তেমনি সুপার সুপার পাওয়ার হলেন আপনারই অনন্ত সত্তা, যাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। স্বাভাবিক যে, আপনি সেখানে যাবেন না। কখন যাবেন না? যখন এই শরীর দিয়ে হবে না, মন দিয়ে যখন হবে না; যখন আপনার মনে হবে আমি সীমিত, যখন আপনার মনে হবে যে, যা চাই তা পাচ্ছি না; আমাকে আরও বড় হতে হবে, আমাকে আরও মহৎ হতে হবে; যখন শরীর আর সাথ দেবে না, মন অতটা সাথ দেবে না, তখন সেখানে যেতে হয়। তার মানে, ঈশ্বরকে দরকার নিজেকে বড় করার জন্য। কত বড়? অসীম। যখন আপনি নিজেকে অসীম করতে চাইবেন, তখন আপনার ঈশ্বরকে দরকার হবে। আবার কিছু পরিস্থিতি হয়ে যায়, যেমন ধরুন আপনার কোন প্রিয়জনের শরীর খুব খারাপ হয়েছে। বাড়ির ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করে হল না, স্পেশালিস্ট দিয়ে হল না, সব রকম প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেছে। ডাক্তার আপনাকে বলে দিলেন, ঈশ্বরের উপর ভরসা করুন, আমাদের আর কিছু করার নেই। তার মানে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান, তিনি কিন্তু শুধু সবচেয়ে ক্ষমতাবান নন; এই যে যত সত্তা আছে, তিনিই সব কিছুকে সত্তা দেন। এই যে ঈশ্বর, যিনি শুদ্ধ আমি, আমার যে শুদ্ধ রূপ, আমার যে বিশুদ্ধ অনন্ত রূপ, এটাই ঈশ্বর। তিনিই সব কিছুকে সত্তা প্রদান করছেন। আপনি বলতে পারেন এটা তো ক্রাইসিস, বাকি গুলো? না, এটা হল আমার আসল রূপ, এটাই হল আমার পয়েন্ট অফ রেস্ট।

আমরা অনেকবার পেণ্ডুলামের উদাহরণ দিয়েছি। পেণ্ডুলাম যে জায়গাতে সবচেয়ে বেশি অস্থির থাকে, ওখানেই শান্তি পায়। যেটা রেস্ট, সেখানে বুম্ করে বেরিয়ে যায়। আমাদের ঠিক এই দুরবস্থা।

যেটা আমাদের স্বরূপ, সেটা থেকে আমরা বুম্ করে পালিয়ে যাই। যেখানে আমাদের বেশি অশান্তি, সেই সংসারকেই আমাদের বেশি শান্তির জায়গা বলে মনে হয়। ঠাকুরের গল্প –নারদ সবাইকে মুক্তি দিতে চাইছেন। একটা গুবরে পোকাকে বললেন, 'কি সারা জীবন গোবরের মধ্যে পড়ে থাকিস, চল তোকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব'। গুবরে পোকা বলছে, 'বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন ভাল, কিন্তু আগে বলুন তো ওখানে ভাল গোবর পাওয়া যাবে কিনা'?

জীবনে যদি শান্তি চান, জীবনে যদি সুখ চান, তাহলে আগে শক্তি অর্জন করুন; ঈশ্বর ছাড়া গতি নেই। কারণ আপনার শরীরের ক্ষমতা সীমিত, তাই সে সীমিত জিনিসই দেবে; মন সীমিত থেকে একটু বেশি দেবে। কিন্তু আপনার যে অনন্ত স্বরূপ, অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ, অনন্ত বিশ্রাম সব কিছু অনন্তই দেবে। সমস্যা কি হয়, ভক্তরাও যাঁরা আছেন, যাঁরা এগুলো পড়েছেন বা শুনেছেন, আমরা এগুলো পাওয়ার যোগ্য না, কারণ আমাদের সেই নিষ্ঠা নেই। মাঝখানে বলা হল, কথামৃত কেন পড়ব? আপনার যে অনন্ত স্বরূপ, এই অনন্ত স্বরূপের বর্ণনাই কথামৃতের পাতায় পাতায়। ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন, একেবারে বিশুদ্ধ বেদান্তের কথা। শুধু এর মধ্যে আগে যেটা বলা হল –বেদমত, পুরাণমত ও তন্ত্রমত, এর সমস্ত কিছু কথামৃতে আছে। কিন্তু সমস্ত কথা তো সচ্চিদানন্দরই কথা, কথামৃতে আর কি আছে সব তো আপনারই কথা। কোন আপনির কথা, আপনি যে দেহ তার কথা না, আপনি যে মন তার কথা না। আপনার দেহ মনকে নিয়ে যেগুলো আছে, সেগুলোকে মজা করে পরিহাস করে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে আপনার যে অনন্ত রূপ, তার বর্ণনা করা আছে।

কথামৃতকে কেন জানবেন না? আপনি যাকে ভালবাসেন, তার ব্যাপারে আপনি কত কি জানতে চান। আমাদের মিশনের একটা স্কুলে একটি ছাত্র কি একটা দুষ্টুমি করেছিল। ওকে একটা ডাইরি দিয়ে বলে দেওয়া হল, তোমার মনে যা যা কথা আসে সেগুলো এতে লিখবে। অনেক দিন পর আমাদের এক মহারাজের ইচ্ছে হল, দেখি তো ছেলেটি ডাইরিতে কি লিখছে। সেই ছেলেটা ডাইরিটা মহারাজকে দিতে চাইছে না। যাই হোক, শেষে দিল। ডাইরিটা নিয়ে দেখছেন যত ফিল্মস্টার, নায়িকার ছবি বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে কেটে ডাইরির মধ্যে সেঁটে রেখেছে। ওর মন ওখানেই পড়ে আছে, ওটাকেই ভালবাসে, ওই ছবিগুলোই সাঁটিয়ে রেখেছে। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে জানতে চায়, তার স্মৃতি রাখতে চায়। আপনি যদি সত্যিকারের ঈশ্বরের পথের পথিক হন, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আপনি কথামৃত পড়বেন, কথামৃতের ব্যাখ্যা শুনবেন। কিন্তু সবাই তো এই রকম নয়। ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন? বৈষ্ণবভক্ত এই প্রশ্ন করাতে এবার ঠাকুর বলতে শুরু করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এ-বোধ যদি থাকে, তাহলে তো জীবনমুক্ত। ঈশ্বরের দুটো রূপ, যেটা আগে বলা হল, নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকার। সগুণ সাকার যিনি, তিনি হলেন নিয়ন্তা; তিনি ঈশন্ করেন, ঈশন্ শব্দের অর্থ শাসন করা। কিন্তু আমাদের যেটা বাস্তব রূপ –আমরা অনন্ত, অনন্তই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এটা যে জেনে গেছে সে তো জীবনমুক্ত, সে কেন আর সাধনা করবে, কেন সে আর প্রার্থনা করতে যাবে। আচার্য শঙ্করও এই কথা বারবার বলছেন, একবার যখন জেনে গেল, তুমিও যা আমিও তাই, তখন কে কার পূজা করবে, কে কার গোলামী করবে, কে কার দাসত্ব করবে, কেনই বা করতে যাবে? দ্বিতীয়, সে হয়ত ঈশ্বরকে মানেই না, সেটা আলাদা কথা। তুমি ঈশ্বরকে না মানতে পার, কিন্তু নিজেকে তো মানো; নিজের মনকে তো মানো, মনের শক্তিকে তো মানো, মনের শান্তিকে তো মানো, মনকে যে একাগ্র করতে হয়ে সেটা তো মানো, বাকিটা তুমি করে দেখ, তুমি নিজেই জানতে পারবে, বৃথা তর্কাতর্কির কি দরকার, মাঠে নামো। বাকিরা যারা ধর্ম, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলে বেড়ায়, এদের নিষ্ঠা নেই; এদেরকে নিয়ে এখানে কোন আলোচনা করা হচ্ছে না।

কিন্তু সকলের এটি বিশ্বাস নাই, কেবল মুখে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ-সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে –বিশ্বাস করে না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনারা আমাদের

লেকচারগুলো নিষ্ঠা সহকারে শুনছেন, আপনারা ধন্য। তবে একটু প্রস্তুতি যদি না থাকে, এই কথাগুলো ধারণা করা অসম্ভব। বিশেষ করে যে কথা এখানে ঠাকুর বলছেন –ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হচ্ছে, ঈশ্বরই সব করছেন; এটা বিশ্বাস হবে না। আমাদের ইউটিউবে এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার, যাঁরা এই তথ্যটা জানেন, তাঁরা প্রায়ই এই একটি কথা জিজ্ঞেস করেন –আচ্ছা, ইউটিউব থেকে কত টাকা দিচ্ছে? এর কি উত্তর দেব? সত্যিই তো আমরা তো কোন টাকা নিই না। আপনারা যে বিজ্ঞাপন দেখেন, ওখানে আমাদের কোন হাত নেই। কারণ আপনারা যত বেশি বেশি ইউটিউব চালাবেন, ওরা তত বেশি বেশি করে বিজ্ঞাপন দেবে। 'টাকা নিই না' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার কথার ফুলঝুড়ি শুরু হয়ে যায়– টাকা ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? এটা ভারি অন্যায়। টাকাটা নিয়ে বেলুড় মঠকে তো দিতে পারেন, ইত্যাদি। একজনকে মজা করে বলেই ফেললাম, টাকা যদি নিতেই হয় তাহলে ইউটিউব থেকে কেন নেব, ঠাকুরের কাছ থেকেই নেব। মজা করে বলছিলাম ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বরে যার সত্যিই বিশ্বাস, সে সত্যিই জানবে ঠাকুরই আমাকে দেবেন, আমার যতটুকু দরকার তিনি নিশ্চয় কোন একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। এর কাছে, তার কাছে আমি কেন চাইতে যাব। তবে এই বিশ্বাস হয় না, এই বিশ্বাস হওয়াটা সহজ না।

বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান? খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন। ঠাকুর বলতে চাইছেন, এগুলো আমাদের কাছে মুখের কথা মাত্র। যেখানে দেখবেন কোন ধরণের ইমোশান আছে, দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরে যাওয়া, সঙ্কীর্তনে লুটোপুটি করা, বুঝবেন কিছু গোলমাল আছে।

সবাই কি তাঁকে ধরতে পারে? তিনি ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন –বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশি প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশি প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশি প্রকাশ।

ঠাকুর টানা বলে গেলেন, এখানে না বোঝার কিছু নেই। আমাদের মন যেমন বিভিন্ন ধরণের চিন্তা-ভাবনা করে; ভাল চিন্তাও করে, অশুভ চিন্তাও করে, মন এটাও করে, সেটাও করে; ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সব রকমই আছে। যদি আমরা প্রশ্ন করি, ঈশ্বর কেন চেঙ্গিস খাঁর মত লোক করলেন? ঈশ্বর কেন করবেন, সে তো আপনিই করেছেন। ঈশ্বর থোরাই চেঙ্গিস খাঁকে তৈরী করলেন। ঈশ্বর থোরাই হিটলারকে তৈরী করেছেন, হিটলারকে তো আপনি তৈরী করেছেন। আপনার মনে কি কখন হিংস্র ভাব আসে না? মশা মারার চেষ্টা করেন না? ঘরে সাপ-বিছা ঢুকে গেলে, বা একগাদা আরশোলা বেড়ে গেলে মারার চেষ্টা করেন না? এখানেও সেই একই জিনিস। আমাদের মনে যেমন হিংসা বৃত্তি আসে, ঠিক তেমনি সৃষ্টিতে হিংসা বৃত্তির স্থূল প্রকাশ। জানবেন, যে জিনিসটা আপনি চিন্তা করতে পারেন বা আমি চিন্তা করতে পারি, কিন্তু এই 'আমি'টা কে? অনন্ত সত্তাবান আমি। আমি যেটা চিন্তা করছি, ঈশ্বরও সেটা চিন্তা করতে পারেন। ঈশ্বর যেটা চিন্তা করেন, সেটাই তিনি দেহ ধারণ করে আসার পর এই জগতে দেখান। সেইজন্য সৃষ্টিতে সবই আছে।

কত রকম ভক্ত হতে পারে ঠাকুর বলছেন; **আবার ভক্তদের ভিতর থাক থাক আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ-সব আছে**।

বৈষ্ণবভক্ত –আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অধম ভক্ত বলে, ঈশ্বর আছেন –ওই আকাশের ভিতর অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে –প্রাণরূপে আছেন। এটা একটা মত। **উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখছি ঈশ্বরের এক-একটি রূপ**। হিটলার ঈশ্বরেরই একটি রূপ। এই কথা

খ্রীশ্চানদের বলে দেখুন, আগুন লেগে যাবে। কি! তোমাদের মত বলছে হিটলার ঈশ্বরের রূপ? অবশ্যই, মা কালী আছেন, তিনি খাড়া ঘোরাচ্ছেন সেখানে।

তিনিই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন –তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, এই জিনিসটাকে ধারণা কর সত্যিই খুব মুশকিল। ভালটাও তিনি মন্দটাও তিনি। অত্যন্ত উচ্চ অবস্থার কথা, এ-সব কথা সাধারণ লোকেদের সামনে বলতেও নেই।

বৈষ্ণবভক্ত –এরূপ অবস্থা কি কারু হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁকে দর্শন না করলে এরূপ অবস্থা হয় না। এই যে উত্তম ভক্তের কথা বললেন, এটা থিয়োরেটিক্যালি হয় না; আমি ও-রকম হতে চাই, ওই অবস্থায় যেতে চাই; এই ভাবটুকু হতে পারে। গীতাতে বলছেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে*।। সারা জগতকেও যদি নাশ করে দেন, তার কিছু হয় না, আমি ছাড়া তো কিছু নেই; কে কার বধ করবে। তাহলে তো যে কোন লোক বলতে পারে, আমার এই রকম হয়েছে? **কিন্তু দর্শন করেছে কিনা তার লক্ষণ আছে**। কি সেই লক্ষণ?

কখনও সে উন্মাদবৎ –হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবৎ –পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা। সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখবেন, যদিও তাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে যায়নি, কিন্তু তাঁদের সাংসারিক বুদ্ধি কম থাকে। **সরল, উদার, অহংকার নাই, কোন জিনিসে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময়**। সাধু মানেই তিনি আনন্দময় থাকবেন। সাধু যদি আনন্দময় না থাকেন, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। ঈশ্বরকে যিনি দেখে নিয়েছেন, তিনি সদা আনন্দময় থাকবেন, গলা কেটে নিলেও আনন্দময়। **কখনও পিশাচবৎ –শুচি-অশুচি ভেদবুদ্ধি থাকে না, আচার-অনাচার এক হয়ে যায়!** এটা খুব উচ্চ অবস্থার বর্ণনা। **কখনও বা জড়বৎ, কি যেন দেখেছে! তাই কোনরূপ কর্ম করতে পারে না –কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না**। মাস্টারমশাই এখানে নিজে থেকে ভাবছেন –

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্তের প্রতি) –'তুমি আর 'তোমার' –এইটি জ্ঞান। 'আমি আর আমার' –এইটি অজ্ঞান। 'আমি' বলতে যে 'আমি' অহংকারের সঙ্গে এক হয়ে আছে, তার মানে অনন্ত সত্তা থেকে সীমিত হয়ে আছে। তুমি-আমি এই জিনিসটাকে যদি বুঝতে হয়, এর সহজ উপায় হল –অনন্ত সত্তা রূপে দেখছেন, নাকি সীমিত সত্তা রূপে দেখছেন। সীমিত সত্তা রূপে দেখলে সংসার –'আমি ও আমার'; অনন্ত সত্তা রূপে দেখলে ঈশ্বর, 'তুমি আর তোমার'।

হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আর আমি অকর্তা –এইটি জ্ঞান। হে ঈশ্বর, তোমার সমস্ত –দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগৎ –এ-সব তোমার, আমার কিছু নয় –এইটির নাম জ্ঞান। সংসার ঈশ্বরেরই রূপ, কিন্তু সংসার রূপে না। সংসার রূপ জিনিসটা হল, যেটা অনেকবার বলা হল, যদি সীমিত রূপ দেখেন, তাহলে সেটা ঈশ্বরের রূপ না। তাহলে বাঁচবেন কি করে? তখন বলতে হয়, প্রভু, সব তোমার।

যে অজ্ঞান সেই বলে, ঈশ্বর 'সেথায় সেথায়' –অনেক দূরে। যে জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর 'হেথায় হেথায়' –অতি নিকটে, হৃদয়মধ্যে অন্তর্যামীরূপে, আবার নিজে এক-একটি রূপ ধরে রয়েছেন। আপনার হৃদয়ে যিনি তিনি অন্তর্যামী, ঈশ্বর; তিনিই আবার অনেক রূপ ধারণ করে আছেন, তিনিই আবার সংসার হয়ে আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তির বিষয়ে কথোপকথন –বিদ্যাসাগর ও কেশব সেনের কথা

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। আজ ইংরাজী ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার (পৃঃ ২৪১)। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আশা করি আপনারা ঠাকুরের ভক্তই হবেন। আপনারা তাই জেনে থাকবেন, স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর ঠাকুরের নামকরা প্রণামমন্ত্র মনে মনে রচনা করে বললেন, *স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে*। *সর্বধর্ম স্বরূপিণে* না হয় ঠিক আছে, কিন্তু *স্থাপকায় চ ধর্মস্য* কেন বললেন? দীক্ষার সময় আমরা যে ইষ্টমন্ত্র নিয়ে থাকি, যেখান থেকেই নিয়ে থাকি না কেন, যে ইষ্টেরই মন্ত্র নিয়ে থাকি না কেন, সবারই গুরু নিশ্চয় দীক্ষার সময় বলে দিয়েছেন, এই তোমার ইষ্ট, ইনি হলেন সচ্চিদানন্দ, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। তার মানে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ভগবান শিবও করেন, ভগবান বিষ্ণুও তাই করেন। পৌরাণিক প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী আমরা জানি, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু স্থিতি করেন, শিব প্রলয় করেন। সচ্চিদানন্দরই তিনটে রূপ। শিবকে যখন আপনি সচ্চিদানন্দ রূপে দেখছেন, তখন তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সব কিছু করছেন।

পৃথিবীতে অবতারদের যে অবদান, যে অবদান আমাদের চোখে স্থূল রূপে পড়ে, তখন দেখছি শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে আমাদের কাছে গীতা এসেছে, খুব ভাল কথা। শ্রীরামচন্দ্রের পূজা হয়, অতি সুন্দর। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের মাঝখানে ঠাকুরকে যখন দেখি, তখন একটা অবাক জিনিস দেখি। স্বামীজী যে বলছেন, *স্থাপকায় চ ধর্মস্য*, ভগবান কৃষ্ণও তাই করেছেন, ভগবান রামও তাই করেছেন। কিন্তু ঠাকুর যেটা করেছেন, যেভাবে করেছেন, এটা বোঝার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। আমাদের বড়রা এগুলো আমাদের বলে গেছেন। যেমন ধরুন, গীতা পড়তে পড়তে আমরা অনেক কিছুই দেখছি, আর অন্য দিকে বেদ, কত যে গভীর জিনিস কল্পনাই করা যায় না; বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে দিয়ে গেছেন। ধর্ম জগতে ঠাকুরের যে অবদান, সেই অবদানে আমরা দুটো রূপ পরিষ্কার দেখতে পাই –ধর্মস্থাপন ও ধর্মজাগরণ। ধর্মস্থাপন এই অর্থে, অনেক মানুষ আছেন যাঁদের ধর্মে কোন রুচি নেই, ঠাকুর সেই মানুষগুলোর কাছে গিয়ে ধর্মের কথা বলছেন। আজকে আমরা হাতের কাছে কথামৃত পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আগেকার দিনে যাঁরা ঠাকুরকে জানতেন না, যাঁদের মধ্যে ধর্মভাব ছিল না, আজ তাঁদের অনেকেই ঠাকুরের বই পড়ে এই পথে আসছেন। কিন্তু সব থেকে ঠাকুরের বিশেষ হল ধর্মজাগরণ। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে খুব সুন্দর কথা বলছেন –অবতার যখন আসেন –*ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণত্ব রক্ষণার্থাম*। ব্রাহ্মণ জাতি না, ব্রাহ্মণ একটা বর্ণ; যাঁরা ধর্মকে ধরে আছেন তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ।

ধর্ম পালন দুটো স্তরে হয় –একটা হল, আমাদের মত সাধারণ মানুষ ধর্মের কথা শুনে, গুরুজনদের দেখে ধর্ম পালন করে যাচ্ছে। আর-একজন আছেন, যিনি ওটাকে ধরে আছেন। এখন আপনারা যাঁরা শুনছেন, পরে যাঁরা শুনবেন; আমাদের সবারই উদ্দেশ্য, এই যে শ্রেণী, ধর্মকে যাঁরা ধরে আছেন, সেই শ্রেণীতে অন্তত যেন পৌঁছাতে পারি। ঈশ্বরদর্শন যদি নাও হয়, আর ঈশ্বরদর্শন তো হবেই হবে, আজই হোক আর কালই হোক। ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের নামে বলছেন –বিয়ে হয়ে গেল, পরে শ্রীমার বাড়ির লোকেরা রেগেমেগে কামারপুকুর থেকে মাকে নিয়ে জয়রামবাটী চলে গেলেন। কি কারণ? মেয়ের গায়ে যত গয়না ছিল, সব অন্যের কাছ থেকে ধার করে আনা। শ্রীশ্রীমায়ের গা থেকে সব গয়না খুলে যাদের গয়না তাদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর সব শুনে হেসে বলছেন, ওকে নিয়ে গেছে তো কি হয়েছে, বিয়ে তো হয়ে গেছে, ওটা তো আর ফেরত নিতে পারবে না। আমি, আপনি, শ্রোতারা, যাঁরা কিনা ঠাকুরের ভক্ত, আমরা সবাই ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে গেছি। উনি চাইলেও এখন আর আমাদের আলাদা করতে পারবেন না। দু-চারটে চড়-চাপ্টা মারতে পারেন, এর বেশি কিছু করতে পারবেন না।

প্রথম লক্ষ্য যেটা হবে সেটা হল ধর্মকে ধরা, দ্বিতীয় ধর্মকে ধারণ করে রাখা। জ্ঞানের এমন স্তরে আমাদের পৌঁছাতে হবে, এই যে সনাতন হিন্দু ধর্ম, এটাকে যেন আমরা ধারণ করতে পারি; এটা আমাদের সবার দায়ীত্ব। কারণ নূতন ভক্ত যাঁরা আসবেন, তাঁরা আমাদের দেখেই আসবেন। এটা যেমন একটা দিক গেল, তেমনি এর অন্য আর-একটা দিক দেখতে হবে।

কথামৃতে দেখবেন, লীলাপ্রসঙ্গেও আছে তবে খুব বেশি নেই, কিন্তু কথামৃতে খুব সুন্দর – প্রত্যেক দিনই ঠাকুরের কাছে লোকজন আসছে। তারপরেও ঠাকুর আবার এর বাড়ি যাচ্ছেন, ওর বাড়ি যাচ্ছেন। কোথাও আবার একটা বড় ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাত্রি দশটায় ঢুকে পড়েছেন। সে হয়ত জানেও না ঠাকুর কে, অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন। আর যেখানেই যাচ্ছেন বাজিয়ে দেখছেন, ভিতরে সার পদার্থ কতটুকু আছে। যেখানে দেখছেন অসার, ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে দেখছেন সম্ভাবনা আছে, দু-চারটে কথা বলে দিচ্ছেন। যেখানে দেখছেন, অনেকটা এগিয়ে আছে, সেখানে তাকে আরও জোগান দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে যেটা ইণ্টারেস্টিং, এক কুশল কারিগর যেমন খাঁচে খাঁচে জিনিসগুলিকে বসিয়ে দেয়; মেশিন চালু আছে, কিন্তু মেশিনের কোথাও যেন একটা ফল্ট আছে, ঠিক ঠিক চলছে না; কারিগর এসে খাঁচে খাঁচে বসিয়ে দিলেন।

আমার এক বন্ধু খুব সুন্দর একটা ঘটনা বলছিলেন, একটা সরকারী দপ্তরে একটা বড় কম্প্যুটার রাখা ছিল, সাধারণ কম্প্যুটার না, এগুলো সুপার কম্প্যুটারের নিচে হয়, যে কম্প্যুটার দিয়ে সরকারি কাজকর্ম চলে। সেই কম্প্যুটারটা হঠাৎ কোন কারণে খারাপ হয়ে গেছে। এখানকার কোন কারিগর সারাতে পারছে না, আমেরিকা থেকে একজন বিশেষজ্ঞ এসে দেখে গেল। এরপর ওখান থেকে দুজন বড় টেকনিসিয়ান এলেন। দু-জন বসে ওদের সব কথা মন দিয়ে শুনলেন এরা কি বলতে চাইছে। যে ভদ্রলোক আমাকে ঘটনাটা বলছিলেন, ওনার সামনে এই ঘটনা ঘটেছে। বিরাট কম্প্যুটার। সব শোনার পর ওনারা কম্প্যুটারের কাছে গেলেন, একটা বিশেষ পার্ট কম্প্যুটার থেকে বার করলেন। তারপর জোরে দুবার ফু মারলেন, তারপর আবার পার্টটা কম্প্যুটারে যেখানে ছিল সেখানে ঢুকিয়ে দিলেন। মেশিন অন্ করলেন, মেশিন চলতে শুরু করল। ঘটনাটা শুনে আমি হতবম্ব। একে বলে কারিগর। কম্প্যুটারের সমস্যার সব বিবরণ শুনলেন, কোন জায়গাতে আটকাচ্ছে, কি কি সমস্যা হচ্ছে। একটা পার্ট বার করলেন, একটা ফু মেরে ভিতরে জমে যাওয়া ধুলোগুলো সরিয়ে দিলেন, তারপর পার্টটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন, মেশিন অন্ করা হল, মেশিন সুন্দর চলতে শুরু করল।

ঠাকুর যে কত লোকের কত কিছু এইভাবে ঠিক করে দিতেন, এখন আমরা অবাক হয়ে ভাবি। যেমন বলা যেতে পারে –হয়ত তিনি কারুর সাথে কথা বলছেন, নিজেই আবার তাকে প্রশ্ন করছেন – তোমার কি মত? যাকে প্রশ্ন করলেন, সে একটা বাক্যও সম্পূর্ণ করতে পারলেন না, একটা দুটো কথা শুনেই ঠাকুর ফু মেরে তার রাস্থা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। দেখিয়ে দিচ্ছেন, দেখ, তোমার জন্য এই হচ্ছে ঠিক পথ। রমণ মহর্ষি আধ্যাত্মিক জগতের একজন বিরাট দিকপাল, তিনি ওই একটা মূল পথ সবাইকে ধরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ঠাকুরের পথ মানে, তিনি সমস্ত কিছুতে আছেন। তুমি বৈষ্ণব হও, তুমি শাক্ত হও, তুমি তান্ত্রিক হও, তুমি জ্ঞানমার্গের হও কি ভক্তিমার্গের হও, কি কর্মযোগী হও, সবার পথের বাধা ফু মেরে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। তিনি ওই পথের কথাও জানেন, এই পথের কথাও জানেন, সেই পথের কথাও জানেন। যারা ঠিক যে জায়গায় ভুল করছে, সেটাকে তিনি ঠিক করে দিচ্ছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, ধর্মকে, বেদকে একেবারে সত্য বলে দেখিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন, বেদে যা কিছু আছে সবটাই সত্য। এ-জিনিস আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

বিশেষ কোন একটা সম্প্রদায়ের ভক্ত হয়ে আমরা ইমোশানালিজিমে ঢুকে যাই। ইমোশানাল হয়ে গেলে তার সঙ্গে কি কথা বলব? সারা বিশ্বে তো আমরা দেখছি কিভাবে চারিদিকে ফ্যানাটাসিজিম্ চলছে। এই ফ্যানাটিকের সঙ্গে কিভাবে লড়বেন? যে কোন জায়গায় যখন ফ্যানাটিকদের লোক জড়ো

হয়, সেখানে তারা যদি ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে, আপনাকেও ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলতে হবে। ওরা বলবে, 'চলবে না, চলবে না'; আপনাকেও 'চলবে না চলবে না' বলতে হবে। আপনার দৃষ্টি যদি সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, তাহলে দেখবেন, এই যে ধর্ম সংস্থাপন আর ধর্ম জাগরণ, এই দুটো ঠাকুর যেভাবে করেছেন, এই জিনিস কল্পনার বাইরে। আচার্য শঙ্কর বাঁচালেন, কিন্তু তিনি বেদ সত্য, এটাকে মেনে বাকি সব কিছুর ব্যাখ্যা করলেন। ঠাকুর দেখাচ্ছেন বেদ কিভাবে সত্য; এখানেই বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। আচার্য শঙ্করের সময় পরিস্থিতি ও পরিবেশ আলাদা ছিল, তখন লোকেরা ধর্ম, শাস্ত্র এগুলো মানত, জানত। কিন্তু আজকালকার দিনের লোকের কিছুই জানে না। ক্লাশ টেন পাশ করেছে, টুয়েলভ্ পাশ করেছে, গ্রাজুয়েট হয়েছে, মাস্টার ডিগ্রি পেয়েছে –সবজান্তা হয়ে গেছে। একটু যদি আপনি ভিতরে যান, দেখবেন কিভাবে ঠাকুর দেখাচ্ছেন –বেদমত, পুরাণমত, তন্ত্রমত; সব মত সত্য। যে কোন জিনিস যেটা মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা সত্য। অথচ আপনি যদি অত্যন্ত ভাল মানুষ হয়ে থাকেন, সত্ত্বগুণী হন; ঠাকুর দাম দিচ্ছেন না; ভিতরে সোনা চাপা আছে বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

২২শে জুলাই, **১১৮৩** খ্রীষ্টাব্দ, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। তার আগের দিন **২১শে** জুলাই রাত দশটায় খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে যান। তারপর কত রাত্রিতে ফিরলেন তার আর বর্ণনা পাই না। সকাল হতেই সব ভক্তরা এসে হাজির, রবিবার, তাই ভক্তের সমাগমও অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি। কোন আলস্য নেই, বিশ্রামের দফারফা, তা যাক; ঠাকুর চড়িয়ে যাচ্ছেন।

মাস্টারমশাই কালীবাড়ির খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। মাস্টারমশাইর ভাষা এত সুন্দর যে মনে হয়, তা যেখানকারই বর্ণনা করুন না কেন, মাস্টারমশাই শব্দ দিয়ে যেন ছবি আঁকছেন। মাস্টারমশাই মণি মল্লিকের কথা বলছেন। মণি মল্লিক আর যদুনাথ মল্লিক, এই দুজন ঠাকুরকে মানতেন। মণি মল্লিক একজন পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত, বয়শ ষাট-পঁয়ষট্টি। তিনি কিছুদিন আগে কাশীধাম দর্শন করতে গিয়েছিলেন। আজ তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন এবং ঠাকুরকে কাশীধাম দর্শনের বৃত্তান্ত বলছেন।

মণি মল্লিক –আর-একটি সাধুকে দেখলাম। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়সংযম না হলে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে?

ইন্দ্রিয়সংযম দরকার। যোগশাস্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন –যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ঠাকুর মন দিয়ে শুনলেন। খাঁচে খাঁচে বসানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মণি মল্লিককে আটকে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এদের মত কি জানো? যেমনি বললেন, এদের মত কি জানো, তার মানে শেষ। **এদের মত কি জানো? আগে সাধন চাই। শম, দম, তিতিক্ষা চাই**। বেদান্ত মতে শম, দম, তিতিক্ষা; যোগ মতে যম, নিয়ম, আসনাদি। **এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করা, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' –বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ**। তাহলে বেদান্ত কি সব ভুলভাল বলছেন? না। তারপরেই ঠাকুর বলছেন –**বড় দূরের কথা**। এই ভাব ঠাকুর আগেও অনেকবার বলেছেন।

এখানে মণি মল্লিক কাশীর সাধুর যে কথা বললেন, ঠাকুর সাধুর ওই কথাগুলোকে ঠিক কেটে দিচ্ছেন না; তুমি ভুল, এটা বলছেন না। সেটা না করে মণি মল্লিকের জন্য একটু এ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে দিচ্ছেন। কম্প্যুটারের যে ঘটনা বলা হল, এখানেও পার্ট বার করে ফুঁ মেরে সারিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুদের মূল গ্রন্থ হল বেদ। ঋষিরা যেটা প্রত্যক্ষ করলেন, চিন্তন-মনন করে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ আর মহাকারণ, এই চারটেকে যেমন দেখেছেন, যেমন বুঝেছেন, সেই অনুসারে আমাদের জন্য তাঁরা প্রার্থনা আদি রেখে গেলেন। একদিকে যেমন প্রার্থনা, আবার অন্য দিকে এর মধ্যে সত্যও রয়েছে। এই সত্য আর এই প্রার্থনা –দুটো মিলে হয় বেদ; উপনিষদও এর মধ্যে এসেছে। বেদের উপর

আমরা যে ক্লাশগুলো নিয়েছি তাতে বেদকে যুগোপযোগী করে বলা হয়েছে। তাতে কারুর মনে হতে পারে বেদ যেন একটা ভক্তিপথ, কারুর বা মনে হতে পারে বেদ যেন একটা জ্ঞানপথ। ঠিকই, কিন্তু পরম্পরা অনুসারে বেশির ভাগ লোকের জন্য বেদ হল যজ্ঞের পথ। আবার অনেকের জন্য বেদ ধ্যানেরও পথ।

এগুলো না হয় বুঝলাম, সব ঠিকই আছে, কিন্তু জীবনে বেদকে নামাবো কি করে? যেমন এই সূর্যের আলো, পৃথিবীতে যা কিছু চলে সবটাই সূর্যের আলোর জন্যই চলে। যা কিছু হচ্ছে সূর্যের জন্য হচ্ছে। এ্যটম বোমা ফাটানো হচ্ছে, সেটাও সূর্যের জন্য। বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল যেটা চলছে সেটাও সূর্যের জন্য চলছে। আমি যে এখানে কথা বলছি, সূর্যের জন্য বলতে পারছি। তাহলে আমি আপনি খাচ্ছি কেন, আমি আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছি কেন? কারণ খাওয়া-দাওয়া না করে, নিঃশ্বাস না নিয়ে আমরা জীবনধারণ করতে পারিনা। এই যে ফটো ভোল্টেজ সেল, কবে থেকে মানবজাতিতে এটা চলছে। আইনস্টাইন এসে যখন ফটো ইলেক্ট্রিক এফেক্টের কথা বললেন, তারপর সেখান থেকে ফটো ইলেক্ট্রিক সেল হয়ে আজকে আমরা সূর্যের আলোকে সরাসরি ইলেক্ট্রিসিটিতে পাল্টে দেওয়ার কৌশল জেনে গেছি। কিন্তু মানবজাতি সরাসরি নিজেরা এটা করতে পারে না। সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসবে, গাছপালা সেই আলোকে গ্রহণ করবে, গ্রহণ করে সূর্যের আলো ফটো সিন্থেসিস হবে, সেখান থেকে চাল হবে, গম হবে, ফল হবে। এবার মানুষ সরাসরি ওটাকে নিতে পারবে বা ছাগলকে খাইয়ে, মুরগীকে খাইয়ে এবার ওদের মাংস খেতে পারে; আর অন্য ধর্মের হলে গরু, মোষও খাবে। বেদ হল ঠিক ঠিক সূর্যের আলো। কিন্তু বেদকে কাজ কিভাবে লাগানো যাবে?

বেদকে কাজে লাগানোর জন্য একটা টেকনিক দরকার। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঋষিরা এসে টেকনিক দিলেন। সেই টেকনিকগুলিকে গুছিয়ে নিতে গিয়ে সেখান থেকে মোটামুটি ছয়টি দর্শন পেয়ে যাই –সব কটা দর্শনকে একসাথে বলা হয় ষড়্‌দর্শন। ছয়টি দর্শন হল –সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। বেদান্তকে অনেকে উত্তর মীমাংসাও বলেন এবং মীমাংসাকে পূর্ব মীমাসংক বলা হয়। বেদান্তের আবার অনেকগুলো বিভাগ আছে, যেমন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত ইত্যাদি। পূর্ব মীমাংসাতেও আবার দুটো মত। তার সঙ্গে আসে তন্ত্র মত, যার সাথে এগুলোর সরাসরি সম্পর্ক নেই। বেদ আর তন্ত্র মত মিলে কোথাও গিয়ে একটা শক্তির উপাসনা এসে যায়। যেমন আমরা অনেকেই নিত্য চণ্ডী পাঠ করি, এই চণ্ডী আসছে পুরাণ থেকে; কিন্তু আসলে চণ্ডী হল তন্ত্র উপাসনার অঙ্গ। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র সব কিছু মিলেমিশে শক্তির উপাসনাটা এসে দাঁড়ায়। এই যে ষড়দর্শন, এর সাথে যদি শক্তি মতকে নিয়ে নেওয়া হয়, যদিও শক্তি মত একটা সরাসরি স্বতন্ত্র সাধনার পথ, তার সাথে শৈব মতকেও যদি নিয়ে নেওয়া হয়, যদিও একটু আলাদা; কিন্তু পুরো ষড়দর্শন আসলে বেদকে প্রমাণ মানে, বেদকে সত্য রূপে মানা মেন, বেদ মুক্তির পথ। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ষড়্‌দর্শন কি? তখন এর উত্তর হবে, এরা বেদকে প্রমাণ মনে করে এবং সত্য মনে করে, আর এটাই মুক্তির পথ। বেদকে সেইজন্য বলা হয় আস্তিক দর্শন, যারা বেদের প্রত্যেকটি কথা সত্য বলে মনে করেন তাদের সবাইকে আস্তিক বলা হয়।

এখানেই ভগবান বুদ্ধ আলাদা হয়ে গেলেন, ভগবান বুদ্ধ বেদকে প্রমাণ মানলেন না। হিন্দু মানেই, যিনি জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, বেদের সমস্ত কথাকে সত্য বলে মানেন। যতগুলো পথ আছে তার মধ্যে এই ছয়টি পথ হল সাধনার পথ। পাশ্চাত্য দর্শনে যেমন বুদ্ধির খেলা করে যায়, ষড়দর্শন সেদিক থেকে বুদ্ধির খেলা নয়, এই দর্শন হল আমাদের সাধনার পথ। এটাকে আপনাদের একটু বোঝা দরকার, তাহলে কথামৃত বুঝতে সুবিধা হবে।

সাংখ্য দর্শন পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলেন, আর এই দুটোকে সাংখ্য পৃথক সত্তা রূপে মানেন। এনারা বলেন, পুরুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে গেছে, এখন বিচার করে করে প্রকৃতির এলাকাগুলোকে যদি ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে ধীরে ধীরে পুরুষ নিজের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

সাংখ্যের ছোটভাই হল যোগ। যোগও একই কথা বলেন, কিন্তু ওনারা বিচার পথের দিকে না গিয়ে ক্রিয়াপথের দিকে যান। ক্রিয়াযোগে বলা হয় –যম, নিয়ম, আসন, কিছু মূল্যবোধ, কিছু গুণের অনুশীলন করা, তার সাথে আসন, প্রাণায়ামের কথা বলেন। ন্যায় ও বৈশাষিক এনারা দুজন মনে করেন আত্মার মধ্যে ধর্ম ও অধর্ম রয়েছে। কোথাও আত্মা আর আমাদের মন মিশে রয়েছে, তারা ওখান থেকে শুদ্ধির পথ নিতে বলেন।

মীমাংসা বা কর্মকাণ্ড হল হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্ম। মীমাংসা বলে কর্ম, যজ্ঞ এটাই সব কিছু। তুমি যজ্ঞ কর, যজ্ঞ করলে তোমার পূণ্য হবে, এই পূণ্য তোমার সঞ্চিত থাকবে। কিন্তু এর মধ্য এটা ঠিক পরিষ্কার হয় না যে, আত্মা কোথায় যায়, মুক্তি বলে কিছু আছে কিনা। কর্মকাণ্ডীদের কাছে ব্রহ্মলোকই হল মুক্তি। যার জন্য বলা হত, কেউ যদি একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তাহলে সে ইন্দ্রপদ পায়। যদি ঠিক ঠিক ভাবে যজ্ঞ করা হয় সেখান থেকে সে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যেতে পারে।

বেদান্তের পথ খুব সুন্দর এবং পরিষ্কার। যতগুলো পথের আমরা আলোচনা করলাম, সব পথই কোন না কোন ভাবে বেদান্তে এসে ঢুকে যায়। ন্যায় পুরোদমে ঈশ্বরকে মানে, বেদান্তে ঢুকে যাচ্ছে। সাংখ্য আর যোগ, তাদের এই যে বিচারপথ আর সাধনার পথ অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ, এটা বেদান্তে পুরোদমে ঢুকে যায়। মীমাংসার যে যজ্ঞভাব, এটা বেদান্তে পূজা রূপে ঢুকে যায়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক এনারা কেউই পূজা মানেন না। পূজো একমাত্র মানে মীমাংসা, কিন্তু যজ্ঞ রূপে। সেটা যখন বেদান্তে ঢোকে তখন যজ্ঞটা পূজাতে ঢুকে যায়। এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, এটা আমরা বেদকে আধার করে চললাম।

অন্যান্য ধর্মে কি হয়, ভগবান তিনি তাঁর কোন বিশ্বস্ত কাউকে কি বলে দিয়েছেন, সেখান থেকে তিনি যেটা বলছেন সেটাই সত্য। বেদ একেবারেই এভাবে নয়। বেদ হল –সাধনা করা হয়েছে, সিদ্ধি বা উপলব্ধি হয়েছে এবং শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের যত ঋষি আছেন, মোটামুটি সবাই এই পথেই গেছেন। ঠাকুর সরাসরি সাধনাতে গেলেন, দেখানোর জন্য যে বেদমত সত্য। কিভাবে? ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেছেন। ঠাকুর যেখানেই যেতেন একটু অশান্তি লেগেই যেত, কারণ তাঁরা ইন্টেলেক্ট ধাঁচের, ঠাকুর ইন্টেলেক্ট নন, ঠাকুর খাঁটি সোনা। ইন্টেলেক্ট মানে তাতে খাদ মেশানো আছে, ডাইলিউটেড। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেদ থেকে কিছু বলতে বললেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেদের একটা মন্ত্র শোনালেন –মন্ত্রের ভাব হল ঈশ্বর যেন একটা ঝাড়লণ্ঠন, ঝাড়লণ্ঠনের প্রত্যেকটি বাতি যেন এক-একটা জীবাত্মা, জীবাত্মা সেই আত্মা বা ঈশ্বরের স্ফুলিঙ্গ। ঠাকুর শুনে বলছেন, আমি যেমন দেখেছিলাম, পুরো তোমার এই বর্ণনার সাথে মিলে গেল তো। বেদকে সত্য মনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রকম বলছেন আর ঠাকুর নিজে যেটা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেটাকে দিয়ে বেদকে তিনি সত্য বলছেন –এই হচ্ছে দুজনের তফাৎ।

এই যে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য, যেখানে তিনি সাক্ষাৎ দেখছেন, এই জিনিসটাকেই একটু আগে কথামৃতে ঠাকুর বলছেন –যে বিশেষ ভক্ত, যে সিদ্ধ, সে দেখে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। আর বেদান্ত মতে বলেন, আত্মা বই আর কিছু নাই। আত্মা ছাড়া কিছু নেই বাকি সব মায়া, নামরূপের খেলা। সত্য কিন্তু এই দুটি। বেদেও আমরা এই রকম পাই, পরে পরে যে বর্ণনাগুলি করা হয়েছে, তাঁরাও এই ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই যে বলছেন, আত্মাই সব, তার মানে আত্মা ছাড়া বাকি যা কিছু আছে, সব আমার কাছে ত্যাজ্য। কিন্তু ভক্তিপথে ত্যাজ্য বলে কোন কিছু থাকে না। যখন জ্ঞানপথ অবলম্বন করছে, যে পথের মূল বক্তব্য আত্মাই সব, আত্মা ব্যতিরেকে সবই মায়া, সব নাম আর রূপের খেলা, তখন এই নাম আর রূপের যে খেলা, এটা হয়ে যায় ত্যাজ্য। ত্যাগ করবেন কিভাবে? যদি কখন আপনাকে বাড়ি পাল্টাতে হয়, তখন কি করবেন? বাড়ি ছাড়ার আগে বিচার করে দেখতে হবে, কোনগুলো কাজের জিনিস, আর কোনগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জিনিস নয়, অকাজের জিনিস, যেটাকে ছেড়ে দেওয়া

যায়। ঠিক তেমনি যখন আপনি জেনে গেলেন আত্মাই সত্য, তখন যেগুলো দরকার নেই সেগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।

যাঁরা এই ছাড়ার পথ নিচ্ছেন, এনাদেরই বলা হয় জ্ঞানী। এনাদেরকেই ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানপথের লোক বা জ্ঞানী। জ্ঞানী শব্দের পরিব্যাপ্তি বিশাল। জ্ঞানী শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনিও জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানপথে চলতে শুরু করেছেন তিনিও জ্ঞানী, যিনি বিচার করে অনিত্যকে ত্যাগ করে নিত্যকে ধরার চেষ্টা করছেন তিনিও জ্ঞানী। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীকে নিয়ে অনেক সময় সংশয় তৈরী হয়। একজন আবার ইদানিং এর মধ্যে বিজ্ঞানবাদকে এনে অনেক রকম কথা বলছেন, নিজের মত বই পড়ে ধারণা করার চেষ্টা করলে এই রকমই হয়। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর মধ্যে তফাৎ করার জন্য অনেক সময় জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে দুটো আলাদা বলা হয়। তর্ক দিয়ে আপনি যে কোন জিনিসকে প্রমাণিত করে দিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তত্ত্ব তো পাল্টাবে না। এই যে ছয়টি পথ বলা হল, আর তার সঙ্গে বেদান্তের আলাদা মতগুলি নিয়ে নেন, পথ আপনি যেটাই নিন পৌঁছাতে হবে সবাইকে সেই সত্যে, আত্মাতে। তা আপনি ন্যায়, বৈশাষিকেই যান, সাংখ্যে যান, বেদান্তে যান, যে পথেই যান, শেষে কিন্তু পৌঁছাতে হবে সেই আত্মাতে। তার সঙ্গে মজার ব্যাপার হল, সব কটা পথেই আত্মা ছাড়া যা কিছু আছে সব খসে পড়ে যাবে।

ভক্তির পথ দিয়ে গিয়ে যখন দেখছেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, তাতেও তো এই জগৎ খসে পড়ে গেল, জগৎ তো মিথ্যা হয়েই গেল। তফাৎ হল, ঘোর বেদান্তে বলে জগৎ বলে কিছু নেই। শেষ কথা হল, যা কিছু আছে আত্মাই আছেন, আত্মা বাদে কিছু নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এটাই বারবার বলছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আত্মা ছাড়া যা কিছু দেখছ সবটাই তোমার ভ্রম। ভক্ত ঠিক এটাই বলে, ভক্ত বলে, ঈশ্বর বাদে তুমি যা কিছু দেখছ, এটা তোমার ভ্রম। আমাদের মত লোকেদের সমস্যা হল, আমরা আত্মাকে মনে করছি একটি বস্তু, আর ঈশ্বরকে মনে করছি তিনি একজন ব্যক্তি। আপনার বাড়ির কেউ বাজারে আনাজ কিনতে গেল, বাজার থেকে সে ভুলভাল জিনিস নিয়ে এসেছে। আপনি বিরক্ত হয়ে তাকে বললেন, যেটা তোমাকে আনতে বললাম সেটা না এনে সব ফালতু জিনিসগুলো নিয়ে এলে? ফলে কি হয়, আত্মা বাদে যা কিছু আছে আমাদের কাছে ফালতু মনে হয়, কারণ আমাদের কাছে আত্মা একটি বস্তু। যেটাকে আমি নিতে যাচ্ছি, সেটা ছাড়া বাকি সব ফালতু। ঠিক তেমনি, আমাদের কাছে ঈশ্বর একজন ব্যক্তি, বাকি সবাই ফালতু। বাস্তবে জিনিসটা তা নয়। এনাদের বক্তব্য হল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বাদে অন্য কারুর চিরন্তন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু সাংখ্য ও যোগ মতে প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্বের কথা বলা হয়। ফলস্বরূপ সাংখ্য মতে নেতি নেতি করাটা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে যায়, অর্থাৎ ত্যাগের পথ অত্যন্ত জরুরী হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে একজন বাংলাদেশী ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল। তিনি কট্টর হিন্দু। তিনি বলছেন, আমাদের বাচ্চারা স্কুলে যায়, ওখান থেকে শিখে এসে বলে, ইয়া আল্লা। বন্ধুদের সঙ্গে থেকে শিখছে, যার সঙ্গে থাকবেন তার মতই আচরণ করবেন। বেদান্ত মত এবং বেদান্তের যে বিভিন্ন মত, এনারাও কিন্তু সাংখ্য থেকে, যোগ থেকে, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তারপর অনেক কিছু মিলেমিশে বর্তমান কালে যে বেদান্ত আমাদের হাতে আসছে, তাতে অনেক কিছু মিলেমিশে আছে। ফলে কি হয়, যে আচার্য যেটা শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি মনে করছেন এটাই ঠিক। যেমন রমণ মহর্ষি তিনি যে পথ দিয়ে চলে যে জায়গায় এসে পৌঁছেছেন, তিনি মনে করছেন এটাই ঠিক, সত্যিই তো ভুল তো কিছু নেই। একটি পথও ভুল না। তাহলে আমার আপনার জন্য কোন পথ? এই যে এতগুলো পথের আলোচনা করা হল, এর মধ্যে কোন পথটা আমার আপনার জন্য? আপনার পথ হল সেটাই, আপনার গুরু দীক্ষার সময় আপনাকে যে পথের কথা বলে দিয়েছেন। তাহলে এত পথের কথা জানতে হচ্ছে কেন? কারণ পড়াশোনা করলে, জানাজানি হলে বুদ্ধিটা খোলে, বুদ্ধি খুললে আপনার যে সাধনার পথ সেটা আরও সহজ হবে, ভাল হবে, পরিষ্কার হবে।

হিন্দু মতে আপনি যে পথই নিন, হয় আপনি ভক্তিতে পৌঁছাবেন, নয় জ্ঞানে পৌঁছাবেন। ভক্তিতে পৌঁছালে আপনি দেখবেন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। জ্ঞানপথে পৌঁছালে দেখবেন, আত্মা বাদে বাকি সব মিথ্যা। এবার আপনি যদি ঠিক ঠিক ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতা দেখতে যান, সেটা হল যোগ। যোগ হল পুরো প্র্যাক্টিক্যাল। বেদান্তে যখন এই যোগের প্রভাব পড়ল, তাঁরা শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে এলেন। আমিও আমার আচার্য মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই যে যোগে যম, নিয়ম, আসন এগুলোর কথা বলছেন, আমাদের তো এগুলো কিছু হয়নি, আমরা তো কিছুই করিনি। যম হল, সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ আবার তপস্যা, স্বাধ্যায় আদি যে নিয়ম আছে, এই জিনিসগুলো তো আমরা কখন করিনি'। আচার্য সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কেন যোগেই তো আছে, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*'। 'তাহলে এই যে বিচার পথ, যেখানে নেতি নেতি বলা হচ্ছে, এটা কতটা ঠিক'? 'অত্যন্ত কঠিন। নেতি নেতি পথ হল খুব বিশেষ সাধক, যাদের মন একেবারে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, সংসারে যাদের এক বিন্দু মন নেই, একমাত্র তাদের জন্য'।

সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রকারের হয়, কিছু আছে যারা প্রচুর কাজকর্ম করতে চায়, তাদের জন্য যজ্ঞাদি অর্থাৎ পূজা অর্চনা, যে কাজগুলো ওরা সহজে বুঝতে পারে। আবার কিছু আছে, যাদের মধ্যে প্রচুর ইমোশানস্; সবাইকে ভালবাসতে চায়, এদের জন্য ভক্তিপথ। আবার কিছু আছে যাদের ভিতরটা ত্যাগের ভাবে টগবগ করছে। কোন কিছুতে এরা জড়াতে চায় না, উপর থেকে যতই নাটুকেপনা করুক, বোঝাই যায় সে জড়াতে চাইছে না। এদের জন্য জ্ঞানপথ। সমস্যা হল, জ্ঞানপথ সবার জন্য নয়। ঠাকুর নিজেই এখানে বলছেন –বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা। ভগবান গীতাতে এই জিনিসটাকেই খুব সুন্দর বলছেন –*অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে*, যার দেহবোধ আছে তার পক্ষে অব্যক্তের উপাসনা শুধু দুঃখ আর দুঃখ। অব্যক্ত উপাসনা হল নেতি নেতির পথ, এটা অত্যন্ত কঠিন পথ, কারণ আমাদের দেহবোধ প্রবল। মিথ্যা মানে সবটাই মিথ্যা; আপনার দেহ মিথ্যা, আপনার মন মিথ্যা, আপনার আমিত্বটাও মিথ্যা। যেমনি বলছেন, আমি ধ্যান করছি, সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফাঁদে পড়ে গেলেন, কারণ আপনার আমি এসে গেছে। *চিদানন্দরূপোহং শিবোহহং শিবোহহং*, এটা মুখে খুব সহজে বলে দেওয়া যায়।

আমাদের এক পরিচিত ভক্তের কথা জানি, প্রত্যেক ঘন্টায় এলার্ম লাগিয়ে রাখেন, এলার্ম বাজলেই বলতে থাকেন I am the Self, I am the Self; মাথা খারাপ না হলে প্রত্যেক ঘন্টায় কেউ এই রকম করে, I am the Self, I am the Self? আরে ভাই যখনই আপনি বলছেন I am the Self, তখন আপনার কাছে 'I' বেশি ইম্পর্টেন্ট 'Self'টা কম ইম্পর্টেন্ট। শুনলাম, কোথায় কোন লেকচারে নাকি শুনেছে, সেখানে বক্তা নাকি awareness জাগিয়ে রাখার জন্য বলেছেন, always practice Self। Self practice করতে গিয়ে আপনার 'I' এসে যাচ্ছে। আরে ভাই, Self awareness জাগিয়ে রাখতে গিয়ে আপনার I awareness জেগে যাচ্ছে। ঠাকুর যে মাস্টারমশাইকে বলছেন, তুমি এখানে সেখানে যেও না, এখানেই আসবে; ঠিক এইজন্যই বলছেন। আপনি একবার ভেবে দেখুন, যেখানে সেখানে লেকচার শুনে যদি এই রকম প্র্যাক্টিস করতে শুরু করেন, কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এলেমেলো হয়ে গিয়ে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে।

স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, আমাদের ভাইস-চ্যান্সলার ছিলেন, আমেরিকার একটা খুব সুন্দর গল্প বলছিলেন। আমেরিকার কোন ভক্ত দীক্ষা নিয়েছে। সাতদিন পর মঠে এসেছে। কি ব্যাপার? সে মন্ত্র ফেরৎ দিতে এসেছে। Oh! Swami I practice it seven days, it did'nt work। যাদের বিয়েটাই এক দিন টেকে না, তাদের মন্ত্র ক'দিন চলবে! যাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন তিনি তাকে বলছেন, I have been practicing this Mantra for fifty years। ভক্ত তো শুনেই হাঁ হয়ে গেছে 'Oh! Fifty years'! আর আপনি একটা বক্তৃতা শুনে আত্মজ্ঞানী হয়ে গেছেন মনে করছেন।

আশির দশকে আমাদের ভারতে একজন খুব নামকরা বক্তা ছিলেন, উনি আবার একজন ডাক্তার। ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে উনি লেকচার দিতেন। একবার একটা ইয়ং ছেলে ওনার বক্তৃতা শুনে বলছে, what a wonderful talks। একজন জিজ্ঞেস করছে, What was the wonderful things? তখন ছেলেটি বলছে, I am Brahman, I am Atman, wonderful thing I learn। জানিনা ছেলেটি চল্লিশ বছর কোথায় আছে, কি করছে। এ-ভাবে হয় না।

ব্রাহ্ম সমাজ যেটা করেছিল –এটা মানব না, সেটা মানব না; এভাবে কি হয়? কখনই হয় না। কিন্তু পথটা ভুল না। ধর্মপথে সব সময় path of least resistence নিতে হয়, যেটা গুরু খুব ভাল বোঝেন। তোমার স্বভাব কি রকম, তোমার মনের গঠন কি রকম, সেই অনুসারে গুরু পথ বলে দেন। ঠাকুর আবার আর-এক ধাপ এগিয়ে শরীরের গঠন দেখে বলে দিতেন। তার বুক কেমন, তার হাতের ওজন কেমন, তার চোখের চাহনি কেমন, মুখের গঠন কেমন, ঠাকুর এগুলোও দেখতেন। বর্তমান কালে বেলুড় মঠে এ-সব দেখা হয় না, কারণ এতটা আমরা বুঝি না। আমাদের এখন দীক্ষার্থিকে একটা বিশেষ মন্ত্র দিয়ে ইষ্টকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, এর থেকে বিশেষ সাধক যদি আপনি হতেন তাহলে আপনি ঠাকুরের সময় আসতেন। I am the Self, I am the Self, বলতেন না। চেলা যেমন হয়, গুরুও তাঁর তেমনই জোটে। একজন জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ সদ্‌গুরু কোথায় পাব? মহারাজ বলছেন, আপনি যাঁকে খুশি গুরু করে নিন, কারণ আপনার মত চেলার জন্য যে কোন গুরুই ভাল হবে, পরে বাকিটা ঠাকুর দেখে নেবেন। আগে নিজে দেখুন আপনি কারুর চেলা হওয়ার যোগ্য কিনা, আপনার মধ্যে একটুও পাত্রতা আছে কি? এদিকে সিদ্ধ গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনার জন্য যদি সিদ্ধ গুরু দরকার হত তাহলে ঠাকুরের সময় আপনার জন্ম হত। জ্ঞানপথ ভুল পথ নয়। কি রকম জানো? ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন।

কিরকম জানো? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' –এসবের খবর থাকে না।

এখানে আবার কয়েকটা কথা বলার আছে। ভক্তিতে যে শেষ অবস্থা হয়, তার বিভিন্ন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে নামকরা কথা হল –সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য। কিন্তু যাই হয়ে যাক, ভক্ত একটা 'আমি' ভাব রাখতে চায়। এরমধ্যে একমাত্র সাযুজ্য হল যেখানে 'আমি' 'তুমি' মিলে সব এক হয়ে যায়। কিন্তু ভক্তরা সাধারণ ভাবে সাযুজ্য চায় না, কারণ এটা তাদের স্বভাবে নেই। তার থেকেও বেশি যেটা হয় তা হল, সাংখ্য মতে প্রকৃতির কথা বলা হয়; এই প্রকৃতিকে আমরা মনে করতে পারি, sum total of energy, কিন্তু প্রকৃতি আসলে তা নয়, আর-একটু বেশি। আমাদের বোঝার জন্য আমরা বলতে পারি, একটা হল শক্তি, আর-একটা হল চৈতন্য। বেদান্ত বলে চৈতন্যটাই শক্তি হয়, কিন্তু সাংখ্য বলে চৈতন্য আলাদা, শক্তি আলাদা। তার মানে যোগ পথে আপনার যখন সিদ্ধি হয়ে যাবে, নিজের স্বরূপে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন কোনটা প্রকৃতির এলাকা আর কোনটা প্রকৃতির এলাকা নয়, এবং আপনি বুঝতে পারবেন, আমি এটা নই।

স্টীমার কিংবা জাহাজে করে যদি কোথাও গিয়ে থাকেন, তাহলে এই জিনিসটা ভাল বুঝতে পারবেন। স্টীমার বা জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে আর কূল থেকে আপনি আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন। আপনি যেমনটি আছেন তেমনটি থেকে যাচ্ছেন। যেখান থেকে আপনি জাহাজে চাপলেন, সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল আর সব কিছু ছোট হতে হতে এক সময় সব কিছু দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল। আপনার দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল, তার মানে কি ওই জায়গার অস্তিত্ব নেই? সাংখ্য আর যোগ বলে, তাদের অস্তিত্ব আছে। তার মানে সাংখ্য আর যোগ হল কাঠ পোড়ানর মত, কাঠ পোড়ানর পর ছাই থেকে যায়। কিন্তু বেদান্তের জ্ঞানপথে যাঁরা আছেন, তাঁরা বলবেন, কিছুই থাকবে না। স্বপ্নে আমিই সত্য, বাকি সব কিছু মিথ্যা। তার মানে এই যে জগৎ, এটা আমারই রূপ, আমি ছাড়া কিছু

নেই। সাংখ্য বা যোগ বলবে, না, এটা তোমার জাহাজে ওঠার মত। ওটা আছে, কিন্তু তুমি অন্য দিকে চলে যাচ্ছ। 'আমি' মতটা এটা বেদান্তের, এটা সবার জন্য নয়। ঠাকুর এবার নামকরা পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথা বলছেন।

পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মানত। যাঁদের মধ্যে শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য আছে, তার সাথে আবার আধ্যাত্মিক ভাবও যদি থাকে; ঠাকুর এনাদের প্রতি বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করতেন। শুধু শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাও একটু মানতেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের না আছে শাস্ত্রজ্ঞান, না আছে ধর্মের প্রতি অনুরাগ, কেবল লম্বা লম্বা কথা। ঠাকুর বলছেন, একদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। যারা এই ধরণের ঢং ঢাং করছে দেখতেন, তাদের ঠাকুর সোজা ফু মেরে উড়িয়ে দিতেন। **পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভা-পণ্ডিত ছিল**।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। কামারহাটিতে তখন পদ্মলোচন এসেছিলেন। তিনি ভাগ্নে হৃদয়কে পদ্মলোচনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, দেখতে পণ্ডিতের অভিমান আছে কিনা। শুধু পাণ্ডিত্য থাকলে তো হবে না, পাণ্ডিত্যের সাথে অহঙ্কার আসবে, I am the Self, I am the Self, 'I'টা আগে এসে যাবে, বাকি সব কিছু পরে থাকবে।

কলকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটির কাছে একটি বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হল। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জানতে, অভিমান আছে কিনা? শুনলাম, পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হল। এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না!

কারণ শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ ভক্তি এক। যিনি ঠিক ঠিক উপনিষদ বুঝেছেন, তাঁর কাছে আত্মা যা, ঈশ্বরও তাই। আচার্য শঙ্কর গীতাতে পদে পদে এই কথা বলছেন, আত্মা, ব্রহ্ম, তিনিই বাসুদেব; আত্মা ব্রহ্ম তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ; সেখান থেকে কোথা থেকে কিভাবে I am the Self, I am the Self, কোথা থেকে আসে ভগবান জানেন। যখন দেহ ধারণ করতে হয়েছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করে, পূজা করে আস্তে আস্তে উপরে উঠবেন, তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন কোনটা ঠিক কোনটা ভুল।

কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। কি সুন্দর কথা বলছেন। ঠাকুর পদ্মলোচনকে খুব ভালবাসতেন। আপনারাও দেখবেন কারু সঙ্গে কথা বলে আপনি সুখ পাচ্ছেন। ইংরাজীতে এই জিনিসটার খুব সুন্দর শব্দ হল –comfort level। কারুর সঙ্গে কথা বলে আপনার বেশি আনন্দ হয়? ঠাকুরদারা নাতির সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পায়। একদিন মঠে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, একজন বৃদ্ধ নাতিকে বলে যাচ্ছেন, treat me as your friend। বয়স হয়ে গেছে, দুদিন পর মরতে যাচ্ছেন, আর একটা বাচ্চাকে বলছেন, treat me as your friend? ইদানিং কালে মায়েরা মেয়েদের বলতে শুরু করেছে, I am your best friend, তুমি যদি ওর বেস্ট ফ্রেণ্ড হও তাহলে ওর মা কে হবে? Comfort level দেখলে বোঝা যায় আপনার বুদ্ধি কত, আপনা ম্যাচিওরিটি কত হয়েছে। পদ্মলোচনের একটা কথা দিয়ে ঠাকুর আবার বলছেন।

আমায় বললে, 'ভক্তের সঙ্গ করব এ-কামনা ত্যাগ করো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত করবে'। পদ্মলোচন ঠাকুরকে উপদেশ দিয়ে গেলেন, শিক্ষা দিয়ে গেলেন। কি উপদেশ? ভক্তদের সঙ্গ করো না। পদ্মলোচন তখন সেভাবে জানতেন না যে, ঠাকুর অবতার; ঠাকুরের কাছে নরেনের মত শিষ্যরা আসবেন, যিনি জগতে ধর্মের একটা আন্দোলনের সূচনা করে দিয়ে যাবেন –সেটা তিনি দেখে যেতে পারেননি। ঠাকুর যে অবতার এটা তাঁর না জানারই কথা, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু পদ্মলোচনের কথাটা খুব সুন্দর। সাধু ভক্তসঙ্গ করেছে, সাধুর পতন নিশ্চিত। আপনারা তো সাধুদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান, চার-পাঁচ পদ রান্না করে খাওয়াবেন, চা খাওয়াবেন। কিন্তু জেনে রাখুন, সাধু ভক্তসঙ্গ করেছে, তাঁর পতন নিশ্চিত।

স্বামী সুহিতানন্দজীর কাছে বাচ্চা বয়স থেকে আমি বড় হয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি। মহারাজ বলতেন, ভক্তসঙ্গ করলে ইহকাল পরকাল দুটোই যাবে। আজ চল্লিশ বছর রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে এটা শিখলাম –ভক্তসঙ্গ করেছে সাধু, আজ হোক কি কাল হোক, ইহকাল পরকাল দুটোই যাবে। মাখন জলে রেখে দিলে থাকবে, মিশে যাবে না। কিন্তু দুধ আর জল মিললে দুটো এক হয়ে যায়। আমি যখন মনে করছি আমি মাখন, আমি তখন বুঝতেও পারছি না যে এটা দুধ। বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলে, ওরা সাধুকে নিজের স্তরে নামিয়ে নেবে, সত্তা হরণ করে নেবে। দুদিন পর সাধুকে বুঝিয়ে দেবে, আপনি আমাদেরই মত একজন। তারপর আপনার সঙ্গে ওদের মত ঝগড়া করবে, তর্কাতর্কি করবে, মান-অভিমান করবে; আর পতনের স্তরে ঠেলে দেবে। সাধু তখন নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে তার মত হয়ে যায়। পদ্মলোচনের মত জ্ঞানী ঠাকুরকে সাবধান করছেন –তোমায় পতিত করবে। তারপর খুব নামকরা প্রচলিত কাহিনী বলছেন। শিব বড় না, ব্রহ্মা বড় এই নিয়ে বিচার। পদ্মলোচন সেখানে বলছেন, 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই'।

এরপর আবার একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন, **কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ শুনে আমায় একদিন বললে, 'ও-সব ত্যাগ করেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটি –এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়'**। ঠাকুর উত্তর দিতে পারছেন না, পদ্মলোচনকে ঠাকুর ভালবাসেন। বলছেন, **আমি কি বলব –বললাম, কে জানে বাপু, আমার টাকা-কড়ি ও-সব ভাল লাগে না**।

খুব দামী কথা –মনকে যখন আপনি ওই স্তরে নিয়ে যাবেন, যে স্তরে পৌঁছানর পর নিজে থেকেই আপনার আর টাকা-কড়ি ভাল লাগবে না, কামিনী-কাঞ্চন আর ভাল লাগবে না। তখন আর চেষ্টা করে ওগুলো ত্যাগ করতে হয় না, আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায়। স্বামীজী আমাদের উদ্দেশ্য করে বলে গেছেন, কৃচ্ছ সাধন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে সবাইকে প্রথম থেকেই ত্যাগের একটু চেষ্টা করতে হয়। একেবারেই যে চেষ্টাশূন্য হয়ে থাকবেন, কালে হবে এই ভেবে বসে থাকবেন, তা কখন নয়। কিন্তু তার সঙ্গে আবার জোর করেও কিছু করতে নেই। শুধু ভক্তিপথকে যদি অবলম্বন করা হয়, শুধু যদি জপধ্যান করা হয়, দেখবেন ধীরে ধীরে সংসার থেকে আপনার মন আপনা থেকেই উঠে যাবে। কারুর আশীর্বাদে সংসার থেকে মন যায় না, কেউ কৃপা করলে যাবে না। যদি মনে হয় সংসার ও জগতের প্রতি আসক্তি যাচ্ছে না, তার মানে বুঝতে হবে আপনার আত্মকৃপা নেই। সাধন-ভজন, তপস্যাদি করতে করতে মন এমন একটা জায়গায় চলে যাবে, যেখানে গিয়ে সংসার আর ভাল লাগবে না, কামিনী-কাঞ্চন আর ভাল লাগবে না। স্বাভাবিক ভাবে এই ভাল না লাগার ব্যাপারটা যখন এসে যায় তখন বুঝবেন আপনি এবার ঈশ্বরদর্শনের পথে সুপার হাইওয়েতে উঠে এসেছেন।

ঠাকুর একটা ছোট্ট কাহিনী নিয়ে আসছেন –**একজন পণ্ডিতের ভারি অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মানত না**। এখানে একটা খুব সাধারণ কথা বলার আছে। আজকে আমরা বইয়ের মাধ্যমে; বইয়ের মাধ্যমের থেকে বেশি, ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনাদের কথা আজকে একসাথে সহজলভ্য হওয়াতে গীতা, উপনিষদ এগুলো বুঝতে অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। গীতা, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি বইগুলো আজ সহজেই উপলব্ধ, রামকৃষ্ণ মিশন চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, আর ইন্টারনেটের দৌলতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বিভিন শাস্ত্রের উপর ভাল ভাল লেকচার ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে, শাস্ত্র বুঝতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরের সময় বা একশ বছর আগে ছাপাখানা তখন সবে শুরু হয়েছে, বই কিনতে দুটো পয়সা লাগে। আর তারও আগে জ্ঞানপিপাসু কোন ব্যক্তি কোথাও থেকে ভুজ্যপত্র সংগ্রহ করে নিজের মত করে পুঁথি থেকে নকল করে লিখে নিতে পারতেন। বই মানেই কিছু টাকা খরচ করতে হবে। আর হিন্দু ধর্মের বইগুলো রীতিমত মোটা মোটা। তখনকার দিনের লোকেদের অত টাকা কোথায় যে মোটা মোটা বই টাকা দিয়ে কিনবে। এটা গেল বই সংগ্রহের ব্যাপার।

দ্বিতীয় বই সংগ্রহ করলেই তো শাস্ত্রকথা আয়ত্ত করা যাবে না, বেশির ভাগ লোকের নিজে শাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রের কথা বোঝার ক্ষমতা নেই। লক্ষ্য করে থাকবেন, যে বই আপনি প্রথম পড়েছেন, আপনার কাছে সেই বইয়ের বক্তব্যই ঠিক বলে মনে হবে। তেমনি যে ধর্মগুরুর কাছে আপনি প্রথম গেছেন, তাঁর কথাগুলোই আপনার কাছে ঠিক বলে মনে হবে। এটাই মনের স্বভাব। আমরা প্রথম যাঁকে জানি, তাঁকেই আমাদের ঠিক বলে মনে হয়।

এখন এই যে ঠাকুর পণ্ডিত মশাইয়ের কথা বলছেন, এটা একটা কাহিনী। আপনি যদি এটাকে বাস্তবিক রূপে দেখতে চান, এই সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। তিনি হয়ত অনেক খেটেখুটে কোন গুরুর কাছে গিয়ে বা এখান ওখান থেকে একটা বই পড়লেন। বই পড়ার পর তার মন একটা ভাব নিয়ে নিল। কিন্তু সেটা তো পুরো ছবি দেবে না। একটা চটি বইতে সব কিছু পেয়ে যাব, তা তো হয় না। গীতাতে অবশ্য আছে, কিন্তু গীতা এত কঠিন, আর তার সাথে গীতার ভাষ্যকাররা পরস্পর বিরোধী এত কথা বলেছেন যে, সাধারণ মানুষ পক্ষে গীতার বক্তব্যকে মাথায় বসিয়ে নেবে, এটা অসম্ভব। যিনি যে সম্প্রদায়ের তিনি সেটাই মানেন। বেদের ধর্ম, হিন্দুদের ধর্ম হল ঋষিদের ধর্ম।

ঠাকুরকে না জানলে ঋষিদের ধর্ম জানা অসম্ভব। অনেকে মনে করতে পারেন, আমি যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, তাই আমি এই রকম কথা বলছি। না, তা নয়। যদি আপনি হিন্দু জীবনদর্শন দেখেন, পুরো হিন্দুদের একসাথে একটা ছবি নেওয়ার যদি চেষ্টা করেন, এরা কোন জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করে? তখন দেখবেন, হিন্দুদের একটাই জিনিস সিন্থেসিস, ইউনিভার্সালিটি। এই যে হিন্দুদের *বসুধৈক কুটুম্বকম্*, এটা আসছে উপনিষদের খুব নামকরা একটি মন্ত্র থেকে –*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। এই যে ভাব আর সেখান থেকে একটা সিন্থেটিক এ্যপ্রোচ অর্থাৎ সব কিছুকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা। বিদেশীদের হল এ্যনালেটিক্যাল এপ্রোচ, ওরা কাটাছেঁড়া করে একটা জিনিসকে বার করে আনে। হিন্দু মন হল সমন্বয় মন। এই জগতে কোন কিছু একা, আলাদা দাঁড়িয়ে নেই। আপনারা কি জানেন, ছোট বড় মিলিয়ে বিশ্ব কত ধর্ম আছে? স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মনে হবে চার-পাঁচটা ধর্ম আছে। কিন্তু যদি এই ধর্মগুলির যত শাখা-প্রশাখা আছে, যেটাকে ওনারা নিজের ধর্ম বলে মনে করে; খুব কম হলে সারা বিশ্বে চল্লিশ হাজার ধর্ম আছে। এখন এই চল্লিশ হাজার ধর্মের একজন যদি একটা ধর্ম-ধ্বজা তুলে বলে, আমরাই ঠিক আর বাকিরা সবাই ভুল। আমি এখানে ভুলের কথা বলছি না, সাধারণ প্রশ্ন উঠেছে। লক্ষ লক্ষ লোক চল্লিশ হাজার ধর্ম পালন করছে। এই যে হিন্দুদের সমন্বয় ভাব, হিন্দুদের যে শিক্ষার ভাব, হিন্দুদের যে সঙ্গীতের ভাব, নাট্যশাস্ত্রের ভাব; হিন্দুরা সব কিছুকে সমন্বয় করে নিয়েছেন। বর্তমানকালে এই সমন্বয় ভাব একমাত্র দেখা যাবে ঠাকুরের কথায়।

কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁশ হয়ে রইল। একটু হুঁশ হবার পর, কা! কা! কা! (অর্থাৎ কালী) এই শব্দ কেবল করতে লাগল। আমরা জানি, তোতাপুরীরও এই রকম হয়েছিল। বক্তব্য হল, সেই সচ্চিদানন্দ যিনি তিনি অনন্ত। তাঁকে যে কেউ অনন্ত ভাবে দেখতে পারেন, কারণ অনন্ত মন রয়েছে। তিনি আবার অনন্ত রূপে যে কারুর কাছে আসতে পারেন। কিছু কিছু ধর্মের লোক হাতে রাইফেল নিয়ে বলে, আমার ধর্মই ঠিক; এখন ভগবান কেন তাদের সামনে এসে বলছেন না, ভাই তুমি ভুলভাল কথা বলছ? ভগবানেরও ভয় আছে, তাঁকেও গুলি মেরে ঝাঁজড়া করে না দেয়। সেইজন্যই হয়ত তিনি এদের সামনে আসতে চান না। মজা করে বললাম। কিন্তু জিনিসটা সত্য। কারণ ভগবান যাকে তাকে দেখা দেন না; একটু প্রস্তুতি না থাকলে, মনের পবিত্রতা না থাকলে ভগবান দেখা দেবেন না।

পরের অনুচ্ছেদ থেকে আলোচনাটা পদ্মলোচন থেকে বিদ্যাসাগরে সরে আসছে। আলোচনটা খুবই ইন্টারেস্টিং, কারণ আমাদের মনে সব সময় প্রশ্ন আসে, ভাল লোকেদেরই কেন কেবল অবসাদ হয়? বিদ্যাসাগরের জীবনী আমরা সবাই মোটামুটি জানি। আমিও ছোটবেলা থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনী

পড়ে এসেছি, আর খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম। চিন্তার জগতে, শিক্ষার জগতে তাঁর যে কি সাংঘাতিক অবদান, কোন মানুষ বিদ্যাসাগরকে ভুলে যেতে পারবে না। সংস্কৃতের ব্যাকরণ নূতন করে বাংলায় লিখে রেখে গেলেন, ভাবা যায় না। কথামৃতে এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি কিভাবে দীন-দুখীদের, সাধারণ লোকেদের সাহায্য করতেন। কত দরিদ্র, সমস্যায় জর্জরিত কত মানুষকে তিনি সাহায্য করেছেন, ভাবা যায় না। ঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এর আগে বলছেন, ভিতরে সোনা চাপা আছে, কিন্তু খবর নাই। অন্য দিকে কলকাতা, কলকাতার বাইরে বিদ্যাসাগরের নামে কত কলেজ, কত সংস্থা। আমরা যখনই দান, দয়া, তার সাথে জ্ঞান শবটাও নিতে পারি; জ্ঞান, দান, দয়া এই কথাগুলো যখনই ভাবি তখনই আমাদের সামনে ভেসে উঠবেন বিদ্যাসাগর। শেষ জীবনে শহরের সমস্ত কোলাহল, সভ্য সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে বাংলার বাইরে এক অজানা অচেনা গ্রামে এসে সাঁওতালদের সাথে তিনি নির্জনে একা কাটালেন। মনের মধ্যে একরাশ তিক্ত ভাব। কেউ নিন্দা করলে উনি বলতেন, কই মনে পড়ছে না তো যে আমি তার ভাল কিছু করেছি।

আমি যখন প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনটা শুনেছিলাম, তখন কেঁপে উঠেছিলাম। দেওঘরে আমি অনেকদিন ছিলাম। ওই লাইনে যদি গিয়ে থাকেন তাহলে কলকাতার দিকে আসার সময় পড়বে যশিডি স্টেশন, ওখানে ট্রেন দাঁড়ায়। যশিডির পর আসে মধুপুর স্টেশন। মধুপুরের পরে কখন ট্রেন থামে, কখন থামে না, তারপর আসে জামতাড়া। জামতাড়ার পর আসানসোল। জামতাড়া আর মধুপুর স্টেশনের মাঝখানে একটা অতি ছোট্ট স্টেশন, নাম কারমাটার, বর্তমানে ওই স্টেশনের নাম বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ওখানেই একটা ছোট্ট গ্রামে আদিবাসীদের নিয়ে থাকতেন। সেখানে একটা হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারি, গরীব লোকেদের চিকিৎসা করতেন। ওখানেই তিনি শেষ জীবনটা কাটালেন। আমরা এর বেশি কোন আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের উদ্দেশ্য হল, ঠাকুর যেটা বলছেন সেটাকে ধর্মের দৃষ্টিতে ধারণা করা। আর এটা আপনাদের জন্য খুবই দরকারী; কারণ আপনারা সমাজে আছেন, দিনরাত এই ধরণের জিনিস দেখছেন, হয়ত আপনার সঙ্গেও এই জিনিস ঘটছে।

হিন্দু দৃষ্টিতে সৃষ্টি মানেই সব কিছুতে তিনটে গুণ –সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ সমস্ত কিছুতে আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কিছু নেই, যেটাতে এই তিনটে গুণ নেই; একমাত্র ভগবান এই তিনটে গুণের বাইরে। এই যে প্রকৃতি, যিনি সব কিছুর মা, তিনি হলেন ত্রিগুণাত্মিকা। আমাদের যে মন, আমাদের যে চিন্তা-ভাবনা, আমাদের যে শরীর, আমাদের পোশাক, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর মধ্যে এই তিনটে গুণ আছে। তমোগুণের আধিক্য হলে মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ হয়। একটা বইয়ে পড়েছিলাম, জানি না কতটা সত্য, কারণ একবারই আমি পড়েছিলাম, পরে জানার চেষ্টা করিনি। মা সাপ ডিম দিয়ে ডিমের উপর বসে থাকে তা দেওয়ার জন্য। বসে থাকতে থাকতে মা সাপের খিদে পেয়ে যায়। তারপর যখন ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো বেরোয়, মা তার বাচ্চাগুলোকে খেতে আরম্ভ করে। বাচ্চাগুলো তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে থাকে। জানি না এটা সত্যি কিনা। কতটা তমোগুণ ভিতরে থাকলে তবে গিয়ে নিজের সন্তানদের ভক্ষণ করবে। মানুষের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য থাকলে মানুষ হয়ত নিজের সন্তানদের খাবে না, কিন্তু প্রচণ্ড স্বার্থপর হয়। আমরা প্রায়ই খবরের কাগজে, সোস্যাল মিডিয়ায় খবরে দেখতে পাই, স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে, সন্তানকে কষ্ট দিচ্ছে। নেশা করে এসে বাড়ির লোকেদের উপর নানারকম উৎপীড়ণ করে, এগুলো সব তমোগুণের লক্ষণ।

রজোগুণ হলে মানুষ আপনজনদের জন্য অনেক কিছু করবে। যে ধর্মগুলি দেখবেন নিজের জন্য লড়াই করছে, সব রজোগুণী। আপনজনদের ভালবাসাকে বলে মায়া। এই মায়া এমনি একটা শব্দ, মায়া মানে আপনজনকে ভালবাসা। পড়াশোনা করে, ধর্মাচরণ করে বা অন্যান্য ভাবে আপনার যদি সত্ত্বগুণ বেড়ে যায় তখন লোকেরা আপনাকে একজন ভাল মানুষ বলবে। রজোগুণীকেও ভাল বলবে, তবে তার আপনজনরাই বলে, কারণ সে আপনজনদের জন্য অনেক কিছু করছে। যার জন্য বেশির ভাগ সন্তানরা নিজের বাবা-মাকে বলে, তিনি ভগবান, তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। বাব-মা সন্তানের জন্য ভাল লোক

হতে পারেন, কিন্তু অপরের জন্য না। একটা বাঘের বাচ্চার কাছেও তার মায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু অন্য প্রাণীর কাছে বাঘ মানেই এক হিংস্র জানোয়ার। একজন মারাত্মক ধরণের ক্রিমিনাল, তারও নিজের সন্তানের প্রতি একটা ভালবাসা আছে, এই ভালবাসা একমাত্র তার পরিবার সন্তানের জন্যই, অন্যদের প্রতি নেই।

কিন্তু একজন মানুষ সত্ত্বগুণে চলে গেছেন কি করে বুঝবো? সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হলে তার জ্ঞানের স্পৃহা জাগে। যার ভিতরে জ্ঞানের স্পৃহা আছে, মোটামুটি ভাবে বুঝে নেওয়া যায় যে তার মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়েছে। এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এই হাঁকডাক সত্ত্বগুণীর নেই। অনেক সময় তমোগুণী লোককে সত্ত্বগুণীর মত দেখায়, আসলে তমোগুণী। সত্ত্বগুণী চাইলে রজোগুণীর মত আচরণ করতে পারে, কিন্তু করে না। রজোগুণ যদি থাকে, এটা স্বাভাবিক যে তার মধ্যে আমিত্ব ভাবটা বেশি থাকবে। সত্ত্বগুণীরও আমিত্ব থাকে। আর তার সঙ্গে কোন ভাবে প্রত্যাশাও ঢুকে যায়, উভয় পক্ষ থেকে। কি রকম? যেমন মা ও সন্তান, দুজন হয়ে গেল। সন্তান মায়ের কাছে থেকে অনেক প্রত্যাশা করে, মাও সন্তানের কাছে প্রত্যাশা করে।

আমাকে একজন একটা জোক লিখে পাঠিয়েছিল। ছয় বছরের ছেলে মাকে বলছে, 'মা আমি তোমাকে ভালবাসি'। মা সঙ্গে সঙ্গে বলছে, 'স্কুলে কি দুষ্টুমি করে এসেছ'? আঠারো ঊনিশ বছর বয়সে ছেলে এসে মাকে বলছে, 'মা আমি তোমাকে ভালবাসি'। মা তখন ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে, 'হ্যাঁ রে কোন প্রেতনীর পাল্লায় পড়েছিস'? তিরিশ বছর বয়সে এসে যদি মাকে বলে, 'মা আমি তোমাকে ভালবাসি'। তখন মা বলে, 'বিয়ে করেছ ঠিক আছে, তাই বলে আমি বাড়ি ছাড়ছি না'। ছেলে চল্লিশ বছর বয়সে মাকে যদি বলে, 'মা আমি তোমাকে ভালবাসি', তখন মা বলে, 'তুমি যাই করে নাও না কেন, এই বাড়ি আমি তোমাকে লিখে দিচ্ছি না'। ছেলে কত সুন্দর করে বলছে, মা আমি তোমাকে ভালবাসি। ছেলে বলার আগেই মা বুঝে যায় ছেলে কি চাইতে এসেছে। এই হল মায়ের কাছে সন্তানের প্রত্যাশা। অন্য দিক থেকে মা এতটা করবে না, কিন্তু এটা থাকে; মা প্রত্যাশা করে আমার বয়স হলে ছেলে আমার কাছে থাকবে, আমার দেখাশোনা করবে। ইদানিং তো মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মা মেয়ে-জামাইএর সংসারে থাকছে। আগেকার দিনে এই জিনিস কল্পনাই করা যেত না।

উভয় পক্ষ থেকে প্রত্যাশা আসে; বাবা-ছেলে, মা-সন্তান, বন্ধু-বন্ধু, সাধু-ভক্ত। আমি সন্ন্যাসী, কোন ভক্ত বা ভক্তানীর সঙ্গে আলাপ হল। এবার আমার মনে প্রত্যাশা জাগল, তারও কিছু আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা জাগল। আর এই আশা এমন জিনিস যে, এর শেষ নেই। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র বলছেন, আশাই পরম দুঃখ। এই আশা আগুনের মত। যত আশা পূরণ হবে, আশা তত বাড়বে; ইন্ধন দিলে আগুন যেমন বাড়ে। ইদানিং কালে কত ঘটনা দেখছি, শুনছি, ছেলেরা বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছে। এই বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা কোথায় যাবে। আবার সন্তানের প্রতি ভালবাসায় দুজনে এমন ডুবে আছে যে সব সম্পত্তি লিখে দিচ্ছে। এইসব ঘটনা শুনলে খুব কষ্ট হয়। এই সব কিছুর পিছনে একটা জিনিস –প্রত্যাশা।

যখন আপনি দান-ধ্যান করছেন, তখন আপনি একজন সত্ত্বগুণী লোক। বিদ্যাসাগর অত জ্ঞানী, আর এত দান করছেন, কিন্তু কি হয় তাঁর কোথাও এইটুকু প্রত্যাশা ছিল –ভাই তোমাকে আমি সাহায্য করছি, কিন্তু মুখটা বন্ধ রাখবে। এটা দেখবেন, সমাজের ছবিটা যদি আপনি পড়তে পারেন, তাহলে দেখবেন, ইদানিং এই 'নিরাশা' শব্দটা কি প্রচণ্ড ভাবে আমাদের জীবনে বাসা বেঁধে নিয়েছে। ভারত হল একটা কমিউনিট দেশ। কমিউনিটি মানে হয়, যেখানে ছোট ছোট গোষ্ঠির লোক থাকে। এই গোষ্ঠিগুলোর সমস্যা হল, তারা লোকজনদের রাখবে, কিন্তু ওদের কাছে সিদ্ধান্ত হল –কচি পাঠা বুড়ো মেষ, দধির অগ্র ঘোলের শেষ। নেবে আপনার ভালটা, মন্দ যদি হয়ে যায়; একেবারে পিষে দেবে। সংগঠিত যা কিছু আছে, সংঘটিত ধর্ম, সংগঠিত কোন প্রতিষ্ঠান, জাতিপ্রথা, সমাজপ্রথা। সমাজপ্রথার

ভাল উদাহরণ গান্ধীজী; গান্ধীজী ওকালতি পড়তে গেলেন ইংল্যাণ্ডে, গুজরাতের বৈশ্য সমাজ গান্ধীজীকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জাতিচ্যুত ছিলেন, হুক্কা-পানি বন্ধ ছিল। স্বামীজীকেও করার চেষ্টা হয়েছিল, সন্ন্যাসী বলে বেঁচে গেলেন। এখন পঞ্চায়েত আদি হয়ে, সেই একই জিনিস সমানে চলছে। মানুষ অসহায় হয়ে যখন এদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে, ক্ষমা করে দিন; তখন পায়ের তলায় তাকে পিষবে। পিষে দিয়ে তাকে আপন করে নেবে, কিন্তু চিরদিনের জন্য ব্রাত্য করে রাখবে। তার মানে আপনার ভাল যা কিছু সেটা নেবে, আপনার মন্দতে আপনাকে পিষে ফেলবে। এই জিনিস প্রতিটি কমিউনিটিতে হয়, যেখানেই একটা কমিউনিটি লাইফ আছে।

আপনি কর্পোরেটা ওয়ার্ল্ডে চলে যান, একই জিনিস দেখতে পাবেন। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আছে, সেখানেও একই জিনিস। আপনার ভাল যেটা সেটা দিয়ে আপনার কাছ থেকে সুবিধা নেবে, দলের নেতা বা নেত্রী স্বার্থ সামান্য ক্ষুণ্ণ হলে, একটা কিছু এলেমেলো হয়ে গেলে, পার্টি আপনাকে পিষে ফেলবে। তখন নেতার কাছে গিয়ে হাতজোড় করে, মাথা নত করে, দিদি ভুল হয়ে গেছে বলতে থাকুন, এবার আপনাকে পিষবে। এবার আপনি নিজের মান-সম্মান সব খুইয়ে অপরের কাজ করতে থাকুন; কিন্তু ওখান থেকে আবার উঠে দাঁড়ানো আপনার পক্ষে মুশকিল হয়ে যাবে। কমিউনিটির এটা একটা বিরাট সমস্যা।

কমিউনিটি মানে ওখানে একটা অধিকার বোধ এসে দাঁড়াবে। মনে করুন আপনি কারুর ভাল করতে চাইছেন, তাকে আপন বলেই করতে যাচ্ছেন, কিন্তু ওখানে একটা কমিউনিটি আছে যার জন্য যার ভাল করতে চাইছেন সে মনে করছে এটা তার অধিকার। আপনার পাড়ার কোন গরীব ছেলেকে একবার পাঁচশ টাকা দিয়ে সাহায্য করে দেখুন। আগামী বছর সে আপনার সামনে আবার এসে দাঁড়াবে ওই পাঁচশ টাকার জন্য। যদি এবার আপনি না দেন, আপনাকে দুটো গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কারণ সে ধরে নিয়েছে এই টাকা পাওয়াটা তার অধিকার। কেন তার অধিকার? কারণ সে গরীব। একটা গরীবের গরীব হওয়ার সুবাদে যে তার এই অধিকার হতে পারে, এই জিনিস ভারত ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যাবে না। আমরা প্রায়ই দেখে থাকি, ভারতের এখানে রেল রোকো, ওখানে রাস্তা অবরোধ, আকছার হয়। এগুলো তো পাবলিক জিনিস, কেন অবরোধ? আমার এই এই দাবী পূরণ করতে হবে, এই দাবীগুলো পাওয়া আমাদের অধিকার। জাতি অনুসারে সংরক্ষণ, এটা আমার অধিকার।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এত জ্ঞানীগুণী, সত্ত্বগুণী, সরল লোক বলে তিনি সমাজের যে এত প্যাঁচ, এই জিনিসটাকে ধরতে পারলেন না। ধরতে না পেরে নিজেই নিজের মধ্যে ফেঁসে গেলেন। তিনি কোথাও ভেবে ছিলেন, আমি তোমার ভাল করে দিলাম, এখানেই শেষ হয়ে গেল; কিন্তু শেষ হয় না। একা একা আপনি যদি কাউকে ভাল করতে যান, বিদ্যাসাগরের মত আপনি বিপদে পড়বেন। অনেককে সঙ্গে নিয়ে, একটা সংগঠন করে সম্মিলিত ভাবে মানুষের মঙ্গল করার চেষ্টা করছেন, তাও একটু বাঁচার পথ থাকে, এছাড়া খুব মুশকিল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে জানি, যাঁরা এই রকম চেষ্টা করেছিলেন, পরে অনেক ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে লোকে মনে করবে আপনার নিজের কোন স্বার্থ আছে এর মধ্যে। পরে যখন আর সাহায্য করতে পারবেন না, বন্ধ করে দেবেন, তখন লোকেরা আপনাকে গালাগাল দিতে শুরু করবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেইজন্য শেষ জীবনে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হল কারমাটার। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই যে সত্ত্বগুণ, এই সত্ত্বগুণকে যদি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবে একশ ভাগ পরিণত না করা হয়, তাহলে অবসাদ আসার শুধু সম্ভবনা না, অবসাদ আপনার আসবেই আসবে। অবসাদ তিন রকম লোকের আসে। প্রথম হল যারা ঘোর তমোগুণী, যারা কোন কাজকর্ম করেনি, বাড়ি লোকেরা তাকে প্রস্তুত করায়নি; সবচেয়ে বেশি গত গত জন্মের পাপের বিশাল একটা পুটলি নিয়ে এসেছে। সেটার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করে করে সেটাকে ঠিক করার উদ্যম নেই। রজোগুণে কি হয়?

গীতাতে খুব সুন্দর বলছেন, *অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি*, এই শত্রুকে শেষ করা হয়ে গেল, এবার ওই শত্রুটাকে শেষ করতে হবে; এরা যদি কোথাও মার খেয়ে যায়, এদের অবসাদ এসে গ্রাস করে নেবে। সত্ত্বগুণী হল কচ্ছপের মত, কচ্ছপের শরীরটা অত্যন্ত কোমল। যার জন্য ওর শরীরটা একটা মোটা ও প্রচণ্ড শক্ত খোল দিয়ে আবৃত থাকে। কিন্তু যেটুকু শরীর বেরিয়ে থাকে সেখানে যদি একটু আঘাত লাগে, তাতেই কচ্ছপ শেষ। সেইজন্য একটু ভয় পেলে বা বিপদের আঁচ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ওরা খোলের মধ্যে ঢুকে যায়। সত্ত্বগুণীর ঢোকার কোন জায়গা থাকে না।

সত্ত্বগুণীর শরীর মন শুধু কোমল না, সুকোমল। ফুল ছুড়ে মারলেও সে মুর্ছা যাবে। ঠাকুর লুচি ছিড়তে গিয়ে হাত থেকে তাঁর রক্ত বেরিয়ে যেত, তাঁর শরীর এতই নরম ছিল। সত্ত্বগুণীর শরীর মন দুটোই নরম হয়। যার জন্য একটু সামান্যতম কটূ কথা তাকে বলে দিলে সে ভেঙে পড়বে। কিন্তু এই ধরণের সত্ত্বগুণী পুরুষ যদি নিজেকে পুরোপুরি ঈশ্বরকে দিয়ে দেন, আধ্যাত্মিক ভাবে যদি প্রচোদিত হয়ে যান, তিনি তখন এগুলোর পারে চলে যান, এগুলো তাঁর কাছে কোন ম্যাটার করে না। এই যে গীতায় বলছেন, *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*, দুঃখে উদ্বিগ্ন না হওয়া আর সুখের স্পৃহা না করা, এই জিনিস সত্ত্বগুণী পারেন না। যতক্ষণ ত্রিগুণাতীত না হচ্ছেন, ঈশ্বরে পুরোপুরি যতক্ষণ সমর্পিত না হচ্ছেন, ততক্ষণ এটা হবে না। আপনি বলবেন, কেন ধর্মান্ধ যারা তারা তো এসবের পারে? এখানে আমরা ধর্মান্ধদের কথা বলছি না, আসলে এরা বেশির ভাগই তামসিক। সত্যিকারের শান্তি তখনই হয় যখন আপনার সব কিছু ইউনিভার্সাল হয়ে যাবে। আপনি সবারই সাথে নিজেকে জুড়ে নিলেন, এই ইউনিভার্সালিটিটাই হল স্পিরিচুয়ালিটি। এই আধ্যাত্মিকতায় মনও নাশ হয়, অহংও নাশ হয়। মন ঈশ্বরে লয় হয়ে যায়, আর আমিত্বটাও ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন আমি বলে কিছু থাকে না, মন বলে কিছু থাকে না। তখন কি হয়? অবসাদ, দুঃখ এসে আর গ্রাস করতে পারবে না; তোমার কাছ থেকে তো এই জিনিস আশা করিনি –এই ধরণের কথা আর বেরোবে না। এই ধরণের লোক যখন কাউকে ভালবাসেন, এটাই তখন হয়ে যায় আসল দয়া।

দয়া সেইজন্য দুই প্রকার –একটা হল সত্ত্বগুণীর দয়া, আর-একটা হল ত্রিগুণাতীতের দয়া। যিনি ত্রিগুণাতীত, ওনার মায়া কখন হয় না; আমি একে ভালবাসব, ওকে কখন ভালবাসব না; এই জিনিস কখন তাঁর হবে না। যিনি সত্ত্বগুণী, যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন, তিনি যে দয়া করছেন, এতে তাঁর প্রত্যাশা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। যদি প্রত্যাশা থাকে, প্রত্যাশা যে ধরণেরই হোক না কেন; তার মানে নিরাশা আসার জন্য তিনি দরজাটা খুলে রেখেছেন। নিরাশা হওয়া মানেই, তাঁর মনটাকে ধীরে ধীরে খারাপ করে দেবে। আর আমাদের মত সাধারণ লোক হলে অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাব। ঈশ্বরের যিনি ভক্ত বা ঈশ্বরকে যিনি জেনেছেন, তাঁর যে দয়া –এই দয়া সব সময় অনপেক্ষঃ, কোন কিছুর জন্য কোন অপেক্ষা নেই। ফলে এদের কখন অবসাদ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই জিনিসটাকে যদি একবার বুঝে নিতে পারেন, তাহলে এর পরের পরিচ্ছেদটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। একজন ভক্তের প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

ভক্ত –মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কিরকম বোধ হল?

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। যে জিনিসটা একজন মানুষকে আধ্যাত্মিক তৈরী করে, সেই জিনিসটাই বিদ্যাসাগরের মধ্যে missing। কিন্তু এই কথা ঠাকুর বলছেন, যিনি ভগবান। এনার সঙ্গে আমরা এর ওর তুলনা করতে যাই, নাম নিচ্ছি না, কারণ কার কোথায় মনে লেগে যেতে পারে, ঠাকুর ভগবান, কারুর সাথে ঠাকুরের তুলনা চলে না; ঠাকুরের তুলনা যদি করতে হয় একমাত্র শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। **অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেত, এত বাহিরের কাজ যা কচ্ছে সে-সব কম পড়ে যেত; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেত**। স্বাভাবিক, কারণ যখনই আপনি কাজ করতে চাইবেন, যে কাজই হোক, কাজ সব সময় হয়

তমোগুণ থেকে, নিজের স্বার্থের জন্য করতে চাইছেন আর নয় তো রজোগুণ থেকে কাজ হয় নিজের নামযশ ছড়াবার জন্য; আর সত্ত্বগুণে যে কাজ হয়, সেই কাজ একটা দয়া ভাব থেকে আসে। ত্রিগুণাতীত কখনই এই কাজ করতে যাবেন না। পরে ঠাকুর, 'ঈশ্বরের আদেশ হলে', এই কথা বলবেন।

এই যে বলছেন, শেষে সব ত্যাগ হয়ে যেত, কাজের বাই কতটা আছে সেটা দেখে বোঝা যায় সত্ত্বগুণ থেকে আস্তে আস্তে তিনি ত্রিগুণাতীতের দিকে যাচ্ছেন কিনা।

অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন –এ-কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেত। একবার একটা মজার ঘটনা বলেছিলাম। আমি তখন ব্রহ্মচারী হয়ে এণ্টালীতে অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম। আমাদের একজন বিদেশী মহারাজ আমাদের খুব ভালবাসতেন। একদিন ওনার কলকাতা থেকে কোথায় কোথায় যাওয়ার কথা ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চটপট করে একটা লম্বা লিস্ট দিয়ে দিলাম, কলকাতা থেকে কোন কোন ট্রেন লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যাবে, কোন কোন ট্রেন দিল্লি পর্যন্ত যাওয়া যাবে; ওখান থেকে ট্রেন চেঞ্জ করে সেই সময় কি কি ট্রেন পাওয়া যাবে, ট্রেন পাওয়া না গেলে কি কি করতে হবে। ভারতের ট্রেন চলাচল নিয়ে আমার খুব আগ্রহ ছিল, মোটামুটি সব ট্রেনের রুট আর টাইম আমার মুখস্ত ছিল। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। মহারাজ খুব অবাক হয়ে আমার কথা শুনলেন, পাশে অন্যান্য সন্ন্যাসী ভাইরা ছিলেন, তাঁদের বলছেন, 'এর দেখছি রেল জগতের সব খবর জানা আছে, অন্তর্জগতের কোন খবর নাই'। বাস্তবিক এটাই হয়, বাইরের জগতের খবর যারা বেশি রাখে, তাদের কাছে এটাই হয়, অন্তর্জগতের কোন খবর তারা জানে না, জানার কথাই না।

বলছেন, **কারু কারু নিষ্কামকর্ম অনেকদিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ওইদিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়**। আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের এটাই সাধনা –নিষ্কাম কর্ম। কেন নিষ্কাম কর্ম? আপনি সেণ্টারে প্রাণপাত করে কাজ করে যাচ্ছেন, আপনি ভাল ভাবে জানেন এই কাজ আপনার কাজ না, আপনি ভাল ভাবে জানেন এই কাজ আপনার বাবা-মার কাজ না, আপনজনদের কাজ না। তারপর হঠাৎ একদিন বেলুড় মঠ থেকে একটা চিঠি এলো, অমুক মহারাজকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও। আপনি যে এতদিন খেটেখুটে একটা সাম্রাজ্য দাঁড় করেছিলেন, একটা চিঠিতেই আপনাকে আপনার সাম্রাজ্যকে ওখানেই ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হবে। এই করেই মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে যাবে। সমাজে এটাই মুশকিল হয়, কারণ একটা জায়গায় বসে আছে কিনা। বসে থাকার জন্য আমিত্বটা থেকে যায়। সেইজন্য এগুলো বলা সোজা যে আমি নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু হয় না।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা –স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা। এক্ষুণি যেটা বলা হল, দয়া দুই প্রকার –যখন আপনি সত্ত্বগুণ থেকে চারজনের ভাল করতে চাইছেন। আর-একটা হল, ঈশ্বরজ্ঞানের পর, ত্রিগুণাতীত হয়ে যাওয়ার পর সবার জন্য যে ভালবাসা হয়। এরপর অষ্টম পরিচ্ছেদে চলে যাচ্ছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ"

"ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত –মুখে বলা যায় না"

পরিচ্ছেদের প্রথমেই মাস্টারমশাই ঠাকুরকে খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন।

মাস্টার –দয়া কি একটা বন্ধন?

দয়া বন্ধন হবে, যদি সত্ত্বগুণ থেকে করা হয়, যেটা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্ষেত্রে দেখছি, কোথাও প্রত্যুত্তরে তিনি একটা ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি তো প্রতিদানে কিছু চাইছেন না,

শুধু একটু ভদ্র ব্যবহারের প্রত্যাশা করেছিলেন। সেটাও লোকেদের নেই, মানুষ এই রকমই হয়। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। ত্রিগুণাতীত যেটা করেন, গীতাতে বলছেন, *সর্বভূত হিতে রতাঃ,* এটাও দয়া আবার সত্ত্বগুণীর যে দয়া এটাও দয়া, তবে দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। **সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণের পার। প্রকৃতির পার**। এখানেই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কথা বলছেন, বলতে বলতে এক বাক্যে সোজা ব্রহ্মাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। ভিতরটা ঈশ্বরীয় ভাবে কতটা পরিপূর্ণ থাকলে তবে গিয়ে একটু সামান্যতম ওই ভাবের কথা হলে তড়াং করে মনটা ওখানে চলে যাচ্ছে।

যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌঁছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণই চোর। একটা গল্প বলি শুন –

কথামৃতের খুব প্রচলিত গল্প, আপনার অবশ্যই জানবেন। এখানে যেটা প্রকৃতির এলাকা, এই এলাকায় যা কিছু আছে সবেতেই এই তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো ও তমো থাকবেই থাকবে। যিনি ঈশ্বরদর্শন চাইছেন, আত্মজ্ঞান পেতে চাইছেন, কোন গুণই এটা তাঁকে দিতে পারবে না –না পারবে দিতে তমোগুণ, না দিতে পারবে রজোগুণ, না পারবে সত্ত্বগুণ দিতে। কিন্তু সত্ত্বগুণ কি করে, এতটা উঁচুতে নিয়ে চলে যাবে যে, সেখান থেকে সে চাইলে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে।

সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ, রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণে জ্ঞানের স্পৃহা হয়। এই যে আপনারা আমাদের এত লেকচার ইউটিউবে দিনের পর দিন শুনেই যাচ্ছেন, সত্ত্বগুণ না থাকলে শুনতেই পারতেন না। বিশেষ করে এই চ্যানেলের ক্লাশগুলো, যেখান কোন খোশগল্প নেই, যেখানে হাল্কা কিছু নেই, সহজ কিছু নেই; যেখানে জিনিসটা যেমন ঠিক তেমন ভাবে উপস্থাপন করে দেওয়া হয়। ধর্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম; সত্ত্বগুণ না হলে এই চ্যানেলের ক্লাশগুলো শুনতেই পারতেন না। ধর্ম তত্ত্বের সূক্ষ্ম জিনিসগুলো শুনছেন মানেই আপনার মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে।

সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম-ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণও আবার জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। সরাসরি হয়ত করে না, কিন্তু সেই অবস্থায় নিয়ে চলে যায়, যেখান থেকে আপনি মায়ার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন। **কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না**। তত্ত্বজ্ঞান মানেই তিনটে গুণের পারে। **কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ওই দেখ, তোমার বাড়ি ওই দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে সত্ত্বগুণ অনেক দূরে**।

আমি অনেক পড়াশোনা করা লোক, ভক্ত মানুষ দেখেছি, এনারা কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে একজন ভদ্রলোক আর একজন সাধুর মধ্যে অনেক তফাৎ। কারণ আমরা যে সমাজে থাকি, সেখানে ভদ্রলোক হওয়াটাই হল শেষ কথা। সংসারধর্ম যাঁরা পালন করছেন, তাঁদের জন্য শ্রেষ্ঠ হল একজন ভদ্রলোক হওয়া। আপনি একজন ভদ্রলোক হতে চাইছেন, তার জন্য আপনার ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই। ধর্ম হলে কি হয়? Being religious। অর্থ, কাম আর ধর্ম এই তিনটেই একজন ধার্মিক লোকের পুরুষার্থ। কিন্তু যাঁরা মোক্ষ পথের, তাঁদের কি? –Being spiritual। তিনটে মজার চ্যাপ্টার –Being noble, being religious and being spiritual। Being spiritual জিনিসটা পুরো আলাদা, যাঁরা আধ্যাত্মিক পথের পথিক, তাঁকে আগে একজন ভদ্রলোক হতে হবে, সেখান থেকে তাঁকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আর সেখান থেকে শেষ লাফ –Being spiritual। শেষ লাফ যখন সে দিতে শুরু করে, তখন সে আর কারুর দিকে তাকাবে না, কোন কিছুর দিকেই তাকাবে না। মোক্ষ পথের পথিক যাঁরা, ওনাদের সঙ্গে আপনাদের খাপ খাবে না। যাঁরা ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে আপনার খাপ

খাবে, তাঁদের কথা শুনতে ভাল লাগবে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগবে। এমন কি যাঁরা ধর্মপথের পথিক তাঁদের সঙ্গও আপনার ভাল লাগবে। কিন্তু যাঁরা মোক্ষপথের পথিক, এনারা সামাজিকতা করতে পারেন না; এনাদের মধ্যে সামাজিকতা, লৌকিকতা থাকে না; কারণ তাঁদের মন পুরো অন্য দিকে চলে গিয়েছে।

ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। কি করে বলবে; কেনোপনিষদে ঋষি বলছেন, *তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে*, তুমি যাঁর উপাসনা করছ, যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলে মনে করছে, আসলে এটা ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্ম কি, এটা মন ধারণা করতে পারে না, মুখ বলতে পারে না; যার হয় সে খবর দিতে পারে না। এটাকেই ঠাকুর অত্যন্ত সহজ ভাবে বলছেন। এর উপর কেনোপনিষদে খুব সুন্দর সুন্দর মন্ত্র আছে, যেমন একটা মন্ত্রে বলছেন, *যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ*, যে মনে করে আমি জানি না, সেই জানে। এখানে জানি না বলতে যারা অজ্ঞানী তাদের কথা বলছেন না। এবার ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন –**একটা কথা আছে, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফিরে না**।

ঠাকুর আবার খুব নামকরা চার বন্ধুর গল্প বলছেন। পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গায় চার বন্ধু মিলে বেড়াতে গেছে। খুব উঁচু পাঁচিল। **পাঁচিলের ভিতর কি আছে দেখবার জন্য চার বন্ধুই খুব উৎসুক। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠল। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক হয়ে 'হা হা হা হা' বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যে-ই উঠে সে-ই 'হা হা হা হা' করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে?**

জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এঁরা ব্রহ্মদর্শন করে আর খবর দিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধি হলে আর 'আমি' থাকে না। সমস্যাটা এইখানেই, আমিত্বটা চলে গেলে তখন কে খবর দেবে কাকে খবর দেবে, তখন দেখে ব্রহ্ম বাদে কিছু নেই। ব্রহ্ম ছাড়া যদি কিছু নাই থাকে, তাহলে অজ্ঞানী বলেও কিছু থাকে না; তখন কে উপদেশ দেবে, কাকে উপদেশ দেবে? **তাই রামপ্রসাদ বলছে, 'আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না'**। মনের লয় হওয়া চাই। মনের লয় হওয়া মানে, মনের তমোগুণ, তমোগুণ মানে স্বার্থভাব, চলে যাবে; মনের রজোগুণ, আপনজনের জন্য ভাল করার ইচ্ছা, চলে যাবে। আর সত্ত্বগুণ? এটা জানতে চাই, সেটা জানতে চাই, এর ভাল করব, ওর ভাল করব –এই ইচ্ছাগুলো চলে যাবে। মন লয় হয়ে যাওয়া –সত্ত্ব, রজো, তমো কোনটাই আর নেই। **আবার 'রামপ্রসাদের' অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই**। অহংতত্ত্ব মানে আমিত্বের ভাব। এই আমিত্বের ভাব বিভিন্ন ভাবে আসে, তমো থেকে আসে, রজো থেকে আসে আবার সত্ত্ব থেকেও আসে। এই আমিত্বেরও নাশ হতে হবে। **তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়**।

তার মানে, মন যে এই জগৎকে দেখছে, আসলে মন বহুকে দেখছে; বহু মানে আমি আছি সংসার আছে, সংসারে স্ত্রী আছে, স্বামী আছে, সন্তান আছে, বাবা-মা আছেন, ভাই-বোন আছে, বন্ধুরা আছে; বহু তো এসেই গেল। এই জগতে যে কজন মানুষ আছে, সবারই দুটি সমস্যা থাকে –প্রথম আমাকে কে দেখবে? দ্বিতীয় আমি না থাকলে এদের কে দেখবে? খুব মজার ব্যাপার। আমি যখন স্কুলে ছিলাম, কলেজে ছিলাম; তখন পুরো ব্রহ্মাণ্ডের কাজ হল আমাকে দেখা, আমাকে খুশি রাখা। বাচ্চাদের দেখবেন, কত রকমের তাদের চাহিদা। একটা নামকরা কথা –এক-একটা বাচ্চা হল সাদ্দাম হোসেন, একটা ডিক্টেটর। ওর মনের মত না হলে কান্নাকাটি করে, চেঁচামেচি করে সবাইকে অস্থির করে তুলবে। তার সঙ্গে আসে দায়ীত্ববোধ, যেমন মা মনে করে, আমি না দেখলে আমার সন্তানকে কে দেখবে। যিনি করেছেন তিনি দেখবেন, ঠাকুর তোমার সন্তানকে করেছেন ঠাকুরই দেখবেন, তোমাকে দেখতে হবে না। অনাথ শিশুকেও তিনি দেখেন।

কিন্তু কেউ কি পারবে সৃষ্টিকর্তার উপর সব ছাড়তে? কখনই পারবে না। কারণটা অত্যন্ত সহজ, ঈশ্বরের পথে চলার জন্য আপনি এখনও প্রস্তুত নন। ঈশ্বরের পথে চলার সময় যখন এসে যাবে, তখন কে বাবা, কে মা? ঈশ্বর পথের পথিকের কাছে তখন একটাই কথা –ধ্যুৎ; জগৎ জগতের জায়গায় থাকুক, আমার ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাই না। এই জিনিস ভাবা বা বলার সাহস কারুর নেই। ঠাকুর এই ধরণের ভক্তদের লক্ষ্য করে অন্য জায়গায় খুব সুন্দর বলছেন –কেউ তার দায়ীত্ব নেওয়ার জন্য এসে যায়। যতক্ষণ তার এই বোধ হচ্ছে –আমার কি হবে, আমাকে কে দেখবে? ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বার্থপরতার ভাব তার এখনও যায়নি। আর যতক্ষণ আপনার এই বোধ আছে, ওকে দেখার দায়ীত্ব আমার; বুঝে নিন আপনার এখনও ঈশ্বরের পথে চলার সময় আসেনি। স্বামীজীর গুরুভাইরা একবার চিঠি লিখে ভারতে আসবার জন্য বললেন। স্বামীজী তার উত্তরে বললেন –কার দেশ, কার মাতৃভূমি, আমি সবারই জন্য। অনেক কম বয়সে আমি স্বামীজীর এই চিঠিটা পড়েছিলাম; পড়ার পর আমার খারাপ লেগেছিল, স্বামীজী এটা কি বলছেন? আমরা মনে করতাম স্বামীজীর মত দেশভক্ত আর কেউ নেই। অনেক পরে গিয়ে স্বামীজীর কথাটা ধরতে পারলাম। কিসের দায়ীত্ব, যিনি ঈশ্বরের পথে চলেন তাঁর কারুর প্রতি দায়ীত্ব নেই। কিন্তু সেইজন্য কি হয়, নিজের জন্যও সে চিন্তা করে না।

হাজরা মশাইর মা কত দুঃখ করে ঠাকুরকে বলে পাঠাচ্ছেন, হাজরাকে একবার দেশে পাঠাতে, হাজরা তাঁর মায়ের কোন খবর নিতেন না। ঠাকুর হাজরাকে গালাগাল দিচ্ছেন। কারণ তিনি নিজের জিনিসগুলোকে ঠিক রেখেছেন। যখন নিজেরটা ঠিক রেখে অপরকে দেখছে না, তখন সে গালাগাল শোনার যোগ্য। কিন্তু যখন আপনার নিজেরই কোন সুখ-সুবিধার দিকে নজর নেই, যা হওয়ার হবে, এই ভাব যদি এসে থাকে, তার মানে নিজের প্রতিও দায়ীত্ব থাকে না, অপরের প্রতিও দায়ীত্ব থাকে না। মন, প্রাণ, অহং সব কিছু চলে গিয়ে একটাই শুধু থেকে যায় –তুমি, তুমি, তুমি; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। ঠাকুর বলছেন, ওই অবস্থা হলে তবে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। দুটি শব্দ 'ব্রহ্ম' আর 'জ্ঞান' মিলে একটি শব্দ 'ব্রহ্মজ্ঞান'। আমরা এই জিনিসটার অনেকবার ব্যাখ্যা করেছি, আবারও হবে।

ব্রহ্মজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানও যা আত্মজ্ঞানও তাই। জ্ঞান শব্দ এলেই আমাদের সামনে এই যে জগৎ আছে, জগতের বস্তুগুলি দেখছি, বস্তুগুলিকে জানছি, উপলব্ধি করছি; এটাকেই মনে করি জ্ঞান। আবার আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, এই ইন্দ্রিয়গুলি দিয়েও আমরা জগৎকে জানছি। এই জ্ঞানকে আমরা জগৎজ্ঞান, সংসারজ্ঞান বলতে পারে, এই জগৎজ্ঞান বা সংসারজ্ঞানে তিনটে জিনিস থাকে –প্রথম হল একজন জ্ঞাতা, যিনি জানছেন; দ্বিতীয় জ্ঞেয়, যেটাকে জানছি আর তৃতীয় হল জ্ঞান, জানার প্রক্রিয়া বা বিধি –জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান। ঈশ্বরদর্শন বলতে আমরা যেটা বুঝি, যেটা মনে করি; এখানে কি হয়, অনেক সময় ঈশ্বর কৃপা করে এক ঝলক একটু দেখিয়ে দিলেন, ধ্রুবকে যেমন এক ঝলক দেখিয়েছিলেন। আবার অনেক সময় মনের ভুলেতেও অনেক রকম দর্শন হয়। কিন্তু আমরা এখানে ঈশ্বরদর্শন বলতে ঈশ্বরজ্ঞানের কথা বলছি। যাঁরা ভক্ত হন, যেমন কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হন, কেউ যদি রামভক্ত হন, তিনি বলবেন আমার এটাই চাই, আমার আর কিছু লাগবে না। যেমন একটা শিশুর কাছে তার মা কত নামজাদা লোক সেটা জেনে তার কোন দরকার নেই, আমার কাছে আমার মা আমার মা, ব্যস আমার আর কিছু জেনে লাভ নেই।

কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান আমাদের ত্রিবিধ জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এর থেকে আলাদা। ঈশ্বরজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান না, আবার ইন্দ্রিয়জ্ঞানও না। এই জ্ঞানে একমাত্র সচ্চিদানন্দই থাকেন, সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দই আত্মা। যখন এই সচ্চিদানন্দকে নিজের ভিতরে বোঝার চেষ্টা করি, তখন আমরা তাঁকে আত্মা বলি, জীবাত্মা বলি। এই সচ্চিদানন্দ যখন আমিত্ব দিয়ে, অহং দিয়ে বোধ করছেন; আত্মা যখন পরমাত্মাকে বোধ করছেন, তখন মাঝখানে একটা অহং থাকে, এই অহংএর কোন দাম নেই। অহং থাকলেও যা না থাকলেও তাই। তখন সগুণ সাকার রূপে ঈশ্বরদর্শন হয়, শিব রূপে, কালী রূপে, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে বা যে কোন রূপে দর্শন হতে পারে। বিভিন্ন ধর্মের যাঁরা স্থাপক তাঁদেরও এই রূপেই

দর্শন হয়েছিল। তিনি যদি চান, মাঝে মাঝে ওই অহংটা মুছে দিতে পারেন, মুছে দিয়ে বলেন, তুইও যা আমিও তাই। তুইও যা আমিও তাই, এখানে অহং মুছে গেল। অহং মুছে যাওয়া মানে, যে রূপকে অবলম্বন করে সাধনা করেছিলেন, সেই রূপে গিয়ে তিনি নিজে ডুবে যান, নিজের আমিটা আর খুঁজে পান না। কিন্তু সেই একের ভাব এসে গেলে, অর্থাৎ একটু আমি-তুমি ভাব থাকলে, ভক্ত তখন খুব সুন্দর বলে –আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই। এই ভাব অনেকে ভক্তরই থাকে। কেন এ-রকম হয়, কেন সবার এ-রকম হয় না, এটা আমাদের বোধগম্যের বাইরে। আমরা শুধু এতটুকু জানি, এ-রকম হয়। নির্বিকল্প সমাধিতে এই সচ্চিদানন্দের বোধ, অহংশূন্য অবস্থায় হয়। অহংটাও মুছে গেল, এটাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞানে আমি, অহং এটা লয় হয়ে যায়।

এই আমিটা কে? যেখানে রামপ্রসাদের গানে বলছেন, 'আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না'। এই গানগুলি খুব গভীর অর্থবহ। মন্দিরে, পূজায় এই গানগুল হয় ঠিকই, কিন্তু কজন শ্রোতা বা গায়ক গানের অর্থ খোঁজেন বলা মুশকিল। রামপ্রসাদ বলছেন, মন তুমি যদি লয় না হতে পারো, হতে পারবে না, কেন পারবে না? কারণ রামপ্রসাদ থেকে যাচ্ছে। রামপ্রসাদ কে? অহং তত্ত্ব। মনে করুন, আমি স্বামী সমর্পণানন্দ আপনাদের সামনে কথামৃতের ব্যাখ্যা করছি, আসলে এই সমর্পণানন্দ বলে কিছু নেই, আছেন শুধু শুদ্ধ আত্মা। কোথাও কোন ভাবে, সেটা জানা নেই, অবিদ্যার একটা আবরণ শুদ্ধ আত্মার উপর এসে গেছে; ফলে আমি সমর্পণানন্দ হয়ে গেলাম, আপনি রাম, শ্যাম, যদু হয়ে গেলেন। যতক্ষণ এই অবিদ্যা না যায় ততক্ষণ অবিদ্যার ওই পাতলা আবরণটা যাবে না। মনও তাই শেষ তত্ত্বের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। সেইজন্য রামপ্রসাদ অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় বলছেন যে, মন যদি না পারিস; কিন্তু মন তো পারবে না, সেইজন্য আমিটাকে, অহংতত্ত্বকে ওতে ডুবিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এর একটা সমস্যা হল, যদি আপনি আমিকে ডুবিয়ে দেন, তাহলে তো নির্বিকল্প সমাধি হয়ে যাবে, অহং ব্রহ্মাস্মি হয়ে গেল।

তাহলে বেদের ঋষিরা যাঁরা আমাদের শাস্ত্র দিয়েছেন, শুকদেবাদি বা আমাদের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বা আচার্য শঙ্কর যিনি আমাদের সামনে শাস্ত্রকে খুলে দিলেন, এর থেকেও বেশি স্বামী বিবেকানন্দ, এনাদের নিয়ে আমাদের মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয়। কি সংশয় সেটাকে আমরা এখানে বিস্তারে ব্যাখ্যা করছি। যাঁরা দু-চারটে বই লিখছেন, বিভিন্ন সভা, সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন, এখানে তাঁদের কথা বলছি না, এনারা খুবই অর্ডিনারি। আগের আগের জন্মে হয়ত কিছু সাধনা করা আছে, কিছু পূণ্য আছে, এই জন্মে কিছু নাম হয়ে গেল। নাম হয়ে যেতেই একটা সংস্থা দাঁড় করিয়ে দিলেন, নামডাক হয়ে গেলে চারটে সাকরেদও জুটে যাবে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, অনেকে সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাওয়ার আশায়। এখন তো দেশে গাঁজা নিষেধ, গাঁজা খেতে পারবে না। তার বদলে অন্য অনেক কিছু আছে, সেটা জুটে যাবে। অনেক সব নামকরা সাধুবাবারা আছেন, ওনাদের ওখানে বড় বড় নেতারা যান, বড় বড় বিজনেসম্যানরা যায়, বিজনেস ডীলগুল ওখানেই হয়। সামনে ধর্মের একটা মুখোশ রাখা আছে, সেই মুখোশের আড়ালে অনেক কিছু হয়। বর্তমান কালের এটাই গাঁজা।

কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রকর্তা, যেমন শুকদেব বা আচার্য শঙ্কর, যিনি এই উচ্চমানের ভাষ্য আমাদের দিয়ে গেলেন, এর থেকে বেশি স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি হিন্দু ধর্মকে, ধর্ম জিনিসটাকে একটা নূতন ভাবে সামনে নিয়ে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তিনি তাঁর ইচ্ছায় যে কোন জিনিস করতে পারেন, তিনি নরদেহ ধারণ করে ভগবান রূপে এলেন, এসে এই নিরাকার রূপে থাকলেন, এই সাকার রূপে থাকলেন, তাঁর কাছে কোন ব্যাপারই না। সমস্যা হয় যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন সাধু মহাত্মা রূপে কেউ দেখবেন। যেমন বিদেশীরা যখন ঠাকুরের উপর লেখালেখি করেন, তাঁরা কেউ এই জিনিসগুলো বোঝেন না, তাঁদের বোঝার ক্ষমতাই নেই, সেইজন্য তাঁরা তখন ঠাকুরকে একজন সেন্ট, একজন মহাত্মা রূপে দেখবেন আর ওই রূপেই ব্যাখ্যা করবেন।

ওনাদের কথা বাদ দিন এটা আমার আপনার কথা। আমরা ছোটবেলা থেকে এই কথাগুলো শুনে শুনে বড় হয়েছি। আমরা এই কথাগুলো বিশ্বাস না করতে পারি, বুঝতে না পারি, কিন্তু আমাদের মনে ঢুকে গেছে –ভগবান অবতার হন, সেই অবতারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণও একজন অবতার। ইনি তো যে কোন জিনিস করতে পারেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে আনা হয়েছে; তিনি বারবার নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যেতে চাইছেন, কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকলে তো আর অবতারের কাজ হবে না, যার জন্য স্বামীজীকে নিয়ে আসা হয়েছে; ঠাকুর তাই স্বামীজীকে বারবার আটকে দিচ্ছেন। সমস্যা এটাই হয়, আর এখান থেকেই আমাদের অনেক রকম সংশয় উৎপন্ন হয়। তাহলে শুকদেব, স্বামীজী, এনারা কি নির্বিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, না কি করেননি? এই জিনিগুলোর বেশির ভাগই হল টেকনিক্যাল প্রশ্ন। সেইজন্য আমাদের যোগবশিষ্ঠে *ব্রহ্মবিদ বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ* এই শব্দগুলো বলছেন। এগুলো কি হয়, মানুষ যে জিনিসগুলো বুঝতে পারে না, তখন ওটার জন্য কয়েকটা শব্দ আবিষ্কার করে নেওয়া হয়, আর শব্দজালের আড়ালে থেকে বুঝতে না পারা জিনিসটাকে সহজে ম্যানেজ করে নেওয়া যায়।

দুটো সম্ভবনা এখানে এসে যায়। একটা হল এই আমিত্ব বা অহং পুরোপুরি ডুবে যায়নি। কারণ নির্বিকল্প সমাধির যদি আপনি কল্পনা করেন, ঠাকুরের কথায় নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, সমুদ্রে নামতেই সে সমুদ্রে মিশে গিয়ে লয় হয়ে গেল। তাহলে বলতে হয় এনারা সচ্চিদানন্দ সাগরে পুরোটা লয় হয়ে যাননি। দ্বিতীয় যেটা হতে পারে, যখন লয় হতে যাচ্ছেন, তখন সেই সচ্চিদানন্দ কোন ভাবে তাঁর আমিত্বটাকে আটকে দিলেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি যে কোন জিনিস করতে পারেন। যার জন্য দ্বৈতবাদীরা এই আইডিয়াটাকে নিয়ে অদ্বৈতবাদীদের আক্রমণ করেন। ঠাকুরও নিজেকে নিয়ে বলার সময় এই কথা বলছেন; তিনি যেন লয় হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কে যেন তাঁকে আটকে দিল; আর লবণের পুতুল যেন হঠাৎ পাথরের বা কাঠের পুতুল হয়ে গেল, যার জন্য তার আর পুরোটা লয় হল না। এর সমস্ত কিছুই হল টেকনিক্যাল আলোচনা, আমাদের এতে যাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু আমাদের জন্য যেটা দরকার, তা হল এই কাঁচা আমি। কাঁচা আমি মানে মিথ্যা আমি। আমি সমর্পণানন্দ, আসলে আমি তো আত্মা, আপনিও আত্মা; কিন্তু একটা মিথ্যার সঙ্গে আমাকে জুড়ে রেখেছি। মিথ্যা নিয়ে আমরা কত রাগারাগি, কত কথা কাটাকাটি করি; একদম মিথ্যা কথা বলবে না বলছি, আমি মিথ্যা কথা একেবারে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু আপনি তো নিজেকে মিথ্যার সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন; আপনার পুরো অস্তিত্ব মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আপনার দেহকে আপনি আমি বলে মনে করছেন। এই আমিত্বকে নাশ করা, এটাই সাধনা। এই আমিত্বের নাশ যদি না হয়, নির্বিকল্প সমাধিতে যদি না পৌঁছান যায়, তাহলে বাচ্চারা যেমন বাবা বা মায়ের নকল করে, আমাদেরও সেই রকম পাকা আমির নকল করতে হবে –আমি ঠাকুরের দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি মুক্ত ইত্যাদি এই রকম একটা ভাব অবলম্বন করা, যাতে বারবার এই কাঁচা আমি আমাদের যে এত বিশ্রি ভাবে জ্বালিয়ে মারছে, এই জ্বালিয়ে মারাটা কিছু দিনের জন্য বন্ধ করা যায়; আর এই যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, এগুলোও এই কাঁচা আমি থাকার জন্যই আসে; একটা ভাব অবলম্বন করে এটাকে আটকানো। যদি শুকদেব, শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ এনারা নিজের ইচ্ছায় বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা 'আমি' যদি রেখে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা মেনে নিচ্ছি ঠিক আছে আমার অহং আছে, আমরা তো নিজের ইচ্ছায় রাখছি না, তাঁর ইচ্ছায় রাখছি, বাকিটাকে কিন্তু পাকা আমি করে নিতে হবে, পাকা আমি মানে universal 'I'। এই কাঁচা আমি, individual 'I', false ego, এটাকে চেষ্টা করে নাশ করা; পুরো সাধনা এটাই। এই জিনিসটাকে নিয়ে এবার ঠাকুর আলোচনা করবেন।

এর আগে আমরা দেখলাম ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করলেন। সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছেন একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাপারে বলতে গিয়ে খুব সুন্দর একটা ছবি দিয়ে দিলেন –ভাল মানুষ যাঁরা, সত্ত্বগুণী যাঁরা, তাঁদেরও কেন অবসাদ এসে যায়। কারণ কোথাও তাঁদের

মনের কোণে একটা প্রত্যাশা থেকে যায়। তবে তার থেকেও বড় হল, এনাদের এই পার্থিব জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে যে একটা উত্তরণ হবে, সেটা আর হয়ে ওঠে না। ফলে তাঁদের প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা হয়ে থাকতে হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা থাকলে অবসাদ আসবে।

একজন ভক্ত –মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

এগুলো বোকা বোকা প্রশ্ন। যাঁদের কোন জ্ঞান নেই, তাঁরা এমন টেকনিক্যাল প্রশ্ন করবেন যে প্রশ্নগুলি বেকার ছাড়া কিছু না। কিন্তু ঠাকুর সবার প্রশ্নের উত্তর দেন। কারণ সমস্ত কিছুর মাধ্যমে ধর্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ সব কিছুর কথা বেরিয়ে আসে। এই যে রামপ্রসাদের কথা হল, রামপ্রসাদ এখানে অহংতত্ত্ব, কারণ রামপ্রসাদ আসলে সেই শুদ্ধ আত্মা। কিন্তু ওনার মন শুদ্ধ আত্মাতে লয় হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ রামপ্রসাদ থেকে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমিত্ব থেকে যাচ্ছে। আসলে এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ শুকদেবের ছিল, কি ছিল না; এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি ব্যাখ্যা করতে যাওয়া হয়, তাহলে নির্বিকল্প সমাধির উপর প্রশ্ন লেগে যায়। এই জন্য দ্বৈতবাদীরা বলে, নির্বিকল্প সমাধি মনেরই একটা অবস্থা। তাই কৃষ্ণই একমাত্র সত্য। সেইজন্য এনাদের ব্যাখ্যাকে বিশ্বাস না করে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলে দিয়েছেন ওটাকেই আমাদের মেনে নিতে হবে। আর ঠাকুর শাস্ত্রস্বরূপ, ঠাকুর যে শুধু গৃহবধুদের জন্য এসেছেন, তা তো না; ঠাকুর যে শুধু নরেন, রাখাল, লাটুর জন্য এসেছেন, তা তো না; শাস্ত্র মানেই সবার জন্য। যিনি অশিক্ষিত তার জন্যও শাস্ত্র, যিনি দর্শনের পণ্ডিত তাঁর জন্যও শাস্ত্র, আর যিনি বিরাট সন্ত মহাত্মা শাস্ত্র তাঁর জন্যও। যার জন্য আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে দেখি আর অবাক হয়ে যাই; নূতন ব্রহ্মচারীও কথামৃত পড়ছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট মহারাজও নিয়মিত কথামৃত পড়ছেন। আমিও আমাদের শ্রেষ্ঠতম আচার্যদেরও নিয়মিত কথামৃত পাঠ করতে দেখে এসেছি।

ঠাকুর এখন যে কথাগুলো বলবেন, সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটা সাধারণ কথা বলে নিলে ঠাকুরের বক্তব্য বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা দেখি অনেকেরই মনে ঠাকুরের ব্যাপারে অনেক জিজ্ঞাসা আছে, ঠাকুর কে ছিলেন, কি ছিলেন ইত্যাদি। সবারই পক্ষে তো ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝা সম্ভব না, ঈশ্বরতত্ত্ব খুবই কঠিন, আমরাই বা কতটুকু আর বুঝি। শাস্ত্র পড়ে অল্প একটু যা বিদ্যা অর্জন করেছি, তাই দিয়ে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর অবতার; ঠাকুরের প্রত্যেকটা কথাই শাস্ত্র। স্বাভাবিক ভাবে অনেকেই মনে করতে পারেন, 'আপনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, ঠাকুরের ভক্ত, আপনি তো ঠাকুরকে ওভাবেই দেখবেন, অন্য লোক কেন এই কথা মানতে যাবে'? ঠিক কথা। তবে এটাকে যাচাই করার জন্য আপনাকে একটা পরীক্ষা নিয়ে দেখতে হবে। কি সেই পরীক্ষা? যে কোন লোক কোন জিনিসটাকে হাতে নিয়ে খেলাতে পারেন? এখানে খেলা মানে খেলা না, ভাল অর্থে বলা হচ্ছে। লুডো খেলাতে এক বললে এক পড়বে, ছক্কা বললে ছক্কা পড়বে, যা চাইবেন সেটাই পড়বে, ঠাকুর বলছেন ওস্তাদ; যিনি ওটার মাস্টার।

গীতার যাঁরা ভাষ্য লিখেছেন, ওনাদের ভাষ্য পড়লে বোঝা যায় ওনারা গীতার অনুধ্যান করেছেন, গীতাকে বুঝেছেন। কিন্তু আচার্য শঙ্করের গীতা ও উপনিষদের উপর ভাষ্যগুলি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শাস্ত্র যেন তাঁর কলমের ডগায় নাচছে, ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মত। যিনি বড় ফুটবল খেলোয়াড় তিনি যেমন খুশি বলকে পায়ে নাচাতে পারেন। শাস্ত্র-ব্যাখ্যা মানে শঙ্করাচার্য। ওনার বৈশিষ্ট্য হল, উনি ভাষ্যে যে কথাগুলো বলেছেন প্রত্যেকটা কথা তত্ত্বে সমৃদ্ধ। অন্যান্য অনেকেই আছেন যাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লিখেছেন। যাঁর যেমন অনুভূতি, যাঁর যেমন বুদ্ধি, ঈশ্বর যাঁর উপর যেমন কৃপা করেছেন, তাঁরা তেমন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ঠাকুর কোন শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু তাঁর মুখনিঃসৃত কথাগুলির মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব যেন খেলা করছে। কথামৃত পড়লেই আমরা বুঝতে পারি। বড় বাড়িতে যেমন বাচ্চারা খেলা করে, এই মুহুর্তে এই ঘরে খেলছে, পরের মুহুর্তে অন্য একটা ঘরে গিয়ে

খেলছে, আবার হঠাৎ কখন চিলে কোঠায় উঠে একা একা নিজের মত এমন খেলায় মত্ত হয়ে যাচ্ছে যে বাড়ির লোকের তার নাগাল পায় না। পুরো বাড়িটাই তার কাছে যেন একটা স্বাধীন সাম্রাজ্য।

ধর্মের ইতিহাসে আমরা এই রকম কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা দেখিনি। মহাভারত ও ভাগবত মিলিয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অনেক বর্ণনা পাই, কিন্তু এতটা কোথাও নেই। স্বামীজীর রচনাবলী পড়তে গিয়ে আমরা দেখি, এই যে ঈশ্বরতত্ত্ব, এই ঈশ্বরতত্ত্বকে সমাজে নামানোর জন্য কি কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে বলছেন। কিন্তু ঠাকুর তো সেটাও করেননি, তিনি শুধু তত্ত্ব দিয়ে চলে গেছেন। ওই ঈশ্বরতত্ত্ব সমাজে নামানোর সময়, আমার-আপনার জন্য যখন নামিয়ে আনছেন, তখন ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত সমস্ত কিছু স্বামীজীর আঙুলে নাচছে। সেইজন্য ঠাকুরের কথাগুলো, ঠাকুরের যে জীবন, এর উপর প্রশ্ন চিহ্ন করা যায় না। বিশেষ করে যাঁরা ঈশ্বরভক্ত, তাঁদের মনে তো কখনই প্রশ্ন আসা উচিত না। বেদ, উপনিষদ না পড়ে থাকুন, গীতা না পড়ে থাকুন; শুধু কথামৃত যদি কেউ পড়েন, পড়ার পর ওটার যদি অনুধ্যান করেন, সাথে জপধ্যান যদি প্রচুর করেন, গভীরে প্রবেশ করার যদি চেষ্টা করেন তখন তাঁর কৃপায় ধীরে ধীরে এই প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন যেমন পরিষ্কার হবে তেমন তেমন বুঝবেন, বেদ যেটা বলেছেন; শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাধীন ভাবে একই কথা বলেছেন। বেদের ঋষিদের মুখ থেকে যা এসেছে, এই যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এসে একই জিনিস বলছেন। এটাকে বোঝা খুব দরকার।

একজন পণ্ডিত হতে পারেন, পণ্ডিতরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারেন, খুব জোর আচার্য শঙ্কর যেমন বলেছেন সেটার ব্যাখ্যা করতে পারেন; আমরা তাঁদের থেকে আরও কয়েক ধাপ নিচে এসে এই জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু ঠাকুর হলেন শাস্ত্রস্বরূপ। ঠাকুরের কথা দিয়ে শাস্ত্রকে মেলানোর চেষ্টা খুব অন্যায়। যাঁরা ঠাকুরের, স্বামীজীর দর্শনকে নিয়ে, তাঁদের জীবনকে বা কোন কিছুকে নিয়ে যখন প্রশ্ন তোলেন বা নিন্দা করেন, এনাদের জন্য একটাই শব্দ উচ্চারিত হতে পারে –অভাগা। ঠাকুর এনাদের বোঝার ক্ষমতা দেননি, তাই কি করা যাবে। আমরা তো অন্যান্য মত নিয়ে কখনই নিন্দা করি না, আমাকে না মানলে তুমি গোল্লায় যাবে, এই কথা আমরা কখনই বলি না। এখানে আমরা যে তত্ত্বগুলো আলোচনা করছি অত্যন্ত গভীর তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটু বলা আছে, কিন্তু আসলে জিনিসটা কি হয়, এটাকে বোঝার জন্য যতক্ষণ ঠাকুরের জীবন, ঠাকুরের কথা না দেখা হয়, না পড়া হয়, ততক্ষণ বোঝা যাবে না। কারণ ঠাকুর কোন কিছু ব্যাখ্যা করছেন না, কারণ ওটা তাঁর হাতের মুঠোয় আছে। সেইজন্য স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ঠাকুরের জীবনের মাধ্যম দিয়ে করতে হবে। আমাদের যে লৌকিক বুদ্ধি, আমরা অতি সাধারণ লোক, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলছি। এখন আচার্য শঙ্কর যদি নিজের মত কিছু বলতে পারতেন তখন আমরা বলতে পারতাম, কিন্তু আচার্য শঙ্করকে ঠাকুর অবতার বলছেন, আমাদেরও তাই মেনে চলতে হবে। ভগবান তখন আচার্য শঙ্কর রূপে এসে ধর্মকে এইভাবে স্থাপনা করলেন। কিন্তু তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এলেন তখন শাস্ত্রকে পুনরায় নূতন করে রেখে দিলেন। এই জিনিসটাকে যদি মাথায় রাখা হয়, বিশেষ করে আপনারা যাঁরা ভক্ত, তখন কথামৃত বুঝতে আপনাদের অনেক সুবিধা হবে। এগুলো ঠাকুরের উপলব্ধির কথা না, ঠাকুরের যত ঈশ্বরদর্শনাদি হয়েছে, তার কথা না; এটা বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, তা নয়; এটা নূতন করে শাস্ত্র, এটাই বেদ। ঠাকুর এবার সেই ভক্তের, যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, মহাশয়, শুকদেবের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন-স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছিলেন। এগুলো হল একটা সাধারণ আলোচনা। লোকেরা যেমন নানার রকম খোশগপ্প করে, যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরাও অনেক রকম গল্প করেন। ধর্মজগতের পুরুষরা তো আর ফিল্মস্টার, ক্রিকেট স্টারদের নিয়ে গল্প করবেন না, তাঁদের মত যাঁরা তাঁরা তাঁদেরকে নিয়েই আলোচনা করবেন। এখানেও তাই করছেন। ঠিক এই সমস্যার কথাই আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম। যদি তিনি সত্যিই ডুব দিতেন, তিনি লোকেদের উপদেশ দিলেন কি

করে? আসলে এর উত্তর নেই। উত্তর খুঁজতে গেলে একটাই উত্তর পাওয়া যায় –কারুর কারুর ক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর অনন্ত রূপ দেখিয়ে আবার 'আমি'টা রেখে দেন, যেমন রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল।

ঠাকুর বলছেন **–কেউ বলে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন –লোকশিক্ষার জন্য**। এই জিনিসটা কাউকে বোঝান অত্যন্ত কঠিন, যাঁর হয় তিনিই জানবেন; আপনার যখন আত্মজ্ঞান হবে তখন নিজেই বুঝবেন। ততদিন এতটুকু মনে রাখা –শুকদেব যে অবস্থায় গিয়েছিলেন, সেই অবস্থায় কিন্তু সবাইকে যেতে হবে। আমি, আপনি শুধু অবতার হতে পারব না, অবতার বাদে আমরা সব হতে পারি। কারণ অবতার সাক্ষাৎ ভগবান, ভগবানের সাথে আপনি এক হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ভগবান হতে পারবেন না। আর শুকদেবের যে ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান আপনাকে, আমাকে, সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। তবে সেখান থেকে ফেরৎ এসে ভাগবতের উপদেশ আমরা দিতেও পারি, নাও দিতে পারি, কিন্তু জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে। শুধু জেনে নিন রাস্তা কতটা বাকি।

পরীক্ষিৎকে ভাগবত বলবেন আরও কত লোকশিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন। একটু ফেকড়ি রেখে দিলেও চলে, কারণ একটা নূতন শুদ্ধ আমি এসে লোকশিক্ষার কাজ করবেন। এই কথাগুলো অত্যন্ত গভীর এবং উচ্চ কথা, যদি আপনারা নিজেরা চিন্তন করে বোঝার চেষ্টা করবেন, বুঝতেও পারেন। লেগে থাকতে হবে, সময় হলে ঠিক বুঝতে পারবেন –*কালেনাত্মনি বিন্দতি*, লেগে থাকলে এক সময় ঠাকুরই সব পরিষ্কার করে দেবেন। ভক্ত আবার প্রশ্ন করছেন।

একজন ভক্ত –ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি দলটল থাকে?

দল কেন থাকবে না, দল থাকবে; ঠাকুর যেমন নরেন, রাখাল, বাবুরাম, তারক আদিদের নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হল ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য। শুধু ঠাকুরই না, শঙ্করাচার্য করেছিলেন, যীশু করেছিলেন, ভগবান বুদ্ধ করেছিলেন, সবাই করেছিলেন। এমনকি অবতারকে যদি বুঝতে হয় তাহলে তাঁর শিষ্যদের দিয়েই বুঝতে হবে। অবতারকে সরাসরি বোঝা যায় না, চোখ ঝলসে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরও বলুন, আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না।

অত্যন্ত সাধারণ একটা জিনিস কল্পনা করুন। আমরা ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন নিয়ে বড় বড় কথা বলে যাচ্ছি। ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন; এর অর্থটা কি? অর্থটা হল, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, আত্মা বাদে কিছু নেই, ঈশ্বরই আছেন। যা আছে সব নাম আর রূপের খেলা; মানে ব্রহ্মই কেবল আছেন, আত্মাই শুধু আছেন। আপনারা যাঁরা শুনছেন, সবাই আপনারা শুদ্ধ ব্রহ্ম, শুদ্ধ আত্মা। যদি ভক্তির দিক দিয়ে দেখা হয়, তখন এটাই হবে –ঈশ্বরই এই সব কিছু হয়েছেন। আপনি, আমি, আমাদের যে বিভিন্ন রূপ, সব ঈশ্বরেরই রূপ। স্বামীজী যে জীবসেবার কথা বলেছিলেন, এইজন্যই বলেছিলেন; জীবসেবা নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। যাঁর সেবা করা হচ্ছে, তিনি ঈশ্বর, এই বোধ করা। এই বোধ ধরে রাখা যায় না, কিন্তু বারবার মনের মধ্যে আনতে হয়।

যদি এই বোধে সেবা না করা হয়, তাহলে এই সেবাটা চ্যারিটি হয়ে যায়, দান করলাম, ব্যস্ ওইটুকুই। দান করার মধ্যে যে দান করছে সে নিজেকে উঁচু মনে করে, আর যে দান গ্রহণ করছে সে নিজেকে নিচু মনে করে। কিন্তু শিবজ্ঞানে যখন জীবসেবা করা হয় তখন যাঁর সেবা করা হচ্ছে তিনি উঁচু, তার সামনে হাতজোড় করতে হয়, এই ভাব যে তিনি তাঁকে এই সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। সম্ভব হয় না, কিন্তু চিন্তা-ভাবনাটা এই ভাবের উপর করতে হয়। মা যশোদার কি সব সময় মনে থাকত যে, আমার কৃষ্ণ ভগবান? কিন্তু কোথাও তো একটা বোধ ছিল যে, আমার কৃষ্ণ ভগবান; সেইজন্যই তো যশোদার এত ভালবাসা। এখন যদি আপনার এই বোধ থাকে, ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে কিছু নেই, ঈশ্বর বই

কিছু নেই, তাহলে আপনি নিজের প্রচেষ্টায় কেন কিছু করতে যাবেন? যার জন্য ঠাকুর বলছেন, নির্বিকল্প সমাধি হলে একুশ দিন পর শরীর চলে যায়। কারণ সে আর ফেরৎ আসবেই না। কেনই বা ফেরৎ আসবে। কারণ ব্রহ্ম ছাড়া সে তো আর কিছু দেখছে না।

একটা মজার ঘটনা বলি। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় ঘটনাটা পড়েছিলাম। একজন ভদ্রলোক সিনেমার শ্যুটিং দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখছেন শ্যুটিংএর ওখানে একজন ভিখারী ভিক্ষা চাইছে। তখনকার দিনের হিসাব অনুযায়ী ভদ্রলোক ভিখারীকে পাঁচ পয়সা দিয়েছেন। ভিক্ষা যিনি নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামকরা অভিনেতা। ভিখারীর অভিনয় করবেন বলে ওখানে ভিখারীর অনুশীলন করছিলেন। অভিনেতা তখন ধন্যবাদ দিয়ে পাঁচটা পয়সা ফেরত দিলেন। শেষে ভদ্রলোক লজ্জায় একেবারে মরে গেলেন। এবার কল্পনা করুন এখানে যত জীব আছে, ভগবানই সব জীবের অভিনয় করছেন। এখন আপনার কি অবস্থা হবে, আপনি কি কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন? না কারুর ভাল করতে যাবেন?

এই জায়গাতে এসে একটা খুব জরুরী কথা দাঁড়িয়ে যায়। হ্যাঁ কারুর ভাল অবশ্যই করতে হবে, উপদেশ অবশ্যই দিতে হবে। কেন? কারণ আপনি যে শিব, এটাকে জানার জন্য। ওনাদের যদি আপনি সেবা না করেন, এটা জানা যাবে না। আপনি এখন যেটা জেনেছেন, সেটা স্বামীজীর কথা শুনে, শাস্ত্রের কথা মেনে। এবার এটাকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে সেবা করতে হবে। যখনই যে কাজ করা হবে সব কাজ কর্মযোগ রূপে করতে হয়। রেলওয়েতে যে টিটিরা কাজ করেন, রেলের যত প্যাসেঞ্জার আছে তাদের সেবা করাটা তার কাজ, এনারা সবাই সেই ঈশ্বরেরই রূপ। যখন কেউ বদমাইশি করবে, তখন দুষ্টরূপী ঈশ্বর এই ভাব আনতে হবে, তিনি দুষ্টলোক হয়ে এসেছেন। আমার এই জ্ঞান হয়নি, আমাকে আমার সংসার চালাতে হবে তাই রেল থেকে আমি মাইনে নিচ্ছি। কিন্তু যখন বোধ এসে যাবে, তখন আমি সমস্ত কিছু ছেড়ে মুক্তির পথে বেরিয়ে যাব। তখন যেটা করবেন সেটা বাস্তব হবে, এখন শুনে হচ্ছে। যেখানে বেশি দলটল নিয়ে নানা রকম প্রচেষ্টা দেখবেন, তার মানে এখনও ওখানে ওই বোধটা আসেনি।

তখন কেশব বললে, তবে আর থাক মশাই। (সকলের হাস্য) তবু কেশবকে বললাম, 'আমি' 'আমার' এটা অজ্ঞান। আমি করেছি, আমার সময় এটা হয়েছে, এগুলো অজ্ঞান থেকে আসে। **'আমি কর্তা' আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম –এ-ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না**।

আপনারা সংসারে আছেন, এই জায়গাটা আপনাদের খুব ভাল করে বোঝা দরকার। এই সমস্ত কথা যে ঠাকুর বলছেন, কি কি জিনিসের কথা বলছেন? –স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গাড়ি, বাড়ি, এগুলো অজ্ঞান। তাহলে কি সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে যেতে হবে? না, তা কখনই না; কারণ আপনি যদি সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে যান খুব বিপদে পড়বেন। কারণ তাতে একটা যে মস্ত বড় সম্বল এই সংসার যেটা ছিল, সেটাও যাবে; আর ওদিকে জ্ঞান তো হবেই না। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সবাইকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে এটা মনে রাখবেন, সবাইকেই শুকদেবের অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। আপনার, আমার সবাইকে সেই বিশ্বামিত্র মুনি, বশিষ্ঠ মুনির অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, সেই যাজ্ঞবল্ক্যের অবস্থায় যেতে হবে, এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আর উদ্দেশ্য একদিন সফল হবে, তা এই জন্মে হোক কি পরের জন্মে হোক, কি দশ বা একশ জন্মে হোক। শেষ সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, এগুলো সব ছেলে ভোলান কথা, এই ধরণের কথায় যাবেন না। শাস্ত্র যেটা বলছেন, ঠিক সেই রকম যাবেন। ঠাকুর কখন কাউকে বলছেন না যে, আমি শেষ সময়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

শ্রীশ্রীমা ভক্তদের উৎসাহিত করার জন্য বলছেন, মা সবাইকে উৎসাহ দিতেন, তা নাহলে তো কেউ কিছু করতে চাইবে না। সংসারে থাকতে গেলে এই সমস্ত কিছুকে support system হিসাবে রাখতে হয়। আপনারা দেখবেন, বেশির ভাগ বাড়িতে, বিশেষ করে বাচ্চা থাকলে, কিছু দরকারি ওষুধ

রাখা থাকে। জরুরী দরকারের জন্য প্যারাসিটমল বা এ্যাসিডিটি, পেটের গণ্ডগোলের জন্য টুকটাক কিছু ওষুধ রাখা থাকে। এটা হল support system, কিছু এমার্জেন্সি হয়ে গেলে যাতে ওষুধের জন্য দৌড়াদৌড়ি না করতে হয়। জীবন চলবে নিজের মত, খাওয়া-দাওয়া চলবে নিজের মত; কিন্তু যদি কখন কিছু হয়ে যায় তখন সে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে বসবে। ঠিক তেমনি স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্ভ্রম, গাড়ি, বাড়ি, ধন, সম্পদ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এগুলো সব support system।

কোন বাড়িতে কেউ সারাদিন ওষুধের বাক্স নিয়ে বসে থাকে না। তবে কিছু কিছু লোক থাকে যাদের ওষুধগত প্রাণ। সকাল, বিকাল কিছুক্ষণ পর পর একটা কোন ওষুধ মুখে না দিলে এদের শান্তি হয় না। আপনারা যাঁরা ধর্ম জীবন-যাপন করতে চাইছেন, আধ্যাত্মিক পথে চলতে চাইছেন, আপনাদের এটা ভাল করে মনে রাখা দরকার, এগুলো সব support system। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা আছেন, বাবা-মার মত আপনাকে কে এত ভাল আশ্রয় দেবে? সংসারের জ্বালায়, সামাজিক ব্যাধির জ্বালায় আপনি যত জ্বলেপুড়ে আসুন, মা তাঁর যত বয়সই হয়ে থাকুক, আপনাকে কিন্তু সব সময় আশ্রয় দেবেন। আপনি যত বড়ই হয়ে যান, আপনাকে খোকা বলে আশ্রয় দেবেন। আমরা সন্ন্যাসীরা সংসারের কিছুই জানি না, তবে শুনতে পাই সংসারীরা নাকি বলে, স্বামী-স্ত্রী এক অপরের সহায়। বাল্মীকি রামায়ণে আমরা খুব সুন্দর এই চিত্রটা পাই। শ্রীরাম বালি বধ করলেন, বালির স্ত্রী তারা এসে বিলাপ করছেন –হে রাম! যে তীর দিয়ে আমার স্বামীকে বধ করলেন, সেই তীর দিয়ে আমাকেও মেরে দিন। কারণ স্বর্গে আমার স্বামী একা কি করে থাকবেন, আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে, ইত্যাদি। স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী, ইংলিশে বলে better half, কেন? এক অপরকে ধরে আছে। আমি যদি স্লিপ করে পড়ি তুমি ধরবে, তুমি স্লিপ করে পড়লে আমি ধরব। আপনার মধ্যে যে ইমোশানগুলো আছে, ভালবাসা আছে, কোথায় বার করবেন? নিজের সন্তানের উপরে। কিন্তু তাই বলে সব সময় ব্যাটা ব্যাটা করবেন? একেবারেই না।

আপনার জীবন চলবে ঈশ্বরের পথে। ঈশ্বরের পথে চলার জন্য, ওই পথে স্থির থাকার জন্য স্বামী-স্ত্রী-বাবা-মা-ভাইবোন এনাদের দরকার, এইটুকু। আগেকার দিনের আমাদের হিন্দু ধর্মজীবন এভাবেই চলত। সবাইকে এভাবেই দেখা হত। তোমার ধর্মজীবনের এনারা সহায়। ঠাকুর বলতে চাইছেন, আসলে এগুলো অজ্ঞান থেকে হয়। তার কারণ, যেখানে জুড়ে গেলেন, সেখানেই অজ্ঞান, এবার আপনাকে সংসার বিষয়ারণ্য টেনে নেবে। যে জিনিসটা সাহায্য করে, সেই জিনিসটাই যে কিভাবে খারাপ করে, এখানেই পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন খাওয়া-দাওয়া, খাবার যত স্বাদু হোক, ভাল হোক; বেশি খেয়ে নিলে পেটের গণ্ডগোল হবে। ওষুধ যা কিনা রোগের উপশম করে, বেশি খেয়ে নিলে ক্ষতি করবে। স্ত্রী, পুত্র, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে মন যদি বেশি চলে যায়, এটাই তখন বিষ হয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রিত যদি থাকে, এটাই ওষুধ। ঠাকুর যে অজ্ঞান বলছেন, বেশি মাত্রাকে নিয়ে বলছেন।

তখন কেশব বললে, মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বললুম, কেশব তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। "আমি কর্তা" "আমার স্ত্রী-পুত্র" "আমি গুরু" –এ-সব অভিমান, "কাঁচা আমি"। এটাকে বলে 'false I', আমিত্বের যে ভাব এটা কাঁচা আমি। **এইটি ত্যাগ করে "পাকা আমি" হয়ে থাক –"আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা"**।

আমরা আবার সেই উদাহরণে যাচ্ছি। আপনি ধর্মপথে চলছেন। ধর্মপথ এমন একটা পথ যে পথটা পিচ্ছিল। ওই পিচ্ছিল পথে আপনি এটা ওটা ধরে এগিয়ে চলেছেন। এখন যেটাকে ধরেছেন, ওটাকেই যদি ধরে বসে থাকেন তাহলে তো আর এগোতে পারবেন না। একটাকে ধরে নিয়ে আর-এক পা এগিয়ে যেতে হবে। আমি একটা ঘটনা আমার নিজের বাস্তব অনুভব থেকে বলছি। আমার টিয়া বই পড়ে ডক্টঃ এ.পি.জে আবদুল কালাম বললেন, টিয়া বই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাঁচটি বইয়ের মধ্যে

একটি। সেটা নিয়ে যে আমার কোন গর্ব হওয়ার কিছু আছে সে রকম কিছু না, কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই টিয়া বই হয়েছে। কিন্তু জিনিসটা তাই, প্রত্যেক প্রানী যে আপনার জীবনে আসে, প্রত্যেক বস্তু যেটা আপনার জীবনে আসে, তারা প্রত্যেকেই আপনাকে সাহায্য করবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সেইজন্য যে জিনিসটা যেটার জন্য সেটাকে ওই কাজেই লাগাতে হয়।

বাচ্চা বয়সে আমরা রাবার ব্যবহার করতাম পেন্সিলের লেখা মোছার জন্য, পেন্সিল ইরেজার। রাবারের কাজ লেখা মোছা, কিন্তু ওই রাবার ওকে তাকে মারার জন্যও ব্যবহার করা হয়। ফাউন্টেন পেনে কালি ভরা হত লেখার জন্য, কিন্তু সামনের বেঞ্চে বসে থাকে বন্ধুদের পিছনে কালি ছেটাতেও ব্যবহার করা হয়। রাবার বা পেন এসব কাজের জন্য নয়, ঠিক তেমনি যে জিনিসটা যেটার জন্য, সেটাকে সেই কাজের জন্যই ব্যবহার করতে হয়। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, টাকা, এগুলো সব ধর্মপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধর্মপথে এগোবার জন্য দরকার এই ভাব –আমি ঠাকুরের দাস, আমি ঠাকুরের সন্তান। কিন্তু আমরা তো জানতে পারছি না যে আমি তাঁর সন্তান, ঠাকুর তো এসে আমাকে এই কথা বলে যাননি। আমি তাঁর সন্তান রূপে ভাবতে পারছি না। এটাকে পারার জন্য, আমাকে এনাদের সাহায্য নিতে হবে। নদীতে আপনি ডুবে যাচ্ছেন, সেই সময় আপনার পাশ দিয়ে একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে। আপনি এখন সেই মড়াটাকেই আঁকড়ে ধরলেন, গরু, মোষ, যে মড়াই হোক। আপনাকে তো যেভাবে হোক আগে বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্য পচা মড়া হোক, পচা কাঠ হোক, নাকে দুর্গন্ধ লাগুক, আপনাকে আগে পারে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু ওটাকে ধরে ওখানেই আটকে থাকা না।

একজন ভক্ত –'পাকা আমি' কি দল করতে পারে? এই ভক্তের মাথায় এখন শুধু কেশবচন্দ্র সেন চলছে। ঠাকুরও সহজ ভাবে, উদাহরণ সহ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপতি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি –এ 'আমি' "কাঁচা আমি"। আমি এই করেছি, আমি ওই করেছি, আমি এটা করে দেব, এগুলো আমিত্বের ভাব, কাঁচা আমি। *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, ভক্ত কি করবে? ভক্ত ভগবানের কথাই বলবে, ভগবানের কথাতেই আনন্দ করবে, ভগবানের কথাতেই রমণ করবে, এতে কোন দোষ নেই। কিছু দিন আগে আমাদের গীতার ক্লাশের উপর একজন একটা কমেন্ট লিখে পাঠালেন, 'আপনি একটা মহামুর্খ, নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন'। আরে ভাই, আজ পর্যন্ত কেউ নিজেকে মহামুর্খ মনে করেনি। মুখে বলে মুর্খ ঠিকই, কিন্তু ভিতরে অহঙ্কার না থাকলে কেউ নিজেকে মুর্খ বলতে পারে? ভদ্রলোক কমেন্টে বলছেন, 'আপনার কি আত্মজ্ঞান হয়েছে যে গীতার ব্যাখ্যা করছেন'? ভাই আমার আত্মজ্ঞান হয়নি, আমি মানছি। আত্মজ্ঞান হয়নি বলে আমি তাহলে এখন কি করব, নাটক, নভেল নিয়ে থাকব? আর এগুলোর উপর ব্যাখ্যা করতে থাকব? শাস্ত্রকে নিয়ে থাকতে থাকতে, শাস্ত্র নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে উন্নতি হয়। আপনি যদি জীবনে উঠতে চান, তাহলে শাস্ত্রে যত থাকবেন তত জীবেন উঠবেন।

একজন গৃহবধূর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, মোবাইলে লেকচার চালিয়ে দিয়ে রান্না করতে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন প্লে লিস্ট ধরে কি শোনেন'? বললেন, 'আমি জানি না'। 'কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কি শোনেন'? 'আমি জানি না, আমি চালিয়ে দিয়ে শুনতে থাকি, খুব ভাল লাগে আর আমি এটা বুঝতে পারছি যে ঈশ্বরীয় কথা চলছে'। এখান থেকেই এই গৃহবধূ এগোবেন। আরও এগিয়ে একদিন তিনি নিজে থেকেই মন দিয়ে শাস্ত্রের কথাগুলো একটু গভীরে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন। সেখানে ওনার এই বোধটা নেই যে আমি বিরাট কিছু হয়ে গেলাম। উনি ইচ্ছে করলে আমাদের লেকচার না চালিয়ে সিনেমার গান চালাতে পারতেন, যেটা বেশির ভাগ মহিলার করে থাকেন। এতে আর যাই হোক, সেখান থেকে তো তিনি এক ধাপ সরে এসেছেন।

ঠিক তেমনি যাঁরা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরাও এইভাবেই এগোচ্ছেন। ঠাকুরের কথা ঠাকুরের সামনেই তাঁরা পরিবেশন করছেন। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করছেন। এটাই ঠাকুর এখানে

কেশবচন্দ্রকে বলছেন। খুবই প্রয়োজনীয় কথা। অফিসে যাঁরা কাজ করছেন, সংসারে যাঁরা কাজ করছেন, আর যেখানে যেখানে যাঁরা কাজ করছেন; কাজ পাল্টাতে হয় না, কাজের প্রতি নিজের দৃষ্টভঙ্গীটা পাল্টাতে হয়। আর যাদের সুযোগ আছে, একা একা থাকার সেই রকম মানসিকতা যাঁদের আছে, তাঁরা একা থাকবেন। সবারই এই সুযোগ হয় না, সুযোগ হলেও সবারই এই মানসিকতা হয় না। যাঁরা আর পেরে উঠতে পারেন না, অনেক বয়সে তাঁদের মনে হয়, কোথায় ফেঁসে গিয়েছিলাম। ফেঁসে আপনি যাননি, কারণ তখন আপনার সময় হয়নি, ওটারও তখন আপনার জীবনে দরকার ছিল। এটা ভাবতে ভাবতে এক জন্ম কি দুই জন্ম পরে আপনার ভিতরে ঠিক ঠিক ত্যাগের ভাব এসে যাবে।

মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। আমাকে ঠাকুর আদেশ দেননি, আমি আচার্যদের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সাধুসঙ্গ করে যেটুকু জ্ঞানলাভ হয়েছে, তারপর আমার সঙ্ঘ আমাকে আদেশ দিয়েছেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে, তাই দিয়ে যতটুকু বুঝেছি সেটুকু দিয়ে আমি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছি। কিন্তু আমার যদি এই ভাব আসে, আমি উপদেশ দিচ্ছি, এখানেই আমি শেষ। ঠাকুর বলছেন, **যেমন শুকদেব ভাগবতকথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে কেউ আদেশ পায় –সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয় দোষ নাই**। ঈশ্বর একবার, দুবার, তিনবারও আপনাকে সাক্ষাৎ দিয়ে আদেশ করতে পারেন, আপনি যদি না শোনেন, ধাক্কা মেরে আপনাকে দিয়ে করাবেন। নরেন বলছেন, আমি ওসব লোকশিক্ষা দিতে পারব না। ঠাকুর বলছেন, তোর ঘাড় করবে।

তার 'আমি'; "কাঁচা আমি" নয় –"পাকা আমি"। আবার এই জায়গাতে 'পাকা আমি' আর 'কাঁচা আমি'র কথা আসছে। ধরুন স্বামীজী, স্বামীজী আমেরিকা চলে গেলেন বা আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে শিক্ষা দিয়েছেন, এখানে এই স্বামী বিবেকানন্দ আর কলকাতার নরেন্দ্রনাথ দত্ত, এই দুজনকে আপনাদের কি এক মনে হয়? বলবেন, কেন এক মনে হবে না, তিনি সাধনা করেছেন, সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমার কিন্তু মনে হয় না দুজন এক। আচার্য শঙ্কর, এই শঙ্কর আর কেরলের কালাডি গ্রামে যে শঙ্কর জন্ম নিয়েছিলেন, এক মনে হয় না। তাঁর এই যে কাঁচা আমি, যেটা দিয়ে আমরা রামপ্রসাদ দিয়ে শুরু করলাম, এই কাঁচা আমি লয় হয় গিয়ে যে শূন্য হয়ে গেল এটা কি দিয়ে পূরণ হবে? কারণ প্রকৃতির নিয়ম যে কোথাও শূন্য থাকে না। তখন কি হয় ওই 'আমি' শূন্যস্থানে ভগবান পুরোদমে ঢুকে যান। তাই এনাদের যত কথা, সব কথা ঈশ্বরীয় কথা।

স্বামীজী যে কথাগুলো বলেছেন, সমাজের বুকে ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, কোনটাই নরেন্দ্রনাথের কথা না, এগুলো পাকা আমির কথা; পাকা আমির কথা মানে সরাসরি ঈশ্বরের কথা। এই জিনিসটাকে বোধ করতে, বুঝতে, মানতে হয়ত আপনাদের সময় লাগবে, কিন্তু আজ হোক কাল হোক একদিন অবশ্যই মানবেন। এখানে ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিন, ঠাকুর তো ভগবান, ওনার সব কথাই ঈশ্বরের কথা। কিন্তু যাঁরা আচার্য, যেমন শুকদেব, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য, স্বামীজী এনারা আধ্যাত্মিকতার, ধর্মের যত কথা বলছেন, সব কথা সরাসরি ঈশ্বর থেকে আসছে, কারণ এনাদের কাঁচা আমি চলে গিয়ে পাকা আমি এসে গেছে। পাকা আমির কথা মানে ঈশ্বরের কথা।

আমরা জিলিপির উদাহরণ দিয়ে থাকি। যেটারই জিলিপি করুন, কলাই ডালের করুন, ময়দার করুন, সুজির করুন, প্রথমে ওটাকে ভাল করে মাখা হয়। তারপর সাধনার আগুনে গিয়ে ওর নিজস্ব রসটা শুকিয়ে যায়। সবার এটাই হয়, সাধনার আগুনে রস শুকিয়ে যায়। শুধু শুকিয়ে গেলে তো জিলিপি হবে না। তারপর যখন ঈশ্বরের রসে তাকে ডোবান হয়, জিলিপি তখন ওই রস টেনে নেয়। কারণ তার নিজের রস সাধনার আগুনে বেরিয়ে চলে গেছে, কাঁচা আমি বেরিয়ে চলে গেছে, এবার পাকা আমি ঢুকে গেল। এটাই ঠাকুর বলছেন, পুর দেওয়া, পুরগুলো সব আলাদা, কোনটা কলাই ডালের পুর, কোনটাতে ক্ষীরের পুর।

কেশবকে বলেছিলাম, 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' এতে কোন দোষ নাই।

তুমি দল দল করছ। তোমার দল থেকে লোক ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। কেশব বললে, মহাশয়, তিন বৎসর এ-দলে থেকে আবার ও-দলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল। এটাই তো হবার কথা। **আমি বললাম তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?** এই জিনিস আমাদের সবারই হয়। কেউ একটু মিষ্টি করে বলল, মহারাজ কি দারুণ সব কথা বলেন। তারপর শুনি যে, বাইরে গিয়ে এর-ওর কাছে আমার নামে নানা রকম নেগেটিভ কথা বলছে।

আর কেশবকে বলেছিলাম, আদ্যাশক্তিকে মানো। এই সচ্চিদানন্দ, তিনি নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত যত ক্রিয়া হয় সব আদ্যাশক্তি করেন। শক্তি আর শক্তিমান অভেদ, ব্রহ্ম যা শক্তিও তাই। **ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ –যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়।** কাঁচা আমির জন্য ব্রহ্ম, শক্তি সব আলাদা বলে বোধ হয়। **বলতে গেলেই দুটো**। যেমনি কথা বললাম, চিন্তন করলাম, মানে মনের এলাকায় আছি, দেহটাও মনের এলাকায়। **কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল**। কেশব সেনকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন, খুব উচ্চ আধার ছিলেন।

এই প্রসঙ্গটা কথামৃতে আগেও এসেছে। **একদিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি বললাম, তোমার লেকচার শুনব। চাঁদনিতে বসে লেকচার দিলে। তারপর ঘাটে এসে বসে অনেক কথাবার্তা হল। আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব বললে, আর শিষ্যেরাও সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বললাম, 'বল গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব', তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অত দূর নয়, তাহলে লোকে গোঁড়া বলবে**। 'গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব কথাটা বৈষ্ণবদের কথা কিনা। বৈষ্ণবরা যখন ঠাকুরের নিন্দা করে খুব খারাপ লাগে।

এরপর ঠাকুর মায়ার একটা বর্ণনা দিচ্ছেন, সেখানে আবার হৃদয়রামের কথাও আছে। আমরা এই যে এতক্ষণ ব্রহ্ম, আত্মা নিয়ে বিরাট আলোচনা করলাম, এটাকে নিয়ে ঠাকুর এবার বলছেন – **ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বরলাভ না করলে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে**। এই বলে ঠাকুর হৃদয়রামের ঘটনা বলছেন, হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি, সেটিকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে ঘাস খাওয়াবার জন্য।

ঠাকুর বলছেন, এটাই মায়া। এই বেঁধে রাখাটাই মায়া, এক অপরকে বেঁধে রাখে। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে আমি মায়া দিয়ে বেঁধে রেখেছি। আমাকে যে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসা দিয়ে বেঁধে রেখেছে, এটাই মায়া। ছোটবেলা থেকে যে কথাগুলো আমাদের শুনতে হয়, ছোটদের আমরা যে কথাগুলো শোনাই, কথা শোনা আর কথা শোনান, এগুলোই আমাদের মায়ার বন্ধনে আরও আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলে। আমাদের স্বভাবে মায়া এমন ঢুকে আছে, মায়া ছেড়ে আমরা বাঁচতেও পারি না। নিজে বাঁচতে পারি না বলে অপরকেও বাঁচতে দিতে চাই না। যখন প্রচুর কষ্ট আদি জীবনে আসে, তখন মনে হয়, ইস্ এর থেকে যদি মুক্তি পেতাম। আসলে এই মুক্তি আমরা সংসার থেকে চাইছি না, সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইছি। বেশির ভাগ মানুষ যে থেকে থেকে মুক্তি, ঈশ্বরের কথা বলে, এগুলো হল বর্তমান সমস্যা থেকে রেহাই পেতে। সমস্যা যদি ঠিক হয়ে যায়, তখন আবার অন্য রকম হয়ে যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস কেন? হৃদে বললে, 'মামা, এঁড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হলে লাঙল টানবে'। যাই এ-কথা বলেছে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। মনে হয়েছিল কি মায়ার খেলা। কোথায় কামারপুকুর, সিওড় –কোথায় কলকাতা! এই বাছুরটি

যাবে, ওই পথ। সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙল টানবে, –এরই নাম সংসার –এরই নাম মায়া। এখানে দুজনকে নিয়েই এই মায়ার খেলা। হৃদয়রাম কত কি ভেবে রেখেছে, আবার এই বেচারা বাছুরটাও ফেঁসে আছে। কত কি আমরা ভাবি। সন্তান হল, বাবা-মা ভাবতে শুরু করল, বড় হলে তাকে বিদেশে পাঠানো হবে, সেখান থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হয়ে আসবে। আমরা মায়াকে নিয়েই আছি। মায়া এমন খেলা খেলে যে, যেখানে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, আত্মা ছাড়া কিছু নেই; সেখানে আমাদের কত জল্পনা, কত কল্পনা।

অনেকক্ষণ পর মূর্ছা ভেঙেছিল।

মায়া আমাদের মুগ্ধ করে দেয়, বর্তমান থেকে সরিয়ে ভূতকালে নিয়ে চলে যায়, বর্তমান থেকে সরিয়ে ভবিষ্যতে নিয়ে যায়। নিজেকেও আমরা সেখানে নিয়ে চলে যাই। সেখানে কি হবে, কি হবে না, তার জল্পনা-কল্পনা এখান থেকেই শুরু করে দিই। অষ্টম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ।

নবম পরিচ্ছেদ

সমাধিমন্দিরে

মাস্টারমশাইর শব্দচয়ন এত সুন্দর, বলছেন, 'সমাধিমন্দির', এই শব্দ আমরা অন্য কোথাও পাই না। মাস্টারমশাই শুরুও করছেন এই বলে –**শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশ সমাধিস্থ। দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে। কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক-একবার ঈশ্বরীয় কথা কীর্তন করেন**।

ঈশ্বরীয় ভাবে ঠাকুর এমন ডুবে আছেন যে সংসারের কোন হুঁশ নাই। আগে হৃদয়রাম ঠাকুরের সংসারকে আগলে রাখতেন, এখন শ্রীশ্রীমা তাঁর সংসার আগলে রেখেছেন। ভগবান গীতায় *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্* এর কথা বলছেন, এই ধরণের ভক্তের জন্য যা কিছু দরকার, আমি সেটা নিজে বয়ে নিয়ে আসি। কেউ না কেউ সাহায্যের জন্য এসে যাবেন। শ্রীশ্রীমাও যদি না থাকতেন, আর-একজন কেউ এসে যেতেন। আমাদের সবার সমস্যা হল, পুরো বিশ্বাস, আমি নিজেকে পুরোপুরি ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়েছি, তিনিই দেখবেন; এই বিশ্বাসের পরে সমস্যা কি হয়, একটা ছোট্ট দু-তিন মাসের শিশুকে যখন মা কোলে নেয় বা অন্য কেউ নেয়, সে মা আর অন্যের মধ্যে তফাৎটা বুঝতে পারে না।

ঠাকুর বেড়াল ছানার উদাহরণ দিচ্ছেন, বিড়ালের ছাকে মা বিড়াল কোথায় রাখছে তা নিয়ে সে ভাবে না। কিন্তু আমরা বড় হয়ে গেছি, আমাদের আমিত্বটাও বড় হয়ে গেছে, আমার ঠাকুর আছেন, তিনি যা করার করবেন, এই কথা আমরা মুখে বলতে পারি, কিন্তু বাস্তবে হয় না। সাধন-ভজন করা, জপধ্যান করা, এগুলো করার উদ্দেশ্য হল, আমিত্বের নাশ। আমিত্বটাকে নাশ করে সেই বাচ্চা বয়সে ফিরে যাওয়া। কিন্তু বাচ্চা বয়সে যেটা হয়, এখানে একটা অবোধ শিশু না, একজন জ্ঞানীর অবস্থা। এই কথা বলা হচ্ছে না যে, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজাতি যে এতদূর এগিয়ে এসেছে, সেখান থেকে আবার আগের জায়গায় ফেরত চলে যেতে বলা হচ্ছে; তা না। আপনি এত বড় হয়ে গেছেন, আবার আপনাকে অবোধ শিশুর মত ব্যবহার করতে কখনই বলা হচ্ছে না। এটা হল, মা, যিনি জগৎজননী, তাঁর কোলের শিশু হওয়া। এখন পাড়া-প্রতিবেশীর কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিনা দেখতে হবে; আমাদের মা-বাবা আসলে পাড়া-প্রতিবেশী। নিজের বাবা-মাকে আমরা সম্মান বেশি দিই ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওনারা আমার পাড়া-প্রতিবেশী। কিন্তু সমস্যা এটাই যে, এই কথাগুলো হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করানো খুবই মুশকিল, বিশ্বাস করা আরও মুশকিল, পালন করা, সে তো কদাচিৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য। কিন্তু তাই বলে ছেড়ে রেখে দিতে হবে, তা না, এটাতেই লেগে থাকতে হবে। মাসে একটা দিনও কিছুক্ষণের জন্য যদি এই ভাব আসে, তখন এখান থেকেই ধীরে ধীরে সংস্কার তৈরী হবে।

বলছেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ঠাকুরের মন এমন ভাবে ঈশ্বরে ডুবে আছে যে, কথা যেগুলো বলছেন, সংসারেরই কথা, কিন্তু রয়েছেন জগন্মাতার সঙ্গে। 'ভাবমুখ' কথাটা আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন। এটাই 'ভাবমুখ' –ভাবমুখে ঈশ্বরও সত্য আবার জগৎও সত্য। পারমার্থিক দিক থেকে জগৎ কখনই সত্য না, এটা হল ব্যবহারিক সত্তা। কিন্তু আমাদের কাছে জগৎটাই সত্য, ঈশ্বরের সত্তা, এটা মুখের কথা বইয়ের কথা না। আবার সমাধিবান পুরুষদের কাছে জগৎটা পুরো মিথ্যা। জগৎ ঈশ্বর, তিনি জগৎ রূপে দেখা দিচ্ছেন। কিন্তু ঠাকুরের এই অবস্থাতে দুটোই একসাথে চলতে থাকে, খুবই ব্যতিক্রমী।

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছেন। আমরা ঠাকুরের এই কথাগুলো আমাদের পরম্পরায় শুনে এসেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের যাঁদের আমি খুব সম্মান করতাম, তাঁদের আমি বিশ্বাস করি। তাঁরা আবার তাঁদের গুরুজনদের বিশ্বাস করতেন, যাঁরা সরাসরি এই-সব কথা ঠাকুরের মুখে শুনেছেন। আর ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঠাকুর, মা, শ্রীমা, রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজদের এই ঘটনাগুলো অত্যন্ত কাছের ঘটনা। ফলে এ-সব কথা বিশ্বাস করা অনেক সহজ। কিন্তু পরম্পরায় এই বিশ্বাস যদি না থাকে, এগুলোকে লোকে মনের ভুল বলবে, স্ক্রিজোফেনিয়া বলবে, হিস্টেরিয়া বলবে, নানা রকমের রোগের নাম দিয়ে বলে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা না, এগুলো অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা। যার জন্য যার সঙ্গেই দেখা হয় আমি বলি, কথামৃত যদি আগাগোড়া পড়া না থাকে, আর একেবারে আঙুলের ডগায় যদি না থাকে, ধর্ম বুঝতে পারবেন না, গীতা, উপনিষদ বুঝতে পারবেন না।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, "মা, ওকে এক কলা দিলি কেন"? ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, "মা বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে"।

কথামৃত যাঁরা নিয়মিত পড়েন, নিশ্চয় তাঁরা এই কথা অনেকবার পড়েছেন। আমার তো মনে আছে, যবে থেকে কথামৃত পড়তে শুরু করেছি, তবে থেকে এই ঘটনাটা আমার খুব মজা লাগত যে, ঠাকুরের নিজের কোন ভক্তকে নিয়ে এই রকম বলছেন। এখানে জরুরী যে কথা সেটা মনে রাখবেন। কি বলছেন ঠাকুর? এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে। তখন ঠাকুরের যে কজন শিষ্য ছিলেন সবাই ছোকরা, নরেন, রাখাল, শশী সব তখন কলেজে পড়ছে, সব ইয়ং, ঊনিশ কুড়ি বছরের। তখনই ঠাকুর মার সঙ্গে কথা বলছেন, আর বলে দিচ্ছেন, এনাদের দ্বারা জীবশিক্ষা হবে। তার সঙ্গে যে কথাটা খুব জরুরী, বলছেন, এক কলা; ঠাকুর পরিষ্কার দেখছেন এর মধ্যে কম আছে। আমরা সঠিক জানি না, এখানে ঠাকুর কার কথা বলছেন।

কলা আর অংশ, এই দুটি শব্দ ভাগবত থেকে এসেছে। ভাগবতে বলছেন, *কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং*। কারণ অন্যান্য অবতাররা কেঁউ অংশাবতার, কেউ কলাবতার। যেমন চন্দ্রমার কলা হয়; এক কলা হল ষোল ভাগের এক ভাগ, শতকরা হিসাবে ছয় শতাংশ। অংশ হলে অনেক ছোট হতে পারে, যেমন এক শতাংশ, পয়েন্ট এক শতাংশ, পয়েন্ট শূন্য এক শতাংশ ইত্যাদি। এক কলা মানে সাংঘাতিক। এই জগতে যদি কারুর এক কলা হয়, তোলপার হয়ে যাবে। এখানে বলছেন, মা ওকে এক কলাই দিলি কেন? তার মানে ঠাকুরের ইচ্ছা যে, মা আরও একটু বেশি দিলে ভাল হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবার ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, তিনি কি কাউকে বেশি শক্তি দিয়েছেন, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? বিদ্যাসাগরের এই কথাকে এখানে যদি নিয়ে আসা হয়, তখন এটাই হয়ে যাবে যে, ঈশ্বর আমাকে কিছু শক্তি দিয়েছেন, আপনাকেও কিছু শক্তি দিয়েছেন, আর যারা বিশ্বের ধনীলোক আছে বিল গেটসের মত, এদেরকেও ঈশ্বরই শক্তি দিয়েছেন। তাহলে ওদের এত টাকা কেন? বা আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন এদেরকে ঈশ্বর বেশি শক্তি দিয়েছেন। এই জিনিসটাকে আমাদের বোঝা দরকার।

ধরুন আজকের বিশ্বের সেরা তিনজন, যাদের কাছে সবচেয়ে বেশি টাকা-পয়সা আছে, বা যাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা আছে, যেমন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট, চীনের রাষ্ট্রপ্রধান, রাশিয়ার

রাষ্ট্রপ্রধান, এরা মনে করে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা। স্বাভাবিক ভাবে আমরা মনে করি তিনি খেটে, পরিশ্রম করে এত দূরে উঠেছেন। ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে self-made। এই জগতে কেউ self-made হয় না। সবটাই হয়, কিছু পূর্ব জন্মে করা, কিছু এই জন্মে করা। সমস্ত কিছু যে হয়, ঈশ্বর তাতে একটু শক্তি দিয়ে দেন। এই শক্তি কতটুকু? এই যে অংশ বলা হল, তার থেকেও নিচে, গুনতির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাতেই এরা বিল গিটসের মত, আরও যারা বিশ্বের খুব নামকরা ধনীলোকরা আছে, তাদের মত হয়ে যায়। তাহলে এবার বুঝুন আমরা কোথায় আছি, না বলাই ভাল।

হোমিওপ্যাথিতে যেমন পোটেনসি কমাতে থাকে, ওই রকম কমাতে কমাতে পোটেনসি আমাদের কোথায় আছে, ওটা ওষুধ না ওষুধের সলভেন্ট বোঝা মুশকিল। যাই হোক, আমরা মনে করি, বিশেষ করে আমাদের যে নলেজ এক্সপ্লোশান, ইনফরমেশান এক্সপ্লোশান আর সেখান থেকে যে নূতন নূতন ভাব এসেছে, নূতন নূতন শব্দ এসেছে, আমরা অনেক সময় ভাবি জীবনে আমি সফল হতে পারলাম না। আবার ভাবি এর জন্য কাকে দোষ দেওয়া যায়? কখন নিজের স্কুলকে, কখন নিজের বাবা-মাকে, কখন নিজের কপালকে বা কখন নিজেকে দোষী বলে মনে করি। কিন্তু আসলে কি হয়?

কেনোপনিষদে খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে, যেখানে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে, দেবতারা অসুরদের উপর জয়ী হয়েছেন। দেবতারা তখন মনে করতে লাগলেন, আমরা জয়ী হয়েছি, আমাদের শক্তিতে আমরা জয়ী হলাম। মোদ্দা ব্যপার হল, দেবতাদের খুব অহঙ্কার হয়ে গেছে। দেবতারা হলেন প্রকৃতির বিভিন্ন যে শক্তি, সেই শক্তির মালিক। কিন্তু ঈশ্বর সব কিছুর মালিক, দেবতাদেরও মালিক। দেবতাদের শক্তি অনেক সীমিত, তবে আমাদের তুলনায় দেখলে দেবতাদের শক্তি অনেক বেশি। আর ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, সেইজন্য তাঁর শক্তির আমরা কল্পনাই করতে পারি না, আমরা তাই বলি তিনি সর্বশক্তিমান। তার থেকেও বড় ব্যাপার হল, জগতে যত শক্তির প্রকাশ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মানুষ; সবার মধ্যে যে কম-বেশি শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, সব শক্তিই ঈশ্বরের।

যাই হোক, ঈশ্বর এবার দেবতাদের একটা শিক্ষা দিতে চাইলেন। তিনি দেবতাদের সামনে একটা অদ্ভূত যক্ষ রূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। দেবতারা জানতে চাইলেন, ইনি কে? প্রথমে অগ্নিকে পাঠানো হল, কারণ অগ্নি দেবতা খুব হম্বিতম্বি করছিল। যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি করতে পার'? 'আমি সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিই'। যক্ষ অগ্নির সামনে একটা ঘাসের টুকরো রেখে বললেন, 'দেখ তো এটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পার কিনা'। অগ্নি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই ঘাসের টুকরোটাকে ভস্ম করতে পারলেন না। বায়ু দেবতাকে পাঠানো হল। বায়ুকেও ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ক্ষমতা? আমি সব কিছুকে উড়িয়ে দিই। এই ঘাসের টুকরোটাকে দেখ তো উড়িয়ে দিতে পার কিনা। বায়ু দেবতা তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও ঘাসের টুকরোকে উড়িয়ে দেওয়া তো দূর অস্ত, নড়াতেই পারলেন না।

অর্থ হল, যেখানে দেখবেন ক্ষমতা, যেখানে যেখানে বিভূতি দেখবেন, যেখানে দেখবেন যে কোন কারণে একটু নামযশ হয়েছে, বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই জিনিসটা বিশ্বের সবারই জন্য প্রযোজ্য। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই ঈশ্বরীয় শক্তি তপস্যা ও সাধনার খাটনিতে আসে। কাউকে কাউকে তিনি এই শক্তি সরাসরি দেন। আপনাদের মধ্যে অনেকের জীবনেই সাফল্য আছে, স্কুলে হয়ত ফার্স্ট হতেন, আপনাদের অনেকের বুদ্ধি হয়ত খুব তীক্ষ্ণ, অনেকে হয়ত প্রচুর টাকা-পয়সা অর্জন করেন, অনেক সুনাম কুড়িয়েছেন। এবার যদি আপনারা ঠাকুরকে কল্পনা করেন, ঠাকুরের বয়স তখন ছয় কি সাত বছর, কামারপুকুরে লাহাদের পাঠশালায় পড়ছেন। ওই বয়সে স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি আমবাগানে খেলা করছেন, সমবয়সীদের সাথে যাত্রা করছেন। নিশ্চয় স্কুল থেকে মায়ের কাছে অনেক অভিযোগ আসত –গদাইএর পড়াশোনায় একদম মন নেই, পড়াশোনা করে না; গদাই শুধু খেলতে ভালবাসে, গদাই কেবল অপরের নকল করতে ভালবাসে। গরীব ব্রাহ্মণ, দারিদ্রতার

জন্য খাওয়ারও অভাব ছিল। স্কুল থেকে অভিযোগ এলে ঠাকুরের মা কি ভাবতেন –ছেলেটার লেখাপড়ায় মন নেই, হয়ত ওর পড়াশোন হবে না। তাহলে গদাইএর ভবিষ্যত কি হবে?

বর্তমান কালে এই জিনিস হলে গদাইএর আরও বেশি খারাপ অবস্থা হত। স্কুল থেকে হয়ত টিসি দিয়ে দিত। ঠাকুরের দাদা রামকুমার শেষে এক প্রকার বাধ্য হয়েই ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য একটা, পুরোহিতের কাজকর্ম শিখে যদি দুটো পয়সা আয় করতে পারেন, তাই দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে যা হল সেটা ইতিহাস হয়ে গেল। ঠাকুর অবতার হন, আর যাই হন, আমরা এখানে ঠাকুরকে ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করছি। তার মানে সাফল্য দুই প্রকার হয়। একটা সাফল্য হয় self success, আত্ম সফলতা, নিজের সফলতা। যে সাফল্যতার জন্য লোকেরা আপনাকে জানে আর এই সফলতা দিয়ে আপনিও নিজেকে উপরে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন। বিশ্বের যারা নামকরা ধনীলোক, টাটা, আম্বানির মত ভারতের যারা ধনী লোক, এদের যে সাফল্য, এটা হল self directed, নিজের দিকে সব কিছু কেন্দ্রিত, নামযশ, টাকা-পয়সা, ক্ষমতা সব নিজের দিকে। টাকা-পয়সা হয়ে গেল বলে, আমাকে আরও করতে হবে, এটা করব, সেটা করব; অনেক সময় এমপি বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। কারণ, জগতের সব কিছুকে নিজের সঙ্গে জুড়ে নিতে চাওয়ার প্রবল একটা বাসনা।

কিন্তু আর-একটা সাফল্য হয়, যেখানে মানুষ জগৎকেই ছেড়ে দেয়। আপনারা সবাই একটু ভেবে দেখবেন, আপনি কোন দিকের সাফল্য চাইছেন। আপনাদের মধ্যে যাঁদের সমাজে কোন কিছু নেই, তাঁরাও দেখবেন নিজেকে একটু দেখে নিতে চান যে, এই সমাজে তাঁর কতটা বিস্তার হয়েছে। একটা যে অনাথ বালক, তারও একটা বিস্তার থাকে। হয়ত তার কারুর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। সেটা না থাকলে দেখবেন, রাস্থার একটা কুকুরের সাথে বা পাড়ার একটা বিড়ালের সাথে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। ব্যক্তিত্বের এই বিস্তার সমাজে ও পরিবারে পুরোপুরি থাকবে। আলেকজাণ্ডারেরও তাই, নেপোলিয়নেরও তাই, সক্রেটিসেরও তাই। কিন্তু এর বিপরীত, যখন ধর্মীয় জগতে প্রবেশ করেন, যীশু খ্রীষ্টের জীবন যদি আমরা দেখি, প্রফেট মহম্মদের জীবন যদি নেওয়া হয়, আমাদের ঠাকুর, স্বামীজীর জীবন যদি নেওয়া হয়; তখন পুরো একটা বিপরীত ছবি দেখতে পাই।

একবার স্বামীজীর দিকে তাকান, কি বিরাট সার্কেল তাঁর। অল্প বয়সে বাবা চলে গেলেন, তীব্র আর্থিক সঙ্কট, আত্মীয়-স্বজনরদের থেকে সঙ্কট। কিন্তু তারপরেও তাঁর আশেপাশে কতজন, মা আছেন, ভাইবোনরা আছেন, বন্ধু-বান্ধবরা আছেন। সেখান থেকেও তিনি নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে চলে আসছেন। ছুঁচের ভিতর সূতো যেমন একেবারে পয়ন্টেড হয়ে প্রবেশ করে, স্বামীজী সেই রকম পয়েন্টেড্। কারণ সূতোর দুট রূপ হয় –বিস্তার যখন তখন চাদররূপে হয়, জামা-কাপড় পরে আছেন, এগুলো সব সূতোর বিস্তার। কিন্তু যখন ছুঁচের ভিতর যায় তখন ওয়ান পয়েন্টেড হয়ে যায়।

তেমনি মানুষের ব্যক্তিত্ব যখন ওয়ান পয়েন্টেড হয়, তখন প্রথমে সমাজ থেকে নিজেকে পুরো গুটিয়ে আনবেন, ধীরে ধীরে ওই ব্যক্তিত্বটাই হয়ে যায় দিব্য। কেউ যদি একা একা থাকতে শুরু করে, অনেকে তখন বলবে, ওর মনের অবস্থা তত ভাল নেই, কেমন অবসাদগ্রস্ত, সেইজন্য একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে। স্বামীজীর ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারেই তা না, এখানে ঈশ্বরীয় উপস্থিতি ভরতে শুরু হয়ে যায়। এখান থেকে সমাজে তাঁর নাম হতে শুরু হয়ে যায়। কারণ তিনি এখন সমাজের ভাল করতে কাজ করবেন। প্রথমটা হল এ্যক্সক্লুসিভ, সে সবকিছু নিজের জন্য চায়, টাকা-পয়সা নিজের জন্য, লড়াইয়ে জয় নিজের জন্য, যাবতীয় যা কিছু নিজের সাফল্যের জন্য। কিন্তু এখানে এ্যক্সক্লুসিভটা পালটে ইনক্লুসিভ হয়ে যায়, কারণ তিনি নিজেকেও অপরের জন্য দিয়ে দিচ্ছেন। কতটা দেবেন? পুরোটাই দেবেন। কিন্তু আপনার শক্তি কোথায়, কিসের শক্তি, আপনার তো কিছু নেই; না আছে আপনার পয়সা, না আছে আপনার সমাজে প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের কাছে যে ছোকড়া শিষ্যরা আছে, সবাইর তখন জিরো।

যীশুর তখন নিজের বলতে কিছু নেই। শুধু তাই না, যাঁদের তিনি শিষ্য করলেন তাঁরাও অতি সাধারণ, কারুর কিছু নেই। জগৎ মাতা তখন শক্তি দেন।

কেন জগন্মাতা শক্তি দেন? কারণ সমাজে যে এখন কাজ হবে, সেটাই ইতিহাস হয়ে যাবে। দু-হাজার বছর আগে যীশু খ্রীষ্ট যে কাজ করে গেলেন, আজও সমাজে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিভাবে হয়েছে, না হয়েছে, ওর মধ্যে আমরা ঢুকছি না। কিন্তু তার যে প্রভাব, তাঁর ওই কথাগুলো শুনে গত দু হাজার বছরে হাজার হাজার মানুষ কিভাবে তাদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে নেমে গেলেন। ইজরাইল থেকে একজন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন, একজন কট্টর জুইস। দেখে আমি অবাক, নিজের ধর্মের প্রতি তাঁর কি নিষ্ঠা! অথচ কত পুরনো ধর্ম, যীশুর থেকে পুরনো। সমাজ এদের জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। কামী লোভীদের হাতে যদি ধর্ম চলে যায়, সমাজের যে কি দুর্গতি হবে ভগবান জানেন। তফাৎ হল, যাঁরা নিজের জোরে শক্তিকে দাঁড় করান, এ্যক্সক্লুসিভ যাদের বলা হল, এদের প্রভাব তৎক্ষণাৎ দেখা যায়। আজকে যিনি বিরাট ধনী, তাঁর প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। আমরা খবর কাগজে তাঁদের নাম ছাপা হতে দেখি, ইনি এখন এক নম্বরে চলে গেছেন।

কিন্তু যাঁরা সমাজে কাজ করবেন, তাঁদের নাম চাপা থাকে। যাঁদের শক্তি একটু বেশি দেওয়া হয়েছে, এক কলা কি দু কলা, তাঁদের নাম আরও বেশি চাপা থাকে, কিন্তু এনারাই হলেন আসল চালিকা শক্তির লোক। যীশু বাইবেলে খুব সুন্দর বলছেন, we are the salt of earth, এনারাই হলেন জগতের প্রাণ। তাঁরা যেভাবে কাজ করেন, যেভাবেই করুন, তাঁদের শরীর যাবার পর ধীরে ধীরে এনাদের নাম জগতে প্রসারিত হতে শুরু হয়। ধরুন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ পরম্পরায় হরি মহারাজ নামে পরিচিত। হরি মহারাজ যতদিন শরীরে ছিলেন, কজন তাঁকে জানতেন? রামকৃষ্ণ ভাবধারায় তখন যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই কেবল জানতেন। কিন্তু আজ যাঁরা রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সবাই তাঁকে জানেন। তপস্বী বললেই হরি মহারাজের নাম আমাদের মনে ভেসে ওঠে। আমাদের রাজা মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নাম রামকৃষ্ণ ভাবধারার সবাই জানেন। কিন্তু তাঁদের জীবদ্দশায় কয়জন আর জানতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে মঠকে যেভাবে দাঁড় করালেন, যেভাবে দিশা দিলেন, আজও আমরা তাঁকে স্মরণ-মনন করি। রাজা মহারাজ এই পরিস্থিতিতে এই এই করেছিলেন, আমরা এখনও সেটাই অনুসরণ করি।

ঈশ্বরের শক্তি যখন থাকে তা অংশ রূপে হোক বা কলা রূপেই হোক, দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে পথ দেখায়, মানুষের জীবনকে একটা আধ্যাত্মিক পুষ্টি দেয়। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগেরই জীবনের উদ্দেশ্য এটাই –আমি সফল হব, আমি বড়লোক হব, আমি এই হব; চেষ্টা করুন, আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন, তাতে কোন দোষ নেই। চেষ্টা করতে নামলে বুঝতে পারবেন আপনার কত ক্ষমতা। নিজের ক্ষমতাটা বুঝে নেওয়ার পর আস্তে আস্তে মনটাকে একটু ওখান থেকে গুটিয়ে আনতে হয়। আপনার যে সামাজিক পরিমণ্ডল আছে, সেটাকে ছোট করে নিতে হয়; আপনার সামাজিকতাকে কমিয়ে আনতে হয়। এগুলো কমিয়ে কমিয়ে মনটাকে এবার ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে বেশি নিয়ে যেতে হয়। ঈশ্বরে দিকে যেতে যেতে আমিত্ব যত কমবে তুমিত্ব তত বাড়বে, তুমিত্ব বাড়লে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ পেতে শুরু হয়। তিনিই তখন ঠিক করবেন আপনাকে কতটা শক্তি দেবেন। কাকে তিনি অংশ দেবেন বা কলা দেবেন, কলা দিলে কত কলা দেবেন আমরা জানি না। এটা কারুর বোঝার উপায় নেই। তিনি স্বামীজীকে কত দিলেন, রাজা মহারাজকে কত দিলেন, স্বামী অভেদানন্দজীকে কত দিলেন, এগুলোর আলোচনা করার অধিকার আমাদের নেই, অনধিকার চর্চা। খুব নামকরা কথা আছে, Less capable person should not judge more capable ones। যাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁদের উচিত নয়, তাঁর থেকে বড়দের বিচার করা। সোস্যাল মিডিয়াতে একজন লিখেছিল, Is Swami Vivekananda over-rated? মুর্খের প্রশ্ন। অনেক আগে আমি খুব পোলাইট উত্তর দিয়েছিলাম। লোকেরা এখনও আমার উত্তরটা দেখে প্রশংসা করে।

আপনি যখন কাউকে বিচার করছেন, ওভাররেটেড, আণ্ডাররেটেড যাই বলুন; তার মানে আপনি তাঁর থেকে বড় হয়ে গেলেন। আমি আইআইএম ইনস্টিট্যুটগুলিতে প্রায়ই যেতাম, সেখানে দেখতাম, ছাত্রদের প্রফেসারদের রেটিং দিতে বলা হয়। এগুলো আমেরিকান সিস্টেম। ছাত্রদের কি কোন অধিকার আছে যে প্রফেসারদের রেটিং দেবে? গুরুজনদের সম্মান দেওয়া, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠকে সম্মান দেওয়া, এই জিনিসগুলো উঠে যাওয়ার ফলে আমাদের অনেক অন্য ধরণের সমস্যা এসে গেছে। একবার যদি বুঝে নেন উনি আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ, ওনাকে কখনই বিচার করতে যাবেন না। সোস্যাল মিডিয়া হয়ে গিয়ে এখন ভদ্রতা, সভ্যতা, সম্মান দেওয়া এগুলো সব পুরোপুরি উবে গেছে। বলা হয়, আত্মা ধর্ম-অধর্মের পারে, পাপ-পূণ্যের পারে; সোস্যাল মিডিয়া আমাদের ভদ্রতা-অভদ্রতার পারে নিয়ে চলে গেছে। বিশ্বের যাঁরা চালিকা শক্তি, salt of this earth, এনারা সবাই ঈশ্বরের শক্তিতে চালিত হন। এটাই ঠাকুর এখানে বলছেন, যদিও আপনারা এটা অনেকবার পড়েছেন, ভেবেওছেন; কিন্তু এর আসল তত্ত্বটা এই জায়গাতে।

আবার কি হয়, যাদের সেলফ্-সাকসেস হয়, ধীরে ধীরে সময়ের সাথে ওটা মুছেও যায়। যেমন ধরুন, নব্বই দশকে আমাদের দেশে পর পর বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, আমিও নামগুলো ভুলে যাই। সেলফ্-সাকসেসে কয়েকদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রীত্ব পেয়ে গেলেন, মন্ত্রীত্ব আবার চলেও গেল। ওই সেলফ্-সাকসেসটাও কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত, কিন্তু তার নিজের চেষ্টা যুক্ত আছে। কিন্তু এখানেও তিনিই সবটা দেন। আগেকার ট্রেনে কামরা কম হত বলে ভিড় বেশি হত। আপনি ট্রেন ধরতে এসে দেখছেন ট্রেনটা সবে ছাড়ল। ওই দেখে আপনি দৌড়াচ্ছেন ট্রেনটা ধরার চেষ্টা করছেন, কোন রকমে একটা কামরার হ্যাণ্ডেল ধরে নিলেন, আপনি তখনও ভিতরে যেতে পারছেন না, কামরার হ্যাণ্ডেল ধরে প্ল্যাটফরমেই দৌড়াচ্ছেন। এখন কি হল, ভিতরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের কেউ উঠে এসে আপনাকে ধরে টেনে তুলে নিল। আসল ধর্ম জীবন ওই অবস্থায় শুরু হয়। ধর্ম হয়, আপনি যখন ধরার চেষ্টা করছেন, নানা রকমের উপাচার করছেন, নানা রকমের বিধি-নিষেধ মেনে চলছেন, বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করছেন। এগুলো হল আপনি ট্রেনের কামরার হ্যাণ্ডেলটা ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আধ্যাত্মজীবন শুরু হয় তখন, যখন তিনি আপনাকে ধরে নিলেন। এরপর তিনি অনেক কিছু ঠিকঠাক করে, মোছামুছি করে দেওয়ার পরে একটা শক্তি দিয়ে ছেড়ে দেন, যাও বাপু, এবার তুমি এই কর। কত শক্তি দিলেন, ওতে কি আছে, ওনার কাছে এগুলো তখন কিছু আসেও না, যায়ও না, তিনি ঈশ্বরীয় কাজ করছেন।

ঠাকুর এই কথা বলার পর মাস্টারমশাই মনে মনে ভাবছেন –**ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর এইরূপে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন? এসব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীবশিক্ষা দিবেন? মাস্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, "তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়"**।

আগেকার দিনে রোগ আদি হলে বাড়িতেই লোকেরা বিভিন্ন ভাবে চিকিৎসা করত। অনেক সময় বিশেষ করে বাচ্চাদের শরীরে ঘা হয়, ঘা-টা লাল লাল থাকে। পরে যখন ঘায়র মুখ বেরিয়ে আসে তখন ঠিক ঠিক চিকিৎসা শুরু হয়, পাতা-টাতা দিয়ে সারানো হত। ঘায়ের মুখ বার না হওয়া পর্যন্ত কোন চিকিৎসা করবে না।

আধ্যাত্মিক জীবনে ইমোশান খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যখন রেগে যায়, কিংবা হতাশায় যদি ভেঙে পড়ে, গুরু যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে কিন্তু সে আধ্যাত্মিক জীবনে উপরের দিকে চলে যাবে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদ এসে গেছে, গুরু তথা স্বয়ং ভগবান সঙ্গে আছেন, বিষাদযোগ থেকে একেবারে মোক্ষযোগে অর্জুনকে নিয়ে চলে গেলেন। আসলে কি হয়, ঢিলেঢালা লোকের দ্বারা ধর্ম হয় না। ঠাকুর গরুর কথা বলছেন –কিছু গরু আছে ল্যাজে হাত দিলেই শুয়ে পড়ে, আবার কিছু গরু আছে

ল্যাজে হাত দিলেই তিড়িংবিড়িং করে লাফাবে। ভিতরে একটা শক্তি থাকতে হয়। ওই শক্তি, যেটা আমিত্বের শক্তি; ওই শক্তিটা যখন চুরমার হয়, তখন কাম, ক্রোধ, মোহ এগুলো বেরিয়ে আসে। কারণ আপনার আমিত্বের শক্তিটা থাকলে এই ইমোশানগুলো মাথা চাড়া দিতে পারবে না। কাম তখনই হবে যখন আপনার মনে কোন কিছুর অভাব বোধ হবে, শোক তখনই হবে যখন নিজের প্রিয় কিছু চলে যাবে। আমিত্বটা যদি একটু নড়ে যায়, সেই সময় হঠাৎ করে ঈশ্বরীয় জ্ঞানটা হয়, তখন কাজ দেয়। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিজের শিষ্যকে একটু নাড়িয়ে দেন, ওষুধটা ঠিক পড়বে বলে। নাড়িয়ে দিয়ে তখন হয়ত একটা আধ্যত্মিক কথা বলে দিলেন যাতে শিষ্যের উত্থান হয়।

সেখান থেকে সরে এসে ঠাকুর এবার হাজরার কথা বলছেন। হাজরা মহাশয় কথামৃতের একটা মজার চরিত্র। **হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ**। জপধ্যান করছেন, সব করছেন কিন্তু ভিতরে কিছু নেই। আমাদের বেশির ভাগেরই এই রকম শুষ্ক কাঠ। এরপর আরও মজার কথা বলছেন। **তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে, জটিলে-কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়**। ঠাকুরের কাছে বসে আছেন, এটাই একটা বিরাট বড় সাধনা। পরে অবশ্য থাকতে পারলেন না, সেটা অন্য ব্যাপার।

ঠাকুর সমস্ত কিছু দিব্য রূপে দেখতেন। কোন অনুষ্ঠানে ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন যখন করা হয় তখন বিভিন্ন ধরণের ব্যঞ্জন তৈরী করা হয়। সেখানে তেতোও রাখা হয়, মিষ্টিও রাখা হয়, টকও রাখা হয়। যেগুলো এমনি ভাল সিনেমা, তাতে অনেক রকম দৃশ্য থাকে, হাসির দৃশ্যও থাকে, দুঃখের দৃশ্যও থাকে, ভয়েরও থাকে, মজারও থাকে। ঠিক তেমনি এই যে সংসারলীলা, সংসারলীলাতে সবটাই থাকে। আর আপনি যদি এই লীলা জিনিসটা নিজের জীবনে নামাতে চান, তার মানে আপনার জীবনে ভাল-মন্দ যা কিছু হচ্ছে, সবটাই আমার জীবনের লীলা, এগুলো যা কিছু আছে সব জটিলে-কুটিলে, আমার জীবননাট্যের খেলাটাকে জমিয়ে দিচ্ছে, পোষ্টাই করছে। জীবনে টানাপোড়েন না থাকলে জীবনটা মনে হবে কেমন যেন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। আপনার পিছনে লাগার মত কেউ যদি না থাকে, আপনাকে রাগিয়ে দেওয়ার মত কেউ যদি না থাকে, আপনার ভালবাসাটাকে সামনে নিয়ে আসার কেউ যদি না থাকে, জীবনটা আপনার শুষ্ক হয়ে যাবে। জীবনটাকে রসেবশে রাখতে হবে, রসেবশে রাখার জন্য জটিলে-কুটিলে দরকার।

এর পরে পরেই মাস্টারমশাইকে ঠাকুর কিছু অন্য ধরণের কথা বলছেন। পড়তে পড়তে এখানে এসে মনে হবে যেন এই জায়গাতে কিছু গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। গ্যাপগুলো কি করে হল আমাদের এখন জানার কোন উপায় নেই। হয়ত মাঝখানে ঠাকুর আরও একটা দুটো কথা বলেছিলেন, যেটা মাস্টারমশাই হয়ত ইচ্ছে করেই লেখেননি। কিন্তু মাস্টারমশাই নিজেকে কথামৃতে এত ভাবে আড়াল করে রেখেছেন যে, যেটা অকল্পনীয়, বোঝার কোন উপায় নেই যে কথামৃত মাস্টারমশাই রচনা করেছেন। অন্যান্যদের স্মৃতিচারণে নিজেদের কথা এত বেশি বলেন যে আসল স্মৃতিকথাগুলোই হারিয়ে যায়। মাস্টারমশাই কথামৃতে এই জিনিস কোথাও করেননি, যদিও বা একটু করে থাকেন সেখানে অন্য নাম দিয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে দিয়েছেন।

(মাস্টারের প্রতি) –ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। আজকে আমরা কথামৃত পড়ে পড়ে এমন জায়গায় চলে এসেছি, যেখানে আমরা এগুলোকে মেনেই চলি। কিন্তু তখনকার দিনগুলোর কথা একবার ভাবুন – একদিকে এলিট ক্লাশের লোকেদের নিয়ে তৈরী ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদ, অন্য দিকে খ্রীশ্চানদের হিন্দুদের উপর আক্রমণ তার উপর মুসলমানদের প্রভাব; সেই সমাজে দাঁড়িয়ে 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়', এই ধরণের কথা বলা খুব মুশকিল ছিল। এখনও তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানমনস্কতা ভাবাসম্পন্ন লোকেরা আছে, যারা কথায় কথায় হিন্দুদের পৌত্তলিক বলে, কিন্তু এখন আর এদের সেই তেজ নেই, যেটা ঠাকুরের সময় ছিল। মাস্টারমশাই তখন সবে ঠাকুরের কাছে আসা-যাওয়া করছেন, তখনও তিনি কথামৃত লেখা শুরু করেননি। মাস্টারমশাই এমন কিছু নন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, শিক্ষকতা করতেন

আর ঠাকুরকে ধরে রেখেছেন, ঠাকুরও তাঁকে নিজের লোক মনে করতেন; এটাই তো সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল। ঠাকুর তাঁকে ব্যাসদেবের গণেশ হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের যে দুটি রূপ –একটা হল বাইরের শাস্ত্রজ্ঞান যেটা ভিতরে প্রবেশ করে; এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় মাস্টারমশাইর শাস্ত্রজ্ঞান আছে, কিন্তু ওটা যে ভিতরে প্রবেশ করবে, ওই জায়গাতে যেন একটু ঘাটতি ছিল। সেইজন্য ঠাকুর থেকে থেকে অনেক কথা বলে বলে মাস্টারমশাইএর ভিতরটা ঠিক করে দিতেন। এখানে বলছেন, ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়।

এই যে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়, এটা একটা বিশেষ কথা। এমনকি অন্যান্য ধর্মে যে মানে না, ব্যক্তিগত ভাবে আমার কেমন যেন অবাক লাগে। এখানে আমি দু-চারটে অতিরিক্ত কথা বলছি, মন দিয়ে একবার যদি শুনে বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে জিনিসটা কি। আপনি ধরুন একটা পুকুরের পারে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে লোকেরা পাত্র এনে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে। যে যা পাত্রই আনুক, হাড়ি, কলসি, বোতল যাই হোক, জল ভরে বাড়ি আনার পর জল ঢাললে সেই জলই বেরোবে, পুকুরের জল। সেই পুকুরে যদি মাছ থাকে, ব্যাঙ থাকে; কদাচিৎ কখন জলের সাথে মাছ বা ব্যাঙ বা কোন জলজ পোকা চলে আসবে। পুকুরের জল স্বচ্ছ জল, যে কোন কাজেই লাগানো যায়।

এবার আপনি কল্পনা করুন, আপনি একটা মহাসমুদ্রের তটে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাসমুদ্র, কোন কুল-কিনারা নেই। সমুদ্র থেকে যদি আপনি কিছু বার করতে চান তাহলে সেখান থেকে কি আসবে? নোনা জলই আসবে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি, সমুদ্রে যে বিভিন্ন ধরণের মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণী থাকে, সে-সব কিছু নেই, শুধু জলই আছে। আপনি যত বালতি দিয়ে জল নিন, বোতল ভরে জল নিন, কলসীতে জল নিন, আসবে শুধু নোনা জল। এটাই আমাদের understanding। আমরা যেভাবে পড়াশোনা করেছি, যেভাবে শিক্ষা পেয়েছি, যেভাবে আমাদের বুদ্ধি তৈরী হয়েছে, সেভাবে আমাদের understanding হয়েছে। আমরা ধরেই নিলাম, ওই সমুদ্রে কোন সামুদ্রিক মাছ-টাছ কিছু নেই, সেইজন্য শুধু জলই আসবে। জল যদি ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যায়, সেটা ওই জলেরই রূপ।

সচ্চিদানন্দ সাগর যেটা, যেটাকে চৈতন্য বলা হয়, যেটা আসল সত্তা –যাঁর সৎ আছে, চৈতন্য আছে আর আনন্দস্বরূপ। আপনি যখন এই চৈতন্যসাগরের কুলে দাঁড়াবেন, আপনিও ওটাই দেখবেন – সচ্চিদানন্দ সাগর। এই যে চৈতন্যের সমুদ্র, চৈতন্যকে আপনি যেভাবেই কল্পনা করুন, আলো রূপে কল্পনা করুন, যে কোন ভাবেই কল্পনা করা যেতে পারে। এই জায়গাতে আপনাকে আপনার কল্পনার সাহায্য নিতে হবে। এই যে চৈতন্য সমুদ্র, সচ্চিদানন্দ সাগর, যদি এখান থেকে একটা রূপ বেরিয়ে আসে; আমরা ভাবব যেমন জলের একটা রূপ বরফ হয়ে বেরিয়ে আসবে; ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্মে যেমন বলে, আমার এই ঈশ্বর, আমার সেই ঈশ্বর, সেই রূপটা বেরিয়ে আসবে। না, সেটা হয় না, হবেও না। বিজ্ঞানে এই জিনিসটাকে বলা হয় counter intuitive। Counter intuitive মানে হল, মন দিয়ে আমার মনে হবে এই রকম, আসলে জিনিসটা কিন্তু এই রকম নয়। যেমন আইনস্টাইনের থিয়োরিগুলো সব counter intuitive। যদিও এখন সবাই মেনে নিয়েছে। কোয়াণ্টাম ফিজিক্স পুরোপুরি counter intuitive। আজকে কোয়াণ্টাম ফিজিক্স আছে বলে আমরা হিন্দুরা লোকেদের আজ বেদান্ত বোঝাতে পারছি। কোয়াণ্টাম ফিজিক্স যদি না থাকত, লোকেরা এটা বুঝতই না। আর এই কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের জন্য অন্যান্য ধর্ম মার খেয়ে গেছে, কারণ বিজ্ঞানের সামনে এই ধর্মগুলো আর দাঁড়াতে পারছে না।

আইনস্টাইনের পর প্রথম যখন কোয়াণ্টাম ফিজিক্স আসা শুরু হল, তখন ওনারা কোয়ন্টাম ফিজিক্সকে বোঝাবার জন্য কোন উপমা পাচ্ছিলেন না। যখন কোন থিয়োরি বার করতেন সেটা ম্যাথমেটিক্সের ইক্যুয়েশান দিয়ে, কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে যে তুলনা করবেন, সেটা করতে গিয়ে দম

বেরিয়ে যেত। সচ্চিদানন্দ সাগরকে যদি সেভাবে কল্পনা করেন, তখন আপনারা মনে করবেন, ধরুন ভগবান বিষ্ণু, আমাদের প্রচলিত মহাবিষ্ণু, তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ। তার মানে সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে মহাবিষ্ণু বেরিয়ে আসবেন। না, মহাবিষ্ণু বেরিয়ে আসবেন না। সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে যখন রূপ বেরোবে তখন এই দেখবেন সরস্বতী বেরিয়ে এলেন, এই দেখবেন লক্ষ্মী বেরিয়ে এলেন, এই শিব বেরিয়ে এলেন, এই শ্রীরামকৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন, এই যীশু খ্রীষ্ট বেরিয়ে এলেন। আপনি দৌড়ে গিয়ে দেখতে যাবেন যে কি করে বেরোল।

এবার আপনি সাগরটাকে সাগর থেকে ছোট্ট করে পুকুর করে নিন, যেটাকে আপনি মাপতে পারবেন। এবার আপনি জাল ফেলে ভাল করে নাড়া দিয়ে দেখুন, কোথাও কিছু নেই, আছে শুধু সেই জল। এই পুকুরটা এমন একটা পুকুর যেটাকে মাপা যাবে। পুকুরকে মাপতে চাইলে আপনি নৌকা নিয়ে পুকুরের মাঝখানে বসে যান, জাল ফেলুন, ছিপ ফেলুন, কোথাও কিছু পাবেন না, কিছু থাকলে তো পাবেন। যেমনি আপনি পাড়ে এসে বসে গেলেন, নিজে থেকে দেখছেন, মা সরস্বতী দেবী উঠে আসছেন, এই মা লক্ষ্মী বেরিয়ে আসছেন, এই শিব বেরিয়ে আসছেন। এটা একেবারে বাস্তবে হয়। তাহলে এনারা কারা, কোথায় ছিলেন? এটা আপনি ধারণা করতে পারবেন না, বুঝতেও পারবেন না, সম্ভবই না। এখানে এসে অন্যান্য ধর্ম মার খেয়ে যায়। ওরা এগুলো তো মানবেই না, উলটে নিন্দা করবে, গালাগাল দেবে।

কিন্তু ফিজিক্সে এই জিনিস মুহুর্মুহু হয়; কোথাও কিছু নেই দুম্ করে একটা পার্টিকেল উঠে গেল, এটা আবার অন্য বিষয়, আমরা এর মধ্যে যাচ্ছি না। আপনি পুকুরের থেকেও ছোট জিনিস, একটা বালতির কল্পনা করুন। একটা বালতি, তাতে জল ভর্তি করে রাখা আছে। আপনি বালতির মধ্যে হাত ডুবিয়ে ভাল করে দেখে নিন, বালতিতে জল ছাড়া কোথাও কিছু নেই। আপনি বসে আছেন, আর হঠাৎ দেখলেন ওই জল থেকে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী বেরিয়ে এলেন, ঐশ্বর্যের দেবী মা লক্ষ্মী বেরিয়ে এলেন, ভগবান বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেরিয়ে আসছেন। আপনি বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখি আর কিছু আছে কিনা। আপনি বালতির জলে হাত ডুবিয়ে ভাল করে নাড়ানাড়ি করে দেখলেন কোথাও কিছু নেই। যাক্ বাঁচা গেছে। আবার দেখলেন আর-একটা রূপ বেরিয়ে এলো। এইভাবে কত রূপ আসতে থাকবে? তিনি অনন্ত, তাঁর রূপও অনন্ত; অনন্ত রূপে আসতে থাকবেন। কারণ সচ্চিদানন্দই তো আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই কিনা। যখন সচ্চিদানন্দকে সগুণ রূপে দেখবেন, তখন সরস্বতী, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, শিব কত রূপ। যখন সচ্চিদানন্দকে সর্বশক্তিমান ভাববেন, তখন তিনি ভগবান।

এর উপর দুটো জিনিস নির্ভর করে –প্রথম, তিনি নিজে কত রূপে আসছেন, দ্বিতীয়, আপনার যদি কোন কিছু খুব ভাল লাগে, আপনি ভাবছেন ভগবানের তো অনেক রূপ জানলাম, নূতন একটা রূপ তো জানা হল না, যদি নূতন এই রকম একটা রূপ হত? কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন, ওই সমুদ্র থেকে সেই রূপটা বেরিয়ে এলো। তার কারণ হল, এই যে সমুদ্র, এই সমুদ্রের এক ফোঁটা জল যা, পুরো সমুদ্রও তাই। এই জিনিসটাকেই counter intuitiveএর কাছে ধারণাও করা যায় না –একটা ফোঁটা যা, পুরো সমুদ্রও তাই। ফলে আমাদের ভিতর যে আত্মা আছেন, সেই জীবাত্মাই ব্রহ্ম, কোন তফাৎ নেই, সব একই। তিনি এক সঙ্গে বিভিন্ন রূপে থাকতে পারেন, একই সাথে বিভিন্ন জীবের মধ্যে থাকতে পারেন। তিনি আবার সব কিছু মিলিয়ে ব্রহ্ম রূপে সচ্চিদানন্দ সাগর হয়েও থাকতে পারেন। তিনি একটা রূপেও আসতে পারেন, বহু রূপেও আসতে পারেন। বহু রূপে এলে আমাদের মনে হবে এটা মায়া। তিনি কেন কি রূপে কাকে দেখা দিচ্ছেন আমাদের বলার কোন উপায় নেই, এটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্যরা এই জায়গাতে এসে গোলমাল করে বসলেন। গোঁড়ামি জিনিসটা ভারতীয় পরম্পরাতে একেবারেই নেই। ভারতে কত বড় বড় সাধকরা এসেছিলেন, কেউ কালী নিয়ে

সাধনা করেছেন, কেউ কৃষ্ণকে নিয়ে সাধনা করেছেন, কেউ শিবকে নিয়ে, কেউ রামকে নিয়ে সাধনা করেছেন, এনারা কেউই কখন গোঁড়ামির কথা বলেননি। কিন্তু পরবর্তি কালে তাঁদের পরম্পরাগত যে শিষ্যরা ছিলেন, অনেক সময় তাঁদের মধ্যে গোঁড়ামি এসে গিয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, শিক্ষার অভাব, বুদ্ধির অভাব, তপস্যার অভাব আর ঈশ্বরীয় কৃপার অভাব হলে ভিতরে গোঁড়ামি এসে বাসা বাঁধে। সারা দেশে আমাদের যে পরম্পরা, তাতে এটাই –এই সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে যত খুশি রূপ বেরোতে পারে, কিন্তু আমার লাগবে এই রূপ।

একজন মা হাওড়া স্টেশনের একটা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন। জানা গেল, তাঁর ছেলে অনেক দিন পর বাড়ি আসছে, মা অপেক্ষা করছেন কখন তার ছেলের ট্রেন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছাবে। চারিদিকে লোক থিক থিক করছে, শুধু লোকের মাথা দেখা যাচ্ছে। মায়ের চোখে কিছুই পড়ে না, হঠাৎ দূরে তিনি ছেলেকে দেখতে পেলেন। ওই অত লোকের মধ্যেও মা ঠিক নিজের সন্তানকে চিনতে পেরেছেন। আপনি আর আপনার ইষ্টের ঠিক এই সম্পর্ক। সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে এত রূপ, এত কিছু বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আপনার যেটা সবচেয়ে প্রিয় সেখানে গিয়ে মনটা আটকে যাবে। হাওড়া স্টেশনে যত লোক আমার দেশেরই লোক, সবাই টিকিট কেটেই এসেছে, কিন্তু আমার ছেলে আমার কাছে আমার ছেলে, ইষ্টের সাথে এই ভাব। ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়, এই হল এর ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা।

এরপর ঠাকুর জগদ্ধাত্রীরূপের কথা বলছেন। **জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন**। সচ্চিদানন্দ সাগরের অনেক রূপের মধ্যে এটাও একটা রূপ। **তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়**। কোথায় পড়ে যাবে? গীতাতে ভগবান খুব সুন্দর বলছেন, আমি পৃথিবীকে ধারণ করে আছি –*গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা*, আমার ওজঃ শক্তি দিয়ে এই পৃথিবীকে আমি ধারণ করে আছি। এটা ভগবানেরই একটা শক্তি, ভগবানের এই শক্তিটাকে যখন একটা রূপ দেওয়া হল, তিনি হয়ে গেলেন জগদ্ধাত্রী। ভগবান তিনি হলেন চৈতন্য, কিন্তু তাঁর যে বিদ্যার রূপ, সেটাকে যখন একটা সাকার রূপ দিয়ে দেওয়া হল, তিনি হয়ে গেলে মা সরস্বতী। ওই সচ্চিদানন্দ সাগর অনন্ত সাগর, তাঁর মধ্যে অনন্ত রূপ, সেই সাগর থেকে যে কোন রূপ বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি আপনাকে দর্শন দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আপনি যে রূপ দেখতে চাইবেন সেই রূপও আসতে পারে, উভয় দিক থেকেই আসে। যাঁদের মনের ট্রেনিং নেই তাঁরা এই জিনিসগুলো বুঝতেও পারবেন না। আমাদের হিন্দুদের কি হয়, আমরা বাচ্চা বয়স থেকে জেনে এসেছি যে, আমাদের এতজন অবতার, এতজন দেবতা, এতজন ঋষি; আমরা সবাইকে মানি। এটাই ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম।

মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

রাখাল –"মন-মত্ত-করী"!

মনকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, মনের ইমোশানগুলিকে যিনি বশে রাখতে পারেন, সেই মনেই জগদ্ধাত্রী উদয় হন। শ্রীশ্রীমায়ের মা তিনি স্বপ্নে জগদ্ধাত্রী দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে। জগদ্ধাত্রী পূজায় আমরা দেখি, হাতি যেন মনের প্রতীক, মন নিয়ন্ত্রণ বিহীন হয়ে পড়ে আছে, সিংহ তাকে জব্দ করে রেখেছে।

মাস্টারমশাইর খুব সুন্দর বর্ণনা। **সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তপোশটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন**, ইত্যাদি।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে, জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে। ঘরের ভিতরে সকলে নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্তমূর্তি দেখিতেছেন। ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা। ওখানে আরও কয়েকজন ভক্ত আছেন, ঠাকুর এবার তাঁদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন।

হাজরার প্রসঙ্গে ঠাকুর লীলা পোষ্টাই নিয়ে কথা বলছিলেন। এই যে সংসার, এটাও একটা তাঁর লীলা। এই সংসার-লীলাতে জটিলে-কুটিলে সব রকম থাকতে হয়। সংসারে যে দুঃখ-কষ্ট, এটা তাঁরই অঙ্গ। কথা বলতে বলতে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে গেছেন। অত্যন্ত গভীর জিনিস কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) –বল, তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বলছি। ঠাকুরের সব কথাই সংশয় মেটানোর জন্যই বলা, তা সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে এই ভাবে বলতেন।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ –আজ্ঞা, শ্যামা এরূপটি হল কেন?

এখানে একটা-দুটো কথা আপনাদের জেনে নেওয়া দরকার। একবার আমি দিল্লির ওদিকে ছিলাম। এক জায়গায় চা খাওয়ার জন্য নেমেছি। বিদেশী কিছু ট্যুরিস্ট আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন, বুঝতে পেরেছেন ইনি একজন সন্ন্যাসী। আগেও হয়ত এই দেশে এসেছেন। আমাকে দেখে সম্বোধন করে বললেন, 'হরেকৃষ্ণ'। আমি বললাম, 'আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী'। তখন একজন বলছেন, 'হিন্দুদের এত দেবীদেবতা, এত ভগবান, আমাদের গুলিয়ে যায়'। আমি বললাম, 'ভগবান আমাদের একজনই, সচ্চিদানন্দ, তিনি এক, যাঁর যে রূপ ভাল লাগে সেই রূপেই সাধনা করেন'। কি বুঝলেন, কতটা বুঝলেন বোঝা গেল না। কিন্তু অনেকেই এটাকে নিয়ে হিন্দুদের নিন্দা করে। কারণ তারা মনে করে, রাম একটি জিনিস, কৃষ্ণ আর-একটি জিনিস, শিব আর-একটা জিনিস; ওরা যেন সব সময় লড়াই করছে। লড়াই করে যিনি জিতবেন তিনি হলেন জয়ী। বিশেষ করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যাঁরা করেন তাঁরা এটাকে নিয়ে বেশি করেন। আসলে জিনিসটা তা নয়।

এই জায়গাতে শ্যামা একটা রূপ। অন্যান্য যে রূপ আছে, এগুলোকে বুঝতে হলে আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বটা একটু বুঝতে হবে। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি, আশা করি আপনাদের মনে বসে গেছে। কিভাবে সৃষ্টি হয়, এর ব্যাখ্যা নেই। বেদে খুব নামকরা সূক্ত আছে নাসদীয় সূক্ত, সেখানে পরিষ্কার বলছেন, *কো অদ্ধা বেদ*, সৃষ্টি কিভাবে হল কে জানবে? কারণ তখন দেবতাদেরও সৃষ্টি হয়নি। বেদের এটা খুব নামকরা কথা, আর এটাই সত্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, বিজ্ঞান কেউ কোন দিন ব্যাখ্যা করতে পারবে না সৃষ্টি কিভাবে হল। কারণটা অত্যন্ত সহজ। আমরা সাধারণ মানুষরা যখন সৃষ্টি শব্দটা বলি, তখন আমাদের মনে হয় এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, দিনের বেলায় আকাশের দিকে তাকালে সূর্য, নীল আকাশ, মেঘের আনাগোনা দেখি; রাতের আকাশে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায় একটা বিশাল জগৎ যেখানে দূরে দূরে গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ, যে যার নিজের কক্ষে ঘুরে চলেছে।

যখন কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় তখন সবাই জানে বস্তুটা কিভাবে তৈরী হয়েছে। ঠিক তেমনি, এই যে বস্তু রূপে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখছি, তাই স্বাভাবিক ভাবে আমরা মনে করছি কোন একটা পদ্ধতিতে নিশ্চয় এর সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের কাছেও তখন এর কোন উত্তর ছিল না। প্রথমে এই সৃষ্টির গভীরে গেলেন নিউটন। সেখান থেকে তিনি তাঁর একটা মত দিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা মেশিন, দম দেওয়া ঘড়ির মত। ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, সেই থেকে নিজের মত জগৎ চলছে; God the watchmaker, খুব নামকরা থিয়োরি। নিউটনের সিদ্ধান্তের একটা মূল জিনিস, স্পেস বলতে যেটা বোঝায়, বস্তু থাকুক আর নাই থাকুক স্পেস থাকবে। যেমন আমি এই ঘরে বসে

আছি, আমি না থাকলেও ঘর থাকবে। ঘরের সব কিছু সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরেও ঘর ঘরই থাকবে। তখন স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্ন আসবে, স্পেস কিভাবে তৈরী হল?

আমাদের বেদান্ত কিন্তু এটা মানে না। বেদান্ত আর বিজ্ঞানের মধ্যে ঝগড়া হত এই স্পেসকে নিয়ে, বেদান্ত ওদের বোঝাতে পারত না স্পেস বলতে আমরা কি বলতে চাইছি। ভাগ্যিস আইনস্টাইন এসেছিলেন। আইনস্টাইন এসে উনি যখন নিজের থিয়োরিটা দিলেন, যে থিয়োরি আজকে বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে। তিনি বললেন, বস্তু যদি না থাকে তাহলে স্পেসও নেই, বস্ত ও স্পেস রিলেটেড। আরও আরও বৈজ্ঞানিকরাও অনেক কথা বললেন। কিন্তু আসলে আমরা হিন্দুরা অনেক দিন আগে থেকেই এই জিনিসটাকে সহজ ভাবে জানি –সৃষ্টি মানেই তিনটে জিনিসের সংযোগ – মন, সময় ও স্পেস। স্পেস মানে বস্তু, বস্তু আর স্পেস একসঙ্গে চলে। আমাদের এখানে স্পেস মানে আকাশ, এই আকাশ মাথার উপরে যে নীলাকাশ দেখছি সেই আকাশ না। আকাশ একটা তত্ত্ব। আকাশ তত্ত্ব হল সব থেকে সূক্ষ্ম পদার্থ। যা কিছু সৃষ্টি হবে সব কিছুতে আকাশ তত্ত্ব থাকবে। সমুদ্র ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেল, এই যে বরফ, সমুদ্রেরই বরফ আর থাকেও সমুদ্রে। ঠিক তেমনি যাবতীয় যা কিছু আছে, যেমন এই কলম, এই কলম আকাশ। কলমটা আছে আকাশে, কলমের ভিতরেও আছে আকাশ। এই জিনিসগুলো ধারণা করতে একটু সময় দিতে হবে। আমরা অনেক দিন ধরে এই বিদ্যার মধ্যে আছি বলে চটপট বলে যেতে পারছি। কিন্তু প্রথমের দিকে আমিও কিছু ধারণা করতে পারতাম না।

যাই হোক, আমরা এই তিনটে জানি –মন, কাল ও পদার্থ বা আকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানে এই তিনটি। এর মধ্যে একটি যদি খসে যায়, বাকি দুটিও খসে যাবে। যিনি মনকে জন্ম দেন তিনি প্রকৃতি, যিনি কালকে জন্ম দেন তিনি কালী; একই, প্রকৃতি যা কালীও তাই, যিনি প্রকৃতি তিনিই কালী। যিনি আকাশ বা স্পেসের জন্ম দেন, তিনি প্রকৃতি, বেদান্ত এটাকে মায়া বলে। এই কথাগুলো বেদে আছে, বইয়ে আছে বুঝলাম, কিন্তু এটাকে জানার পথ কি? আমি বলে যাচ্ছি, আপনারা শুনে যাচ্ছেন, এভাবে তো হবে না। আমাদের ঋষিরা বলেন, যে কোন মানুষ এই জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ধ্যান করুন, মনকে একাগ্র করুন, দিনের পর দিন করে যান, একদিন দেখবেন সব কিছু আপনার প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। পেঁয়াজের খোসা একটা একটা করে যেমন সরিয়ে দেওয়া যায়, তেমনি যে কোন বস্তু নিন, একটা ফুলকে কল্পনা করুন। আপনি ফুলের উপর ধ্যান করতে শুরু করলেন, মন একাগ্র হল। ধীরে ধীরে মন সেখান থেকে এত গভীরে চলে যাবে, যেখানে শুধু ফুল থেকে যাবে বাকি সব কিছু চলে যাবে। সেখান থেকে মনকে আরও গভীরে নিয়ে চলে যাওয়ার পর, যে গোলাপ বা পদ্ম ফুলের ধ্যান করছেন, এখন গোলাপ বা পদ্ম চলে গিয়ে শুধু ফুল জিনিসটা থেকে যাবে। যদি না বুঝতে পারেন, মন খারাপ করার কিছু নেই, মন আরও সূক্ষ্ম হলে তখন এগুলো বোঝা যাবে।

এই যে গোলাপ, পদ্ম চলে গিয়ে শুধু ফুল জিনিসটা থেকে গেল, এবার ফুল তত্ত্ব কি, এই ফুল-তত্ত্ব জিনিসটার পুরো জ্ঞান আপনার হয়ে যাবে। এটাকেই যোগশাস্ত্রে বলছেন, সবিতর্ক সমাধি। সেখান থেকে মন যখন আরও গভীরে চলে, মন যখন আরও একাগ্র হয়ে যাবে, তখন ফুল এই জিনিসটাই থাকবে না, যে পঞ্চ তন্মাত্রা; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দিয়ে ফুল তৈরী, মন সেই পঞ্চ তন্মাত্রাতে চলে যাবে। তখন ফুল আর থাকবে না, থেকে যাবে ফুলের গুণগুলো, সেখানে এসে যাবে সবিচার বা নির্বিচার সমাধি। সেখান থেকে এসে যাবে শুদ্ধ তন্মাত্রা। যিনি ধ্যান করছেন, যিনি যোগী, তিনি যেমন যেমন ধ্যান করছেন, তাঁর মন যেমন যেমন গভীরে যায়, তেমন তেমন সেখানে যে শুধু যে এই জিনিসগুলোকে জানতে পারেন তা না, সেগুলোর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এসে যায়। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন ফুলকে, গোলাপ ফুলকে গাঁদা ফুল, পদ্মফুলকে গোলাপ ফুল বানিয়ে দিতে পারবেন। জানাও যা, শক্তি পাওয়াও তাই, এটা বাস্তবে হয়।

এই করে করে যোগী চলে যান সমষ্টি মনে বা বিশ্বমনে। সেখানে যদি তিনি পৌঁছে যেতে পারেন, তিনি এবার যত মন আছে, সব মনের মালিক হয়ে গেলেন। যে কোন মনকে জানতে পারবেন, যে কোন মনে তিনি ঢুকে যেতে পারবেন, যদিও তিনি এ-সব করেন না। কিন্তু এই ধরণের সাংঘাতিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে এসে যায়। যাঁরা আমাদের আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়েছেন, তাঁদের সবারই এই ক্ষমতা ছিল। যীশু খ্রীষ্ট সাধারণ কয়েকজন মানুষকে নিজের শিষ্য করলেন, শিষ্য করে তাঁদের এক কথায় বললেন, জ্ঞান হোক, জ্ঞান হয়ে গেল। কারণ তিনি বিশ্বমনের সাথে এক হয়ে গেছেন, বিশ্বমনকে জয় করে নিয়েছেন। ফলে যে কোন মনকে যেমন খুশি তিনি পাল্টে দিতে পারেন। স্বামীজী একবার আমেরিকার একটা জায়গায় লেকচার দিচ্ছিলেন, লেকচার দিতে দিতে এত গভীরে চলে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে হঠাৎ লেকচার বন্ধ দিতে করে দিতে হল। পরে ওনার এক বন্ধু স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি এত ভাল বলছিলেন, হঠাৎ থেমে গেলেন কেন'? স্বামীজী তখন বলছেন, 'আমি যখন লেকচার দিচ্ছিলাম, তখন লক্ষ্য করলাম শ্রোতাদের মন কাদা মাটির মত হয়ে গেছে, আমি ওই নরম মাটিকে যেমন খুশি আকার দিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি এটা করতে চাইনি, কারণ আমি চাই প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের গুণ ও তার ভিতরের ভাব অনুযায়ী বড় হয়'। স্বামীজী এইজন্যই স্বামীজী, একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, নিজের ভাব তিনি কারুর মধ্যে চাপিয়ে দেবেন না। এই যেমন ইদানিং নিরামিষ খাওয়া আমিষ খাওয়া নিয়ে কত চেঁচামেচি করছে, বোকা বোকা সব কথা। সবাই নিজের ভাব অন্যদের উপর চাপাতে চায়। যার যেমন ভাব সেই ভাব অনুযায়ী তাকে বড় হতে দিতে হবে।

আপনি মন পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কিন্তু তাই বলে মনের পারে কি আছে, এটা জানা আপনার পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। কারণ এরপরে যেটা আছে, সেটাকে জানতে হলে তার সঙ্গে আপনাকে এক হয়ে যেতে হবে। মনের পারে রয়েছে প্রকৃতি, প্রকৃতি হল ত্রিগুণাত্মিকা –সত্ত্ব, রজো ও তমো; এই ত্রিগুণাত্মিকাকে আর তাঁর তিনটে গুণকে আর জানা যাবে না; কারণ যে মন দিয়ে আপনি সব কিছু জানবেন সেই মনকে আপনি পিছনে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। সেই মন পড়ে থেকে গেছে পিছনে, তার মানে প্রকৃতি মন থেকে আরও সূক্ষ্ম। স্থূল দিয়ে সূক্ষ্মকে জানা যায় না। তাহলে প্রকৃতির ব্যাপারে আমরা জানি কি করে? বাস্তবে এরপরে জানার আর কোন পথ নেই। কারণ এরপর যা কিছু জানার থাকে, এটা একমাত্র আচার্য, অবতার পুরুষ যাঁরা, ঠাকুর যেমন; তাঁরা এই জ্ঞানটা পেয়ে থাকেন। সাধারণ অবস্থায় ওখান থেকে কারুর ফেরত আসার কথা না। কিন্তু এনারা হলেন অবতার, অধিকারী পুরুষ; এনারা ওখান থেকে ফিরে এসে আমাদের ওখানকার কথা বলেন, এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা তাঁদের কথা কিছুই বুঝতে পারিনা।

দ্বিতীয় হল, যুক্তির দিক দিয়ে যদি দেখা হয়, একটু আগে পঞ্চ তন্মাত্রার কথা বলা হল; ওই অবস্থায় ওনারা বুঝতে পারলেন, যত তন্মাত্রা আছে সব তন্মাত্রার মধ্যে তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো ও তমো মিশে আছে। স্বাভাবিক ভাবে মনের পারে এটাই থাকবে –সত্ত্ব, রজো ও তমো। এরপরে ঋষিরা, বিশেষ করে কপিল মুনি, তিনি যে সাংখ্য দর্শন দিলেন তাতে এই জিনিসগুলিকেই বিস্তারে দেখানো হয়েছে। বাকিরা সবাই এখান থেকে নিয়েছেন, কিন্তু সবাই যে নিয়েছিলেন তা না, যেমন কাণ্বাদ মুনি, গৌতম মুনি এনারা অন্য পথ দিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু সাংখ্য ও যোগদর্শনের যে সৃষ্টিতত্ত্ব এটা মোটামুটি হিন্দুরা সবাই মেন নিয়েছেন। আমরা আর সৃষ্টিতত্ত্বে যাচ্ছি না।

এখান থেকে কি হয়? আচার্যরা বলছেন, প্রকৃতি হল ত্রিগুণাত্মিকা, তার মানে জড়; কারণ সেখান ইউনিফিকেশান নেই। ইউনিফিকেশান রয়েছে চৈতন্যে। যখনই চৈতন্য আর সত্ত্ব, রজো ও তমো কাছাকাছি আসে, তখন এই তিনটে গুণকে দেখে মনে হবে ওদের মধ্যে যেন চৈতন্য এসে গেছে, সেখান থেকে সৃষ্টি হয় বিশ্বমন, যেখানে সাধনার দ্বারা একজন পৌঁছে যেতে পারেন। সাধারণ যাঁরা তাঁরা এর উপরে যদি যান, তাঁরা প্রকৃতিকে জানতে পারবেন না, কিন্তু প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যাবেন। অধিকারী পুরুষদের আলাদা কথা।

বিশ্বমনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বা প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন ঈশ্বরকে দেখছেন, তখন কি হয়? সচ্চিদানন্দ বা ঈশ্বরকে দেখা বা সাংখ্যে যাঁকে পুরুষ বলছেন, তাঁকে দেখা, আপনি যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখবেন। তার মানে, আমি যখন ঠাকুরকে দেখব, আমার মনের যে ভাব, এই ভাবটা পুরোপুরি নির্দেশিত হবে আমার মন কি অবস্থায় আছে। আমার মনে যদি দুঃক-কষ্ট থাকে, তাহলে আমি ঠাকুরকে একজন ত্রাতা রূপে দেখব। আমার যদি অভাব থাকে, ঠাকুরকে আমি দাতা রূপে দেখব। আমার মনে যদি প্রেমের ভাব থাকে, আমি ঠাকুরকে প্রেমস্বরূপ দেখব। মন যেন চশমার মত। যার যেমন মনের অবস্থা, যার মনের যে চাহিদা, তার মনের যে চশমা সেই চশমার ভিতর দিয়ে যখন ঈশ্বরকে দেখবেন, সে ওই চশমার অনুসারেই দেখবেন। এই যে সবিচার, সবিতর্ক, সানন্দা, সাস্মিতা বিভিন্ন রকমের সমাধির কথা যোগশাস্ত্রে বলা হয়, সমাধিবান যোগি যিনি, তিনি এই সমাধির মাধ্যমে সমষ্টি মন থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। এখন যোগীর মন যত সূক্ষ্ম হতে থাকবে, ঈশ্বরের রূপ তত পাল্টাতে থাকবে।

যিনি প্রকৃতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারবেন যে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় প্রকৃতি থেকেই হয়। তিনি তখন এও দেখেন যে, ঈশ্বর আর প্রকৃতি আলাদা কিছু না। তখন সাধারণ জিনিসের জন্য, হে ঠাকুর আমার অভাব দূর কর, হে ঠাকুর আমার যেন চাকরি হয়, হে ঠাকুর আমার বাড়ি ভেঙে গেছে দুটো টাকার ব্যবস্থা করে দাও, ঈশ্বরের কাছে এই ধরণের চাহিদা তাঁর আর থাকবে না। কারণ যোগি এই জিনিসগুলিকে পেরিয়ে এসেছেন, এখন তিনি দেখবেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনিই এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। যাঁকে তিনি এতদিন দাতা রূপে, ত্রাতা রূপে পূজা করে এসেছিলেন, আসলে তিনি এর থেকে অনেক বেশি। গীতায় খুব সুন্দর বলছেন –*পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*। কিন্তু তাই বলে তিনি কি এতটুকুই? না, তিনি *বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার,* আমি সেই ওঁ। যেমন যেমন মন শুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরকে তিনি তেমন তেমন দেখছেন।

প্রকৃতির তিনটে গুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর যে ঈশ্বরের বোধ হবে, গুণের মাধ্যমে হবে। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়ে এক রকম দেখবেন, রজোগুণে আর-এক রকম, তমোগুণে অন্য রকম। ফলে কি হয়, বেদ থেকে শুরু করে যে সন্ত-মহাত্মা, যে ঋষির মনের অবস্থা যেমন, তিনি ঈশ্বরকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। একটা মজার কথা বলি, যখন আপনি বিভিন্ন বই বা শাস্ত্র পড়েন, তখন সেই শাস্ত্রে ভগবানের যে বর্ণনা পাবেন, তাতে আপনি ধারণা করবেন না যে, ভগবান এই রকমই। সেখানে আপনি এই ধারণাটাই করবেন যে, যিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি তখন তাঁর মনের এই অবস্থায় ছিলেন। আমি যদি বিরাট মারকুটে লোক হই, হাতে তলোয়ার, বন্দুক নিয়ে বিশ্ব জয়ে বেরিয়ে পড়লাম, তার সাথে আমার শ্রদ্ধা, ভক্তিও আছে। আমি এখন ভগবানকে কেমন দেখব? ভগবানকে দেখব, তিনি শক্তি প্রদান করেন। এক সময় আমি খুব নামকরা চন্দন দস্যু বীরাপ্পনকে নিয়ে যত বই আছে, যত লেখালেখি আছে সব পড়তাম। কুড়ি বছর ধরে একা বীরাপ্পন দুটো রাজ্যের সরকারকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। দুটো রাজ্যের প্রশাসন কিছুই করতে পারছিল না। এটাও জানতে পারলাম যে, বীরাপ্পন নাকি সব সময় মা কালীর স্বপ্ন দেখত। সাধারণ লোকেদের মধ্যে এই আলোচনা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে লোকেরা মনে করত লাগল বীরাপ্পনের মধ্যে বিভিন্ন দেবীর শক্তি কাজ করছে।

যে যেমন সে তেমন ঈশ্বরকে দেখবে। আমি যদি নিজেকে সব সময় জয়ী মন করি, আর তার সাথে আমার যদি প্রচুর জপধ্যান থাকে, ঈশ্বরকেও আমি ওই রকম দেখব। কোথাও যদি আমাকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়, বা জীবনে প্রচুর মার খেতে থাকি; তখন বলব, হে প্রভু, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে? আমি যদি বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হই, তখন আমি ঈশ্বরকে মা সরস্বতী রূপে দেখব। হে মা সরস্বতী, তুমি তোমার জ্ঞানদুগ্ধ দিয়ে জগতের পুষ্টি সাধন করে থাক, আমাকেও পুষ্ট কর। বেদে ঠিক এই মন্ত্রই আমরা পাই। বেদে আবার ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সেই মন্ত্র আছে যেখানে ঋষি বলছেন –হে

ইন্দ্র, তুমি আমাদের যুদ্ধে জয়ী কর। তাই বলে ভগবান এমনটা হয়ে গেলেন না যে, আপনাকে নিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে নেমে গেলেন শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা তাঁর মনের এই অবস্থা ছিল। তিনি ঋষি ছিলেন ঠিকই, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা একজন জয়ীর মত। এটা খুব মজার ব্যাপার; সমস্ত ধর্মগ্রন্থে, এমন কি অন্যান্য সব গ্রন্থে, সমস্ত কাব্যিক গ্রন্থে ঈশ্বরের কিছু না কিছু যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, যিনি ঈশ্বরের বর্ণনা লিখেছেন তাঁর অজান্তায় তাঁর মনের অবস্থার প্রতিফলনই তাঁর রচনায় ফুটে ওঠে। কবি কালিদাসের খুব নামকরা কথা – কামী পুরুষ সব জায়গায় শুধু কাম দেখে।

সেইজন্য ঋষিদের বেদ থেকে শুরু করে বিশ্বে যত ধর্মগ্রন্থ আছে, ভারতবর্ষে যত ধর্মগ্রন্থ আছে, সমস্তে গ্রন্থে তাঁরা তাঁদের মনের যে ভাব, সেই ভাবকে অবলম্বন করেই ঈশ্বরের বর্ণনা করেছেন। যাঁর মনে প্রচুর রকমের চাহিদা, তিনি সব সময় ঈশ্বরকে ঐশ্বর্যাবান রূপেই দেখবেন। ঠাকুর হাজরার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠিক এই কথাই বলছেন –হাজরা গত জন্মে কাঙালী ছিল, তাই সব সময় ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা বলে। তাহলে কি হাজরা ভুল কিছু বলছেন? একেবারেই না। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু, এই সমস্ত কিছুর শক্তির মালিক তিনি। এই জিনিসটা যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে এরপর ঠাকুর যেটা বলছেন সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠাকুর শ্যামা এরূপটি হলে কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সে দূর বলে। এই দূর আমাদের জন্য না, যাঁরা সাধনা করছেন তাঁরা এখনও যে সমষ্টি মনের কথা বলা হল, সেই সমষ্টি মনের পিছনে আছেন বলে তাঁদের কাছে দূর মনে হচ্ছে। **কাছে গেলে কোন রঙ নাই**। কোন কাছে? প্রকৃতির সঙ্গে যখন এক হয়ে যাবে, মায়ের সঙ্গে যখন এক হয়ে যাবে। **দীঘির জল দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল, কোন রঙ নাই। আকাশ দূর থেকে যেন নীলবর্ণ। কাছের আকাশ দেখ, কোন রঙ নাই**। কাছে বলতে, আমাদের কথা বলা হচ্ছে না, এই কাছে বলতে সেই সব সাধকদের কথা বলছেন, যাঁরা যোগ সাধনা করে ভক্তির পথে বা জ্ঞানের পথে মন যখন একাগ্র হতে শুরু হল, আর যখন একেবারে শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেল, তখন দেখেন কিছু নেই। রূপ মনের অবস্থা থেকে আসে। মহতের সাথে অর্থাৎ বিশ্বমনের সাথে আপনার মন যখন এক হয়ে গেল, তখন মনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে দেখাচ্ছে। আমরা এখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরকে দেখছি, ফলে ঈশ্বরকে এক-রকম দেখাচ্ছে। তন্মাত্রার মাধ্যমে যখন দেখবেন, তখন ঈশ্বরকে আর-এক রকম ভাবে দেখাবে। মনের মাধ্যমে তাঁকে আর-একরকম দেখাবে। ত্রিগুণাত্মিকা অবস্থা থেকে ঈশ্বর আবার অন্য আর-এক রকম দেখাবেন। আর ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেলে, ঈশ্বরকে আর-এক রকম জানবেন।

পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার "আমার শ্যামা মা"। যেন ঘাসফুলের রঙ। এই অবস্থা খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হয়। যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষি বা অবতার, একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা দেখেছেন তিনি নির্গুণ নিরাকার, যাঁর কোন রূপ নেই; আবার দেখছেন তাঁর রূপ আছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর উপনিষদের ভাষ্যে ঈশ্বরকে শুধু নিরাকার নিরাকার বলে গেছেন, কিন্তু সেই তিনিই আবার কত হিন্দু দেবদেবীর উপর কত উচ্চমানের কত সুন্দর সুন্দর সব স্তোত্রগুলি রচনা করে আমাদের জন্য রেখে গেলেন। মা গঙ্গার স্তোত্রে কি সুন্দর মা গঙ্গাকে বলছেন, *দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে*। এই রকম কত স্তোত্র রচনা করে গেলেন; আবার অন্য দিকে নির্বাণষটকমে বলছেন –*চিদানন্দ রূপোহহং শিবোহহম্ শিবোহহম্*। নিরাকার আর সাকারের মধ্যে শঙ্করাচার্য বাচ খেলতেন। স্বামীজীও বাচ খেলছেন; ঠাকুরও বাচ খেলছেন। বাচ খেলছেন মানে –এই সগুণ সাকারে আছেন আবার নির্গুণ নিরাকারেও আছেন। যখন নির্গুণ নিরাকারে তখন রূপ নেই, তখন *শিবোহম্ শিবোহম্*। আবার যখন সগুণ সাকারে চলে আসছেন আবার সেই শ্যামারূপ, দূর্গারূপ, সব রূপ এসে গেল।

শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়েছ! ভক্তটি বললে, "ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ। আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি"।

প্রকৃতি যখন চৈতন্যময় হন, তখন পুরুষ আর প্রকৃতি এমন মিশে থাকে যে, সেখানে কোন কথা বলা বোকামো। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম মা কালীর দর্শন হয়েছিল, এই দর্শন ওই অবস্থায় হয়েছিল, যেখানে চৈতন্য আর প্রকৃতি মিলে রয়েছে। যার জন্য ঠাকুর সব সময় মা, মা করছেন। আর তারপর তিনি যে অদ্বৈত সাধনা করলেন, সেখানে তিনি পুরুষের সাথে মিশে গেলেন। ওখান থেকে যখনই ফেরৎ এলেন, প্রকৃতির এলাকায় প্রবেশ করে গেলেন, আবার মা মা শুরু হয়ে গেল।

যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি – শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

আসলে ব্রহ্ম ও শক্তি; এই দুটোকে আলাদা করা যায় না। তবে এত পরিষ্কার করে খুব কম গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে, ভাগবতে মাঝে মাঝে এই জিনিসটার বর্ণনা আসে। কিছু কিছু ভক্তিগ্রন্থেও মাঝে মাঝে বর্ণনা পাওয়া যাবে, কিন্তু সব ভক্তিগ্রন্থকে আবার শাস্ত্র বলা যায় না। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ; এটা অত্যন্ত দামী কথা, এটা অনেকেই বুঝতে পারেন না। ব্যাসদেব গীতাতে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। গীতাভাষ্যে আচার্য শঙ্কর থেকে থেকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। বারবার আচার্য বলছেন, যিনি পরব্রহ্ম তিনিই বাসুদেব। তাও কেন লোকেরা আচার্যকে এই ভাবে অদ্বৈতী বলে যাচ্ছেন বুঝতে পারি না। অদ্বৈতী বলতে এনারা কি বোঝেন? আসলে কি হয়, অদ্বৈত বেদান্ত বড় বড় শব্দ কিনা, শুনতে ভাল লাগে। শুনতে ভাল লাগা মানেই এই নয় যে, জিনিসটা আমার জন্য দরকারী হবে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শুনতে ভাল লাগে বলেই যে সত্য হবে, তা না। যেমন বৌদ্ধদের অনেক কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকে প্রচণ্ড ডিফেক্টিভ। আচার্য শঙ্কর সেইজন্য বৌদ্ধদের তুলোধুনো করে রেখে দিলেন।

ব্রহ্ম শক্তি –শক্তি ব্রহ্ম, ঠাকুরের এই কথা আচার্যও তাঁর উপনিষদের ভাষ্যে অনেকবার বলেছন। কেনোপনিষদে যেখানে উমা হৈমবতীর ব্যাখ্যা আসে, সেখানেও আচার্য বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। লোকেদের মাথায় কোথা থেকে এসে গেছে যে, ব্রহ্ম শক্তি অভেদ, এই কথা ঠাকুরই শুধু বলেছেন, শঙ্করাচার্য বলেননি; তা নয়। এটাই অদ্বৈত বেদান্ত, অদ্বৈত বেদান্ত পুরোটাকে নেয়। পরে দেখবেন, ঠাকুর অষ্টাবক্র সংহিতার নিন্দা করবেন, আবার তিনিই স্বামীজীকে পড়তে দিচ্ছেন। একজন ভক্ত ইউটিউবে আমাকে নিন্দা করে লম্বা একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলছেন, 'ঠাকুর তো স্বামীজীকে অষ্টাবক্র পড়তে দিয়েছিলেন, আমরা কেন পড়তে পারিনা', ইত্যাদি। আরে ভাই, আমি কি জানি না যে ঠাকুর স্বামীজীকে পড়তে দিয়েছিলেন? কিন্তু ঠাকুর যে আবার বলছেন, গৃহীদের এগুলো শুনতে নেই, গৃহীদের মুখে এসব কথা সাজে না –এগুলো আপনার চোখে পড়ল না? যখন নেবেন পুরো ছবিটা নেবেন, কোন একটা জিনিসকে নিয়ে বলবেন না, বলতে হলে পুরোটাকে নিয়ে বলবেন। যখন পুরো জিনিসটাকে নেবেন, তখন কেন এই কথা বলা হচ্ছে বুঝতে পারবেন।

বিষয় থেকে সরে একটা কথা বলি। কেনোপষিদের একটা ব্যাখ্যাতে আমি বললাম যে, ভক্তরা এসে এই এই ধরণের প্রশ্ন করেন। সেখান থেকে কিছু কিছু সম্প্রদায়ের লোকেরা তুলকালাম মাচিয়ে দিয়েছে। বলছে, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা মুর্খ। কি বলবেন এদের? মনুস্মৃতির কথা বলেছিলাম, সেটাকে নিয়েও প্রচুর নিন্দা করতে শুরু করল। মাংস ভাত খাওয়া নিয়ে মনুস্মৃতি থেকে বেছে বেছে একটা দুটো শ্লোক নিয়ে বলতে লাগল। কিন্তু ওই মাংস ভাত খাওয়া নিয়ে আগে পিছনে আরও যে শ্লোক আছে সেগুলোকে এরা ঘুণাক্ষরেও বলবে না। আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি হয়েছে, এর প্রথম লক্ষণ আপনি বৌদ্ধিকতার দিক থেকে একজন সৎ। যারা গোঁড়া হয়, তারা বৌদ্ধিকতায় অত্যন্ত অসৎ। যদি

নিন্দাই করতে হয় তাহলে একটা দুটো শ্লোক যখন আনছেন তখন তার আগে পিছের শ্লোকগুলোও নিয়ে আসুন। আমি যখন মনুস্মৃতি বিস্তারে ব্যাখ্যা করি তখন পুরোটাই বলি; মনু এখানে এই রকম বলেছেন আর এই জায়গায় তার ঠিক বিপরীত বলেছেন। বিপরীত কথা কেন বলছেন? সেটাকেও আমি ব্যাখ্যা করে বলে দিই, তার কারণ এটা।

অন্য এক জায়গায় চমৎকারিতা নিয়ে, সিদ্ধাই, মিরাক্যাল এগুলো নিয়ে কিছু কথা বললাম। তখন এক ভদ্রলোক সেটাকে নিয়ে কমেন্ট করলেন –তখনকার দিনে এগুলোর নাকি দরকার ছিল না, এখন দরকার আছে। কি বলতে চাইছেন? যদি কোন ধর্ম মিরাকেলের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যে কোন ধরণের মিরাকেল; ওটা ধর্মই না। স্বামীজী কতবার বলেছেন, মিরাকেল বলে কিছু হয় না। একজন ফাদার স্বামীজীকে বলছেন, যীশু খ্রীষ্টের এই এই মিরাকেলগুলোর ব্যাখ্যা করা যায়। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যদি ব্যাখ্যাই করে দিলাম, তাহলে সেগুলো আর মিরাকেল হল কিসের? এই কথা বলার পর বলছেন, মিরাকেল যত আছে এগুলো সব মনের শক্তি। মিরাকেলের পিছনেই যদি মানুষ পড়ে থাকে, এই মিরাকালই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বনাশ করে দেবে। আপনি যে আমাকে উত্তর দিতে আসছেন, আমি কি জানিনা না কি ভেবে আসছেন। আমি এত ক্লাশ নিচ্ছি, দেখে কি মনে হয় আমার কোন আইডিয়া নেই? সমস্যা হল, যে কোন বিদ্যাতে থাকতে গেলে সেই বিদ্যার চর্চা করতে হয়, আরও দশজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, দশটা মতকে জানতে হয়। তা নাহলে আপনি ভুলভাল সব বুঝে নিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলতে থাকবেন। একটু পরিচিতি থাকলে ভুলভাল জিনিস বলেও নাম হয়ে যায়। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, আচার্য শঙ্কর বলেছেন, এটাই অদ্বৈত বেদান্ত। ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

গোবিন্দ –যোগমায়া কেন বলে?

একটু আগে আমরা যেটা বললাম, পুরুষ প্রকৃতির যোগ। সাংখ্য আর যোগ মতে পুরুষ আর প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক দুটো আলাদা জিনিস। তাদের নিজস্ব সত্তা রয়েছে। কোন কারণে পুরুষ যদি প্রকৃতির কাছে আসেন, প্রকৃতি আলোময় হয়ে ওঠে, আর পুরুষ যেন প্রকৃতির গুণগুলো নিয়ে নেন। গীতাতে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। সেখানে ভগবান বলছেন, পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি এই দুটোই আমার। পরা প্রকৃতি হল সাংখ্য ও যোগের পুরুষ আর অপরা প্রকৃতি হল জড় প্রকৃতি। কিন্তু সবটাই ভগবানেরই। যখন এই দুটোর সংযোগ হয়, তখনই সৃষ্টি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। কারণ ঈশ্বর কখন সৃষ্টি করেন না। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা বলে শ্রীরামচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, শিব সৃষ্টি করেছেন; তারা কিন্তু সেখানে সৃষ্টিতে এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের ভাব নিয়ে আসবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে নারদের স্তুতি আছে, সেখানে তিনি বলছেন, হে রাম! পুং বাচক যা কিছু আছে, সব আপনি আর স্ত্রী বাচক যা কিছু আছে সেটা সীতা। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে পুরুষ মানে চৈতন্য আর প্রকৃতি মানে জড়। অধ্যাত্ম রামায়ণে এটাকে অন্য ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। দেখাচ্ছেন সব এক সঙ্গে, কারণ শিব শব হয়ে থাকবেন। শিব ঈশ্বর, তিনটে গুণের পারে, সেইজন্য তিনি শব হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু ওখানে একটা খুব সুন্দর কাহিনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। কারণ প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া চলতে পারবে না।

ঠাকুর বলছেন, **এই সমস্তই-পুরুষ প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন**। এই কথা বলে ঠাকুর সাংখ্যযোগের যে সৃষ্টিতত্ত্ব সেটাকে বলছেন।

শঙ্করাচার্য বলছেন, শক্তি আর শক্তিমান এক, তেমনি পুরুষ-প্রকৃতি এক। কিন্তু আমরা দুটো শব্দ নিচ্ছি, তার মানেই পুরুষ আর প্রকৃতির যোগ। আমাদের পুরাণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ব্রহ্মা যখন মন থেকে সব সৃষ্টি করছিলেন তখন তিনি দেখলেন সৃষ্টি খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। তখন তিনি নিজেকে নারী আর পুরুষ এই দুটি ভাগে বিভাজন করে নিলেন। সেখান থেকে হয়ে গেল মনু ও শতরূপা। এবার দুজন মিলে সৃষ্টি করতে লাগলেন।

রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তিরও মানে ওই। ওই যোগের জন্য বঙ্কিমভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতির নাকে নীল পাথর। শ্রীমতির গৌর বরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতির নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতি নীলবসন পরেছেন। দেখানো হচ্ছে আসলে দুটো মিলে এক।

উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলছেন। গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ে খুব সুন্দর শ্লোক আছে –*বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*।। যিনি পণ্ডিত, যিনি জ্ঞানী, সমদর্শি, তিনি জানেন সেই আত্মাতেই সব কিছু। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হত, চণ্ডালকে নিচু বলা হত, কিন্তু জ্ঞানী যিনি তিনি জানেন উচ্চনীচ বলে কিছু নেই, সব সমান, কোন তফাৎ নেই। **প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' করে ছাদে পৌঁছাতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি –ইট, চুন, সুরকি – সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে, ব্রহ্মই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন**।

এটা অত্যন্ত উচ্চভাব। আসলে যাবতীয় যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা দেখছি সব সচ্চিদানন্দ। আপনি বাড়িতে বসে ফোনে বা কম্প্যুটারে বা টিভিতে এই লেকচার শুনছেন, টেলিফোন, কম্প্যুটার, টিভি সব সচ্চিদানন্দই। ইয়ার ফোন লাগিয়ে শুনছেন, সেই ইয়ার ফোনও সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখার জন্য আমরা সচ্চিদানন্দকে নিজের মত করে দেখি। ভগবান ওই ভাবে দেখাচ্ছেন না, আমরা ওই রূপে দেখতে চাইছি বলে ভগবান সেই রূপ দেখাচ্ছেন। এই কলমকে আমি কলম রূপে দেখছি, সেই সচ্চিদানন্দ আমাকে কলম রূপে দেখাচ্ছেন। কারণ আমি এটাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখছি। ঠাকুর যখন সেই অবস্থায় থাকতেন, ছাগ বলি হবার সময় তিনি বাস্তব দেখতেন, যে ছাগকে বলি দেওয়া হবে সেও সচ্চিদানন্দ, যে খড়্গ দিয়ে বলি দেওয়া হবে সেই খড়্গাও সচ্চিদানন্দ। যে বলি দেবে সেও সচ্চিদানন্দ, যাতে বলি দেওয়া হবে সেই যূপকাঠও সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় সবাই এটাই দেখেন, কারণ এটাই বাস্তব।

শুধু বিচার! থু! থু! –কাজ নাই।

(ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন)। ঠাকুরের এই এক ছিল। থু! থু! মুখে শুধু বললে হবে না, মুখ দিয়ে থুতু ফেলতেও হবে। মন, মুখ একেবারে এক কিনা।

কেন বিচার করে শুষ্ক হয়ে থাকব? যতক্ষণ 'আমি তুমি' আছে, ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে।

'আমি' বোধ যখন আছে, তার মানে 'তুমি' বোধও আছে। তাহলে নেতি নেতি করে শুষ্ক বিচার কেন করতে যাব? তার থেকে ভাই আনন্দে থাক। নেতি নেতি করে তুমি তো সেই ব্রহ্মেই যাবে। তার থেকে শুদ্ধাভক্তি নিয়ে থাকা অনেক ভাল। আসলে এগুলো ধারণা করা খুব কঠিন। শুনতে ভাল লাগে, শুনে যান। বাচ্চারা একটা করে নূতন কথা শিখে আসে, আর সব সময় ওটাকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গায়, সব কিছুতে বলতে থাকবে। ঠিক তেমনি অদ্বৈত, নেতি নেতি, অহং ব্রহ্মাস্মি এই শব্দগুলো

নূতন নূতন শিখছি, শব্দগুলো শুনতেও খুব ভাল লাগে; এরপর অদ্বৈতের নিচে কোন কথাই আর বলতে চাইবে না। একটু বিচার করে দেখ তোমার 'আমি তুমি' বোধ আছে কিনা, এই বোধ থাকলে কিসে ভক্তি হয়, কিভাবে শুদ্ধাভক্তি হবে সেটাকে নিয়ে ভাব।

(গোবিন্দের প্রতি) –কখনও বলি –তুমিই আমি, আমিই তুমি; আবার কখনও 'তুমিই তুমি' হয়ে যায়। তখন 'আমি' খুঁজে পাই না।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিও বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করেন। যেমন কখন প্রকৃতিতে লীন হয়ে আছেন, আবার কখন আবার মনের অবস্থাতেও থাকেন আর তার নিচের অবস্থাতেও থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয় দিয়েও দেখেন, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি না দেখেন তাহলে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন না। তিনি যখন খাচ্ছেন, তখন ইন্দ্রিয় দিয়েই দেখছেন বলে খেতে পারছেন, তা নাহলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

শক্তিরই অবতার। এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটি ঢেউ।

দেববাণীতে স্বামীজী ঠাকুরের এই কথার উপর অনেকবার গভীর আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। সচ্চিদানন্দসাগর, যেখানে বড় ঢেউ, ছোট ঢেউ, সব রকম ঢেউ আছে; যীশু, বুদ্ধ সব এক-একটা ঢেউ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটাও সেই সচ্চিদানন্দসাগরের একটা ঢেউ। আমি, আপনিও ঢেউ, তবে ছোট্ট ঢেউ। সাগরে বড় ঢেউএর সাথে ছোট ছোট ঢেউও চলছে। এগুলো আমাদের কাছে সব মুখের কথা, আমরা ধারণাই করতে পারিনা। বক্তব্য হল, আমাদের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট, আমাদের মনের যে অপূর্ণতার ভাব, এগুলোর পিছনে একটাই কারণ –আমি নিজেকে ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎএর সঙ্গে বেঁধে রেখেছি। উদ্দেশ্য হল, যোগের দ্বারা হোক, বিচার করে হোক, ভক্তি করে হোক, নিষ্কাম কর্ম করে হোক, ঠাকুরের সেবাপূজা করে হোক, যে ভাবেই হোক, উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা।

অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্যলাভ হয়। তখন দেখে, সর্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।

(মাস্টারের প্রতি) –আর তোমায় বলছি, রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস করো না।

প্রথমের দিকে আমরা শুরু করলাম ধ্যান দিয়ে, কিভাবে ধ্যান শুরু হয়। যখন প্রথম ধ্যান শুরু করতে যাচ্ছেন, তার আগে গুরু আপনাকে নিশ্চয় বলে দিয়েছেন কোন একটা জায়গায় ধ্যান করতে, হৃদয়ে হোক, ভ্রু যুগলে হোক, যাকে যেমন বলে দিয়েছেন। এরপর গুরু সবাইকে বলে দেবেন, সেখানে এই রকম একটা পদ্ম কল্পনা করবে। এবার তুমি দেখ সেই পদ্মের উপর তোমার ইষ্ট বসে আছেন। সেখানে তুমি তোমার ইষ্টকে চিন্তন করবে। এই চিন্তনটা পুরোপুরি কল্পনা। ইষ্টের চিন্তার সাথে সাথে আপনার মনে সব রকম চিন্তা-ভাবনাও আসতে থাকবে। সেইজন্য সময় হলেই মাঝে মাঝে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে বসতে হয়। কারণ ইষ্টের ছবি বারবার দেখলে কল্পনা করতে সহজ হয়।

ওই কল্পনা করতে করতে মন যখন একাগ্র হয়ে যায়, তখন এই ছবি, এই বিগ্রহ ধীরে ধীরে জীবন্ত মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে, কারণ সব কিছু হচ্ছে কল্পনাতে, চিন্তা-ভাবনাতে। এরপর কল্পনাতে যখন মন সত্যিকারের একাগ্র হয়ে যায়, তখন যেন একটা কালো পর্দা ফেটে যায়। তখন আপনি যেটা কল্পনা করছিলেন, সেটা এবার বাস্তব হয়ে গেল। আপনি বলবেন, 'কই আমি তো আগে ঈশ্বরকে দেখিনি, কি করে হবে'? 'ঈশ্বরকে দেখেননি কি করে বলছেন, ছবি তো দেখছেন'। ঈশ্বরের ছবি আছে, মূর্তি আছে। আপনি যে কোন মূর্তি বা ছবির চিন্তা করতে শুরু করুন, চিন্তা করতে করতে ওটা জীবন্ত হয়ে উঠবে। জীবন্ত হয়ে যাওয়া মানে, মানুষ রূপে দর্শন করছি চিন্তা করা যায়। সেখান থেকে হঠাৎ যখন একটা পর্দা যেই সরে যাবে, তখন ওটাই চৈতন্যের আলোতে জ্যোতির্ময় হয়ে

বাস্তব হয়ে যাবে। এরপর জীবনটা পুরো পাল্টে যায়। তার আগে পর্যন্ত ওটা কল্পনাতেই থেকে যায়। এই কল্পনার রাজ্যেই কেউ ভক্ত সেজে, বড় বড় কথা বলে লোকেদের কাছে নিজেকে জাহির করতে পারেন। বেশির ভাগ ভক্ত চিন্তা-ভাবনার স্তরেই চলে। কিন্তু এই মনই যখন কেন্দ্রিত হয়ে তখন সবটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। যেটা কল্পনা করছিলেন সেটাই বাস্তব হয়ে যায়। ঠাকুর এখন কোন রূপে আপনাকে দেখা দেবেন বলা খুব মুশকিল। তিনি চৈতন্যময়, ইচ্ছাময়, তিনি যেমন খুশি তেমন রূপে দেখা দিতে পারেন।

রূপ আছে বিশ্বাস কর! তারপর যে রূপটি ভালবাস সেই রূপ ধ্যান করো। ঠাকুর আপনাকে সেই রূপেই দর্শন দেবেন, অন্য রূপেও দর্শন দিতে পারেন। যখন দর্শন দেবেন, তিনি জ্যোতির্ময় রূপেই দর্শন দেবেন। এই জ্যোতির আলো সাধারণ যে আলো আমরা দেখি সেই আলো না, ওই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন হলে আপনাকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমার কি জ্যোতিদর্শন হয়েছে কিনা। আপনি নিজেই জানবেন যে আপনার জ্যোতিদর্শন হয়েছে।

(গোবিন্দের প্রতি) –কি জানো, যতক্ষণ ভোগবাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না।

এই যে আমরা এতক্ষণ এত কিছু আলোচনা করলাম, সবটাই লজিক্যালি চলছে, এগুলো যে বিশ্বাস করে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে, একেবারেই তা নয়। রাজযোগ তো কোন কিছুই মেনে নিতে বলছেন না, রাজযোগ বলেই দিচ্ছে তুমি যদি এই এই কর তুমিও হাতেনাতে এই এই ফল পেয়ে যাবে। তাহলে আমরা নিচ্ছি না কেন? কারণ আমরা ঈশ্বরকে ঈশ্বররূপে চাই না। ঈশ্বরকে আমরা চাই ভোগবস্তু রূপে, ঈশ্বরকে আমরা চাইছি কামিনী-কাঞ্চন রূপে, ঈশ্বরকে আমরা চাই নামযশ রূপে, ঈশ্বরকে আমরা চাইছি নিজের প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে। সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখে সবারই মনে কি শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হয়? নরেন্দ্রপুর চলে যান, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন চলে যান, সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীকে ধরলে মনে করছেন আপনি আপনার ছেলেকে সেখানে ভর্তি করাতে পারবেন। নামকরা সেন্টারে গেলে ওই মহারাজকে ধরলে প্রসাদের কুপন পাওয়া যাবে। সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী রূপে কে দেখছেন? বেশির ভাগ সময় দেখবে আমার কোন কাজে আসতে পারে।

অনেকদিন আগে একবার নরেন্দ্রপুর থেকে এক মহারাজ সেবা প্রতিষ্ঠানে ফোন করেছিলেন। যিনি ডিউটি রুমে ছিলেন, তিনি ফোন তুলে বলছেন, 'মহারাজ আপনি সেক্রেটারি মহারাজ বলছেন'? 'না না'। 'কলেজের প্রিন্সিপাল মহারাজ বলছেন'? 'না না'। 'ও, তাহলে নিশ্চয় স্কুলের হেডমাস্টার মহারাজ বলছেন'? 'আমি একজন এমনি সাধু বলছি'। আমাদের সাধুদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক হাসিমজা হয় –আমি এমনি সাধু। এমনি সাধুকে কে জিজ্ঞেস করতে যাবে? যে গরু দুধ দেয় না, সেই গরুকে কে ঘাস খাওয়াতে যাবে? আমরা সেই ঈশ্বরেরই পূজা করি, যে ঈশ্বর দুধ দেবেন। ঈশ্বরকে আমাদের দরকার দুধ পাওয়ার জন্য। ঈশ্বরকে আমরা চাইছি না, কিন্তু ঈশ্বর প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে বহু রূপেই আসছেন। আপনি যাকেই ভালবাসছেন, টাকা-পয়সা, নামযশ, বেলুড় মঠে এলে গেস্ট হাউসের রুম চাই, সেবা প্রতিষ্ঠানে রোগীকে ভর্তি করা চাই, সবই ভগবানের রূপ, কিন্তু আমরা ওটাই চাইছি। এই কথাই ঠাকুর বলতে চাইছেন, যতক্ষণ ভোগবাসনা ঈশ্বরকে ঈশ্বর রূপে পাবে না, এই রূপেই পাবে।

কিন্তু এই রূপে পেতে সমস্যা হল, আপনার গলা কাটবে। ঈশ্বরকে ঈশ্বর রূপে ভালবাসলে সেখানেও আপনার গলা কাটবে। সেখানে আপনার অনেক কিছু চলে যাবে, অন্যান্য ধরণের অনেক দুঃখ-কষ্টের আমদানি হবে। তবে তফাৎ হল, মানুষ যেমন নিজের ভোগবাসনা ছাড়তে চায় না, তেমনি যিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, তিনি নিজের ভক্তিকে কোন পরিস্থিতিতেই ছাড়তে চাইবেন না। ঠাকুর

বলছেন, যতক্ষণ প্রাণ ব্যাকুল না হয়। কেন দর্শন হচ্ছে না? কারণ দর্শন পাওয়ার জন্য আপনার প্রাণ এখনও ব্যাকুল হচ্ছে না।

ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে 'মা যাব'। আর সন্দেশ চায় না।

সংসারে মানুষ যখন কষ্ট পায়, তখন তারা মহারাজদের কাছে গিয়ে বলবে, 'মহারাজ সত্যি বলছি, একেবারে মন থেকে বলছি, সংসার আর ভাল লাগে না, শুধু আমড়া, আটি আর চামড়া। মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন, উট কাঁটা গাছ খায়, মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, আবার কাঁটা ঘাসই খেতে নেমে যায়'। বলেই, নিজেও কাঁটা ঘাস খেতে নেমে যায়। আমি যে কত ভক্ত ভক্তানীর কাছে এই কথা শুনেছি, কল্পনাও করতে পারবেন না। বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার কাঁটা ঘাস খেতে যাবে। সংসার আপনাকে অত সহজে যেতে দেবে নাকি, কত কোটি কোটি জন্ম দিয়ে আপনাকে এই জায়গাতে এনে বাঁধতে পেরেছে, অত সহজে আপনাকে বেরিয়ে যেতে দেবে!

আমাদের নিজেদের জীবনে কত দেখেছি, সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে আসব ঠিক করেছি, তখন বাবা-মা পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমরা তোমার উপর কত টাকা ঢেলেছি, কত পরিশ্রম করে বড় করেছি, এমনি তোমাকে বেরিয়ে যেতে দেব'? একজন মহারাজ বাড়ি থেকে চলে আসার পর মঠে এসে ওনারা বাবা মঠের মহারাজদের পরিষ্কার বলছেন, 'ফসল আমি তৈরী করলাম আর কাটবেন আপনারা'? প্রকৃতিও এই ভাষাতেই বলে –আমি এত দূর নিয়ে এলাম আর ফসল নেবেন ঈশ্বর? চল চল, আমার কাছে; তোমার কষ্ট হচ্ছে, এই নাও একটু মিষ্টি ফল খেয়ে নাও প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। বাস্তবে এই রকমই হয়।

প্রকৃতি আপনাকে অত সহজে ছেড়ে দেবে ভাবছেন? আমার আর ভোগ লাগবে না, বলছেন? আরে ভাই, বুড়ো বয়সে কার ভোগ ভাল লাগে? খেলে হজম হয় না, সে বলে নাকি, আমার আর ভোগ ভাল লাগে না। কুড়ি বছর বয়সে বলুন, তখন বুঝব। যখন কুড়ি বছর বয়সে বলবেন, আমার ভোগ ভাল লাগে না, আর সেখানেও আপনাকে জাগতিক ক্ষেত্রে একজন কৃতকৃত্য হতে হবে। সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে, কোথাও কিছু করতে পারছে না, তখন বলছে, আমার ভোগ ভাল লাগে না, এই রকম হলে হবে না। একটা কিছুতে সাফল্যের শীর্ষে থাকতে হবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, আমি জীবনে যা চাই তাই আমি পেয়ে দেখাতে পারি, কিন্তু আমার লাগবে না। ওই রকম হয়ে দেখান, তারপর বেরিয়ে আসুন, তবে বুঝব।

অনেক ব্রহ্মচারীদের আমরা আমাদের সামনেই বড় হতে দেখেছি। নূতন ব্রহ্মচারীদের অনেক সময় মন স্বাভাবিক ভাবেই একটু খারাপ করে। আমি তখন মজা করে তাঁদের বলি, 'ভাই, ঘরবাড়ি ছেড়ে নূতন সন্ন্যাসী হয়েছ, প্রথমের দিকে মন যদি একটু চঞ্চল না হয়, বাড়ির কারুর জন্য চোখে জল যদি না আসে, বুঝতে হবে তোমার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। হঠাৎ মনে হতে পারে, ঠিক জায়গায় আছি কি? ঠিক পথে আছি কি? এইভাবে যেতে যেতে যখন এমন একটা বয়স হয়ে যাবে, যখন দেখবে আর কোন পথ নেই, আমাকে এখানেই থাকতে হবে; তখন গিয়ে সত্যিকারে একটা শান্তি হয়'। সেইজন্য প্রকৃতি কি করে, এই দেহটাকে নাশ করে দেয়। জীবাত্মাকে আর-একটা শরীর দিয়ে দেয়। এই নাও তোমার নূতন শরীর, এই জন্মটা এতে থাক, আর তোমার জন্য এই ধন-সম্পদ রূপী সন্দেশ দিলাম, নামযশ রূপী সন্দেশ দিলাম, ভাল স্ত্রী রূপী সন্দেশ দিলাম, এই নিয়ে থাক; ঈশ্বর আবার কি, ঈশ্বরের কথা ছাড়, এই সংসারটাই সব কিছু।

ঠাকুর বলছেন, যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই –তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন শুরু এভাবেই হয়। যে বলে, আমি তোমাকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাব, তারই সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সব পিছনে পড়ে থেকে যাবে। ভিতর থেকে যখন ডাক আসে, তখন যে কোলে করে নিয়ে যেতে চাইবে, তারই সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। আসলে আমাদের বেশির ভাগেরই ঈশ্বরের যে বাস্তব রূপ সেই রূপের দিকে মন যায় না, ঈশ্বরের অন্য যে রূপগুলো আছে সেই রূপের দিকেই আমাদের বেশি আকর্ষণ, সেই রূপকেই বেশি ভাল লাগে; প্রকৃতিও তাই আমাদের খুব ভাল করে বেঁধে যতদিন খুশি প্রকৃতির রাজ্যে আমাদের নাচাতে থাকবে।

সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। মনে রাখবেন, লোকেরা যখন বলে সংসার ভাল লাগে না, তাদের সংসার ভাল লাগছে না, কিন্তু তাই বলে মনে করবেন না যে ঈশ্বরের দিকে মন টানছে, প্রশ্নই নেই। **কি করে তাঁকে পাব –কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে**।

মাস্টার (স্বগত) –ভোগবাসনা গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। নবম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়। এরপর আবার বলরাম মন্দিরে ঠাকুরের আগমন, ১৮ই আগস্ট; একটা বড় ব্যবধান।

দশম পরিচ্ছেদ

বলরাম-মন্দিরে ঈশ্বরদর্শন কথা

১৮ই অগস্ট, ১৮৮৩, শনিবার ঠাকুর বিকালবেলায় বলরামবাবুর বাড়িতে এসেছেন। (পৃঃ ২৪৮) ঠাকুর কোথাও গেলে যেমন কথা বলতেন, তেমনি আরও কিছু কিছু করতেন বা বলতেন। মাস্টারমশাই সব শব্দগুলোই যে অনুলিখন করেছেন তা না, একটা দুটো শব্দ ছেড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হয় না যে মাস্টারমশাই মূল কথাগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

এখন ঠাকুর কারুর বাড়িতে গেছেন, সেখানে গিয়েই অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে শুরু করে দেবেন, তা তো সম্ভব না; অন্য কিছু কথা অবশ্য বলেছিলেন। যাই হোক, এই পরিচ্ছেদে মাস্টারমশাইর বর্ণনানুযায়ী পাই, ঠাকুর সরাসরি অবতার তত্ত্ব দিয়ে শুরু করছেন। আগে হয়ত ঠাকুর কিছু বলেছিলেন, সেগুলো মাস্টারমশাই বাদ দিয়ে গেছেন, ভালই করেছেন। কথাগুলোকে ডাইরিতে লিখে নোটস্ বানিয়ে রাখা, এটা একটা বিশেষ কলা, মূল লেখার সময় যার মধ্যে কিছু কিছু জিনিসকে ছেড়ে দিতে হয়। যাই হোক, ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে অবতারতত্ত্ব বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –অবতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে। ঠাকুর এটা নিজের কথা বলছেন না, অবতারের কথা বলছেন। অবতারতত্ত্ব এর আগে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। তবে কি, কথামৃতে দেখবেন ঠাকুর একই কথা অনেকবার বলেছেন। ব্যাখ্যাও সেইভাবে অনেকবার করতে হয়। তাছাড়া এই জিনিসগুলো এত সূক্ষ্ম যে, গীতাতে এক জায়গায় আচার্য শঙ্কর বলছেন, একই কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলাটা পুনরুক্তি দোষ। একই কথা বারবার বলা এটাকে শাস্ত্রে একটা সিরিয়াস দোষ বলা হয়। কিন্তু সেখানে আচার্য বলছেন, আত্মতত্ত্ব এত সূক্ষ্ম যে, মা যেমন সন্তানকে একই কথা বারবার বুঝিয়ে বলেন, ঠিক তেমনি শাস্ত্র আত্মতত্ত্বকে বারবার এভাবেই বুঝিয়ে বলছেন। ঠাকুরও সেইজন্য একই কথা বারবার বলছেন।

বস্তু হল সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি, কিংবা ব্রহ্ম আর শক্তি। এই শক্তিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়; কখন প্রকৃতি বলছেন, কখন মায়া বলছেন। যিনি শুধু ব্রহ্মকেই দেখছেন, তিনি ওই শক্তিকে শুধু মায়া বলে ছেড়ে দেন। যিনি শক্তিকে আলাদা রূপে দেখতে চান, তিনি প্রকৃতি দেখেন বা শুধু শক্তি রূপে দেখেন। এক-একজন যোগী বা এক-একজন ঋষি, তাঁর মনের যে অবস্থা, তাঁর যেমন ভাব তিনি সেভাবে বলেছেন। আশ্চর্য এটাই যে, আপনি যেটাই ধরবেন সেটার জন্য একটা সঠিক দর্শন দাঁড়িয়ে থাকবে। যে দর্শনের সঙ্গে আপনার মত মেলে, আপনি যদি সৃষ্টিতত্ত্বের আধার মা কালীকে মানতে চান,

তারও একটা দর্শন পেয়ে যাবেন। মায়ারূপে যদি দেখতে চান, সেটারও একটা দর্শন পেয়ে যাবেন। প্রকৃতিকে এক আলাদা সত্তা রূপে দেখতে চান, সেটারও দর্শন পেয়ে যাবেন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, এই রূপে যদি দেখতে চান, তারও দর্শন পেয়ে যাবেন। যদি কিছু করতে চান, তাহলে একটা মত, একটা দর্শনকে ধরে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। আর যদি কিছু করতে না চান, তাহলে পাঁচ খানা প্রশ্ন করে জীবন কাটিয়ে দেবেন। কোন কিছু করার জন্য একটা কারণ লাগে, কিছু না করার জন্য হাজারটা কারণ লাগে। যদি দেখেন কেউ কোন কিছুর জন্য একগাদা কারণ দেখায়, তার মানে উত্তরটা গোলমেলে আছে। প্রথম বলবে, মহারাজ খুব ইচ্ছে এগুলো করি, কিন্তু সময় হয় না, কিংবা বলবে আমার অনেক সমস্যা, কিংবা নিজের শরীরের সমস্যার কারণ দেখাবে। যারা আন্তরিক করতে চায়, তারা সরাসরি কিছু করার জন্য নেমে পড়ে।

যদি আপনি শ্রেষ্ঠ হতে চান, তাহলে যেমন আপনার ভাব, তেমন আপনার গ্রন্থ, তেমন আপনার দর্শন। আপনি যদি সুপার মার্কেট যান, সেখানে আপনি যা কিনতে চাইবেন সবই পেয়ে যাবেন। তবে পকেটে টাকা থাকা চাই। পকেটে টাকা থাকলে যা চাইবেন পেয়ে যাবেন। ধর্ম পথে টাকা লাগে না, ধর্ম পথে চলার জন্য টাকা হল ইচ্ছা; শুধু ইচ্ছাটুকু থাকলেই হল। এর বেশি আর কি দরকার, ভগবান এর বেশি আর কি করবেন! ভগবান আপনাকে সংসারে রাখেননি, সংসারে আপনি আছেন। আর আপনিও একটা ঈশ্বরের রূপ; নিজের মনকে একটা সৃষ্টি করে দিয়ে সেই মনের আধারে সংসারে জড়িয়ে আছেন। বাচ্চা যেমন খেলার সাথে জুড়ে থাকে। ভগবান বারবার অবতার হয়ে এসে বলেন, বাপু তুমি তো আমার সন্তান, আমার সাথে চলো। আমরা যাব না, কারণ আমার সোনার হরিণ চাই, না আমি যাব না; বলছি তো আমি যাব না। এরপর বোকা বোকা প্রশ্নগুলো শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয় –ভগবান কেন আমাদের সংসারে রেখেছেন, ভগবান কেন আমাদের কষ্ট দেন।

ভগবান আপনাকে সংসারে রাখেননি, ভগবান আপনাকে কোন কষ্ট দিচ্ছেন না। আপনি জোর করে সংসারকে, জগৎকে আঁকড়ে রেখেছেন। বলবেন, ভগবান তো শক্তিমান, তিনি চাইলে তো মুক্ত করে দিতে পারেন? ভগবান চাইলেও আপনাকে মুক্ত করতে পারবেন না। পারতেন, যদি ভগবান থেকে আপনি আলাদা হতেন, ভগবান থেকে যদি আপনি নিকৃষ্ট হতেন। কিন্তু আপনি তো ভগবানেরই রূপ, সেইজন্য তিনি আপনাকে সংসার থেকে আলাদা করতে পারবেন না। আগেকার দিনে কিছু কিছু সিনেমাতে রাজা আর রাজকুমারের ঝগড়া দেখা যেত, রাজকুমার বলছে, আমিও রাজার ব্যাটা, বাপকে আমি দেখে নেব। ওই ধরণের মত আর কি, আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, ঠাকুর তুমি যতই অবতার হয়ে আসো না কেন, আমি তোমার কথা শুনব না। আমি এখানেই থাকব, মাতাল হয়ে থাকব, আমি চেঁচামেচি করে অস্থির করে দেব, আমি তোমার অস্তিত্বে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দেব, যদি তুমি আস আমি তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে ছাড়ব; তুমি যদি আস, তোমাকে আমি কাঙাল বানিয়ে ছাড়ব, তোমার কোন কথা শুনব না।

ভগবান বেচারি কি করবেন। আপনার বর্তমান দুরবস্থার জন্য কে দায়ী, একবার ভাল করে ভেবে দেখুন। ভগবান বারবার এসে দুই বাহু তুলে বলছেন, এই সংসার ছাড়, এটা একটা জঞ্জাল; তারপরেও আমরা বলছি, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। এক মাতাল শুঁড়িখানাতে মদ খেয়ে মাতলামো করে যাচ্ছিল। বাড়ির লোকদের খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে ওকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছে, মাতাল বলছে, আমি যাব না, আমি এখানেই থাকব। আমাদেরও ওই দুরবস্থা, আমি যাব না, আপনি কি করবেন? ভগবান বুঝিয়ে যাচ্ছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে এসে তিনি তো ঘরে ঘরে গিয়ে বলছেন, কলকাতার রাস্তায় গিয়ে বলছেন –যে রাম যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ। কিন্তু লোকেরা শুনছে না। অবতাররা এত রূপে এসে আমাদের বলছেন, তাও কেউ শুনছে না। আমরা ঠিক করে রেখেছি অবতারের কথা শুনব না; আরে আপনি অবতার হলে কি হবে, আমিও ভগবানের ব্যাটা। এসব দেখার

পর আমার তো ভগবানকে দেখেই করুণা হয়, মানুষকে দেখে হয় না। এই যে এতগুলো কথা বললাম, ভেবে দেখবেন, একটা কথাও ভুল বলছি না।

এই যে শক্তির কথা বলা হল, শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। সৃষ্টিতে কিছু নেই, সৃষ্টি শুধু তিনটে গুণের খেলা, পিওর তিনটে কোয়ালিটি। যেমন লাল রঙ, লাল রঙ তো আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু লাল রঙ দেখার সময় আমরা একটা কোন বস্তুকে আধার করে লাল রঙ দেখব, ফুলে দেখব, কাপড়ে দেখব, রেলের সিগন্যালে দেখব। যেমন আমি গেরুয়া রঙের কাপড় পরে আছি, গেরুয়া রঙকে আপনারা এই কাপড়কে আধার করে দেখছেন। কিন্তু শুধু লাল রঙ, লালত্ব, রেডনেস্, এটাকে কি আপনি কল্পনা করতে পারেন? একটু মুশকিল হবে। আপনি যদি চেষ্টা করেন কল্পনা করতে পারবেন। ত্রিগুণাত্মিকার গুণ হল ওটাই, যেমন রঙ, রঙের যে আধার, যেমন লালত্ব, হলুদত্ব, ধবলত্ব, নীলত্ব; ঠিক তেমনি গুণ হল সমস্ত কিছুর আধার, পিওর কোয়ালিটি, যে গুণ কোন বস্তুকে আধার করে নেই। যেমনি কোন বস্তুকে আধার করে নেয়, তখন গুণকে বোঝা সহজ হয়ে যায়। এই গুণকে আধার করেই এই সংসার। আর এই সংসার যখন সৃষ্টি হল, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, তিনিই এই শক্তিকে সৃজন করে সংসারের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনিই এখন জীবরূপে দেখাচ্ছেন। জীবরূপে তিনি অবাক হয়ে এই তিনটে গুণের মাঝখান দিয়ে নিজের দিকে তাকাচ্ছেন, অণু বৃহতের দিকে তাকাচ্ছে।

কল্পনা করুন হিমালয় থেকে একটা পাথরের টুকরো গড়াতে গড়াতে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছে গেল, আর সেখান থেকে সে অবাক হয়ে হিমালয়ের দিকে তাকাচ্ছে, আর ভাবছে কি বিশাল পাহাড়! আরে! তুমিও তো সেটাই। বোঝানর জন্য বলা হল। কিন্তু বাস্তবে যেটা হয়, আমি, আপনারা যাঁরা শুনছেন, যাঁরা ডাকাত, খুনী, আরও হাজারটা যারা এই রকম মানুষ, তারাও সব সময় যা কিছু দেখছে ঈশ্বরকেই দেখছে; কারণ ঈশ্বর বাদে তো কিছু নেই। আপনি আমাকে দেখছেন, আমার সামনে মাইক্রোফোন আছে, আমার হাতে কলম আছে, কি এগুলো? ঈশ্বর ছাড়া আর কি হবে, কারণ ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই। শুধু যখন আমার মন দিয়ে দেখছি, মন মানেই তিনটে গুণ, তখন ঈশ্বরের রূপ পাল্টে যায়।

এটাই যখন যোগ সাধনা করে, কিংবা ভক্তি পথে সাধনা করে বস্তুর উপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরাতে থাকেন, তখন আসে তন্মাত্রার আবরণ। তন্মাত্রার আবরণও যখন সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওটা হয়ে গেল শুদ্ধ মন। বেদান্ত মতে শেষ অবস্থায় দেখবেন শুদ্ধ চৈতন্য বাদে কিছু নেই। এই শুদ্ধ চৈতন্যই কলম রূপে, মাইক্রোফোন রূপে আমার সামনে প্রকাশ পাচ্ছেন। আর যোগীরা, যাঁরা ধ্যান করেছেন তাঁরাও ওই অবস্থায় সেই সচ্চিদানন্দকে, ঈশ্বরকে জগৎ রূপে না দেখে ঈশ্বর রূপে দেখেন। যোগীর মন একটু শুদ্ধ পবিত্র হয়েছে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ একটু বেড়েছে, কিন্তু রয়েছেন গুণের মধ্যেই। তখন তিনি ঈশ্বরকে তেমনটাই দেখেন যেমনটা তাঁর মনের গঠন। যাঁরা খ্রীশ্চান ধর্মের প্রবর্তক, বা অন্যান্য ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক, তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরকে সেইভাবেই দেখেছেন, কারণ তাঁদের মনের গঠন ওই রকমই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সচ্চিদানন্দকে কালী রূপে দেখলেন, কারণ তাঁর মনটা সেই রকম ছিল। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে একটা পরম আশ্চর্যের যে, তিনি বিভিন্ন ভাব নিয়ে সাধনা করলেন; কারণ তিনি মনকে বিভিন্ন ভাবের অবস্থায় নিয়ে যেতে পারতেন। সেইজন্য সচ্চিদানন্দ বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাবে দেখা দিচ্ছেন।

এই সচ্চিদানন্দ যখন দেখেন আমার আপনজনরা সৃষ্টিতে প্রচুর কষ্ট পাচ্ছে; আসলে তো কষ্ট হয় না, কষ্টের বোধ আছে; তখন তিনি অবতার হয়ে এসে আমাদের অজ্ঞান আবরণকে সরাবার জন্য অনেক কথা বলেন, কিন্তু আমরা এক কান দিয়ে শুনে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ি। বাচ্চারা যেমন ঘুমের মধ্যে ভয়ের স্বপ্ন দেখে কাঁদতে শুরু করে; মা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সন্তানকে জাগিয়ে দেন, কিংবা সকালবেলা একটা ভাল স্বপ্ন দেখছে, মা ডেকে ডেকে অনেক তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু

সে উঠতে চায় না। সংসার হল যখন সে এই মন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখছে, আসলে দেখছে না, কিন্তু অজান্তে ঈশ্বরকেই দেখছে। কিন্তু মনটা যখন শুদ্ধ হয়, মনের ভাবটা যখন পাল্টায় তখন ঈশ্বর রূপে বোঝা যায়, জগৎ আর ঈশ্বর দুটোই দেখা যায়। সেই ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন, তিনি জানেন কেউ শুনবে না। যীশু খ্রীষ্ট সত্যি কথাটা মানুষদের ভুল করে বলে দিলেন, আমি সেই ভগবানের সন্তান, সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা তাঁকে ক্রুশিফাই করে দিল।

অবতার যখন আসেন সঙ্গে কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসেন। কাদের তিনি নিয়ে আসেন? আগে আগে যাঁরা অনেক সাধনা করেছেন। সাধনা বিভিন্ন মতের হয়। যাঁরা সগুণ সাকারের সাধনা করে সবিকল্প সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যাঁরা সাধনা করে ইষ্টের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। ইষ্ট চাইলে তাঁকে তাঁর অনন্ত রূপ দেখাতে পারেন, আবার নাও দেখাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, অনন্ত রূপ দেখলেন কি দেখলেন না, জিনিসটা কিন্তু একই। কারণ অনন্ত যা, ঈশ্বরও তাই। সৃষ্টি যত দিন আছে, এই মহাপুরুষরা ততদিন ঈশ্বরকোটি হয়ে বিভিন্ন লোকে বাস করেন। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তিনি তখন এনাদের তাঁর পার্শ্বদ করে নিয়ে আসেন। পার্শ্বদদের নিজের আশেপাশে রাখেন, এনাদের সঙ্গে লীলা করেন। আর অবতারের সঙ্গীরা এনার মতই হন।

শ্রীরামচন্দ্র যখন এলেন, তখন লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বোবান আদি কয়েকজনকে নিজের পার্শ্বদ করে সঙ্গে নিয়ে এলেন। এনারা সবাই হলেন ঈশ্বরকোটি। ওই রকম জীবন-যাপন করতে হবে বলে, ওই রূপেই ওনাদের এনেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ভগবান দেবতাদের বললেন, তোমরা বিভিন্ন গর্ভে গিয়ে জন্মগ্রহণ কর। কারণ ভগবান আপনজনদের নিয়ে সেই ভাবেই থাকবেন। শ্রীকৃষ্ণ রূপে যখন এলেন, তখন কয়েকজন বীর যোদ্ধা কে সাথে করে নিয়ে এলেন। নিজেও তিনি রাজা থাকলেন না, পাণ্ডবরাও রাজা না, সবাই তাঁর সঙ্গী। এই যে ঠাকুর বলছেন, পাণ্ডবদের মত জ্ঞানী কোথায় আছে, অমন ভক্ত কোথায় পাবে, কারণ সবাই ঈশ্বরকোটির লোক। অর্জুন একাধারে তাঁর সখা, অন্য দিকে তাঁর শিষ্য, কারণ অর্জুন ঈশ্বরকোটির।

অবতার তো আসেন লোকেদের ভাল করার জন্য, মাঝখান থেকে কয়েকজন ঈশ্বরকোটির জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেই দিলেন, আমি এসব লোকশিক্ষাতে যেতে পারব না। অনেকবার স্বামীজী বিরক্ত হয়ে সব কাজ বন্ধ করে তপস্যায় চলে যেতে চেয়েছেন। নিজের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ছেড়ে এদের জন্য কাজ করতে হবে, যারা আমার কথা শুনবে না। ধর্মীয় কথা বললে গালাগাল দেবে, ইট মারবে। এখনও মেরে যাচ্ছে। কয়েকজন মন্দবুদ্ধি লোক ধর্মের জামা চাপিয়ে কখন স্বামীজীর এটাকে নিয়ে নিন্দা করবে, কখন তাঁর ওটাকে নিয়ে নিন্দা করবে। আমাদের এখানে বড় ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানকার ছাত্ররা স্বামীজীর নামে নিন্দা করবে। স্বামীজী থাকলে হয়ত মজা করে বলতেন, আমি ঈশ্বরকোটি হতে পারি, তাই বলে কি আমরা ভদ্রলোক না? একটু ভদ্র ভাবে কথা বলুন।

স্বামী ভূতেশানন্দজী অনেক আগে কয়েকজন মহারাজকে নিয়ে দেওঘর গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটা ঘটনা আমাদের বলেছিলেন। মহারাজ একদিন অন্য একজন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় একটা লোক সাধুদের দেখে ব্যঙ্গ করে কিছু খারাপ মন্তব্য করল। মহারাজ শুধু এতটুকু বললেন, 'আপনি একজন ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মত কথা বলুন'। ব্যস আর যায় কোথায়, লোকটা তেড়ে এসে বলতে শুরু করল, 'কি! আমাকে অভদ্র বলা, বলেই সাধুদের মারতে শুরু করলেন'। ভূতেশানন্দজী বলছেন, তিনিও মার খেলেন। আপনারাই কেবল মনে করেন, সাধু-সন্ন্যাসী মানে বিরাট কিছু, কিন্তু কত গালমন্দ আমাদের শুনতে হয় সে আমরাই জানি।

ভগবান অবতার হয়ে এসে কার সঙ্গে কথা বলবেন? যীশু এক সাধারণ ঘরে জন্ম নিলেন। তাঁর আপনজনরা তাঁকে সাধারণ ভাবেই লালন-পালন করলেন। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাও খুবই সাধারণ, সবাই জেলে, মাছ ধরে বেড়াত। অবতার যেমন অবস্থায় আসবেন, তাঁর সঙ্গীরাও তেমন অবস্থায় আসবেন।

ঠাকুর কাঙালী, তাঁর যত শিষ্য সবার কাঙালীরই অবস্থা। অবতার একজন ক্ষত্রিয় হয়ে এলে বা যোদ্ধা হয়ে এলে, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরাও ওই রকম হবেন। এগুলো খুব ভাববার বিষয়। জানিনা আপনারা আগে এগুলো শুনেছিলেন কিনা, কথামৃতেই আছে।

ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকার ব্যাপারে বলছেন, **যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা**। অবতার একজন সাধারণ মানুষের মত থাকতে পারেন, আবার তাঁর স্বরূপেও থাকতে পারেন, কোন বাধা নেই। অবতার আপনজনদের সাথে কথা বলে একটু শান্তি পান। অবতার নিজে ইচ্ছে করলেই স্বরূপে অবস্থান করতে পারেন, অর্থাৎ তিনি ছাদেও থাকতে পারেন, আবার সিঁড়িতে কয়েকধাপ নেমে সাঙ্গপাঙ্গোদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গও করতে পারেন।

অন্য মানুষ ছাদে উঠবার জন্য ভক্তিপথে থাকবে; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না সব বাসনা না যায়। খুব মূল্যবান এবং অত্যন্ত জরুরী কথা। আমরা একটু আগে তিনটে গুণের কথা বললাম। ঈশ্বরের যে শক্তি, এই শক্তি আর ঈশ্বর স্বামী-স্ত্রীর মত নয়। ঈশ্বরের শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা –সত্ত্ব, রজো ও তমো। এই যে তিনটে গুণ, এটাই বাসনা। এই তিনটে গুণ যখন আমিত্বের উপর চলে আসে তখন নানা রকম খেলা করে। কি রকম খেলা করে? 'আমি' যেখানে বিস্তার পায়, সেটাকে বলে সুখ। আপনার বন্ধুর সঙ্গ আপনার ভাল লাগে, এটা সুখ; আসলে 'আমি'টা বিস্তার পাচ্ছে। কিন্তু এই সুখ জিনিসটাও তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা। কিছু জিনিস আপনার পছন্দ হয় না, এটাও তিনটে গুণের মধ্যে। এইভাবে তিনটে গুণ নানান রকমের বাসনা সৃষ্টি করে। বাসনাগুলোকে মোটামুটি দুটো ভাবকে কেন্দ্র করে চলে –রাগ আর দ্বেষ। রাগ হল ভালবাসার ভাব আর একটা দ্বেষের ভাব। সেখান থেকে আর-একটা হয়, বেঁচে থাকার ইচ্ছা। সব আমিত্ব, আমিত্বের উপরেই রাগ, দ্বেষ, বেঁচে থাকার ইচ্ছা, সব কিছু ঘুরঘুর করছে।

আমরা বাসনা বলতে সাধারণ ভাবে মনে করি, কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ; আসলে তা না। বাসনা হাজার রকমের থাকতে পারে। জন্মজন্মান্তর ধরে আমাদের মনের গভীরে কত রকমের যে সুপ্ত বাসনা জমে আছে, সব আমরা জানিও না –যোগশাস্ত্রে যাকে বলছেন, কর্মাশয়। একটা জিনিস আপনি খেলেন। গরু, ছাগল যেমন খায়, সেই রকম আপনি খেয়ে নিলেন; কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু যেমনি আপনার মনে হবে, আহা! এটা বেশ খেতে তো, আর-একবার খেলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভিতর একটা সংস্কারের বীজ তৈরী হয়ে গেল। এই সংস্কারবশতঃ আবার যখন এই রকম কোন খাবার পাবেন, তখন আপনার ওটা খেতে ইচ্ছে করবে। ঠিক সেই রকম একটা কোন কাজ করলেন, কাজটা করে আপনি আনন্দ পেলেন। আপনার একটা সংস্কার তৈরী হয়ে গেল। ঠিক এই সংস্কারের জন্য আবার যখন কোন জিনিস পাবেন, তখন আপনার ওই কাজটা করতে ইচ্ছে করবে। জন্মজন্মান্তর ধরে, যবে থেকে সৃষ্টি চলছে, এত যে সংস্কার আমাদের ভিতর জমে আছে আমাদের তার খবরই জানিনা, এটাকেই রাজযোগে বলেন কর্মাশয়।

অন্য দিকে কি হয়, মানুষ যখন সাধনা শুরু করে, তা যে পথেই সাধনা করুক এই সংস্কারের বীজ সহজে যায় না। আপনি যদি চান পূর্ব পূর্ব সংস্কারের বীজ আমি শেষ করে দেব, শেষ হয় না; সেইজন্য বলা হয় ভোগ করলে কখনই ভোগের শান্তি হয় না। সাধনা করতে করতে আপনি হয়ত শ্রেষ্ঠতম অবস্থায় চলে গেলেন, রাজযোগে যাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়, সেখানে চলে যাওয়ার পরেও এই সংস্কারের বীজ নাশ হয়ে যাবে না। যতদিন না ঈশ্বরজ্ঞান হয়; আমি সেই ঈশ্বরের সন্তান, এই জ্ঞান সাক্ষাৎ যতদিন না হয়, বা নির্বিকল্প সমাধি না হচ্ছে, ততদিন এই বাসনাগুলো নির্বীজ হবে না। আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এই বীজ থাকবেই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সুরথ ও সমাধির খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। সুরথ একজন রাজা ছিলেন, আর সমাধি একজন বৈশ্য ছিলেন। দুজনেই জীবনে কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। সুরথ ও সমাধি মার্কেণ্ডেয়

মুনির আশ্রমে গেলেন, মুনিকে নিজেদের কষ্টের কথা নিবেদন করলেন। মুনি তাঁদের দেবীসূক্তম্ জপ করতে বললেন। মা দুজনকেই দেখা দিলেন, দুজনকেই বর চাইতে বললেন। সমাধি বৈশ্য বললেন, আমার মুক্তি চাই। সুরথ রাজার মনে বাসনার বীজ থেকে গিয়েছিল, তিনি তাই বর চাইলেন, আগামী জন্মে আমি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা হয়ে জন্মাতে চাই। তাই হল। এখানে কাহিনীটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল এটা দেখাতে যে, বাসনা যায় না। এখানে মা দুজনকে দর্শন দিলেন কৃপা করার জন্য, এটা ঈশ্বরজ্ঞান নয়। ঈশ্বরদর্শন দুই প্রকার, একটা হল, আপনার ভক্তিতে তিনি আপনাকে একটা কৃপা করলেন, হয়ত বলে দিলেন, যাও খুব সুখভোগ কর। আর-একটা দর্শন হয়, যেখানে আপনাকে তিনি বোধ করিয়ে দেবেন –তুমি তো আমারই। দুটো পুরো আলাদা জিনিস, ঈশ্বরজ্ঞান আর ঈশ্বরদর্শন এই জিনিসটাকে অনেক সময় লোকেরা বুঝতে পারেন না। তিনি আপনার প্রার্থন শুনলেন, এবং আপনাকে তিনি কৃপা করলেন। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আপন বোধ, এটা সব সময় হয় না। যখন জ্ঞানলাভ হয় তখন বাসনা ক্ষয় হয়। ঠাকুর তাই বলছেন, **সব বাসনা গেলেই ছাদে উঠা যায়**। তখন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন, তিনি চাইলে আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন।

এত কিছু বলার পর ঠাকুরের হয়ত বোধ হল, কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, তাই উদাহরণ দিচ্ছেন **–দোকানদার যতক্ষণ না হিসাব মেটে ততক্ষণ ঘুমায় না। খাতায় হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়**। খুব সহজ উদাহরণ। বক্তব্য হল, মুক্তি তখনই হবে যখন সমস্ত বাসনা ক্ষয় হয়ে যাবে। সেইজন্য চেষ্টা করে এই যে বাসনার বিশাল সমুদ্র রয়েছে, এটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হয়। অর্থ হল, বাসনা যেটা বীজ রূপে রয়েছে, সেটা বীজ রূপেই যেন পড়ে থাক; জল দিয়ে ওটাকে আর বড় করার দরকার নেই। যে বাসনাগুলো বীজ রূপে পড়ে আছে, ওগুলো যাবে না, সব থাকবে। যখন আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান হয়ে যাবে তখন ওটা নির্বীজ হয়ে যাবে। বাসনা যাওয়ার না, কিন্তু এটাই পথ। যখনই দেখলেন কোন কিছুর প্রতি আপনার আকর্ষণ হচ্ছে বা কোন জিনিসকে দেখে আপনার বিকর্ষণ হচ্ছে, তার মানে ওই বস্তু বা ব্যক্তিকে নিয়ে আপনার ভিতরে বাসনা আছে; তখন সমন্বয়ে যেতে হয়।

(মাস্টারের প্রতি) –ঝাঁপ দিলে হবেই হবে! ঝাঁপ দিলে হবেই হবে!

ঝাঁপ, মানে যখন একবারে অন্তর থেকে ঠিক ঠিক বলে দিলেন, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না। তখনও কিন্তু আপনার সব কামনা-বাসনা চলে যাবে না, সব সমেত আপনি ঝাঁপ মেরে দিলেন। বাসনাগুলো তখন পড়ে থেকে যায়, আছে তো আছে, পড়ে থাক। কিন্তু একবার জ্ঞান হয়ে গেলে তখন কে কি বলছে, না বলছে, কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। আমাদের ঠাকুরের নামে কত লোক কত কি বলছে, তাতে কি আসে যায়, আমরা তো জানি ঠাকুর কি। সোস্যাল মিডিয়াতে ইদানিং দু-পয়সার লোকেরা স্বামীজী নিয়ে কত কি-সব উল্টোপাল্টা কথা বলে যাচ্ছে। হাতে একটা মাইক্রোফোন এসে গেছে, যা খুশি বলে যাচ্ছে। নিন্দুকরা কাউকে ছাড়ে না, কার নামে নিন্দা করে না; রাজার মাকে পিঠ পিছনে লোকেরা ডাইনি বলে, এই তো লোক।

ঠাকুর আবার মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, **আচ্ছা, কেশব সেন, শিবনাথ এরা যে উপাসনা করে, তোমার কিরূপ বোধ হয়?**

মাস্টার –আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন, তাঁরা বাগান বর্ণনাই করেন, কিন্তু বাগানের মালিকের দর্শন করার কথা খুব কমই বলেন। প্রায় বাগান বর্ণনায় আরম্ভ আর উহাতেই শেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঠিক! বাগানের মালিককে খোঁজা আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এইটেই কাজ। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।

অবতার এসে আমাদের ধাক্কা মেরে মেরে বলে যাচ্ছেন, ওহে তুমি ভেড়া নও, তুমি সিংহ; কিন্তু আমরা মানব না। তা নাহলে বলবে, ভদ্রলোকের এক কথা, আমি আপনার কথা মানব না। আপনার কথা কেন মানতে যাব? আপনি প্রমাণ দিন যে আপনি ভগবান? আমাদের একজন মহারাজ খুব সুন্দর বলতেন –ঠাকুর এত সুন্দর বর্ণনা করে বলেছেন যে, কাশীতে মরলে শিব কানে তারক মন্ত্র দেন আর মা গিট কেটে দেন। মহারাজ তখন বলছেন, যারা এই ধরণের সংশয়াচ্ছন্ন মানসিকতার লোক, এরা প্রথমে বলবে, দাঁড়ান দাঁড়ান, এই যে কাঁচি দিয়ে কাটতে যাচ্ছেন এটাকে স্টেরালাইজড্ করা হয়েছে কিনা দেখে নিন। আর এই যে মুক্তি দেবেন, এর তিনটে কপি আগে আমাকে লিখে দিন। একটা কপি আমার কাছে থাকবে, এক কপি আপনার কাছে আর অন্যটা অফিসে থাকবে। মানুষ এই রকমই হয়, এদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পূণ্য যদি একটু কাজ করে, তাহলে হয়ত এই মানসিকতার একটু পরিবর্তন হয়ে ধর্ম পথে পা রাখবে।

বলরামের বাড়ি থেকে ঠাকুর এবার অধর সেনের বাড়ি এসেছেন। সন্ধ্যার পর অধরের বাড়িতে ঠাকুর নামসংকীর্তন ও নৃত্যাদি করলেন। অধর, মাস্টার, রাখাল আদিরা উপস্থিত আছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছেন, রাখালকে বলিতেছেন, এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল খুব হুড়হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। বলে নাকি, কোথাও কোথাও শিবলিঙ্গ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। অন্যান্য যে শিবলিঙ্গ আমরা দেখতে পাই, এগুলো কেউ না কেউ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। **তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বললুম, মা এর অপরাধ নিসনি**।

দেখুন, ঠাকুর রাজা মহারাজকে নিয়ে বলছেন, ঠাকুরের উপর রাখাল মহারাজের কোন কারণে রাগ হয়েছে, যিনি একজন ঈশ্বরকোটি, যিনি সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ হবেন, ঠাকুরের উপর তাঁর রাগ হয়েছে, সেখানে আমরা কোন ছাড়। মান, অভিমান, কষ্ট এগুলো তো সবারই হবে। ভাগ্যিস মাস্টারমশাই এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করে লিখে দিয়েছিলেন, না হলে তো আমরা জানতেও পারতাম না। রাজা মহারাজের উপর যে বইগুলো আমরা পাই, বেশির ভাগ বই ওনার শিষ্যদের লেখা, আর শিষ্য গুরুর দুর্বলতাগুলিকে আড়ালে রেখে দিয়ে বেরিয়ে যান, তারপর গুরুকে এমন ভাবে একটা উঁচুতে তুলে দেবেন যে, পড়ার সময় মনে হবে আমাদের দ্বারা তো এই জিনিস কোন দিন হবে না। শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনাগুলো আমরা পাই, দেখে মনে শঙ্কা লেগে যায়, শত শত জন্মেও আমরা এই ধরণের কাজ করতে পারব না; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূতনার মত এক ভয়ঙ্করা রাক্ষসী বধ করে দেব, কখনই তা সম্ভব না। মহাভারতের চরিত্রগুলো তাও মনে হয় একটু আমাদের মত। মানব শরীর ধারণ করলে, তার পাঁচখানা দুর্বলতা থাকবেই। কামিনী-কাঞ্চনে তাঁর মন একটু আসক্ত হতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে মজে যাবে না। সংসারী মানুষ ওর মধ্যে ঝাঁপ মেরে দেয়, ওর মধ্যেই মজে যায়।

এই যে বলা হল, যাঁরা ঈশ্বরকোটি, যাঁরা অবতারের সঙ্গী; এনাদের পূর্ণজ্ঞান থাকে কিন্তু চাপা থাকে। কারণ পূর্ণজ্ঞান নিয়ে জন্মই নেওয়া যাবে না। আর ওনারা তো অবতার নন, অবতারের সঙ্গী। একটুতেই মনের আসক্তিটা চলে যায়। ঠাকুর খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন, ফুল হলে ফল হয়; কিন্তু ঈশ্বরকোটির ক্ষেত্রে ফল আগে ফুল পরে, যেমন লাউ, কুমড়ো। নরেন, রাখাল এনারা অন্য শ্রেণীর। কিন্তু তাতেও এই রকম, মান, অভিমান, কষ্ট থাকছে। বরঞ্চ এগুলো দেখলে আমরা মনে একটা বল পাই এই ভেবে যে, আমরা যদি ঠাকুরকে বুঝতে না পারি, আমাদের যদি কিছু এলেমেলো হয়, তাহলে এতে দোষের কিছু নেই।

আবার অধরকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "বাপু! তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান করো"।

এই বলিয়া অধরের জিহ্বা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন ও জিহ্বাতে কি লিখিয়া দিলেন। এই কি অধরের দীক্ষা হইল?

ঠাকুর বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চার করে দিতেন। কাউকে হয়ত কিছু বলে দিলেন, কাউকে বা একটু স্পর্শ করে দিলেন, কাউকে দৃষ্টি দিয়ে, কাউকে হয়ত জিহ্বাতে একটা মন্ত্র লিখে দিলেন। অবতার কিনা, এত শক্তি যে যাকে যা দরকার, যেমন দরকার তেমনটাই দিচ্ছেন। দশম পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ
আদ্যাশক্তি ও অবতারতত্ত্ব

একাদশ পরিচ্ছেদে এসে দিন পাল্টে গেছে। এখানে মাস্টারমশাই কোন তারিখ উল্লেখ করছেন না, শুধু বলছেন **–আর-একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। সঙ্গে রাখাল, মাস্টার, হাজরা। ঠাকুর রহস্য করিতে করিতে বাল্যকালের অনেক কথা বলিতেছেন।** মাস্টারমশাই কিন্তু এখানে ঠাকুর নিজের বাল্যকালের কি কথা বলছিলেন, তার একটা কথাও লেখেননি।

ঠাকুর সমাধিস্থ! সন্ধ্যা হইয়াছে। নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "মা, এত হাঙ্গাম করিস কেন? মা, ওখানে কি যাব? আমায় নিয়ে যাস তো যাব"। এই কথাগুলো পড়লে কেমন একটা রোমাঞ্চ লাগে। মা কালী ওই জায়গাতে কি করছেন বলা মুশকিল। মাস্টারমশাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, উনিও কিছু বুঝতে পারছেন না। কি ভাষা! 'মা, এত হাঙ্গাম করিস কেন'? মা কালী ওখানে কি হাঙ্গাম করছেন আমরা জানি না, জামা ধরে টানছেন নাকি হাত ধরে টানছেন, আমাদের জানার কোন উপায় নেই। ঠাকুর সব দেখতে পারছেন, মা কালীর সঙ্গে কথাও বলছেন। মাস্টারমশাইও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ঠাকুরের কোন ভক্তের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপার ছিল। **তাই কি জগন্মাতার আজ্ঞার জন্য এইরূপ বলিতেছেন?**

রোমা র‍্যোঁলা ঠাকুরের উপর খুব সুন্দর জীবনী লিখেছেন। সেখানে এই ধরণের কিছু কথা লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি বলছেন, আমরা কি বর্তমান কালে আছি, নাকি কোন সুদূর ইতিহাসের কথা শুনছি।

এখনও জগন্মাতার সঙ্গে ঠাকুরের কথা চলছে। **এবার কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য বুঝি প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, "মা, ওকে নিখাদ কর। আচ্ছা মা, ওকে এককলা দিলি কেন"?**

ঠাকুর একটু চুপ করিয়াছেন। আবার বলিতেছেন, "ও! বুঝেছি, এতেই তোর কাজ হবে"।

খুব মজার এই বাক্যটা। আমরা সবাই মায়েরই কাজ করছি, সবাই মায়েরই কাজ করছে। কিন্তু আমি বোধ থাকাতে মনে করছি, আমি করছি। যার মধ্যে আমি বোধ যত বেশি তার কাজ তত সাধারণ হয়। যার আমিত্ব যত কমতে শুরু হয়ে যায়, তার পাকা আমি অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাব তত বেশি হয়। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। তোমার আমিত্বটা ত্যাগ কর, তোমার আমিত্ব ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি,* সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে ঈশ্বরই সব করান। প্রথমের দিকে আমরা যে আলোচনা করলাম, কিভাবে আমরা তিনটে গুণের সাথে 'আমি'কে আমরা জড়িয়ে রেখেছি, ফলে ঈশ্বরের খেলা আর স্বাধীন ভাবে হয় না।

একবারও কি ভেবে দেখেছেন আপনার শক্তি কেন কম? একবারও কি ভেবে দেখেছেন আপনার জ্ঞান এত কম কেন? আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন জীবনে আপনার এত কষ্ট কেন? আপনি কি

একবারও ভেবে দেখেছেন, আপনার এত শোক কেন? কারণ আপনার একটা জোরালো 'আমি' আছে। ছোট্ট বাচ্চাদের দেখবেন, ওদের আমি বোধটা বিরাট। বাচ্চা যেটা মুখ থেকে বার করে দিয়েছে, এবার বাড়ির লোকেদের ওটাই করতে হবে। না হলে চিৎকার চেঁচামেচি করে সবাইকে অস্থির করে তুলবে। জীবনে আমিত্ব ভাব যত বেশি থাকবে কষ্ট তত বেশি হবে, উপলব্ধি তত কম হবে। আমি এই জামা পরে আছি, জামার হাতা দিয়ে হাতটা গলিয়ে না দিয়ে উপর থেকে যদি জামার ভিতরে পরে নিই, আমার হাত আর বেশি যাবে না; হাত যদি বেশি না যায় হাত চলবে কি করে। হাতটাকে জামার হাতা দিয়ে গলিয়ে বাইরে আনুন, হাতটাকে জামার ভিতরে রাখবেন না। যদি জামার ভিতরে থাকে তাহলে আর কাজ করা যাবে না। আমাদের আমিত্ব ভাব এত প্রবল যে ঈশ্বর ঢুকতেই পারছেন না। ঈশ্বর যে হাত চালাবেন, আমরা সুযোগই দিচ্ছি না, জামার ভিতরে ঢোকানো আছে। আমিত্বের শক্তি যত বেশি, ঈশ্বরের শক্তি তত কম।

ঠাকুর বলছেন, ওকে এককলা দিলি কেন? ওতেই মায়ের কাজ হয়ে যাবে। আসলে এগুলো খুব উচ্চমানের কথা, আর আমাদের বোধগম্য করা সাধ্যের বাইরে। আমাদের একটাই কাজ, শুধু প্রার্থনা করা –ঠাকুর কৃপা কর, আমার যেন বাসনা ক্ষয় হয়, আমার আমিত্ব যেন কমে। বেদে ইন্দ্রের নামে খুব সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা আছে। এই রকম একটা প্রার্থনায় ইন্দ্রকে বলছেন –Divine Dancer। এটাকেই পরে শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের যে নৃত্য, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান হলেন Divine Dancer। কিন্তু তাঁকে নৃত্য করার সুযোগ দিতে হবে, স্টেজও তেমন দিতে হবে। আমাদের যে হৃদয় এটাই তাঁর স্টেজ, এই স্টেজকে একেবারে ফাঁকা করে দিতে হবে। হৃদয় যার যত কম ফাঁকা, ঈশ্বরীয় শক্তি তার তত কম। হৃদয়ের স্টেজটা পুরোটাই দখল করে আছে আমিত্ব ভাব, ভগবানের নৃত্য করার সুযোগ নেই।

এইবার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মাস্টার প্রভৃতিকে আদ্যাশক্তি ও অবতারতত্ত বলিতেছেন।

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। এই কথাগুলো পড়ে অনেকে ভাবেন যে আচার্য শঙ্কর থেকে ঠাকুর আলাদা। কি করে আলাদা, আচার্য শঙ্করও একই কথা বলছেন। তখনকার দিনে ঋষিদের সনাতন ধর্মকে বাঁচানোর জন্য বৌদ্ধদের দাবানোর দরকার ছিল, মীমাংসকদের দাবানোর দরকার ছিল। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্যকে এই কাজের মাধ্যম করে নিলেন, আর তাই আচার্যকে কিছু কিছু জায়গায় জোর দিতে হয়েছে, আবার কিছু জায়গায় কম জোর দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আচার্য শঙ্কর ভাষ্য রচনা করছিলেন, নিজের মত লিখলে তখন বোঝা যেত তিনি কি লিখছেন। তিনি ওখানে ভাষ্য লিখছেন, তাঁর হাত-পা বাঁধা, এটাই তাঁকে করতে হবে। আচার্য শঙ্কর অনেক জায়গায় লিখছেন, শক্তি আর শক্তিমান এক; এই কথা গীতাতেও বলেছেন, কেনোপনিষদেও বলেছেন, আরও অনেক জায়গায় বলেছেন। তবে তিনি ওটাকে নিয়ে বেশি বলছেন না, বেশি বললে তর্কটা আবার ঘুরিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে। আচার্য শঙ্কর সব সময় মায়া নিয়ে বললেন, বিরুদ্ধবাদীরা তাই শঙ্করের মতের নাম দিয়ে দিলেন মায়াবাদ। কিসের মায়াবাদ? আচার্য শঙ্কর হলেন ব্রহ্মবাদী, শব্দটা হল ব্রহ্মবাদী, নাম দিয়ে দিল মায়াবাদী।

যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। শক্তিলীলাতেই অবতার। শক্তি যদি না মানেন তাহলে অবতার হবেন না। আর আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই অবতারের কথা বলছেন। কেন বলছেন? তিনি শক্তিলীলা যদি নাই মানতেন তাহলে কি এই ধরণের কথা লিখতেন? যাঁরা শঙ্করাচার্যের ভাষ্য নিয়ে এই ধরণের কথা বলতে পারেন, তাঁদের নিয়ে কি আর বলার আছে, জোনাকি আলো দিয়ে অন্ধকারকে বাড়ায়।

অবতার প্রেমভক্তি শিখাতে আসেন। অবতাররা যখন আসেন, লোকেদের তখন তিনি এটাই বলেন, ঈশ্বরকে কি করে ভক্তি করতে হবে শিখে নাও বাপু, শান্তি হবে। **অবতার যেন গাভীর বাঁট। দুগ্ধ বাঁটের থেকেই পাওয়া যায়**। কি অসাধারণ উপমা! কোথায় ব্রহ্ম আর শক্তি, কোথায় প্রেমাভক্তি, সেখান থেকে ধপাস্ করে সরে এসে অতি সাধারণ লোকেরা যাতে বুঝতে পারে, বলছেন অবতার যেন গাভীর বাঁট, যেখান থেকে দুধ পাওয়া যায়। কারণ মানুষ অবতারকে জানতেই পারবে না। যদি অবতার না আসতেন, আমরা কল্পনা করতে পারছি না যে, আজকে হিন্দুদের কি দুরবস্থা হত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Comperative Religionএর একটা কোর্স আছে. ওই কোর্সে পড়েছেন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি পুরো বেদকে একটা সাহিত্য রূপে দেখছেন। আমি প্রথম শুনলাম যে বেদকে সাহিত্য রূপে দেখা যায়। বেদকে সাহিত্য রূপে দেখছে। বেদ যা কিনা আধ্যাত্মিক সম্পদের এক বিশাল রত্নখনি, সেটাকে সাহিত্য রূপে দেখছে? ওর মধ্যে সাহিত্য থাকতে পারে? কথামৃতেও আমরা সাহিত্য পাই। কিন্তু তাই বলে বেদকে সাহিত্যের মধ্যে বেঁধে দেওয়া, কল্পনা করা যায় না আমরা কোথায় আছি! ঠাকুরের কথা দিয়েই বলতে হয়, পণ্ডিতদের নিয়ে বলছেন, শকুনি অনেক উপরে ওঠে, কিন্তু তার দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে; এদের দৃষ্টি সাহিত্যে। কারণ বেদ বোঝার ক্ষমতা লোকেদের ছিল না বলে সাহিত্য বলে চালিয়ে দিত। কোরানকে নিয়ে একবার বলুন তো, কোরান একটি সাহিত্য মাত্র, তারপর দেখুন কি হয়। হিন্দুরা শান্তিপ্রিয় কিছু বলে না বলে সব ঠিক আছে।

কিন্তু অবতাররা যে এসেছেন, যার কথা আমরা ভাগবতে, বিভিন্ন পুরাণে, গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে পাই। ঠাকুর এসে আবার সেই অবতারতত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একমাত্র হিন্দু ধর্মে আমরা দেখি, যেখানে অবতাররা মাঝে মাঝেই আসেন। আমরা মরুভূমির জল নই, আমাদের এখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, কাবেরী, নর্মদা, গোদাবরী; চারিদিকে জলে জলাকার –অবতারের এখানে ছড়াছড়ি। ফসল হওয়ার জন্য ভাল মাটি দরকার। ভারতের মাটি হল পূণ্যভূমি, ধর্মের ভূমি। এই পূণ্যভূমিতে অবতার যখন আসেন, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা জীবন্ত হয়ে ওঠে। আপনাদের হাতজোড় করে বলি, এই কথাগুলো যদি একটু চিন্তন করেন, বুঝবেন এর অর্থটা কি। ধর্মের আকাশে যখন মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করবেন, তখন শুধু আপনার মনে হবে আহা! আহা! ধন্য হয়ে গেল জীবন, এই ধর্মে আমার জন্ম। যে ধর্মে মুহুর্মুহু ভগবান অবতার হয়ে আসছেন, লীলা করছেন, খেলা করছেন আর লোকেদের বলছেন, বাপুরা ধর্মকে জানো, ধর্ম হল এই। কোন পাথরে লেখা ধর্ম নয়। একবার বলে দেওয়ার মত ধর্ম নয়। এখানে প্রেম এই, ভক্তি এই, জ্ঞান এই; গ্রহণ করে ধন্য হও, আরও পাঁচজনকে গ্রহণ করিয়ে নিজেকে ধন্য কর। এই যে একটা জীবন্ত ধর্ম, জীবন্ত শাস্ত্র, এই জিনিস একমাত্র এই পূণ্যভূমিতেই আসে।

শুনেছি অন্ধ্র প্রদেশ থেকে কলকাতায় মাছ আসে, মাছে ফরমালিন দেওয়া হয়। এটা মরা মাছ না যে, ফরমালিন দিয়ে মরা মাছকে দেখানো হচ্ছে বেঁচে আছে বলে। এ যেন জীবন্ত মাছ, আর যত রকমের মাছ চান, রুই, কাতলা, মৃগেল, কই, মাগুর, পাবদা, পারসে, ফলি, চিতল, মরলা সব মাছ পেয়ে যাবেন। আমাদের কত রকম ধর্মশাস্ত্র আর সব জীবন্ত। কোন একটা শাস্ত্রকে নিয়ে সেটাতেই লেগে থেকে নিজের জীবনকে ধন্য করুন। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য শুরু করার সময় পুরাণ থেকে একটা শ্লোক নিয়ে এসেছেন। *ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্। অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।* তিনি দেখাচ্ছেন, পুরাণে যা বলছেন, স্মৃতিতে যা বলছেন, বেদে যে কথা বলছেন, গীতাতেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। আমাদের অনেক শাস্ত্র কিন্তু সবাই একই কথা বলেন। এখানে কোন শাস্ত্র বড় নয়, কোন শাস্ত্র ছোট নয়। কারণ ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। যেটা আছে সেটা আমিত্ব, সেই আমিত্বটা জীবের, সেই জীব আসলে ঈশ্বরেরই অংশ, কিন্তু 'আমি'র জন্য নিজেকে আলাদা মনে করছে।

মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুটির ভিতর মাছ এসে জমে।

ভক্তেরা কেহ কেহ ভাবিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার পুরুষ? যেমন শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, Christ? এরপর দ্বাদশ পরিচ্ছেদে চলে যাচ্ছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

পরের দিন ১৯শে অগস্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ২৪৯)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে। **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর – এখনও মধ্যাহ্নকাল –তিনি তাঁহার ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময় মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল**।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, 'সোহহম্' অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা'। এ-সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ-মত ঠিক নয়।

আমি ২০০১-০২ সালে কিছু দিন কানপুর আশ্রমে ছিলাম। ওখানে একজন ডাক্তার ছিলেন, আশ্রমের একজন ভক্ত। এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা ওনার মাকে শাস্ত্র পড়া নিয়ে খুব জোর দেন। ডাক্তারবাবু একদিন এসে আমাকে বললেন, 'স্বামীজী, অষ্টাবক্রসংহিতা পাওয়া যাবে'? আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'অষ্টাবক্রসংহিতা নিয়ে কি করেবন আপনি'? 'আমার জন্য না। একটা সম্প্রদায়ের একজন স্বামীজী একটা ফ্ল্যাটে থাকেন, ওখানে উনি একটার পর একটা ক্লাশ নেন, আমার মা রোজ ক্লাশে যান'। ভদ্রমহিলার বয়স হয়ে গেছে, ঠিক মত চলতে পারেন না, তিনি এখন অষ্টাবক্রসংহিতা পড়তে চাইছেন। ২০০১ সালে ওই প্রথম জানলাম যে অষ্টাবক্রসংহিতা পড়াটা একটা ফ্যাশন হতে পারে। এখন আর এটা ফ্যাশন নেই, ফ্যাড্ হয়ে গেছে। ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন, কোন্ সন্ন্যাসীর জন্য বলছেন? যাঁরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী এবং একেবারে শ্রেষ্ঠ অবস্থায়। এটা গৃহীদের জন্য নয়। আপনি জানতে চাইবেন গৃহীদের জন্য এটা পড়লে কি সমস্যা হবে? শুনতে কি দোষ? প্রচণ্ড দোষ আছে।

এখানে আমরা অন্য একটা টপিকে যাচ্ছি। পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই আমি ওনার কাছে যেতাম এবং অনেক প্রশ্নাদি করতাম। একবার কোন একটা ব্যাপারে একটা মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাইলাম। উনি আমাকে দরজা জানলা সব আগে বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি এমনি কৌতুহল বশতঃ বললাম, 'মহারাজ, এখানে বাইরের কেউ নেই, সবাই আমাদেরই লোক, দরজা জানলা কেন বন্ধ করতে হবে'? উনি বললেন, 'এটা এমন এক সত্য যদি কেউ শুনে নেয়, আর পালন যদি না করে, সে মিথ্যাচারী হবে'। মহারাজের কথাগুলো লক্ষ্য করুন, এগুলো আমার কথা না, পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের –সে মিথ্যাচারী হবে। আমি শুধু কৌতুহল হয়ে একটা গ্রন্থ পড়লাম, কি আছে এই গ্রন্থে জানার জন্য। এতে আমি মিথ্যাচারী হব না। কিন্তু যখন আপনি ওটা অধ্যয়ন করছেন, ওটাকে যখন মন্ত্ররূপে জেনে গেলেন, এরপর আপনি যদি ওই রকম জীবন-যাপন না করেন, তখন ওটা মিথ্যাচার হয়ে যায়। আর যিনি পড়াচ্ছেন, তাঁর জন্য এটা বিষয়টাকে খেলো করে দেওয়ার দোষ হবে। একবার নরেন ও হাজরা বেদান্তকে নিয়ে মজা করছিলেন। মজা করে বলছিলেন, বলে কিনা ঘটি, বাটি সব ব্রহ্ম। মজা করে বিষয়টাকে খেলো করে দিচ্ছেন। ঠাকুর সহ্য করতে পারলেন না। জানতে চাইলেন কি কথা হচ্ছে। যেই জানলেন, স্বামীজীকে ছুঁয়ে দিলেন। হাজরাকে ঠাকুর জানতেন ওকে দিয়ে কিছু হবে না, সেইজন্য হাজরাকে ছেড়ে দিলেন। তারপরের ঘটনাটা সবাই জানেন। তার মানে, যে জিনিসটা বলা হচ্ছিল, সেটাকে ঠাকুর খেলো করতে দিলেন না।

এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড কড়া ভাষায় আমাকে ইউটিউবে আক্রমণ করলেন, ঠাকুর স্বামীজীকে অষ্টাবক্রসংহিতা পড়তে দিলেন, আর আপনি কেন এর বিরোধিতা করছেন? আমি কি বিরোধিতা করব,

ঠাকুর নিজে বিরোধিতা করে গেছেন। ঠাকুর গৃহীদের জন্য নিষেধ করে দিয়ে গেছেন। আপনি একবার পড়লেন, জানলেন এতে কি আছে, ব্যস্, এরপর গ্রন্থকে প্রণাম করে তাকে তুলে রাখলেন –এটা আমার জন্য নয়; এই পর্যন্ত ঠিক আছে। আর আপনি যদি ঠাকুরের কথা না শুনতে চান, স্বামী ভূতেশানন্দজীর কথা না শুনতে চান, তাহলে মিথ্যাচারী হয়ে মিথ্যাচার করুন। ঠাকুরের পরের কথাগুলো লক্ষ্য করুন।

সবই করা যাচ্ছে, অথচ "আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা" –এ কিরূপে হতে পারে? এটা কত বড় মিথ্যাচার কল্পনা করতে পারেন? আপনি খাওয়া-দাওয়া করার সময় ভোগ করছেন, আপনি বিছানায় গিয়ে ভোগ করছেন, সংসারে ভোগ করছেন, সব জায়গায় আপনি ভোগ করে যাচ্ছেন, আর বলছেন –আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। কি-রকম মিথ্যাচার এটা কল্পনা করতে পারেন? আমি একবার একটা দোষ করেছিলাম। সুহিতানন্দজী মহারাজ জানতে পেরে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমাকে বলছেন, 'গেরুয়া পরে তুমি মিথ্যাচার করছ'? ঠিক এই ভাষা। যেমনি আপনি বলছেন, আমি সেই আত্মা, অথচ আপনি সব কিছুতে লিপ্ত, লিপ্ত থেকেও আপনার বাসনা মিটছে না –সবটাই মিথ্যাচার। ঠাকুর নিষেধ করছেন, এগুলো করো না। এই মিথ্যাচারে পরমার্থের হানি হয়ে যায়। এগুলোতে কি হয়, একটু যে ভক্তিভাব নিয়ে এগোবে, একটু যে অবতারতত্ত্বকে ধরে এগোবে, অবতারকে ধরে এগোবে, সবটাই তছনছ হয়ে যায়। অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, এরা নিজেকেও ঠকায় পরকেও ঠকায়।

বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পূণ্য –এ-সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না; তবে দেহাভিমানী লোকেদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারেন। কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মতো বলত, আমি 'খ' –অর্থাৎ আকাশবৎ। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, **তা সে পরমভক্ত, তার মুখে ওকথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়**।

কৃষ্ণকিশোর একজন পরমভক্ত, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে আছেন, তাঁর মুখে 'আমি আকাশবৎ' মানায়। কিন্তু সকলের মুখে, আমি সেই আত্মা, আমি আকাশবৎ, এ-সব কথা সাজে না, একেবারেই ঠিক না। এতে নিজের সর্বনাশ হয়। অষ্টাবক্রসংহিতা এগুলো প্রকরণ গ্রন্থ, যাঁরা উচ্চমানের সাধক তাঁরা পড়লেন, তাঁরা বলছেন, ঠিক আছে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি শোনার চেষ্টা করে বা শুনিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে *ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্ট*; দু-দিক থেকেই শেষ। এ-সব কথা আমি একবার দুবার কোন ক্লাশে বা লেকচারে বলেছিলাম, তাতেই অনেকেরই অশান্তি লেগে গিয়েছিল। কারণ এর মধ্যে একটা স্ট্যাটাস সিম্বল জড়িয়ে আছে কিনা, আমি অমুকের মুখ থেকে অষ্টাবক্রসংহিতার ব্যাখ্যা শুনেছি। এই যে কানপুরের ডাক্তারবাবুর মায়ের গল্প বললাম। এই রকম দিল্লি, মুম্বাইতে ধনী পরিবারের অনেক মহিলা আছে, যারা বলে, ম্যায়নে তো রেইকি ভি কি, ম্যায়নে তো আর্ট অফ লিভিং ভি কি, আর যে পাথর সেই পাথর। তার থেকে বাপু, জীবনে যদি একটু কিছু ভাব আনাতে পার, একটু যদি ভক্তিভাব আনাতে পার, যেটা তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহলে বরঞ্চ তোমার জীবন ধন্য হবে। এরপর ঠাকুর একটা খুব জরুরী কথা বলছেন।

কিন্তু 'আমি মুক্ত' এ-অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত' এ-কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' এ-কথা বলতে বলতে সে বদ্ধই হয়ে যায়। যে কেবল বলে 'আমি পাপী 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বলতে হয়, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি।

যাঁরা নিয়মিত কথামৃত পড়েন, তাঁদের কাছে এই কথাগুলো খুব পরিচিত। কথামৃত রোজ নিয়মিত এক পাতা কি দু পাতা পড়তে হয়; হয় সকালে স্নান করে, নয়তো রাত্রে শোয়ার আগে। রাত্রে শোওয়ার আগে পড়লে কি হয়, মন একটা শুভ চিন্তা নিয়ে নিদ্রায় চলে যায়, স্বপ্ন যদি আসে শুভ স্বপ্নই আসবে। ঠাকুর এখানে বলছেন, আপনি নিজেকে যেমন ভাববেন, আপনি তেমনটি হয়ে যাবেন। যদি

মনে করেন আমি পাপী, আপনি সত্যিই পাপী হয়ে যাবেন। নিজেকে বদ্ধ মনে করলে বদ্ধ হয়ে যাবেন। ঠিক তেমনি নিজেকে যদি মুক্ত মনে করেন, মুক্ত হয়ে যাবেন।

জ্ঞানের যে অবস্থান, মাত্র দুটি অবস্থান হয়। যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, সমাধিবান পুরুষ, মুক্ত পুরুষ তাঁরা স্বরূপে অবস্থান করেন, স্বরূপ মানে শুদ্ধ আত্মা। শুদ্ধ আত্মাকে স্বরূপ কেন বলছেন, এগুলো বলে আর কত বোঝান যাবে। যাঁরা অনেকদিন আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনছেন, বিশেষ করে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন পড়ে হয়ত তাঁদের কিছুটা ধারণা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারেন না। জ্ঞানের আর একটি অবস্থা বৃত্তির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। আমাদের কাছে আমি সত্য, জগৎ সত্য; যাদের ভালবাসি তারা সত্য। যোগশাস্ত্রে এটাকেই বলে বৃত্তির সঙ্গে এক হওয়া। মনে করুন, আপনার সামনে চারটি টিভি স্ক্রীন রাখা আছে, চারটে স্ক্রীনেই খুব মজাদার সব প্রোগ্রাম চলছে। আপনি যেগুলো ভালবাসেন, সিনেমা, খেলাধূলা, নাচ, গান; ওর মধ্যে একটি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আপনি দেখে যাচ্ছেন, আর ওটাতে এমন মজার মজার সব কাণ্ড হচ্ছে দেখে আপনি ওতে মজে গেলেন। তারপর দেখছেন আর-একটা স্ক্রীনে একটা খুব মজার নাচগান হচ্ছে। যারা সারাদিন বসে টিভি দেখে, ওর মধ্যেই তারা মজে আছে। কিন্তু যাঁদের বোধ আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে টিভি দেখা বন্ধ করে নিজের মত থাকার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁদের কাজকর্ম করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। চোখের সামনে যে মজা হচ্ছে, সেটাতে যে ডুবে যাচ্ছেন, মজে যাচ্ছেন এটাকে বলে বৃত্তির সঙ্গে এক হওয়া।

আমাদের মনের যে চাঞ্চল্য, এটাই বৃত্তি। আমরা কি? আমরা হলাম আমাদের বৃত্তি। কিন্তু টিভি যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমরা আমাদের মত। আপনি বলবেন, তখন তো আমরা সংসার নিয়ে মজে থাকি। এটাকে উদাহরণের জন্য বলা হল, উদাহরণকে বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করতে নেই।

এই যে জগৎ, আমাদের সামনে যে জগৎ, আত্মা এর মধ্যে মজে থাকে। মজে থাকতে থাকতে চোখটা যখন বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন সে মনের জগতে মজে থাকে। বৃত্তিকে নিয়ে যোগসূত্রে খুব সুন্দর বলছেন –*প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ*। প্রমাণ হল চোখের সামনে আমরা যেটি দেখছি। বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি সবটাই মনের অবস্থা। তার মানে আপনার মন যা, আপনি তাই। আপনার মনে যে বৃত্তি উঠছে, আপনি তাই। ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন একটা বৃত্তিশূন্য অবস্থা, বৃত্তির অভাব, এখন আপনি সেটাই। ফলে কি হয়, আমার সামনে মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোন দেখছি এটা একটা বৃত্তি, হঠাৎ চোখের সামনে কলমটা নিয়ে এলাম, তখন আর-একটা বৃত্তি এসে গেল। চোখ যেমন যেমন নাড়াচ্ছি তেমন তেমন বৃত্তি পাল্টাচ্ছে। বৃত্তি পাল্টাচ্ছে পাল্টাক, এই সমস্তের মধ্যেও কিন্তু মনের একটা স্বাভাবিক গঠন আছে।

কোন নদীর ধারে বসে নদীর জলের দিকে যদি তাকিয়ে থাকেন, দেখবেন জলের ধারা একদিকে সমান ভাবে বয়ে চলে যাচ্ছে। ওই জলের মধ্যে ছোট ছোট ঘূর্ণির মত তৈরী হয়, ফলে জলটাও বিভিন্ন দিকে ঘুরতে থাকে। একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে জল যতই ঘুরতে থাকুক, আসলে পুরো জলের ধারাটা তো একদিকে বয়ে চলে যাচ্ছে। যোগশাস্ত্রে বলছেন প্রত্যেকটি মানুষের গঠন আলাদা। বৃত্তিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, মনের যে গঠণ সেটাকেও পাল্টাতে হয়। এখানে ঠাকুর মনের গঠণটাকে পাল্টাতে বলছেন। বৃত্তিজ্ঞান যেটা আমাদের আসে, যেটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে নিচ্ছি, সেখান থেকে আবার কিছু জিনিস থেকে পালাতে চাইছি; এই যে আমাদের জীবন পাগলা কুকুরের মত এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে দৌড়াচ্ছে, এটাকে পাল্টানো প্রত্যেকেরই দরকার। পাল্টে কি করা? মনের যে গঠণ সেটাকেই পাল্টে দেওয়া।

ভিতরে যাদের ভক্তির ভাব আছে, তাদের একজন হয়ত মনে করতে পারে, আমি ঠাকুরের সন্তান; এটা একটা ধারণা। এবার ওই ধারণা থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে আসবে। প্রথমে বেরোবে, আমি তো রাজার ব্যাটা, আমার কি আবার পাপ হয়! দোষ করে ফেলেছি, ঠিক আছে, বেশ

করেছি। কিছু দিন আগে আমার কাছে একটা বাচ্চা এলো, দেখে মনে হল মনের মধ্যে সে একটা বেদনা চেপে রেখেছে। আমি বললাম, 'তোমার ভিতরে যে বিষ জমছে, এটাকে কক্ষণ ভিতরে রেখো না, এত বড় জগৎ রয়েছে, ওটাকে ছড়িয়ে দাও। সেটা করার জন্য পাঁচজন বন্ধু রাখতে হয়। সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে নিজের মাথাটা পরিষ্কার রাখতে হয়'। আমাকে বাঁচতে হবে; কারণ বিষ যদি ভিতরে জমে যায়, ওই বিষের জ্বালায় আমি নিজেই শেষ হয়ে যাব। হৃদয়ের ভিতরে কোন জ্বালা পুষে রাখতে নেই, হয় শুনিয়ে দিতে হয়, নয় কাগজে লিখে, নয় মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে শুনিয়ে দিতে হয়, ঠাকুর এই হয়েছে, সেই হয়েছে বলে। মাথার মধ্যে বোঝা জমতে দিতে নেই।

ঠিক তেমনি যখন এই বোধ হবে, আমি ঠাকুরের ভক্ত, আমি ঠাকুরের সন্তান, আমার আবার কিসের পাপ। আসলে পাপ বলে কিছু হয় না; এগুলো হল খ্রীশ্চানদের মস্তিষ্ক প্রসুত। ওদের কাছে হল, ভগবান আদেশ দিয়েছেন, সেই আদেশের বাইরে যাওয়া পাপ। আমাদের এখানে হল, আমি একটা পথ নিয়েছি; সেই পথ থেকে রাস্তা পাল্টে একটু এদিক-সেদিক ঘুরে নিলাম। আপনি গাড়ি নিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য দিল্লি যাওয়া। হঠাৎ জানতে পারলেন যে গাড়ি এখন গয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে সঙ্গে মনের পড়ে গেল যে গয়া শহর খুব নামকরা, হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান, বৌদ্ধদের সারনাথ আছে যেখানে ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আপনার মনে হল, একবার গয়া শহরটা, সাথে সারনাথ ঘুরে দেখে নিলে হয়। আপনি ওখানে ঘুরতে যতটা সময় লাগাবেন ততটা সময় আপনার দিল্লি পৌঁছাতে দেরী হবে। তাতে দোষের কিছু নেই, একটু না হয় ঘুরে নিলেন, কোন ক্ষতি নেই। এত ভাবাভাবির কি আছে। ভাবাভাবিটা ছেলেমানুষী। বাচ্চারা কিছু করলে ভয় পেয়ে যায়। বাচ্চাদের নৈতিকতার বোধ খুব প্রবল। ওদের কাছে সত্য বলতে সত্য, মিথ্যা বলতে মিথ্যা। আমরা যে মরালিটি মরালিটি বলি, যারা আদিবাসী তারাই এগুলো পালন করে আর বাচ্চারা পালন করে। মানুষ এমনিতে কখন মরাল হয় না।

ঠাকুর এখানে বলছেন, উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে আধার করে জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। তৃতীয় জিনিস যেটা হয়, সেটা আপনাদের জানা খুব দরকার। আমাদের ভক্তদের কথা যখনই শুনি, তখন দেখি মুক্তির নিচে কেউ কথাই বলেন না। কদাচিৎ কেউ কখন ভক্তির কথা বলেন। আসলে টিয়া পাখির মত দুটো তিনটে কথা শিখে নিয়েছেন, ওই কথাই সব জায়গায় বলে যাচ্ছেন। একবারও কেউ ভাবেন না, আমার যদি মুক্তি হয়ে যায়, আমার ভিতরে কি পরিবর্তন হবে। আপনারা কল্পনা করুন, ঠাকুর এসে আপনাদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। মুক্তি দিয়ে দিলেন, কিন্তু মৃত্যু দিলেন না। অন্যান্য ধর্মে বা অন্যান্য মতে কি হয়, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া, সেইজন্য এখানে থেকে আপনি স্বর্গে যেতে পারবেন না। ইদানিং কালে এটা খুব পপুলার হয়েছে, স্বর্গ এখানে নরক এখানে।

স্বর্গলাভ মৃত্যুর পরে হয়, নরকবাসও মৃত্যুর পরে হয়। কিন্তু মুক্তি একমাত্র এখানে এই দেহে থাকা অবস্থায় হয়। কাশীতে আপনি যদি মুক্তি পেতে চান, আপনাকে মরতে হবে। কিন্তু যদি জ্ঞানলাভ হয় তাহলে কলকাতায় বাড়িতে বসেই মুক্তি হবে, মুক্তির জন্য কাশী যাওয়ার কি দরকার! আর মনে করুন, আপনি খুব প্রার্থনা করেছেন, প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুর আপনাকে বললেন, বাপু, এই নাও তোমাকে মুক্তি দিয়ে দিলাম, তুমি মুক্ত। মুক্ত হয়ে যাওয়াটা কি? লোকেদের বিচিত্র সব ধারণা। যারা মুক্তির কথা বলে, তাদের বেশির ভাগ লোক বলতে পারবে না, মুক্তি জিনিসটা কি, মুক্ত হয়ে গেলে কি হয়। মুক্তি মানে আত্মজ্ঞান পেয়ে যাওয়া, মুক্তি মানে জেনে যাওয়া যে আপনি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তার মানে আপনি জেনে গেলেন আপনি দেহ নন, মন নন। দেহ, মন কি? কলকাতায় রাস্তায় ট্রাম চলে, আপনি ট্রামে বসে কোথাও যাচ্ছেন। ট্রাম যেমন একটা বাহন, এই দেহ মন এটাও বাহন।

আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে আপনি এটাও দেখবেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এখানে আপন বলে কেউ নেই, পর বলে কেউ নেই, শত্রু বলে কেউ নেই, মিত্র বলে কেউ নেই। তাহলে

আত্মজ্ঞান লাভের পর আপনার আচরণ কেমন হবে? আপনারা যাঁরা সংসারের জন্য কেনাকাটা করতে বাজারে যান, দেখবেন তাঁরা বাজারে গিয়ে আনাজ কেনার সময় প্রচুর বিচার করবেন। কি কি আনাজপাতি কিনতে হবে আগে সেটা ঠিক করে নিলেন। তারপর কোন দোকানে ভাল সতেজ আনাজ পাওয়া যাবে সেটা ভেবে রাখলেন, আনাজ কেনার সময় ওজন দেখছেন, তারপর দেখছেন ভাল আনাজটা দিয়েছে কিনা, শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আপনার বিচার চলছে। কিন্তু আপনি সাবান কেনার সময় দোকানে গিয়ে বললেন, ভাই আমাকে দুশো গ্রামের সার্ফের প্যাকেট দিন। দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুটো দুশো গ্রামের সার্ফের প্যাকেট বার করে দিলেন। এখানে আপনার বিচার করার সুযোগ নেই, আপনি কোন বিচার না করে সাবান নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। এবার যদি আপনি সার্ফের ফ্যাক্টরিতে যান, সেখানে সামনে সেলসম্যান বসে আছে; তাকে বলে দিলেন পাঁচশ গ্রামের এক হাজার প্যাকেটের একটা পেটি দিতে, তখন আর কোন বাছাবাছি নেই, এক হাজার প্যাকেটের পেটি নিয়ে চলে আসছেন। আত্মজ্ঞান হওয়া মানে, আপনি জেনে গেলেন, যে জগৎকে এত বৈচিত্র বলে মনে হচ্ছিল, আসলে জগৎটা একটা সার্ফের কারখানা। যত মানুষ সব কটা হল এক-একটা সার্ফের প্যাকেট। কোনটা দুশো গ্রামের প্যাকেট, কোনটা পাঁচশ গ্রামের প্যাকেট, কোনটা এক কেজির প্যাকেট, এর বেশি কিছু না। সার্ফের প্যাকেট নাও, বাড়ি যাও। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে পছন্দ আর অপছন্দের কিছু থাকবে না।

তাহলে আপনি মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর এই একই জিনিস করবেন। মুক্তির পর বলবেন, ঠাকুরই সব কিছু হয়েছেন। তখন জগৎকে একটা সার্ফের গোডাউন ছাড়া কিছু মনে হবে না, প্যাকেট নাও বাড়ি যাও। এই জিনিসটাই মুক্তি না হলেও যে কেউ করতে পারেন, ভক্তি অর্জন না হলেও এটা করা যায়। আসলে এটাই করতে হয়, সাধনা মানেই এটা। সিদ্ধিলাভ হলে যেটা হবে, সিদ্ধিলাভের আগে ওটাই করতে হবে। যে জিনিসটা ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোন দিন হল না, সমস্ত নারীজাতিকে যে আমরা মা রূপে দেখব দূরে থাক, নিজের স্ত্রীকেও দেখে না; কিন্তু ঠাকুর ওটাও করে দেখালেন। এই যে সমগ্র নারী জাতি, নারী জাতির যে সমষ্টি আমাদের সামনে বিদ্যমান, এটাই মা। নিজের স্ত্রীকেও ঠাকুর সেই দৃষ্টিতে মাতৃরূপে দেখে গেলেন। কারণ আত্মজ্ঞান লাভের পর জ্ঞানী তাই দেখেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত নারী, সব মায়েরই এক-একটি রূপ। তাহলে নিজের স্ত্রীকে স্ত্রী বলে কি করে ভাববেন? কিন্তু হঠাৎ কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার স্ত্রীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে শুরু করেন; স্ত্রী আপনাকে টানতে টানতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাবেন। প্রথমেই হুট্ করে নেমে যেতে নেই। কিন্তু কোথাও একটা শুরু করতে হবে।

এই শুরু করাটা বিভিন্ন পথ অনুযায়ী হতে পারে। যদি আপনি জ্ঞানপথ ধরে এগোতে চান, তাহলে এই বলা যে, আমি মুক্ত। আর যদি আপনি ভক্তিপথ পছন্দ করেন, তাহলে এই বলা যে, আমি ভক্ত। কিন্তু তার যে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে আসবে, সেটাকে দৈনন্দিন জীবনে পুরো আক্ষরিক ভাবে পালন করা চাই। যখন পুরোপুরি আপনি সাধনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, তখন দেখবেন, জ্ঞানী যা করছেন, আপনিও তাই করছেন; একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত যা করছেন, আপনিও তাই করছেন। শুধু আসল দর্শনে তফাৎ থাকবে, তার বাইরে আর কোথাও কোন তফাৎ থাকবে না। তাই উচ্চমানের একজন জ্ঞানপথের সাধক আর একজন বাস্তব জ্ঞানীর মধ্যে তফাৎ করা যায় না, কোন ভাবেই সম্ভব না। তফাৎ থাকে শুধু আসল জ্ঞানের প্রত্যক্ষ করাতে। আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশে রকেট পাঠালেন, আর বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর কোন গবেষণা কেন্দ্রে বসে বসে গবেষণা করে সব কিছু তথ্য বার করলেন –স্পেস ট্রাভেল কি কি ভাবে হয়, তাতে কি কি সমস্যা হয়; ঠিক সেই ভাবে মহাকাশযান তৈরী করলেন। **১৯৬৯** সালে নিল আর্মস্ট্রংকে সেই মহাকাশযানে চাঁদে পাঠানো হল। বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীতে বসে মহাকাশের সব খবর জানেন, কিন্তু নাম হয়ে গেল নিল আর্মস্ট্রংএর, কারণ সে প্রত্যক্ষ করল। বৈজ্ঞানিকরা এখানে বসে সমস্ত কিছু জানেন, সেইজন্য তাঁরা বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ মনের অধিকারী।

আধ্যাত্মিক জীবনেও তাই হয়, আপনারা হলেন আধ্যাত্মিক জীবনের বৈজ্ঞানিক, আপনারা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রত্যেকটা ইঙ্গিতকে জানেন। তাঁদের মধ্যে কেউ হবেন নিল আর্মস্ট্রং, যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। বক্তব্য আসলে এটাই, ঠাকুর যখন বলছেন যে, 'আমি মুক্ত' এই অভিমান খুব ভাল। 'আমি মুক্ত', কিন্তু কখন কখন ভুল করে কিছু করে ফেলি। একবার দুবার কেউ বললে, বলি, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু বেশি বললে বলে দিই, বেশ করেছি, ওই খিচখিচানি থেকে বাঁচার জন্য বলতে হয়। কিন্তু তাই বলে যে আপনি কেচ্ছা করে যাবেন, নোংরামি করে যাবেন, তা একেবারেই না। আপনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই কথা বলে ঠাকুর হৃদয়রামের কথা বলতে শুরু করলেন।

(মাস্টারের প্রতি) –দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। হৃদে চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া না দয়া?

ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি এক আদর্শ ভক্ত। যে আদর্শ ভক্ত তারও দুঃখ হয়, তারও কষ্ট হয়, সংসারকে নিয়ে তারও চোখে জল আসে। আবার সে ঈশ্বরকে নিয়েও থাকে। হৃদয়রাম এক সময় ঠাকুরের প্রচুর সেবা করেছিল, তার কিছু হলে ঠাকুরের মন স্বাভাবিক ভাবেই খারাপ হবে। আবার, তার উপর থেকে মন উঠেও গিয়েছিল। আমাদেরও অনেক সময় হয়, কাউকে জীবনে একটা সময় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, একটা সময় এমন কিছু হল, এমন ধাক্কা মারল যে, জীবন থেকে আলাদা হয়ে গেল। এরপর দুটি ভাব চলতে থাকবে, একটা পুরনো ভালাবাসা, আর-একটা শেষের দিকে যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। সব মানুষের জীবনেই এই ধরণের জিনিস হয়, এটাই সংসারের ধর্ম। সেই সময় বলে দেওয়া সহজ যে, একটাতে থাক, কিন্তু তা হয় না। একটা জিনিস খুব সুন্দর দেখা যায়, আগেকার দিনে এটা বেশি দেখা যেত; অশান্তি লাগল, বাবা রেগে গেল, রেগে গিয়ে সন্তানকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। পুরুষ মানুষ একটু নিষ্ঠুর হয়, বাবা রেগে বার করে দিল। মায়েরা কিন্তু সহ্য করতে পারে না। হয়ত মাও পুরো জিনিসটাকে পছন্দ করল না, চোখের জলও ফেলে।

মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করে ঠাকুর নিজেই মায়া আর দয়ার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন – **মায়া কাকে বলে জানো? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি –এইসব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা**। গীতাতে এটাকে বলছেন, *অসক্তিরনভিষঙ্গঃ;* শুধু দেহের প্রতি যে আসক্তি এটাকে বলছেন *অসক্তি*, আর আমাদের আশেপাশে যারা আছে, আমিত্বটা এগিয়ে গিয়ে যাদের জড়িয়ে ধরে রেখেছে, এটাকে বলছেন *অনভিষঙ্গঃ*, এটাই মায়া; মায়া মানে 'আমি'। আপনার 'আমি' যত দূর যেতে পারে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ওই 'আমি'র মধ্যে থাকছেন আপনি।

দয়া মানে –সর্বভূতে ভালবাসা। আমার এক বন্ধু কোন পরিচিতদের সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এগিয়ে গিয়ে যাদের সাহায্য করতে গেলেন, দেখছেন তারাই সরে গেছে, কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, কারণ অপরের কাছে ছোট হয়ে যেতে হল। তিনি রেগেমেগে আমাকে বলছেন, 'পা এগিয়ে আর কারুর আমি ভাল করতে যাব না'। আমি সবটাই শুনলাম, কারণ যখনই কেউ দুঃখের কথা বলে, তার কথা শুনতে হয়। ওর ভিতরে যে আগুন জ্বলছে, ওই তাপটা বেরিয়ে গেলে তারপর তাকে যা বলার বলতে হয়। আমি সব শোনার পর বললাম, 'আপনি চেষ্টা করলেও অপরের ভাল করা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না; কারণ সবাইকে ভালবাসা এটা আপনার স্বভাবে আছে। আগামীকালই যদি দেখেন কারুর সাহায্যের দরকার, আপনি পা এগিয়ে সাহায্য করতে যাবেন'।

সাধুবাবার খুব নামকরা গল্প, একটা বিছে জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। সাধুবাবা হাত দিয়ে তুলছেন আর বিছেটাও দংশন করেছে। হাত থেকে বিছেটা আবার জলে পড়ে গেছে। তিনিও আবার তুলে আনলেন, বিছেটা আবারও দংশন করল। লোকেরা নদীর পার থেকে চিৎকার করে বলছে, 'আরে কি করছেন সাধুবাবা, বিছেটা তো আপনাকে দংশন করেই যাচ্ছে, ওকে ছেড়ে দিন'। সাধুবাবা তখন

বলছেন, 'কি বলছেন, এই ক্ষুদ্র জীব তার স্বভাব পাল্টাতে পারছে না, আমি নিজের স্বভাব কি করে পাল্টাবো'। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁদের স্বভাব হল পা এগিয়ে লোকেদের সেবা করা, সাহায্য করা। স্বভাববশতঃ করতে গিয়ে আপনারা হয়ত অনেক সময় আঘাত পেয়েছেন, চোট খেয়েছেন। মানুষের স্বভাব হল, যেখানে চোট খাবে সেখান থেকে সে সরে আসবে। তখন মনে হয়, কি দরকার আমার সাহায্য করার, আমিও বাকিদের মত স্বার্থপর হব। বাচ্চা ছেলে যেমন রেগে গিয়ে মাকে বলে, তুমি আমার মা নও। মনটা একটু শান্ত হয়ে গেলে আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যায়, মার কাছে দৌড়ে গিয়ে আবদার করতে শুরু করবে। এগুলো সত্ত্বগুণের লক্ষণ –সবাইকে ভালবাসা। যিনি পরিচিত তাঁরই সাহায্য করবেন, অপরিচিতদের নিয়ে তো লাফালাফি হয় না, একটা কোথাও লিঙ্ক থাকতে হয়, কিন্তু এটা সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

আমার এটা কি হল, মায়া না দয়া? হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল –অনেক সেবা করেছিল –হাতে করে গু পরিষ্কার করত। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছিলাম। কিন্তু আমার অনেক করেছিল –এখন সে কিছু (টাকা) পেলে মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বলতে যাব! কে বলে বেড়ায়?

প্রথম কথা হল, ঠাকুর যে হৃদয়কে নিয়ে ভাবছেন, এটা দয়া না মায়া? ঠাকুরের কাছে এটা দয়াও না, মায়াও না। আমাদের মত লোকেদের জন্য দয়া, মায়া হয়। ঠাকুর বা যে কোন মুক্ত পুরুষের দয়াও থাকে না, মায়াও থাকে না। তবে ওটা বিশেষ, হৃদয় খুব সেবা করেছিল, আচ্ছা ঠিক আছে, ওর জন্য এতটুকু করে দিলাম। অনুগ্রহ করেন কোন একটা বিশেষ কারণে, যেমন একজন বিশেষ ভক্ত, অনুগ্রহ করলেন। যেমন নরেন্দ্রনাথ, বাড়িতে খাওয়া নেই, পরা নেই; ঠাকুর তাঁকে বললেন, যা মার কাছে গিয়ে চা, সব হয়ে যাবে। সবাইকে তো ঠাকুর মার কাছে চাইতে পাঠাচ্ছেন না। এখন আপনি বলবেন, এটা বৈষম্য দোষ। হ্যাঁ, বৈষম্য দোষ, থাকুক, তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ, যিনি অবতার, মহাপুরুষ যিনি, তাঁরও আপন বলে একটা গোষ্ঠি থাকে, যাঁরা হলেন তাঁর অন্তরঙ্গ। এই যে অন্তরঙ্গ, যার জন্য ঠাকুর নরেনকে বলছেন, ওরে, তোর জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি। কেন বলছেন? নরেন তাঁর অন্তরঙ্গ। এই যে গীতায় বলছেন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী আমার আত্মা, জ্ঞানী আর আমি এক। যাঁর সঙ্গে একাত্মবোধ তাঁর জন্য করবেন।

তাহলে বাকীদের? তাঁদের সাথেও একাত্ম বোধ আছে, তাঁদের জন্যও করেন। কিন্তু একজন লোক সাক্ষাৎ সেবা করেছে, তার জন্য একটা বিশেষ ভালবাসা তো থাকবেই। অনেক সময় লোকেরা এসে আমাদের বলে, আপনি সন্ন্যাসী কোন ভেদ দৃষ্টি রাখবেন না। ঠিকই, যাঁরা চব্বিশ ঘন্টা আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করছে, চব্বিশ ঘণ্টা খেটে বেলুড় মঠকে যারা সামলে রাখছে, আর জীবনে একবার উড়ে এসে এক ঘণ্টার জন্য একজন ভক্ত এলেন, তাকে ওদের সাথে সমান দেখব? আসলে যারা এই ধরণের কথা বলে, তাদের কোন বোধ-বুদ্ধি নেই। আশ্রমে যিনি কাজ করছেন, তিনি তো মহাপুরুষ। সে নিজের ইচ্ছাতেই হোক, অসহায় হয়েই হোক, জীবিকা অর্জনের জন্যই হোক, যেভাবেই হোক চাকরি করার জন্য ঢুকেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষই হোক অপ্রত্যক্ষই হোক, সে ঠাকুরেরই সেবা করছে, আমিও ঠাকুরের সেবায় আছি, সে বিশেষ। ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বেলুড় মঠে তাঁদের একটা বিশেষ স্থান; কিন্তু আমার যিনি স্টাফ সে তো আমার আত্মা। কোন সাধু বা সন্ন্যাসী কোন দিন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর জন্য বেলুড় মঠের কোন স্টাফকে ছোট করবেন না। এগুলো সমাজে হয়, এখানে না।

ঠাকুর হৃদয়রামের জন্য যেটা করছেন, এটাই হচ্ছে সন্ত স্বভাব, এর মধ্যে কোথাও বৈষম্য নেই, দয়াও নেই, মায়াও নেই। ঠাকুর বোঝাবার জন্য বলছেন। আর ঠাকুর ছিলেন বালক স্বভাবের, বুঝতে পারছেন না আমি কি এটা ঠিক করলাম, নাকি ভুল করলাম। কেউ যদি বলে দিলেন, মহাশয়, ঠিকই করছেন। তুমি বলছ, ঠিক করছি? তাহলে ঠিক করেছি। আমি অনেক সিনিয়র মহারাজদের দেখেছি,

কোন একটা জিনিসকে নিয়ে হয়ত মাথা গুলিয়ে গেছে, তখন বলতে শুরু করেন, এটা কি ঠিক করছি, নাকি ভুল করছি। যিনি আপনাকে এত দেখাশোনা করে রেখেছিলেন, যাঁর প্রতি আপনি এত কৃতজ্ঞ, যখন তাঁর কোন সাহায্যের দরকার, আপনি অবশ্যই সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন। বলরামবাবুর পরিবারের শরীর খারাপ হয়েছে, শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখতে যাবেন। গাড়ি নিয়ে কিছু সমস্যা হল, মায়ের যাওয়াটা অনিশ্চিত। শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর বলছেন, আমার বলরামের পরিবার ভেঙে যাচ্ছে আর তুমি গাড়ির জন্য বসে আছ? আপনজন, এটা দয়া, মায়া কিছুই না। ভক্ত একটা আলাদা জাত, ভক্ত মানে যিনি এই মহাত্মার সঙ্গে জুড়ে আছেন, সাধুর সঙ্গে জুড়ে আছেন। যদি বলেন, ভক্তরা আপনার বিশেষ কেন? অবশ্যই বিশেষ, কারণ আমার সুখে-দুঃখে এনারাই আমার সঙ্গে জুড়ে আছে, আমি এখন সংসারে আছি। সমান ভাব যদি নিতে হয়, তাহলে চলুন আপনিও সমাধিতে নামুন, আমিও সমাধিতে নামি, তারপরে সমানতা আসবে। এরপর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ শুরু হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মৃণ্ময় আধারে চিণ্ময়ী দেবী –বিষ্ণুপুরে মৃণ্ময়ীদর্শন

বেলা দুটো-তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধর সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাস করিলেন, আপনি কেমন আছেন? ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হয়ে আছে"। হৃদয়রামকে নিয়ে ভাবছেন।

ঠাকুর অবতার, মায়ের সঙ্গে এক, এনাদের কথা ছেড়ে দিন, এমনকি সাধু সন্ন্যাসীরাও বড়লোক ভক্তদের কাছে নিজের জন্য বা অপরকে সাহায্যের জন্য কিছু সাহায্য চাইবেন। আমার মঠে জয়েনিং থেকে আজ পর্যন্ত আমি অনেক কাজের জায়গায় ছিলাম, দেওঘর বিদ্যাপীঠে অনেকদিন ছিলাম। অনেক নামকরা লোকেদের আমি জানতাম, এখনও জানি। মায়ের এমন কৃপা আমার উপর যে, কদাচিৎ কখন কোন সাধারণ জিনিসের জন্য বা অপর কাউকে সাহায্য করার জন্য আমার কোন বিশেষ পরিচিত কাউকে যদি বলে থাকি আমার দুটো টাকার দরকার, বেইজ্জত হওয়া ছাড়া আমার কিছু হয়নি। কোন না কোন ভাবে ছোট করে দেবে। ওই কারণে কোন দিন তীর্থে গেলাম না। তীর্থে যাওয়া মানেই কারুর কাছে আবার দুটো টাকা চাইতে হবে। অনেক আগে থেকেই আমার খুব ইচ্ছে ছিল মহাকালেশ্বর, ওঁঙ্কারেশ্বর দর্শন করা; কিন্তু নানা কারণে সম্ভব হয়নি। কপাল এমন, আইআইএম, ইন্দোর আমাকে লেকচার দেওয়ার জন্য ডাকল। টানা দশখানা লেকচার দিলাম। পরে ওরাই সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল, এই করেই তীর্থদর্শন হয়ে গেল। প্ল্যান করে তীর্থে যাওয়া, কারু কাছে টাকা চাইব, কি করব, আমার দ্বারা হবে না। আর সত্যিই ভক্তরা কত খেটে টাকা আয় করে, এমনিই তারা ঠাকুরের সেবার জন্য, সাধুসেবার জন্য কত টাকা দান করছেন। আর এমন এমন সেন্টারে ছিলাম, যেখানে এগুলোর প্রচলনও ছিল না। টাকার জন্য ঠাকুরকেও কথা শুনতে হয়েছে, স্বামীজীকেও কথা শুনতে হয়েছে। শ্রীশ্রীমা সেইজন্য কোন দিন কারুর কাছে কিছু চাইতেন না। ঠাকুর শুধু বলছেন, মনে একটা কষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেন কষ্ট হয়েছে বলছেন না, হৃদয়ের অসুখের কোন কথাই উত্থাপন করলেন না। এত কথা হচ্ছে, তার মধ্যেই বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবী-বিগ্রহের কথা উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সিংহবাহিনী আমি দেখতে গিছিলুম। চাষাধোপাপাড়ার একজন মল্লিকদের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখলুম। পোড়ো বাড়ি, তারা গরিব হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুরঝুর করে বালি-সুরকি পড়ছে। এইসব বলে বলে বলছেন, **অন্য মল্লিকদের বাড়ির যেমন দেখেছি, এ-বাড়ির সে শ্রী নাই। (মাস্টারের প্রতি) –আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি**।

(মাস্টার চুপ করিয়া আছেন)

কি জানো, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এ-সব মানতে হয়।

আমাদের এই যে জীবন, জীবনের কোন কিছু মেলে না। ঠাকুরই আবার অন্য জায়গায় বলবেন, মায়ার জগতে এটা থেকে সেটা হয়, সেটা থেকে এটা হয় বলা যায় না। কিন্তু আমরা যখন আমাদের চারপাশটা তাকিয়ে দেখি, তখন দেখি দুষ্ট লোকেরা কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে, দেখছি ভাল মানুষ কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তখন মন কেমন একটা আর্তনাদ করে ওঠে। এখানে জরুরী যে কথা সেটা আপনাদের বলি, মন যতই আর্তনাদ করুক, যতই ঝঞ্ঝা আসুক, বিপদ আসুক, আপনি আপনার পথ ধরে এগিয়ে চলে যান, এসবের দিকে তাকাবেন না। একটা বড় জাহাজ যখন সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে ভেসে যায়, তখন অনেক রকমের ঢেউ, অনেক রকমের ঝঞ্ঝা বিপদ আসতে থাকে, জাহাজ নিজের মত চলে যাচ্ছে। জীবনে অভাব আসবে, দুঃখ আসবে, দারিদ্রতা আসবে, এসবের দিকে তাকাতে নেই। যদি তাকাতে হয় তাহলে মানতে হবে, এগুলো আমার প্রারব্ধ, তবে গিয়ে ওই কষ্টের মধ্যেও একটা শান্তি পাবেন।

ঈশ্বরের উপর যদি এগুলো ফেলতে যান, তাঁর ইচ্ছাতে সব হচ্ছে, তখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসটা নড়ে যাবে এই ভেবে যে, ঈশ্বর কেন আমায় এত কষ্ট দিচ্ছেন। ঈশ্বর কেন আপনাকে কষ্ট দিতে যাবেন, এমন কি আছে যে ঈশ্বর আপনাকে দুঃখ দেবেন, কষ্টে রাখবেন? হ্যাঁ, তিনি বিধাতা, তিনি আছেন বলেই সব কিছু হয়। তিনিও যখন করেন ম্যাজিক্যালি কিছু করেন না, তারও একটা মেথডলজি থাকে। এটাকেই আমরা বলি সংস্কার, প্রারব্ধ। কিভাবে? আপনি যেমনটি করেছেন, সেই অনুসারে সব আসবে। সাধারণ কর্মের ফল এই জন্মেই পাবেন। আবার যেমন কিছু বৃক্ষ আছে বীজ থেকে বৃক্ষ হতে অনেক সময় লাগে, ঠিক তেমনি কিছু কর্ম আছে যার ফল অনেক পরে আসবে। মনে রাখবেন, এখানে কর্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য না; বেদান্ত তো এগুলোকে কোন দাম দেয় না।

আমি একজন সন্ন্যাসী, আমার এক বন্ধু তিনি সন্ন্যাসী না, কিন্তু বিরাট বড়লোক। হঠাৎ একদিন আমার মনে হল, আরে, তাই তো আমার সন্ন্যাসী হয়ে কি লাভ হল; আমার বন্ধু এত বড়লোক, জগতের সব সুখ সে ভোগ করছে। আমার তো কাশী যাওয়ার জন্য টাকাও জোটে না। তাহলে আমি কি করব? ঠাকুর যেমন বলছেন, সাবির দিন ফিরেছে। সাবি ছিল সতী বিধবা, এখন বড়লোকের ইত্যাদি হয়েছে। যে মেয়ে নষ্টা হয়ে গিয়ে শরীর বিক্রি করবে, সে তো টাকা পাবেই, সবাই জানে। কিন্তু যে সতী সে কি কখন এই পথে আসবে? কখনই না। অনেক আগে আমাকে একজন এই রকম কিছু একটা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, ‘এই যে অভাবের ঐশ্বর্য এটাতেই আমি গর্ববোধ করি। ভাই আমার কিছু নেই, এটাই আমার আনন্দ; আমার কিছু নেই, এটাই আমার ঐশ্বর্য’। আমার বন্ধু বলবে, আমার এই আছে, সেই আছে। আমার কলেজের এক বন্ধু এক সময় এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাবলিশারস্ ছিলেন, বিরাট বড়লোক, প্রায় হাজার কোটি টাকার মালিক। দিল্লি গেলে আমার সঙ্গে দেখা হয়, নিজেই দৌড়ে আসে দেখা করতে।

একবার কয়েকজন বন্ধু একসাথে হয়েছিলাম। সেখানে কি একটা কথা বলতে বলতে, একজন বন্ধু আমাকে দেখিয়ে বলছেন, ‘তোমরা দেখ আমরা এত কিছু করে যাচ্ছি কিন্তু কোন শান্তি নেই, আর আমাদের এই বন্ধুকে দেখ, এর কিছু নেই কিন্তু তাতেই এত আনন্দ, এত গর্ব’। যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, যিনি আত্মজ্ঞানের পথে, তাঁরা দুঃখ, দারিদ্র দেখতে যান না। কিন্তু কেউ যদি এসে যায়, যদি জানতে চায়, মহাশয়, আমার এত কষ্ট কেন? একটা কিছু তো উত্তর দিতে হবে, তাই বলে দিলেন, লঙ্কা খেলে ঝাল তো লাগবেই। ভাই তোমার এই কর্মই তোমার দুঃখ-কষ্টের কারণ, তোমার যে সুখ, আনন্দ আসে সেটাও ওই কর্মের কারণেই আসে। তুমি আগে আগে যে কর্ম করেছিলে, তার ফল আজকে পাচ্ছ, আজ যেটা করছ তার ফল আগামীকাল পাবে। চাষবাশ করেছিলে আজ তাই ফসল পাচ্ছ, আজকে চাষ করলে পরে ফসল পাবে। এইটুকু বলে মানুষকে শুভপথের দিকে ঠেলে দেওয়া। এগুলো মেনে নিলে অনেক

শান্তি। কর্মবাদে কিছু তো আছে, কিন্তু কর্ম ছাড়া কিছু নেই, কর্মই শেষ কথা মনে করে কর্মেতেই সব সময় থাকা; তাহলে তো পুরো বেদান্তই মিথ্যা হয়ে যাবে। কর্মবাদ যদি একশ ভাগ সত্য হত তাহলে বেদান্ত মিথ্যা হয়ে যেত। তাহলে মুক্তি কর্মের পরিণাম হয়ে যাবে, কারণ কর্মবাদে কিছু নেই। জপধ্যান একটা কর্ম, তাহলে জপধ্যান করলে কি ঈশ্বরলাভ হবে? কর্ম দিয়ে যদি জ্ঞানলাভ হয়, তাহলে তো সেই জ্ঞান কিছু দিন পরে নষ্ট হয়ে যাবে। পুরো বেদান্ত এই যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম একটা সীমা পর্যন্তই চলে, ব্যাখ্যা করার জন্য কর্মবাদ একটা মডেল। কিন্তু কর্মবাদ যদি শেষ কথা হয়, তাহলে পুরো দেশ বেদান্ত ফেলে দিয়ে মীমাংসক হয়ে যাবে। মীমাংসকদের মতে কর্মবাদই সব কিছু। যজ্ঞে আহুতি দিয়ে মন্ত্রের শক্তিতে দেবতাকেও বেঁধে নিয়ে আসা যায়। বেদান্ত বলে, একটা সীমা পর্যন্ত কর্মের দাম আছে, কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, এগুলো কর্মের উপর নির্ভর করে না। জ্ঞান সবারই ভিতর আছে, স্বামীজী বলছেন, তোমার ভিতর সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, কিন্তু আবৃত হয়ে আছে। কাজ হল আবরণকে সরানো, জ্ঞান সব সময়ই তোমার মধ্যে বিদ্যমান। শক্তি বাইরে থেকে আসে না।

আর পোড়ো বাড়িতে দেখলুম যে, সেখানেও সিংহ-বাহিনীর মুখের ভাব জ্বলজ্বল করছে। আবির্ভাব মানতে হয়।

মাস্টারমশাইএর দৌলতে আমরা অনেক কথা জানতে পারলাম। ঠাকুর এখানে একটা কথা বলছেন –আবির্ভাব মানতে হয়। আশ্বিন মাসে দূর্গাপূজা হয়, শাস্ত্র বলে দিয়েছেন, এই সময় দূর্গাপূজা করতে হয়। আবির্ভাব যদি মানতে হয় তাহলে এটাও মানতে হবে, যে এই সময় মা দূর্গার আবির্ভাব হয়। আর বেলুড় মঠে যেভাবে নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে দূর্গাপূজা হয়, এখানে যে মায়ের আবির্ভাব হয়, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এরপর ঠাকুর আর-একটা বর্ণনার কথা বলছেন।

আমি একবার বিষ্ণুপুর গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘষার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি তো জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। ঠাকুরের এই জিনিসটা কেমন অবাক লাগে। যেখানে সেখানে একটু কিছু দিব্য স্পন্দনের স্ফুলিঙ্গ পড়লেই হল, ইন্ধন যেন পুরো মজুত হয়ে আছে, দেশলাইয়ের একটা কাঠি লাগাতেই জ্বলে উঠল। মানুষ যেমন আহার করে, জলপান করে, নিদ্রা যায়; ভাবসমাধি যেন ঠাকুরের কাছে সেই রকম স্বাভাবিক। বিগ্রহ না দেখেই তিনি ভাবসমাধিতে চলে গেলেন। **আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ীদর্শন হল –কোমর পর্যন্ত**। যেখানে দেখা যায় ভক্তরা অনেকদিন ধরে যাচ্ছেন, বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে। আবির্ভাব না হলে শুধু নামের প্রভাবে এত লোক যাবে না।

ইতিমধ্যে আরও অনেক ভক্তরা এসেছেন। কাবুলে সেই সময় কোন যুদ্ধ চলছিল, তার কথা উঠল। কেউ বললেন, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। ঠাকুরকে জানানো হল যে ইয়াকুব খাঁ একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কি জানো, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। এরপর ঠাকুর কয়েকজন ভক্তের কথা বলছেন, বলতে চাইছেন দেহধারণ করলে সুখ-দুঃখ ভোগ হবে। যেমন বলছেন, **কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল –কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে**। এরপর শ্রীমন্তের কথা বলছেন। **শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল**।

একজন কাঠুরে পরমভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে, তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। আমাদের ঠাকুরেরও সব

কিছু হয়ে গেল, মা কালীর দর্শন হল, আত্মজ্ঞান হয়ে গেল; কিন্তু ওনার পূজারীর কাজটা আর গেল না, অর্থাৎ অভাবটা গেল না। লোকেদের একটা বোকা বোকা ধারণা, আমি ভক্ত, আমার কেন কষ্ট? আরে ভাই আপনার যিনি ইষ্ট তাঁর অবস্থা দেখুন, শ্রীরামচন্দ্রের দুরবস্থা দেখুন; তাঁর স্ত্রীকেই অপহরণ করে নিয়ে চলে গেল আর বিনা কারণে চোদ্দ বছর বনবাস। আমরা মজা করে বলি, আমাদের ঠাকুর কোমরের ধুতি সামলে রাখতে পারতেন না, তিনিই এখন জগৎ সামলাচ্ছেন, এর থেকে আর কি ভাল সামলাবেন। **কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচল না**। দেবকী সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পেলেন, তারপরেও কত বছর তাঁকে কারাগারে বন্দি থাকতে হল।

মাস্টার –শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই তো যত জঞ্জালের গোড়া। দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কি জানো, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে কদিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। দুটো পরস্পর জুড়ে আছে। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখের ভোগ হবে। প্রারব্ধটা মন দিয়ে চলে, প্রারব্ধ যতদিন আছে দেহধারণ ততদিন চলতে থাকবে, দুটো লিঙ্ক। সেইজন্য বেদান্ত বলে, জ্ঞান ছাড়া পথ নেই। আপনি যদি কর্ম কর্ম করতে থাকেন, কোন দিন মুক্তি হবে না। **একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচল না। (সকলের হাস্য) পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ**। ঈশ্বরদর্শন হওয়া মানে একটা জ্ঞান হয়ে যাওয়া। আপনি একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেই যে বিরাট বড়লোক হয়ে যাবেন, তা তো না। একজন বৈজ্ঞানিক রূপে সবাই আপনাকে জানবে, সম্মান করবে। তাই বলে যে আপনার শরীরে কোন ব্যাধি আসবে না, তা তো না। স্টিফেন হকিং কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, ছোটবেলা থেকে বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে কত বড় বড় কাজ করে গেলেন। আত্মজ্ঞানও তাই। বিজ্ঞান যেমন একটা জ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞানও এক ধরণের জ্ঞান, দুটোর ফল আলাদা। ঠাকুর আবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়। এটাই হল মূল। আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে তাহলে এটাকে ভাল করে বোঝার চেষ্টা করুন। ঈশ্বরকে ভক্তি কেন করব? জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্যের জন্য। লোকেদের যেমন টাকার ঐশ্বর্য হয়, ক্ষমতার ঐশ্বর্য হয়; আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যদি শরীর খারাপ হয়, তাঁর এমন ক্ষমতা যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা এসে তাঁর চিকিৎসা করবেন, ক্ষমতার ঐশ্বর্য। যার প্রচুর টাকা আছে, দেখবেন যখন মরার সময় হয় তখন তাকে সবচেয়ে দামী হাসপাতালে রেখে দশদিন, এক মাস ধরে চিকিৎসা করাবে। ডাক্তাররাও আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ওরে কামধেনু এসেছে, দুধ দুয়ে নে। অন্য দিকে বাড়ির লোকেরা সবাইকে বলবে, আমরা বাবাকে বেস্ট ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি। আগেকার দিনে কোথায় ছিল এই ব্যবস্থা! রাজারও যদি শরীর খারাপ হত, নিজেকে মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দিত। কিন্তু এখন লোকের টাকা হয়েছে, ওদিকে ডাক্তার, নার্সিংহোম এদেরও টাকার দরকার, এবার ইনি টাকার ঐশ্বর্য দেখাবেন, আর ওনারা টাকার ঐশ্বর্য অর্জন করবেন।

ঠিক তেমনি যিনি ভক্ত, তাঁর আছে জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য। যাঁর জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য আছে, ওই ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি জীবন চালান। ক্ষমতার ঐশ্বর্যে জীবন এক রকম চলে, টাকার ঐশ্বর্যে জীবন – আর-এক রকম চলে। আপনার প্রচুর সংযোগ আছে, প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আছে, সেই ঐশ্বর্যে জীবনটা আর-এক রকম চলে। আপনার যদি জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, তাতে আপনার জীবনটা অন্য রকম চলবে। কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ধর্ম করে কি লাভ? ধর্ম করে এই লাভ –জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন করা। জীবনে যেমন টাকা-পয়সা, মান, সম্মান, পদমর্যাদা, বন্ধু-বান্ধব এগুলো সবই ঐশ্বর্য, যখন দরকার পরে কাজে লাগে। কিন্তু আবার কিছু জায়গা আছে সেখানে কাজে লাগবে না। আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, আপনার ছেলে যদি মরে যায়, আপনার ক্ষমতা, টাকা-পয়সা কোন কাজে লাগবে না।

বড়লোকের একমাত্র ছেলে যদি মারা যায়, তার যতই টাকা থাকুক কোন কাজে লাগবে না। ঠিক তেমনি জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য কিছু জায়গায় কাজে লাগে, কিছু জায়গায় কাজে লাগে না।

কিন্তু জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য এমন; মীরাবাঈএর ভজনে বলছেন, দিন দিন বাড়ত সবই, দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। কিন্তু টাকা-পয়সার ঐশ্বর্য কমেও যেতে পারে। ক্ষমতা আপনার চলেও যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য কোন দিন যাবে না। একদিকে অভাবের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে ছটফটানি হবে, শোকের তাড়নায় হয়ত চোখে জল আসবে, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য ওই অভাব বা শোকের মধ্যেও আপনাকে স্থির রাখবে, কূটস্থ করে দেবে।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমি বলব, জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন করা। ঈশ্বরদর্শন, মুক্তি এগুলো আমাদের মুখের কথা, আমরা আদৌ বুঝি না ঈশ্বরদর্শন, মুক্তি বলতে কি বোঝায়, সব বড় বড় কথা। খুড়ি-জ্যেঠীর কোঁদল শুনে বাচ্চারা যেমন বলে, আমার ঈশ্বরের দিব্যি, এগুলো আমাদের কাছে শুধু মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন করা, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রতি এমন ভক্তি, যেখানে আমরা বলছিলাম, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমার আবার কিসের পাপ। আর জ্ঞান –আমি সেই আত্মা, আমি মুক্ত, আমার আবার কিসের বন্ধন। জীবনের উদ্দেশ্য এটাই, চব্বিশ ঘন্টা এটাই –জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন করা। কামী পুরুষ যেমন ভোগের বস্তু অর্জন করতে থাকে, আজকের দিনে যুব সমাজ যেভাবে টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে; ঠিক তেমনি আমার-আপনার জীবনের উদ্দেশ্য এটাই –জ্ঞান-ভক্তির ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা কিভাবে বাড়ানো যায়। জ্ঞান-ভক্তির মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হয়ে গেল তো, সব হয়ে গেল।

ঠাকুর বলছেন, **দেখ না, পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ-বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মতো ভক্ত কোথায়?** একবার যদি জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য হয়ে যায়, তখন ওই চৈতন্য, ওই বোধ –আমি ঈশ্বরের, ঈশ্বর আমার। এই বোধ যত বাড়বে এটাই হল ঐশ্বর্য বাড়ানো, ঐশ্বর্য অর্জন করা। পাণ্ডবদের মত অত বড় জ্ঞানী, অত বড় ভক্ত কোথায়? জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। মৃত্যুর সময় আপনার টাকাও কাজে দেবে না, আপনার ক্ষমতাও কাজে দেবে না; একমাত্র জ্ঞান-ভক্তির ঐশ্বর্যই কাজে দেবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

‘সমাধিমন্দিরে’ –কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন

১৯শে অগস্ট, **১৮৮৩** সাল, এই দিনের বর্ণনা চলছে। মাস্টারমশাই বলছেন, **এমন সময় নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নেপালের রাজার উকিল – রাজপ্রতিনিধি। ঠাকুর তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন**। কেন কাপ্তেন বলতেন জানা নেই।

একটা মজার ঘটনা। কিছুদিন আগে আমি কাঠমাণ্ডু আশ্রমের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বিষয় ছিল ‘ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব’। ওখানকার অধ্যক্ষের সাথে কয়েকজন ভক্ত আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ওনাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর যাঁকে কাপ্তেন বলতেন, তাঁর নিজের নাতি। শুনে চমকে উঠলাম, পরিচয় করতে পেরে ভাল লাগল। উনি পরিবারের লোকেদের কাছে শুনেছেন, ওনার ঠাকুরদার সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক ছিল। আমি নিজেই খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। কেমন একটা খুব ভাল লাগার ব্যাপার –বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কথামৃতে তাঁর নাম পড়ছি, তাঁরই বংশের লোক, একেবারে নিজের নাতি। উনি কখন বেলুড় মঠ আসেননি, এখন তিনি বিদেশে থাকেন। ওনার খুব ইচ্ছা একবার বেলুড় মঠ আসবেন, দক্ষিণেশ্বর যাবেন, সব দেখবেন। ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন বলে আজকে ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ‘কাপ্তেন’ নামটা অমর হয়ে আছে। ঠাকুর কাপ্তেনকে খুব ভালবাসতেন। কাপ্তেন বাংলা ভাল

জানতেন, কথামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী যেটুকু জানতে পারি, তাতে ওনার স্ত্রী বাংলা জানতেন না। মাস্টারমশাই বলছেন, **নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ, বিএ পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন**। আজ সঙ্গে নরেন আছেন।

ঠাকুর নরেনকে গান করার জন্য অনুরোধ করলেন। ঘরের দেওয়ালে একটা তানপুরা ঝোলান ছিল। সেটাকে নামিয়ে এনে বাঁয়া আর তবলার সুরের সাথে বাঁধা চলছে তো চলছেই। সকলে অধৈর্য, কখন গান হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) –দেখ, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন –পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য) পূর্ণকুম্ভ।

ঠাকুরের এই জিনিসটা আমার খুব অবাক লাগে, হয়ত আপনাদেরও লাগে। বন্ধুদের সঙ্গে বা আপনজনদের সাথে কথা বলার সময় কেউ হয়ত একটা কোন মজা করে কথা বলল, আমরা সেই কথার পিঠে আর-একটা কথা বলে দিই। মজা করে কেউ হয়ত কোন কথা বললেন বা একটা কোন কথা উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ওই মজার কথা বা এমনি কোন কথা, ঠাকুর সেখান থেকে টেনে সোজা নিয়ে গেলেন সেই আধ্যাত্মিক জগতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি) –কিন্তু নারদাদি? ঠাকুর বলতে চাইছেন, নারদেরও তো পূর্ণজ্ঞান, কিন্তু তিনি ত্রিলোকে বীণা বাজিয়ে 'শ্রীমন্ নারায়ণ শ্রীমন্ নারায়ণ' গান করে যাচ্ছেন।

কাপ্তেন –তাঁরা পরের দুঃখে কথা কয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ নারদ, শুকদেব –এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন, –দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য, তাঁরা কথা কয়েছিলেন।

এখানে ছোট্ট একটা বর্ণনা করছি। এই যে নারদাদির কথা চলছে, কি জ্ঞানীর কথা চলছে, কি আমাদের ঠাকুরই আছেন, স্বামীজী আছেন; এই ধরণের জ্ঞানী আর আমাদের মধ্যে কি তফাৎ? এই যে বলা হয়, জ্ঞানীরা পূর্ণকুম্ভ, কিন্তু সাধারণ জীবের কষ্ট দেখে ওনারা তাঁদের ওই উচ্চ অবস্থা থেকে ফিরে আসেন, ফিরে আসেন বলতে যে, ওনারা কথা বলেন। তত্ত্বের দিকে থেকে যদি দেখি, তাহলে তো ঈশ্বর বাদে কিছু নেই, এই কথা যে শুধু ঠাকুর বলছেন তা না, ভক্তিশাস্ত্রও তাই বলে। আর বেদ, উপনিষদ এটাই বলছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। আপনি যদি অতটা মানতে রাজী না হন, ঠিক আছে; এক ধাপ যদি নেমে আসেন, তাহলে মানুন –সবারই ভিতর সেই ঈশ্বর আছেন। হৃদয় বলতে মাংসপিণ্ডের হৃদয় না, এই হৃদয় হল আধ্যাত্মিক হৃদয়। যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানী মানে যিনি দেখেন সবারই ভিতরে অন্তর্যামী রূপে তিনি পরিষ্কার আছেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের এই শ্লোকটা দেখুন, কি সুন্দর বলছেন– *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।* জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই সব হয়েছেন।

এখন আপনাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তিনি আছেন' বা 'তিনিই সব হয়েছেন' এটা কি কল্পনা, না বাস্তব? এটা কি পূর্ণ সত্য, না আংশিক ভাবে সত্য? আপনারা বলবেন, এটা পূর্ণ সত্য। তাহলে গোলমালটা কোথায় হচ্ছে? ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, আমিও সেই ঈশ্বরের রূপ, আপনিও সেই ঈশ্বরেরই রূপ, ঠাকুরও সেই ঈশ্বরের রূপ; না হয় ভক্তিশাস্ত্রে বলবেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ঠিক আছে। কিন্তু শেষ কথা একটা তত্ত্ব কথা দিয়ে বলছি। আমাদের বিভিন্ন উপনিষদে এই কথা আসে, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। এই যে কলম, কলম আর আমার চক্ষু ইন্দ্রিয়, এই দুটির যে মিলন যেটাকে জ্ঞান বলে; সেখান থেকে মনে যে বৃত্তি তৈরী হচ্ছে, সবটাই তিনি হয়েছেন –কলম, চক্ষু ইন্দ্রিয়, মিলন, জ্ঞান, বৃত্তি।

তিনি বস্তু হয়েছেন, তিনি ইন্দ্রিয় হয়েছেন, বস্তু আর ইন্দ্রিয়ের যে মিলন সেটাও তিনি, সেখান থেকে মনে যে বৃত্তি জন্ম নিল, সেটাও তিনি। ভালটাও তিনি, মন্দটাও তিনি, অধমের যে অধম সেও তিনি। আমরা যেটাকে বিষয় মনে করি, যেটাকে ভোগ মনে করি সেটাও তিনি। কিন্তু আমাদের মনের এমন একটা ভাব হয়ে গেছে, যিনি নিত্য ঈশ্বর, সদাসর্বদা আমার ভিতরে ও বাহিরে বিরাজমান, তাঁকে ঈশ্বর রূপে না দেখে আমরা বস্তু রূপে দেখি, ঈশ্বর রূপে না দেখে বৃত্তি রূপে দেখি। ঠাকুর বলছেন, আমাদের যত কষ্টের মূলে কামিনী-কাঞ্চন, কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। কিন্তু কামিনীও তো তিনিই হয়েছেন, কাঞ্চন, সেটাও তো তিনি। আমরাই তো কাঞ্চনকে মা লক্ষ্মী রূপে পূজা করি। কিন্তু তফাৎ হল, ঈশ্বর রূপে না দেখে আমরা কামিনী রূপে দেখছি, আমরা কাঞ্চন রূপে দেখছি। জ্ঞানী এটাকেই ব্রহ্ম রূপে দেখেন। যার জন্য মথুরবাবু ঠাকুরকে বিশেষ পাড়াগুলোতে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানকার মেয়েদের দেখে তিনি মা মা বলে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মেয়েরা মথুরবাবুর উপর রেগে গেল, একজন সাধুপুরুষকে এখানে নিয়ে এসেছেন নষ্ট করার জন্য, আমাদের পাপ লাগবে। যে মেয়েদের নামে এত কলঙ্ক, এত বদনাম দেওয়া হয়, সেই মেয়েদের দেখে ঠাকুর মা মা বলে সমাধিস্থ। কিন্তু তাদেরকেই মথুরবাবু অন্য ভাবে দেখছেন।

এই দৃষ্টি পরিবর্তন আমরা করব কিভাবে? যে ভগবান আমাদের এত সমীপে তথাপি আমাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য। এটাই সাধনা, এটার জন্যই আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। গীতাতে বলছেন, কর্ম না করে কর্মযোগ কর; গীতায় বলছেন, সব কিছুকে যজ্ঞে আহুতি রূপে দেখ। আবার বলছেন, ঈশ্বরীয় রূপকে ভক্তিভাবে নাও। আবার বলছেন, এগুলোকে ত্রিগুণাত্মিকা মনে করে সব কিছু ত্যাগ কর। এটা ঠিক যে, যখন পৌঁছে যাবে তখন দেখবে এগুলো বাস্তবিক এই রকম। এখন সমস্যা কি হয়, যাঁরা বেদ, উপনিষদ, গীতার সাধনা করে শেষ অবস্থায় যখন পৌঁছে গেলেন, তখন বলছেন যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়, তুমি ছাড়া যে কিছু নেই। এরপর কি করে তিনি সবাইকে উপদেশ দিতে পারবেন? সেইজন্য তাঁরা অদ্বৈত তত্ত্বে লীন হয়ে যান।

কিন্তু বিচিত্র এমন কিছু একটা আছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলুন, যাই বলুন; কিছু এমন হয় যে, মাত্র কয়েকজন সেই অবস্থা থেকে ফেরৎ চলে আসেন। এনারা অত্যন্ত বিশেষ লোক। যাঁরা বুঝে গেছেন, যাঁরা প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন –যা কিছু আছে সব ঈশ্বরেরই রূপ অথচ মায়া দ্বারা ঢাকা। কিন্তু সাধারণ জীবের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে একটা করুণার ভাব জেগে ওঠে, এদের কি হবে? এরা তো কষ্ট পাচ্ছে, এদের জন্য কি করা যায়? এর খুব কাছের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ছোট শিশু ঘুমোবার সময় মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে কাঁদতে শুরু করে। মা তখন তাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়। মা জানে এটা তার স্বপ্ন, মা জানে স্বপ্নে সে হাসছে কাঁদছে। কিন্তু আবার তার মনে হয় যে, বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে, কষ্টটা দূর করার জন্য তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আমি, আপনি যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, তাঁরা বিশেষ, সত্যিকারের বিশেষ। এই জগতে স্বপ্ন সবাই দেখছে। কিন্তু আমাদের স্বপ্নে কান্নাটা যেন অনেক বেড়ে গেছে, আমরা ওই কষ্টটা বোধ করতে শুরু করেছি। বেশির ভাগ লোক যারা কষ্ট পাচ্ছে, তার দশটা উপায়ে এই কষ্টটা দূর করার চেষ্টা করছে। তার মানে স্বপ্নে মজে আছে, তাদের তাই কোন সমস্যা নেই। নারদ, শুকদেবাদি, অবতারের মত জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা বিশেষ ভাবে এই কয়েকজনের জন্য ওই অবস্থা থেকে আবার ফিরে আসেন। সব মায়েরা নিজের বাচ্চাকে ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠলে তোলে না। জগতে এত মা, সবাই কি ঘুমের মধ্যে নিজের বাচ্চাকে তুলে দিচ্ছে? ঘুম থেকে তুলে দিয়ে কি বলে দেয় যে, বাপু তুমি তো ঘুমোচ্ছ, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছ বলে কাঁদছ, কোথাও কিছু হয়নি? এগুলো উদাহরণ, উদাহরণ নিয়ে বেশি প্রশ্ন করতে নেই। কিন্তু বাচ্চা যদি ঘাবড়ে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, মা তখন তুলে দেয়।

কাপ্তেন যেটা বলছেন, তারা পরের দুঃখে কথা কয়েছিলেন, এটাই সত্য। জগৎ একটা স্বপ্ন, জাগ্রত অবস্থাটাও স্বপ্ন, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমরা যখন গভীর নিদ্রায় চলে যাই, যেটাকে সুষুপ্তির অবস্থা বলছেন, ওই সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত কিছু লয় হয়ে যায়। যেমন যেমন আমাদের অবস্থার

পরিবর্তন হয় তেমন তেমন সেখান থেকেই আবার সব কিছু বেরোতে শুরু করে। এই জগতে আমাদেরও আনন্দ আছে, আবার কান্নাও আছে; কিন্তু দেখা যায়, এই জগতে সব কিছুই আছে, কোন কিছুর অভাব নেই, তা সত্ত্বেও ভিতরে একটা সময় একটা অন্য কিছুর অভাববোধটা বেশি হয়ে যায়, জগতের সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম আমার লাগবে না, তখন ভিতর থেকে ছটফটানিটা বেড়ে যায়। এই ছটফটানিটা যখন বেড়ে যায়, তখন মনে হয় আমাকে এই জগৎ থেকে বেরোতে হবে, আমার ঘুমটাকে ভাঙাতে হবে; তখনই দরকার পড়ে এই ধরণের আচার্যদের, তখন দরকার পড়ে আচার্যদের কথা। আপনারা যে গীতা শুনছেন, উপনিষদের কথা শুনছেন, কথামৃত শুনছেন, এর অর্থ একটা –সংসারে আর টিকতে পারছি না। এনারা পুরো জগতের জন্য আসেন না, আসেন এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য। সেইজন্য এই গল্পটা মনে রাখবেন।

নারদ একদিন ভগবান বিষ্ণুকে বলছেন, জগতে এত কষ্ট কিছু একটা করুন প্রভু। ভগবান বললেন, যাও তুমি যাকে খুশি নিয়ে এসো, কষ্ট দূর করে দেব। নারদ বৈকুণ্ঠ থেকে মর্ত্যে এসেই প্রথমে একটা গুবরে পোকাকে দেখলেন। তাকে বললেন, 'চল তোকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব, ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে থাকবি'। গুবরে পোকা বলছে, 'আপনি যখন বলছেন নিশ্চয় যাব, কিন্তু আগে বলুন বৈকুণ্ঠে ভাল গোবর পাওয়া যাবে তো'? জগতে, এই সংসারে যত মানুষ আছে, এদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলে সেখানে গোবরই খুঁজবে।

জীবন-দর্শন আপনার যাই থাকুক, যদি মনে হয়ে এই জগতে আপনার এখনও প্রচুর দায়ীত্ব আছে, যদি মনে হয় এই জীবনে আমি ঠাকুরকে এই ভাবে দেখি, যদি মনে হয় আমি বেদান্ত ধর্ম পালন করতে চাইছি, সেখানে এই তত্ত্বটাকে মনে রাখা –ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, জ্ঞানীদের কাছে তিনি সুস্পষ্ট, আমাদের কাছে অদৃশ্য। ফলে আমরা এই জগতে মজে যাই। কিন্তু জগৎটা স্বপ্নের মত। আবার একটা সময় আসে, যখন আমরা বলি আমাদের জন্য জগতে সুখের মাত্রা কমে গেছে, তখন একটা ছটফটানি আসে, আর সেই সময় নারদ, শুকদেবাদিদের মত আচার্যের দরকার হয়; স্বামীজীর মত যুগাচার্যের দরকার হয়। তাঁরাই কথা বলে বলে ঘুমটা ভাঙান, তখন তত্ত্বজ্ঞান হয়।

নরেন্দ্র গান শুরু করলেন –সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। সেদিন কবে বা হবে। লম্বা গান। গানে একটা কথা আছে ''আনন্দ অমৃতরূপে''।

''আনন্দ অমৃতরূপে'' এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। দেখবেন যখন কোথাও প্রচুর লোকের জমায়েৎ হয়েছে, সেই ভিড় যদি উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন ভাল মানুষও ভুল কাজ করে বসে, সঙ্গে পরে গোলমাল করে বসে। তেমনি সঙ্গে পড়ে ভালও হয়। আপনারা চারজন মিলে যদি জপধ্যান করেন, দেখবেন ঘরে একা যে ধ্যান করতে বসলে পনের মিনিট করার পর আর করতে ইচ্ছে করছে না, সেখানে চারজন মিলে করলে এক ঘন্টা অনায়াসে ধ্যান হয়ে যাবে। এক অপরকে সাহায্য কর, এক অপরকে ধরে রাখা। স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ, তিনি গান করছেন। ঠাকুর তো এমনিতেই সমাধিতে থাকেন, কিন্তু সেখানে অনেকে আছেন, গান শুনছেন, ভাব এসে গেল। **আসীন হইয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন**। আমরা বসা অবস্থায় ঠাকুরের একটাই ছবি দেখি। কিন্তু এখানে বসে আছেন আর বুকের কাছে হাতজোড় করে বসে আছেন। ঠাকুরের ব্যাপারে কথামৃতে মাস্টারমশাইএর সৌজন্যে অনেক বর্ণনা আমরা পাই। অবাক হয়ে ভাবি একশ বছর আগে ওনারা এগুলো সাক্ষাৎ করেছেন। একবার যদি এই রকম দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়, তাহলে জীবনটাই পাল্টে যাওয়ার কথা, পাল্টে ছিল নিশ্চয়।

পূর্বাস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। লোকবাহ্য একেবারেই নাই। শ্বাস বহিছে কি না বহিছে! এই জিনিসটা মাস্টারমশাই কথামৃতে অনেকবার লিখেছেন। পুরো গভীরে

গিয়ে ছোট ছোট জিনিসগুলিকে মাস্টারমশাই চিত্রণ করেছেন। বলছেন, **স্পন্দহীন! নিমেষশূন্য! চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ-রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গেছেন**।

শাস্ত্র পড়ে আমরা দেখি যোগীরা যোগ সাধনা করেন, আরও কত কি করে একজন যোগী সমাধিস্থ হন। ঠাকুর এখানে গান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ। সমাধি প্রথমবার হওয়াটাই কঠিন হয়, তারপর অত কঠিন হয় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সচ্চিদানন্দলাভের উপায় –জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারান্দায় চলিয়া গেছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতেছেন।

হাজরা মহাশয় আমার খুব প্রিয় চরিত্র। হাজার মহাশয় হলেন আমাদের ছবি। দুটো বই পড়ে নিয়ে, নিজের মত একটা ধারণা করে, নিজেকে একজন বিরাট কিছু মনে করে যত রাজ্যের ভুলভাল কথা বলে যেতেন। নরেন্দ্রর সঙ্গে হাজরার খুব ভাব ছিল, কেন ছিল ভগবান জানেন, মজা করার জন্য নাকি অন্য কিছুর জন্য আমাদের জানা নেই।

এদিকে ঘরে একঘর লোক। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি জেনেশুনে এখানে প্রত্যেকটা কথা বললাম। কথামৃত আপনারা পড়েছেন, কি আছে আপনাদের জানা আছে। যেখানে যেখানে তত্ত্বকথা আছে, যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করছি। এখানে হয়ত তত্ত্ব কথা নেই, কিন্তু মাস্টারমশাই একটা দৃশ্যকে কি সুন্দর করে অঙ্কন করেছেন। এই দৃশ্যের বর্ণনা যখন শুনছেন, চোখ বন্ধ করে যদি শোনেন আর সঙ্গে সঙ্গে যদি চিন্তন করেন, দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘর, ঘরে কি কি হচ্ছে; এটাই একটা ধ্যানের বিষয় হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকল আর গেল। দেখুন কেমন একটা ভাব। সেই অসীমের রাজ্য থেকে নেমে আবার এখানে এসে দেখছেন, নরেন্দ্র ঘরে নাই। **(কাপ্তেন প্রভৃতির প্রতি) – চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে**। আরোপ করলে কি হয় ধীরে ধীরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। অভ্যাসে দাঁড়ালে ধীরে ধীরে একদিন হঠাৎ সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে। ঠাকুর যে অবস্থায় আছেন, ওই অবস্থায় যাওয়া আমাদের দ্বারা হবে না, কিন্তু আরোপ তো করাই যেতে পারে। আমি সেই আত্মা, কিছুক্ষণের জন্য তো আরোপ করাই যায়, জোর করে না, এমনি সহজ ভাবে। ধ্যান করার সময়, গুরু ইষ্টের যে রূপ, যে বিগ্রহ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই রূপের উপর ধ্যান করুন। অন্য সময় হয়ত কথামৃত পড়ছেন, কিছুক্ষণ পড়ার পর চোখ বন্ধ করে চিন্তন করছেন, ঠাকুর বসে আছেন, কথা বলছেন। আপনি ঠাকুরের সামনে বসেই যেন কথাগুলো শুনছেন।

ঠাকুর বলছেন, **চিদানন্দ আছেই; –কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ**। চিদানন্দ, চৈতন্যরূপী আনন্দ যিনি, একমাত্র তিনিই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। তিনি এই বিষয় রূপে, যেটাকে হারালে আমরা কষ্ট পাই, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, অথচ তিনিই ওই বিষয় হয়েছেন, তিনিই চোখের জল হয়েছেন, ভাবতে গেলেই অবাক লাগে। জল যখন বরফ হয়ে যায় তখন কত আকার ধারণ করে, কত রূপ ধারণ করে; এই জগতে সেই চিদানন্দ কত রূপ ধারণ করে আছেন। আবরণ আর বিক্ষেপ – আবরণ মানে আসল স্বরূপকে ঢেকে দেওয়া এবং বিক্ষেপ মানে, ঢেকে দিয়ে অন্য একটা রূপকে সামনে নিয়ে আসা। তাঁর চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর আনন্দ স্বরূপকে ঢেকে দিয়ে এই জগৎকে সামনে নিয়ে আসছেন।

বলছেন, **বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে**। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, এরা নিজের নিজের বিষয়ের দিকে দৌড়াচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের এই দৌড়ঝাপ যত কমবে তত ঈশ্বরের দিকে মন যাবে। এখানে আবার কিছু কথা বলার আছে। প্রথমের দিকে যেটা বলা হয়েছিল, সেই জিনিসটাকেই আর-একবার এখানে বলছি। আসলে বিষয় বলে তো কোন অস্তিত্ব নেই, অন্যান্য ধর্মে থাকতে পারে, আমাদের সনাতন ধর্মে এটা নেই। আমাদের কাছে যেটা বিষয়, সেটা তারই রূপ; ইন্দ্রিয়গুলি যে বিষয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলিও তাঁরই রূপ। ঠাকুরকে একজন বলছিলেন, তুমি খাচ্ছ? নাকি সচ্চিদানন্দকে আহুতি দিচ্ছ? বিষয়াসক্তি কমানো অত্যন্ত সহজ।

আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনাদের কারুর মনে যদি কোন দুর্বলতা থাকে, যদি বিষয়াসক্তি থাকে, তাহলে ছোট্ট একটা কাজ করুন; দেখবেন ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যে আসক্তিটা কমে যাবে। বদলে অন্য আসক্তি হয়ত এসে যাবে, কারণ ভিতরের ভাবটা তো এতে পাল্টে যাচ্ছে না। ধরুন আপনার মাংস-ভাত খেতে খুব ভাল লাগে, যেমন খাচ্ছিলেন তেমন আপনি খাবেন। যেমন সপ্তাহে একদিন, বা সপ্তাহে দু-দিন কি তিন দিন কিংবা সাতদিনই মাংস-ভাত খান, তাই খান। শুধু খাওয়ার সময় এইটুকু বলা –আমি এই খাবার জঠরাগ্নিতে আহুতি দিচ্ছি। জঠরাগ্নি হল, পেটের অগ্নি। যজ্ঞ হলে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। পেটে যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনে খাদ্যবস্তুকে আহুতি দিচ্ছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে মন্ত্র আছে, পুরুষ-নারীর যে সম্পর্ক হয় সেখানে নারী হল অগ্নি, পুরুষ সেই অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছে। এই ভাবটা আনুন আর সব কিছুতে অভ্যাস করুন, ধীরে ধীরে আসক্তি অনেক কমে যাবে।

এটাকেই তন্ত্র সাধনার একটা অঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মানুষ এটাকে নোংরামিতে নিয়ে চলে গেল। একটা উচ্চ জিনিস বা উচ্চ ভাব যখন জনগণের মধ্যে চলে যায়, কোথাও যেন সেই উচ্চ জিনিসটা হারিয়ে যায় বা খেলো হয়ে যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনার জন্য এই ভাবটার অভ্যাস অত্যন্ত কার্যকর। এখানে আমরা শুধু কামনার কথা বলছি না, যে কোন জিনিস যেটা সবাই করেন –আহার-নিদ্রা-মৈথুন; এই তিনটেই মূল, যখনই করবেন তখন মনে মনে আহুতি দিচ্ছি মনে করে করবেন। এটা শাস্ত্রের কথা, আমি নিজে থেকে কিছু বলছি না। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *অপানে জুহ্বতি প্রাণম্*, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি এটাও আহুতি। আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব, আপনি বাড়িতে খান, হোটেলে খান, ট্রেনে খান যেখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন, খাওয়ার আগে অবশ্যই *ব্রহ্মার্পণং* মন্ত্রোচ্চারণ করে খাওয়া শুরু করবেন, এতে খাওয়াটা শুদ্ধ হয়ে যাবে; তার সাথে আপনার খাওয়ার যে প্রক্রিয়া এটা যজ্ঞে পরিণত হবে। এটাই যখন অনেক বছর ধরে করে যাবেন, তারপর দেখবেন, খাওয়ার প্রতি যে লোভ, এই লোভটা অনেক কমে যাবে।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে, এই যে ঠাকুর বিষয়াসক্তির কথা বলছেন, বিষয়াসক্তি যত কমবে তত আপনি ঈশ্বরের দিকে এগোবেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বাড়বে। ঠাকুরের কাছে কত রকমের লোক আসতেন, যে মদ খায় তাঁকে বলছেন, মাকে অর্পণ করে খাবে। যজ্ঞে আহুতি দেওয়া আর মাকে অর্পণ করা দুটো একই জিনিস। আপনার করুন, দেখবেন ধীরে ধীরে আসক্তি, লোভ এগুলো অনেক কমে গেছে। ওই যে একটা মরণ কামড় দিয়ে ভোগকে ধরের রাখার আপ্রাণ চেষ্টার ভাব, এই ভাবটা এতে চলে যাবে। পুরোটা না চলে গেলেও, এটাই আপনার জন্য একটা বিরাট উপলব্ধি হয়ে যাবে। বিষয়াসক্তি জোর করে কমাতে গেলে খুব বিপদে পড়বেন। ইদানিং কালের ইয়ং ছেলেরা ইউটিউব, সোস্যাল মিডিয়ায় নানা রকম কথা শুনে ডিস্টার্ব হয়ে অনেকেই এসে আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চান। জোর করে, ভয় দেখিয়ে বিষয়াসক্তি দূর করাটা হিন্দু ধর্মের ভাব নয়, হিন্দু ধর্ম কক্ষণ কোন জিনিসকে বাতিল করে না, তাচ্ছিল্য করে না। ঠাকুরও বলছেন, মোর ফিরিয়ে দাও; যজ্ঞ রূপে মোর ফিরিয়ে দিতে হয়। অনেক কিছু জিনিস আছে যেটা ইষ্টের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা যাবে না। যদি না দেওয়া যায়, যজ্ঞ রূপে করুন। যে ধর্ম নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই যজ্ঞ রূপে দেখছেন, এরপর কোন কিছুকে যজ্ঞ রূপে না নিয়ে কাজ করা যাবে না। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে একেবারে বিস্তারে বলছেন, সব

কিছুকে কিভাবে যজ্ঞ রূপে নিতে হয়। স্বাধ্যায়, পড়াশোন করা, এটাও একটা যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, তপস্যা যজ্ঞ, সব কিছুই যজ্ঞ। দ্রব্যযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞই হল দান। ব্যাসদেব সব ননী-মাখন খেয়ে বলছেন, আমি খাইনি, তাহলে কি করেছেন? আহুতি দিয়েছেন। কাপ্তেন পড়াশোনা করা লোক ছিলেন, ঠাকুরের সঙ্গ করতেন, বলছেন –

কাপ্তেন –কলিকাতার বাড়ির দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাত হবে। কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ি থেকে তত তফাত হবে। যত যজ্ঞের ভাব আসবে, বা ইষ্টের প্রতি বা ঠাকুরের প্রতি অর্পণের ভাব যত আসবে, তত বিষয়ের ভাব কমে যাবে। বিষয় ভাব কমে গেলে মন তত ঈশ্বরের দিকে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –শ্রীমতি যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়। ভাবভক্তি কি রকম হয়? ঠাকুরের বিষয়ে কোন গান দূর থেকে আপনার কানে এল, যেমন ঠাকুরের খুব প্রিয় গান, 'তারা তারা দুভাই এসেছে রে', দূর থেকে শুনতে পেলেন, মনে হবে যেন আপনি মনে মনে নৃত্য করছেন। ঠাকুরের গান শুনে মনটা ঠাকুরের ভাবে চলে গেল। যাঁরা আরও উচ্চমানের সাধক, তাঁরা আরও গভীরে ডুবে যাচ্ছেন। তবে আমাদের এখানে রামকৃষ্ণ ভাবধারায় এই ধরণের ভাবের উচ্ছাসকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। যেমন যেমন জপধ্যান করবেন তেমন তেমন ভাবভক্তি বাড়বে, তেমন তেমন ওই ভাবভক্তিকে চেপে রাখার ক্ষমতাটাও বাড়বে। জ্ঞানীরা একটু অন্য রকমের হন। আমাদের রামকৃষ্ণ ভাবধারায় জ্ঞানের ভাবটা বেশি।

জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। এটাই হিন্দুদের জীবনধর্ম। আগেকার দিনে বেশির ভাগ লোক স্নান করার সময় পুরুষসূক্তম্ পাঠ করতেন। যে কোন কর্ম করছেন, তখনও কোন বেদমন্ত্র বা প্রার্থনার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছেন। স্নান করে উঠলেন, তখন আর-একটা স্তব পাঠ করতে লাগলেন। সব সময় পূজা-পাঠ চলছে। লোকেরা প্রথমেই এসে বলবে, মহারাজ ধ্যান কি করে হবে, জপ কিভাবে হবে? জপ করা কি সাধারণ কথা আর ধ্যান তো সাধনার প্রায় শেষ অবস্থা। আপনার জীবনটাই তৈরী হল না, বলছেন ধ্যান কি করে হবে। তার আগে জীবনটাকে তৈরী করতে হবে। বিষয়ভোগ কমাতে হবে, আসক্তি কমাতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বাড়বে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে জপ হতে শুরু হবে। জপ করতে করতে ভিতরটা যখন পরিবর্তন হয়, তখন আসে ধ্যানের কথা। এতো কয়েক দিনের কথা না, কয়েক জন্মের কথা। হাজরা মশাইএর মত অবস্থা, নিজের মত পড়ে নিয়ে একটা ধারণা করে নেওয়া।

সে সর্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। নিজের স্বরূপে থাকা, সব সময় মনে করা যে আমার ভিতর ইষ্ট আছেন, একেবারে সজীব, সচল। এটা নিয়ে কোন নাটুকেপানা করার দরকার নেই। কারণ এগুলো নিজের মনের ভিতরের ব্যাপার, ভাব যত ভিতরে থাকে ততই ভাল।

ভক্তের ভিতর একটানা নয়; জোয়ার-ভাঁটা হয়। হাসে-কাঁদে, নাচে-গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে। এটা ঠিক আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাব নয়, তবে কোন কোন ভক্ত আছেন যাঁদের এই ভাব হয়। –**কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে –যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর-টুপুর' 'টাপুর-টুপুর' করে। (হাস্য)** এই ভাব কারুর কারুর মধ্যে থাকে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলতে পারি, এখানে সব কিছুরই সুযোগ আছে, যেমন দূর্গাপূজার সময় গান হচ্ছে, কালীপূজায় এত গান হচ্ছে, বাকি সময় জপধ্যানের ব্যবস্থা, অনেক জায়গায় কালীকীর্তনের ব্যবস্থা আছে, সব কিছুরই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আর মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নিত্য যে সন্ধ্যা আরতি হয়, সেখানে একটা আলাদা ভাব বেরিয়ে আসে। স্বামীজী বারবার চারটে যোগের সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন, চারটেই করতে হয় – সেবা, পূজা, জপধ্যান, ভক্তিভাব সবটাই আমাদের কম বেশি করতে হয়।

জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান, –ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এগুলো খুব উঁচু কথা। আগে আমরা অনেকবার বর্ণনা করেছি যে, শক্তিরই অবতার, শক্তিরই ভগবান; সেই নির্গুণ নিরাকার যখন ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তার মানে এবার তাঁকে দেখা যাবে। বেদের খুব নামকরা সূক্ত নাসদীয় সূক্ত, সেখানে প্রথমেই বলছেন, *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ*, যেটা নির্গুণ নিরাকার সেটাকে জানা যায় না। কিন্তু তারপরে যখন সৃষ্টি হয়ে যায় তখন বেঁধে ফেলে। তখন যেটা আছে সেটাকেই যোগীরা হৃদয়ে দেখতে পান। আমরা অতি সাধারণ স্তরের, এত উঁচু কথা আমাদের জন্য নয়, তবে শুনে রাখতে হয়।

ঠাকুর বলছেন –**যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী**। ঠাকুরের এই সব কথাগুলিকে আধার করে অনেকে ঠাকুরের এই কথাগুলোকে শাক্ত বেদান্ত বলতে শুরু করলেন, তার মানে ঠাকুর হলেন শাক্ত বেদান্ত। কত রকম যে নাম দিচ্ছেন, কখনো শাক্ত বেদান্ত, কখনো বিজ্ঞান বেদান্ত, কখনো ব্রহ্ম বেদান্ত আবার কখনো মায়া বেদান্ত। বেদান্ত, বেদান্তই একমাত্র সেই অনন্তের বর্ণনা করে। অনন্তের বর্ণনাও তো অনন্তই হবে। তাই বলে এটা থেকে ওটা আলাদা, তা নয়। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, **যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না –মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না**। আচার্য শঙ্করও এই একই কথা অনেকবার বলেছেন। ঈশ্বর আর শক্তি, দুটো এক; যিনি ঈশ্বর তিনিই শক্তি, যিনি শক্তি তিনিই ঈশ্বর। এখানে শাক্ত বেদান্ত কোথা থেকে আসছে?

এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদে –এই নানারূপ –'সে তো তুমিই গো তারা'। যেখানে কার্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ, ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি –যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। খুব উঁচু কথা, তবে শুনে রাখা ভাল। এটা জানার জন্য যে, এই তত্ত্বকেই আপনি একদিন প্রত্যক্ষ করবেন। গুরু আপনাকে যেভাবে সব কিছু করতে বলে দিয়েছেন, মন্ত্রজপ কিভাবে করবেন, ধ্যান কিভাবে করতে হবে, জীবন-যাপন কেমন হবে, শুধু এতেই দাগা বুলিয়ে যেতে হবে, আর কিছু না।

যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন, তখনও তিনি; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি; কেবল উপাধি বিশেষ। প্রথমের দিকে শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, তিনিই সব কিছু হয়েছেন; বস্তুও তিনি হয়েছেন, ইন্দ্রিয়ও তিনি হয়েছেন। আবার বস্তু আর ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ, সেটাও তিনি, সেখান থেকে যে বৃত্তি হয় সেটাও তিনি, আর যিনি এই সব কিছুকে জানছেন, সেটাও তিনি।

কাপ্তেন –আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়। ঠাকুর নিজের মত বলে যাচ্ছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ –আমি এই কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

কাপ্তেন –কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার, তিনি বাবু, সাধু নন। কাপ্তেরনের এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং কমেন্ট। কেশব সেনের বিভিন্ন রকম ব্যাপার ছিল, যে কারণে ব্রাহ্মসমাজও শেষে ভেঙে গেল। যাই হোক, ঠাকুর খুব মজা করে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –কাপ্তেন আমায় বারণ করে, কেশব সেনের ওখানে যেতে। এটা ছিল সিগন্যাল, এবার থেমে যাও।

কাপ্তেন –মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি করব। এই দেখুন, ঠাকুরের কাছে থেকেও যে ওই চেতনাটুকু জাগবে, I should draw a line here, থেমে যাও, আর না; চেতনাটা জাগে না।

আমি দেখেছি লোকেদের ওই চেতনা জাগে না। হৃদয়রামেরও এই একই সমস্যা ছিল, হাজরারও ওই একই সমস্যা। ঠাকুরের আশেপাশে যাঁরা ছিলেন এনাদের ধারণাই নেই যে ঠাকুর কি ইঙ্গিত করছেন। কাপ্তেন বলছেন, আপনি যাবেন, তা আর কি করব। আমরা থাকলে আমরাও এই রকম আচরণ করতাম। ঠাকুরকে নিয়ে আজকে দশটা কথা শোনা আছে, ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর অবতার, আমরা পাঁচটা কথা ভেবে নিয়ে হয়ত চুপ থাকতাম।

ঠাকুর বিরক্ত। কতক্ষণ আর ঠাকুর ভদ্রলোক সেজে থাকবেন। কয়েকদিন আগে মরিশাস থেকে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। মরিশাসে অনেক হিন্দিভাষী আছেন, আমাদের ক্লাশ শোনেন, তাঁদের ভাল লাগে, লম্বা লম্বা মেল পাঠান। একটা মেইলে ভদ্রলোক লিখে পাঠালেন, 'স্বামীজী একটা জিনিস বুঝতে পারিনা, আমাদের আগেকার ঋষিরা এত রেগে যেতেন কেন, কথায় কথায় অভিশাপ দিতেন'? আমি ওনাকে ব্যাখ্যা করলাম, মানুষ আগের জীবনে যেমন থাকে, পরের জীবনেও তেমনই থাকে। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন রাজকুমার, তিনি ওই ভাবেই বড় হয়েছেন, পরে তাঁর ব্যবহারও সেই রকমই থেকে গেল। এইসব বলে তাঁকে শেষে লিখলাম, যাঁরা ভদ্রলোক সাধু, এনাদের কাউকে আমি বিশ্বাস করিনা। মুখে মিষ্টি হাসি, সহজে রাগেন না; এনাদের সাধু বলে মনে করতে আমার সন্দেহ হয়। সাধু মানে একটা কথা ভদ্রভাবে বলবেন, দুটো কথা ভাল ভাবে বলবেন; তারপর আসল রূপটা বেরিয়ে আসবে, ডিনামাইট লাগিয়ে দেবেন। পুরো কথামৃতে দেখুন, কাউকে ঠাকুর ছেড়ে দিয়েছেন? আমরা সাধুরা বসে একদিন এমনি কথাবার্তা করছিলাম। কি একটা কথা হতে একজন বলছেন, 'ভাল লাগে না, যেখানেই যাই সেখানেই দেখি শুধু পরনিন্দা পরচর্চা'। অন্যান্য সাধুরা একটা দুটো কথা বলতে আমি বললাম, 'কি পরনিন্দ আর পরচর্চা করবেন, কথামৃতটা একটু খুলে দেখুন কিভাবে ঠাকুর একজনের পর একজনকে শ্রাদ্ধ করে যাচ্ছেন –'অমুক লোক, নাম বলব না, এত মাইনে পায় আবার মিথ্যা কি লিখিয়ে টাকা নেয়'। এখানেও ঠাকুর কাপ্তেনকে ছাড়ছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) –তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। আমাদেরও অনেকে এসে উপদেশ দেবে, আপনি ওর সাথে কথা বলেন কেন; বেশ করি, না পছন্দ হয় আসবেন না। সবাই একটা পছন্দ অপছন্দের তালিকা তৈরী করে রেখেছে, সেটাকে আবার অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চাইবে। ঠাকুর হরিনাম ছাড়া কিছু জানেন না; কেশব সেন যত যাই হোক হরিনাম তো করেন। তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার, আর আমি কেশব সেনের কাছে গেলেই যত দোষ?

তবে না তুমি বল 'ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ' –যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীবজগৎ হয়েছেন। এটা আরও ইন্টারেস্টিং কমেন্ট। কাপ্তেন এই কথাগুলো প্রায়ই বলতেন। এই ধরণের কথা মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু যখন জীবনে ব্যবহারিক কাজে নামছে, সেই সময় কোথাও যেন ফাঁক থেকে যায়। ফাঁক এইজন্য থেকে যাচ্ছে না যে, তিনি কেশব সেনকে ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার বলছেন, এগুলো বলে তিনি ঠাকুরকে আটকানোর চেষ্টা করছেন। এগুলো মুখে বলা যত সহজ, জীবনে নামানো তত কঠিন হয়ে যায়। এখানে মাস্টারমশাই আমাদের জন্য একটা বিরাট অবদান রেখে গেলেন। ঠাকুরের ছোট ছোট জিনিসগুলোকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আমাদের ধর্মজীবন আরও বিস্তারে পরিষ্কার হয়ে যায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রনাথ –জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়

ঠাকুর কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন; এতে কাপ্তেনের আপত্তি। ঠাকুর ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না, সেইজন্য যিনি ঈশ্বরীয় কথা বলবেন, তাঁর কাছেই ঠাকুর যাবেন। আমরা যখন যাকে ভালবাসি, আমরা তখন চাই তিনি আমার মতই চলবেন। আমরা যদি বিচার করে দেখি, দেখা

যাবে, যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁরা কত বলবেন, কত বোঝাবেন, আমি তোমার ভাল চাই, ওই লোকটা ভাল নয় ইত্যাদি; কিন্তু যিনি জীবনের ধারা ধরে নিয়েছেন, তিনি আর এ-সব কথা শুনতে যাবেন না। আমরা যখন সব ছেড়ে মঠে এসে জয়েন করলাম, আমাদেরও কত কিছু শুনতে হয়েছে। এখানে জীবনের সত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না, জীবনের ধারা –এতেই মরব, এতেই বাঁচব। ঠাকুর ঈশ্বরীয় ভাবে ও কথায় এমন ডুবে গেছেন যে, ওনার কাছে অন্য কোন কথার কোন দাম নেই। যেখানে তিনি সেই সুখ পাবেন, সেখানেই তিনি যাবেন।

কাপ্তেনকে এই বলে ঠাকুর হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাপ্তেন বসে রইলেন। তাঁকে যে ভর্ৎসনা করা হল, সেটাকে তিনি আর অন্য ভাবে নিলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ঠাকুর ফেরেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকে যে বারান্দা আছে, সেখানে হাজরা মশাই বসে থাকতেন। নরেনের সাথে হাজরার খুব বন্ধুত্ব। আসলে কি হয়, স্বামীজী একটা সাংঘাতিক বৌদ্ধিক স্তরে অবস্থিত থাকতেন। যাঁরাই বৌদ্ধিক স্তরে থাকেন, আমাদের মনে হবে তাঁরা যেন ইন্টেলেকচুয়ালদের সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করেন, কথা বলতে ভালবাসেন, না তা হয় না। সে-রকম জায়গায় এমন লোক যদি পান, যিনি অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু কথা বলে মজা পাওয়া যাবে, তাঁদের সঙ্গে স্বামীজীর মত পুরুষদের প্রচুর বন্ধুত হয়।

আইনস্টাইন খুব ভালভাবে জানতেন তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, সেইজন্য তিনি যে কোন লোকের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন, তাতে তাঁর কিছু আসত যেত না। পেপারওয়ালারা ছাপাবে বলে আইনস্টাইনের ছবি তুলতে চাইল, আবদার করল জিভ বার করে তুলতে, এটাই পরে আইনস্টাইনের বিখ্যাত ছবির মধ্যে একটি হয়ে গেল। আবার কেউ আবদার করছে, স্যার আপনার টুপিটা একটু উপরে বাতাসে ছুঁড়ে দিন। উনি এত উপরে চলে গেছেন, এগুলো ওনাকে কোন ম্যাটার করে না। এটা কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষদের সাথে হয় না; ইন্টেলেকচুয়াল আর স্পিরিচুয়াল দুটো বিরাট তফাৎ। যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁরা ধর্মপ্রাণ তাঁরা সবার সাথে মেশেন না। কিন্তু বৌদ্ধিক জগতে যাঁরা অনেক উপরে চলে গেছেন, সাধারণ লোকেদের সাথে মেলামেশা করতে তাঁদের তেমন কিছু হয় না। মঠে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অনেক পড়াশোনা করা বৌদ্ধিক স্তরে অনেক উপরের মানুষের সঙ্গ করা। তাঁরা সেই রকম সঙ্গ পেলে মেলামেশা করেন। তাই বলে যে তিনি কাউকে তাচ্ছিল্য করেন, তা না। তাঁরা যাঁর সঙ্গে কথা বলেন বা কাজের সুত্রে যাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, তাঁরা যেমনটি তিনি তাঁদের সঙ্গে ঠিক তেমনটি আচরণ করবেন, কথা বলবেন।

নরেন্দ্রনাথের সাথে হাজরা মশাইএর এই রকম খুব বন্ধুত্ব। ঠাকুরের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে, বেশি মেলামেশা করলে নরেনের যা আধার, মাথা ফেটে যাবে। আমি, আপনি যদি ঠাকুরের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা ঘুরি, আমাদের মাথা ফেটে যাবে না, তেমন কিছুই হবে না। যেমন হৃদয়রাম, কি হল তাঁর? এত সেবা, এত সঙ্গ, কিছুই হল না, শেষে ঠাকুরকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হল। কিন্তু নরেন যদি বেশিক্ষণ ঠাকুরের কথা শোনেন, ওনার মাথা ফেটে যেত। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, বৈষ্ণবদের শাস্ত্র নিয়ে ঠাকুর একদিন কথা বলতে গিয়ে বলছেন –জীবে দয়া। বলেই ঠাকুর থু থু করে বলছেন –জীবের কি ক্ষমতা আছে যে সাধারণ মানুষকে দয়া করবে? দয়া না সেবা, ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা। এই কথা শোনার পর ঠাকুরের ঘর থেকে নরেন বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে এসে ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলছেন, আজ এক নূতন দিক পেলাম, ঈশ্বর যদি আমাকে কোন দিন সুযোগ দেন, আমি এটা জীবনে করে দেখাব। কি করে দেখাবেন? ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা, যার উপর আজ রামকৃষ্ণ মিশন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যদি ঠিক ঠিক দেখি, ঠাকুরের এই ধরণের কথাগুলো শুনলে স্বামীজীর যে বুদ্ধির স্তর তাতে সটান হয়ে যেতেন। আমাদের সেটা হবে না, কারণ আমাদের সেই আধার নেই। সেইজন্য কেউ যখন কোন মহারাজদের সঙ্গে দেখা করতে যান, মহারাজ তাদের সাথে খেলার খবর, রাজনীতির দু-

চারটে কথা বলে বিদায় করে দেন। কারণ, কি কথা বলবেন, কোন প্রস্তুতি ছাড়া উচ্চ কথা বলে দিলে উলটো হয়ে যেতে পারে।

যাই হোক, নরেনের সাথে হাজরা মশাইএর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক জ্ঞানবিচার করেন –বলেন, "জগৎ স্বপ্নবৎ -পূজা নৈবেদ্য এ-সব মনের ভুল –কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য; আর 'আমিই সেই'।"** আজকাল অনেকেই ইউটিউব, সোস্যাল মিডিয়াতে বেদান্তের উপর প্রচলিত লেকচার দেন। সেখানে অনেকেই 'স্বপ্নবৎ' শব্দটাকে খুব ব্যবহার করেন। বেদান্তে কোথাও জগৎকে স্বপ্নবৎ বলছেন না। আচার্য শঙ্করের পরে বেদান্ত নিয়ে যাঁরা চর্চা করলেন, তাঁরা বেদান্তকে একটু এলেমেলো করে দিলেন। বেদান্ত যদি ঠিক ভাবে না বোঝা হয়, সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। বেদান্ত যদি আপনারা কেউ শিখতে চান, তাহলে আমাদের বাংলায় স্বামীজীর দেববাণীর উপর লম্বা আলোচনা আছে, ইউটিউবে আমাদের প্লে লিস্টে পেয়ে যাবেন। বেদান্ত যদি বুঝতে হয়, তাহলে দেববাণী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

একটা অতি সাধারণ কথা বলি, আপনি যে মন দিয়ে বলছেন, পূজা নৈবেদ্য এ-সব মনের ভুল, সেই মন দিয়ে আপনি বিচার করছেন জগৎ স্বপ্নবৎ, সেটা কেন মনের ভুল হতে পারে না? আপনার যে ধারণা, জগৎ স্বপ্নবৎ, এটাও তো মনের ভুল হতে পারে। আপনি যে মনে করছেন উপনিষদ একটা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এটাও তো আপনার মনের ভুল হতে পারে। সমস্যা হল, আমরা সবাই কিন্তু হাজরা মশাই। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তিনি তখন আসেন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য। ঠাকুর ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা সবাই ব্রাহ্মণ। তাদের মধ্যে তিনজন ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, তিনজনেরই সাথে ঠাকুরের কাছের, দূরের সম্পর্ক। একজন হাজরা, দ্বিতীয় হৃদয়রাম আর তৃতীয়জন হলেন হলধারী। হৃদয়রাম সর্বদা ঠাকুরের সেবায় রত, কর্মযোগ করছেন। হাজরা বিচার করতেন, জ্ঞানযোগ। হলধারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন ও পূজা করতেন, ভক্তিযোগ। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এত সুন্দর প্রকাশ আর কোথায় পাবেন, যেটাকে নিয়ে স্বামীজী আধ্যাত্মিক দুনিয়ায় তোলপাড় করে দিলেন।

কিন্তু এই তিনজনের কি হল? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনজনেই তেমন কোন সাফল্য পেলেন না। লীলাপ্রসঙ্গ আর কথামৃতে ঠাকুরের প্রসঙ্গের সাথে জুড়ে তিনজনের নাম এসেছে। এই দুটো গ্রন্থে নাম এসেছে বলে আমরা জানি। কিন্তু সম্মান বলতে যেটা আমরা বুঝি, সেখানে পুরো অসফল। অন্য দিকে লাটু মহারাজ ঠাকুরের সেবা করলেন (কর্মযোগ), কত তপস্যা করলেন, সাধনা করলেন(জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ), আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় যুক্ত সবাই লাটু মহারাজকে পূজা করেন, সম্মান করেন। অন্য দিকে স্বামীজী চারটে যোগকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন, রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ভক্তিযোগ ধরে এগিয়ে গেলেন। আজ এনারাই আমাদের জীবনের আদর্শ।

আমাদের ভিতরে, সবার ভিতরের কথা না বললেও আমার ভিতরে কোথাও না কোথাও হৃদয়রাম, হাজরা, হলধারী আছেন। অত্যন্ত সাধারণ যুক্তিতর্ক, যে যুক্তি দিয়ে জগৎ মিথ্যা বলে মনে হয়, ভোগ ত্যাজ্য বলে মনে হয়; সেই যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মও ত্যাজ্য হয়ে যায়, সেই যুক্তি দিয়ে জগৎ যে স্বপ্নবৎ এই জ্ঞানটাও ত্যাজ্য হয়ে যায়। কিন্তু এনাদের বোঝার ক্ষমতা নেই, কে বোঝাবে এনাদের। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, প্রচণ্ড হিউমারাস আর খুব ইন্টেলিজেন্ট; হিউমারাস হওয়ার জন্য আপনাকে ইন্টেলিজেন্ট হওয়া খুব দরকার। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, মহারাজ এটাকে নিয়ে একদিন বলছেন, 'আচ্ছা মহারাজ যদি এর উল্টোটা হয়ে যায়? সর্পে যদি রজ্জু ভ্রম হয়? আর যদি এমন হয়ে যে, যেটা আসলে জগৎ সেখানে যে আমরা ব্রহ্ম চিন্তন করছি, এই ভুল যদি হয়'? এটা হাসির কথা। আপনি যেভাবে বলছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এর উল্টোটাও তো হতে পারে, এটাও তো হতে পারে যে, জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পভ্রম, এটাই যদি সর্পে রজ্জুভ্রম হয় তাহলে কি হবে? জিনিসটা

কিন্তু তা না, বেদান্ত যখন একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া হবে তখন এটা বোঝা যাবে। ওনারা এটা পরিষ্কার করে দেন, কেন ওটা ওইভাবে হবে না, এইভাবেই হবে। সমস্যা হল, একটা কথা ওখান থেকে শুনে নিল, আর-একটা কথা সেখান থেকে শুনে নিল, তারপর দুটোকে মিলিয়ে একটা হযবরল থিয়োরি দাঁড় করিয়ে দিল। রুডিয়ার্ড কিপ্লিংএর খুব বিখ্যাত বই 'জঙ্গল বুক' ওতে বান্দরলোক আছে, বান্দরলোকরা সব কিছুতে জ্ঞান দেবে। একটু ওখান থেকে নিয়ে, একটু সেখান থেকে নিয়ে বান্দরলোক জ্ঞান দিয়ে যাবে। আমরাও ওই রকম, বান্দরলোক। বানর থেকেই মানুষ হয়েছে, বানর থেকে হওয়ার জন্য ওদের স্বভাব মানুষের মধ্যেও থাকবে।

কিন্তু এখানে বিষয়টা হল পূজা নৈবেদ্য; নৈবেদ্যর বদলে আমি অর্চনা শব্দ ব্যবহার করছি, ইংরাজিতে রিচুয়াল (ritual)। হাজরা মশাই যে কথাটা বলছেন, এটা ওনার মুখে সাজে না। কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে যাঁরা ভক্ত তাঁদের দিনরাত এই কথা শুনতে হচ্ছে। আমার একজন খুব পরিচিত ভক্ত আছেন, অনেক কাজে আমাদের সাহায্য করেন; ওনাকে কে একজন বলেছেন, না কোন মহাত্মাজীকে বলতে শুনেছেন যে, এই যে বলিপ্রথা, এটা শাস্ত্র সম্মত নয়। সমস্যা হল, বিশেষ করে কলকাতাতে, কিছুটা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আর কিছু যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানবাদী, মার্ক্সবাদীরা পূজা অর্চনাকে নিয়ে প্রচুর আক্রমণ করেন, বিশেষ করে মূর্তিপূজা নিয়ে তো উঠতে-বসতে হিন্দুদের আক্রমণ করেন। আমি এখানে ইংরাজী রিচুয়াল শব্দটাই ব্যাবহার করব, আমাদের পরম্পরাগত শব্দ হল পূজা-অর্চনা। কিন্তু রিচুয়াল শব্দের মধ্যে সব কিছু, যেমন, পূজা, নৈবদ্য, অর্ঘ্য, মালা সব কিছু এসে যায়।

বেদের সময় যজ্ঞ করা হত, এটাও রিচুয়াল। রিচুয়ালের বিরুদ্ধে লড়াই হিন্দু ধর্মে আদিকাল থেকে চলে আসছে, এটা নূতন কিছু না। কঠোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ যদি শুনে থাকেন তাহলে সেখানেও আপনারা দেখবেন কিভাবে রিচুয়ালসকে নিন্দা করা হচ্ছে। বেদের কর্মকাণ্ড মানেই রিচুয়ালস, উপনিষদে কর্মকাণ্ডকে প্রচুর নিন্দা করা হয়েছে। অথচ আমরা হিন্দুরা বেদান্তী থেকে কর্মকাণ্ডী বেশি। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর কর্মকাণ্ডকে আদিকাণ্ড বলছে, ঠাকুরও বলছেন। কাজ সবাইকে করতে হয়। সেইজন্য ভগবান গীতাতে খুব সুন্দর ভাবে কর্মকে সমন্বয় করে দিলেন, যেটা মানুষকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। গীতাতে আমরা পাই *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, বেদের কর্মকাণ্ডকে নিন্দা করছেন। কিন্তু সেখান থেকে যখন বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিত হয়ে গেল, তাঁরাও বেদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলে গেলেন।

তবে মনে রাখতে হবে কর্মকাণ্ড একটা জিনিস, রিচুয়ালস আর-একটা জিনিস। আপনি বলতে পারেন এই রিচুয়ালের দরকার নেই। যেমন দূর্গাপূজায় আপনি বলতে পারেন, এই রিচুয়াল, সেই রিচুয়ালের দরকার নেই; কিন্তু আপনি যদি বলেন দূর্গাপূজাটাই বন্ধ করে দিতে, তাহলে কিন্তু গোলমাল লেগে যাবে। কেন গোলমাল লেগে যাবে? সেটাই আমরা এখানে আলোচনা করছি। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন্য ধর্ম কর্মকাণ্ডের বিরোধী; ভগবান বুদ্ধ তো ভয়ঙ্কর বিরোধী, যজ্ঞে যে হিংসা করা হত, সেটার তিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, এসব নিয়ে অনেক কাহিনীও আমরা পাই। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের দিক দিয়ে যদি দেখা হয়, ভক্তিশাস্ত্রে আমাদের খুব সুন্দর বই হল নারদীয় ভক্তিসূত্র। নারদীয় ভক্তিসূত্রে ভক্তির নামকরা আচার্যদের ভক্তির উপর বিভিন্ন মতগুলিকে বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা সূত্রে বলছেন, *পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ, পারাশর্যঃ* মানে পরাশর মুনির সন্তান, মানে ব্যাসদেবের কথা বলছেন। ব্যাসদেবের মতে ভক্তি হল পূজা আদিতে অনুরাগ, যেটা পরে রামানুজ নিলেন। তার মানে ভক্তিকে যেখানে পরিভাষিত করা হচ্ছে এই বলে, *সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা*, ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম, যেটা শেষ কথা; ঠাকুর যেটা অনেকবার বলছেন, জ্ঞান আর ভক্তি এক। জ্ঞান আর ভক্তি যদি এক হয় তখন সেই যে পরমপ্রেম, সেটার ব্যাপারে ব্যাসদেব ভক্তিকে বলছেন পূজা আদিতে অনুরাগ। পূজা আদিতে অনুরাগ, এখানে বৈধি ভক্তির কথা বলা হচ্ছে না, এখানে পূজা বলতে বলা হচ্ছে রোমে যাওয়া। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাক্ষাৎ দেখালেন, পূজা আদি করতে করতে তিনি কোথায় চলে গেলেন।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে আবার গর্গ মুনি ভক্তি সম্বন্ধে কি বলছেন, সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে। গর্গ ঋষি ভক্তির সংজ্ঞা দিচ্ছেন –*কথাদিষু ইতি গর্গঃ*। রামকথা, কৃষ্ণকথা, ভাগবত, চৈতন্যলীলা, এই যে গ্রন্থগুলো আছে, এগুলো পাঠ করা, শ্রবণ করা, এগুলোকে নিয়ে চিন্তন করা, এটাই ভক্তি। ভক্তিকে পরমপ্রেমস্বরূপ বলে সেখান থেকে চলে আসছেন পূজাদিতে, সেখান থেকে চলে আসছেন কথাবাচকে। সেইজন্য আমাদের হিন্দুদের মধ্যে কথাবাচন খুবই জরুরী। এত বড় বড় ঋষিরা যখন এই কথা বলে গেছেন, তাহলে তো মানতেই হবে এগুলো ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথে চলার জন্য খুবই দরকারী। কারণ, আমাদের এটা মেনে নিতে হয় যে আমরা উচ্চমানের সাধক নই, আমরা নিম্নমানেরও সাধক নই। আচার্য শঙ্কর উপনিষদের ভাষ্য লেখার সময় এই জিনিসটা অনেকবার বলছেন, যাঁরা শ্রেষ্ঠ শিষ্য, আচার্য একটা কথা বললেই তাঁরা জেনে যান সত্য কি, যেমন স্বামীজী আদি। যাঁরা অধম শিষ্য, তাঁরা উল্টো বোঝেন। যাঁরা মধ্যম শিষ্য, তাঁদের এটা বারবার শুনতে হয়। আমাদের মত লোকেদের জন্য তাই রিচুয়াল প্রচণ্ড জরুরী।

যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, আমি রিচুয়ালসে যাব না, পূজা অর্চনা করব না, আমার এগুলো লাগবে না; এই জিনিস কক্ষণ করতে যাবেন না, প্রচণ্ড ভাবে ফেঁসে যাবেন। পূজা অর্চনা যদি না করেন, পূজা অর্চনা না করে যদি ভাবেন সরাসরি অহং ব্রহ্মাস্মিতে ঢুকে যাবেন, আপনি কিন্তু একেবারে ফেঁসে যাবেন। এটা আমার মত না, শাস্ত্রসম্মত; আর ঠাকুরও অনেকবার এই কথা বলছেন। যার জন্য অনেক জায়গায় আপনি দেখবেন, কলেজে, স্কুলে, মিলিটারিতে অনেক রকম রিচুয়ালস পালন করা হয়। রিচুয়ালস করলে কি হয়, যে আদর্শকে জীবনে নিতে হবে, সেই আদর্শের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়া হয়। স্কুলে যে শুধু পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষা দেওয়া হয় তা তো না, জীবনের আদর্শ, নৈতিকতা, দেশের প্রতি ভালবাসা, সমাজের প্রতি কর্তব্য, সব কিছুরই শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে স্কুলে যে এসেম্বলী করা হয়, সেখানে যে জিনিসগুলো করা হয়, এগুলো সমস্ত রিচুয়ালস। ঠিক তেমনি আপনি যদি বলেন, আমি আত্মজ্ঞান পেতে চাই, তার জন্যও আপনাকে কিছু রিচুয়ালস পালন করতে হবে, রিচুয়ালস্ পালন না করলে হবে না। কেউ যদি বলে আমি সরাসরি ধ্যানে বসে যেতে চাই, তা কি কখন সম্ভব। জীবনে প্রথম ধনুক হাতে নিয়ে বলছেন, আমি উড়ন্ত পাখি মারতে শিখব, তা কি কখন হয়।

তার সঙ্গে একটা বিরাট মজার জিনিস আছে –অনিশ্চয়তা, uncertainity। Uncertainity মানে, হবে, হবে না; এই অবস্থা। এই অনিশ্চয়তা জিনিসটা মানুষের মনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। মনে অনেক দুশ্চিন্তা তৈরী করে; হবে কি হবে না, কি হবে বুঝতে পারছি না। অনেক সময় ভক্তরা আমাদের এসে বলে, মহারাজ আমাদের কি কিছু হবে? ভক্তরা দুটো বই পড়ে নিয়ে মনে করতে থাকেন, ঠাকুর এত কিছু, শ্রীশ্রীমা এত কিছু, স্বামীজী এত কিছু, আমারও কিছু হয়ত হবে। প্রথমেই আমি বলে দিই, কিচ্ছু হবে না। কি বলব এদের? মূল জিনিসটাই বুঝছেন না, বুঝতে চাইছেন না। আপনার উদ্দেশ্যটা পুরো ভুল, আপনার পথটা পুরো ভুল। কারণ আপনি যে জায়গাটায় যাচ্ছেন, ওই জায়গাটা uncertain। ফলে আপনার ভিতর স্ট্রেস তৈরী হবে। আমরাও যখন প্রথম জয়েন করেছিলাম, আমাদেরও মনে হত, কোথায় এসেছি, হবে কি হবে না, কি হবে কি জানি, সন্ন্যাস রক্ষা করতে পারব কিনা। বড়দের কাছে শুনতাম কৌপিন রক্ষা করতে পারলেই হবে। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে পুরো জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

কি পরিষ্কার হল? ঠাকুরের সঙ্গে তো আমি তো এখন জুড়ে গেছি। এখন ঠাকুরই যদি লাথি মারেন, তাতেও ঠাকুরকেই না ধরে রাখব। আগেকার দিনে হত, এখন আর দেখা যায় না, বাচ্চা দুষ্টুমি করলে মা পিটিয়ে দিত, মা যত মারত বাচ্চা তখন মাকে আরও জড়িয়ে ধরত। আমাদের এখন সেই অবস্থা। তোমার দ্বারা কিছু হবে না, তাতেও আমি ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে থাকব; কিছু হবে ঠিকই, তাতেও ঠাকুরের সাথে জুড়ে আছি। আমি ঠাকুরের মুরগী, তিনি আমাকে মুণ্ড দিয়ে কাটুন আর লেজ দিয়েই

কাটুন, সবটাই ঠাকুরের। আমি এখন ঠাকুরের মিছরির রুটি, তিনি আড় করে খাবেন, কি সোজা করে খাবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। যতক্ষণ এই ভাব পুরোদমে মনে না আসছে, ততক্ষণ আপনার জন্য রিচুয়ালস প্রচণ্ড জরুরী। রিচুয়ালস বলতে এখানে পূজা অর্চনা।

অনেক সময় লোকেরা পূজা অর্চনার আড়ম্বরে হারিয়ে যান, যেমন কলকাতার দূর্গাপূজায় হয়। কলকাতায় দূর্গাপূজা দেখার উদ্দেশ্যটা হল, পূজার এই চার-পাঁচদিন সেজেগুজে বড় বড় খাবারের দোকানে বিভিন্ন রকমের নূতন নূতন খাবারের আইটেম খাওয়া, আর ফুচকা, এগরোল, পিৎজা খাওয়া তো আছেই। কম বয়সের ছেলেমেয়েরা ফুচকা খেতে যাবে, রোল খেতে যাবে, ঝালমুরি খেতে যাবে। এদের মধ্যে কারুর হয়ত হঠাৎ একদিন মনে আসবে, আচ্ছা দূর্গাপূজা জিনিসটা কি। এখন হাজার হাজার লোক ফুচকা খেতে, এগরোল খেতে যাচ্ছে বলে দূর্গাপূজা তো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। কারণ দূর্গাপূজার আয়োজন করা হয় বলে দু-চারজন তৈরী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তা নাহলে তো পুরো সমাজটাই শেষ হয়ে যাবে। এখানে আমার উদ্দেশ্য সমাজ উদ্ধার না, উদ্দেশ্য হল আমার নিজের কি দরকার। আমার নিজের দরকার মনে করে আপনার মনে যদি ঘুণাক্ষরও এই প্রশ্ন আসে, মহারাজ আমার কি কিছু হবে? মহারাজ, ঠাকুরের কৃপা কি আমার উপর হবে? এই ধরণের প্রশ্ন যদি আপনার মনে আসে, তার মানে আপনি এখনও ভক্তির জন্য প্রস্তুত নন, জ্ঞানের জন্য আপনি প্রস্তুত নন। তাহলে কি করবেন? পূজা অর্চনা। পুরোদমে রিচুয়ালসে নামতে হবে। কতক্ষণ রিচুয়ালস করতে হবে? যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে যাচ্ছেন।

শুনেছি আগেকার দিনে কোন কোন ট্রাইবলদের মধ্যে নিয়ম ছিল, ছেলে আর মেয়ে যে যাকে বিয়ে করতে চাইছে, তাদের মেটিং রিচুয়াল হত। মেটিং রিচুয়ালে ছেলেটা কিছু রিচুয়াল করছে, মেয়েও এটা করছে; করতে করতে যখন বুঝে নিল এ আমার, আমি ওর, তারপর সমস্ত রিচুয়ালস বন্ধ হয়ে যায়। ভক্তিতে ঠিক তাই হয়। আপনি তো শুষ্ক রিচুয়ালস করবেন না। আপনি ঠাকুরের ভক্ত, আপনি ঠাকুরের কথামৃত পড়বেন, লীলাপ্রসঙ্গ পড়বেন, মায়ের কথা পড়বেন; দৈনিন্দিন জীবনে এগুলো রিচুয়ালসের মধ্যেই পড়বে। সেইজন্য আপনার পূজা অর্চনা কক্ষণ শুষ্ক হবে না, হতে পারবে না, কারণ ঠাকুর আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমরা হলাম মধ্যম অধিকারী, ফলে আমাদের দরকার খুব কম করে আধ ঘণ্টা রীতিমত পঞ্চোপাচারে পূজা করা, তার সঙ্গে স্তব পাঠ, তার সঙ্গে জপ করা; এগুলো সবই রিচুয়ালসের মধ্যে পড়ে। বিচার যাঁদের জন্য, তাঁরা প্রথম থেকেই জানেন যে, আমাদের জন্য বিচার।

যারা কুঁড়ে, যারা ঘোর তমোগুণী, তারাই এই রিচুয়ালসের নিন্দা করে, কারণ নিজেরা পরিশ্রম করতে হবে বলে করবে না। আমরা মঠ মিশনেও দেখি, সন্ন্যাসী হয়েছেন, একটু পড়াশোনা করে এসেছেন, তাতে কি হয় এখানে যে ধর্ম জীবন, ওই ধর্ম জীবনে যা কিছু করা দরকার সেখানে ওদের কুঁড়েমি আছে, কুঁড়েমির জন্য অনেকেই করতে চান না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী নূতন ব্রহ্মচারী যাঁরা আসছেন তাঁদের জন্য অনেক কিছু বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আপনি বিদেশ থেকে এসে থাকুন, বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসুন, পূজা অর্চনা আপনার জন্য কম্পালসারি। এনারা আবার বাইরেও পূজা করতে যান। ইউনিভার্সিটি থেকে কোন মহারাজ যদি আপনার সেন্টারে পূজা করার জন্য যান, জানবেন আপনাদের পূজারীর খুব কম করে হলে বিদেশের নামকরা ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা আছে। আপনারা জানতেও পারবেন না যে, এত বড় বড় সব ডিগ্রি নিয়ে আমাদের মহারাজরা পূজার ঘরে ঘণ্টা নাড়ছেন, আরতি করছেন। তাঁরা যদি করেন আপনি কেন করবেন না? পূজা অর্চনা হল ধর্ম পথে পা ফেলার প্রথম ধাপ।

আপনার মনে যদি কখন এই প্রশ্ন জাগে, যদি কোন সংশয় আসে –আমার কি কিছু হচ্ছে? আমার কি কিছু হবে? বুঝবেন, আপনি এখনও ভক্তির জন্য প্রস্তুত নন, বেদান্তের জন্য তো কোন মতেই প্রস্তুত নন, বেদান্ত এখন আপনার কাছে বিষতুল্য। আপনি এখন নিষ্ঠা সহকারে পূজা-অর্চনা করতে শুরু

করুন, পাঠ আদি করুন। ঠাকুরও এই কথাগুলো বারবার বলছেন। আমরা যে uncertainity নিয়ে আলোচনা করছি, রিচুয়ালস করলে মাথা পরিষ্কার থাকে –আমাকে এখন এটা এতক্ষণ করতে হবে, এটার পর ওটা করতে হবে; পূজা, পাঠ, অর্চনা, জপধ্যান, চিন্তন একটার পর একটা চলতেই থাকবে। কেন করছি? আমার মনকে শুদ্ধ করার জন্য। মন আমার শুদ্ধ হচ্ছে কিনা কি করে বুঝব? কেন মন শুদ্ধ হবে না, হতে বাধ্য; কেন শুদ্ধ হবে না, এতদিন ধরে যে এত কিছু করছি মন তো আমার শুদ্ধ হবেই। ফলে কি হয়? আধ্যাত্মিক জীবনে যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব আছে, এই ভাবটা কেটে যায়। অনিশ্চয়তার ভাব সরে গেলে আধ্যাত্মক জীবনে সুখ আসে, শান্তি আসে। আধ্যাত্মিক জীবনকে যদি মসৃন করতে চান, তাহলে আপনার জন্য পূজা-অর্চনা অত্যন্ত জরুরী। আমি পূজা-অর্চনা করি বলে অমুকে কি বলল, তমুকে কি বলল, তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। আপনারা দেখবেন কম্যুনিস্টরা ধর্মের বিরুদ্ধে এত কথা বলে কিন্তু ওরা কম্যুনিস্ট নেতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ওদের নিজস্ব ঘরানায় যখন স্যালুট মারে, তখন এটাও তো একটা রিচুয়াল হয়ে গেল। রিচুয়াল করলে কি হয়, মানুষ ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমির সাথে জুড়ে যায়। এখানে স্যালুটের মাধ্যমে যত কম্যুনিস্ট আছেন তাঁদের সাথে তিনি জুড়ে গেলেন। ঠিক তেমনি, আপনি যেমনি পূজা অর্চনা শুরু করলেন এরপর যত আচারি হিন্দু আছেন, নৈষ্ঠিক হিন্দু আছেন, তাঁদের সবার সাথে আপনি জুড়ে গেলেন।

আমার 'The Hindu Way' বইতে দেখবেন, সেখানে আছে being religious। এই যে আমি নিষ্ঠাবান হিন্দুর সঙ্গে জুড়ে গেলাম, এটা যে কি পরিমাণ সাংঘাতিক শক্তি দেয়, যাঁরা এটা করেন তাঁরা জানবেন। লোকেরা বোকা বোকা প্রশ্ন করে, আচ্ছা মহারাজ মেয়েরা কি গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে পারে? খুব পারে। মেয়েরা কি চণ্ডীপাঠ করতে পারে? পুরোদমে পারে। আমার এক পরিচিত ছেলে ডাক্তারী পড়ে, খুব ভাল ছেলে। ছেলেটির বাবা-মা হিন্দু ধর্মের কোন কিছুই পালন করতেন না। কিন্তু তাঁদের ছেলের হিন্দু ধর্মের এত জ্ঞান, আমিই ওর জ্ঞান দেখে আঁৎকে উঠি। এখন দেখি ছেলেকে দেখে ওর মা ধীরে ধীরে পূজা অর্চনাতে ঢুকছেন। ভদ্রমহিলা এখন নিত্য চণ্ডীপাঠ করেন, নিত্য পূজা করেন, রোজ আমাদের ক্লাশগুলো শোনেন। ছেলেটি একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা মহারাজ রাত্রিবেলা যদি আমিষ খেয়ে থাকি, তাহলে পরের দিন চণ্ডীপাঠ করা যাবে কি? আমিও মজা করে বললাম, চণ্ডীপাঠ তো শাক্তরা করে, শাক্তরা তো আচ্ছা করে ভাত মাংস খেয়ে তারপর সব করে, পাঠ করার পরে আবার খায়।

আর-একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, ছেলেটি মণিপুরী, থাকে আসামে, পড়াশোনা করছে তামিলনাড়ুতে। ছেলেটি হিন্দি বাংলা ইংরাজী অনেক ভাষাই বোঝে, আমাদের ক্লাশগুলো শোনে। বাচ্চা ছেলে সবে কলেজে পড়ছে। ছেলেটি বলছে, মহারাজ আপনার ক্লাশগুলো শুনে আমার জীবন পাল্টে গেল। কি রকম পাল্টালো? আমি এখন স্নান না করে মুখে জল পর্যন্ত দিই না। ওর মাধ্যমে একটি মুসলিম মেয়ে তামিলনাড়ু থেকে আমাদের ক্লাশগুলো শুনছে। মেয়েটি আবার আমার ক্লাশগুলো শুনে শুনে কুড়ি পাতার নোটস্ তৈরী করে আমাকে পাঠিয়েছে। কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে শুনছে ভেবে দেখুন, অথচ হিন্দু ধর্মের সে কিছু জানত না। মেয়েটির এখন একটাই স্বপ্ন –হিন্দু ধর্মকে ভাল করে জানতে হবে, শাস্ত্রগুলিকে ভাল ভাবে পড়ব। এই রিচুয়ালসগুলো করছে, দেখুন কিভাবে এরা একটা কম্যুনিটির সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে, একটা উচ্চ আদর্শের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে।

যারা হাজরার মত এই ধরণের কথা বলে –সব স্বপ্নবৎ, এগুলোর কোন দরকার নেই; সব ভুলভাল কথা। পুরো ইসলাম ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে রিচুয়ালসের উপরে। এই যে গোটা মুসলিম সমাজ দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ছে, এতে নিজেরও উন্নতি হচ্ছে, তার সাথে একটা কম্যুনিটির সঙ্গে জুড়ে থাকছে। যার জন্য আমরা দেখি, সমাজে যখন কোথাও বিবাহ আদি হয়, শ্রাদ্ধ হয়, তখনই সবাই একজোট হয়। একই জিনিস আমাদের ধর্মেও হয়। তার সঙ্গে কি হয়, আমরা যখন রিচুয়ালসগুলো পালন করি, তখন কিছু অর্থবহ অনুভূতির অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। যখন পূজা অর্চনা করছেন, তখন এই যে আমিত্ব, আমি

বোধ, এটা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আপনার জীবনে যদি কোন ধরণের অবসাদ থাকে, জীবনটাকে যদি নিঃসঙ্গ মনে হয়, আপনার এখন উচিৎ নিয়মতি ভাবে নিষ্ঠা সহকারে পূজা অর্চনা করা। আপনার আশেপাশে হয়ত কেউ আছে যার জীবনটা অবসাদগ্রস্থ, মনের মধ্যে একটা ধারণা নিয়ে ভাবছে আমার জীবনে কেউ নেই, আমার বড্ড একা একা লাগে; তাদেরকেও আপনি বলুন, শোন ভাই, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি আজ থেকে ভাল করে ঠাকুরের পূজা অর্চনা শুরু কর। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে একবার প্রণাম করে এলাম, নমো নমো করে পাঁচবার জপ করলাম, এভাবে না। যে ঠাকুরকে ভাল লাগে, শিব হোক, কালী হোক, দূর্গা হোক, কৃষ্ণ হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ হোক, বাড়িতে তাঁর ছবি লাগিয়ে রীতিমত দু-বেলা পুরোদমে পূজা অর্চনা করতে শুরু করুন। দেখবেন, কিছু দিনের মধ্যে আপনার জীবন পাল্টাতে শুরু করবে।

নূতন ব্রহ্মচারী হয়ে আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম। সেখানে একজন পরিচিত ছেলেকে দেখেছিলাম, কিভাবে তার জীবনটা এলেমেলো হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমি দেখেছিলাম ওনার কাছে এই রকম কেউ এলে উনি তাকে আশ্রমে রেখে দিতেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্র নয়, কিন্তু ওকে নিজের মত পড়াশোনা করতে বলতেন, আর কিছু কিছু রিচুয়ালস, ছোটখাটো কাজ, যেমন বাগান করা ইত্যাদি, এগুলো ওকে দিয়ে করাতেন। দেওঘরে আর-একটা ছেলে দেখেছিলাম, আমার থেকে ছোট ছিল, যার জীবনটা পুরো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দু-বছর নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলেকে ধরে তিনি এমন তৈরী করে দিলেন, যে পরে আর্মির বিরাট অফিসার হয়ে গেল। রিচুয়ালস মানুষকে অনেক দূর নিয়ে যায়। কাজ যদি করা হয়, কিছু কিছু সৃজনমূলক কাজ, এগুলো মানুষকে অনেক দূর নিয়ে যায়।

যে কোন ধর্ম দাঁড়িয়ে থাকে তার ফিলজফিতে, তার তত্ত্ব; এই ধর্মতত্ত্ব যখন actionএ নামে, তখন action দুই প্রকার হয়ে যায় –একটা রিচুয়ালস, ব্যাসদেবের মতে পূজা আদি আর দ্বিতীয় কথা-কাহিনী, যেটা গর্গ মুনির মত। আমাদের মত সাধারণ মানুষ বেদান্তের অহং ব্রহ্মাস্মির মত বড় বড় কথা বলতে পারবে না, চিন্তন করতে পারব না; যাঁরা একটু উচ্চস্তরের যায়নি, যাবে কিনা জানা নেই, এনাদের জন্য রিচুয়ালস। এর জন্য একটা কংক্রিট ফিলজফি অত্যন্ত জরুরী। একটা জিনিস মনে রাখবেন, যে কোন পূজা, যে কোন বিধি যদি একটা জায়গায় অনুষ্ঠিত হতে দেখেন, তার সঙ্গে যদি অন্য কোন জায়গাতেও অনুষ্ঠিত হতে থাকে, খুব কম করে একশ কিলোমিটার দূরেও যদি হয়, জানবেন কোথাও না কোথাও, কোন না কোন শাস্ত্রে ওই পূজার কথা বা বিধির কথা লেখা আছে।

আপনাদের যদি ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস থাকে, আমার এই ব্যাখ্যাতে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে জানবেন, পূজা অর্চনা এটাই আপনাকে বাঁচাবে। জপধ্যান আপনাকে বাঁচাবে না, কারণ জপধ্যান করার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, এই প্রস্তুতিটা হয় পূজা অর্চনার দ্বারা। আপনারা নিশ্চয় অনেকেই দীক্ষা নিয়েছেন, বিশেষ করে যাঁরা বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, আপনারা সবাই গুরুর নির্দেশ মত পূজা অর্চনা, জপধ্যান করুন। এমনকি ঠাকুর পরমহংস ওই অবস্থায়, স্বামী বিবেকানন্দ একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য, ওই পরমহংস অবস্থায় তাঁরাও পূজা করতেন, তবে রিচুয়ালিস্টিক পূজা করতেন না, নিজের মত করতেন। ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য পূজা অর্চনার থেকে আর ভাল কিছু হতে পারে না।

হাজরা বলছেন, এগুলো মনের ভুল। তুমি যে বেদান্তের কথা বলছ, সেটাও তো মনের ভুল। কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য; আর 'আমিই সেই'। আমরা আগে আগে অনেকবার বলেছি, এগুলো লোক ঠকানো ছাড়া কিছু না। বৌদ্ধরা সব নূতন নূতন শব্দ বার করে আনল শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ইত্যাদি; আর লোকজন সব ওগুলোকে নিয়ে লাফালাফি করে। যার জন্য আমাদের বেদান্তের কিছু শিক্ষকরাও নূতন নূতন শব্দ বার করে লোকেদের ধরার চেষ্টা করেন। এভাবে হয় না। আপনাকে আগে বুঝতে হবে, আপনি কি নিজের মঙ্গল চান, না গ্ল্যামার চান? আধ্যাত্মিক গ্ল্যামার একটা জিনিস

আর আধ্যাত্মিক উন্নতি আর-একটা জিনিস। আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি জীবনে চান, তাহলে ঠাকুর যেটা বলেছেন, সেটা আপনাকে শুনতে হবে, সেইভাবে আপনাকে চলতে হবে। আর আধ্যাত্মিক গ্ল্যামার যদি চান তাহলে আপনিও নেমে পড়ুন, যেমন ইউটিউবে, টিভিতে আমাদের সব বড় বড় গুরু-বাবাজীদের ছড়াছড়ি; আপনিও কিছুদিন পর এই রকম একজন গুরু হয়ে গ্ল্যামার নিয়ে মেতে থাকবেন –ওখানেই শুরু ওখানেই শেষ। ঠাকুর এগিয়ে এসেছেন, তিনি হাজরা আর নরেনকে দেখে জিজ্ঞাসা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –কি গো! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?

নরেন মজার লোক কিনা। হাজরার সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলছেন, যেটা আমরা বললাম, যাঁরা বৌদ্ধিক স্তরে উঁচু হন তাঁরা এই রকমই করেন। নরেন মজা করে বলছেন –

নরেন (সহাস্যে) –কত কি কথা হচ্ছে –'লম্বা' 'লম্বা' কথা। মজা করে বলছেন বটে, বাস্তবিক কিন্তু এগুলো লম্বা লম্বা কথা। এগুলো লম্বা লম্বা কথা ছাড়া কিছু না, স্বরূপ চিন্তন 'আমিই সেই' লম্বা লম্বা কথা ছাড়া কিছু না। ঠাকুর শুনে হাসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ। প্রশ্নই নেই যে হাজরা মশাই ঠাকুরের এই কথাকে নিতে পারবেন। স্বামীজী নিতে পারবেন, সেইজন্য স্বামীজী নিচ্ছেন।

এই যে স্বরূপ জ্ঞান, 'আমিই সেই' আর শুদ্ধাভক্তি দুটো এক। রাজযোগে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলা হয়েছে। রাজযোগের মূল উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ, আর চিত্তবৃত্তি নিরোধ থেকে যে জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানকে বলছেন স্বরূপে অবস্থান। নারদীয় ভক্তিতে বলছেন, পরমপ্রেম। পরমপ্রেম আর যোগে এটাই তফাত, পরমপ্রেম সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও না, আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল, মনকে কেন্দ্র করে সমাধি, জড় সমাধি। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল যেখানে, মন নেই, অর্থাৎ আমিত্ব নেই। কিন্তু ভক্তিতে বিশেষ করে পরমপ্রেম অবস্থায় যে সমাধি হয় এটা জড় সমাধি না; কারণ সেখানে ঈশ্বরের সত্তা আছেন। ঈশ্বর চৈতন্য, তাঁরই সত্তা আছে বলে ওটাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যাবে না। তার সাথে ওই বোধ, ঈশ্বরই আছেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, সেইজন্য একে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা যাবে না; কারণ ওই বোধটুকু থাকছে, বোধ করার জন্য মন থেকে গেছে। যোগপথে যখন আমরা স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করি, তখন এই 'আমি' থাকে না। তাতে দোষের কিছু না, কারণ 'আমি' বিহীন জ্ঞান হয় নির্বিকল্প সমাধিতে, 'আমি' সহিত জ্ঞান হয় সবিকল্প সমাধিতে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠতম আচার্য যাঁরা, শঙ্করাচার্য, ঠাকুর, স্বামীজী, এনারা যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যা হল, যাঁর নির্বিকল্প তাঁরই সবিকল্প। জ্ঞান মাধ্যমে যাঁকে জানছেন, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর রূপে দেখা দেন; দুটো এক। কিন্তু শুদ্ধাভক্তি, এটাকে নারদীয় ভক্তিতে পরিভাষিত করছেন –*সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*, কোন কামনা নেই সেখানে। একবার মনে করুন, চারিদিকে আপনি শুধু ঠাকুরের অস্তিত্ব দেখছেন, শুধু ঠাকুরই আছেন। একটা মাছ যেন সমুদ্রে খেলা করছে। শিব যেমন হাতে ডমুরু নিয়ে নৃত্য করেন। আপনিও যেন মনে মনে নৃত্য করছেন। ঠাকুর শিবের উদাহরণ দিয়ে এক জায়গায় বলছেন, এই তিনি সমাধিতে ডুবে থাকেন, আবার ওই সমাধি থেকে যখন নেমে আসেন তখন তিনি রামনাম করতে করতে নৃত্য করতে থাকেন।

যে চৈতন্যের সাথে আপনি শুদ্ধাভক্তির মাধ্যমে যেখানে এক হয়ে গেলেন, তখন তিনি যদি চান আপনাকে ওই জ্ঞানটা দিয়ে দিতে পারেন। তিনি হয়ত নাও দিতে পারেন, তাতে আপনার আর এখন কি আর আসে যায়, আপনি তো ওখানেই শেষ। বিষয়ীরা যেমন বিষয়ের আনন্দ পেলে আর কিছু চায় না, ঠিক তেমনি শুদ্ধাভক্তির মাধ্যমে, ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমে, যেখানে *ন তু কাময়মানা*, যে তাঁর সঙ্গে

এক হয়ে গেছেন; তখন মন তো ছেড়ে দিন, নিজের দেহ যে এত প্রিয় সেই দেহের বোধও চলে গেছে। রয়ে গেছে শুধু একটা –তুমি, তুমি, তুমি; তুমি ছাড়া আর কিছু নেই, আর সত্যি সত্যিই কিছু থাকে না। এটাই ভক্তির শেষ কথা; এটাই কিন্তু আবার জ্ঞানের শেষ কথা, যেখানে আমিত্বটা চলে গিয়ে থেকে যায় শুধু আত্মা। জ্ঞানী দেখেন আত্মাই আছেন, বাকি সব নাম আর রূপের খেলা; ভক্ত দেখেন তিনি এই সব কিছু হয়ে আছেন; সবটাই তাঁর লীলা। ওই অর্থে 'আমি' কোথাও থাকে না, যে অর্থে আমরা 'আমি' বুঝি। আর বস্তুর যে বিভেদ, ভাল-মন্দের যে বিভেদ; এটাও থাকে না। নরেন মজা করে বলছেন।

নরেন –"আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে"। এখানে হাজরা মশাইএর ক্ষমতা নেই যে, নরেন তাঁর সঙ্গে মজা করছেন, সেইজন্য তিনি এই কথা বলছেন। কিছু দিন আগেও এই নরেন ঠাকুরের নামে টিপ্পণি কাটতেন –উনি এখনও কালীঘরে যান। আজ সেই নরেন বলছেন, দে মা পাগল করে। **(মাস্টারের প্রতি) দেখুন, হ্যামিলটন্-এ পড়লুম –লিখছেন, "A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion"**। এমনি সাধারণ অজ্ঞ না, শিক্ষিত অজ্ঞ, পড়াশোনা করে আপনি বুঝলেন আমি আর এই কাঁচের ব্যবধান ভাঙতে পারছি না, তখন ধর্ম শুরু হয়। ধর্ম শুরু করার জন্য জানতে হয়, শাস্ত্রজ্ঞান খুব জরুরী। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলে ধর্মজীবন শুরু করা খুব মুশকিল, কারণ ওই ধর্ম যে কখন অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যাবে, কখন যে ওই অন্ধ বিশ্বাস ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে, যার পরিণাম রূপে কিভাবে আপনি নিজে নাশ হয়ে যাবেন এবং আরও দশজনকে নাশ করবেন টেরও পাবেন না। আজ চারিদিকে চোখ খোলা রেখে দেখুন, কান পেতে শুনুন; দেখবেন সোস্যাল মিডিয়াতে, টিভিতে কিভাবে ধর্মের ধ্বজাধারীরা গুরুজনদের নিন্দা করে যাচ্ছে, কিভাবে মহাপুরুষদের নিন্দা করে যাচ্ছে।

এই জায়গাটা খুব মজার। নরেন ইংলিশে বলছেন, ঠাকুর কিছু বুঝতে পারছেন না। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, নরেন যখন বলছে, নিশ্চয় ভাল কিছু বলছে। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –এর মানে কি গা?

এখন নূতন একটা হয়েছে, artificial intelligence (AI)। ঠাকুরের সামনে বললে, নরেনকে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করতেন, হ্যাঁগা নরেন, এই 'আই' (AI) মানে কি গা? নরেন বলতেন 'ওটা 'আই' না 'এ আই', আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স'। 'হ্যাঁ গা এটা কি জিনিস'? নরেন বোঝাতে যেতেন, আর সেটা শুনতে শুনতে ইন্টেলিজেন্স, সেখান থেকে মন, মন প্রতিবিম্বিত চৈতন্য; ও চৈতন্য, চৈতন্যের কথা, বলতে বলতে সমাধিতে চলে যেতেন। মাইক্রোস্কোপ দেখতে গিয়ে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যেত। এখানে এটা মজার জিনিস। নরেনের কথাগুলো শোনার ঠাকুরের খুব আগ্রহ ছিল, তবে কখন তাঁর মন সেখান থেকে সরে যাবে, কখন তিনি সমাধিতে চলে যাবেন বলা খুব মুশকিল। যাই হোক নরেন তাঁর কথাটা বাংলায় তর্জমা করে ঠাকুরকে বলছেন।

নরেন –ফিলসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমুর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়। শুনে ঠাকুর খুব খুশি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –Thank you! Thank you! (হাস্য) ঠাকুর কয়েকটা ইংরাজী শব্দ জানতেন, তার মধ্যে 'থ্যাঙ্ক ইউ' একটা। এর উল্টোটা 'ড্যাম্' শব্দটাও শিখেছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাসমাগমে হরিধ্বণি –নরেন্দ্রের কত গুণ

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অধিকাংশ লোকেরা বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন। **নরেন্দ্রেও বিদায় লইলেন**। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর একটা বর্ণনা করছেন, নিজেরা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাততালি দিয়ে হরিধ্বণি করিতেছেন। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, সন্ধ্যা হয়ে গেলে ঠাকুরের ছবি বা যে কোন দেবীদেবতা বা ঠাকুরদেবতাদের ছবির সামনে ধূপ ধুনো দেবেন, পারলে হাততালি দিয়ে হরিনাম করবেন। শাঁক যদি থাকে খুব জোর শাঁক বাজাবেন, অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যাতে শুনতে পায়। ঠাকুর, যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, কথায় কথায় যিনি সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, যিনি অবতার, তিনি আমাদের পথ দেখাতে এসেছেন ধর্মজীবন কিভাবে যাপন করতে হবে। মুসলমানরা কি সুন্দর সন্ধ্যে হলে নমাজ পড়ে। কিছুদিন আগে এখানে কাছেই একটা চশমার দোকানে গিয়েছিলাম, দোকানের মালিক আমাকে খুব ভালবাসে। দোকানে যেতেই নমাজের সময় হয়ে গেল, ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'স্বামীজী, পাঁচ মিনিট সময় দিন নমাজ পড়ে আসি'। আমি বললাম, 'আপনি অবশ্যই যান'। আপনারাও অবশ্যই করবেন। আপনাদের পরিচিত যত ভক্ত আছেন তাঁদেরকেও করত বলবেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন আর কোন কিছু না, এখন হরিনাম; সন্ধ্যা হয়েছে, এখন খণ্ডন ভব বন্ধন।

মাস্টারমশাই বলছেন, ঘরে যত ঠাকুর-দেবতাদের ছবি আছে, তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে তাঁদের নাম করে প্রণাম করছেন। আবার বলছেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান; ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম, বেদ-পুরাণ-তন্ত্র; গীতা-গায়ত্রী; শরণাগত, শরণাগত, নাহং, নাহং; তুঁহু, তুঁহু; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, ইত্যাদি। এইভাবে ঠাকুর বলে যাচ্ছেন। অন্যান্য ধর্মে যেমন একটা ছোট্ট বই, ওটাই তাদের সব। আমাদের তা নয়; ঋষিরা যে কথা বলে দিয়েছেন, এটাই শাস্ত্র। ঠাকুর যেমন বলছেন, বেদ-পুরাণ-তন্ত্র; বেদ মানে সমস্ত বেদ তার সাথে উপনিষদ, পুরাণ মানে আঠারোটি পুরাণ আর আঠারোটি উপপুরাণ, তন্ত্রে হাজার হাজার গ্রন্থ। যার জন্য যখনই কোন পূজার কথা আসে, ওই পূজা কোথাও না কোথাও ওই বইতে পাওয়া যাবে।

আপনি কোনটা অনুসরণ করবেন? যেটা আপনি আপনার পরম্পরাতে শিখেছেন, তা সে বাড়ির পরম্পরাতেই হোক বা গুরুর পরম্পরাতেই হোক। আমরা হিন্দু, আমরা কোন কিছুকে বাদ দিই না। যারা বলে, একমাত্র যারা নিরামিষ খায় তারাই ভগবানের কাছে যাবে, আমি হাতজোড় করে বলব, ঠাকুর, আমাকে ছেড়ে দিন, এই রকম নিরামিষাশী ভগবান আমার লাগবে না। যার মাংস খাওয়ার স্বভাব, যে ভগবান তাকে নরকে পাঠাবেন, আমার ওই ভগবান লাগবে না। এগুলো অন্যান্য ধর্মে যারা বলে, আমার মত যে মানবে না, তাকে নরকে যেতে হবে, তাদের জন্য ঠিক আছে। এটা আর যাই মত হোক, এটা হিন্দু মত নয়।

বলছেন, গীতা-গায়ত্রী। আমি আপনাদের আবার বলব, গীতাপাঠ রোজ অবশ্যই করবেন। গায়ত্রী মন্ত্রের জপ রোজ অবশ্যই করবেন, খুব কম করে বারোবার। গুরুর মন্ত্র যদি পেয়ে থাকেন, ওই মন্ত্রের জপ অবশ্যই করবেন এবং ওটাই করবেন। কিন্তু এখানে ঠাকুর যে গ্রন্থগুলোর নাম উচ্চারণ করে একটা অনুমোদন দিয়ে দিলেন, এগুলোর পাঠ, মন্ত্রজপ অবশ্যই করবেন। আর শরণাগত, শরণাগত; নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু, এটা হল শেষ কথা। আগে যা কিছু বলা হল, এর সমস্ত করে করে শেষে আসে শরণাগতি। প্রথমেই যদি শরণাগত হতে যান, সব এলেমেলো করে বসবেন।

নামের পর শ্রীরামকৃষ্ণ করজোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। যত যাই কাজ থাকুক, আপনি ট্রেনে যাচ্ছেন, বাসে যাচ্ছেন, সঙ্গে একটা হাল্কা চাদর বা উত্তরীয় রাখবেন। কোলের উপর চাদরটা রেখে ওর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জপ করুন। লোকে জানুক, লোকে দুটো বাজে কথা বলবে, বলুক। মদ খাওয়া, ড্রাগস নেওয়া, এগুলো থেকে তো অনেক ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল –এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। কথামৃতের পাঠক-পাঠিকারা নিত্যসিদ্ধ আর ঈশ্বরকোটি এই দুটি শব্দ অনেকবার শুনে থাকবেন।

এখানে আমরা স্বামীজীকে নিয়ে একটু আলোচনা করে নিয়ে মূল বিষয়ে প্রবেশ করব। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে স্বামীজীর জীবন এক অপূর্ব জীবন; ঠাকুরের যে সাধনা সেটাও অপূর্ব, তারপরের যে জীবন, সেই জীবনটাও অপূর্ব। স্বামীজীর জীবন সাধনার আগে পর্যন্ত অপূর্ব, মানে বিদেশ যাওয়ার আগে অপূর্ব জীবন। বিদেশে যাওয়ার পর একটা অন্য ধরণের জীবন। স্বামীজীকে নিয়ে প্রথম যে জিনিসটা আমরা পাই, যা আমরা বাচ্চা বয়স থেকে শুনে আসছি। একদিন ধ্যানের গভীরে ঠাকুরের মন চলে গেল সপ্তর্ষি মণ্ডলে, যেখানে দেবতারাও যেতে পারেন না। সপ্তর্ষি মণ্ডলে দেখলেন শ্মশ্রুপ্রলম্বিত এক ঋষি গভীরে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছেন। একটা ছোট্ট শিশু, যেটা ঠাকুর নিজে, সেই ঋষির গলা জড়িয়ে বলছেন, আমার সাথে চলুন। ঋষি চোখ উন্মিলিত করলেন, ধীর ও মিষ্টি কণ্ঠে বললেন, তুমি যাও, আমি আসছি। ঠাকুর বলছেন, পরে দেখলাম একটা আলো, এটা আধ্যাত্মিক আলো, সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নেমে কলকাতাতে যেখানে স্বামীজীর বাড়ি, যেখানে স্বামীজীর বাবা-ম-ভাইরা থাকেন, সেখানে নামল। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা মনে করি স্বামীজী সেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক ঋষি। সপ্তর্ষি মণ্ডল হল, ঋষিদের মধ্যে ধ্যানে যাঁরা উচ্চতম অবস্থায় আছেন, কিন্তু কোন কারণে ঈশ্বর তাঁদের নির্বিকল্পের জ্ঞান দিয়ে অখণ্ডে লীন হয়ে যেতে দিলেন না। কিংবা অখণ্ডের বোধ করিয়ে দিয়ে আবার দেহটা রেখে দিয়েছেন। ফলে তাঁরা একটাই কাজ করেন, তা হল ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান, নারদ যেমন করেন, বীণা সহকারে ঈশ্বরের নিত্য গান।

যাই হোক কলকাতায় স্বামীজীর জন্ম হল। অনেক পরে দেখছি, কলেজের এক বন্ধু স্বামীজীকে বলছেন, 'রাত্রে আমার ঘুম হয় না'। স্বামীজী বন্ধুকে বলছেন, 'কেন, ঘুমোবার সময় তুমি দেখ না যে, একটা আলোর মহাসমুদ্র তোমাকে ঘিরে নিয়েছে, আর তুমি সেই আলোর সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছ'? বন্ধুটি কিছু বুঝতে পারল না, বললেন, 'না তো'। পরে ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হতে শুরু হল। একদিন স্বামীজীকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কি রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে এই রকম আলো দেখতে পাও? নরেন চমকে উঠলেন, উনি কি করে এটা জানলেন? এটা সেই আলো, যে আলো যোগীরা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানাদির প্রচুর চেষ্টা করে কুণ্ডলীনি যদি তাঁদের জাগ্রত হয়, সেখান থেকে আলো, আরও আলো দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কুণ্ডলীনির খুব উচ্চ অবস্থায় যোগী যেটা দর্শন করেই, সেটাই স্বামীজীর কখন হচ্ছে? ঘুমের মধ্যে। আমার আপনার কাছে ঘুম একটা শরীরের বিশ্রামের জায়গা, মনের বিশ্রামের জায়গা; স্বামীজীর জন্য ওই জায়গাটা যোগীদের কাছে যেটা সবচেয়ে উচ্চাবস্থা, সেটাই একটা স্বাভাবিক স্থিতি। কারণ ঘুমেই আমরা স্বাভাবিক স্থিতিতে যাই, স্বামীজীর জন্য ওটাই স্বাভাবিক অবস্থা।

এই স্বামীজীকে নিয়েই এক আন্তর্জাতিক নামকরা ধর্মীয় সংস্থার একজন বক্তাকে শ্রোতাদের একজন প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মনে হয় স্বামীজীর জ্ঞান হয়েছিল'? বক্তা আবার স্বামীজীর মাছ খাওয়া নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা বলতে লাগলেন। যিনি ছাত্রবস্থায়, সাধনা শুরুই করেননি, তিনি রোজ রাত্রে যখন ঘুমোতে যান, আর ওই অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম সমাধির অবস্থা যাঁর, তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, ইনি জ্ঞানী কিনা। এর থেকে দেশের দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। বিদেশীরা এই ধরণের কথা বোঝেন না, তাঁরা এসব বললে তাও বোঝা যায়; ভারতবর্ষের লোকেরা যদি বলে, তখন একটাই জিনিস হয় —লজ্জায় মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। যাঁর এই উচ্চ অবস্থা, ঠাকুর যাঁকে দেখে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে স্তব করছেন, আপনি সেই নর-নারায়ণ ঋষির নরঋষি; আর তাঁকে নিয়ে কিনা লোকেরা প্রশ্ন করছে, স্বামীজীর জ্ঞান হয়েছিল কিনা।

আমাদের কাছে এখানে যেটা জরুরী, স্বামীজী কতটা উচ্চমানের পুরুষ, ওনার সঙ্গে রাখাল, ভবনাথের নামও আছে; আমাদের একজনকে নিলে সবাইকেই নেওয়া হবে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙবে। আপনি কলকাতায় বসে পরনিন্দা পরচর্চা করেন আর 'চলবে না', 'চলবে না' করেন। আপনি

হিমালয় যদি বেড়াতে যান, সেখানে গিয়ে কি করবেন? সঙ্গীদের সাথে পরনিন্দা পরচর্চাই করতে থাকবেন। দেশের অবস্থা খারাপ, সরকার খারাপ, অমুক পলিটিক্যাল পার্টি খারাপ, হিন্দু এটা কোন ধর্মই না, এগুলো নিয়েই আলোচনা করবেন। আমি নিজে দেখেছি, কলকাতা থেকে হিমালয়ে গিয়ে সেখানেও ঝগড়া করছে। সাধারণ জিনিস নিয়ে, খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে, গাড়ির ড্রাইভারদের সাথে, হোটেলের স্টাফেদের সাথে খিটিমিটি করেই যাবে। কেন? ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙবে। স্বামীজীও ঢেঁকি, সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নেমে এই জগতে এসেও তিনি কি করবেন? ধ্যান করবেন, ধ্যান ধ্যান খেলা করবেন; ঢেঁকি যেটা করে। আপনি এখানে যেটা করছেন, স্বর্গে গেলে সেটাই করবেন। ভাবুন, যদি আপনি আজ মারা যান, কোথায় যাবেন? ধরছি স্বর্গেই গেলেন, কি রামকৃষ্ণলোকে গেলেন, যেখানে ভক্তরা ইদানিং সবাই যেতে চাইছে। রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে আপনি কি করবেন? রামকৃষ্ণলোকে যদি পৌঁছে যান, তাহলে আপনি ওটাই করবেন, যেটা আপনি এখানে এখন করছেন। প্রথমে সেখানে গিয়ে আপনি অপেক্ষা করবেন, যাঁকে আপনি খুব ভালবাসতেন, যদি স্বামীকে/স্ত্রীকে ভালবাসেন, যদিও আজকাল পরস্পর দূরে থাকতে চায়; রামকৃষ্ণলোকে যদি সে-রকম কোন নদী থাকে, সেই নদীর পারে বসে ভাববেন, তুমি যে কবে আসবে। এলেই আবার সব শুরু হয়ে যাবে। সেখানেও তখন এই অভিযোগ, সেই অভিযোগ, এটা নেই, সেটা নেই; একই জিনিস করবেন, কিছুই পাল্টায় না। কারণ এই জগৎ, এই জীবন আর ওই জগৎ, ওই জীবন এক। যার আছে হেথা তার আছে সেথা। কঠোপনিষদেও এই একই মন্ত্র –*যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*, নূতন কিছু হবে না সেখানে, এখানে যা করবেন সেখানেও তাই করবেন। স্বামীজীও ধ্যান করছেন। খুঁজছেন, কোন যোগী, কোন গুরু তাঁকে শিখিয়ে দেবেন কি করে তাঁর ঈশ্বরদর্শন হবে। ঈশ্বরদর্শন তো ওনার রোজ রাত্তিরে হচ্ছে।

একটা মজার ঘটনা বলি। এক সময় আমি আমাদের কানপুর সেন্টারে ছিলাম। ওখানে কাজকর্ম কম ছিল। একবার আশ্রমের পাশে একটা মেলা বসেছিল। মেলা থেকে খাঁচা সমেত একটা টিয়া পাখি কিনে আনলাম। পাখিকে খাবার দিতে হবে। দানা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম, যতবার দানা দিতে যাই, টিয়া খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিছু বুঝতে পারছি না, জীবনে কখন পাখি পুষিনি। মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা ছেলেমানুষী খেয়াল এলো, একটা পাখি পুষতে হবে। পাখিটাকে কিছু খাওয়াতে পারছি না, ফল খাচ্ছে না, দানা খাচ্ছে না, কেবলই ঠোকরাতে আসে। আমাদের আশ্রমের একজন স্টাফ এলেন। উনি এসে পাখিটাকে দেখে আমাকে বললেন, 'মহারাজ আসলে এটা বুনো টিয়া পাখি। কোন ভাবে ধরা পড়ে গেছে, বিক্রি করে বেচারি দুটো টাকা পেল। এই পাখিটা কিন্তু কখন পোষ মানবে না'। আমি সঙ্গে সঙ্গে খাঁচাটা খুলে দিয়েছি। তখন আমার মাথায় এলো, আমরা সবাই এই রকম বুনো পাখি খাঁচায় বদ্ধ হয়ে আছি। এমনিতে পোষ মানলেও, একদিন দুদিন রেখে আমি পাখিটাকে ছেড়ে দিতাম।

স্বামীজী হলেন সেই খাঁচার বুনো পাখি। স্বাধীন হওয়ার জন্য ছটফট করছেন। কিন্তু ঠাকুর যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ওনাকে নিয়ে এসেছেন, সেই দায়ীত্ব পালন করতে হবে। সেটা হল সমাজকে শিক্ষা দেওয়া। পড়াশোনা করে যাচ্ছেন, দিনে দুটো চারটে বই শেষ করছেন। স্বামীজীর জীবনী যদি পড়েন, তাঁর পড়া লেখকদের নাম শুনলে মাথা ঘুরে যায়, কত লেখকের লেখা পড়েছেন। হিন্দু শাস্ত্রের কোন অঙ্গ নেই যেটা স্বামীজীর পড়া নেই। আবার ঠাকুরের কাছ থেকে সাধনার সমস্ত অঙ্গ জেনেছেন। আমরা আমাদের এই শিক্ষায়তনে সব শাস্ত্রই পড়াই, আমি অবাক হয়ে যাই, কবে স্বামীজী এত বই পড়লেন, পড়ে মন্থন করলেন আর হৃদয়ঙ্গম করলেন? ভাবুন, ওনাকেও লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কত সাধনা করতে হয়েছে । সাধনা করছেন নিজের মনের একটা শান্তির জন্য। শ্রীশ্রীমাও তো পঞ্চতপা করেছিলেন, মায়ের পঞ্চতপা করার কি দরকার, কারণ করলে লোকেরা জানবে শ্রীশ্রীমা তাঁকেও লোকশিক্ষার জন্য এই তপস্যা করতে হয়েছে, আর কিছুটা নিজের শান্তির জন্য তপস্যা করলেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলে কি করবে, ধান ভাঙবে। এনারা এখানে এসে কি আর করবেন, সেই ঈশ্বরেই মন দেবেন।

ফলে ঠাকুর এখানে এত সুন্দর বলছেন, এরা নিত্যসিদ্ধ; ঠাকুর যদি না বলতেন, আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হত না।

এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। বাড়ার ভাগ মানে, অতিরিক্ত, দরকার নেই। উপর থেকে একটু দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাড়ার ভাগ। আচার্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের ভূমিকা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই অবতারতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন –*স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া,* নিজের কোন প্রয়োজন নেই, এনারা যা কিছু করেন পুরোটাই মানুষের ভালর জন্য, মঙ্গলের জন্য করেন। স্বামীজীর মত মহাপুরুষরা যা কিছু করেন সবটাই মানুষের ভালর জন্য করেন। কারণ এনারা যদি তপস্যা না করেন, লোকে বলবে, ওনার তো কোন তপস্যাই নেই, ওনার কথা কি মানব।

স্বামীজী কি ভয়ঙ্কর তপস্যা করেছেন। নিজে বলছেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা গঙ্গাতে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী জপ করতেন। যখন রাজযোগ অনুশীলন করছেন, তখন দু মাস শুধু দুধ আর ফল খেয়ে থাকতেন। কত কঠোর সাধনা করেছেন। আমরা তো উপর উপর ভাসা ভাসা সব করি। এই যে বাড়ার ভাগ, এটা কেন? কারণ অবতার যখন আসেন, এই যে বলা হল *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া,* মানুষের ভালর জন্য; একা উনি আর কদিন করবেন, ভগবান বুদ্ধ ছাড়া দীর্ঘ দিন কেউ শরীর ধারণ করেননি। সেইজন্য কিছু সঙ্গীকে নিয়ে আসতে হয়, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিদের বা উচ্চমানের সিদ্ধপুরুষ যাঁরা, তাঁদের মত কয়েকজনকে অবতার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, যাতে অবতারের অন্তর্ধানের পর এনারা অবতারের অসমাপ্ত কাজ করে মানুষকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এনারা যেটা করেন সেটাই ঠাকুরের কাজ। ঠাকুরের কাজ মানে মানুষের মধ্যে ধর্মচর্চা করানো এবং অপরকে ধর্মজ্ঞান দেওয়া।

তাহলে এই লাইনটা কোথা পর্যন্ত টানবেন? শ্রীকৃষ্ণ এলেন, অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিলেন, ওখানেই কি শেষ? মহাভারতে আমরা দেখি, ভগবান পরে পরেও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি যাঁরা, তাঁরা অনেকদিন ধরে এই কাজ করেন। তাহলে ঠাকুরের যে ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্য আর শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে সতেরো জন্য; এনারা চলে গেলে কি ধর্মসংস্থাপনের কাজ থেমে যাবে? না, কাজ থেমে যায় না, এই কাজ খুব কম করে দুশো থেকে তিনশ বছর চলতে থাকে। কারণ একটা যুগ থেকে আর-একটা যুগে যেতে কম করে চারশ বছর লাগে। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর আসার পর সত্যযুগের শুরু। একশ বছর হয়েছে, আরও তিনশ বছর বাকি, তবেই সত্যযুগ আসবে, তার আগে আসবে না। কিন্তু এনারা তো চলে গেলে ধর্মসংস্থাপন কি করে হবে?

ব্যক্তিগত ভাবে আমি একটা মজার ঘটনা জানি, কখন-সখন বলি। শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমাদের দশম সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন। ওনার খুব ঘনিষ্ঠ সেবক ছিলেন হরলাল মহারাজ। শ্রীমৎ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ সেক্রেটারী ছিলেন। আমি হরলাল মহারাজের প্রচুর সঙ্গ করেছি, আমাকে খুব স্নেহ করতেন, অনেক গল্প ও ঘটনাদি বলতেন। তার মধ্যে এই মজার ঘটনাটাও ওনার কাছে শোনা। একদিন পুরনো প্রেসিডেন্ট কোয়ার্টারসে নিজের ঘরে পূজ্যপাদ প্রভু মহারাজ বসে আছেন। হরলাল মহারাজ প্রভু মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মহারাজ, আপনাকে কি আবার আসতে হবে'? মহারাজ অনেকক্ষণ চুপ ছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর বলছেন, 'ঠাকুর, মা, স্বামীজী যদি আসেন, আবার আসতে হবে'। হরলাল মহারাজের মুখে আমি শুনেছি। হরলাল মহারাজ কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলবেন। প্রভু মহারাজের মুখে হরলাল মহারাজ শুনেছেন, প্রভু মহারাজ কেন হরলাল মহারাজকে মিছিমিছি এই কথা বলতে যাবেন। কথাটা খুবই ইন্টারেস্টিং। উনি তখন মঠের দশম প্রেসিডেন্ট, মহারাজ শরীর রাখলেন ১৯৮৫ সালে; ঠাকুরের মহাসমাধির একশ বছর পরে। তখনকার যিনি প্রেসিডেন্ট, একশ বছরে হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি এই কথা বলছেন। তার মানে তিনি এসেছেনই ধর্মসংস্থাপনের কাজে। আর যেটা বললাম, এক্ষুণি তো অবতারের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। তাহলে কি প্রমাণ আছে যে, আপনি সেই কাজের জন্য আসেননি?

প্রভু মহারাজের জীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় জেনে থাকবেন যে, মহারাজ বাইচান্স রামকৃষ্ণ মিশনে এলেন, আবার শরীর খারাপের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে চলেও যেতে হল। কিন্তু দেখুন, তাঁরও একটা সময় চেতনা এলো যে, আমিও ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। কিন্তু তার আগে তিনি সাধনা করলেন, সাধনা করার পর জানলেন। স্বামীজীও কিন্তু সাধনার পর তিনি জানলেন যে, তিনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ আর এই কাজের জন্য তাঁর আসা। প্রথমের দিকে ঠাকুর স্বামীজীকে ছুঁয়ে একটা সমাধির অবস্থায় নিয়ে গিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন, যেখানে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী নিজে যদি এই কথাগুলো জানতে চান, তাঁকে সাধনা করে সেই অবস্থায় যেতে হবে। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি যদি সাধনা না করেন, আপনি কি করে জানবেন যে, আপনি ঠাকুরের কাজের জন্য এসেছেন কিনা? লোকেরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, জীবনের উদ্দেশ্য কি, জীবনের লক্ষ্য কি; সব বোকা বোকা কথা। স্বামীজী সাধনা না করা পর্যন্ত জানতে পারছিলেন না যে, তিনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ কি না, আর তাঁর এই মানবদেহ ধারণ এই কাজের জন্যই কি না। আমি প্রভু মহারাজের ঘটনা বললাম, যিনি ওই অবস্থায় গিয়ে জানতে পারলেন যেই তিনি একজন লীলাসঙ্গী। কারণ প্রথম জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, ছোটবেলা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এই ধরণের কোন কিছু নেই। তাহলে আপনার ক্ষেত্রে কি এটা extension, যদি লাইনটা লম্বা টানি? তাহলে এই সম্ভাবনা, আপনি ঠাকুরের কাজের জন্য, ঠাকুরের ভাবপ্রচারের জন্য চিহ্নিত? আপনি কি করে জানবেন? আমি আমার ব্যাপারে কি করে জানব? জানার কোন পথ নেই।

সেইজন্য আপনাকে সাধনা করতে হবে। যদি আপনি সাধনা করেন, পরিষ্কার বুঝতে পারবেন আপনি একজন সাধারণ সাধক, না কি স্বামীজীর ভাষায় মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ইদানিং কালে ছাগ বলি নিয়ে লোকেরা অনেক কথা বলে, এদের জন্য যত নোংরা বিশেষণ ব্যবহার করেন, ততটাই কম হবে। মা জগজ্জননী, তিনিই সব কিছু, তাঁর উদ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত, এই ‘বলিপ্রদত্ত’ কত উচ্চমানের শব্দ। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের যাঁরা সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য এসেছেন, তাঁদের জন্য, এমনকি নিজের শিষ্যদের জন্য বলছেন, আলাষিঙ্গা পেরুমল থেকে শুরু করে সবার জন্য বলছেন –জন্ম থেকে তোমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। কিন্তু কাজে নামলে তবে এটা বোঝা যাবে। কি প্রমাণ আছে যে, আপনি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত নন? আমি আপনার ব্যাপারে হ্যাঁ বলতে পারব না, আপনি আপনার এই ব্যাপারে না বলতে পারবেন না। এটা প্রমাণ করার জন্য এদিক হোক সেদিক হোক, আপনাকে সাধনা করতে হবে। সাধনা করলে আপনি জানতে পারবেন, আপনি জগজ্জননীর জন্য বলিপ্রদত্ত কিনা। আপনি জানতে পারবেন ঠাকুরের কাজের জন্য আপনি চিহ্নিত কিনা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের নামে উপমা দিচ্ছেন, কুটো বাঁধা। গ্রাম দেশে কোন ফলের গাছে নূতন ফল এলে, কোন ফলকে ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে যদি রেখে দেওয়া হয়, ওই ফলটাকে খড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত, এটাকে বলে কুটো বাঁধা। এই ফল কেউ গাছ থেকে পাড়বে না। ফল পাকলে ঠাকুরকে নিবেদন করা হবে। আপনি কি ঠাকুরের জন্য কুটো বাঁধা? এটা জানার জন্য আপনাকে সাধনা করতে হবে। আর সংসারে টুকটাক কি করছেন, এগুলোর কোন দাম নেই। স্বামীজী অনেক কিছু করেছিলেন, কিন্তু তাতে কি হল? এর সাথে সন্ন্যাসী হওয়া, গৃহস্থ হওয়া, পুরুষ হওয়া, নারী হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক একটা, ঠাকুরের প্রতি আপনার ভাব, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আপনার ভাব। ঈশ্বরকোটি আপনি নাও হতে পারেন, আর ঈশ্বরকোটি সব কাজ করেন, তা তো না। যেমন অবতার আছেন, নিত্যসিদ্ধ বা ঈশ্বরকোটি আছেন, আপনিও তেমনি একটু নিচে একজন সাধক রূপে আছেন। প্রভু মহারাজ তো কখন বলেননি যে, তিনি ঈশ্বরকোটি; আর ঈশ্বরকোটি নিয়ে ঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, তাতে তিনি নাও থাকতে পারেন। যদি আপনি যুক্তি দিয়ে চলেন, ঠাকুরকে যদি মানেন, তাহলে যে কথাগুলো বললাম, সবটাই যুক্তিপূর্ণ কথা।

প্রথম ধর্মসংস্থাপনার কাজ চারশ বছর পর্যন্ত চলে। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুর বেছে বেছে অনেক লোককে পাঠান, যাতে তাঁর ভাবটা চলতে থাকে। এর মধ্যে কারা আছেন, কে আছেন আমরা জানি না; এর মধ্যে আপনিও হতে পারেন, তা নাহলে কি আর ঠাকুরের কথামৃতের ব্যাখ্যা শুনতে বসতেন? সেইজন্য বক্তব্য একটাই, নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। আদাজল খেয়ে নেমে পড়ুন। শরীর ও মনকে শুদ্ধ করুন। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে, জপধ্যান করে, নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, হৃদয়টাকে আরও উদার বানিয়ে, শরীর ও মনকে একেবারে শুদ্ধ পবিত্র করে নিতে হবে, যাতে মনটা ঠিক দিশায় থাকে। ঠাকুরই তখন আপনাকে জানিয়ে দেবেন, আপনি ঠাকুরের কাজের জন্য এসেছেন কিনা। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব, এখনও, আজ থেকে পরেও শত শত এই রকম চিহ্নিত লোক আসতে থাকবেন, আসতে বাধ্য। একনাথজী রানাডের নাম আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন, যিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্র তৈরী করেছেন। কন্যাকুমারীতে এনারই প্রধান উদ্যোগে আমরা বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল পেয়েছি। কি সাংঘাতিক জীবন, আজকে ওই জীবন তাঁকে কোথায় নিয়ে চলে গেছে। চিহ্নিত লোক না হলে এভাবে এত বিশাল কাজ করা সম্ভবই না।

এই যে ঠাকুর তাঁর কয়েকজন ঈশ্বরকোটি অন্তরঙ্গদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। কিন্তু আমাদের জন্য সাধনা বাড়ার ভাগ না, সাধনা আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। যদি আপনি জানতে চান আপনি ঠাকুরের চিহ্নিত কিনা, তাহলে সাধনা ছাড়া আর কি কি গুণ দরকার? ঠাকুরের জীবন দেখলে এগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়। বর্ণনার ছলে ঠাকুর আমার জন্য আপনাদের জন্য, সবার জন্য বলে দিয়ে গেছেন –**দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার (গ্রাহ্য) করে না**। সবাইকে খুশি করার ভাব যদি আপনার থাকে, বুঝবেন আপনার কিছু গোলমাল আছে। যিনি ঠাকুরের চিহ্নিত তিনি জগতে কাউকে কেয়ার করবেন না, তাই বলে যে অসম্মান করবেন, একেবারেই তা না। কিন্তু এই যে লোকেরা বলে, আপনি কত ক্ষমতাবান, আমাকে একটু দেখবেন; তোমার ভালবাসা চাই; তোমার কাছ থেকে দুটো টাকা সাহায্য চাই; কখনই না। কেয়ার না করা মানে হয়, কারুর অপেক্ষা না রাখা। যিনি আপন তার সঙ্গেও মজা করবেন, আবার বিশেষ অবস্থায় সেই আপনকেও ধাক্কা মারতে ছাড়বেন না; কিন্তু তারা জানবে যে, আপনার উপর তারা নির্ভর করতে পারে।

ঠাকুর বর্ণনা করছেন –**আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল –কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে –তা চেয়েও দেখলে না**। আবার ঠাকুর মজা করে বলছেন –**আমারই অপেক্ষা রাখে না**। এটা নরেনের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসার কথা। বাবা অনেক সময় সন্তানের নামে এমন ধরণের কথা বলেন। মৌচাক থেকে যেমন মধু টপটপ করে পড়ে, এই একটি কথায় নরেনের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা টপটপ করে ঝরে পড়ছে। নরেন, রাখাল, লাটু, ভবনাথ এনারা সবাই ঠাকুরের আপনজন। শুধু আপনজনের সাথে এমন ব্যবহার হয়। পরে এই স্বামীজীই যখন বিদেশে ছিলেন বা অন্যান্য জায়গায় ছিলেন, সেই সময় তিনি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। এই খোলামেলা ব্যবহার শুধু আপনজনদের সাথে ছিল।

আবার যা জানে, তাও বলে না –পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। এটা আবার আর-একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। ঠাকুরের কাজের জন্য যিনি চিহ্নিত, কোন একটা গুণ তাঁর সাংঘাতিক থাকবে, যে গুণ তাঁকে সত্ত্বগুণী বানাবে। বিদ্যা বা সঙ্গীতচর্চা, কিছু একটা, যেটার মাধ্যমে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে পুরোদমে জুড়ে থাকবেন। হাভাতে লোক হওয়া চলবে না। প্রথম হল, ঠাকুর তাঁর জন্য সর্বস্ব, দ্বিতীয় জগৎ থেকে কোন কিছুর প্রত্যাশা থাকবে না, জগৎ থেকে উদাসীন, কিন্তু সবাই তাঁর আপন। বিদ্যা পুরোদমে থাকতে হবে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো থাকতেই হবে, তা নাহলে ঠাকুরের কাজ করবেন কি করে! শুধু ফুল তোলা, ঠাকুরকে সাজানো, নৈবেদ্য দিয়ে তো ঠাকুরের কাজ হবে না। আমরা এখানে সাধারণ সাধকের কথা আলোচনা করছি না, যাঁরা বিশেষ, মায়ের জন্য যাঁরা বলিপ্রদত্ত তাঁদের নিয়ে কথা বলছি।

মায়ামোহ নেই। –যেন কোন বন্ধন নেই। একটু কোন বন্ধন যদি এই ধরণের মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ব্যক্তির উপর আসে, ছটফট করে উনি ওই বন্ধন উপড়ে ফেলে দেবেন। ভাল করে দেখবেন, সমস্ত রকম বন্ধন উপড়ে ফেলার ক্ষমতা আপনার মধ্যে আছে কিনা। চিন্তা করে দেখুন, কারুর ভালবাসায় বেঁধে থাকতে চাইছেন কিনা। জগতের কারুর ভালবাসায় যদি বাঁধা হয়ে থাকতে চান, তাহলে আপনি কিন্তু মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত নন, আপনি তাহলে একজন সাধক; সাধনা করুন, সময় হলে সিদ্ধি হবে। এগুলো বলা হচ্ছে তাদের জন্য, যাঁরা ঈশ্বরকোটি, যাঁরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।

খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ –গাইতে-বাজাতে, লিখতে-পড়তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, –বলেছে বিয়ে করবে না। ঠাকুর, স্বামীজীর মত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ আমাদের স্তরে সম্ভব না। তাই যদি হত তাহলে তো আমরা ঠাকুরের সময়েই আসতাম। আমাদের একটু দাগ আছে, সোনাতে একটু খাদ মেশানো আছে; তার জন্য কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আবার মরণ-কামড় দিয়ে জগৎকে ধরে আছি, সেটাও যেন না হয়। আর জগৎ থেকে মার খেয়ে এগুলো থেকে আলাদা হয়ে গেছি, সেটাও না। আপনার ক্ষমতা আছে, জগৎ থেকে আপনি ইচ্ছে করলে সব অর্জন করতে পারেন, তারপরেও আপনি বলছেন, আমার লাগবে না। একটু জোর থাকলে তাকে আরও জোরালো করা যায়।

ব্যক্তিগত ভাবে নরেনকে নিয়ে বলছেন –**নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারী মিল –যেন স্ত্রী-পুরুষ। নরেন্দ্র বেশি আসে না। সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই**। আগে নরেনকে নিয়ে বললেন, আমারই অপেক্ষা রাখে না, এখন বলছেন, ও এলে আমি বিহ্বল হই। নরেন যে কি বিশাল আধার, ভাবা যায়! নরঋষি রূপে ঠাকুর তাঁর অর্চনা করছেন। এখানে যা বর্ণনা করছেন ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের এখানে কি করার আছে? আমাদের জন্য এটাই; এই গুণগুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখার পর দেখুন, আমার মধ্যে এর কি কি গুণ আছে, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনি ঠাকুরের বিশেষ কিনা, আপনিও মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত কিনা। এইটুকু জানার জন্য আপনাকে সাধনা করতে হবে, সাধনা করলে আপনি বুঝতে পারবেন। তাই বলে এখন বৃদ্ধাবস্থায় এসে, ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, কথা বলতে গলা কাঁপছে, আর এসে বলবেন, মহারাজ আমাকে ধ্যান শিখিয়ে দিন, তা কি কখন হয়। আপনি এখন হাততালি দিয়ে হরিনাম করুন, এই বয়সে কি আর ধ্যান হয়! নিজের খাওয়ার রুচি নেই, রুচি থাকলে হজম করার শক্তি নেই, আর এখন চাইছেন ধ্যান শিখবেন? আর যাই হোক, আপনি ঠাকুরের বিশেষ লোক নন। সাধনা করুন, ঠাকুরের কৃপা অবশ্যই পাবেন; এ-জন্মে না হলেও হয়ত পরের জন্মে ঠাকুর আপনাকে বিশেষ ভাবে তাঁর কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, যাদের বয়স কম, শরীরে জোর আছে, মনে তেজ আছে, এগুলো তাদের জন্য। এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয় এবং নূতন পরিচ্ছেদ শুরু।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

এর আগে পর্যন্ত **১৯শে** অগস্ট, **১৮৮৩** সালের কথা বর্ণনা চলছিল। শুরু হচ্ছে পরের দিন **২০শে** অগস্ট, **১৮৮৩** সালের ওই দিনের বর্ণনা।(পৃঃ ২৫৬)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাত ৭ট-৮টা হবে। ঠাকুরের নিজের খাটে মশারির ভিতর ধ্যান করছেন। জানিনা আমার এমনটা কেন হয়, এই ধরণের প্রসঙ্গ, ঠাকুরের ধ্যান করছেন, পড়লেই আমার খুব জোর হাসি পেয়ে যায়। যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, এত উপলব্ধি হয়ে গেছে, তাঁর আবার ধ্যান করা! রামচরিতমানসে তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –শ্রীরামচন্দ্র গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে গেছেন; তুলসীদাস বলছেন, যাঁর নিঃশ্বাস থেকে বেদ বেরিয়েছে, তিনি এসেছেন গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে, এর থেকে আশ্চর্যের আর কি হতে পারে। ঠাকুর সেই পূর্ণব্রহ্ম, যাঁকে সবাই ধ্যান

করছেন, তিনি এখন মশারির ভিতর ধ্যান করছেন, এর থেকে বেশি হাসির কি আছে। তবে লোকমর্যাদার জন্য, লোকশিক্ষার জন্য এগুলোও করতে হয়।

আগের দিন ঠাকুর বলছিলেন হৃদয়ের জন্য তাঁর মন খুব খারাপ, দেশে হৃদয়ের বড় অসুখ। হৃদয় ঠাকুরের অনেক সেবা করেছিলেন। মাস্টারমশাই বলছেন, **তাই একজন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যের হাতে আজ দশটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।** 'একজন ভক্ত', এখানে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মাস্টারমশাই নিজেকে এখানে প্রচ্ছন্ন রাখছেন। হৃদয় ঠাকুরের অনেক সেবা করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেবা করে করে ঠাকুরের উপর তার একটা অধিকার বোধ জন্মেছিল। অধিকার বোধে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের মহারাজদের আমি দেখেছি, ভক্তদের সাথে একটু কথা বললেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা সমাজে যেমন করে, এখানেও সেটা লাগাতে যাবে; অধিকার বোধ এসে গেছে কিনা। মাস্টারমশাইর সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুও এসেছেন। ঠাকুরের মশারি তুলে দেওয়া হল। ঠাকুর বড় খাট থেকে নেমে ছোট খাটে উঠে বসেছেন এবং কথা বলতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –মশারির ভিতর ধ্যান করছিলাম। ভাবলাম কেবল একটা রূপ কল্পনা বই তো না, তাই ভাল লাগল না। তিনি দপ্ করে দেখিয়ে দেন তো হয়। আবার মনে করলাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি। এখানে দুটো তিনটে জরুরী কথা বলার আছে।

ধ্যানের প্রসঙ্গে আমরা কেনোপনিষদের ক্লাশে এবং মায়ের কথা ক্লাশে খুব বিস্তারে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা অত বিস্তারে যাব না। সাধন-ভজনের অর্থ, গুরু আপনাকে আপনার যিনি ইষ্ট, তাঁর কথা বলে দেবেন, ইষ্টের রূপ দেখিয়ে দেবেন, ইষ্টের মন্ত্র বলে দেবেন। কিভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হবে, গুরু তাঁর নির্দেশাবলীতে দেখিয়ে দেবেন। আর ইষ্টের যে রূপ, যে রূপের উপর আপনি ধ্যান করবেন, কোথায় ধ্যান করবেন, কিভাবে ধ্যান করবেন, এটাও গুরু আপনাকে বলে দেবেন। যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা অবশ্যই এগুলো জানেন। আপনাকে একটা ছবি দেখিয়ে বলবেন, এই রূপের ধ্যান করবে। ছবির ধ্যান করতে বলেন না, বলেন এই রূপের ধ্যান করবে। তাঁর মানে যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁদের ঠাকুরের উপর ধ্যান করতে বলা হয়, ঠাকুরের ছবির উপর না। ছবিটা একটা প্রতীক, প্রতীক ছবি না।

স্বামীজী ভক্তিযোগে এক জায়গায় প্রতীক ও প্রতিমা নিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, সেখানে তিনি বলছেন, যেমন ওঁ একটা প্রতীক, অন্যান্য অনেক প্রতীকও থাকে। আর প্রতিমা হল বিগ্রহ, যেমন বেলুড় মঠের গর্ভগৃহে ঠাকুরের বিগ্রহ রয়েছে। প্রত্যেক হিন্দুরা এই জিনিসটা জানে যে, ইনি ভগবান নন, কিন্তু ইনি সেই ভগবানের প্রতীক, যে প্রতীককে আলম্বন করে আমাকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। মুসলমানরা এবং খ্রীশ্চানরা হিন্দুদের বলে, এরা পৌত্তলিক। অথচ নিজেরা চারিদিকে কি করে বেড়াচ্ছে? সারা ভারত ঘুরে দেখুন কত জায়গায় মাজার দেখতে পাবেন। আমাদের বেলুড় মঠের পাশেই একটা দরগা না কি একটা বানিয়ে রেখেছে। স্বামীজী ওখানে পরিষ্কার বলছেন, সেখানে গিয়ে সব মুসলমানরা পূজা করবে। একদিকে বলে আমরা পৌত্তলিক না, আমরা মূর্তিপূজা করি না। কিন্তু কবরস্থানে গিয়ে সেখানে ফুল ধূপ আদি দিয়ে পূজা চড়াবে।

এই যে রূপের ধ্যান করা হচ্ছে এটা কল্পনা; ঠিক কথা। কিন্তু এই কল্পনার উদ্দেশ্য হল যেটা আসল সত্য, সেই সত্যে আপনাকে নিয়ে যাওয়া। তার মানে ওখানেই থেমে যাওয়াটা আপনার উদ্দেশ্য নয়। যখন আপনি কোন মন্দিরে যাচ্ছেন, তা কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরেই যান, কালীঘাটেই যান আর দক্ষিণেশ্বরেই যান; সেখানে গিয়ে আপনি যে পূজা-অর্চনা করছেন, ওই যে ভগবতীর মূর্তি বা ওই যে শিবলিঙ্গ, সেখানে আপনি সেই বিগ্রহ বা লিঙ্গের পূজা করছেন না; তিনি যেটার প্রতীক, পূজা তাঁর করা হচ্ছে। হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই এই জিনিসটাকে পরিষ্কার জানে, সেইজন্য কোন পূজাই হিন্দুদের কাছে সমস্যার না। যারা হিন্দুদের নিন্দা করে, এটা তাদের সমস্যা। ঠিক তেমনি যখন ধ্যান করা হয়,

আসলে কি হয় দেখুন; জপ করতে করতে মনটা একাগ্র হয়। ধ্যান না হলে সিদ্ধি হয় না। জপাৎ সিদ্ধি এটা আমাদের পরম্পরাগত কথা, শ্রীশ্রীমাও জপাৎ সিদ্ধির কথা বলেছেন। জপ করতে করতে কি হয়, মনটা একাগ্র হয়। কিন্তু মনের এই একাগ্রতা অনেকদিন ধরে লক্ষ লক্ষ জপ করলে হয়, এমনি এমনি হয় না। প্রচুর জপ না করে সরাসারি যেমনি ধ্যান করতে যাবেন, তখন বাইরেও অন্ধকার দেখবেন, ভিতরেও অন্ধকার দেখবেন। কারণ লোকেরা সাধারণত ঘরের লাইট নিবিয়ে ধ্যান করে, সেইজন্য বাইরেও অন্ধকার দেখে, ভিতরেও অন্ধকার দেখে।

ঠকুর বলছেন, কেবল একটা রূপ কল্পনা বই তো না –ধ্যানে কি হয়, আমরা যে একটা রূপ কল্পনা করি সেই রূপটাকে শুধু কল্পনা করে যাওয়া; সমস্ত বৃত্তিকে এই একটি রূপের বৃত্তিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে যেতে হবে। শুরুটা এখান থেকে করতে হয়। ঠাকুর যে অবস্থায় চলে গেছেন সেখানে এগুলো সব অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জন্য রূপ কল্পনাটা অত্যন্ত জরুরী। সেখান থেকে করতে করতে মন যখন একাগ্র হয়, তখন ঈশ্বরের কৃপায়, যাঁর ধ্যান করছেন তাঁর কৃপায় একদিন তিনি দপ্ করে তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়ে দেবেন, যে রূপের আপনি কল্পনা করছিলেন সেটাই এখন বাস্তবে দেখবেন। যেমন আমাদের অনেক সময় হয়, আমি কারুর কথা ভাবছি, হঠাত দেখি সে নিজেই আমার সামনে এসে হাজির হয়ে গেল; আমরা বলি, আরে, আমি তো তোমার কথাই ভাবছিলাম। অনেক সময় অনেকে বলেন যে, আমার বাবা-মা-ই আমার ভগবান। বাবা-মা কখনই ভগবান না। বাবা-মার যতই আপনি ধ্যান করুন, দপ্ করে আপনার বাবা-মা আপনার ধ্যানের গভীরে কোন দিন তাঁদের জ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়ে দেবেন না। এগুলো ইমোশানাল, ছেলেমানুষী কথা, এসব কথার কোন দাম নেই।

প্রথমটা বলছেন সাধারণ সাধক যাঁরা রূপ কল্পনা করেন। সেখান থেকে বলছেন, শেষ যেটা হয় –দপ্ করে দেখিয়ে দেওয়া। বাস্তবে আপনি চোখ বন্ধ করে হৃদয়ের ভিতরে ভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ দেখবেন। বাইরে যদি দেখেন, তাহলে বুঝবেন মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। বাইরে ঠাকুরকে ঘুরে বেড়াতে দেখাটা মনের ভুল। এই ধরণের দর্শন অনেক উচ্চ অবস্থায় হয়।

সেখান থেকে একেবারে শেষে অদ্বৈতের শেষ কথা বলছেন –কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি। কারণ পুরো ধ্যান জিনিসটা হল মনের। নিজেকে যিনি শুদ্ধ আত্মা রূপে জেনে গেছেন, তিনি কার ধ্যান করবেন, কার উপর ধ্যান করবেন। ছোট্ট তিনটি কথাতে তিনটি অবস্থার কথা বলে দিলেন। প্রথমটা সাধারণ সাধকের কথা, দ্বিতীয় কথা যোগশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে বলছেন। তৃতীয় অদ্বৈতের শেষ কথা। এটাই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য, ছোট ছোট এক লাইন, দু-লাইনের কথা; দেখে মনে হবে এমন কিছু কথা না। কিন্তু যেমনি এর ভিতরে ঢুকবেন দেখবেন, পুরো আধ্যাত্মিক যে শাস্ত্র হতে পারে, তার সার আধখানা বাক্যে সমাহিত।

মাস্টার –আজ্ঞে হাঁ। আপনি বলেছেন যে, তিনিই জীব, জগৎ সব হয়েছেন –যে ধ্যান করছে সেও তিনি। আপনি প্রত্যক্ষ জেনে গেছেন একমাত্র তিনিই আছেন, যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন; তখন আর ধ্যান করে কি হবে। ধ্যান তখন করা হয়, যখন আপনি বলছেন, এটা হল ঈশ্বর আর এটা জগৎ, দুটো আলাদা; আমি জগৎকে একপাশে সরিয়ে রেখে একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা করব। কিন্তু আপনি যখন জেনে নিলেন, দেখে নিলেন, সবটাই তিনি হয়েছেন, তখন আপনি কার ধ্যান করবেন, কিসের ধ্যান করবেন। আপনি প্রথম হিমালয় যাচ্ছেন। যেতে যেতে আপনি বারবার আপনার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করছেন, হিমালয় কখন আসবে। হরিদ্বার পৌঁছে গেলেন। ঋষিকেশ থেকে আপনি এগোতে শুরু করলেন, এগোতে এগোতে আপনি উত্তরকাশীর দিকে চলে গেলেন। এখন আপনি হিমালয়ের মধ্যেই আছেন, এখন সবটাই হিমালয়। ঠিক এই ভাবে যিনি ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন, তখন তিনি কার ধ্যান করবেন, কিসেরই বা ধ্যান করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আর তিনি না করালে তো আর হবে না। তিনি ধ্যান করালে তবেই ধ্যান হবে। তুমি কি বল?

'তিনি' বলতে এখানে অন্তর্যামীকে বলছেন। একজন কেউ উপরে একটা সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে আছেন, আর তিনি আপনার মনকে বলছেন, ওহে! আজ বেলুড় মঠে এসো। এভাবে হয় না। বুঝতে হয় যে এখানে অন্তর্যামীর কথা বলা হচ্ছে। অন্তর্যামীর বিরাট বড় সমস্যা। অন্তর্যামীর বাইরে আপনি পুরো একটা অজ্ঞানের আবরণ তৈরী করে রেখেছেন, উপনিষদ যেটাকে হৃদয়গ্রন্থি বলছেন। হৃদয়গ্রন্থিতে আপনার ওই চাহিদা আছে, সেই চাহিদা আছে। অন্তর্যামী এখন কি করবেন? একটু ওকেও সন্তুষ্ট রাখেন, একটু একেও সন্তুষ্ট রাখেন। যদি সন্তুষ্ট না রাখেন, মাথাটা বিগড়ে যাবে। যাদের মধ্যে নিষ্ঠা আছে, অন্তর্যামী তাকে দিয়ে ধ্যানও করিয়ে নেন।

মাস্টার –আজ্ঞে, আপনার ভিতর 'আমি' নাই তাই এইরূপ হচ্ছে। যেখানে 'আমি' নাই সেখানে এরূপই অবস্থা। এগুলো বলে দিলে কি হয়, সবাই এই রকমই বলতে শুরু করে দেবে। ইদানিং খুব পপুলার হয়ে গেছে, লোকেরা সোহম্ সোহম্ বলে বেড়াচ্ছে। কদিন আগে একজন মহিলা শিক্ষা দিচ্ছেন, সেখানে হিন্দিতে একটা বিজ্ঞাপন লেখা –সবিকল্প সমাধি সে নির্বিকল্প সমাধি ঔর; তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন সবিকল্প সমাধি থেকে কিভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে যাওয়া যায়। আমি ছবি দেখে জয় মা জয় মা বলে প্রণাম করলাম। লোকেদের বোকা বানাও নিজের টাকা কামাও। কেউ তো আর বিনা পয়সায় শিক্ষা দেবে না, কটি টাকা খরচা করে লোকেরা সবিকল্প সমাধি থেকে নির্বিকল্প সমাধিতে যাওয়ার শিক্ষা পাচ্ছে। লজ্জাও পায়, হাসিও পায়। সেইজন্য ঠাকুর সাবধান করে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কিন্তু "আমি দাস, সেবক" এটুকু থাকা ভাল। যেখানে "আমি সব কাজ করছি" বোধ, সেখানে "আমি দাস, তুমি প্রভু" এ-ভাব খুব ভাল। খাওয়ার সময় বোধ আছে আপনি খাচ্ছেন, ভোগের সময় বোধ আছে আপনি ভোগ করছেন, আর ওই দিকে 'সোহম্' 'সোহম্'! ভাবতে গেলেই অবাক লাগে; মানুষ কতটা প্রতারক হলে, কতটা নিচে নামলে এই ধরণের সব কথা বলতে পারে। নিজের বেলায় আঁটিশুটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। নিজের বেলায় সবটাই চাই, ভগবানের নামে সোহম্। ঠাকুর তাই বলছেন –**সবই করা যাচ্ছে, সেব্য-সেবক ভাবে থাকাই ভাল**। এগুলো যে কত প্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষা আমরা বুঝতেও পারি না। অদ্বৈত, বেদান্ত, সোহম্ এগুলো আজ ফ্যাশান হয়ে গেছে।

আমরা ২০শে অগস্ট, ১৮৮৩ সালের বর্ণনায় আছি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন; ঠাকুর ভাব নিয়ে আলোচনা করছেন। 'আমি দাস' এই ভাবটাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করছেন। মণিমোহন, যিনি সর্বদা পরব্রহ্ম নিয়ে চিন্তা করেন; ঠাকুর তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। এখানে একটা দুটো কথা বলার আছে। আপনারা নিশ্চয় সবাই কথামৃত পড়েন আর নিজের মত বুঝে নেওয়ার চেষ্টাও করেন। আমরা যখন আলোচনা করছি তখন অবশ্যই দুটি কথা নিজের তরফ থেকে বলব। ভারতকে বলা হয় ভারত এক আধ্যাত্মিক দেশ, এখানে কত সাধু-সন্ন্যাসী। অনেক সময় কথার কথা হিসাবে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, জপধ্যান করতে হয়, আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে হয়। আমাদেরও অনেক সময় জানতে ইচ্ছে করে জিনিসটা কি। জিনিসটা কি যখন জানতে ইচ্ছে হয় তখন এটাও জানতে ইচ্ছে হয়, শেষ কথা কি। তৃতীয় হল, অনেক সময় কোন মহাপুরুষকে দেখে ইচ্ছে করে, আমাকেও এনার মত একজন হতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে বলি, অল্প বয়স থেকে আমি মহারাজদের জানতাম, সাধু-সন্ন্যাসীদের জানতাম। দেওঘর বিদ্যাপীঠে স্বামী গোপেশানন্দজী ছিলেন, সৌরীন মহারাজ যাঁর ডাকনাম, ওনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগত। মহারাজকে দেখে কেবলই আমার মনে হত, বড় হয়ে আমাকে এনার মত হতে হবে। অনেকেরই এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা হয়। অনেক সময় এটাই ছেলেমানুষী হয়ে যায় আবার অনেক সময়

জিনিসটা সিরিয়াস হয়ে যায়। আপনি যখন একজনকে দেখে বলছেন, আমিও এনার মত হতে চাই, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি যেটার উপলব্ধি করে আজকে এই অবস্থায় এসেছেন সেটা আপনি জানতে চাইবেন বা তিনি নিজে থেকেই বলবেন।

ধর্মপথে এসে আপনি যদি বৈষ্ণবদের মতে চলেন সেখানে তাঁরা এক রকম কথা বলবেন, শাক্তরা অন্য রকম কথা বলবেন, শৈবরা আবার আর-এক ধরণের কথা বলবেন। কিন্তু যাঁরা বেদান্তবাদী, জ্ঞানমার্গের যাঁরা, তাঁরা ব্রহ্ম, আত্মা বলবেন; আর বলবেন তোমার ভিতর যে সত্য সেটাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কি? এই জগতে যা কিছু দেখছি, মনের সংসার, মনের সঙ্গে বুদ্ধি, মনের সঙ্গে যে আমিত্বের ভাব আর মন; এগুলো সবটাই ত্রিগুণাত্মিকা –অর্থাৎ সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে মিলে। এটা আলাদা একটা বিরাট বড় বিষয়। রাজযোগে এর উপর বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে, যে কোন বস্তু যদি পাথরের মত পড়ে থাকে, এই পড়ে থাকার ভাব, এটাকেই তমোগুণ বলা হয়। যেটা চলে তাকে রজোগুণ বলা হয়, যেটা স্থৈর্য, সাম্য, সেটাকে সত্ত্বগুণ বলা হয়। সংসারে এমন কোন কিছু নেই যার মধ্যে এই তিনটে গুণ নেই। আমাদের মনের জগতে যে চিন্তা-ভাবনা চলে, এর মধ্যেও তিনটে গুণের খেলা চলে। যখন কারুর উপর খুব রাগ হয়, ইচ্ছে হয় তাকে শেষ করে দিই, এটা হয় তমোগুণের জন্য। কখন মনে হয় সবাইকে আমি দাবিয়ে রাখব, এটা হয় রজোগুণের জন্য। আবার কেউ কোন দোষ করার পর বলছি, দোষ করে ফেলেছে কি আর করা যাবে, এই ভাব আসে সত্ত্বগুণের জন্য। যেখানেই এই তিনটে গুণের খেলা চলে, এটাকেই বলা হয় প্রকৃতির এলাকা। যদিও এই বিষয়টা বিরাট, এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তবে এর আগে আগে এই বিষয়ের উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি।

এখন সমস্যা হল, এর বাইরেও কিছু আছে কিনা আমরা জানিনা। অনেক সময় লোকেরা বলে, God is energy, কিন্তু এনার্জি জিনিসটা চলছে, যেমন আমরা ইলেক্ট্রিসিটিতে দেখি, তার মানে এটা রজোগুণ হয়ে গেল। সেইজন্য ঈশ্বর কখন এনার্জি হতে পারেন না বা বলা যেতে পারে এনার্জি কখন শেষ কথা হতে পারে না। সত্ত্ব, রজো ও তমোর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, আজকে যে অবস্থায় আছে, আগামীকাল এই অবস্থাটা পাল্টে যেতে পারে। ফিজিক্সে বলে একই এনার্জি একটা সময় কাইনেটিক, যেটা চলছে; আবার অনেক সময় এনার্জি পোটেনসিয়াল থাকে, যেটা থেমে আছে। জলাশয়ের জল একটা জায়গায় থেমে আছে, পোটেনসিয়াল এনার্জি, দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জলাধারের সুইচগেট খুলে দেওয়ার পর সেখান দিয়ে যখন জল বেরোবে তখন কাইনেটিক এনার্জি হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিকের যে শেষ কথা ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম হলেন তিনটে গুণের পার। সেইজন্য তাঁকে ত্রিগুণাতীত বলা হয়।

যেমন অগ্নির কোন রঙই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। চোখের সামনে আমরা যে সংসার দেখছি, এটা সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, চৈতন্য। কেন, কি কারণে ব্রহ্ম এই সৃষ্টি করেন কারুর জানা নেই। কিন্তু যখন সৃষ্টি করেন, ব্রহ্ম আর শক্তি, যে শক্তি তাঁর সঙ্গে এক, তখন সেই শক্তির খেলা শুরু হয়ে যায়। যেমনি শক্তির খেলা শুরু হয়ে যায়; যিনি চৈতন্য, যিনি এক, যিনি নির্গুণ নিরাকার, এবার যেন তিনি তিনটে গুণের খেলা দেখাতে শুরু করে দেন। আমরা যত রকম রঙ দেখি, সেখানেও সেই তিনটে গুণের খেলা। আসলে আমরা যা কিছু দেখছি সবই ব্রহ্ম, কোনটাই ব্রহ্ম ছাড়া কিছু না, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। শক্তির খেলা চলছে বলে তিনটে গুণের খেলা দেখায়।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ –এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। এটাকেই শক্তি বলা হয়, প্রকৃতি বলা হয়, মায়া বলা হয়, এগুলো বিভিন্ন নাম, কিন্তু কাজ সেই এক রকম। **আগুনে যদি সাদা রঙ ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যদি কালো রঙ ফেলে দাও তবে আগুন কালো দেখাবে। যদি কালো রঙ ফেলে দাও তবে আগুন কালো দেখাবে**। ঠাকুর এগুলো উদাহরণ দিয়ে বলছেন। স্কুলে কেমেস্ট্রির ছাত্ররা দেখে থাকবেন, সল্ট তৈরী করা হত, ওই সল্ট আগুনে দিলে রঙ পাল্টে যেত, এটা একটা টেস্ট।

ব্রহ্ম –সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। কারণ, আপনি জপধ্যান করছেন, জপধ্যান করতে করতে মন একাগ্র হতে শুরু হয়। মন একাগ্র হলে দেখবেন সেই ঈশ্বর জ্যোতির্ময় রূপে আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু এটাও তিনটে গুণের মধ্যে। সেখান থেকে মন যখন আরও কেন্দ্রিত হয়ে কুণ্ডলীনি কণ্ঠদেশ, ভ্রুযুগল হয়ে শেষ পর্যায়ে যায়, যেটাকে অদ্বৈত জ্ঞান বলে বা নির্বিকল্প সমাধি বলে; সেখানে তখন দেখেন শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই; সত্ত্ব, রজো, তমো কোন কিছু নেই, কখন ছিলও না। এটা একটা আশ্চর্যের জিনিস। এই কথা একজন ঋষি না, বহু ঋষি বলে গেছেন। ঠাকুরও এই কথা বারবার বলেছেন, স্বামীজীও বলে গেছেন, সেইজন্য প্রশ্ন করার কিছু নেই। সমস্যা হল, যেখান পর্যন্ত আপনার বোধ হচ্ছে, যেমন ধরুন বলা হল হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখছেন বা আপনার ইষ্টকে দেখছেন; এখানে বলা হচ্ছে 'আপনি দেখছেন', তার মানে আপনি মন দিয়ে দেখছেন, তাই মন সেখানে থাকছে। কিন্তু আগে বলা হল, মন ত্রিগুণাত্মিকা, সেইজন্য এটা ব্রহ্ম নন। যেখানেই তিনটে গুণ, ওটা ব্রহ্ম নন। এমনকি ভ্রু-মধ্যে কুণ্ডলীনি চলে এলো, যেখানে ঈশ্বরকে আপনি সাক্ষাৎ করছেন, তখনও মন থাকছে; সেইজন্য ওই অবস্থার কথা আপনি মুখে বর্ণনা করতে পারছেন।

জগতের যত প্রবর্তক মুখে যখন বর্ণনা করেছেন ঈশ্বর কেমন, তার মানে দাঁড়ায় ব্রহ্মজ্ঞান জিনিসটা তাঁদের নেই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ মানেই মনের সীমানাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে? মনই ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সেখানে এই মন আর মন থাকে না। মন তখন এমন শুদ্ধ হয়ে যায় যে, তখন দেখেন এই যে শুদ্ধ মন এটা আসলে শুদ্ধ আত্মা, অথচ দেখাচ্ছিল অশুদ্ধ মন রূপে। এই জিনিসগুলির ধারণা করা সাধনা সাপেক্ষ। তা নাহলে আমাদের মত সারাক্ষণ শাস্ত্র নিয়ে যদি পড়ে থাকেন, তাহলে ধারণা হবে; ধারণা না হলেও, একটা জিনিস করতে করতে কি হয় মনটা ওর মধ্যে বসে যায়। তার মানে এই নয় যে আমি এগুলো জানি এবং আমার অনুভব হয়ে গেছে। শাস্ত্রের মধ্যে আছি, আর এতদিন পড়ে পড়ে বুঝে গেছি জিনিসটা এই রকম। কিন্তু অনুভূতি জিনিসটা পুরো আলাদা।

তিনি বাক্যের অতীত। স্বাভাবিক, যেটাকে মন গ্রহণ করতে পারে না, সেটাকে বাণী কিভাবে প্রকাশ করবে। স্বামীজী চারটে যোগের কথা আপনারা সবাই শুনে থাকবেন –কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ নেতি নেতি বিচার করে। জ্ঞান আর জ্ঞানযোগ দুটো আলাদা জিনিস; জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, আর জ্ঞানযোগ মানে নেতি নেতি বিচার করা। কিসের নেতি নেতি বিচার হয়? যেটাই তিনটে গুণের সেটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। ছেড়ে দেওয়ার পর এগিয়ে কোথায় যাওয়া হয়? কোথাও এগিয়ে যাওয়া হয় না। আপনি বলছেন, আমার মনের মধ্যে যে কোন ভাব যদি ওঠে, সেটা যদি ত্রিগুণাত্মিকা হয়, ওটাকে আমি বাদ দেব। সংসারে যাবতীয় যা কিছু তিনটে গুণের মধ্যে আছে, সবটাকে বাদ দিতে দিতে যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, সেখানেই আত্মজ্ঞান। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। একটা অন্ধকার ঘরে বাবু শুয়ে আছেন। বাবুকে অন্ধকারে খুঁজতে হবে। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে, দেওয়ালে হাত ঠেকল, এটা বাবু নয়; খাটে হাত ঠেকল, এটা বাবু নয়; চেয়ারে ঠেকল, এটা বাবু নয়। এই করতে করতে হঠাৎ হাতটা বাবুর গায়ে এসে ঠেকল। এতক্ষণ নেতি নেতি করে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ বাবুর গায়ে হাত পড়ে গেল, তখন বলছেন এটাই আসল বস্তু। কিন্তু ভক্তি পথে যাওয়ার সময় প্রথমেই ইষ্টকে অবধারণা করে ভক্ত বলেন, আমি ইষ্ট ছাড়া আর কোন কিছুর চিন্তন করব না। ফলে জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের পথ আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু উপলব্ধি এক। এরপর ঠাকুর একটা খুব সুন্দর নামকরা উদাহরণ দিচ্ছেন।

একটি মেয়ের স্বামী এসেছে; অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ওই মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না –ওই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ওইটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছেন, না। আর একজনকে

দেখিয়ে বলছে, ওইটি কি তোর বর? সে আবার বলছে, না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে, ওইটি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না –কেবল একটু ফিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। **মেয়েটি হাঁও বললে না, নাও বললে না –কেবল একটু ফিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্করা বুঝলে যে, ওইটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ**।

এই উদাহরণ তুলসীদাস রামচরিতমানসে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে গেছেন। সেখানে যেতে যেতে আদিবাসী ভিলদের এক দম্পতির সাথে দেখা হল। ভিল আদিবাসীর স্ত্রী সীতাকে সেখানে জিজ্ঞেস করছে, 'তোমার বর কোনটা, ওই লোকটা'? সীতা বলছেন, 'না না'। 'তাহলে কি ওই লোকটা'? সীতা একটা হাল্কা হাসি দিলেন। আদিবাসী রমণী তাতেই বুঝে গেল। এগুলো প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার উদাহরণ। বর্তমান কালে এই উদাহরণ দেওয়া যাবে না, ফ্যামিনিজিম এসে গেছে, সব লিবারাল হয়ে গেছে। স্ত্রীরা এখন স্বামীকে 'তুই' করে সম্বোধন করে। এখন আর ফিক্ করে হাসবে না। নাম ধরেই ডেকে বলবে, 'এই এদিকে আয়, তোকে আমার বন্ধুরা দেখতে এসেছে'। যেখানে সত্যিকারের খুব গভীর ভালবাসা, সেখানে দুজন এখনও এভাবেই কথা বলবে। সংসার করা, গার্হস্থ জীবন পালন করা আর কলেজের বন্ধুত্ব, দুটো আলাদা জিনিস। আমার পরিচিত বন্ধুদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হলে আমি বলে দিই, তুই বলে ডাকবে না, তুমি বলে ডাকবে। ঠাকুর এরপর মণিকে জিজ্ঞেস করছেন।

(মণির প্রতি) –আচ্ছা, আমি বকি কেন?

মণি –আপনি যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে যদি আবার কাঁচা লুচি পড়ে তবে আবার ছ্যাঁক কলকল করে। ভক্তদের চৈতন্য হবার জন্য আপনি কথা কন। এখানে ঠাকুর নিজেকে নিয়ে সন্দেহ করছেন না, সামনের লোকের যেন সন্দেহ না হয়ে যায়, ওটাকে আটকাবার জন্য এই কথা বলছেন।

খুব ঘরোয়া কথাবার্তা চলছে। মাস্টারমশাই হাজরাকে নিয়ে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সতের কি স্বভাব জানো? সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না –ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব –হয়ত বললে, আমি আলাদা বসব। ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে না –কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন –ভক্তের স্বভাব কেমন – *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ*, ভক্ত কক্ষণ এমন কিছু করবে না, যাতে কারুর কোন অসুবিধা হয়। একটা অতি সাধারণ কথা বলছি। অনেককে দেখি হোটেলে খেতে গেছে, সেখানে গিয়ে চেয়ারে বসেই হোটেলের ওয়েটারকে ডেকে এটা এখানে কেন, ওটা কেন নেই ইত্যাদি বলে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়বে। যে যত বড়লোক তার এই ব্যতিব্যস্ত করার স্বভাব তত বেশি। এগুলোকে নিয়ে অনেক মজার মজার লেখাও বেরোয়। মাঝরাত্রে হোটেলের ম্যানেজারকে ফোন করে হুকুম করবে, আমার এক্ষুণি এটা চাই; এরা কোটিপতি না, আরবপতি। একবার হোটেলের একজন ম্যানেজার বলছিলেন, একদিন একজন আরবপতির স্ত্রী রাত একটার সময় ফোন করে বলছে, কাল আমাদের পার্টি আছে, আমার কোন নেকলেস নেই। নেকলেস নেই মানে, তার শত শত নেকলেস আছে, কিন্তু তাকে নূতন নেকলেস পড়তে হবে। ম্যানেজার তারাও সেই রকম, মাঝ রাতে গয়নার দোকান খুলিয়ে মহিলার জন্য একটা অত্যন্ত দামী নেকলেস কিনে এনে মহিলাকে দিল।

সৎলোকের এই ধরণের স্বভাব হয় না। তিনি জানেন, যে সেবা করছে সেও ঈশ্বরের সন্তান। অনেক আগেকার একটা ঘটনা জানি। বাড়ির বাচ্চা তাদের কাজের লোককে 'তুই' বলে ডেকেছে। বাচ্চার ঠাকুরদা নাতিকে শুধু বললেন, 'তুমি তাকে 'তুই' বলে ডাকলে'? আবার গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তাকে 'তুই' বলে ডাকলে? না, এভাবে তুমি তাকে ডাকতে পারো না'। আপনার বাড়ির

কাজ করছে বলে তার সাথে যা খুশি ব্যবহার করতে পারেন না? কলকাতায় খুব সুন্দর বলে, ‘কাজের মাসি’। তাকেও মাসি বলে সম্বোধন করা হয়। সেও মাসি, আপনি সংসারের সব কাজ সামলাতে পারছেন না বলে, ভদ্রমহিলা এসে আপনাকে সাহায্য করে দিচ্ছে; বিনিময়ে তাকে আপনি কিছু পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। তাকেও ব্যতিব্যস্ত করতে নেই, তাচ্ছিল্য বা অপমান করে কোন ভাবে তার মনে কষ্ট দিতে নেই। আপনি মনে করছেন, আমি টাকা দিচ্ছি, সেবা পাওয়া আমার অধিকার। সেবা আপনি নিন, কিন্তু সাথে সাথে তাকেও ব্যতিব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকতে হয়। নিমন্ত্রণ বাড়িতে আপনাকে ডেকে নিয়ে গেছে, সেখানে যদি কোথাও কোন অসুবিধা বা কিছু সমস্যা হয়ে থাকে, সেটাকে মানিয়ে নিতে হয় বা সহ্য করে নিতে হয়, কিন্তু ব্যতিব্যস্ত কখনই করতে নেই। সত্ত্বগুণের উদয় না হলে সহ্য করার ক্ষমতা আসে না।

তার সাথে বলছেন, **আর অসতের সঙ্গ ভাল না। গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। (মণির প্রতি) তুমি কি বল?** একবার যখন বুঝে গেলেন লোকটা অসৎ, তার মানে মিথ্যা কথা বলে, অপরকে কষ্ট দেয় কিংবা দুরাচার করে, চুরি-চামারি করে; এদের থেকে সরে আসতে হয়। কারণ এদের সঙ্গে থাকলে বা সঙ্গ করলে, আজ কিংবা আগামীকাল আপনার ভিতর ওর স্বভাবের ছাপ পড়বেই। সেও হয়ত চাইবে না, আপনার উপর ছাপ পড়ুক, কিন্তু পড়বে। ছোটবেলায় বড়রা আমাদের সব সময় বলতেন, বড়লোকদের থেকে সব সময় দূরে থাকবে। আমি এখনও যারা ক্ষমতাবান তাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি, নিজে থেকে তো যাই না। কোন ভাবে পরিচয় হয়ে গেল, তারাও আসছেন ঠিক আছে, কিন্তু নিজে থেকে আমি কারুর কাছে যাব না, আমার সঙ্ঘেরও না, বাইরেরও না। কোন কাজের ব্যাপারে বা সঙ্ঘের কাজে যেতে হল, সেটা অন্য জিনিস। নিজে থেকে কক্ষণ যেতে নেই, কারণ ধীরে ধীরে তার স্বভাব আপনার উপরেও পড়বে। তার কাছে আছে ক্ষমতা, নিজে থেকে গেলে এক সময় আপনারও মনে হবে আমিও ওর মত ক্ষমতাবান হয়ে গেলাম। সেইজন্য বড়লোকদের সাথে একেবারেই মিশতে নেই।

আমাদের দেশের প্রথম সারির একজন নামকরা ব্যক্তিত্ব, নাম বলছি না, তাঁর সেক্রেটারি আমাকে ফোন করে বললেন, আপনি কি তাঁর সাথে দেখা করতে চান? আমি ওনার সেক্রেটারিকে এই কথাই বললাম, জগতে কেউ নেই যার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইব। তিনি দেখা করতে চাইলে, আমি অবশ্যই দেখা করতে যাব। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন। ভারতের এত নামী লোক, যাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সবাই ছটফট করে, একবার দেখা করে নিলে নিজেকে ধন্য মনে করে। আমার স্বভাবেই নেই, একমাত্র নিজে থেকে ঠাকুরের দর্শন করা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাই না। ক্ষমতাবান যারা, অসৎ যারা, এদের থেকে দূরে থাকতে হয়।

মণি –আজ্ঞে, অসৎসঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপনি বলেছিলেন, বীরের কথা আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কিরূপ? ঠাকুর আবার ভেরিফাই করে নিতে চাইছেন, কি বলেছিলাম।

মণি –কম আগুনে একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে তখন কলাগাছটাও ফেলে দিলে কিছু হয় না। কলাগাছ পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এখন সেখানে যদি আপনি মনে করেন আমি বীর, না তা হয় না। যদিও মনে করেন আপনি বীর, তাও জড়াতে নেই।

ঠাকুর মাস্টারের বন্ধু হরিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মাস্টারমশাই তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে করে এনেছেন, হরিবাবু; ঠাকুর তাঁর কথা জানতে চাইছেন।

মাস্টার –ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এঁর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে।

স্ত্রী গত হয়ে যাওয়া পুরুষের জীবন খুব কষ্টের। আগেকার দিনে দ্বিতীয় বিয়ে হওয়াটা বিরাট সমস্যার ছিল। একজনকে যখন একবার যে ভালবাসা দিয়েছেন, দ্বিতীয়জনকে সেই ভালবাসা দেওয়া মুশকিল হয়। আপনারা সমাজে আছেন এই জিনিসগুলো আপনারা ভাল বুঝবেন, এসব ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। আমাদের তো একটা সেন্টার থেকে আর-একটা সেন্টারে যেতে হয়, সেখানে সেন্টারের অধ্যক্ষ যেমন বলেন তেমন চলতে হয়। এখানে ভালবাসার কোন ব্যাপার নেই। ঠাকুর এবার হরিবাবুকে জিজ্ঞেস করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তুমি কি কর গা? আমরাও অনেক সময় জানতে চাই কি কাজ করেন, আপনার প্রফেশান কি, তাতে লোকটির ব্যাপারে অনেক কিছু বোঝা যায়। মাস্টারমশাই ওনার হয়ে বলছেন।

মাস্টার –একরকম কিছুই করেন না। তবে বাড়ির ভাই-ভগিনী, বাপ-মা এদের খুব সেবা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –সে কি? তুমি যে "কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর" হলে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। দুটো থাক –সংসারী আর হরিভক্ত। এটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক।

ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন, এ ভাল নয়। হয় তুমি সংসারী হও পুরোদমে, নয় হরিভক্ত হও পুরোদমে। হিন্দু ধর্মে মাত্র দুটি ধর্ম –প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে, সংসারে পুরোদমে নামো। যদি মনে কর সংসারে তোমার মন নেই, তাহলে পুরোদমে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে নামো। আমাদের ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ভর্তৃহরি একটি খুব বিখ্যাত নাম, তিনিই বৈরাগ্যশতকম্, শৃঙ্গারশতকম্, নীতিশতকম রচনা করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলছেন, হয় সংসারে নেমে বিবাহ করে খুব ভোগ কর আর তা নাহলে হরিদ্বার চলে যাও, সেখানে তাঁবু খাটিয়ে তপস্যা কর; মাঝামাঝারি কিছু হয় না। যেটাতেই যান, পুরোদমে যেতে হবে। পুরোদমে গেলে কি হবে, একটা জায়গায় গিয়ে ভোগ থেকে নিবৃত্তি এসে যাবে। আর তা নাহলে পুরোদমে হরিভক্ত হয়ে যান। মাঝামাঝারি যারা, এই যে হরিবাবুর কথা মাস্টারমশাই ঠাকুরকে বলছেন, এমন কিছু করেন না, সেবা করেন, ভাল মানুষ; এদের জন্য একটাই শব্দ 'অপদার্থ'।

ঠাকুর এরপর বলছেন, **এক-একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে, –মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়, নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বঠ্ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দুখানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে "কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর"**।

তুমি এ-ও কর –ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তিশাস্ত্র –শ্রীমদ্ভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত –এই সমস্ত পড়বে।

আমি জীবনে দেখেছি বেশির ভাগ লোক কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর। ভারত ভ্রমণের সময় স্বামীজী হৃষিকেশে একদিন দেখেন একজন সাধু দুপুরবেলা কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকছে। স্বামীজী রেগেমেগে বলছেন, দে ব্যাটাকে লাগুলে জুতে। তখনই স্বামীজীর মনে এই ভাবটা এলো, এটা কি হচ্ছে? কোন রকমে ভিক্ষা করে রুটি ডাল পেয়ে যাচ্ছে, সেটা খেয়ে নিজের মত থাকছে। তাঁর সাধুর ভাব কোথায়? ওই রুটিডাল ভিক্ষা করতে যখন যাচ্ছে তখন সাধুর ভাব, বাকি সময়টা নেই। আমাদের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব অসন্তুষ্ট হতেন, উনি বলতেন, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা দুটো পুরো আলাদা জিনিস। আমরা প্রায়ই ক্লাশে এটাকে নিয়ে আলোচনা করি। ধার্মিকতা বললেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা বিচিত্র ধারণা মাথার মধ্যে বসিয়ে নিই –কোন মেয়ে-মানুষের দিকে তাকান না, ভক্তদের সঙ্গে তিনি তেমন

মেলামেশা করেন না, পয়সাকড়ি সে-রকম কিছু রাখেন না, সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে আরতিতে যান –আহা-আহা কি ভাল সাধু! ভাল সাধু ঠিকই, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভাল সাধু হওয়ার জন্য কেউ সন্ন্যাসী হন না। সন্ন্যাসী হন ভাল-মন্দের পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলে উপরে দিকে যাওয়ার জন্য।

স্বামীজীর কাছে একবার এই রকম একজন অপদার্থ এসেছে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি চুরি করতে পার'? 'না, পারিনা'। 'মিথ্যা কথা বলতে পার'? 'না, আমি মিথ্যা কথা বলি না'। স্বামীজী পরিষ্কার বলে দিলেন, 'তোমার দ্বারা সাধু হওয়া হবে না'। শক্তি চাই, যে শক্তি সব কিছু ছিঁড়ে বেরিয়ে উপরের দিকে নিয়ে চলে যাবে। ঠাকুর ব্রহ্ম আর শক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন –এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে এটা হল সত্ত্ব, রজো আর তমের খেলা। রজোগুণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর রজোগুণ সত্ত্বগুণে পাল্টাতে পারে আবার তমোগুণেও চলে যেতে পারে। সত্ত্বগুণের স্বভাব শান্ত, ধীরে, স্থির। তমোগুণের স্বভাব হল জড়। এখন জড় আর স্থির বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তাহলে তফাৎ আমরা কি করে বুঝব? এই কারণে তমোগুণীকে অনেক সময় সত্ত্বগুণী বলে মনে হয়।

এই যে এখানে মাস্টারমশাইর বন্ধু হরিবাবুর কথা বলা হচ্ছিল, আসলে ইনি একজন ঘোর তমোগুণী লোক। কিন্তু বলার সময় আমরা বলব, আহা! কি ভাল মানুষ, মা-বাবার সেবা করছেন, ভাই-বোনদের দেখাশোনা করছেন, ভাইপো-ভাইঝিদের দেখছেন। একটু বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবেন, এই ধরণের সব কজন উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঘোর তমোগুণী। আমাদের পুরো সমাজ, বিশেষ করে আমাদের ভক্তমহল হল কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর। সবাই না, কিন্তু ইন্ জেনারেল।

আমার একটা ঘটনা মনে আছে, একবার এয়ারপোর্ট থেকে আমি ট্যাক্সি করে আসছিলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার বাঙালী এবং ইয়ং ছেলে। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ও দিনে দু-তিনটে ট্রিপ করে। আমি জানতে চাইলাম, মাত্র দুটো তিনটে ট্রিপ কেন, আরও ট্রিপ করো না কেন? বলছে, 'অত পয়সা নিয়ে কি হবে, মাছ ভাত আমার হয়ে যায়'। 'তাহলে সারাদিন করো কি'? তখন বলছে, 'আমাদের ক্যারাম কম্পিটিশন হয়'। সারাটা দিন ক্যারাম খেলে যাচ্ছে। ওই অতটুকুতে তার জীবন চলে যাচ্ছে। বাকি সময়টা কোথায় দিচ্ছে? ক্যারাম খেলে, নয়তো লুডো খেলে, নয়তো তাস খেলে, আর তা নাহলে টিভি সিরিয়াল দেখে –উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর। যখন আমোদন-বিনোদনে যাবেন, সেখানেও যেন আপনার এ্যক্টিভ্ পার্টিসিপেশান থাকে।

যে কোন কাজকর্ম করাটা দুই প্রকার হয় –এ্যক্টিভ্ আর প্যাসিভ্। জীবন সব সময় যেন এ্যক্টিভ্ থাকে; এ্যাক্টিভ থাকা মানে আপনি সেখানে লেগে আছেন, খাটছেন; এটা আপনাকে সত্ত্বগুণে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ছেড়ে দিলেন, দুম্ করে তমোগুণে চলে যাবেন। তমোগুণে চলে গেলে আস্তে আস্তে এই জীবনটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। জীবনটা নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে; মৃত্যুর পর ঠাকুর জানতে চাইবেন, হ্যাঁ, বলো তাহলে কি করলে? প্রভু! সারাটা জীবন আমি প্রচুর কুমড়ো কেটেছি। বাইরের ঘরে বসে তামাক খেতাম আর বাড়ির ভিতর থেকে মেয়েরা ডাকত, আমি গিয়ে কুমড়োটা দু ফালি করে দিয়ে আসতাম। খুব ভাল, খুব ভাল। ঠিক আছে, এবার তাহলে তুমি একটা শামুক বা কচ্ছপ বা অজগর শাপ হয়ে পড়ে থাক, তোমাকে বেশি নড়চড়া করতে হবে না। একদিন খেয়ে নেবে, সাতদিন পড়ে থাকবে; অজগর সাপ তাই করে। আরে ভাই, সাপই যদি হতে হয় তাহলে কেউটে সাপ হও। সেইজন্য যে ভাবেই হোক, আগে তমোগুণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না, আমি নিজের অনুভব থেকে বলছি, চারিদিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যা দেখেছি, ভক্ত মানে তমোগুণ। ওই কথামৃত একটু পড়ে নিয়ে দুটো কথা টিয়া পাখির মত আউড়ে যাচ্ছে। আর যারা একটু ভাল ভক্ত গীতার দুটো শ্লোক মুখস্থ করেছে, এবার তো তারা ঠাকুরের সাম্রাজ্যে পাসপোর্ট, ভিসা সব পেয়ে গেছে বলে মনে করছে। তা কি কখন সম্ভব! ইউটিউবে বেছে

বেছে সেই ধরণের লেকচারগুলো শুনবে যেখানে কোন বুদ্ধি খাটাতে হবে না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সাধু হয়েছিস, ঈশ্বর দর্শন করতে এসেছিস, আগে অন্তত একটা ভূত দেখ, তবে বিশ্বাস হবে আত্মা বলে কিছু আছে। স্বামীজী বাচ্চাদের ভূত দেখার কথা বলছেন না। যাঁরা সাধন-ভজন করছেন তাঁদের ভূত দেখা আলাদা জিনিস।

কিভাবে আমরা ঘোর তমোগুণী হতে পারি? সত্যিকারের একটা ঘটনার কথা বলি। প্রফেট মহম্মদের যখন প্রচার প্রসার শুরু হল, তখন প্রথমে আরবদেশ থেকে ছড়াতে শুরু হল। সেখান থেকে ইরাণে গেল, তারপর আফগানিস্থানে গেল, আর সেখান থেকে ভারতে এলো। কিন্তু ইসলামের যে ধর্ম দর্শন, সেটাকে নিয়ে ওনাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা চিরদিন থেকে গেল। সেই সময় ওনাদের একজন নামকরা দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম আল গাজালি। আল গাজালি বিরাট পণ্ডিত লোক। আল গাজালি সুফি ভাব দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন। সুফি ভাবের ছিলেন বলে রাজারা বেশির ভাগ সময় তাঁকে জেলে বন্দি করে রাখত। আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না, একজন মুসলমান রাজার জেল কি রকম হতে পারে, নরকের থেকেও জঘন্য। ওই রকম জেলে যখন তাঁকে বন্দি করে রাখা হত তখন তিনি ওই সময়টা ধ্যান করাতে ব্যবহার করে নিতেন। একজন উচ্চমানের সাধক না হলে ওই রকম জেলে শুধু ধ্যান করে কাটিয়ে দিতে পারতেন না। জেল থেকে ছাড়া পেলে তিনি মুসলিমদের বড় বড় যাঁরা সন্ত মহাত্মা, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, নোটস্ নিতেন আর লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তেন, আর নিজেই বই লিখতেন। আল গাজালি দুর্ধর্শ সব বই রেখে গেছেন।

ভল্টায়ার ছিলেন একজন ফরাসী লেখক, আমার খুব প্রিয় লেখক। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে এত কিছু করলেন যে, তাঁকে দেশ থেকে বার করে দেওয়া হল। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ওই সময়ের মধ্যে তিনি ইংরাজী ভাষাটা শিখে নিলেন। ফ্রাঞ্চরা ইংরেজদের বিরোধী, কিন্তু তিনি ইংরাজী শিখলেন। গ্যালিভারস ট্রাভেল খুব নামকরা বই, ওটাকে আধার করে তিনি লিখলেন মাইক্রো বেগার্স, খুব নাম হল। বই লেখার দুই কি তিন বছর পর সরকার তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন, এখন তুমি আসতে পার। তার মানে আপনার যখন বিষম পরিস্থিতি তখন কেঁদে কেঁদে সময় অতিবাহিত করবেন না।

পত্নীবিয়োগ হয়েছে বলে তমোগুণী কেঁদে ভাসাবে আর বলবে, আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল, আমার জীবনে আর কিছু নেই। কত বোকা বোকা কথা, তোমার একটা সুযোগ এসেছে, এবার সুযোগকে কাজে লাগাও। হ্যাঁ, একজন সঙ্গী ছিল, চলে গেছে, এবার তুমি নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও। বেনহুরের কাহিনী আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন। তার কোন দোষ নেই, সে বড়লোক; তাকে গোলাম করে বিক্রি করে দিল। তখনকার দিনের জাহাজে তাকে স্লেভ করে দাঁড় টানার কাজ দেওয়া হয়েছে। ও শুধু বলল, সাতদিন আমাকে ডান দিকে, সাতদিন বাম দিকে বসাতে হবে। কারণটা বুঝিয়ে দিল, একদিকে বসে যখন দাঁড় টানে তখন একদিকের মাসেল শক্ত হয়ে যায়, অন্যটা দুর্বল থাকে। দুদিক পাল্টাপাল্টি করে টানলে দুটো বাহুই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। আর সত্যিই তাই। আর এই দুটো শক্ত বাহুই তার কাজে দিল। জাহাজের মালিককে এই শক্ত বাহু দিয়েই বাঁচালো।

অল্প বয়স থেকে আমি স্বামী সুহিতানন্দজীকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেওঘর বিদ্যাপীঠে গরমের ছুটি হত। লম্বা ছুটি, কিছু করার নেই। ওই পুরো সময়টা তিনি কত কি করতেন, বিভিন্ন রকমের কাজ। যে কজনকে আমার জীবনে দেখলাম, যে কজন সাধুকে দেখে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি; তাঁদের কাউকে আমি দেখলাম না এক মিনিট সময় নষ্ট করতে। এনারা কেউই কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর না, যাঁরাই সত্যিকারের ফেমাস হয়েছেন, কেউই কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর ছিলেন না। ইতিহাসে যাঁরা নামকরা লোক, যেমন আলেকজাণ্ডার ছিলেন, সারা জীবন লড়াই শুধু লড়াই করে গেছেন। এনারা তেমন কিছু না। কিন্তু এই যে আল গাজালির কথা বলা হল, তাঁকে জেলে বন্দী করে দিচ্ছে। আমাদের জেলে

পুরে দিলে আমরা কি করব ভাবলেই শিউড়ে উঠি। অথচ জেলে থাকাটাকেই আল গাজালি কেমন সুন্দর ভাবে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু ঠাকুর এখানে যেটা বলছেন, সাধারণ লোকদের জন্য বলছেন না। আপনারা ভক্ত, আপনাদের জন্য বলছেন, সেইজন্য যে কাজগুলো করবেন, সব সময় ঈশ্বরকেন্দ্রিক কাজ করবেন। ঠিক করে নিন, আমি প্রত্যহ এই গ্রন্থ পাঠ করব, শুধু পাঠ না, মুখস্ত করে পাঠ করব। এই যে ক্লাশগুলো শুনছেন, যেটা শুনছেন তার থেকে ভাল ভাল পয়েন্টসগুলো খাতায় লিখুন। আমাদের ক্লাশের লেকচারে প্রচুর রসদ থাকে, প্রচুর নাম আসছে, অনেক বইয়ের রেফারেন্স আসছে। সেই বইগুলো নেটে গিয়ে খুঁজে বার করুন, যাঁর নাম বলা হল তিনি কি, তাঁর কি কি কীর্তি নেটে খুঁজে বার করে লিখে রাখুন।

এটাকেই বলা হচ্ছে, এ্যক্টিভ্ পার্টিসিপেশান, এই এ্যক্টিভ্ পার্টিসিপেশানটা যদি না থাকে তাহলে ঠাকুর আজ আপনাকে যে সুযোগ দিয়েছেন, আগামী জন্মে এই সুযোগ হয়ত দেবেন না। সুংস্কৃতে *সৃপ্* ধাতু থেকে এসেছে সংসার শব্দ। *সৃপ্* শব্দের অর্থ যেটা সাপের মত স্লিপ্ করতে করতে চলতে থাকে। জগৎ শব্দও তাই, *গম্* ধাতু থেকে এসেছে, *গম্* মানে চলা। হয় আপনি এগোবেন, নয় পিছোবেন। যদি মনে করেন, আমি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি, একশ আটবার দু-বেলা জপ করব, এতেই আমার হবে। না, হবে না। এটা শুধু আমার কথা না, গুরুজনদের কাছে আমার শোনা কথা, গুরুজনদের আমি সাক্ষাৎ দেখেছি, আর এনাদের আমরা কাউকে একটা মুহুর্তও সময় নষ্ট করতে দেখিনি। হয় কথামৃত আদি নিয়ে গভীর চিন্তন করে যাচ্ছেন, আর সকালে উঠে শ্লোক পাঠ করতে হবে ওই অর্থে না, শাস্ত্র আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। আমাকে উপরে উঠতে হবে, এটাকে মাথায় রেখে একটা সচেতন প্রয়াস ওনারা চালিয়ে যেতেন।

ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যাচরিতামৃতের নাম করছেন, আমাদের তরফ থেকে বলতে পারি, গীতা, কথামৃত, চণ্ডী আর আমাদের উদ্বোধন প্রকাশনায় প্রচুর বই রয়েছে, দাম খুবই কম, বইগুলো কিনুন। সাথে সাথে রোজ গীতা, চণ্ডী পাঠ করুন। আমরা কল্পনাই করতে পারিনা দিনে দিনে আমরা কিভাবে কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর হয়ে যাই। আর যত বয়স হয়, বয়সের সাথে সাথে শরীরের শক্তি যত কমে যায়, তত তখন তমোগুণ আরও বেড়ে যায়। বৃদ্ধাবস্থা অব্দি তমোগুণকে আসতে দিতে নেই। আমি যে সবাইকে বলি, কিছু করুন, এই কারণে বলি যাতে কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর না হয়ে যেতে হয়।

ঠাকুর এই যে বলছেন, তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত, এই হরিভক্ত একেবারে একশ ভাগ। আল গাজালির কথা বলা হল, এটাই ঠিক ঠিক একশ ভাগ। যখন জেলে বন্দী হয়ে আছেন সেখানে ধ্যান করছেন, জেলের বাইরে আছেন পড়াশোনা করছেন।

মাস্টারমশাই বর্ণনা করছেন –**রাত প্রায় দশটা হয়। এখনও কালীঘর বন্ধ হয় নাই**। মাস্টার প্রথমে রাধাকান্তের মন্দিরে, পরে মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন। **চাঁদ উঠিয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয় –প্রাঙ্গণ, মন্দিরশীর্ষ, অতি সুন্দর দেখাইতেছে**। ফিরে এসে দেখছেন ঠাকুর খেতে বসেছেন। খাদ্যের মধ্যে একটু সুজির পায়েস আর একটা কি দুটো লুচি। রাত্রে বেশি খেতে নেই। তবে কিছু লোককে কাজে-কর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় বলে ঠিক মত খাওয়া হয় না, তারা রাত্রেই বড় করে আহার করে। অধ্যায় এখানেই শেষ হয়ে পরের অধ্যায়ে যাচ্ছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গুরুশিষ্য-সংবাদ –গুহ্যকথা

এতক্ষণ আমরা ২০শে অগস্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টব্দের কথা আলোচনা করছিলাম। সেখান থেকে মাস্টারমশাই আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টব্দের বর্ণনাতে। (পৃঃ ২৫৯) দক্ষিণেশ্বরে

ঠাকুর নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে বসে আছেন, মণির সঙ্গে নিভৃতে কথা বলছেন। রাত আন্দাজ সাড়ে সাতটা বেজেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সেদিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি – সবাইয়ের পেটের চিন্তা।

ঠাকুরের এই কথা শোনার পর স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের প্রশ্ন আসবে, মহারাজ আপনাদের কি পেটের চিন্তা নেই? না, আমাদের সন্ন্যাসীদের পেটের চিন্তা থাকে না। আপনি বলবেন, সে কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। আমি এক সময় ট্রেনে যাওয়ার সময় এটা করতাম, এখন অবশ্য করি না; ট্রেনে আমি কিছু খেতাম না। চব্বিশ ঘণ্টা, তিরিশ ঘণ্টা কিছু না খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। আমাদেরও আগের এক মহারাজের কথা শুনেছি, উনি চেন্নাই থেকে কলকাতা আসতেন। সময়টা ছিল ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের, তখনও মাদ্রাজ মেল ছিল। তিনি ট্রেনে চেপে উপরের বাঙ্কে উঠে পড়তেন, ব্যস্, আর ওখান থেকে নামতেন না। সারাটা রাস্থা কিছু খেতেন না। আপনি বলবেন, কখনও তো খান। কখনও খাওয়া আর পেটের চিন্তা দুটো আলাদা জিনিস। পেটের চিন্তা মানে, মাথায় সব সময় ঘুরছে, আরও টাকা কিভাবে আয় করা যায়। তার সাথে আগামী দশ বছরের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, সন্তান হয়েছে ওর জন্য কি কি করতে হবে, নাতি হয়েছে ওর জন্য কি কি রাখা যেতে পারে। পেটের চিন্তা মানে এটাই।

ঠাকুরে আসলে যেটা বলতে চাইছেন তা হল –**সব পেটের জন্য দৌড়াচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে**। মনটা সব সময় কামিনী-কাঞ্চনে পড়ে আছে। স্ত্রীকে কিভাবে খুশি রাখা যাবে, সন্তানদের কিভাবে ভাল করে রাখা যাবে। **তবে দুই-একটি দেখলাম উর্ধ্বদৃষ্টি –ঈশ্বরের দিকে মন আছে**। এমনটা তো কখন হবে না যে কেউই ভাল না, জনসংখ্যায় লেখকরা আছেন, কবিরা আছেন; এমন এমন লেখকরা আছেন পুরো মনটা সাহিত্য রচনায় ডুবে আছেন, খাওয়া-দাওয়ার কোন চিন্তা করেন না, কোন টাকা-পয়সার চিন্তা নেই, রয়্যেলটি নিয়ে ভাবেন না। আবার এমন লেখকরাও আছেন, লেখা শেষ করার আগেই রয়্যেলটি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। ঠাকুর কথাগুলো মণিকে বলছেন, মণি মানে মাস্টারমশাই।

মণি –আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকেদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে, তাই অভাব বেড়েছে।

মাস্টারমশাই যখন এই কথা বলছেন, তখন তো কিছুই সে-রকম অনুকরণ করার কিছু ছিল না। আজকের দিনে কল্পনা করা যায়! ভোগের কত উপকরণ এসে গেছে, বিজ্ঞাপনের দৌলতে ভোগ্যবস্তুর সব খবর আমরা সহজেই পেয়ে যাচ্ছি। আজ তাই আমাদের চাহিদার শেষই নেই। সবাই দৌড়াচ্ছে। প্লেনের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, ট্রেনের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে তাও কোথাও কোন ট্রেনের টিকিট পাবেন না। সবাই দৌড়াচ্ছে। সবারই বিলাসিতা চাই। চাইলেই তো বিলাসিতা করা যায় না, টাকা দরকার। ইংরেজদের কথা উঠেছে, ঠাকুর ইংরেজদের বিষয়ে প্রশ্ন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত?

মণি –ওরা নিরাকারবাদী। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আমাদের এখানেও ওই মত আছে।

আগেকার দিনে বিদেশীদের ধারণা ছিল হিন্দু ধর্ম একটা অত্যন্ত নিম্নজাতি, নিম্নবুদ্ধি লোকেদের ধর্ম। বিদেশীদের অনুকরণ করতে গিয়ে ব্রাহ্ম সমাজও এই ভাবটা নিলেন। আজকেও বেশ কিছু ইংরাজী পড়া লোকদের কাছে হিন্দু শব্দটা শুনলেই তাদের গা যেন জ্বলতে শুরু হয়ে যায়। সোস্যাল মিডিয়ায়

একটু নজর দিলেই এই ছবিটা চোখে পড়বে। কিছু দিন আগে একজন সোস্যাল মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে লিখছেন, 'আমার বাবা বলে গেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের গুণগত মান দিনে দিনে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আপনি হলেন তার একটা নমুনা'। আমি শুধু হিন্দু ধর্মের প্রশংসা করে কিছু লিখেছিলাম। হিন্দু ধর্মের যদি বিরোধিতা করি, তখন ওটা হয়ে যাবে বড়লোকেদের ধর্ম। বড়লোকদের ধর্ম কি? তারাও জানে না তাদের ধর্ম কি; আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া আর কি কিছু জানে নাকি!

অথচ আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে যখন লেখা হয়, আমি বিদেশীদের কথা বলছি, এমন কোন ধর্মের ভাব নেই, এমন কোন চিন্তা-ভাবনা নেই, যেটা হিন্দুরা পুরোদমে অনুশীলন করেনি। বিদেশীদের দুটো জিনিস আমরা নিই না, একটা হল একেশ্বরবাদ। আমার ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, এই চিন্তা-ভাবনা হিন্দু ধর্মে নেই। যদিও বৈষ্ণবরা টুকটাক একটু এই ভাবকে নিয়ে চলে। প্রথম থেকেই এরা এলেমেলো, এদের কথা কি বলব। দ্বিতীয় চিরনরক বলে আমাদের কিছু নেই। এই দুটো জিনিস হিন্দু ধর্মে নেই। একেশ্বরবাদ, আমার ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, এই ভাব এক সময় হিন্দু ধর্মে এসেছিল, কিন্তু পরবর্তিকালে ডিসকার্ড করে দেওয়া হয়েছে। চিরনরক ব্যাপারটাও একমাত্র পাওয়া যায় মাধ্বাচার্যের গীতার ভাষ্যে একটা জায়গায়, মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এটা লিখে থাকতে পারেন। এই দুটোর বাইরে যত কিছু আছে সবটাই হিন্দু ধর্মে আছে। আপনারা কল্পনা করুন, পুরো বৌদ্ধ ধর্ম, যেটাকে নিয়ে এত লাফালাফি, আমাদের মহারাজরাও কেউ কেউ আছেন বৌদ্ধ ধর্মকে মিলিয়ে কি একটা নূতন ধর্ম দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের রাজযোগের একটা ছোট্ট অংশ। সেখানে কিছু কথা-কাহিনী দিয়ে বিরাট বড় করে দিয়েছেন। আর কিছু নেতারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে যাবেন বলে একটা কিছু চাই, ভারতের লোকেরা ধর্ম ছাড়া তো থাকবে না, সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে গেল রাজার ধর্ম। ঠাকুরের সময় উঠেছিল ব্রাহ্ম সমাজ, ঠাকুর বলতেন ইদানিংকালের ব্রহ্মজ্ঞানী। আমাদের এখানেও ওই মত আছে, ঠাকুরের বক্তব্য হল, ইংরেজরা নূতন কি আর বলছে।

কিয়ৎকাল দুইজনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

যে ব্রহ্মজ্ঞানের তিনি সাক্ষাৎ করেছেন, তার বর্ণনা করছেন, এটা গীতার বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞান নয়, উপনিষদের বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞান না। আমরা কোন মুনি, ঋষি, মহাত্মা পাইনা যিনি এভাবে পরিষ্কার করে বলবেন –আমি এই রকম দেখেছি। তাঁরা অনেক সময় কোন গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু এখানে একেবারে পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছেন –ব্রহ্মজ্ঞান বলতে এই।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলছিলেন, কে একটা ওদের কি বই নিয়ে এলো, তাতে শুধু পাপ আর পাপ। বইটা ছিল বাইবেল। আমরা যতটা জোর দিয়ে ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলছি, ঠাকুর যে ততটা জোর দিয়ে বলেছেন, তা না। পরে পরে এটাই হল, তোমার মত অনুযায়ী তুমি যাও, কোন অসুবিধা নেই। ঠাকুরও বলছেন, নিজের যে পথ, নিজের যিনি ইষ্ট, সেখানে স্থির থাকতে হয়। আমরা বলি ঠাকুর ইসলাম মতে সাধনা করেছিলেন, খ্রীশ্চান ধর্মে সাধনা করেছিলেন। কিন্তু এতটা হলে একটা যে মৌলিক প্রশ্ন, 'ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত'? ঠাকুর এই প্রশ্ন করতেন না। ঠাকুরের খুব ইচ্ছে ছিল জানার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কেমন, সাধনা করে তিনি যীশুর দর্শন পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি যে খ্রীশ্চানদের মত, ইসলামের মত পুরো জানতেন; যে অর্থে আমরা জানা বুঝি, সেই অর্থে জানতেন না। ঠাকুরের এই প্রশ্নটাই এখানে এই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

মাস্টারমশাই উত্তরে ঠাকুরকে শুধু একটি কথাই বললেন, ওরা নিরাকারবাদী। ঠাকুরকে বুঝতে গেলে ঠাকুরের যে দুটি ভাব এই দুটো ভাবকে আগে ভাল করে বুঝতে হবে। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে*। আচার্য শঙ্কর এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, একই বৃক্ষে দুটো পাখি বসে আছে –একজন হলেন ঈশ্বর, আর-একজন তাঁর ভক্ত, অর্থাৎ

জীব। জীব এখন কি রূপে থাকবে বলা মুশকিল। আপনি নিজের জীবনেই দেখুন, দশ বছর আগে আপনি এক-রকম ছিলেন, আজকে আর-এক রকম। আপনার আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁরাও ওই রকমই; আগে এক রকম ছিলেন, আজ অন্য রকম। আবার লোকদের মধ্যে কত তফাৎ। কিন্তু ঈশ্বর এক, জীবে তফাৎ। জীব যে ভাবটা নিয়ে আছে, সেটাই হল সে। অবতারও যখন মানুষ হয়ে আসেন, তাঁর ভিতরে যেন এই দুটি ভাব থাকে। না থাকলে লোকেরা অবতারের সঙ্গে জুড়তেই পারবে না। তফাৎ হল আমাদের জীব ভাব, এটাকে আমরা আসল মনে করি, তাঁরা জানেন ওটা আসল না, ওটা কিছু না। শ্রীরামচন্দ্র যে ব্যক্তিত্ব ধারণ করে আছেন, সেটা আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যক্তিত্ব ধারণ করে আছেন, সেটা আলাদা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যক্তিত্ব ধারণ করে আছেন সেটা আলাদা। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের রূপ ধারণ করে আছেন, একজন সাধকের রূপ। ঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধি নিয়ে যখন কথা হবে, তখন আমরা ঠাকুরকে সাধক রূপে, সিদ্ধ রূপে দেখব। কিন্তু ঠাকুরের যে অন্য রূপ, ঈশ্বর, যেটা জীব কখন জানতে পারে না। যদিও মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, কিন্তু সেটা যে কত উচ্চ অবস্থা আমরা ধারণাও করতে পারি না, কত জন্মের পরে ধারণা হবে জানা নেই, সেটার পরে পিছনের দিক আর থাকে না। সেটা আলাদা। কিন্তু সাধারণ জীব যখন ওই অবস্থায় পৌঁছায়, নিজেকে যখন পরমাত্মার সঙ্গে এক জানছে; এটা এক রকম। আর পরমাত্মা নিজে যখন আসেন, তখন পুরো জিনিসটা অন্য রকম।

ঠাকুর পরমাত্মা, জীব রূপে এখানে খেলা করছেন। এই খেলা করার জন্য একটা কিছু তো তাঁকে অবলম্বন করতে হবে। গ্রাম দেশে যাত্রা হবে, এখন জমিদার মহাশয়ের ইচ্ছে হয়েছে তিনিও যাত্রাতে ভাগ নেবেন। তখন জমিদারকে মৃত সৈনকের ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হল। মৃত সৈনিক হয়ে জমিদার মশাই এখন মাটিতে শুয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, আমি এত টাকা দিয়েছি, আমি মৃত সৈনক হব না, আমাকে দুটো কথা বলতে দিতে হবে। যাত্রা হয়ে গেল পণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের ক্ষেত্রে মৃত, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পুরো জীবন্ত। ঠাকুর যদি থেকে থেকে রাস্তায় বলতে শুরু করেন, আমি সেই ভগবান, আমি সেই ভগবান। যীশু শুধু বললেন, আমি ঈশ্বরের সন্তান, তাতেই তাঁকে ক্রুশিফাই করে দেওয়া হল। ঠাকুরের যে কি কাণ্ড হত যদি বলতেন, আমি সেই ভগবান, ভগবানই জানেন কি হত। আপনারা যাঁরা শুনছেন এই ভাবটা একটু মনে জাগিয়ে রাখবেন। ঠাকুর এসেছেন সনাতন ধর্মে আর-একবার প্রাণ দান করতে। আমরা প্রাণ দান করার কথা বলছি, হয়ত শব্দগুলো একটু এলেমেলো হয়ে যেতে পারে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, কালের নিয়মে সনাতন ধর্ম এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে, অবতার এসে তখন আবার সব কিছু নূতন করে ওর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দেন। গীতাতে যে ধর্মসংস্থাপনায় বলছেন, তার মানে আবার নূতন করে ধর্মকে ওর মধ্যে দিয়ে দেওয়া। এবারের অবতারে ঠাকুর এই কাজটা করলেন নিজে এক অভূতপূর্ব সাধনা করে। তিনি যে সমস্ত ধর্মের স্থাপনা করছেন তা না, স্থাপনা করছেন সনাতন ধর্মের। অন্য ধর্মের সংস্থাপন করতে হলে তাঁকে সেই ধর্মে জন্ম গ্রহণ করতে হত।

তাঁকে যখন বলা হল, ওরা নিরাকারবাদী, তখন ঠাকুর বলছেন, আমাদের এখানেও এই মত আছে। খুব গভীর কথা, যতটা আমরা হাল্কা ভাবে নিতে চাইছি, সেইভাবে হাল্কা নেওয়া যাবে না। এখানে ইংরেজদের কথা বলা হচ্ছে। বক্তব্য হল, ইংরেজরা যে আমাদের নূতন কোন কথা বলছেন, আসলে তা নয়, এই মত আমাদের এখানেও আছে। এটা ইসলামের প্রতি আরও বেশি জোরালো। ইসলাম সব সময় আমাদের পৌত্তলিক বলে যাচ্ছে, কত নিন্দা, কত কি বলে। বেদের ক্লাশে আমরা *না তস্য প্রতিমা অস্তি* মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছি। সেই নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে এমন এমন কমেন্ট লিখতে শুরু করল, দেখে লজ্জা পেয়ে যায়; মানুষ এতটা নিচ হতে পারে! তুমি কি বলতে চাইছ ভাই, তোমার ঈশ্বর নিরকারাবাদী? এটাও তো আমাদের ধর্মে আছে। তফাৎ হল তুমি একটা দোকান খুলে আছ, আর হিন্দু ধর্ম সেখানে একটা সুপার স্টোর। তোমার দোকানে যাবতীয় যা কিছু আছে, এখানে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই সব আছে।

কিছু দিন আগে নেপালের এক ভদ্রলোকের সাথে আমার কথা হচ্ছিল। ঠাকুরের বই পড়ে তিনি ভক্ত হয়েছেন, তারপর আট-দশ বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। সেখান থেকে কারুর একজনের কথা উঠল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলছেন, 'যিনি ঠাকুরের বই পড়েছেন, তিনি কি করে অন্য কোন ভাবে বা অন্য কোন পথে যেতে পারেন? কারণ ধর্মের ব্যাপারে যাবতীয় যা কিছু জানার আছে সবটাই তো এখানে আছে'। আমি বললাম, 'ঠিকই বলছেন, কিন্তু তাও যাবে, তার কারণ যারা হাভাতে তারা যখন শুনল অমুক জায়গায় অমুক এক গুরু আছেন খুব বড়; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দৌড়ে যাবে'। আপনারা জানেন হরিদ্বার, হৃষিকেশ, উত্তরকাশীর দিকে প্রচুর সাধু থাকেন। সেখানে অনেক অন্নক্ষেত্র আছে। অন্নক্ষেত্রে গেলে আপনাকে চারটে করে রুটি আর এক হাতা ভারী ডাল দিয়ে দেবে। এই রকম দু-তিনটে অন্নক্ষেত্রে যদি ঘোরেন আপনার দুপুর-রাত্রের খাবার হয়ে যাবে। তবে ওরা সাধু-সন্ন্যাসীদেরই দেয়, আপনাদের দেবে না। উত্তরকাশী ছোট জায়গা, সবাই সবাইকে জানে। হৃষিকেশে সাধুর সংখ্যা আরও বেশি, আর ওখানে আখাড়াও বেশি যেখানে অন্ন দেয়। ওখানে একটা মজার গল্প আছে, সত্যিকারের ঘটনা। ষাট-সত্তর জন লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকে রুটি-ডাল দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ একজন এসে বলল, ওই আখড়াতে লাড্ডুও দিচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে এই অন্নক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে গেল। সবাই দৌড় লাগালো রুটি-ডালের সঙ্গে লাড্ডু পাওয়ার জন্য। এই যারা ঠাকুরের বই পড়েছেন, হঠাৎ কেউ এসে বলল ওখানে লাড্ডুও পাওয়া যাচ্ছে, ঠাকুরকে ছেড়ে দিলেন দৌড়। এটা একটা ঘটনা আপনাদের বললাম।

এই রকম অন্য একটা গল্প আমাদের একজন মহারাজের কাছে শুনেছিলাম। উত্তরকাশীতে উনি থাকতেন, চা খেতে খুব ভালবাসতেন। কোন আখড়াতে শুনতে পেলেন, আজ বিকালে অমুক জায়গায় চা দেবে। অমুক জায়গায় মানে, পাহাড়ী রাস্তায় তিন কিলো মিটার যাওয়া, তিন কিলোমিটার আসা। উনি ভাবলেন সাধুদের একশ কি দুশ গ্রাম চা পাতা দেওয়া হবে। ওখানে গিয়ে দেখছেন সবাইকে এক কাপ করে চা খেতে দেওয়া হচ্ছে। সাধুদের এই ধরণের বিরাট বিরাট কাণ্ডকারখানা হয়। আমি উত্তরকাশীতে চারবার ছিলাম, সেইজন্য জানি সেখানে কি হয়। মূল বক্তব্য হল, যেমনি একটা টোপ খাইয়ে দেওয়া হল; টোপটা ঠিক কিনা, টোপটা ভুল কিনা, বা টোপটা আপনি ভুল বুঝলেন কিনা; কোন কিছু না ভেবে লাগালেন দৌড়। হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে ঠাকুর এটাই বলছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম থেকে যারা মুসলমান হয়েছে, খ্রীশ্চান হয়েছে, তারা নিশ্চয় কোন কারণে হয়েছে? যদি বলেন যে, আমি একটা নূতন দিক পেলাম। তাহলে আপনার জন্য একটাই শব্দ আছে –আপনি আপনার ধর্মকে বুঝতে পারেননি; স্রেফ মুর্খ, আধ্যাত্মিক অজ্ঞান। এদের জন্য একটাই কথা বলা যেতে পারে –আধ্যাত্মিক মুর্খ। সামাজিক কারণে যদি হয়, সেটা আলাদা জিনিস। কিছু করার নেই, যাদের টাকা আছে, তারা এসে আপনাকে টোপ খাইয়ে নিয়ে গেল; গলায় তলোয়ার রেখে আপনাকে ওদের ধর্মে ঢুকিয়ে দিল, সেখানে করার কিছু নেই, কি আর করবেন।

কিন্তু যদি আপনি বলেন, ধর্মের আলোচনা, তত্ত্বের আলোচনা; তোমার যা কিছু আছে আমারও আছে; কিন্তু আমার যা কিছু আছে তোমার নেই। এখানে একেবারে পরিষ্কার। এই কথা যে শুধু আমি বলছি তা না, ঠাকুরও বলছেন। তার থেকেও বেশি হল, ঠাকুর যখন বলছেন, আমাদের এখানেও এই মত আছে। যে কোন নিরাকারবাদী তা সে ব্রাহ্ম সমাজেরই হোক বা জুহুদিরাই হোক, জিজ্ঞেস করুন নিরাকার মানে কি? অসম্ভব, কেউ বলতে পারবে না। একজন মানুষের গলাটা কেটে দিন, নিরাকার হয়ে গেল। এ্যব্রাহাম, যিনি জুহুদি ধর্ম নিয়ে এলেন, তিনি একই জিনিস করলেন। বাবার দোকানে যত মূর্তি ছিল সব ভেঙে দিলেন, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে গেল নিরাকার ধর্ম। এখনও যারা পৌত্তলিক বলে হিন্দুদের নিন্দা করে, তাদের একই ভাব।

নিরাকার মানে হয় –*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। নিরাকার মানে হয় –আত্মাই আছেন, আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। তার মানে ঈশ্বরই আছেন, চৈতন্য রূপে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। এই স্তরে ওরা যাবে না,

বোঝার ক্ষমতাই নেই। ধর্মের দিক থেকে যে তাদের নিন্দা করা হচ্ছে, তা না; ধর্ম তত্ত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তুমি তোমার নিজের ধর্ম তত্ত্ব বোঝ? আমি জোর গলায় বলব, তুমি বোঝ না। আপনাদের বন্ধুরা যারা নিরাকার নিরাকার বলে আর হিন্দুদের পৌত্তলিক বলে নিন্দা করে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এই জিনিসটা কি তোমাদের মধ্যে আছে? আপনি কি বলতে চাইছেন, সেটাই তারা বুঝতে পারবে না। এবার দেখুন ঠাকুর নিরাকারের কথা বলতে গিয়ে কি বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —আমি একদিন দেখলাম, এক চৈতন্য —অভেদ। ঠাকুর এটা বোধ করছেন তিনি নিজেও তার মধ্যে। এই যে আমাদের ভেদ-দৃষ্টি, সংসারজীব হয়ে সংসার দেখছি, জীব দেখছি, মানুষ, পশু দেখছি, আসলে এর কোন কিছুই নেই। সেই অভেদ থেকে **প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ, জীবজন্তু রয়েছে;** অথচ চৈতন্যটা সেই এক। চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে এগুলো যদি একটু ধারণা করার চেষ্টা করেন, তবে হয়ত একটু বুঝতে পারবেন। সব চৈতন্য, অথচ দেখাচ্ছে জীবজন্তু, মানুষ। **তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দোফরাস, কুকুর;** সবটাই হচ্ছে এক অভেদ চৈতন্য। এটা হল, কিছুটা বিশিষ্টাদ্বৈতের ভাব। আবার এটাকে বিশিষ্টাদ্বৈতও বলা যাবে না। অখণ্ড চৈতন্য, কিন্তু মনে হচ্ছে আলাদা আলাদা অনেক কিছু। কিছুটা আমরা সমুদ্র আর তার ঢেউএর কথা বলতে পারি। এবার যদি আপনি কল্পনা করেন, সমুদের ঢেউগুলো কোনটা কুকুর রূপে, কোনটা মানুষ রূপে। যদিও এ-রকম হয় না, কল্পনা করার জন্য বলছি। কল্পনা করলে এটা অনেকটা তাই; অভেদ চৈতন্য দেখছেন, আবার রূপও দেখছেন। সমুদ্রও দেখছেন, সমুদ্রের ঢেউও দেখছেন।

একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক সনকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানকির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল, আমিও একটু আস্বাদ করলুম। এর কি অর্থ হতে পারে আমার জানা নেই, এগুলো ভাব। এই হল অভেদ চৈতন্য, যেখানে সব কিছুতে চৈতন্য আছে।

আর-একদিন দেখালে, বিষ্ঠা, মূত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন সবরকম খাবার জিনিস, —সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মতো সব আস্বাদ করলে। এই জীবাত্মা মানে শুদ্ধ চৈতন্য। **যেন জিহ্বা লকলক করতে করতে সব জিনিস একবার আস্বাদ করলে। বিষ্ঠা, মূত্র —সব আস্বাদ করলে। দেখালে যে, সব এক —অভেদ**। কোন ধর্মগ্রন্থে এই জিনিস পাওয়া যাবে না। তাই বলে কি, যিনি অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি বিষ্ঠা মুখে দেবেন? কখনই না, প্রশ্নই উঠছে না। কারণ এটা ব্যবহারিক জগৎ, যেটা বর্ণনা করা হয়েছে সেটা পারমার্থিক সত্য। পারমার্থিম সত্য কি? এক অভেদ চৈতন্য। চৈতন্য চৈতন্যের সঙ্গে মেলে। জীবাত্মা যখন বেরিয়ে গিয়ে আস্বাদ করছে, বলছেন জিহ্বা লকলক করছে; এটা হচ্ছে ঠিক ঠিক নিরাকার। যারা নিজেদের নিরাকারবাদী বা যে কোন বাদী বলে, যারা আমাদের পৌত্তলিক বলে নিন্দা করে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয়, ভাই, এই জিনিসটার বর্ণনা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে? আর এই জিনিসটা তুমি বুঝতেও পারবে কি? ঠাকুর এই জিনিসটাকে সাক্ষাৎ করেছেন, এখানে থিয়োরেটিক্যাল কিছু বলা হচ্ছে না।

গীতাতেই এই জিনিসগুলোকে নিয়ে বারবার বলা হয়েছে। সেই এক চৈতন্য সব কিছু হয়েছেন, *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে হিন্দু ধর্ম কখন কাউকে, কারুর সঙ্গে বিভেদ করে না; ব্যবহারিক দৃষ্টিতে করে। কারণ ওই পারমার্থিক সত্যে পৌঁছানর জন্য ব্যবহার দরকার পড়ে। ব্যবহার যদি ঠিক না রাখা হয়, পরমার্থে পৌঁছান যাবে না। এই অভেদ দৃষ্টিতে পৌঁছানর জন্য প্রথমে সবাইকে এই ভেদ দৃষ্টি রাখতে হবে, আপনি আলাদা ঈশ্বর আলাদা। আপনি ভক্তরূপে আলাদা, আপনাকে যারা অভক্ত তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে, পাপ থেকে দূরে থাকতে হয়, ভাল কাজ করতে হয়। এগুলো সব ব্যবহারকালে চলে। কিন্তু যখন পারমার্থিক অবস্থায় পৌঁছে যাবেন, তখন তিনি দেখবেন সব এক। ঠাকুরের শরীর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে এসে যে বিষ্ঠা, মূত্র আস্বাদ করছে —এতে কি দেখাচ্ছে? সবই সেই এক অভেদ চৈতন্য। এটাই নিরাকারের ঠিক ঠিক মানে। বস্তু, পশু, পাখি, মানুষ

যাবতীয় যা কিছু আছে, সব তিনিই হয়েছেন। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ আত্মা যিনি, তিনিই সমস্ত কিছু হয়েছেন। আমাদের গীতা, উপনিষদে বারবার এই জিনিসটাই আসে। আচার্য শঙ্কর বারবার বলছেন – ঘাসের যে ছোট্ট একটা টুকরো, সেখান থেকে নিয়ে ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই এক চৈতন্য। আচার্য শঙ্করের এটা খুব প্রিয় বর্ণনা। চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, এটাই আমাদের মত। এখানে থিয়োরেটিক্যাল কিছু নেই, ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আস্বাদ করে, ঠাকুরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, দেখ, এক চৈতন্য –অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) –আবার একবার দেখালে যে, এখানকার সব ভক্ত আছে –পার্ষদ– আপনার লোক। যাই আরতির শাঁখঘণ্টা বেজে উঠত, অমনি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হয় চিৎকার করে বলতাম, ‘ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ যায়’।

মানুষের এটা স্বভাব, যে কোন মানুষ যখন কোন জ্ঞান অর্জন করে, সে সবাইকে জানিয়ে দিতে চায় –ভাই আমি এই জ্ঞান অর্জন করেছি। অর্কিমিডিস যেদিন ল অফ বোয়েনসি আবিষ্কার করলেন, জলে কোন বস্তু দিলে বস্ত কতটা ওজন হারায়, এই জিনিসটার সমাধান পেয়ে যাওয়ার পর তিনি রাস্থায় চিৎকার করে ‘ইউরেকা’ ‘ইউরেকা’ বলতে বলতে দৌড়াতে থাকলেন। এখন তো প্রাইজ, সম্মান পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু উল্টোপাল্টা করেন, কিন্তু আগেকার দিনে যিনি নূতন কিছু পেতেন, আনন্দে চিৎকার করে বলতেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বন্ধুদের, পরিচিতদের জানাতেন –এই দেখ আমি এটা পেয়ে গেছি। বাড়িতে যাঁদের ছোট বাচ্চা আছে তাঁরা এটা ভাল বুঝতে পারবেন। ছোট বাচ্চা স্কুলে গিয়ে যা কিছু শিখে আসে, গালাগালও যদি শিখে আসে, সবাইকে সেটা বলে বেড়াবে। আমি একটা বাচ্চাকে জানি, বাচ্চাটি কোথা থেকে ‘শালা’ শব্দটা শিখেছে। বাচ্চাটা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ‘শালা’ মানে কি? আমি তো তাকে চুপ চুপ বলে তখনকার মত চুপ করিয়ে দিয়েছি। এটাই মানুষের স্বভাব, যা শিখবে, সেটা সবাইকে জানাবে। যারা কবিতা লেখে, তারা পরিচিতদের ধরে ধরে স্বরচিত কবিতা শোনাতে থাকবে। বাচ্চার হাতে একটা ট্যামট্যামা দিয়ে দিন, সে যদি বাজাতে শিখে যায়, এরপর এমন ট্যামট্যামা বাজাতে থাকবে যে বাড়ির সবার মাথা খারাপ করে ছেড়ে দেবে।

আধ্যাত্মিক পুরুষরা যখন সেই আত্মজ্ঞান পান, তাঁরা যখন জগতের পিছনে যে সত্য সেটাকে জেনে যান, তিনি তখন চিৎকার করে এটাই বলবেন –*শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা*, হে পৃথিবীবাসী, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা শোন। আমরা প্রথমে যে *দ্বা সুপর্ণা*র কথা, ঈশ্বর আর জীবের কথা বললাম; জীব রূপে যিনি বাস করছিলেন তিনি যখন দেখলেন তিনি সেই ঈশ্বর, তাঁর তখন যে আনন্দ, কল্পনাতীত। তার সঙ্গে তিনি দেখছেন, তাঁর অনেক ভক্তরা আসবে, পার্ষদরা আসবে, অনেকে তাঁর কথা শুনতে আসবে। তা নাহলে এই বিদ্যা হারিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে বলছেন, উত্তম শিষ্য পেলে শিক্ষা ভাল প্রচার প্রসার পায়। আপনারা একটু বিচার করে দেখবেন, আপনারা ভাল শিষ্য কিনা; ঠাকুরের ভাব আপনার মাধ্যমে প্রচার প্রসার পাচ্ছে কিনা, নাকি আপনার মধ্যেই সীমিত থেকে যাচ্ছে। একটা করে দিন চলে যাচ্ছে আর ঠাকুর চিৎকার করছেন। এরপর এক এক করে ভক্তরা আসতে শুরু করলেন। যাঁরা সবাই এলেন, আপনারা ঠাকুরের সেই সব সন্তানদের কাহিনী ভাল জানেন।

বর্তমান কালের যাঁরা ঠাকুরের সন্তান, ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত, তাঁরাও ওই ডাক শুনেই এসেছেন; এখনও যাঁরা আসছেন তাঁরাও ওই ডাক শুনেই আসছেন। যদিও এতদিনে সেই ডাক সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; আর যে ডাক আমরা শুনছি, সেটাও সূক্ষ্ম রূপেই শুনছি। এই ভাবটাকে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখা –এই যে ঠাকুর বলছেন, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, তোদের দেখার জন্য আমার প্রাণ যায়। হে শ্রোতৃমণ্ডলী, আপনাদের যাঁদের মনে ঠাকুরের প্রতি মতি হয়েছে, ভক্তির উদয় হয়েছে; তাহলে জেনে রাখুন, নাতিকে দেখার জন্য যেমন তার ঠাকুরদা ছটফট করে, তেমনি ঠাকুর আপনার জন্য ছটফট করছেন। মানুষ যত না নিজের সন্তানকে ভালবাসে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজের নাতিকে ভালবাসে।

আমাদের জেনারেশানের যাঁরা সবাই তো ঠাকুরের নাতি। ঠাকুরেরও প্রাণ আমাদের দেখার জন্য আটুপাটু করছে –ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।

এই সাধারণ একটি ছোট কথা, এই ভাবটাকে যদি ভিতরে জাগিয়ে রাখা হয়, যিনি ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত –তাঁর এই ভাব, ঠাকুর আমাকে ডেকেছেন, সেই ডাকেই তো আমি আজ এখানে এসেছি। আমার সেই আধ্যাত্মিক যোগ্যতা না থাকতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। নিজের ভিতর দেখবেন আপনার অন্তর্জগতের শক্তিটা অন্য রকম হয়ে গেছে। আপনি এখন যে গা বাঁচিয়ে চলছেন, এরপর আপনি চলবেন না। প্রবাদ আছে যে, এক জায়গায় ডাকাত পড়েছে, মামা ভাগ্নেকে বলছে, তুই বন্দুক নিয়ে এগো, আমি একটু প্রস্রাব করে আসি। এই ভাব যেন না আসে, হ্যাঁ ঠাকুর ডাক দিয়েছেন, ভালো তো; অনেকেই আসছেন, আমিও যাব, আপনারা এগোন। ভগবান ডাক দিয়েছেন আমি নিজেই দৌড়াব। সন্ধ্যে হলে বাড়িতে খুব ভাল করে শাঁখঘণ্টা বাজাবেন, কাসর-ঘন্টার শব্দগুলো হল ডাক। সন্ধ্যে হয়েছে, এখন ঈশ্বরকে ডাকার সময়। তার থেকেও বড় হল, আমাদের ঠাকুর ডেকেছেন, এখন তাঁর কাছে যাওয়ার সময়।

ঠাকুর হলেন আনন্দস্বরূপ, সন্ধ্যাবেলা হল তাঁর সূক্ষ্ম শরীরকে আনন্দ দেওয়ার সময়। নরেন, রাখালরা কুঠির ছাদের উপর থেকে ঠাকুরের চিৎকার শুনে আসেননি। উপনিষদের ঋষি বেদের সময় শৃণ্বন্তু বিশ্বে বলে যে ডাক দিয়েছিলেন, ওই ডাক আর এই ডাক এক, কোন তফাৎ নেই। হে বিশ্ববাসী তোমরা অমৃতের সন্তান, তোমরা এসো; ঠাকুরও বলছেন, তোমরা এসো, বাকিদের সাথে কথা বলতে পারছি না। নিজেকে মনে করাবেন, আমি অমৃতের সন্তান। যিনি অমৃতস্বরূপ, তিনি কখন ঋষির মাধ্যমে ডাক দেন, কখন নিজেই সরাসরি ডাক দেন। এখানে সরাসরি ডাক দিয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্য আপনার হৃদয়টা খুলে দিন, যদি তাঁর অমৃত কথা একটু প্রবেশ করে। খ্রীশ্চানরা কত কি বলে, Jesus gave his life for you, আর এখানে ভগবান নিজে আপনাকে ডাকছেন, এসো, এসো, এসো, তুমি আমার আপন। কিন্তু আমরা হলাম বাড়ির বাচ্চাদের মত, বাচ্চারা বন্ধুদের সাথে খেলছে, মা এসে ডাকছে, 'ওরে আর খেলতে হবে না, খেতে হবে তো'। বাচ্চা বলবে, 'না, আমি এখন যাব না, আর-একটু খেলে নিই'। আমরাও বলি, আমি এখন যাব না, আমাকে এখন ছেলেমেয়েদের দেখতে হবে, আমাকে এখন টাকা রোজগার করতে হবে, আমি এখন সংসার সামলাতে ব্যস্ত। ঠাকুর আর কি করবেন।

আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিষয়ে তোমার কিরূপ বোধ হয়? এইসব কথা বলে ঠাকুর মাঝে মাঝে বাজিয়ে দেখতেন।

মণি –আপনি তাঁর বিলাসের স্থান –খুব সুন্দর ভাব। **এই বুঝেছি, আপনি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, কিন্তু আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন**। এগুলো প্রচলিত কথা, মাস্টারমশাইও প্রচলিত কথাকে এখানে নিয়ে আসছেন। কারণ মাস্টারমশাইর কখন মনে হত তিনি অবতার, আবার কখন এই ভাব থাকত না; ওই ভাব ধরে রাখা খুব মুশকিল। ঠাকুর কখন সাধক ছলে, কখন প্রশ্নের ছলে উপদেশ দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পরে ষড়ৈশ্বর্য হয়।

এই বাক্যটা খুব মজার। সংসারে মানুষদের কত রকমের ভাব নিয়ে থাকতে হয়। কখন টাকা-পয়সার অভাব, কখন বাড়িতে গুরুতর অসুখ, কখন সাংসারিক বিবাদ; সেখানে যদি শুদ্ধাভক্তির কথা বলা হয়? ওই পরিস্থিতিতে কিসের শুদ্ধাভক্তি! প্রাণ চলে যাওয়ার উপক্রম যেখানে, খাওয়া জুটছে না, সব সম্মান হারিয়ে ফেলেছি, সেখানে কিসের শুদ্ধাভক্তি। তখন যে সরাসরি বলবে, হ্যাঁ আমার লাগবে, আমি ঠাকুরের কাছে চাইতে এসেছি। কিছু করার নেই, সে ওই পরিস্থিতিতে ঠাকুরের কাছে চাইতেই পারে। কিন্তু সেটাকে যদি আপনি ধর্মদর্শনে ঢুকিয়ে দেন, তাহলে এলেমেলো হয়ে যাবে, শাস্ত্র

উলোটপালট হয়ে যাবে। জ্ঞান, ভক্তি, বল, বীর্য, তেজ, ঐশ্বর্য এগুলো হল ঐশ্বর্য। ষড়ৈশ্বর্য বলা হয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের ভাষায় টাকা-পয়সা।

মণি –যারা শুদ্ধাভক্তি চায় তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখতে চায় না।

মাস্টারমশাই ঠিকই বলছেন, কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য দেখতে চাওয়াতে দোষের কিছু নেই। আমাদের ঠাকুরও জগন্মাতার কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঐশ্বর্য দেখতে চেয়েছেন। দেখছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে লোকেদের আকর্ষিত করতেন। ঠাকুরের মধ্যে ওই ঐশ্বর্য হতে শুরু করল। ঠাকুরেরও মাঝে মাঝেই মনে হত, দেখি তো এই ঐশ্বর্যটা কেমন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ঠাকুরকে প্রায়ই বলি –ঠাকুর আমার মুক্তি হতে বাধ্য, আজ হোক আর কাল হোক, কেউ আটকাতে পারবে না। স্থূল জগতের সব দেখা হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা দেখা হয়নি, দেখার কোন আগ্রহও আমার নেই। মানুষের যে রূপ, প্রকৃতির যে রূপ, আমাদের দেখা হয়ে গেছে, সেইজন্য জগতের কোন কিছুই আর দেখার আগ্রহ নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম জগৎ কেমন, কারণ জগৎ কেমন; এটা দেখার ইচ্ছে আছে। প্রভু কোটি কোটি জন্ম দিয়ে যখন আমাকে এতটা ঘোরালে, মুক্তির আগে ওটা একটু দেখিয়ে দাও। এটা কি? *এতাবানস্য মহিমা*, মহিমা মানে ঐশ্বর্য। এই যে আমরা স্থূল জগৎ দেখছি, এটা তাঁর ঐশ্বর্য। যা কিছু দেখছেন, প্লেন উড়ে যাচ্ছে, রকেট উৎক্ষেপণ হছে; ভগবানের ঐশ্বর্য। অন্য দিকে তাজমহল, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, এগুলোও তাঁর ঐশ্বর্য। এগুলো তো সাধারণ জিনিস, কোথাও মাটি, কোথাও পাথর, কোথাও লোহা পুরো জমিয়ে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড –*এতাবানস্য মহিমা*। মহিমা, তাঁর এই ঐশ্বর্য দেখতে তো ইচ্ছে হয়। কিন্তু যে অর্থে হাজরা বলছেন ওই অর্থে না। হাজরা মশাই চাইছিলেন, যদি কিছু পাওয়া যায়। আর ঠিক তাই, হাজরার সম্বন্ধে এখানে ঠাকুর খুব মজার কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বোধ হয়, হাজরা আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়। আর-জন্মে মানে আগের জন্মে হাজরা কি ছিল বলছেন। গরীব মানুষ কি করবে, ঐশ্বর্য দেখতে চাওয়া তার জন্য স্বাভাবিক। ঠাকুর নিজেও দরিদ্র ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। ঠাকুরেরও একবার ইচ্ছে হয়েছিল রূপোয় গড়গড়ায় তামাক টানবেন। হাজরা এই জন্মেও গরীব ছিলেন, তার উপর এত দেনা, কি করবেন? ঠাকুর এসব কথা বললেও তিনি তাকে তো টেনে সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবেন।

হাজরা এখন বলছে, রাঁধুনি-বামুনের সঙ্গে আমি কি কথা কই। আবার বলে, আমি খাজাঞ্চীকে বলে তোমাকে ওই সব জিনিস দেওয়াব। (মণির উচ্চহাস্য) এখানে আমাদের মাস্টারমশাই একটা সাংঘাতিক কাজ করেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলছেন, সেখানে বলছেন, তত্তৎ *প্রাপ্য শুভাশুভম্*, ভাল-মন্দ যেমন আসছে তেমনটি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। আমরা ঠাকুরকে দেখছি, আশেপাশে যা হচ্ছে সেটাকে নিয়ে মন্তব্য করছেন, কথা বলছেন; এটা হল একটা পূর্ণ ভাব। পূর্ণ ভাব বলতে, আধ্যাত্মিক রূপে যাঁরা সিদ্ধি পেয়ে যান, তাঁদের অনেক রকমের ভাব হয়। ভাব মানে এখানে attitude, যেমন শান্তভাব, যাঁর শান্তভাব তিনি কোন কিছুতে জড়াবেন না। কিন্তু ঠাকুর ছিলেন সম্পূর্ণ জ্ঞানের মূর্ত রূপ। এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞানের ভাব, ফলে কখন কোন ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার, আবার কোন কোন ব্যাপারে হাসিমজা করছেন, রসেবশে থাকছেন। আমরা যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, আমাদেরও এই ভাব। ঠাকুরের যাঁরা শিষ্য, প্রশিষ্য, তাঁদেরও এই ভাব। ঋষিদেরও শান্তভাব, কিন্তু তাঁরাও আনন্দে থাকতেন। খ্রীশ্চানদের এটা বিরাট বড় সমস্যা; কারণ তাঁদের কাছে ঈশ্বর আলাদা, জগৎ আলাদা। যার জন্য আমেরিকার একজন খ্রীশ্চান স্বামীজীকে বলছেন, 'আপনি এত হাসেন কেন, গম্ভীর থাকতে পারেন না? কখন কি সিরিয়াস হতে পারেন না'? স্বামীজী বলছেন, 'হ্যাঁ যখন পেটে ব্যাথা হয় তখন সিরিয়াস হয়ে যাই, মুখ গোমড়া করি'। *রস বৈ সঃ*, আপনি সেই রসস্বরূপের সন্তান, রসেবশে কেন থাকবেন না।

এখানে হাজরা নিজের সমস্যা মেটাতে পারছেন না, আবার এদিকে বলছেন খাজাঞ্চীকে বলে তোমাকে ওই সব জিনিস দেওয়াবো। কিন্তু ঠাকুর সহাস্যে বলছেন –**ও ওই সব কথা বলতে থাকে, আর আমি চুপ করে থাকি**। রসেবশে থাকবেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সব কিছুর উত্তর দিতে হবে না। আমরা দেখেছি, ভক্তরা এখানে আসেন, এসে আমাদেরই উপদেশ দেন। ভক্তানি হলে তো আরও বেশি উপদেশ দেবে, পা এগিয়ে এগিয়ে উপদেশ দিতে আসবে। কেউ এলেই নিজেকে বলি –একেবারে চুপ থাকতে হবে। কিন্তু ওই দুটো বক একটা কচ্ছপকে নিয়ে আকাশ মার্গ দিয়ে যাচ্ছিল। কচ্ছপকে বলা আছে, তুমি তোমার মুখটা একেবারে বন্ধ রাখবে, একবার মুখ খুলেছ কি মৃত্যু; এসো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কচ্ছপকে নিয়ে দুটো বক যাচ্ছে, নিচে বাচ্চারা আকাশে কচ্ছপকে দেখে ওকে নিয়ে মজা করে অনেক রকম মন্তব্য করতে শুরু করেছে। কিন্তু অত মন্তব্য করছে দেখে কচ্ছপটা শেষ মুখ না খুলে থাকতে পারল না –কাঁচকলা পাবে। তারপর কচ্ছপের যা হওয়ার ছিল তাই হল। আমারও মুখ দিয়ে দুটো কথা বেরিয়ে আসে, কতক্ষণ আর মুখ বন্ধ করে রাখা যায়। এদের এই আবর্জনা কথা কত আর মুখ বুজে সহ্য করে থাকা যায়, মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসে। ঠাকুরও চুপ থাকতেন না, সুযোগ পেলে আচ্ছা করে গালাগাল দিতেন; এই হাজরাকেই কত গালাগাল দিয়েছেন। কিন্তু এখানে ঠাকুর বলছেন, আমি চুপ করে থাকি; এই নয় যে সব সময় তিনি চুপ করে থাকেন।

মণি –আপনি তো অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শুদ্ধভক্ত সে ঐশ্বর্য দেখতে চায় না। যে শুদ্ধভক্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে দেখতে চায়। –প্রথমে ঈশ্বর চুম্বক পাথর হন আর ভক্ত ছুঁচ হন –শেষে ভক্তই চুম্বক পাথর হন আর ঈশ্বর ছুঁচ হন –অর্থাৎ ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায় –চক্ষু ঝলসে যায় না –বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায় –তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।

ঠাকুরের এই পুরো বক্তব্যটা যদি বুঝতে চান, তাহলে গীতার একাদশ অধ্যায়ে আমাদের যেতে হবে। বিশ্বরূপদর্শন যোগে অর্জুন ভগবানকে ঐশ্বর্য রূপে দেখতে চাইলেন। ভগবান তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। ভগবানের ওই ভয়ঙ্কর রূপ অর্জুন নিতে পারছিলেন না। ভগবান বলছেন, আমি কাল, *লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, এই মহাভারত যুদ্ধে সব কটাকে মারার জন্য আমি এই রূপ ধারণ করেছি। অর্জুন ভয়ে কাঁপছেন, মাথা ঘুরছে, শরীরের সব রোম দাঁড়িয়ে গেছে, ঘাম বেরোচ্ছে। হাতজোড় করে অর্জুন প্রার্থনা করছেন –হে প্রভু, আমি আপনাকে সেই আগের রূপে দেখতে চাই। অথচ অর্জুন নিজেই বিশ্বরূপ দেখতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরও অনেকবার মা কালীর কাছে মায়া রূপ দেখতে চেয়েছিলেন, মা তাঁকে মায়া রূপ দেখিয়ে দিলেন। একদিন দেখছেন, গঙ্গা থেকে এক অতি সুন্দরী রমণী উঠে এলো। এত সুন্দরী রমণী ঠাকুর কখন দেখেননি। তারপর তাঁর পেট বড় হতে শুরু হল, প্রসব করলেন, বাচ্চাকে কোলে নিলেন, স্তন্য পান করালেন, তারপর কচকচ করে বাচ্চাকে খেতে শুরু করলেন। ভেবে দেখুন তো, আপনার চোখের সামনে এই দৃশ্য যদি সংঘটিত হয়, কি অবস্থা হবে আপনার? বাচ্চাকে খেতে হবে না, গঙ্গাগর্ভ থেকে এক অতি সুন্দরী নারী উঠে এলো, গর্ভসঞ্চার হয়ে পেটে বড় হয়ে গেল, একটা বাচ্চা প্রসব করলেন – এতটুকু দেখেই আমরা ঘাবড়ে যাব। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করল, তারপর কচকচ করে খেয়ে ফেলল। আমরা পারব নিতে? ঠিক তেমনি, অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, ওই রূপ সবাই নিতে পারবে না। ভগবানের যে ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ, যেখানে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার একসাথে করছেন, সবাই নিতে পারবে না। আমরা যখন বাচ্চাদের কোন সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাই, কোন বিভৎস দৃশ্য থাকলে আমরা বাচ্চার চোখটা হাত দিয়ে ঢেকে দিই।

ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি যখন দর্শন দেন চৈতন্যরূপে দর্শন দেন, কি ঈশ্বর রূপে যখন দর্শন দেন, তখন তিনি জানেন আমার ভক্ত এটা নিতে পারবে না। সেইজন্য তিনি ভক্তের সামনে শান্ত রূপে আসেন, আলোময় রূপে আসেন। আলোময় রূপে তো তিনি আসবেনই, কিন্তু ওই আলো বিভিন্ন রকমের হয়। ঠাকুরও বর্ণনা করছেন, এই আলো, সেই আলো। কঠোপনিষদে এই আলোর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে –*অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ*, বুড়ো আঙুলের মাপে এক জ্যোতি, তাতে কোন ধুম্র নেই। এখানে ঠাকুর বর্ণনা করছেন –আভা। আলোর বিভিন্ন শব্দ আমরা ব্যবহার করি, তার মধ্যে একটি শব্দ হল আভা। আভা হল, খুব মিষ্টি এবং মধুর এক আলো। এর সবচেয়ে কাছের উপমা হল, ভোরবেলা সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন সূর্যকিরণের শোভা যেমন হয়, একটা মনোরম আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বলা হয় যে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের রঙটা একটু পীত, হাল্কা রক্তিম সব মিলিয়ে এমন একটা সুশোভন বর্ণচ্ছটার বিচ্ছুরণ হয় যে, তাকিয়ে থাকলে চোখ তৃপ্ত হয়ে যায়, ইচ্ছে করে দেখতে থাকি। কিছুক্ষণ পরেই ওই আলোতেই সূর্যের তেজ এসে যায়, তখন আর তাকিয়ে থাকা যায় না, একটু তাকালেই চোখ ঝলসে যায়। তাই তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন। দুজনেই আবার চুপ করে আছেন।

মণি –এ-সব দর্শন ভাবি, কেন সত্য হবে না –যদি এ-সব অসত্য হয় এ-সংসার আরও অসত্য –কেননা যন্ত্র মন একই। ও-সব দর্শন শুদ্ধমনে হচ্ছে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচ্ছে।

অনেক আগে বিদেশের এক নিউরোলজিস্ট ঈশ্বরদর্শনকে নিয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বরদর্শন কেন আমরা মিথ্যা বলব, কারণ যন্ত্র সেই এক। যে মন দিয়ে ঠাকুর ঈশ্বরকে দেখছেন, সেই মন দিয়ে আমি সংসারকে দেখছি। সংসার যদি সত্য হয় তাহলে ঈশ্বর কেন সত্য হবে না। শুধু ঈশ্বরকে মিথ্যা করার জন্য যদি বলেন, সংসার যদি মিথ্যা হয়, তাহলে দুটো সম্ভবনা থাকে –মনটা মাঝখান থেকে চলে যায়। মন যদি চলে যায় তাহলে কি থাকবে? বৌদ্ধদের মত শূন্য থাকবে, নাহলে বেদান্তীদের ব্রহ্ম, এক অভেদ চৈতন্য থাকবেন। যার যেমন মত সে তেমন মানবে। কারণ মনই নেই, মন যখন নেই তখন এটা হোক, সেটা হোক, কোন কিছুই বলার নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এবার দেখছি, তোমার খুব অনিত্য বোধ হয়েছে। আচ্ছা, হাজরা কেমন বল। হাজরা সম্বন্ধী ছিলেন কিনা, থেকে থেকে ঠাকুর হাজরার কথা জিজ্ঞেস করছেন।

মণি –ও একরকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে? এগুলো হল বাজিয়ে নেওয়া।

মণি –আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কোন পরমহংসের সঙ্গে?

মণি –আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই। অনেক সময় গুরু শিষ্যের পরীক্ষা নেন, শিষ্য কতটুকু বুঝল। স্বামীজীকেও ঠাকুর জিজ্ঞেস করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –অচিনে গাছ শুনেছ?

মণি –আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সে একরকম গাছ আছে –তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি –আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার জো নাই। আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে!

খুব দামী কথা। আমরা ওটাই বুঝি যেটাকে আমরা ছাপিয়ে যেতে পারি। ঠাকুরকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব না, কারণ তিনি অনন্ত। কিন্তু আপনি যত তাঁকে বুঝবেন, তত আপনি উন্নত হবেন। যদি আপনি মনে করেন, আপনি এটা বুঝতে পারছেন; ধরুন আপনি বলছেন, মহারাজ, অনেকে এসে আমাদের বলেন, আপনার ক্লাশ শুনে এখন গীতা বুঝতে পারছি, আপনার ক্লাশ শুনে এখন উপনিষদ বুঝতে পারছি, তার মানে আপনি উন্নত হচ্ছেন। একটা হল কাউকে বুঝে নেওয়া, যেমন আপনি নিজের ছোট সন্তানকে বোঝেন, বড় হয়ে গেলে বোঝা যায় না।

দ্বিতীয় হল appreciate করা, যত বুঝবেন তত তাঁর প্রশংসা করবেন, তত তাঁর সঙ্গ করে আনন্দ পাবেন। তার সাথে এর এটাও অর্থ যে, আপনি তত উন্নত হচ্ছেন। বাচ্চারা যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালবাসে না, কারুর কদাচিৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে মন গেল। আমরা শুনেছি বিদেশে মোজার্ট নামে নামকরা মিউজিসিয়ান ছিলেন, ছয় বছর বয়সেই এমন মিউজিক কম্পোজ করলেন, সবাই অবাক। এগুলো ঈশ্বরপ্রদত্ত মেধা। কিন্তু সাধারণ ভাবে বাচ্চারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিতে পারে না। কিন্তু যেমন যেমন সে বড় হয়, বুদ্ধির বিকাশ হতে শুরু করে, সঙ্গীতের স্বাদটাও তার পাল্টাতে থাকে। তখন এই গান সেই গান থেকে সরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হয়। ভারতের যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, যেটা আমাদের ঠিক ঠিক সঙ্গীত, সেটাকে বোঝার জন্য একটা উচ্চমানের আস্বাদন করা ক্ষমতা দরকার। তা নাহলে এই চলতি গান নিয়েই সে মেতে থাকবে।

মণি চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর “সূর্যোদয়ের সূর্য” আর “অচিনে গাছ” এই সব কথা যা বললেন, এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর কি অবতার? তাই পার্ষদদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকতেন, “ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়”? এই কথা বলে মাস্টারমশাই এই পরিচ্ছেদ শেষ করলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসে আছেন। ঠাকুর সাধারণত ভক্তদের সঙ্গে যখন কথা বলতেন তখন ছোট খাটে বসে কথা বলতেন। ভক্তরা মেঝেতে বসে থাকতেন। যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন ঠাকুরের ঘরে দুটো খাট –একটা শোওয়ার খাট, আর তার পাশে আর-একটা ছোট খাট। ঠাকুর প্রায়ই ছোট খাটে বসে কথা বলতেন। ওই ঘরে আপনারা যাঁরা গেছেন, এই একশ বছর আগেও ঠাকুর এখানে বসতেন আর তাঁর ভক্তরা, যাঁদের নাম এত শুনেছি, পড়েছি, তাঁরা মেঝেতে বসে ঠাকুরের কথাগুলো শুনতেন; এগুলো একটু চিন্তা করলে মনে হবে, এই তো সেদিনকার কথা। এখনও সব কিছু কেমন জীবন্ত, ধর্ম জীবন্ত, ধর্ম-জীবন জীবন্ত, অধ্যাত্ম জীবন্ত, মা কালী সেখানে জীবন্ত, অবতার জীবন্ত। এগুলোকেই চিন্তার বিষয় করলে, অনুধ্যান করলে মন আপনা থেকেই অন্য এক জগতে হারিয়ে যাবে। আমরা এত কিছু ভাবি, কি করলে মন ভাল হবে, কিন্তু কথামৃতে মাস্টারমশাইএর বর্ণিত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘরের দৃশ্যগুলি চিন্তা করলে মন নিজে থেকেই ভাল হয়ে যাবে। কিছু কিছু জিনিস ততদিন বিশ্বাসে ভর করে চালাতে হয়, যতদিন না উপলব্ধি হয়ে যায়। ঠাকুর ও তাঁর ভক্তরা যে ছিলেন, এটা বাস্তব, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর আপনারা হলেন ভক্ত, ভক্তরা উল্টোপাল্টা সন্দেহ করেন না। মা কালী যে ওখানে প্রত্যক্ষ, ঠাকুর যে প্রত্যক্ষ অবতার, এগুলোকে সন্দেহ করা কোন অবকাশ নেই। সেইজন্য কথামৃতের এই বর্ণনাগুলিকে চিন্তন, অনুধ্যান করলে মন স্বাভাবিক ভাবে ভাল হয়ে যায়।

ঘরের মেঝেতে রাখাল, মাস্টার, রতন বসে আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে, শ্রীযুক্ত হাজরা, এনারা মাঝে মাঝে আসছেন, বসছেন। শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানের তত্ত্বধায়ক রতন এসেছেন, ঠাকুরকে ভক্তি করে। রতন এসে খবর দিচ্ছে, যদু মল্লিকের কলিকাতার বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে।

রতন –আপনার যেতে হবে। তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন, অমুক দিন যাত্রা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তা বেশ, আমার যাবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকণ্ঠের কি ভক্তির সহিত গান!

একজন ভক্ত –আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রতনের প্রতি) –মনে কচ্ছি রাতে রয়ে যাব।

আপনারা অবশ্যই যন্ত্রে বা কণ্ঠে সত্যিকারের ভাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে থাকবেন। সেখানে দেখে থাকবেন, যাঁরা বাদক বা গায়ক কেমন যেন ওই সঙ্গীতে ডুবে যান। সঙ্গীত যাঁদের সাধনা, তাঁরা পাবলিকের সামনে খুব কম আসেন, কিন্তু যখন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন তখন একেবারে ওতে ডুবে যান, তখন তাঁরা অন্য জগতে বাস করেন। অনুষ্ঠান করার সময় তাই একটু কোন এলেমেলো হলে ওনাদের বুকে লাগে, খুব কষ্ট পান। কীর্তনেও ঠিক তাই হয়। কীর্তন এক আবেশ সৃষ্টি করে, সেই আবেশ সৃষ্টি হলে নানা রকম ভাব আসতে পারে। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত, তিনি ওই কীর্তনের আবেশে চোখের জলে ভেসে যাবেন। নূতন ব্রহ্মচারী রূপে জয়েন করার পর আমি একজন দুজন মহারাজকে দেখেছি, ঠাকুরের সামনে গান করে যাচ্ছেন আর তাঁর দু-চোখ দিয়ে অঝোরে জলে ঝরে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলা আরতি হয়ে গেছে, সবাই চলে গেছেন, মহারাজ নিজের মনে ঠাকুরকে গান শুনিয়ে যাচ্ছেন। একজন, দুজন ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন, কিন্তু তিনি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। ইদানিং কালে এই জিনিস দেখা যায় না। কারণ এখন যে ভজন-কীর্তন হয় তাতে নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, দ্যাখনদারটা যেন বেশি বেড়ে গেছে। কীর্তন এমন হবে যে, তাতে গায়ক ও শ্রোতা দুজনেই মজে যাবেন। শ্রোতাদের মনে একটা সাময়িক উদ্দীপন হবে, জগতকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যাবেন। এই যে একটু ক্ষণের জন্য জগৎ ভুলে যাওয়া, আর তার যে আনন্দ বোধ একবার যদি এটা শুরু হয়, ধীরে ধীরে মানুষ ভাল পথের দিকে যেতে শুরু করে। কারণ ওই ক্ষণিকের আনন্দটা মনে গেঁথে যায় –আরে তাই তো, সেই সময় আমার একটা যে আনন্দ হয়েছিল, পুরো অন্য রকম।

ঠাকুর রাত্রিবেলা থেকে যাবেন বলাতে রতন বলছেন –**তা বেশ তো**।

রাম চাটুজ্যে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতন –যদুবাবুর বাড়ির ঠাকুরের সোনার খড়ম চুরি হয়েছে। তার জন্য বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেছে। যদু মল্লিক বড়লোক, তাঁর বাড়ির খড়ম, সেটা আবার ঠাকুরের, খড়ম আবার সোনার, সেই খড়মের আবার চুরি হয়ে যাওয়া। যারা চুরি করে, তার অত বাছবিচার করে না যে, এটা ঠাকুরের জিনিস নাকি সাধারণ মানুষের জিনিস; নিষ্কাম ভাবে চুরি করে যায়। এরাও ঠিক ঠিক কর্মযোগী, চুরি করার সময় কাউকে ছাড়বে না। একবার মজা করে একজনকে বলছিলাম, সত্যিকারের যে ভাল চোর হবে, গুরুর কাছে সে যখন চৌর্যবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে, তখন গুরুদক্ষিণা রূপে সে গুরুকে কি দেবে? গুরুর বাড়ি থেকেই কিছু একটা চুরি করে গুরুকে গছিয়ে দেবে। এটাতে দেখিয়ে দেয় যে, সে ঠিক ঠিক শিক্ষাগ্রহণ করেছে।

রতন বলছেন, **থালা চালা হবে, সব্বাই বসে থাকবে, যে নিয়েছে তারদিকে তালা চলে যাবে**। আগেরকার দিনের লোকেরা থালা চালানো দেখে থাকবেন। আমিও ছোটবেলায় দেখেছি থালা বা বাটি ধরে একজন চলতে থাকত। থালা বা বাটি ওরকম চলতে চলতে চোরের বাড়ি পৌঁছে যেত। ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –কিরকম থালা চলে? –আপনি চলে? দেখুন, ঠাকুর কত কি মানছেন; টিকটিকি পড়লে তার লক্ষণগুলো মানছেন, কাঁচের শিশি ভেঙে গেছে, তার লক্ষণগুলো মানছেন, নক্ষত্রাদি মানছেন। কিন্তু থালা চলাকে, যদিও ঠাকুর গ্রামে বড় হয়েছেন, হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এই হল সার আর ভুষি দুটোকে আলাদা করে দেওয়া। এর মধ্যে ওরা হিউম্যান সাইকলজিকে লাগাতো, যদিও বেশির ভাগ সময় ভুল প্রমাণিত হত।

রতন –না, হাত চাপা থাকে।

ভক্ত –কি একটা হাতের কৌশল আছে –হাতের চাতুরী আছে।

ঠাকুর দেখুন কেমন। যাঁরা নিয়মিত বা নিত্য কথামৃত পাঠ করেন, তাঁরা অবশ্যই এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছেন –যে কোন কথা হোক, যেখানেই কথা হোক, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর সেটাকে টেনে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বরকে ভালবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, এই ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। এখানেও ঠাকুর সেটাই করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। "সা চাতুরী চাতুরী"।

আমার মাথায় এক সময় দার্শনিক কবিতা লেখার শখ চেপেছিল। বর্তমানে আমার সব বন্ধুরা বলে দিয়েছেন, আপনার দ্বারা কবিতা হবে না, লিখবেন না। ক্রিয়েটিভিটি এমন এক জিনিস, ক্রিয়েটিভিটিক্ কাজ করে একটা আনন্দ হয়; অনেক সময় মানুষ নিজের ওই কাজকে অপরের সঙ্গে শেয়ার করতে চায়। আমার থেকে ছোট একজন মহারাজকে একটা স্বরচিত কবিতা শোনাতে গেলাম। উনি আমাকে বলছেন, 'আপনার এই কবিতায় কি ঈশ্বরের বর্ণনা আছে'? আমি বললাম, 'না। জীবন-দর্শনের উপর আধার করে এই কবিতা'। 'তাহলে শুনে আর কি করব'। মহারাজের এই রূঢ় কথাটা শোনার পর প্রথমে তো আমার খুব খারাপ লাগল। তারপরেই আমার মনে পড়ল, এই একই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

ব্যাসদেব বেদের বিভাজন করেছেন, মহাভারত রচনা করলেন। এত কিছু সৃষ্টি করার পরেও কেমন অবসাদগ্রস্থ হয়ে বসে আছেন। সেই সময় সেখানে নারদ মুনি এসে হাজির হলেন। নারদের সঙ্গে ব্যাসদেবের বিষণ্নতার কারণ নিয়ে কথা হল। নারদ সেখানে বলছেন, যে গ্রন্থে ঈশ্বরীয় কথা নেই, সেটা কাকের উচ্ছিষ্টের সমান, মানে কাকের এঁটো। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যা কিছু আগে ছিল, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, ভাস্কর্য সব কিছু ধর্মের সঙ্গে জুড়ে ছিল। ক্রতু বইতে এই জিনিসটাকে আমি দেখিয়েছি –ভারতে যা কিছু আছে সব কিভাবে ধর্মের সঙ্গে জুড়ে আছে। ভারতে এখন অল্প একটু যা আছে –কম্প্যুটার কোম্পানি চালাচ্ছেন, আর্টেফেসিয়াল ইণ্টেলিজেন্স চালাচ্ছেন আর তার সাথে কোন একটা ঠাকুরের মূর্তি রেখে দিয়েছেন, সেখানে সকাল-বিকাল একটু ধূপধূনো দেন। এই জিনিসটাকেই কিন্তু পুরোদমে করতে হয়। খাওয়ার সময় *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ* মন্ত্রোচ্চারণ করে খাওয়া, অন্যান্য যত কাজ করা হচ্ছে সবেতে ঈশ্বরের একটা ভাব নিয়ে করতে হয়; যাতে হঠাৎ যদি মনে পড়ে এটা কোত্থেকে এসেছে, এটা কি, তখন ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালবাসা জাগবে। আর আপনার যে কোন চাতুরী, যেখানে মনে হচ্ছে এটা

আমি করব, সেটা যেন ভগবানের প্রতি সমর্পিত হয়। এটা হল একটা নমুনা –কিভাবে সব কিছুর সাথে ঠাকুর ভগবানকে জুড়ে দিচ্ছেন। এখান থেকে মাস্টারমশাই পরের পরিচ্ছেদে নিয়ে যাচ্ছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব

কথাবার্তা চলছে, আর সেই সময় বেশ কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন ও আসন গ্রহণ করলেন। এনারা সবাই তন্ত্রমতে সাধন করেন। পঞ্চ-মকার সাধন। পঞ্চ-মকার সাধনা আসলে রীতিমত উচ্চমানের সাধনা। পঞ্চ-মকার সাধনায় এই পাঁচটি জিনিস থাকে –মৎস, মাংস, মুদ্রা, মদিরা ও মৈথুন; মুদ্রা মানে চালভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি। তন্ত্রে এই পাঁচটি জিনিস হল পাঁচটি তত্ত্ব –আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী; পঞ্চ-মকার সাধনা মানে এই পঞ্চ তত্ত্বকে জয় করা। তন্ত্র হল গুহ্যবিদ্যা, ওনারা বলেন এক রকম কিন্তু করেন অন্য রকম।

সন্ধ্যাবেলা মন্দির, দেবালয় আদিতে যে আরতি করা হয়, তাতে পাঁচটা জিনিস দেখা যায়, যেমন কর্পূরবাতি, শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর। এখানেও পঞ্চ তত্ত্বেরই পূজা হয়। কর্পূরবাতি অগ্নিতত্ত্বের প্রতীক, শঙ্খে জল থাকে, জলতত্ত্ব; বস্ত্র আকাশতত্ত্বের প্রতীক; ফুল পৃথিবীতত্ত্ব এবং চামর বায়ুতত্ত্বের প্রতীক। এই পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে পূজা হল, হে প্রভু, এই পাঁচটি তত্ত্ব তো তোমারই, তোমাকে আর কি নিবেদন করে পূজা করব। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলছেন, মা সব কিছু তো তুমিই হয়েছ, তোমাকে আর কি অর্পণ করব। হে প্রভু, আপনিই সব কিছু হয়ে আছেন, আপনাকে কি অর্পণ করব, সেইজন্য সব কিছুর পিছনে যে শক্তি, সেটাই আপনাকে অর্পণ করছি। আর আমার চোখে এই পাঁচটা জিনিসই পড়ছে। সেইজন্য আমাদের যে আরতি হয়, আরতি হল পঞ্চ তত্ত্বের অর্পণ করা। এই পঞ্চ তত্ত্বই অন্য ভাবে তন্ত্রে পঞ্চ-মকার হয়ে আসে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই তন্ত্র থেকেই আসে, সেইজন্য পঞ্চ-মকার এক রকম, আরতি আর-এক রকম, তা না; জিনিসটা আসলে একই। কারণ এর পিছনে যে দর্শন, সেটা এক। সাধারণ মানুষ এগুলো বুঝতে পারে না। কেউ বুঝিয়েও দেয় না, আর বোঝার ক্ষমতাও নেই। ফলে কি হয়, সাধারণ মানুষ খুব করে মা কালীর পূজা করবে, মাছ, মাংস, মদিরা দিয়ে দেবীকে নিবেদন করে সেটাকে পরে প্রসাদ করে খাবে।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন আছেন, যিনি ধর্মের নামে পাপাচরণ করেন। সেই ব্যক্তি কোন বড়লোকের ভ্রাতার বিধবার সাথে অবৈধ প্রণয় করে ও ধর্মের নাম করে তার সাথে পঞ্চ-মকার সাধন করে। কি করবে মানুষ, এই যে একটু আগে যেমন বলা হল, যা কিছু করা হবে, ধর্মের মাধ্যমে করতে হবে। এই যে একটা কামভাব আসছে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এখন সে কি করবে, গলায় দড়ি দেবে? গলায় দড়ি দেওয়া সম্ভব না, ওই ধর্মকে সামনে রেখে যতটুকু পারে করে নেয়। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ধর্মের লোক, তাঁরা এই জিনিস সহ্য করবেন না। যীশুর জীবনের খুব নামকরা ঘটনা, ওদের যে মন্দির ছিল, সেখানে পায়রা বিক্রি হত, টাকা খুচরো করা হয়; তিনি গিয়ে সব ভাঙচুর করে দিলেন। কারণ তিনি এটা পছন্দ করতেন না, কিন্তু তাই বলে কি বন্ধ হয়ে গেল, আবার একই জিনিস চলতে লাগল। যারা দেহের সম্পর্ক রাখতে চায়, তারা ঠিক উপায় বার করে নেবে, এসব নানান সমস্যা আছে। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের সন্তান, যাঁরা ঠিক ঠিক ধর্মের পথে, তাঁরা এগুলোকে কোন কালেই ভাল চোখে দেখতেন না। এখানে মাস্টারমশাই ঠাকুরের ভাব সম্বন্ধে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানেন –বেশ্যা পর্যন্ত! –আর ভগবতীর এক-একটি রূপ বলিয়া জানেন।

এই বিষয়টি আমাদের সকলের বোঝা খুব দরকার। আমরা যে জীবন চালাই, জীবন চালাতে গিয়ে একটা জিনিসকে আমরা ভুলে যাই, সেটা হল জীবনদর্শন। জীবনদর্শন মানে, আমার কাছে জীবন

বলতে এইটা; আমার যে জীবন, এটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। যাঁরা আপনারা এই আলোচনা শুনছেন, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন –জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন। আমরাও চল্লিশ বছর ধরে এটাই বলে আসছি। আমাদের যেমন নেতাজী ছিলেন, তাঁর জীবনদর্শন ছিল দেশভক্তি, একা নেতাজী নন, আরও অনেকেই ছিলেন যাঁদের জন্য দেশভক্তিটাই ছিল জীবনের আদর্শ। কিন্তু জীবনদর্শন আর-একটু গভীরে চলে, যেখানে যে কোন একটা মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে জীবন চলে। যেমন সক্রেটিস, তিনি বললেন আমি সত্যকে ছাড়ব না, সত্যই আমার জীবনদর্শন। তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখা হল, এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, বিষপান করে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। ওনার শিষ্য প্লেটো ও অন্যান্যরা ঠিক করে নিলেন কায়দা করে সক্রেটিস থেকে জেল থেকে বার করে আনবেন। সক্রেটিসকে জানাতেই তিনি বললেন, এই সত্যকে নিয়ে আমি এতদিন বেঁচে আছি, এটাকে আমি কি কখন ছাড়তে পারি! মৃত্যুদণ্ডকে তিনি মাথা পেতে নিলেন।

মহাভারতে এই ধরণের কত জীবনদর্শন আছে, সেখানে প্রত্যেকেই জীবনদর্শনে স্থির। আধ্যাত্মিক জীবনে জীবনদর্শন অবশ্যই থাকতে হবে। আপনি যদি সাধুজীবন-যাপন করেন, বা সাধুজীবন যদি আপনি চালাতে চান, ঈশ্বরের পথে বা আত্মজ্ঞানের দিকে যদি এগোতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে একটা পরিষ্কার জীবনদর্শন রাখতে হবে –আমি এই, জগৎ এই; আর জগতের সাথে আমার এই সম্পর্ক। এই জীবনদর্শন একেবারে পরিষ্কার থাকা চাই, আর এই জীবনদর্শন পুরোপুরি আসে আপনি ঈশ্বরকে কিভাবে দেখেন, সেটার উপরে। সক্রেটিস যে সময় গ্রীস দেশে ছিলেন, সেই সময় সেখানে ঈশ্বর বলে কিছু ছিল না। দেবতারা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা মানুষেরই মত; সেইজন্য তিনি সত্য, কর্তব্য, ন্যায় এই ধরণের impersonal valuesগুলিকে অনেক দাম দিলেন। যার জন্য পরে পরে পাশ্চাত্য দর্শনে এই জিনিসগুলো ঘুরেঘুরে আসতে দেখা গেছে। আমাদের এখানে এই সমস্যা নেই। আমাদের এখানে কিছু কিছু মানুষ এসেছেন, এনাদের আমরা কি বলব জানিনা, ঠিক দার্শনিকও নন, ঠিক সাধুপুরুষও নন। যেমন একজন ছিলেন জে কৃষ্ণমূর্তি; তিনি নিজের মত একটা জীবন-যাপন করেছেন। এক সময় আমি ওনার অনেক বই পড়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, উনি যেটা বলতে চাইছেন বা বলছেন, ওটা আমাদের দরকারই নেই। ভগবান বুদ্ধ যেমন বলছেন, *আত্মদীপো ভব*, অর্থাৎ তুমি নিজে জ্ঞানপ্রাপ্তি কর। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে কিছু কিছু জিনিস, যেমন গুরুবাদের নিন্দা, ঈশ্বরের নিন্দা, এগুলো এসে গিয়েছিল। যার জন্য কৃষ্ণমূর্তি যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁর খুব নাম হয়েছিল। স্বাভাবিক, একজন জীবন্ত মানুষ যদি জীবন্ত দর্শন বলেন, সেটাতে তাঁর বিরাট সম্মান হবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আস্তে আস্তে সেই ভাবটা স্তিমিত হতে থাকবে, তারপর একদিন হারিয়ে যাবে। কিন্তু যাঁরা মূল তত্ত্ব নিয়ে চলেন, সময়ের সাথে সাথে তাঁদের প্রচার প্রসার হয়।

ভারতবর্ষে আমাদের এই সমস্যা নেই। আমরা পরিষ্কার জানি, ভারতবর্ষে যিনিই আছেন, তাঁদের সবারই জন্য ঈশ্বর সর্বোপরি। মাঝে মাঝে ইংরাজী পড়া কয়েকজন বাঙালী শিবলিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গ দেখে, শিবের মাথায় দুধ ঢালাকে নোংরা ভাষায় বর্ণনা করে। এই ধরণের নোংরা মনের ভাবকে নিয়ে কি বলবেন? কিছু বলার প্রবৃত্তিও হয় না। এদের বুদ্ধির বলিহারি, না শুনতে চায়, না শিখতে চায়। জন্ম থেকেই এরা সবজান্তা হয়ে আছে। সব বাঙালী না, শুধু কলকাতার লোকেদের এই সমস্যা বেশি। আমি বেশি ঘোরাঘুরি করিনি, দু-চার জায়গায় গেছি, বিভিন্ন কারণে বাংলার বিভিন্ন গ্রামে যেতে হয়েছে, তখন দেখেছি গ্রামের লোকেদের কি ভক্তি, ভক্তি যেন একেবারে টগবগ করছে। আর আমি যখনকার কথা বলছি, বাংলায় কম্যুনিস্টরা তখন ক্ষমতার তুঙ্গে। কম্যুনিস্টরা বুঝে গেল ওই জায়গাতে হাত দেওয়া যাবে না, মারাত্মক বিপদ হয়ে যাবে। কলকাতার মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকেরাই এই ধরণের উল্টোপাল্টা কথা বলতে থাকে।

ঈশ্বর যদি সত্য হন, স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক হবে। সেই সম্পর্কটা ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথেও সম্পর্কিত হয়ে যাবে। মাস্টারমশাই যেমন এখানে ঠাকুরের সন্তানভাবের

কথা বলছেন, আপনি ঈশ্বরের সন্তান। এটা কিন্তু সাধারণ সন্তান শব্দ নয়। আপনি যদি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলেন, তাহলে সৃষ্টিতে বাকি যা কিছু আছে, যত প্রানী আছে সবাই আপনার ভাই বোন হয়ে যাবে। না, এখানে বলা হচ্ছে সন্তানভাব। ভাব হল, আপনি ওটার মূর্ত রূপ। আপনি যখন নিজেকে ওটার মূর্ত রূপ বলছেন, তখন সব কিছুর প্রতি আপনার সন্তানভাব থাকবে। সমস্যা হল, আমরা এই জিনিসগুলো মুখে বলি ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে আমরা এটা করি না।

আমি রামকৃষ্ণ মিশনের চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় তিরিশ বছর কলকাতায় কাটালাম, কিন্তু তাও কলকাতার খুব বেশি লোককে আমি চিনি না বা জানি না। আমি স্বীকার করছি, এটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু কলকাতায় এমন ভক্ত নিশ্চয় আছেন, যাঁর একটা পরিষ্কার জীবনদর্শন আছে, একটা ভাব নিয়ে চলছেন, কাজে-কম্মে ছিলাম সেইজন্য হয়ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। এই ধরণের অনেক ভক্ত অবশ্যই আছেন, নাহলে এই ভাবধারা আজ এত জোরাল হতে পারত না। এখানে বক্তব্য হচ্ছে, আমার আপনার কর্তব্য কি। কর্তব্য হল, যে কোন একটা ভাব, সন্তানভাব হোক, মাতৃভাব হোক, একটা ভাবকে আশ্রয় করতে হয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে যেমন বলতে পারি, আমি হলাম মুক্তির সাধক। আমার কাছে সব কিছু থেকে মুক্তি লাভ করা, এক স্বাধীন জীবন। কোথাও কোন ধরণের ইমোশানাল এ্যটাচমেন্ট থাকবে না। বেলুড় মঠে আছি, এইটুকু আছে, ব্যস; ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা করি, এখানে কোন ঝামেলা না হলেই হল। এক একজনের এক-একটা ভাব। সেইজন্য আপনাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চেষ্টা করতে হবে, ওই ভাবের সাথে এক থাকা। আপনি একটা ভাবকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করে আছেন কিনা ধরা পড়ে যাবে আপনার দৈনন্দিন কার্যাবলীতে, আপনার ব্যবহারে।

কারণ, যখন আমরা উচ্চ চিন্তন করি, তখন দেখবেন, চিন্তাভাবনা আর কর্ম দুটোতে কোন তফাৎ নেই। উপনিষদের আলোচনাগুলো শুনলে এই জিনিসগুলো আরও পরিষ্কার হবে। আমরা ওটাই করি, যেটা আমরা চিন্তন করি, যেটাকে আমরা জানি। আগুনকে আমরা সাবধানে ব্যবহার করি, কারণ আমরা জানি আগুন সব কিছুকে ভস্ম করে দিতে পারে। আমার ভিতর যে জ্ঞান আছে, ওটাই কর্মে পরিণত হয়। আপনার কর্ম পরিষ্কার বলে দেবে আপনার জ্ঞান কি রকম। আর আপনার কর্ম এটাও বলে দেবে যে, আপনার ভাব কি রকম। আমি বেশির ভাগ ভক্তই দেখি স্বার্থপর, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর। দেখে অবাক লাগে, ভক্ত হয়ে কি করে এত স্বার্থপর হয়। যে কোন একটা ভক্ত সম্মেলনে গিয়ে একবার দেখুন, বসার জায়গা নিয়ে কি হুড়োহুড়ি। একটা অতি সাধারণ কথা বলি, ইসলাম ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে ভ্রাতৃত্ব বোধের উপরে। একশ ভাগ ভ্রাতৃত্ব বোধ, ভ্রাতৃত্ব ভাবটাই ইসলামের শিড়দাঁড়া। আমাদের এখানে প্রথমে অনন্ত ভাব, অনন্ত ভাবের জন্য কোন একটা জিনিস বাঁধবে না, কারণ আমরা রেজিমেন্টেড রিলিজিয়ান নয় কিনা। খ্রীশ্চান আদি হল রেজিমেন্টেড রিলিজিয়ান, ওদের চার্চ যেটা বলে দিয়েছেন, সেটাই মানতে হবে। আমাদের একেই অনন্ত ভাব, তার মধ্যে আবার ভাব বলে কিছু নেই। তোমার বিভিন্ন রকমের বাজনা আছে, কোন রাগরাগিণী বাজানো হয় না। বাজনাগুলো দশজনকে দিয়ে দিন, দশজন নিজের নিজের মত বাজাতে থাকবে, তাতে সিম্ফনি আর হবে না।

আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে গেলে প্রথমে দরকার ভাব, দ্বিতীয় হল ওই ভাবকে কেন্দ্র করে নিজেকে সংগঠিত করা। এই দুটো যদি না করা হয়, কোন দিন ধর্ম পথে এগোতে পারবেন না। ভক্তরা এসে জিজ্ঞেস করে, মহারাজ, ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা কি করে হবে? কি করে হবে মানে, ভালবাসা কি আপনি চান? আপনি কাউকে ভালবাসতে চাইলে কে আপনাকে আটকাতে আসবে। একটা অতি সাধারণ ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে, তারা এক অপরকে ভালবাসতে চাইলে, কে তাদের আটকাতে আসবে? বাবা-মা তাদের মারবে, ফোন কেড়ে নেবে, তখনও ভালবাসা আছে। ঈশ্বরকে ভালবাসলে আপনাকে কে ভগবানের ভালবাসা থেকে সরিয়ে নেবে? কারুর দম আছে? ভালবাসা নেই, কারণ ঈশ্বরকে আপনি ভালবাসতে চান না। এসব কথা শুনলে কষ্ট হবে, কিন্তু এটাই সত্য। আপনি বলবেন, ঠিক আছে আমি সত্যিই ভালবাসতে চাই। যদি তাই হয় তাহলে, আপনার সব কিছুতে এটা দেখা

দেবে, সব রকম আচরণে দেখা যাবে, সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত আপনার যত ক্রিয়াকর্ম হবে, সবেতেই ওটা দেখা যাবে।

সত্যিকারের যার এই বিশ্বাস হয়েছে –ঠাকুর ভগবান; তার জীবন পুরো পাল্টে যাবে। যার আগুনের জ্ঞান আছে, সে যখন আগুন জ্বালায়, সে তখন আগুনকে সামলে চলে –তাকে আর বলে দিতে হয় না যে, ওহে আগুনকে সামলে রেখে চলবে। যে জানে এ বাড়িতে কুকুর আছে, সে সাবধান হয়ে যায়। সেইজন্য সাধন-জীবনে ভাব খুব জরুরী। কারণ ভাব হল সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

দেওঘর সেন্টারে আমি দু-বার ছিলাম, দু-বারই আমি বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট স্বামী সুহিতানন্দজীকে কাছে পেয়েছিলাম। দেওঘরে বিদ্যাপীঠে আমি যখন যোগ দিই তখন উনি ছিলেন প্রিন্সিপাল; আর আমি যখন প্রিন্সিপাল হই তখন তিনি ওখানকার সেক্রেটারী। দেওঘর বিদ্যাপীঠে প্রচুর ফুল গাছ ছিল আর প্রচুর ফুল হত। আমার একবার ইচ্ছে হল যদি কিছু গাছকে বনসাই করা যায়। মহারাজকে বনসাই করা ইচ্ছা প্রকাশ করতেই খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। বনসাইএর কথা শুনে উনি আমাকে বললেন, ‘একটা গাছ নিজের প্রকৃতিতে প্রকৃতির মধ্যে বড় হচ্ছে, সেখানে তার শিকড় কেটে তাকে ছোট করে রাখা, খুব অন্যায়’। বনসাই মানেই তাই, গাছের শিকড় কেটে গাছের ফ্রীডমকে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হচ্ছে। আমার সিস্টেমে হয়ত এই বনসাই জিনিসটা ছিল, কিন্তু পরে মহারাজের কথা শুনে বনসাই জিনিসটা গাছের ফ্রীডমকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে, এই ভাবটা খুব জোরাল হয়ে গেল। তারপর থেকে বনসাই দেখলে আমি ভিতর থেকে মারাত্মক ইরিটিটেড হয়ে যাই। আমি যদি কোন সেণ্টারের ইনচার্জ থাকি, প্রথমেই আমি বনসাই করা বন্ধ করে দেব। কেন তাকে বন্ধনে রাখবেন, আপনি কে, এতে আপনার কি কার্যসিদ্ধি হচ্ছে? নিজে বন্ধনে থাকবেন না, কাউকে বন্ধনে রাখবেন না।

মায়াবতীতে অবস্থানকালে স্বামীজী একটা খুব নামকরা কথা সেখানে লিখেছিলেন, আমি কোনদিন কারুর বন্ধনে ছিলাম না, আমি কোন দিন কাউকে বন্ধনে রাখিনি। ফ্রীডম্, এটাই একটা ভাব; আমি মুক্ত আমি অপরকেও মুক্ত রাখব। আমাদের সমস্যা হল, আমি মুক্ত, কিন্তু আমি তোমাকে বন্ধনে রাখব। ফ্রীডম যদি আপনার ভাব হয়, তাহলে আপনি মুক্তির মসিহা; স্বামীজী ছিলেন মুক্তির মসিহা, আর কিছু না, শুধু মুক্তির কথা বলে গেছেন। নিজে মুক্ত, অপরকেও মুক্ত করছেন। স্বামীজীর যে জীবনদর্শন ছিল, সেটা ছিল মুক্তির উপরে। তাঁর যত কথাবার্তা, যত কাজকর্ম, সেখানে একটিই কথা –মুক্তি। আমাদের বেদান্তের একটিই কথা –মুক্তি।

ঠাকুর ছিলেন অনন্ত ভাবের, তাই তিনি এটাকেও দেখাচ্ছেন, সেটাকেও দেখাচ্ছেন; কিন্তু তার মধ্যে ঠাকুরের মূল ভাব হল –সন্তান ভাব। সন্তান ভাব অতি শুদ্ধ ভাব, অতি ভাল ভাব। ঠাকুরের সামনে গিয়ে, কি ঠাকুরের চিন্তা করলে এই বোধ –আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি ঠাকুরের সন্তান। কিন্তু সন্তানও যখন-তখন মা-বাবার কাছে গিয়ে চাই চাই করে না। মা-বাবা নিজেই ভাল করে জানেন আমার সন্তানের কি লাগবে, ওনারা দিয়ে দেন। ঠাকুরও আপনাকে দিয়ে দেবেন, যদি আপনার ঠিক ঠিক সন্তান ভাব হয় –*যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*। ভগবান যদি কাউকে না পান, নিজে আপনার জন্য বয়ে নিয়ে আসবেন। ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, ভক্ত হল ঈশ্বরের সন্তান, তার মাসোয়ার মাসে মাসে এসে যায়। সন্তান ভাবে প্রথম একটা যে বৈশিষ্ট্য, কাঙালীপনা থাকবে না। এই জিনিসটাকে নিয়ে এখন আলোচনা চলবে। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, আপনি তাঁর সন্তান; সেখানে কি করে আপনি কোন লোকের কাছে কাঙালীর মত ব্যবহার করবেন। এই ব্যাপারে একটা প্রিয় ঘটনা আমি প্রায়ই বলি। আগেকার দিনে লক্ষ্ণৌকে তাহজীব্ কা শহর বলত, খুব cultured city। ভারতের স্বাধীনতার পর সব নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানকার মুসলিমরা বেশির ভাগ শিয়া সম্প্রদায়ের ছিল, highly cultured। তখনকার দিনে শহরে টাঙ্গা চলত। কোন লোক প্রথম শহরে এলে টাঙ্গাওয়ালারা তার থেকে পয়সা নিতে চাইত না। আপ হামারে শহর মে মেহেমান হ্যায়, ঠিক এই ভাষা ছিল। হাম আপসে কিরায়া নহি লে সক্তা।

সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাব, একটু বিচার করলে দেখবেন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। যাই হোক, আমরা আবার কথামৃতের মূল জায়গাতে ফিরে আসছি।

ঠাকুর (সহাস্যে) –অচলানন্দ কোথায়? কালীকিঙ্কর সেদিন এসেছিল, আর একজন কি সিঙ্গি, –(মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব।

যদি ঈশ্বরের সঙ্গে কারুর সন্তানভাব থাকে, মাস্টারমশাই যেমন ব্যাখ্যা করেছেন –সে প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানে, –বেশ্যা পর্যন্ত –আর ভগবতীর এক-একটি রূপ বলিয়া জানে। কারণ ব্রহ্ম ছাড়া তো কিছু নেই, ঈশ্বর ছাড়া এই জগতে কিছু নেই। ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে আলাদা কিছু নয়, স্বাভাবিক ভাবে তাই তাঁর প্রতি আপনার সেইরূপ দৃষ্টি থাকবে। এ আমার শত্রু, এ আমার মিত্র, ওকে টাইট দিতে হবে, তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার; যেখানে এই ভাবগুলো চলছে –তার মানে আপনার এখনও ঈশ্বরের সঙ্গে কোন ভাব জন্মায়নি। যখনই হাতজোড় করে বলছেন, মহারাজ, আমার কি হবে? যখনই বলছেন, মহারাজ, আমার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন; তার মানে আপনার ভিতরে এখনও ভাব উদয় হয়নি। ভাব যখন আসবে, তখন দেখবেন সাক্ষাৎ ঠাকুর আপনাকে দেখছেন, সেখানে অহঙ্কারের কিছু নেই। ঠাকুর দেখছেন, আমি ভেবে কি করব, যা হয় হবে –এটাই স্বাভাবিক।

আগন্তুক বাবুরা চুপ করিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত। খুব কারণ করত। আমার সন্তানভাব শুনে শেষে জিদ্ –জিদ্ করে বলতে লাগল –'স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে ন? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে –বীরভাবেরও সাধন আছে'।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, আমার সন্তানভাব আমি এসব করিনি, লীলাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ অন্য রকম লিখেছেন; জানা নেই কোনটা ঠিক। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কথামৃতকে বেশি মানি।

অচলানন্দ এখানে একটা জোর দিচ্ছেন যে, তন্ত্র মানে শিবের কলম। যতক্ষণ একটা ধর্মের আদেশ ভগবান থেকে না আসে, সেই আদেশ লোকেরা মানবে না। মুসলমান আর খ্রীশ্চানদের মধ্যে এই নিয়ে বিরাট ঝামেলা। ইসলাম বলছে, কোরান আল্লা নিজে বলেছেন আর খ্রীশ্চানিটিতে যা কিছু আছে যীশু বলেছেন। এগুলো তর্কের খাতির। কিন্তু এটা ঠিক যে, ঈশ্বরের কথা সরাসরি যদি না থাকে, সেই কথা লোকেরা কেন মানবে! কথামৃত ঠাকুরের কথা, ঠাকুর ভগবান, আমরা কথামৃতকে পুরোদমে মানব। ঋষি, যাঁর মন পুরোপুরি ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে বা আত্মতে লয় হয়ে গেছে; তাঁর কথাকে আমরা মানব। সেইজন্য এগুলো আমাদের কাছে কোন সমস্যা তৈরী করে না। আমি প্রভু যীশুর উপর একটা ভাষণ দিয়েছিলাম। সেই ভাষণকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোক আমাকে গালামন্দ দেওয়া শুরু করে দিল। শুধু এটাই ভাবলাম, একদিকে হিন্দুদের কি প্রচণ্ড গোঁড়ামি এসে যাচ্ছে; দ্বিতীয় যেটা ভাবলাম, কি পরিমাণ অজ্ঞানরাশি এদের গ্রাস করে নিয়েছে। একজন আমাকে লিখলেন –আপ সন্ন্যাসী নেই হো, বিজনেসম্যান হো। বেচারা ভাবছে, এগুলো করে আমি পয়সা আয় করি। আরে ভাই আমাদের ইউটিউবে যে ক্লাশ নিই, এগুলো সবটাই ফ্রী, মনিটরাইজ করা নয়। ওতে ইউটিউব এ্যড দিচ্ছে কারণ তাকে পয়সা আয় করে নিতে হবে। যাদের এ্যডে অসুবিধা বোধ হয়, তাদের প্রিমিয়াম করে নিলেই হল, তখন আর এ্যড দেখাবে না। কিন্তু সবারই সব সুবিধা চাই, এটাও চাই সেটাও চাই। কতটা অজ্ঞান হলে মানুষ এই ধরণের কথা বলে।

ঠাকুর যীশুখ্রীষ্ট বলতে পারতেন না, ঋষিকেষ্ট বলতেন। ভুল তিনি কিছু বলছেন না, কারণ যিনি ঋষি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক। মুণ্ডকোপনিষদে পরিষ্কার বলছেন, যিনি ব্রহ্মকে জেনে গেছেন, তিনি

ব্রহ্মের সঙ্গে এক। ফলে তিনি যাকে যেমন আশীর্বাদ দেবেন তেমনটাই ফলবে, ফলতে বাধ্য। যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তিনি যা বলবেন তাই হবে। আধ্যাত্মিক কথা যা বলবেন তা একশভাগ সত্য। কিন্তু এখানে কি হয়, তন্ত্র আদি মত যেমন শিবের নামে বলে দিচ্ছেন, আর আপনি শিবের ভক্ত আপনিও তাই বলে দিচ্ছেন –শিবের কলম আপনাকে মানতে হবে; এই হল গোঁড়ামি। আসলে এর মূলে রয়েছে অজ্ঞান। সেইজন্য কিছু কিছু ধর্ম আছে, তাদের যে ধর্মগ্রন্থ; যেমন হিন্দি বেল্টে গোস্বামী তুলসীদাসের রামচরিতমানস, এই গ্রন্থই হল তাদের কাছে সব কিছু –সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম সব কিছু। ওদের কাছে রামচরিতমানসে যা আছে সব সত্য, কারণ স্বয়ং তুলসীদাস লিখে গেছেন। এভাবে হয় না। ঠাকুর অচলানন্দের কথার খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন।

আমি বললাম, কে জানে বাপু আমার ও-সব কিছুই ভাল লাগে না –আমার সন্তানভাব। এই জগতে কত কিছুই তো আছে, কত কিছু ভোগ করার আছে; আপনি তো জগতের সব কিছু ভোগ করছেন না। বিশ্বের বেশির ভাগ লোকে গরু-মোষ খায়, কই আপনারা তো খাচ্ছেন না। আমাকে একজন কমেন্টে লিখল –হিন্দুরা যদি মাংস-মাছ খেতে পারে, তাহলে গরুর মাংস খেতে কিসের এত আপত্তি? ভাবলাম একটা নোংরা ভাষায় উত্তর দিই। মেয়েরা পুরুষদের বিয়ে করে, তাই বলে নিজের বাবা, কাকা কিংবা আর দাদাকে বিয়ে করে না কেন? পুরুষ মানুষ হলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে, তা না, সেখানেও বাছ-বিচার থাকে। আপনারা হয়ত মাছ-মাংস খান, তাই বলে কি গরু খান, মোষ খান? খান না। জগতে কত লোক গরু-মোষ খেয়ে ভোগ করছে, আপনি করেন না। জগতে হাজার রকমের ভোগ আছে, আপনি সব করেন না। ফলে সবাইকে যে সব কিছু ভোগ করতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

ভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হয়। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাব, তোমার ভাব –আমার ভগবান এই বই দিয়েছেন, এই বই আমার কাছে সত্য; খুব ভাল; যাও, ওই বই অনুসরণ করে নিজের জীবনকে গঠন করে নাও। এটাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। যেমন ইসলাম, ওরা বলবে আমাদের ধর্ম সত্য, কারণ এই আমার ধর্মের বই, এই বই সরাসরি আল্লা থেকে এসেছে। খুব ভাল, তাই বলে আমাকেও কেন মানতে হবে। এটাই ঠিক ঠিক লিবারাল। লিবারাল জিনিসটাকে যদি আপনাকে বুঝতে হয়, সেটা হল হিন্দু ধর্ম। আমরা হিন্দুরা সব কিছুকে মানি, কিন্তু পরিষ্কার –তোমার ভাব তোমার ভাব, কিন্তু আমি ওখানে ঢুকতে যাব না। ঠাকুর যখন বলছেন মত পথ, তাই বলে কি আমার পথ ছেড়ে তোমার পথ নিতে যাব নাকি? কখনই না, কোন মতেই না। সমস্ত ধর্ম হয়ত একই সত্যের কথা বলছে, কিন্তু তাই বলে আমি মুসলমান হয়ে যাব, আমি খ্রীশ্চান হয়ে যাব, এই জিনিস কখনই হবে না। ঠাকুর, স্বামীজী কোথাও এই ধরণের কথা বলছেন না। যেটা বলতে চাইছেন –মতুয়া বুদ্ধি রেখ না, আমার মতটাই ঠিক আর বাকি সব মত ফালতু, এই বুদ্ধি রেখ না। তোমার যা মত ওটাই তোমার নিজের ভাব, ওখানে স্থির হও। শিব তন্ত্রে লিখেছেন মৈথুন করতে হবে, তাই বলে আমাকেও করতে হবে; তা কখনই না। এই ব্যাপারে আমার এই ভাব, এই ভাব থেকে আমি নড়ব না। কিন্তু তোমার যে ভাব, সেই ভাবকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আমার জন্য তোমার ভাব নয়।

বৃটিশ পার্লামেন্টের যাঁরা সদস্য হতেন, তাঁরা খুব বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিতেন। সেখানে দুজন পার্লামেন্টিরিয়ান, খুব নামকরা রাজনীতিবিদ্। দুজনে একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। সিঁড়িটা সরু ছিল, দুজনেই মোটাসোটা। একজন আগে আগে নামছেন, আরেকজন উপর থেকে আসছেন, ওনার খুব রাগ, উনি বললেন –আমি মুর্খদের পথ দিই না, এই কথা বলে গটগট করে নামছেন। যিনি নিচে ছিলেন, তিনি বলছেন –আমি মুর্খদের পথও দিই, তাঁদের সেলামও করি। কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ধর্মজীবনে অনেক সময় এই রকম করতে হয় –হ্যাঁ ভাই, আমরা মুর্খ, তুমি নিজের মত থাক। এখানে এসেই হিন্দুদের অন্য রকম সমস্যা হয়ে যায়। আবার ওরা এই নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে আসে, আপনারা তো সব ধর্ম মানেন, ফলে আপনি আমাকেও মেনে নিন। আমি সব স্ত্রীকে সমান দেখি, তাই বলে সব স্ত্রীকে

নিজের ঘরে ঢুকিয়ে নেব, তা তো হয় না। ঠাকুরের মাতৃভাব, তাই বলে সবাইকে ওখানে ঢুকিয়ে থাকতে দিচ্ছেন না। ঠাকুর একটা জায়গায় স্থির। লোকেরা এটা বুঝতেও চায় না, বিশেষ করে যারা অন্য সংস্কৃতিতে বড় হয়েছে, তার এগুলো বুঝতে পারেনা। এরপর ঠাকুর আসল কথাতে আসছেন।

অচলাননদ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলত, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন, –এ-সব ঈশ্বরেচ্ছা'! এগুলোই রিলিজিয়াস হিপক্রেসি। জপধ্যান যে তিনি করছেন না, তা না; সাধন-ভজন যে তিনি করছেন না, তাও না; কিন্তু কোথাও একটা dishonesty। ঠিক তেমনি হয় intellectual dishonesty, আপনি কথাগুলোকে বেছে বেছে দিচ্ছেন, তার যে বিপরীত কথাগুলো হয়, সেগুলো আপনি বলছেন না। ধর্মের যে সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সিলেক্টিভ কোডস্ যেটা হয়, নিজের মত বেছে বেছে কথাগুলো বলছেন, এগুলো হল religious dishonesty। আপনার ধর্ম ঠিক, কিন্তু আপনার মধ্যে, আপনার কথাবার্তার মধ্যে অনেক dishonesty আছে।

আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। বলি ছেলেদের দেখে কে? ছেলেপুলে, পরিবার ত্যাগ করেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছুতা না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন, আর অনেক টাকা এসে পড়বে।

আমাদের বেলুড় মঠের পাশেই একটা পীর দর্গা আছে। আগে নাকি ওখানে একটা পোড়ো বাড়ি ছিল; এখন সেখানে বিরাট পীর বাবার দরগা হয়ে গেছে। মঠের ভক্তরাই বেশি ওখানে যায়, প্রণামীও দিয়ে আসে। এই ধারণা যে, নিশ্চয় কোন পীর মহাত্মা হবেন, বা একজন সাধুবাবা হবেন, ওই ভেবে ওখানে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রণামীও দিয়ে আসে। ঠিক তেমনি এখানে ঠাকুর যে অচলানন্দকে নিয়ে মন্তব্য করছেন যে, উনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন, সাধনা করছেন, লোকেরা তাঁকে মানবে, লোকেরা তাঁকে টাকা-পয়সা দেবে; ঠাকুর বলতে চাইছেন, সংসার ছেড়ে ধর্ম পথে এসে নূতন করে টাকা রোজগারের ছুতো যেন না করা হয়। আমি যখন নূতন রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি, কয়েকদিন হল ব্রহ্মচারী হয়েছি, তখন আমার পূর্বাশ্রমের একজন শিক্ষক, ঠাকুরের ভক্ত, উনি আমাকে খুব মিষ্টি করে বলেছিলেন –দেখ বাবা, যদি সাধু হতে পার খুব ভাল, এর থেকে ভাল আর কিসে হবে, কিন্তু সাধু সাজতে যেও না। তখন সাধু হওয়া ও সাধু সাজা কথাগুলো বুঝতাম না, বুদ্ধি কম ছিল, বয়স কম। এখন বুঝতে পারছি, সাধু হওয়া আর সাধু সাজা দুটো আলাদা জিনিস। ঠাকুর এখানে এটাই বলছেন, সংসারের সমস্ত ঝামেলা থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম, কিন্তু এখানেও আমি সেই ভোগই করছি; এটা ঠিক না। গীতাতেও ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন –ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে নিয়ে মনে মনে সব ভোগ করছে, এটা পাপ।

মোকদ্দমা জিতব, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, –এইজন্য সাধন? এ-ভারী হীনবুদ্ধির কথা।

কিছু বাবাজীদের মধ্যে এই জিনিসগুলো হয়ত হয়, কিন্তু এগুলো খুব হীনবুদ্ধির পরিচয়। কাশ্মীরে এই রকম একজন ফকিরবাবা স্বামীজীকে বাণ মেরেছিলেন, স্বামীজীর পেট খারাপ হয়ে গেল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি, আমার জীবনে এই ধরণের ঘটনা হয়েছে, যেখানে এই হীনবুদ্ধির লোকেরা আমার উপর বাণ চালিয়েছিল। কোন কারণ নেই, আমি দেখছিলাম, আমার সব কিছু কেমন এলেমেলো হয়ে যাচ্ছিল। আমি নিজে অনুভব করেছি, সেইজন্য আমার সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলো এতই লঘু হয় যে, ঈশ্বরের ক্ষমতার সামনে এগুলোকে কাটিয়ে দেওয়া কিছুই না। সেইজন্য ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়। কোন কিছুর জন্য না, ঈশ্বরকে ভালবাসবেন ঈশ্বরের জন্য, আপনি তাঁর সন্তান। এবার টাকার ব্যাপারে ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন।

টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধু-ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরিব পড়লে তার উপকার হয়। ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন কি কি কাজে টাকার ব্যবহার করতে হয়। আপনারা অবশ্যই টাকা উপার্জন করছেন, এই টাকা দিয়ে কি কি করবেন? প্রথমে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, দ্বিতীয় থাকার একটা জায়গা করে নিতে হবে, তৃতীয় ঠাকুরের সেবা, চতুর্থ সাধুসেবা, পঞ্চম সামনে কোন গরিব দেখলে দুটো টাকা দিতে হয়, এইভাবে টাকার সদ্ব্যবহার হয়। এই যে পাঁচটা বলা হয়, এটাই আপনার জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ। কিন্তু পঞ্চ মহাযজ্ঞ পুরো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু এখানে টাকার ব্যবহার; পঞ্চ ব্যয় বলতে পারেন।

এরপর ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন, **ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্য টাকা নয়, লোকমান্যের জন্য টাকা নয়**। টাকার পিছনে কেন এত দৌড়াচ্ছেন; আমি আমার পরিচিতদের বলি, টাকার পিছনে দৌড়াবেন না। লোকমান্য পাওয়ার জন্য টাকা দিয়ে মানুষ নিজের মূর্তি স্থাপন করছেন।

সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধনা করে। কিন্তু কী হীনবুদ্ধি। সন্ধ্যা আরতিতে ঈশ্বরের বিগ্রহের যে আরতি করা হয়, তাতে পঞ্চ-তত্ত্ব দিয়ে আরতি করা হয়। কত উচ্চমানের ভাব, আরতি দর্শন করলে মন আপনা থেকেই একটা উচ্চ ভাবে চলে যাবে। আর সেখানে কিনা সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধনা করে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না। সিদ্ধাই মানেই মায়া, কারণ সিদ্ধাই একটা শক্তি, শক্তি মানেই মায়া। এই জগতে দুটি সত্তা –ব্রহ্ম আর মায়া। মায়াতে কোথাও যদি থাকেন, মানে শক্তির এলাকায় যদি থাকেন, সে ব্রহ্মের দিকে আপনাকে যেতে দেবে না।

মায়া থেকে আবার অহংকার। কি হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হল? –না মোকদ্দমা জেতা। ইদানিং আর তন্ত্র এভাবে চলে না। কিছু কিছু তান্ত্রিক এখনও অবশ্য আছে, যারা বিভিন্ন রকম সিদ্ধাই প্রাপ্তির জন্য এই রকম উল্টোপাল্টা করে। ঠাকুর কি বলতে চাইছেন বুঝে নিন, শরীরের নোংরা অঙ্গে রেখে ওরা মদ খায়। বলছেন, এর ফল কি? মোকদ্দমা জেতা। তন্ত্রের নামে, পঞ্চ-মকার সাধনার নামে নিজেকে এতটা নামাচ্ছ? এসব ক্রিয়াদি করে যদি ঈশ্বরের দিকে যাও, তাও না হয় বোঝা যায়; কিন্তু তা তো নয়, মোকদ্দমা জিততে হবে। আমার এক ভাল বন্ধু, বড় আইএএস অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। ঠাকুরের ভক্ত, রিটায়ারের আগে অত ছিলেন না, এখন হয়েছেন। উনি আমাকে সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন।

অনেক আগেকার কথা, এক সময় তিনি ডিভিশানাল কমিশনার ছিলেন, ডিভিশানাল কমিশনারের অধীনে কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। তিনি আমাদের মঠের সব কার্যবিধি দেখে একদিন আমাকে বলছেন, 'স্বামীজী, একটা সেন্টারের সেক্রেটারী, যত বড় সেন্টারই হোক, সেক্রেটারী হয়ে আপনি সারা জীবনে যত বাড়ি বানাবেন, আর আমার একজন সাধারণ বিডিও তার থেকে বেশি বাড়ি এক বছরে বানিয়ে নেবে। কিন্তু জানবেন আমরা আপনার কাছে বাড়ি বানাবার কৌশল দেখতে আসব না। আমরা যখন আপনার কাছে আসব, আমরা আপনার জ্ঞান, ভক্তি দেখতে আসব। আমরা আপনার কাছে দেখতে আসব, মুক্তির পথে আপনি কতটা এগিয়েছেন, আমরা আপনার কাছে দেখতে আসব, আপনি আমাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন'। ওনার বক্তব্য হল, আপনি সাধু-সন্ন্যাসী হয়েছেন, সঙ্ঘ-জীবনে যেটা আপনার কাজ সেই কাজ অবশ্যই আপনি করবেন, কিন্তু এটা যেন আপনার শেষ কথা না হয়। পঞ্চ-মকার সাধন, তন্ত্র সাধন আপনি নিজেই করছেন, সিদ্ধাই আপনার এমনিই আসবে। কিন্তু সিদ্ধাই যদি কাউকে দেখাতে যান, যেমনি কেউ এসে বলল, আমার মামলাটা যেন জিতে যেতে পারি। আপনিও বলে দিলেন, যাও মোকদ্দমা জিতে নাও, তাতেই সে জিতে গেল। কিন্তু তাতে কি হল? আপনার সাধনার সব সিদ্ধি বা সিদ্ধাই ওখান থেকে শুরু করে ওখানেই শেষ হয়ে গেল, এটা যে কত

বড় ক্ষতি, বোঝার অবকাশও পাওয়া যাবে না। এতদিনের সাধনালব্ধ আপনার যা কিছু উপলব্ধি, পুরো জিনিসটাই আপনার নষ্ট হয়ে গেল।

এখানে ঠাকুর তন্ত্র সাধনার কোন নিন্দা করছেন না, উনি খুব সুন্দর কথা বলছেন; এই যে এইসব করা, পঞ্চ-মকার সাধন বা যে কোন জিনিসই করা হোক না কেন, এমন কি ভক্তি করা; বলছেন, এসব করা কেন? মোকদ্দমা জেতা? এই শরীরের সুখের জন্য, টাকা-পয়সার জন্য, সংসারে নামযশ পাওয়ার জন্য, অপরকে দাবানোর জন্য আমরা যে খাটছি, এই খাটাতে দেখবেন আপনার যা উপলব্ধি হয়েছে, সব কদিন পরে চলে যাবে। সংসার মানেই তাই, সংসারে কোন কিছু স্থির থাকে না। কিন্তু ওই একই খাটনিতে যদি এমন কিছু পাওয়া যায়, যেটা চিরন্তন, যেটা চিরস্থায়ী হবে, তাহলে সেটার জন্যই আমাদের খাটা উচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন, মানুষ নিজেকে টাকাতে দেখে, নিজের স্ত্রীর মধ্যে দেখে; তাই মানুষ টাকাকে, স্ত্রীকে ভালবাসে। লোকেরা মোকদ্দমা করে, যেখানে দরকার নেই সেখানেও মোকদ্দমা করে।

অনেক আগেকার কথা, কলকাতার একজন বড়লোককে জানতাম। তখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের কোম্পানী প্রচুর টাকা আয় করেছিল। পরে সরকার অনেক কিছু দাবী করাতে উনি সরকারের বিরুদ্ধে কেসের পর কেস ঠুকে গেছেন, আর মামলা টেনে যাচ্ছেন। উনি বলছেন, আমাদের বাড়ির সিদ্ধান্ত, সরকারকে আমরা একটি টাকাও দেব না। তখন আমি খুব ইয়ং ব্রহ্মচারী ছিলাম। আমার শুনে কেমন অবাক লাগল। সবাই যদি বলে সরকারকে একটি পয়সাও দেব না, সরকার চলবে কি করে? পুলিশ সমাজে কি করে কাজ করবে? দেশের রক্ষা কি করে হবে? যাই হোক, ওনার সিদ্ধান্ত হল, সরকারকে আমরা একটি টাকাও দেব না, মোকদ্দমা করে জিতব। জিততে পারবে না, তবুও যত দিন টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তারপরে কি হবে? আর-একটা কিছু হয়ে যাবে। এখন সাইবার ক্রাইম হচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্স থেকেও বাঁচিয়ে নিচ্ছেন, ওরা ক্রাইম করে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলে অবাক লাগে, এসবের জন্য মানুষ পঞ্চ-মকার, আরও কত কিছু, মারণ-উচাটন ইত্যাদি করছে।

ঠাকুর বলছেন, কৃপণের ধন কিভাবে চলে যায়। সারা জীবন প্রচুর টাকা জমিয়ে ছেলের জন্য রেখে গেলেন, বড় হয়ে ছেলে সব উড়িয়ে দিল। আপনি এত খেটেখুটে যে এত রোজগার করলেন, এত কিছু করলেন, কিসের জন্য? যাজ্ঞবল্ক্য এটাই বলছেন, কোন জিনিসের জন্য আমরা তখনই খাটব, যখন মনে হবে সেটা আমার আত্মা, এটা আমি। কিন্তু দুদিন পরে ওটা তো পাল্টে যাবে। তখন তো আপনার সেই একই কষ্ট। কিন্তু এই একই খাটনিতে এমন কিছু যদি পাওয়া যায়, যেটা স্থায়ী, যেটা থাকবে; সেটার জন্য খাটাই তো ভাল। গীতাতেও ভগবান এই কথা বলছেন, লোকেরা এই দেবতা, সেই দেবতার পূজা করে; কিন্তু এই একই খাটনি দিয়ে আমার পূজা করত তাহলে আমার পরমধাম পেয়ে যেত, সত্যিই কি দুঃখের কথা। গীতার এই কথাটাকে যদি আমরা একটু বুঝে নিতে পারি, তাহলে এরপর ঠাকুর যেটা বলতে যাচ্ছেন সেটাকে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারব।

'আমি'র ভাব সব প্রাণিতে খুব জোরালো ভাবে থাকে। 'আমি' ভাব সাপ-বিছেতেও আছে, পিঁপড়েতেও আছে; ওদের মারতে গেল ওরা একবার অন্তত পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে। যোগশাস্ত্রে এই বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে বলা হয় –অভিনিবেশ, আমার আমিত্বটা যেন থাকে। 'আমি' বলতে কে? 'আমি' জিনিসটাই বা কি? বিরাট বড় সমস্যা। ছোটবেলা দেখতাম, বাড়িতে কেউ এলে জিজ্ঞেস করত, 'বড় হয়ে তুমি কি হবে'? ছোট্ট বাচ্চা, সে তো কিছু জানেই না। মুখের কথায় বা বড়দের থেকে কিছু শুনে নিয়ে অনেক সময় বলে দেয়, ডাক্তার হব, কি ইঞ্জিনিয়ার হব, কি মিলিটারি হব। বাংলাতে তাও ভ্যারাইটি আছে, এখানে কেউ হয়ত বলবে, আমি কবি হব, আমি লেখক হব, আমি গায়ক কিংবা অভিনেতা হব। কিন্তু বিহার, ইউপিতে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইপিএস, আইএএস ছাড়া কিছু জানেই না।

কল্পনাও করতে পারে না যে, এর বাইরেও কিছু হতে পারে। বাচ্চা বয়স থেকে ওর মধ্যে আমিত্ব ভাব, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার ইচ্ছা; সৎ ভাবে হোক বা অসৎ ভাবে হোক একটা ভাল চাকরী জোগাড় করতে হবে; এই জিনিসগুলো ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে দেহবোধ, আমিত্ব বোধ এমন বাড়িয়ে দেয় যে, দেহটাকে কিভাবে ঠিক রাখা যায়, এটা করতে করতেই আমাদের জীবন চলে যায়।

দেহ থাকলেই দেহের সুখবোধ থাকবে। কিন্তু তার থেকে বেশি নিরাপত্তা, আজকে তো খাওয়া জুটে গেল, আগামীকাল কি হবে, কোথা থেকে পাব, এই দুশ্চিন্তা থাকবে। দেহের ভোগ আর তার সঙ্গে নিরাপত্তা। দেহের ভোগের জন্য পুরুষের স্ত্রী চাই, স্ত্রীর পুরুষ চাই। নিরাপত্তার জন্য স্ত্রীর পুরুষ চাই, পুরুষের স্ত্রী চাই, সন্তান চাই। আবার অনেকে চান না, কারণ সন্তান এসে গেলে তাদের সময় বাধা হয়ে যাবে। ফলে কি হয়, এই 'আমি'র পরিধিটাও এমন ছড়িয়ে যায় যে, সেই পরিধির মধ্যে সহজেই স্থান করে নেবে গাড়ি, বাড়ি, টাকা-পয়সা, সন্তান, স্ত্রী, স্বামী; তার সঙ্গে এসে জুটবে মান-অপমানের ব্যাপার। আমার সম্মান চলে গেলে আমি আর বাঁচব না, আবার যে আমাকে অপমান করল তাকে কিভাবে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া যায় বা শেষ করে দেওয়া যায়, তার জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা ছকা। আমি অনেক ঘটনা জানি, ডিভোর্স কেসগুলো যখন হয়, তখন দেখা যায় এক পার্টি সামনের পার্টির লোকটাকে শেষ করার জন্য যা খুশি করবে। সেখানে ডিভোর্সটা কোন ব্যাপার না, আশি বছরের শ্বশুর থেকে শুরু করে সবাইকে জেলে ঢোকাতে হবে। আচ্ছা না হয় শেষ করে দিল, কিন্তু ততঃ কিম্, এরপর কি হবে। কারণ দুদিন পর আবার তোমার সেই সমস্যা আসবে। দুপুরে যত ভাল খাবারই খান, রাত্রিতে আবার খিদে পাবে। আমাদের তাই সবারই একটা কিছু এমন করা কি উচিত না, যেটা করলে এই জিনিসগুলি থেকে মন সরে আসবে?

ঠাকুর অবতার, তাঁরও অভাব ছিল। ঠাকুরও বলতেন, আমারও দুটো ঘটি-বাটি আছে, দুটো টাকা দেনা আছে। ঠাকুরের শরীরেও রোগব্যাধি ছিল, ক্যান্সার রোগে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সব বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কখন শোক নেই। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আমার হঠাৎ একদিন মনে হল, যাঁরা খুব হাসিখুশি থাকে তাদের রোগশোক কম হয়, হলেও এমন মারাত্মক কিছু হয় না। আমাদের অনেক মহারাজদের মধ্যে এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। আমাদের অধ্যক্ষ প্রভু মহারাজকেও (স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ) দেখছি, তাঁরও গলায় ক্যান্সার, কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত হাসিখুশি ছিলেন। যাঁরা ইয়ং মহারাজ তাঁদের আমি বলি, হাসিখুশি থাকবেন, তাহলে দেখবেন রোগভোগ কম হবে। আসল নিরাপত্তা কোনটা? ঠাকুর বলছেন জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য। টাকা-পয়সা কি তাহলে? ঐশ্বর্য। স্ত্রী-পুত্র কি? ঐশ্বর্য। গাড়িবাড়ি কি? ঐশ্বর্য। কেন ঐশ্বর্য? কারণ কিছুটা ভোগের শান্তি করার জন্য, কিছুটা নিরাপত্তার জন্য। অনেক সুবিধা পাওয়া যায় এই ঐশ্বর্যে। সুবিধাটা দেহসুখের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু যাঁর কিছু নেই, সে তো শাহেন্ শা; অবশ্য যদি তাঁর মন ঈশ্বরে বাস করে বা ঈশ্বর যদি তাঁর মনে বাস করেন। ঈশ্বর যদি তাঁর মনে বাস না করেন তাহলে আর শাহেন্ শা হবেন না। শাহেন্ শা হওয়ার জন্য দরকার ঈশ্বর।

অর্থ হল, 'আমি'কে যখন আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, 'আমি'কে যখন 'আমি' রূপে জানা হয়, তখন আর এসব অশান্তি থাকে না। 'আমি'কে 'আমি' রূপে জানো। 'আমি'কে আমরা কি রকম জানি? গীতায় খুব সুন্দর বলছেন –*অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, 'আমি' বলতে জানি আমি এই দেহ, 'আমি' বলতে আমরা জানি এই মন, বুদ্ধি আর *অভিষঙ্গঃ*। কিসে *অভিসঙ্গঃ*? স্ত্রী-পুত্র-বাড়িতে *অসক্তি*। *অসক্তি* হল নিজের দেহের প্রতি আসক্তি আর *অভিষঙ্গঃ* হল দেহের বাইরে যে জিনিসগুলি আছে সেগুলোর প্রতি আসক্তি। আসল 'আমি' তো আত্মা, আসল 'আমি' হলেন, আমার অন্তর্যামী হয়ে যিনি আমার ভিতর আছেন। এই আসল আমিতে যদি কেউ পৌঁছে যেতে পারে, তার আর অশান্তি থাকবে না। সেও সব কাজ করবে, তারও রোগব্যাধি হবে, তারও ঝামেলা আসবে, সবই হবে; কিন্তু শোক জিনিসটা তার আর হবে না।

ঠাকুর এখন এই জিনিসটাকেই এখন ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন। নিয়মিত কথামৃতের পাঠক বা শ্রোতারা এই কথাগুলো নিশ্চয় শুনে থাকবেন। *অসক্ত* ও *অনভিসঙ্গঃ*, এই দুটোকে একটু একটু করে অনুশীলন করে কাজে লাগাতে হয়। অনিত্য বস্তু থেকে একটুও যদি মনকে সরিয়ে আনতে পারেন, দেখবেন জীবনে অনেক শান্তি এসে যাবে। মনে রাখবেন, আসক্তি যত বেশি অশান্তি তত বেশি। আসক্তি থাকলে কোন ভাল কাজ করা যায় না, একজন শিক্ষক ভাল শিক্ষক হতে পারবেন না, একজন ডাক্তার ভাল ডাক্তার হতে পারবেন না, একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার, ভাল পলিটিসিয়ান কিছুই হতে পারবে না। যে নেতারা শুধু নিজের বাড়ির লোকেদের কথা ভেবে আখের গোছাতে নেতাগিরি করতে গেছে, নিজের কাছের লোকগুলোকে বড় করার চেষ্টা করে গেছে, এই ধরণের সব নেতারা বেশি দূর যেতে পারেনা; ধীরে ধীরে তারা জনমানস থেকে হারিয়ে যায়। একজন নেতা হওয়া মানে, ভগবান তাকে এক বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন দেশ সেবা করার জন্য। অনাসক্ত হয়ে দেশের সেবা করুন, দেখুন কিভাবে আপনি অমর হয়ে যান। সংসারে এসেছেন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, অনাসক্ত হয়ে সব কাজ করুন, দেখুন কিভাবে আপনি অমর হয়ে যাবেন। অমর হন আর না হন, জীবনে শান্তি পাবেন, শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন। ঠাকুর এখন এই কথাই বলতে যাচ্ছেন।

শরীর, টাকা –এ-সব অনিত্য। এর জন্য এত কেন? দেখ না, হঠযোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর। এখন এগুলো হয়ত কমে গেছে, বা থাকলেও নিজেদের মঠ আখড়া আদিতে সীমাবদ্ধ থাকে। হঠযোগীরা বিভিন্ন রকম আসন, প্রাণায়াম করে প্রাণবায়ু আদি নিয়ন্ত্রণ করা, এগুলোকে নিয়ে আবার চমৎকারি দেখান –যেমন আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা, বরফের উপর খালি গায়ে শুয়ে থাকা। এসব দেখে আমরাও চমকে উঠি। অথচ আমাদের ঠাকুরের খুব শীত করত, একটুতে ঠাণ্ডা লেগে যেত, কিন্তু কই হঠকারী যোগীর তো পূজা হতে দেখি না, দেখি ঠাকুরেরই পূজা হয়। কোন্ হঠযোগীর পূজা হয় বলুন? ঠাকুর বলতে চাইছেন, আমিকে 'আমি' রূপে জানার চেষ্টা কর, এই 'আমি' আত্মা, এই 'আমি' ঈশ্বর; সেইরূপে জান, তবেই জীবনে শান্তি পাবে। অন্য কিছু করলে কেঁদে মরবে।

ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। নেতি, ধৌতি –কেবন পেট সাফ করছেন। নল দিয়ে দুধ গ্রহণ করছেন। এইসব হঠযোগীদের লক্ষ্য হল, শরীরটাকে সুস্থ রাখা। শরীরটা তো একটা যন্ত্র, এই যন্ত্র দিয়ে কিছু একটা পাওয়া। কিছু দিন আগে এক ইয়ং ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল, বয়স তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ হবে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কর'? বলল, 'বডি বিল্ডিং করি'। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম ওর কাজই হল, জিমে গিয়ে সারাদিন বডি বিল্ডিং করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বডি বিল্ডিং করে কি হবে, কি করবে'? আমাকে বলছে, 'আপনি যে সন্ন্যাসী হয়েছেন, সন্ন্যাসী হয়ে আপনার কি হবে'? দেখলাম এঁড়ে তর্ক করতে চাইছে, এদের সঙ্গে কি তর্ক করব! তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম, সবার সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না, আর পারবও না। যে ভদ্রলোক ছেলেটার সাথে ছিলেন, তিনি অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় পড়ে গেলেন। আমাদের দেহটা একটি যন্ত্র, মন একটি যন্ত্র; যন্ত্রকে কাজে লাগানো হয় কিছু পাওয়ার জন্য। টাকা একটা মাধ্যম, টাকা দিয়ে সুখ প্রাপ্তি হয়। আপনার যদি এক ঘর ভর্তি টাকা থাকে, কি করবেন সেই টাকা নিয়ে? টাকাকে আপনার কাজে লাগাতে হবে। কি কাজে লাগাবেন? সুখ পাওয়ার কাজে। সুখ দিয়ে কি হবে? মনের একটা স্থিতি আসবে। কিন্তু আত্মজ্ঞান দিয়ে যদি মনের স্থিতি হয়, তাহলে সেই দিকে যাওয়াই তো সবচেয়ে ভাল।

একজন স্যাকরা তার তালুতে জিব উলটে গিছল, তখন তার জড় সমাধির মতো হয়ে গেল। এক সময় আমি হঠযোগ নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। একটু পড়ে বইটাকে প্রণাম করে ছেড়ে দিলাম। তাতে দেখেছিলাম, জিবটাকে উলটে নিয়ে একটা কচি বাঁশের ছিলকা দিয়ে একটু একটু করে জিবটাকে কাটতে থাকবে। তাতে নাকি জিবটা পুরো উলটে যায়। সেখানেই আমি বলে দিলাম, আমার এসব লাগবে না। একজন স্যাকরার জিব উলটে যাওয়াতে তার জড় সমাধির মত হয়ে গিয়েছিল। পুরোপুরি জড় সমাধি নয়, বলছেন, জড় সমাধির মত। প্রাণ বায়ু নাকি ওতে আটকে যায়, কি হয় আমার জানা

নেই। বলছেন, **আর নড়ে-চড়ে না। অনেকদিন ওই ভাবে ছিল, সকলে এসে পূজা করত**। আমাদের দেশ চমৎকারীর দেশ, শুধু আমাদের এখানেই না, বিদেশেও চমৎকারীর খুব দাম, আর সেখানকার চমৎকারী সাংঘাতিক। লোকেরা এখানে আমাদের এসে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা উনি কি কি চমৎকারী পারেন। সরাসরি কেউ জিজ্ঞেস করবে না। **কয়েক বৎসর পরে তার জিব হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। তখন আগেকার মতো চৈতন্য হল, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগ**। **(সকলের হাস্য)** জিবটা ঘুরে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে, আবার আগের মত সব কাজ করতে লাগল। এতে তোমার কি লাভ হল?

ও-সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। সবাই শর্টকাট চায়, সহজে যাতে কিছু পেয়ে যায় আর তার সাথে চমৎকারী দেখানো। ঠাকুর বলছেন, কলকাতার লোক শুধু লেকচার দেবে আর হুজুগে। হঠাৎ একজনের কিভাবে খুব নাম হয়ে গেল, আর সবাই তার দিকে দৌড়াতে শুরু করল, হুজুগে। জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করবে তা না, কোন চেষ্টা নেই, সব হুজুগে চলে। হঠাৎ খবর পেল, ওই সাধু-মহাত্মার খুব নাম হয়েছে, অনেক চমৎকার দেখায়, দৌড় লাগাল। আমাদের সময় উঠেছিল সন্তোষী মা, রাতারাতি পুরো দেশ সন্তোষী মার ভক্ত হয়ে গেল। একটা সময় এলেন রজনীশ। রিক্সাওয়ালারাও গেরুয়া পরে, গলায় মালা ঝুলিয়ে রিক্সা চালাতে লাগল। ভয়ে লোকেরা রিক্সা চাপত না, সন্ন্যাসী বেশে কিনা। তখন আবার গেরুয়া ছেড়ে রিক্সা চালাতে শুরু করল। এগুলো এখন এই রূপে নেই, অন্য রূপে আছে।

শালগ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল) –বিরাশিরকমের আসন জানত, আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলত! একটু হয়ত পড়া ছিল, যা হয়, একটু পড়েই ফরর ফরর করে সব বলতে থাকবে। **কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট পড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ করে খেয়ে ফেলেছে –গিলে ফেলেছে –পরে কোনও রূপে বার করবে**। খুব অবাক লাগে এই ভেবে যে, কোথা থেকে ঠাকুর এত সব ঘটনা জানতেন?

একবার আমরা কয়েকজন মহারাজ ও ব্রহ্মচারীরা বসেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন কোন এক সেন্টার থেকে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন। আমাদের মধ্যে নিজের গুরুত্ব জানান দেওয়ার জন্য বললেন, 'কি বলব মহারাজ, সেন্টারে শুধু পরনিন্দা-পরচর্চা হয়'। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, ভাবছেন আমরা ওনার কথায় বাহাবা দেব, বলব আপনি কত ভাল, কত কিছু সহ্য করে থাকতে হত। আমি হঠাৎ বললুম, 'শুনুন মহারাজ, আপনার এই লেকচারবাজী বন্ধ করুন তো। একবার কথামৃতটা খুলে দেখুন, পাতায় পাতায় খালি পরনিন্দা-পরচর্চা'। আমার কথা শুনে কারুরই হাসি আর থামে না। ঠাকুরের কাছে কত জায়গার কত রকম খবর। কে কার সঙ্গে জড়িয়ে, কে কি চুরি করেছে, সমস্ত খবর আছে। কিন্তু তার মধ্যেও একশ ভাব স্থিতি ঈশ্বরের উপর। সংসার এভাবেই করতে হয়। ঈশ্বর জ্ঞান থিয়োরেটিক্যালও যদি হয়, প্রত্যক্ষ যদি নাও করে থাকেন; কণায় কণায় যদি বুঝে থাকেন ঈশ্বর সত্য, এতটুকু জেনে সংসার করতে নামলে মজাই লাগে। কিন্তু কণায় কণায় ঈশ্বরকে যদি জানেন, তাহলে আপনার চরিত্রে কিছু তো পরিবর্তন হবে। ঈশ্বর সব দেখছেন, সব জানছেন; এই ভাবটাও যদি আপনার থাকে; ভুল কাজ করার সময় বুঝতে পারা যে আমি ভুল কাজ করছি; কাউকে কটূ কথা যখন বলছেন তখন এই বোধ থাকা, চুরি-চামারি করার সময় এই বোধ থাকা –অনেক হয়ে গেল, আর না।

কিন্তু নোট আদায় হল। শেষে তিন বৎসর মেয়াদ। এরপর ঠাকুর কি সুন্দর কথা বলছেন –**আমি সরল বুদ্ধিতে ভাবতুম, বুঝি বেশি এগিয়ে পড়েছে, –মাইরি বলছি**। ধর্মজীবনে এই জিনিস প্রায়ই হয়, অনেক সময় মনে হয়, আমার সামনের লোক এটা করে বুঝি অনেক এগিয়ে পড়েছে। ওকে দেখে আমরাও দৌড়াতে শুরু করি। সেইজন্য আচার্য যদি পাশে না থাকেন, এগুলোই আমাদের অনেক সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়ে সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয়। আর এগুলো এমন চোখ ধাঁধানো চমৎকারী যে, মানুষের নিজের সাধনার পথ, নিজের আদর্শটাই ভুলে যায়।

এখানে সিঁথির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছল –রামলালের কাছে। ঠাকুর আবার টাকা-পয়সা ছুঁতে পারতেন না, কারুর কাছ থেকে নিতেও পারতেন না। আমিও আমাদের অনেক মহারাজদের দেখেছি, ওনারা টাকা-পয়সা নিতে পারেন না, সঙ্গেও রাখতে পারেন না, খুব মুশকিল। কোন জিনিস যদি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় ঘুরতে শুরু করে, এটা কাকে দেব, কাকে গচিয়ে দেওয়া যায়। আমাকে এরকম কেউ কিছু দিতে এলে, আমি বলি, দেখুন আমার কাজ বাড়াবেন না। কারণ আপনি আমাকে যেটা দিচ্ছেন এটা আমার কোন কাজে লাগবে না; তাই এখন আমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে, এটা কাকে দেব –প্লিজ্ আমার কাজ বাড়াবেন না। আমাদের জীবন অতি সাধারণ; জামা-কাপড় মঠ থেকে আমরা পেয়ে যাই, এর বাইরে আমাদের কিছু লাগে না। ঠাকুরের কথা ভাবুন, এমন উচ্চস্তরের যে উনি টাকা ছুঁতে পারতেন না, সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু রাখতে পারতেন না।

সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাস করলাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে –দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। আমার কবিতা আছে –‘জয় জয় রামকৃষ্ণ অবতার’, আমাদের প্রভু এসেছেন, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, মা লক্ষ্মী যাঁর দাসী আর তাঁর মাথায় দুশ্চিন্তা –দুধের দেনা আছে। প্রভুর যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ওনার যাঁরা শিষ্য, প্রশিষ্য, ওনার ভক্ত যাঁরা, তাঁদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন। আরও অবাক লাগে, দুধের দেনার কথা ভেবে যাঁর এত দুশ্চিন্তা, সেই ঠাকুরের কাছেই কিনা লোকেরা টাকা-পয়সা চায়! আমি মজা করে বলি, যিনি নিজের ধুতি সামলাতে পারতেন না, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, এর থেকে ভাল আর কি চালাবেন। শান্ত হয়ে যান, জগৎ এই রকমই চলবে। একটু বুঝতে হয়, আমাদের মুনি-ঋষিরা এই কথা জানতেন। সেইজন্য তাঁরা আমাদের জন্য নাড়ুগোপাল, রামলালা এনে বালরূপী ভগবানের ভাব আনলেন। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের জীবনীতে রামলালার কাহিনী আপনারা অনেকেই পড়ে থাকবেন। অষ্টধাতুর নির্মিত রামলালার মূর্তিতে ঠাকুর সাক্ষাৎ জীবন্ত রামলালাকে প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁকে নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, রামলালা এদিকে দৌড়ে যাচ্ছে, সেদিকে দৌড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর কি করছেন? তাঁর সেবা করে যাচ্ছেন। আপনার বাড়ির যে ছোট্ট নাতি, তাঁর থেকে আপনি কি আশা করেন? কিন্তু দিয়ে যাচ্ছেন শুধু ভালবাসা আর ভালবাসা। ভগবানকে ঠিক এ-ভাবে দেখতে হয়। কিসের প্রত্যাশা, কিসের আশা? তোমাকে শুধু ভালবাসি। নিজেকে যেমন ভালবাসি, তোমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসি। এখন তিনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন, কি করেন না, আমার জানা নেই। আমরা তো দেখছি, প্রার্থনা করলে কোনটা পূরণ হয়, কোনটা পূরণ হয় না। যেটা পূরণ হয়, সেটা বাইচান্স পূরণ হয়, না তিনিই পূরণ করেন, জানা নেই। সেইজন্য মনের শান্তির জন্য, চাওয়াটা কম করতে হয়।

ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লি আঁচড়াতে লাগল! তখন রামলালকে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে? রামলাল বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললাম, না; এক্ষুণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে আমার শান্তি হবে না। শ্রীশ্রীমাকে যদি দিয়ে থাকত তাহলে তাও একটু শান্তি হত।

রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে হয়।

আমিটা পুরো মুছে গেছে। আপনি বলবেন, এই জিনিস করতে গেলে আমরা কি করে সংসারে থাকব? ঠিকই, সংসারে এটা আপনাদের দ্বারা হবে না, কিন্তু একটা সীমারেখা তো টানতে হবে। ঠিক করে নিন –এতটুকুতে আমার চলে যাবে, এর বেশি আমার দরকার নেই। তখন হা-হুতাশ যেটা করতে হত, সেটা বন্ধ হবে। এরপর ঠাকুর ভগি তেলী কর্তাভজাদের কথা বলছেন।

ও-দেশে ভগি তেলী কর্তাভজার দলের। ওই মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন। পুরুষ না হলে মেয়েমানুষদের সাধন-ভজন হবে না। পুরুষদের দরকার মেয়েমানুষ, মেয়েদের দরকার পুরুষমানুষ, এইসব করেই আমাদের সব সর্বনাশ করে দিল। এরা বৈষ্ণবদেরই একটা ধারা। **সেই পুরুষটিকে বলে**

‘রাগকৃষ্ণ’। রাগকৃষ্ণ বলছে কারণ সেখানে অনুরাগ রয়েছে। **তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ পেয়েছিস? সে মেয়েমানুষটি তিনবার বলে, পেয়েছি**। এ-সব জিনিস ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না, তবে একটা মত আর-কি।

ভগি (ভগবতী) শূদ্র, তেলী। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করত, তখন জমিদারের বড় রাগ হল। জমিদার এমন চালাকি করলেন যে, তার চরিত্রটাই নষ্ট করে দিল। ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে না গেলে এই ধরণের অনেক সমস্যা হয়। একটু যোগশক্তি, একটু নামযশ পেয়ে গেল, আর ওর পিছনেই পড়ে থাকল; বুঝতে পারছে না এই যোগশক্তিই, নামযশ কোথা থেকে কোন বিপদে নিয়ে যাবে সে বেচারি টেরও পাবে না। এতদিনের সঙ্ঘজীবনে আমরা কত কিছুই না দেখলাম। এই সেই করে নামযশ হয়ে গেল, ব্যস, ওই নামযশ ধরের রাখার জন্য কত কি করা, সব এলেমেলো হয় গেল, কত কি দেখলাম।

একদিন একজন বড়মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয় এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আজকে আমরা ঠাকুরকে অবতার বলছি, তাঁকে শ্রীশ্রীমা বলছেন ত্যাগের বাদশা। আমাদের আগের আগের পূর্বসূরী যাঁরা ছিলেন, হয় তাঁরা ঠাকুরের কাছে যেতেন না, আর যদিও বা কেউ কেউ যেতেন তাও আবার মোকদ্দমা জেতার জন্য। **আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই –তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ**। এর আগেরদিন অচলানন্দের কথা বলা হয়েছিল।

যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা –এ-সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, আবার তপ-জপ কি! এ-সব অনিত্য, দিন দুই-তিনের জন্য।

পূজনীয় রাম মহারাজ, স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ আমার আচার্য ছিলেন। আমরা ট্রেনিং সেণ্টারে ছিলাম, তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। কোন কারণে সেবা প্রতিষ্ঠানে আমাকে যেতে হয়েছিল, সেই সময় সেখানে রাম মহারাজ ভর্তি ছিলেন। ওনার বয়স তখন ষাট-বাষট্টি হবে, বুকের অনেক সমস্যা ছিল। পরে তো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অক্সিজেন নিয়ে থাকতে হত। মহারাজের সঙ্গে তখন আমার তেমন প্রয়োজন হয়নি। পরে পরে পরিচয় হতে হতে ঘনিষ্ঠতা হল। আজকে আমি যা কিছু বলি, তার বেশির ভাগই ওনার কাছ থেকে শেখা। আমাদের ট্রেনিং সেন্টারের যিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, ‘সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে রাম মহারাজকে জিজ্ঞেস করবে কিছু লাগবে কিনা’। আমিও গিয়ে হাতজোড় করে বললাম, ‘মহারাজ, প্রিন্সিপাল মহারাজ বলেছেন, আপনার কিছু লাগবে কিনা’। উনি খুব জোর একটা হাসি দিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ বলবে, চারজনকে পাঠিয়ে দিতে’। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, উনি কি বলতে চাইলেন। পরে বুঝলাম, মরে গেলে চারজন ব্রহ্মচারী কাঁধে করে নিয়ে পুড়িয়ে দেবে। বলে খুব হাসছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের মৃত্যুভয়টা কেটে যায়।

বেলুড় মঠের সাধু-সন্ন্যাসীদের এই দুটো জিনিস দেখেছি; একটা দেখেছি, ভোগের ভাবটা চলে যায়। অথচ আমরা ঠাকুরের কাছে যাই একটা লম্বা লিস্ট নিয়ে। এগুলো যে দরকার পড়ে না তা নয়, দরকার পড়ে। কারণ, একটু ভোগ যদি না করে থাকেন, ত্যাগ হবে না। ঠাকুর এই কথা আগেও বলেছেন, আমরাও তার ব্যাখ্যা করেছি। একটু ভোগ করতে হয়; ঠাকুর বলছেন, আমি ছোকড়াদের একটু আঁশ ধোওয়া জল দিই। একটু করে নিতে হয়, নাহলে মাথায় ঘুরতে থাকে, মনে করে বুঝি সব সুখ ওরাই পেয়ে যাচ্ছে। সেও জ্বলছে এই ভেবে যে সন্ন্যাসীরাই সব সুখ পাচ্ছে। অনেক এসে আমাদের বলে, খুব মজাতেই আছে, বেশ আনন্দে আছেন। মহারাজ হয়েছেন, কিছু করতে হয় না, আরামসে খাওয়া-দাওয়া জুটে যাচ্ছে। তোমাকে কে বারণ করেছে, তুমিও চলে এসো। চলে আসার কথা বললে তখন বলবে, আপনার লজ্জা করে না, মা-বাবাকে ফাঁকি দিয়ে সাধু হয়েছেন? আরে ভাই, মা-বাবাকে

ফাঁকি দেওয়ার সাহসটা তো আমরা অর্জন করেছি, তোমার তো সেই সাহসটাও নেই। এরাই হল বিশ্বনিন্দুক। যেমন সিরিয়াল কিলার হয়, এরা হল সিরিয়াল ক্রিটিক; সব কিছুতে এরা নিন্দা করবে। এদের নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভাল।

আগন্তুকরা এইবার গাত্রোত্থান করিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, তবে আমরা আসি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন ও মাস্টারকে বলিতেছেন, "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। (সকলের হাস্য)

একটা প্রস্তুতি যদি না থাকে কি করে আপনি ধর্মের কথা নেবেন? চোরের মন বোঁচকার দিকে। একটা গান আছে, তেরে গাটরি মে লাগাল চোর, চল জাগ মুশাফির। চোর যদি কোন গাটরির পিছনে লেগে যায়, গাটরিওয়ালা এখন যেখানে যাবে, মন্দিরে গেলে মন্দিরে, শ্মশানে গেলে শ্মশানে, রাজদ্বারে গেলে রাজদ্বারে পৌঁছে গিয়ে লেগে থাকবে ওই গাটরিটা হাতাবার জন্য। আমাদের মন সেই গাটরির পিছনে দৌড়াচ্ছে। যে যেখানে আছে, সেখান থেকে গাটরি চুরি করার চেষ্টা করছে। কি করে সে শুনবে ধর্মের কাহিনী? গাটরিওয়াল মন্দিরে গেছে, চোরও পৌঁছে গেছে আর সব সময় নজর রাখছে গাটরির দিকে, গাটরিওয়ালা যেন দৃষ্টির আড়াল না হয়ে যায়। মন্দিরের পূজারী হয়ত চরণামৃত দিচ্ছেন, সেও চরণামৃত অবশ্যই নিয়ে খাবে। কিন্তু দৃষ্টি সব সময় গাটরিওয়ালা যেন নজর থেকে বেরিয়ে না যায়। আমরা রোজ এক ঘণ্টা ধরে আপনাদের সামনে ধর্মকথা পরিবেশন করছি। আপনার পরিচিতদের বলুন একটু বসে শুনতে। আপনাকে এমন কতগুলো কটূ কথা শুনিয়ে দেবে, আপনি আর দ্বিতীয়বার বলতে চাইবেন না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিজের উপর শ্রদ্ধার মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে) –আচ্ছা, নরেন্দ্র কেমন! ঠাকুরের বহিঃপ্রাণ নরেন্দ্র। একশ বছর পর পিছনে ফিরে তাকাচ্ছি, দেখছি সত্যিই তাই।

মণি –আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ –দেখ, তার যেমন বিদ্যে তেমন বুদ্ধি! বিদ্যা থাকলেই যে বুদ্ধি হবে তা না, বিদ্যা হল ইনফরমেশান। আপনি স্কুল কলেজ থেকে অনেক বিদ্যা অর্জন করে নিলেন, বুদ্ধি হল ওই অর্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগানো। সবার দ্বারা এটা সম্ভব না, সবাই পারে না। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, গণিত যে বিদ্যাই বলুন, পড়লেই যে আপনি বুঝতে পারবেন, তা না; ওটার জন্য বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধিটা সবার থাকে না, মুখস্ত করেও উত্তর দিয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু বিষয়কে বোঝার জন্য বুদ্ধি লাগে।

আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না। এখানে গুটি কয়েক কথা বলার আছে। যাঁদের বয়স কম, গুণী ছেলে, তাঁরাও অনেক সময় বলেন, বিয়ে করব না। এমনও আছেন যে, সত্যিই কেউ কেউ বিয়ে করেন না। ঠাকুর নরেনের ব্যাপারে আসল জিনিসটা জানেন। বিয়ে করব না বলছে বলেই যে ঠাকুর নরেন্দ্রর প্রশংসা করছেন, তা না। বলতে চাইছেন যে, নরেন সংসারে ঢুকবে না। এখানে কিছুটা আনন্দের প্রকাশ, কিছুটা ভেরিফিকেশান।

মণি –আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। আর উঠতে পারে না। আমি ঈশ্বরের ছেলে –এ-বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়।

যত আপনি বিশ্বাস করবেন যে, আপনি ঈশ্বরের সন্তান; দিনরাত যত এই ভাবকে মনের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবেন, তত আপনি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকবেন। আমাদের সমস্যা হল,

বড় বড় নামকরা মহারাজদের দেখে বা প্রচুর সুনাম হয়েছে কাউকে দেখে অনেক সময় আমাদের মনে হয়, কবে আমি ওনার মত একজন হব। ওনার মত আপনি কেন হয়তে চাইছেন, আপনি আপনার মত বড় হবেন। আপনি আলাদা, উনি আলাদা। শচীন তেণ্ডুলকার নিজের জায়গায় গ্রেট, পেলে নিজের জায়গায় গ্রেট। আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন কি বাসবেন না, সেটা আপনার ব্যাপার। তাঁর বহিঃপ্রকাশ কি হবে, ঠাকুর দেখবেন। তাঁর যদি দরকার থাকে তিনি বহিঃ প্রকাশ করাবেন; তাঁর দরকার না থাকলে বহিঃপ্রকাশ হবে না। একটা সাধারণ কথা –আমার উত্থন চাই।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি, ঘটনাটা আমার খুব প্রিয়। আমেরিকার দুজন ইয়ং ছেলে, দুই ভাই –উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট, বাবা ছিলেন খ্রীশ্চান ফাদার। ছোটবেলা থেকে ওদের ইচ্ছে উড়োজাহাজ বানাবে। বাবা ওদের বলছেন –ভগবান যদি চাইতেন আমরা আকাশে উড়ব, তিনি আমাদের পাখির মত ডানা দিতেন। খুব নামকরা কথা। একটু বড় হয়েছে, সে-রকম বড় হয়নি। একটা সাইকেলের দোকানে গিয়ে তারা একটা ইঞ্জিন তৈরী করল। সেই সময়কার খুব প্রাথমিক স্তরে একটা ইঞ্জিন বলা যেতে পারে। একটা এ্যারোপ্লেনের ডিজাইন করে তাতে ইঞ্জিনটা লাগিয়ে দিল। তারপর সেটাকে চালালো, প্লেনটা মাটি ছাড়াল, কিছুটা আকাশে উড়ল। প্রথমের দিকে কেউ এই খবরটা পায়নি। মূল প্রচারে আসতে অনেকটা সময় লেগেছিল।

এই যে নূতন আবিষ্কৃত প্লেনটা মাটি ছেড়ে দিল, এটাই একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আমরা ভারতে গর্ব করে বলি, আমাদের এই ছিল, সেই ছিল, অথচ আমরা এই রকম একটা মাটিকে ছেড়ে দেওয়া ইঞ্জিন তৈরী করতে পারলাম না, চাকাতেই আমাদের চিরদিন আবদ্ধ থেকে যেতে হয়েছিল। যাতায়াতের ক্ষেত্রে তখন আমাদের নির্ভর ছিল, হয় পায়ে হেঁটে নয় গরুগাড়ি আর না হয় নৌকা করে। আর যার টাকা-পয়সা থাকত সে নিজের রথে করে যাতায়াত করত। এর বাইরে যাতায়াতের জন্য আর কিছু উপায় ছিল না। এই রকম একটা ইঞ্জিন পর্যন্ত তৈরী করতে পারলাম না, অথচ বড় বড় কথা, আমরা সবই জানতাম, আমরা এই করতাম, সেই করতাম। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিন, রাজা পর্যন্ত যদি কোথাও যেতে চাইতেন তাঁকে হয় ঘোড়ার পিঠে, নয় হাতির পিঠে চেপে, নয়তো নিজের ঘোড়ায় টানা রথে করে যেতে হত, পশু ছাড়া কোন গতি ছিল না। পরে ইংরেজরা আসার পর দেশে রেল, বাস, মোটর নিয়ে এলো, কিন্তু তখনও আমরা চাকাতেই আবদ্ধ। গরুগাড়ি আর স্পোর্টস কার খুব বেশি তফাৎ নেই। কিন্তু স্পোর্টস কার আর রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের তৈরী প্লেন, যে জমি কে ছেড়ে দিল, আকাশ-পাতাল তফাৎ - ভ্রাতৃদ্বয় মাটি ছেড়ে দিল।

আধ্যাত্মিক জীবনে মাটি ছাড়া, এটাই উদ্দেশ্য। সংসার হল এই মাটি, যেটা আমাদের সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ঠাকুর হলেন সেই ইঞ্জিন, যে ইঞ্জিন আপনাকে এই সংসার মাটি থেকে ছাড়িয়ে উপরে তুলে দেবেন। শুধু মাটিই ছাড়িয়ে দেবেন না; আধ্যাত্মিক শক্তিকে যদি জাগিয়ে দিতে পারেন, আপনাকে রকেট বানিয়ে দেবে, যা কিনা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে আপনাকে মহাকাশে নিয়ে যাবে। এরপর আপনি তো স্বাধীন, যেখানে খুশি আপনি চলে যেতে পারেন –আর কোন বাধা নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ধর্মকথা আগ্রহ নিয়ে শুনি, শোনার পর বলি, খুব ভাল লাগল। কিন্তু যখন চেষ্টার ব্যাপারটা আসে, তখন মুশকিল হয়ে যায়, গর্তে গিয়ে পড়ি। তবে কি হয়, শুনতে শুনতে মনের মধ্যে একটা শুভ সংস্কার তৈরী হয়। জন্মজন্মান্তর ধরে শুভ সংস্কার সঞ্চিত হতে হতে একটা সময় ফল দিতে শুরু হবে।

মণি বলছেন, আমি ঈশ্বরের ছেলে –এ-বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, বিশ্বাস।

একবার যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে যায় ঠাকুর আছেন, এই কথা বললেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'আমাদের তো বিশ্বাস আছেই, শুধু আছে না, দীক্ষাও নিয়েছি'। আরে ভাই, আপনি যান বিহার, ইউপিতে, হিন্দি বেল্টের বেশির ভাগ লোকের পুরো রামচরিতমানস মুখস্ত, আর তাদের অবস্থাটা কি দেখুন। মনের যত রকম বিকার হতে পারে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সব গিজগিজ করছে। অপরের প্রতি কোন সম্মান নেই, কোন ভালবাসা নেই। আগে একটা সময় ছিল, এখন সব শেষ। আজ সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিছু নেই। কিন্তু সবার কি বিশ্বাস, রাম ভগবান। যদি সত্যি বিশ্বাস থাকে শ্রীরাম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শিব ভগবান, জীবন পুরোপুরি পাল্টে যাবে, রাইট ভাইদের তৈরী প্রথম প্লেনের মত আপনার ইঞ্জিনটাও মাটি ছেড়ে দেবে।

ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরের কথা বলছেন। কথামৃতে কৃষ্ণকিশোরকে নিয়ে অনেক মজার মজার কথা আছে। কৃষ্ণকিশোর একজন পরমভক্ত। হাজরা মহাশয়, হলধারীর তুলনায় ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরকে খুব স্নেহ করতেন। কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাসকে অনেকবার উদাহরণ রূপে উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বলত, একবার তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি? আমি শুদ্ধ নির্মল হয়ে গেছি। হলধারী বলেছিল, 'অজামিল আবার নারায়ণের তপস্যায় গিছিল, তপস্যা না করলে কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায়! শুধু একবার নারায়ণ বললে কি হবে'! ভাগবতে অজামিলের খুব সুন্দর কাহিনী আছে। **এই কথা শুনে কৃষ্ণকিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল তুলতে এসেছিল, হলধারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে না!** ঈশ্বরের নামে যাঁদের এই রকম সত্যিকারের বিশ্বাস, তাঁরা হলধারীর এই ধরণের কথা মানবে না। এরপর ঠাকুর হলধারীর বাবার কথা বলছেন।

হলধারীর বাপ ভারী ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করত, – 'রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্' এই সব যখন ধ্যান করত, –তখন চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়ত।

একদিন এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছে। আমরা দেখতে যাব কথা হল। হলধারী বললে, সেই পঞ্চভূতের খোলটা দেখতে গিয়ে কি হবে?

হলধারী জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন কিনা। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, পওহারী বাবা ঠাকুরের ছবি রাখতেন শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, 'খোলটার'। এখানে হলধারী যখন বলছেন, তখন কিন্তু ঠাকুর নিন্দা করছেন। সেখানে আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম, নিজের ছবির কথায় ঠাকুর কেন 'খোলটার' এই কথা বলেছিলেন। সেইজন্য দেখতে হয়, আপনি কার পূজা করছেন? খোলটার পূজা করছেন, না খোলের ভিতর যিনি আছেন তাঁর পূজা করছেন? সেখানে ঠাকুর বলতে চাইছেন –এই ভুল করো না, খোলটার দিকে যেও না। এখানেও ঠাকুর সাধুকে দেখতে যেতে চাইছেন, খোলের ভিতর যিনি আছেন তাঁকে দেখার জন্য। হলধারী সেটা বুঝতে পারলেন না।

তারপরে সেই কথা কৃষ্ণকিশোর শুনে বলেছিল, কি! সাধুকে দর্শন করে কি হবে, এই কথা বললে। –যে কৃষ্ণনাম করে, বা রামনাম করে, তার চিন্ময় দেহ হয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে –'চিন্ময় শ্যাম', 'চিন্ময় ধাম'। বলেছিল, একবার কৃষ্ণনাম কি একবার রামনাম করলে শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া যায়। তার একটি ছেলে যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রামনাম বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ও রাম বলেছে, ওর আর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে কাঁদত। পুত্রশোক! পুত্রশোক সাংঘাতিক জিনিস। কিন্তু আর-একটা যে শোক হয়, এটা সেই শোক না, সে মৃত্যুর সময় রামনাম করেছে, আর চিন্তা কি!

বৃন্দাবনে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, মুচিকে বললে, তুই বল শিব। সে শিবনাম করে জল তুলে দিলে –অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস! আগেকার দিনে মুচি-মেথররা সমাজের উচ্চবর্ণ

লোকেদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল, তাদের ছায়াও মাড়াবে না। কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস যে, তুই বল শিব, সেও শিবের নাম করে দিল, যাঃ তুই শুদ্ধ হয়ে গেলি।

বিশ্বাস নাই, অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম করছে –তাতে কিছুই হয় না। কি বল?

মণি –আজ্ঞা হাঁ।

এরপর ঠাকুর নিন্দা করছেন। বেলুড় মঠেও আমরা এই জিনিস কত দেখি। কখন যদি বেলুড় মঠে আসেন আর লোকেদের কথা শোনেন, তা তারা ট্যুরিস্ট হয়ে থাকুক, ভক্ত হয়ে থাকুক, ভক্ত সম্মেলনে এসে থাকুক, সংসারের কথা ছাড়া আর কোন কথা শুনতে পাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা। বিধবা পিসি বলছে, মা, দুর্গাপূজা আমি না হলে হয় না –শ্রীটি গড়া পর্যন্ত! কি আর করবে, আমিত্বটাকে তো ছাড়তে পারছে না, আমিত্বকে সামনে রাখতে হবে কিনা। **বাটীতে বিয়ে-থাওয়া হলে সব আমায় করতে হবে মা –তবে হবে। এই ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত! দেখ দেখি, ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা**। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন।

মণি –আজ্ঞে, এদেরই বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে! এই জন্য আমরা প্রথমের দিকে বললাম, একবার যদি ঈশ্বরের দিকে মন যায়, তখন মন জগৎএর পঞ্চাশটা জিনিসের থেকে সরে আসে। ঠাকুর শুনে হাসছেন, আর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –ছাদের উপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হচ্ছে। পূজার নৈবদ্য, চন্দন ঘষা – এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটি নাই। কি রাঁধতে হবে, –আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না, – কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল! ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয়, –হাঁরে তোর সে কর্মটি আছে –আর আমি কেমন আছি! –আমার হরি নাই! এই সব কথা।

আমাদের বেলুড় মঠে বিশেষ উৎসবের দিন ব্রহ্মচারী মহারাজদের অনেক রকম ডিউটি পড়ে, তার মধ্যে সবজি কাটার ডিউটিও পড়ে। ব্রহ্মচারীরা যাঁরা কাটাকুটি করবেন তাঁরা চুপ করে থাকবেন, আর-একজন কোন একটা গ্রন্থ থেকে পাঠ করতে থাকেন। কানে ঈশ্বরীয় কথা আর হাতে ঈশ্বরের সবজি কাটা চলছে। অন্য কোন কথা, বাক্যালাপ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

দেখ দেখি, ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা। মুখে না বললেও, মনের ভিতর দুনিয়ার সব রাজ্যের কথা চলতে থাকে।

মণি –আজ্ঞে, বেশির ভাগই এইরূপ। আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে যার অনুরাগ তার অধিক দিন কি পূজা-সন্ধ্যা করতে হয়! মাস্টারমশাই আলোচনাটা পরের পরিচ্ছেদে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিন্ময় রূপ কি –ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান –ঈশ্বরই বস্তু

ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। মণি, এখানে মাস্টারমশাই, মণি জিজ্ঞেস করছেন এবং ঠাকুর তার উত্তর দিচ্ছেন।

মণি –আজ্ঞে, তিনিই যদি সব হয়েছেন, এরূপ নানাভাব কেন?

মাস্টারমশাই জানতে চাইছেন, ঈশ্বরই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা মানুষ, আমাদের এত ভিন্ন ভিন্ন ভাব কেন, বা এত প্রকার পশু, পাখি, জীবজন্তু কেন? আমরা চিনির তৈরী

মঠের উদাহরণ দিয়ে থাকি, সেখানে আমরা বলি আকার যাই থাকুক মুখে দিলে মিষ্টি লাগবে; কিন্তু জগতে যখন দেখছি তখন কখনও তো বোধ হয় না যে সবাই ঈশ্বর? তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ঠাকুর একটু পরে ব্যাখ্যা করবেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলবেন, এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য সাধনা চাই। আমরা যত রকম বিষয়কে জানি, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ফিলজফি, সাহিত্য এমন কি ভক্তিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, সাংখ্য-ন্যায় দর্শন, এই বিষয়গুলিকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়। তার কারণ হল, ওনারা যেখানে শুরু করেন, আর যেখানে শেষ করেন সেখানে দেখা যায়, এই জিনিসগুলোর সমান কিছু না কিছু জিনিস সংসারে আছে, যেগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। ফলে কি হয়, তাঁরা কি বলতে চাইছেন সেটা আমরা বুঝতে পারি। নারদীয় ভক্তিসূত্রে ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম। প্রেম আমরা সবাই জানি, এই প্রেমেরই পরমপ্রেমকে ব্যাখ্যা করলে মনটা একটা উচ্চাবস্থায় চলে যায়। আর থাকল ঈশ্বর, ঈশ্বর কি আমরা জানি না। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সবারই কিছু না কিছু ধারণা আছে; আমরা মন্দিরাদিতে যাই, বড়দের মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, ফলে একটু তো বোঝা যায়। আবার ধর্মতত্ত্ব একমাত্র বেদান্ত থেকে আসছে।

বেদান্তের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, আমাদের শরীর, মন যদি বেদান্তের ধর্মতত্ত্বগুলি ধারণা করার জন্য কিছু প্রস্তুতি না নিয়ে থাকে, বেদান্তের কিছুই বুঝতে পারব না। যেমন ধরুন, আমাদের খুব নামকরা গ্রন্থ বেদান্তসার, বেদান্তসার প্রথমেই শুরু করেন এই বলে যে, বেদান্ত জানার জন্য আপনাকে অধিকারী হতে হবে। কিভাবে অধিকারী হওয়া যাবে? *ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ*, আর নিত্য অনিত্য বিবেক থাকতে হবে। এ কি কখন সম্ভব? আমার ঘরসংসার আছে, দায়ীত্ব আছে, ভালবাসা আছে, কি করে সব ছেড়ে দেব? বেদান্তকে বোঝা সেখানেই ইতি হয়ে গেল।

সমস্ত শাস্ত্রই বলেন, ধর্মজীবন শুরু করতে তোমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে। কিন্তু এনারা যা যা করতে বলেন, মোটামুটি সেগুলো করা যায়। কিন্তু বেদান্ত যা যা করতে বলে সেগুলো করা সংসারীদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। যেমন ইসলাম বলছেন, আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর, বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। আমরাও জানি দেশে একজনই রাজা হন, ঈশ্বরও একমাত্র একজনই হবেন, বুঝতে কোন গোলমাল হয় না। ফলে কি হয়, তত্ত্বটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু বেদান্ত যখন বলেন, সবই চৈতন্য, তখন কিছুই বোঝা যায় না। তিনিই সব কিছু হয়েছেন, কিছুই ধারণা হয় না। সেইজন্য বেদান্ত বোঝা বা ধারণা করার জন্য সাধনা দরকার, সাধনা ছাড়া কিছুই হবে না। আজকে কথামৃতের ১৩৬তম ক্লাশ হচ্ছে, এতদিন ধরে যাঁরা কথামৃত শুনছেন, আমরা ধরেই নিচ্ছি আপনাদের একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে, নিষ্ঠা আছে; একটু সাধনা করলেই বেদান্তের দরজা খুলে যাবে।

কি সাধনা করবেন? কিছু লোকের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরাগ্যভাব থাকে, যেমন ঠাকুর নিজে ছিলেন, নরেনাদি ছোকড়া কয়েকজনের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরাগ্য ছিল। এই স্বাভাবিক বৈরাগ্য আমরা কিভাবে আমাদের মধ্যে আনব? বিবেকচূড়ামণি আদি বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থগুলিতে বলবে, তোমার ভিতরে যেন বৈরাগ্যভাব থাকে। আরে ভাই, আমার ভিতর বৈরাগ্যভাবের ছিটেফোঁটা নেই, তার জন্য এখন আমার কি করণীয় সেটা বলুন। দুটি জিনিস করতে হয় –এক, শুনে যেতে হবে। শুনে গেলেও মনে একটা ছাপ পড়ে। দুই, একটু আধটু ভোগ করে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, একটু ভোগ করে ছেড়ে দেব। কিন্তু একেবারেই যদি ভোগ না করে থাকেন, টাকা-পয়সা যদি না দেখে থাকেন, মান-সম্মান যদি না দেখে থাকেন, তাহলে আমার এই কথা লিখে রাখুন –সাধন জীবনে ভবিষ্যতে মহা বিপদে পড়বেন, আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমরা কত মহাত্মাকে উল্টে পড়ে যেতে দেখেছি, কতজনকে ছিটকে যেতে দেখেছি। কারণ, মন যখন একাগ্র হতে শুরু হয়, তখন ক্ষমতা বাড়ে। ক্ষমতা বাড়লেই প্রণাম-প্রণামী আসবে, ভক্ত-ভক্তানী আসবে, নামযশ আসবে, আর আপনাকে উল্টে ফেলে দেবে। কারণ এর মধ্যে আপনি অভ্যস্ত নন, ভোগের কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তাই নামযশাদি জিনিসগুলোকে হজম করা অত সহজ না।

তার থেকেও বেশি, মন যদি তৈরী না হয়ে থাকে, পাত্রতা যদি না থাকে, বেদান্তের কথাগুলো ধারণাই হবে না। সেইজন্য সংসারে আগে প্রচুর কাজ করতে হয়। এই ব্যাপারটাই এখন আলোচনায় আসবে। খাটাখাটনি করে একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য আনা যায়; জোর করে বৈরাগ্য না, বৈরাগ্য যদি জোর করে করা হয় খুব বিপদে পড়বেন। টুকটাক একটু শাস্ত্রের কথা শুনছি, সংসারে একটু ভোগও করছি, যদিও এভাবে আপনি শেষ অবস্থায় যেতে পারবেন না, কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু ধীরে ধীরে এই কথাগুলো ভিতরে ঢুকবে, যেমন যেমন ভিতরে ছাপ পড়বে, তেমন তেমন প্রস্তুতি হবে। এরপর ঠাকুরের যে বৈরাগ্য ছিল, স্বামীজীর যে বৈরাগ্য ছিল, সেই বৈরাগ্য আমাদের হবে না, আবার জোর করে বৈরাগ্য করারও দরকার নেই। যতটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য হবে, আপনার জ্ঞানও ততটা বাড়বে, জ্ঞান ধারণ করার ক্ষমতাও ততটা বাড়বে।

স্বাভাবিক বৈরাগ্য হওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে জিনিসটা খুব প্রয়োজন, সেটা হল, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। আপনাকে শাস্ত্রের পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু শাস্ত্র কি বলতে চাইছেন একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরী হবে। আবার বলে দিচ্ছি, শাস্ত্র বলতে বেদ, উপনিষদ ও গীতা, এই তিন হল মূল। এই তিনের বাইরে কোনটাই শাস্ত্র না। বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত তাও কিছু শাস্ত্রের পর্যায়ে চলে, তাও বেছে বেছে; বাকি কোনটাই না। ইদানিং কালে দেখছি বেদান্তের নামে কি লাফালাফি, কিন্তু বেদান্তের যে গ্রন্থগুলিকে নিয়ে লাফালাফি করছেন, এগুলো একেবারেই মূল শাস্ত্র নয়। আর আমাদের কথামৃত, মায়ের কথা, এগুলোও শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে। আবার অন্য পরম্পরাতে তাঁদের যেসব গ্রন্থ আছে, সেখানে একটু প্লাস মাইনাস করে নিতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে, আবার যাঁরা শিবভক্ত তাঁদের কাছে শিব মহাপুরাণ শাস্ত্র।

শাস্ত্রের মূল আলোচনা তিনটে জিনিসকে কেন্দ্র করে চলে –ঈশ্বর কি, জীব কি এবং জগৎ কি। শাস্ত্র পড়া হয় এই তিনটে জিনিসকে জানার জন্য। অদ্বৈত বেদান্ত হলে ব্রহ্ম আর মায়া এসে যাবে, সেটাও ঈশ্বরের মধ্যে পড়ে। জানার জন্য এই তিনটে জিনিস –আমি কে, তিনি কে আর আপনি ও তিনি এই দুজনের সংসারের মাধ্যমে যে সম্পর্ক সেটা কি, এতটুকু জানতে হয়। এইটুকু জানা না থাকলে শাস্ত্র ধারণা হবে না। সেইজন্য সুযোগ পেলেই শাস্ত্র শুনতে হয়, শাস্ত্র শোনার জন্য সুযোগ তৈরী করে নিতে হয়। অথচ লোকেরা কত রকম উল্টোপাল্টা কথা বলে –ঠাকুর কি কোনদিন শাস্ত্র পড়েছেন, না পড়তে বলেছেন ইত্যাদি। তবে আচার্যের মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা না শুনলে শাস্ত্র বোঝা যায় না। সাথে সাথে একটু সাধনা করতে হয়।

সাধনাতে প্রথম জিনিসটা হল সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ মানে, সাধুদের কাছে গিয়ে ঈশ্বরীয় কথাবার্তা শোনা। সাধুসঙ্গ এই নয় যে, সাধুর কাছে গিয়ে সমাজের খবর, রাজনীতির খবর নিয়ে কচলানো আর কিছু খোস গপ্প করা। সাধুর সাথে বন্ধুত্ব থাকলে না হয় দুটো এই ধরণের কথাও হল, কিন্তু মূল জিনিসটা হল, সাধুর কাছ থেকে ত্যাগের ভাব, জ্ঞানের ভাব আহরণ করা। আর যে করেই হক একান্ত বাস খুব দরকার, দিনে কিছুক্ষণ একান্ত বাস। আর বছরে একবার সাতদিনের জন্য হোক, এক মাসের জন্য হোক, একান্ত বাস খুব জরুরী। একান্ত বাস না হলে মন স্থির হবে না, কোন মতেই হবে না, আপনি যাই করে নিন না কেন। আপনি বলবেন, আমার দায়ীত্ব আছে। যাদের প্রতি আপনার দায়ীত্ব আছে তাদের বুঝিয়ে বলুন, ভাই তুমিও কিছু দিনের জন্য দায়ীত্ব নাও। গরুগাড়ি বলদে টানে। অনেক সময় আপনারা দেখে থাকবে, গরুগাড়ি কোন কারণে যদি ফেঁসে যায় গাড়োয়ান নেমে এসে চাকাকে ধাক্কা দিয়ে বলদকে সাহায্য করে। এখনও রাস্থাঘাটে দেখা যায় কোন গাড়ি ফেঁসে গেলে দু-চারজন মিলে ধাক্কা মেরে ইঞ্জিন স্টার্ট করায়। আপনি সংসার চালাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু যাদেরকে চালাচ্ছেন, দরকার হলে তারাও আপনাকে একটু সাহায্য করবেন। যদি না করে, বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে, যেটাকে ঠিক করার জন্য আপনাকে অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে।

আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জপধ্যান নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যেতে হবে। খুব কম করে দিনে দু-ঘণ্টা জপ তো করতেই হয়। দিনে দু-তিন ঘণ্টা জপধ্যান যদি আপনার না করা থাকে, তাহলে বাকি জিনিসগুলো আপনার হবে না। এই যে বৈরাগ্যের কথা বলা হল, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলা হল, সাধুসঙ্গের কথা বলা হল, জপধ্যান না করা থাকলে এগুলো পারবেন না। এই সব কিছুকে এক সঙ্গে চালাতে হয়। ঠাকুর এখন যে জিনিসগুলো বলতে যাচ্ছেন, এই জিনিসগুলোর সঙ্গে আপনি যদি এক না হয়ে থাকেন, আপনার শরীর মন যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকে, তাহলে এগুলো ধারণা করা যাবে না। বাচ্চা বয়সে বোঝান হল দুইয়ে দুইয়ে চার, কিভাবে বোঝাল? ওখান থেকে দুটো জিনিস এনে, সেখান থেকে দুটো জিনিস এনে গুণে গুণে দেখানো হল চার। বাচ্চা অতি সহজে শিখে গেল। তার মানে, বাচ্চার শরীর আর মন ওই যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জিনিসগুলোকে সে চোখে দেখেছে, জিনিসগুলোকে একত্র করতে দেখেছে, জিনিসগুলোকে সরাতে দেখেছে, ফলে ধারণা করা গেল। একবার যখন ধারণা করা হয়ে গেল, এরপর তরতর করে এগিয়ে চলে যাবে। বেদান্তেও তাই, প্রথমে ধারণা করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে হয়। তারপর যখন বেদান্তের ভাবের সঙ্গে এক হয়ে গেল, এরপর যেমনি একবার বস্তুটাকে ধরে নিল, তখন তরতর করে এগিয়ে চলে যাবে। এরপর বুঝতে আর কোন অসুবিধা হবে না। ঠাকুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে আছেন, কিন্তু শক্তিবিশেষ। কোনখানে বিদ্যাশক্তি, কোনখানে অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি কি? অবিদ্যা শক্তি কি?

যে জিনিসটা আপনাকে ঈশ্বরে দিকে নিয়ে যায়, সেই জিনিটাকেই আমরা বিদ্যাশক্তি বলি। যে জিনিসটা আপনাকে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে চলে যায়, সেটাকে অবিদ্যাশক্তি বলছি। এগুলো শুনে আমাদের সাধু সমাজের কেউ কেউ বলতে চান ঠাকুরের বেদান্ত হল শাক্ত বেদান্ত। পণ্ডিত সাধুরা কি করে এই ধরণের সব কথা বলেন, ভাবলে অবাক লাগে। ঠাকুর বেদান্তী, বেদান্ত মানেই অদ্বৈত বেদান্ত; এখানে আবার শাক্ত, শৈব কোথা থেকে আসছে, ভগবান জানেন। কারণ অদ্বৈত বেদান্তে সবটাই আছে। বেদান্তের সাথে কোন কিছুর একটা নাম জুড়ে দিয়ে মনে করছেন একটা নূতন থিয়োরি দিলাম। যে কোন কার্য, যে কোন বোধ, বা যে কোন কার্য আপনাকে যদি ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, ওটা হল বিদ্যাশক্তির প্রভাব। যে জিনিস আপনাকে ঈশ্বর থেকে সরিয়ে সংসারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ওটা হল অবিদ্যাশক্তির প্রভাব। যে জিনিসটা আপনাকে উদার করে দিচ্ছে, আরও বড় করে দিচ্ছে, এটা বিদ্যাশক্তির প্রভাব; যে জিনিসের প্রভাব আপনাকে ঈশ্বর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, এটা অবিদ্যাশক্তির প্রভাব। যে কোন জিনিস, যেটা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করছে, ঈশ্বরের কাছে বেশি বেশি করে থাকার ইচ্ছা করাচ্ছে, এটাও বিদ্যাশক্তি। যে জিনিস ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছে, দু-মিনিটের জন্য না, পুরো মনটাকে তুলে আনতে চাইছে, ওটাকে বলছেন অবিদ্যাশক্তি।

বিদেশীদের চারটি ধর্ম খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুহুদি ও পার্সি। চারটে ধর্মেই অবিদ্যাশক্তির কথা পাওয়া যাবে, যেটাকে অশুভশক্তি বলা হয়, আবার আসুরীশক্তিও বলা হয়। এর জন্য আর-এক জনকে দায়ী করা হয়। এই ভাব যদিও প্রথম পার্সিদের থেকে শুরু হয়। পার্সিরা আহুর মাজদা আর আহীরমাণ এই দুটো শক্তি মানত। আহীরমাণ হল অশুভশক্তির প্রতিভু আর মাজদা মানে আলো, তিনি হলেন শুভশক্তি। এই শুভশক্তি আর অশুভশক্তির লড়াই সবসময় চলছে। কিন্তু আমরা এভাবে মনে করিনা। আমাদের কাছে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। ঠাকুর আগে খুব সুন্দর বলছেন, চোখ ঠাওরে মনকে ইশারা করে দিয়েছেন, মন তুই এখন সংসার কর। আসলে বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তি বাইপোলার না, বাইপোলার মানে হয়, দুটো যে পুরোপুরি এক অপরের বিপরীত তা না। অবিদ্যাশক্তিকে যে কোন সময় বিদ্যাশক্তিতে পরিণত করে দেওয়া যায়, যে কোন সময় মোর ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বাইপোলার হলে আটকানো যাবে না, চুম্বকের নর্থপোল সাউথপোলকে পালটানো যাবে না। কিন্তু এখানে যে কোন সময় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। আসল জিনিসটা হল শক্তি, এই শক্তিটাই আসল। এই শক্তি দিয়ে, আপনার বুদ্ধি

দিয়ে আপনি নিজেকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, আবার এই শক্তিকেই আপনি আমিত্বকে আসক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

অনেক সময় আমরা বলি, ছেলেটা তো বেশ ভাল ছিল, এখানে আসত, কাজ করত; কিন্তু এখন কেমন হয়ে গেছে, পুরো পাল্টে গেছে। কি করে পাল্টে গেল? কারণ যে ভালো ছেলে, তার খারাপ ছেলে হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা সব সময় পুরোদমে রয়েছে, কারণ ভিতরে শক্তি আছে। আবার যে খারাপ ছেলে, তারও ভাল ছেলে হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা পুরোদমে রয়েছে, কারণ তার ভিতরেও শক্তি আছে। কিন্তু মাঝামাঝারি যারা, যাদের আমরা মনে করি, খুব শান্ত, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে পারে না; এদের দ্বারা সত্যিই সারা জীবনে কিছু হবে না, সারা জীবনই ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারবে না, এদের শক্তি হতে অনেক সময় লাগবে।

তাহলে কেন কেউ অবিদ্যা শক্তি নিয়ে থাকে, কেউ বিদ্যাশক্তি নিয়ে থাকে? কারণ তার এখনও ভোগের শান্তি হয়নি। ভোগের শান্তি হয়নি মানে, তার এখনও ওটাই ভাল লাগছে। ভালো লাগা কেন? আপনিও তো পূর্ণব্রহ্ম, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক। কিন্তু সংসারে আছেন মানেই ভোগ করার জন্য আছেন। সংসারে কেন আছি? ভোগ করার জন্যই আছি। কিন্তু লোকেরা তো ঠাকুরের নাম করে বলে – ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য; আসলে এগুলো সব মুখের কথা। আমার মনে যদি কোন পাপ না থাকত, আমার মনে যদি কোন দুর্বলতা না থাকত, আমি তো শুদ্ধ আত্মা, আমার তো জন্মই হত না। অল্প যদি একটু বাকি থাকত, তাহলে জন্ম নিয়েই শুকদেবের মত সব ছেড়ে হিমালয় চলে যেতাম। কিন্তু একটু পড়াশোনা করে রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছি, তার মানেই আমার মধ্যে এখনও এলেমেলো কিছু আছে, সেইজন্যই আজ এখানে আসা। আর কত কোটি কোটি মানুষ সন্ন্যাসীই হতে পারছে না। কদিন আগে আমাকে একজন বলছেন, 'হ্যাঁ ভালই তো আছেন, মঠে খাওয়া পাওয়া যায়, মাথার উপর একটা ছাদ পাওয়া যায়, সব রকম সুবিধা পাওয়া যায়'। আমি তাঁকে বললাম, 'ভাই দেশে এত লোক তো আছে, এত বেকার দেশে, সবাইকে গিয়ে বলুন তোমরা সবাই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়ে যাও, থাকার জায়গা পাবে, খাওয়া পাবে, আরও অনেক কিছু পাবে। দেখুন তো আপনি কজনকে পাঠাতে পারেন, আর যে কজনকে পাঠাতে পারবেন তাদের কজন টিকতে পারে'। টিকতেই পারবে না। শুভ সংস্কার না থাকলে সন্ন্যাসী হতে পারবে না। আরও বেশি, শুভ সংস্কার না থাকলে সন্ন্যাস জীবনকে ধরে রাখতে পারবে না।

কিন্তু মানুষ যখন একটা ভোগে থাকে, ওটা তার তখন এত বেশি ভাল লাগে যে, সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। একটা ঘটনা বলি, খুব মজার; আমি একজন বড় নেতাকে জানতাম, জানিনা বর্তমানে উনি কোথায় আছেন। আমি যখন দেওঘরে ছিলাম, সেই সময় উনি একজন বড়মাপের নেতা ছিলেন। চোখ-মুখ দেখতে ভাল, কিন্তু নির্বাচন এলেই সেই গুলি-বন্দুক নিয়ে ময়দানে নেমে যেতেন। আমি একবার ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন আপনারা এগুলো করেন, কি দরকার'? উনি বলছেন, 'জানেন, সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বাইরে আসি, তখন দেখি দশজন লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছে, দেখে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। দশজন লোক আমার জন্য এই আশায় বসে আছে, আমি তাদের কৃপা করব, এটা ভাবতেই আমার ভাল লাগে। সেইজন্য আমি চাইলেও ক্ষমতার রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারব না'। লোকটা সৎ বলতে হবে, পরিষ্কার স্বীকার করছে। লোকটা যে ক্ষমতালোভী তাও না, কিন্তু দশজন লোক তাকে মানছে, জী হুজুর করছে, তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকছে, এটাই তার এত ভাল লাগছে যে, সে আর নেতাগিরি ছাড়তে চাইছে না। আমি এটাকে ছাড়তে চাইছি না –এটাকেই বলে ভোগ। কিছু দিন পরে শুনলাম বেচারীর জেল হয়ে গেছে। নানা রকম স্ক্যামে জড়িয়ে পড়েছিল। অনেকদিন জেল খেটেছে।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ভদ্রলোকের সাথে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি। মাঝেমাঝে জানতে ইচ্ছে করে, এখন কি তার রাজনীতি থেকে, নেতাগিরি থেকে বৈরাগ্য এসেছে কিনা; বলা খুব মুশকিল। বৈরাগ্য যদি না হয়ে থাকে আগামী জন্মেও সে এটাই করবে। আর তার ফলস্বরূপ আবার জেলে যাবে, মার খাবে, গুলি খাবে। এভাবে অনেক জন্ম ধরে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ বলবে, আমার আর এসব লাগবে না। তখন আবার এই ভোগ শেষ হয় অন্য একটা ভোগ আসবে। অবিদ্যাশক্তিটাও শক্তির মধ্যে। আবার এমন নেতাও হন, যাঁদের সত্তার কোন লোভ নেই। আমি দেশের কাজ করতে চাই, তাই করছি। তার জন্য সত্তা যদি ছেড়ে দিতে হয়, ছেড়ে দেব। অবিদ্যা ও বিদ্যা দুটোতেই শক্তি থাকে। আমিত্ব যখন ঢুকে যায় তখন ওটাই অবিদ্যাশক্তি হয়ে যায়। তুমিত্ব ভাব যখন আসে তখন ঈশ্বরের দিকে যায়। আমরা যখন আমাদের স্তর থেকে দেখছি তখন আমাদের কাছে ভাল-মন্দ হয়ে যাচ্ছে। ভালকে আমরা বলি বিদ্যাশক্তি, মন্দকে বলি অবিদ্যাশক্তি। কিন্তু আসলে জিনিসটা এই রকম চলে।

কোনখানে বিদ্যাশক্তি, কোনখানে অবিদ্যাশক্তি, কোনখানে বেশি শক্তি, কোনখানে কম শক্তি – স্বাভাবিক, চরিত্রবান গরুর মত। চুরি করতে পারে না, মিথ্যা কথা বলতে পারে না, শুধু একজন ভাল মানুষ। এভাবে হয় না, ভাল মানুষ মানে যার ভাল ও মন্দ দুটোই করার ক্ষমতা আছে। একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, বলছিলেন, আমি সঞ্চয় করি না, আমি আগামীকালের চিন্তা করিনা। এটা তো কুকুরও করে, গরুও করে। কোন কালে শুনেছেন, কুকুর, গরু তার খাবার জমিয়ে রাখে? একমাত্র মানুষই রাখে। আবার এই মানুষই পারে সেখান থেকে উপরে উঠতে।

দেখ না, মানুষের ভিতর ঠগ, জুয়াচোর আছে, আবার বাঘের মতো ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি, ঠগ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ। সেইজন্য বেদান্তী কাউকে ঘৃণা করতে পারে না, আপনারা জানবেন, আপনারা সবাই বেদান্তী। শ্রীশ্রীমায়ের বিখ্যাত উক্তি –আমি আমজাদেরও মা, শরতেরও মা। ঘৃণা করার প্রশ্নই উঠবে না, কি করে করবেন! আমজাদ এক সময় ডাকাত থাকতে পারে, তাতে কি হল, ডাকাতরূপী নারায়ণ, নারায়ণই তো। আপনারা কতটা পারবেন আমি জানি না, কিন্তু আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমি যদি জানি লোকটা বদমাইশ, কিন্তু আমার কাছে যদি আসে, সে আমার থেকে একই সম্মান পাবে। আমাদের এখানে কোন বিভেদ করা হয় না। তবে কি হয়, কথা বলার সময় সবাইকে তো সঙ্গে রাখা যায় না। আমাদের নিন্দুকের অভাব তো নেই, মাঝে মাঝে আমরা শুনতাম, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা নাকি শুধু বড়লোকদের দেখে। কি সব উল্টোপাল্টা কথা। এত স্কুল, এত হাসপাতাল, এত রিলিফ ওয়ার্ক, সেখানে শুধু বড়লোকদের দেখা হচ্ছে? নিন্দুক লোকের অভাব নেই। সত্যিকারের এই জিনিসটা জীবনে কেউ যদি নামিয়ে থাকতে পারে, তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কথাই প্রথম আসবে।

আমিও তো দেখেছি, জীবনে তো আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীমা সেইজন্য বলছেন, কারুর দোষ দেখবে না। এই যে বাঘ নারায়ণ, ঠগ নারায়ণ, তার মানে এখন তার এই রকম বৃত্তি চলছে; আগামীকাল হয়ত তার বৃত্তি পালটে যাবে। এই যে বাঘ নারায়ণ, তার ভয়ঙ্কর ক্ষতি করার ক্ষমতা, এটাই হয়ত কাল পাল্টে গিয়ে রক্ষা করার ক্ষমতা হয়ে যাবে।

মণি (সহাস্য) –আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার করতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করলে বাঘ তার খাদ্য বানিয়ে নেবে। আগেও ঠাকুর এই কথাই বলেছিলেন। এইবার ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তিনি আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি –বই আর কিছু নাই। জগতে তত্ত্ব দুটি – ব্রহ্ম আর শক্তি। **নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে করতে বললেন, হে রাম তুমিই শিব, সীতা ভগবতী, তুমি**

ব্রহ্মা, সীতা ব্রহ্মাণী; তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী; তুমিই নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী; পুরুষ-বাচক যা কিছু আছে সব তুমি, স্ত্রী-বাচক সব সীতা।

ঠাকুর এই কথাগুলো অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে বলছেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসেছেন তাঁকে মনে করিয়ে দিতে, রাবণবধের জন্য তাঁর বনবাসে যাওয়া দরকার। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে প্রথমেই তিনি স্তুতি করে উপরোক্ত কথাগুলো বলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ অতি উচ্চমানের গ্রন্থ, সমন্বয় গ্রন্থ। আমাদের ধর্মে বিভিন্ন যে মত আছে, সব মতকে এখানে সমন্বয় করা হয়েছে। মূল বক্তব্য ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা কিছু না। আচার্য শঙ্করও বলছেন, শক্তি আর শক্তিমান এক, ব্রহ্ম আর শক্তি তাই এক। কিন্তু আমরা যখন জগৎকে দেখছি, যখন আমাদের ভিতর জগতের এই বোধ আছে, তখন একটু আগে যেটা বলা হল, তিনটি সত্য সামনে আসে – জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। জীব, জগৎ, ঈশ্বর এই তিনটে যখন হয় তখন ঈশ্বর হলেন ব্রহ্ম। জীবের ভিতর সেই আত্মা, আর তার সঙ্গে রয়েছে মন, একজনের মনের গতিপ্রকৃতি দেখে বোঝা যায় তার শক্তি কত; তার সঙ্গে রয়েছে জগৎ আর তার শক্তি। পুরোটা যখন এক সঙ্গে নিয়ে দেখবেন, জীব, জগৎ, ঈশ্বর পুরোটাই শুধু ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা। শেষ সত্য ব্রহ্মই আছেন, শেষ সত্য আত্মাই আছেন।

কেন হয়, কিভাবে হয়? মাণ্ডুক্যকারিকা বলবেন, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা;* তিনি আপ্তকামী, তাঁর আবার কিসের ইচ্ছা যে তিনি এই সৃষ্টি করবেন, জগৎ করবেন, জীব করবেন? এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। কিন্তু চোখের সামনে জগৎ আছে, জগৎ সেই ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা। আপনারা জানবেন আগেকার দিনে, দুশো তিনশো বছর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান পরিষ্কার বলত ম্যাটার আর এনার্জি দুটো আলাদা জিনিস। এনার্জি পদার্থের উপরে কাজ করে, সেখান থেকে বিভিন্ন জিনিস হয়। আইনস্টাইন এসে বলে দিলেন, ম্যাটারও যা এনার্জিও তাই – $E=MC^2$। কিন্তু এনার্জি যে কনসাসনেস, তা নয়, কেউ কোন দিন এটাকে প্রমাণিত করতে পারবেন না। আর স্বামীজী বারবার বলছেন, আমাদের মন হল ম্যাটারের খুব সূক্ষ্ম অবস্থা, তার মানে এনার্জি। আমাদের মন জিনিসটাকে আপনি পদার্থ রূপে দেখুন, এনার্জি রূপে দেখুন, ঠিক আছে। মনের যে কার্য, এটা এনার্জি; মন নিজে পদার্থ। সাংখ্যের সৃষ্টতত্ত্ব তাই বলে, বেদান্তের যে সৃষ্টিতত্ত্ব, সেও তাই বলে; আর জিনিসটা তাই। রাজযোগ আরও এক ধাপ এগিয়ে এটাকে পুরো যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখাচ্ছেন মন কেন পদার্থ, মন কেন চৈতন্য হতে পারে না। আইনস্টাইনকে যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব এনার্জি।

এই এনার্জির যিনি মা, তিনি হলেন শক্তি, মা কালী, মা দূর্গা, মা ভবানী যে নামই বলুন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম এনার্জি থাকতে পারে, যত রকমের শক্তি হতে পারে, তিনি সবটারই মা। ওখানেই তিনি শেষ হয়ে যান না, সবটাই তাঁর থেকে। অথচ এই এনার্জিটা কিছুই না। যিনি ব্রহ্ম, ওটাকে যদি চৈতন্যের সমুদ্র মনে করেন, ওই এনার্জি হল তাঁর এক কণা, কারণ অনন্তের কণাটাও অনন্ত। সমুদ্রের এক ফোঁটা সমুদ্র হয় না, মরুভূমির এক কণা বালি পুরো মরুভূমি হয় না। কিন্তু চৈতন্যের একটি কণাও অনন্ত। চৈতন্যের একটি কণাতেই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে যাবে। এগুলো ধারণা করা খুব মুশকিল ঠিকই, কিন্তু শুনতে শুনতে কিছুটা ধারণা হয়। এরপর সাধন-ভজন করলে বাকিটা হয়। তার আগে পর্যন্ত ঠাকুর যেটা বলেছেন, সেটা শুনে রাখতে হয় –সমস্ত জগতের সত্য হল দুটি –ব্রহ্ম আর শক্তি।

আমার 'The Hindu Way' বইতে বারবার আমি এই জিনিসটার উপর জোর দিয়েছি, ব্রহ্ম আর শক্তি। হয় পূর্ণব্রহ্মের দিকে নিজেকে নিয়ে যান, আত্মজ্ঞানের দিকে যান, নয় তো জগতে আপনি শক্তি অর্জন করুন; যেটাকেই আপনার শক্তি বলে মনে হয়, টাকার শক্তি হোক, ক্ষমতার শক্তি হোক, যেটাই হোক; কারণ কদিন পর বিরক্ত হয়ে আপনি সব ছেড়ে দেবেন। মাঝামাঝারি যদি থাকেন যন্ত্রণায় আপনি ছটফট করতে করতে মরে যাবেন। জীবদ্দশায় মৃত্যু আর মৃত্যুর সময় জীবদ্দশায় মৃত্যুর যন্ত্রণা

নিয়ে মৃত্যু। কারণ সত্য হল দুটি – হয় ব্রহ্ম, নয় শক্তি। হয় পূর্ণরূপে আপনি শক্তিকে অতিক্রম করে চৈতন্যে চলে যান, আর তা নাহলে পূর্ণ রূপে শক্তির মধ্যে থাকুন। এটা যদি আপনি না করেন, আপনার জীবনে সীমাহীন কষ্ট। মানুষের জীবনে এত কষ্ট কেন? কারণ, দুটো মধ্যে কোনটাকেই ধরছে না। দ্বিবিধা মে দোনো গায়ে, মায়া মিলি না রাম; না নিচ্ছে মায়াকে, না নিচ্ছে রামকে। এখানে মায়া মানে শক্তি। হয় শক্তিকে ধরুন, নয় রামকে ধরুন। তাহলে এই দুটি কথা কেন বলছেন? কারণ সংসারকে আমাদের সত্য বলে বোধ হয় তাই এই রকম করে বলা হয়েছে, অন্য কোন কারণে না।

তখন মণি প্রশ্ন করছেন। **মণি –আর চিন্ময় রূপ?**

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু চিন্তা করিতেছেন। এই জায়গাটা খুব সুন্দর। চিন্তা এইজন্য করছেন না যে কি উত্তর দেব, চিন্তা এইজন্য করছেন, কি বললে প্রশ্নকর্তা বুঝবে। মাস্টারমশাই এতবড় এক সাংঘাতিক কাজ করেছেন, তিনি আমাদের সবারই প্রণম্য; কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, কিছুদিন আগে ঠাকুর সঙ্গে তর্ক করছিলেন, লোকেদের একটু বুঝিয়ে দিতে হবে, মূর্তিপূজা ভুল ইত্যাদি।

আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কিরকম জনো –যেমন জলের –এ-সব সাধন করলে জানা যায়"। ঠাকুর বোধ হয় জলের ঢেউ বা তরঙ্গ বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন। পুরোটা না বলে ঠাকুর বললেন, সাধন না করে এ-সব জানা যায় না, বললেও ধারণা হবে না। তখন কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজের রমরমা; এখনও ব্রাহ্মভাব নিয়ে পুরোদমে হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে যাচ্ছে। ঠাকুর মণি অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে আদেশ করছেন।

তুমি 'রূপে' বিশ্বাস করো। আমাদের যখন বয়স কম ছিল, বন্ধুরা মিলে সিনেমা দেখতে যেতাম। কি সিনেমা দেখতে যাওয়া হবে তাই নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে আগে একপ্রস্থ আলোচনা হত। এই কোন সিনেমাটা ভাল রে? হঠাৎ কেউ বলল ওই সিনেমাটাই ভাল হবে মনে হয়। আচ্ছা চল ওই সিনেমাটাই দেখি গিয়ে। আমাদের ভক্তিটা ঠিক এই রকম। আচ্ছা, বেলুড় মঠে ঠাকুরের কাছে গেলে কি কি পাওয়া যাবে? উত্তরটা শুনে ঠিক জমল না। হঠাৎ একজন বললে, আচ্ছা ওই জায়গায় গেলে কি কি পাওয়া যাবে? সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল, এইটা খুব জোরাল বুঝলি, ওখানেই চল। সবাই গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। উত্তরকাশীর ওদিকে সাধুরা ছত্রে ডাল-রুটির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একজন এসে বলল, উধার লাড্ডু ভি মিল রহা হ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে লাইন ছেড়ে ওই দিকে দৌড়াল। সাধারণ লোকেদের যদি বাড়ির জোরাল একটা পরম্পরা না থাকে, এখন যদিও সব উঠে গেছে, যেখানে তাদের কুলদেবতা আছে, পূজাবিধি আছে যা নিত্যকর্ম রূপে অবশ্যই করণীয়, সেই পরম্পরার লোকেদের রূপে একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়। আমি অনেক ভক্তকে জানি, বাড়িতে ঠাকুরের নিত্য পূজা, নিত্য সন্ধ্যারতি করেন।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা, তখন আমি দেওঘরে নূতন ব্রহ্মচারী। সেই সময় একবার ধানবাদের কাছে সিন্ধ্রি বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে যেতে হয়েছিল। বাড়ি ছাড়ার পর ওই প্রথম আমি কোন গৃহস্থ ভক্তের বাড়িতে ঢুকলাম। ভদ্রলোক আমাকে পূজার ঘর দেখিয়ে বলছেন, আমরা নিত্য সন্ধ্যারতি করি। শুনে আমি চমকে উঠলাম, কারণ তার আগে জানতাম না, কারুর বাড়িতে ঠাকুরের নিত্য সন্ধ্যারতি করা হয়। ইদানিং অনেক জায়গায় হচ্ছে। যাদের বাড়িতে এই নিত্যপূজা আছে, তাদের তাও রূপে বিশ্বাস থাকে। কিন্তু যারা এঁটো পাতার মত নিজেদের ইণ্টেলেকচুয়াল মনে করে, তাদের কিছু নেই। ঠাকুর বোঝাচ্ছেন, তুমি রূপে বিশ্বাস কর। অর্থ হল, কোথাও গিয়ে তুমি স্থিতি পাবে। কিন্তু নিরাকার নিরাকার করে আর অদ্বৈতের বড় বড় বুলি কপচালে কোথাও স্থিতি পাবে না, যন্ত্রণার শেষ থাকবে না।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ –ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যে চিন্ময় রূপের কথা মণি বলছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর বলতে চাইছেন –ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কখন অভেদ বোধ হবে? অদ্বৈত জ্ঞান হলে। যতক্ষণ অদ্বৈত জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ এগুলো মুখেও বলতে নেই। তত্ত্বের দিক থেকে আপনি সর্বদা সামনে রাখবেন –ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা। সাধনা যখন করছেন, তখন ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা। সাধনার সময় ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা হয়, তাহলে সবার আগে আপনাকে রূপ মানতে হবে, তার সঙ্গে জপধ্যান করতে হবে। কারণ যিনি বলবেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, তাঁর তো আর জপধ্যান করারও দরকার নেই। কিসের জপ, কিসের ধ্যান? কারণ তিনি তো ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। কিরকম অভেদ?

যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকাশক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। দুগ্ধ আর দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিম শক্তি।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ঠাকুর এখানে যে 'ব্রহ্মজ্ঞান' শব্দটা বলছেন থিয়োরেটিক্যাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং থেকে বলছেন। যদি পুরোটা দেখা হয় তখন এই জিনিসটা পরিষ্কার হবে। সাধনা করে একটা স্তরে পৌঁছে গেলাম, পুরো জিনিসটাকে আমরা বুঝে নিলাম, এটাকেও ব্রহ্মজ্ঞান বলছেন। বিজ্ঞান বলছেন, যখন এই সত্যকে সাক্ষাৎ করা হয়। এই নিয়ে আমাদের একজন সাধু লিখেওছেন। কিন্তু গীতাতে ভগবান বারবার পরিষ্কার বলছেন –*জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্*; জ্ঞান আর বিজ্ঞান আমরা চিরদিনই জানি। আচার্য শঙ্কর বলছেন, যিনি জ্ঞানের পথ অবলম্বন করছেন তিনিও জ্ঞানী। এই জিনিসটাকে লোকেরা কোথাও ভুল বোঝে। এখাবে ব্রহ্মজ্ঞান বলতে থিয়োরেটিক্যাল নলেজ, যেখানে আপনি সাধনা, তপস্যা করে খুব ভালভাবে বুঝে গেছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কিন্তু ওখানে মাস্টারমশাই প্রশ্ন করেছিলেন, আর চিন্ময় রূপ?

যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শত পুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। বশিষ্টদেব ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন কিনা আমরা ঠিক জানিনা, বশিষ্ঠ হলেন এক ঋষি। ঋষিরা যে সবাই সব সময় ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন তা না। এখানে বলছেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে। সেইজন্য কি হয়, সাধন-ভজন করে আপনি একটা খুব উচ্চস্তরে চলে গেলেন, যেখান থেকে আপনার ব্রহ্মের বোধ হয়ে গেল, ব্রহ্মের একটা জ্ঞান হয়ে গেল। এটা কিন্তু সেই জ্ঞান না, যে জ্ঞানের কথা গীতা বলেছেন; আচার্য শঙ্কর বলেছেন, উপনিষদ বলছেন –এটা হল খুব উচ্চমানের একটা থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞান। কিন্তু তখনও এক ধাপ বাকি থেকে যায়। এই জায়গাটা ভাল করে পড়া না থাকলে, ভাসা ভাসা পড়লে লোকেদের বুঝতে ভুল হয়ে যাবে।

যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর-একটি আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।

মণি –অজ্ঞান, জ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন। এখানে বিজ্ঞান মানে পরিষ্কার, ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা। এরপর ঠাকুর যেটা বলছেন, এটা আমরা অধ্যাত্ম রামায়ণে পাই।

দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ আছে, তার দুঃখ বোধ আছে, যার পূণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; যার শুচি বোধ আছে, তার অশুচি বোধ আছে; যার আমি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

ব্রহ্মজ্ঞানীর এই জিনিস কক্ষণ হবে না। ভগবান গীতায় বলছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ*, এই যে বলছেন *গতাসূনগতাসূংশ্চ*, গতাসূ

আর *অগতাসূ*, এনারা সুখ-দুঃখের পারে। কিন্তু এর আগে এতগুলো বললেন, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে, পর পর যেগুলো বলে গেলেন, এই জিনিসগুলো হল যাঁরা সাধনা করে খুব উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন এবং সেখানে ব্রহ্মকে বোধ করেছেন, কিন্তু আত্মাই আছেন, এই জ্ঞানটা এখনও হয়নি, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়নি। আমি রাম মহারাজের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। তিনি বারবার বলতেন –চিন্তন করে করে তুমি যখন ওই স্তরে চলে যাবে, তোমার জীবনটাও যখন তাঁর মত হয়ে যাবে, এটাই হল ব্রহ্মজ্ঞানের সমান। কিন্তু এরপরেও একটা ধাপ বাকি থাকে, যেটা তোমার হাতে নেই। *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, তিনি যখন বরণ করবেন; তা তিনি কখন বরণ করবেন কেউ জানে না। কিন্তু ওটা হলে যেটা হবে, সেটা তোমার হয়ে গেছে।

বিজ্ঞান –কিনা তাঁকে বিশেষ রূপে জানা। বিশেষ রূপে জানা মানে প্রত্যক্ষ রূপে জানা। কি রকম? ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন –**কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ –এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান**। এখানে ঠাকুর 'বিশ্বাস' শব্দটা বলছেন, এই বিশ্বাসের নামই জ্ঞান। প্রথমে যে ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে বললেন, সেখানে বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে। এখানে মনে হতে পারে কোথাও শঙ্করাচার্য যেন এক রকম বলছেন, ঠাকুর অন্য রকম বলছেন; তা কখনই না। তারপর বলছেন –**সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান**। এই কথাটাই গীতাতে পদে পদে বলা হয়েছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে স্থিতঃপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই এই বিজ্ঞানীর কথাই বলা হয়েছে। **ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ; তার নাম জ্ঞান**। প্রথমটা হল শুধু বোধ, তার মানে বিশ্বাস। সেখান থেকে কি হয় – **তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা –বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে –এরই নাম বিজ্ঞান**। এটাই আসল; ঈশ্বর যখন প্রত্যক্ষ হয়ে যান তখন কি হয় –তাঁর সঙ্গে আলাপ করা, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা। আমরা যাঁকে ভালবাসি, যাঁকে পেয়ে আনন্দ করি, বিভিন্ন ভাবে তাঁকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে চাই। মা যে সন্তানকে ভালবাসে, বিভিন্ন ভাবে ভালবাসে। মা সন্তানকে কখন এই জামা পরাচ্ছে, কখন এই গেঞ্জি পরাচ্ছে, কখন কোলে নিয়ে আদর করছে, কখন বুকে জড়িয়ে আদর করছে, সেই মায়ই আবার সন্তানের চোখের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলছে, মায়ের জন্য সন্তানের ব্যাকুলতা মা দেখতে চায় আনন্দ পাওয়ার জন্য। নাটকে, নৃত্যে, সাহিত্যে, সমস্ত প্রকৃতিতে এই নবরস ছড়িয়ে থাকে, এটা হল ভালবাসার জন্য।

জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী মানেই তাঁর সব প্রত্যক্ষ হবে; সত্যিকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলছি। যিনি বলছেন আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, এটা আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব যে, আদৌ তাঁর জ্ঞান হয়েছে কিনা। যাঁর হয়েছে তিনিই জানবেন। তিনি যদি মিথ্যা বলেন আমাদের কিছু করার নেই। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এটা যিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, আমরা বলছি তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী। এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আমাদের মহারাজরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন, আলোচনা করার জন্য কথাবার্তা করেন। তবে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম জিনিসগুলিকে বোঝার জন্য শাস্ত্রের মধ্যে থাকতে হয়। গীতা, উপনিষদ বহু বছর যদি আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, গুরুর কাছে যদি অধ্যয়ন করেন, তখন আপনার একটা ধারণা হয়ে যাবে; এই ধারণাটাই পরে দৃঢ় হয়ে যায়। দৃঢ় হয়ে যাওয়ার পর আপনি জানবেন, ব্রহ্মই বস্তু বাকি সব অবস্তু –কিন্তু এটা সব সময় থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞান। এটাকেই ঠাকুর বলছেন জ্ঞান। এরপর যেটা বাকি থাকে তা হল, এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা। আমাদের গীতা, উপনিষদ বারবার যে জিনিসটা বলছেন, সেটা হল এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা। মুণ্ডকোপনিষদে পরিষ্কার বলছেন – ব্রহ্মজ্ঞানী যা কিছু কামনা করবেন সেটাই তিনি পেয়ে যাবেন। তিনি যে লোকে যেতে চাইবেন, সেই লোকই তিনি যেতে পারবেন। আপনার সত্যিই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে কিনা কি করে বুঝবেন? আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। আপনি যদি কোন বন্ধ্যাকে বলে দেন, তোমার সন্তান হোক, সন্তান হতে তার বাধ্য। ব্রহ্মজ্ঞানী মানে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তবে ব্রহ্মজ্ঞানীরা সচরাচর এ-সব জিনিস করতে যাবেন না।

মাস্টারমশাই চিন্ময় রূপের কথা বলছিলেন। দেখুন, ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন –জীবজগৎ তিনি হয়েছেন –এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। মাণ্ডুক্যকারিকাতেও এই জিনিসটাকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই যে আমরা জীব বলছি, জগৎ বলছি, ঈশ্বর বলছি, আসলে এই তিনটে বিভাজন মনের কারণে হয়, জগৎ বলে কিছু নেই। মন যখন লয় হয়ে যায়, তখন তিনি জানতে পারেন, এই তিনটে ব্রহ্মই হয়েছেন –ব্রহ্মই ঈশ্বর হয়েছেন, ব্রহ্মই জীব হয়েছেন, ব্রহ্মই জগৎ হয়েছেন। এগুলো নূতন কোন কথা না, উপনিষদেই সব রয়েছে। আচার্য শঙ্কর এর উপরেই সব ভাষ্য লিখেছেন। সেখানে আমরা কখনই বলতে পারি না যে, আচার্য এক রকম বলছেন আর ঠাকুর অন্য রকম বলছেন। ঠাকুর আবার অন্য একটা মতের কথা বলছেন।

এক মতে দর্শন হয় না –কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে। আসলে সত্যিই দর্শন হয় না, বেদান্ত মতে আর স্বামীজী তাঁর দেববাণীতেও অনেকবার বলছেন যে, দর্শন হয় না। দর্শন ঈশ্বরের হয়, ব্রহ্মের কখন দর্শন হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া যায়, কারণ আমিত্বটা না চলে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। **কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না –আর ফিরে খবর দেয় না**। ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, আর তাঁর সময়ে যে সব উদাহরণ সামনে ছিল, সেগুলোই বলছেন।

মণি –যেমন আপনি বলেন, মনুমেন্টের উপর উঠলে আর নিচের খবর থাকে না –গাড়ি, ঘোড়া, মেম, সাহেব, বাড়ি, ঘর, দ্বার, দোকান, অফিস ইত্যাদি। ঠাকুর হ্যাঁ কি না কিছুই বলছেন না, কথাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব মজার।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, আজকাল কালীঘরে যাই না, কিছু অপরাধ হবে কি? নরেন্দ্র বলত, ইনি এখনও কালীঘরে যান।

কোথায় অদ্বৈত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা চলছিল, সেখান থেকে হঠাৎ দুম্ করে বলতে লাগলেন, কালীঘরে যাই না, আচ্ছা অপরাধ হবে কি? এটা যে কত উচ্চমানের কথা, এর ব্যাখ্যা করার ভাষা আমার কাছে নেই। কঠোপনিষদে একটা মন্ত্র আছে, *যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*; এখানে যেটা আছে, সেখানে সেটা আছে। যদি ব্রহ্ম সত্য হন, তাহলে দক্ষিণেশ্বরের মা কালীও সত্য, কালীঘাটের মা কালীও সত্য, বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণও সত্য। ইনি যদি মিথ্যা হন, তাহলে ওনারাও মিথ্যা। নরেন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করে করে নিরাকার নিরাকার করছেন। তিনি ঠাকুরকে একটু খোটা দিয়ে বলছেন –ইনি এখনও কালীঘরে যান, মানে ইনি এখনও সাকারে আছেন। নরেনের মনে তখন এটা পরিষ্কার যে, নিরাকারই হল শ্রেষ্ঠতম কথা। আমাদেরও কোথাও একটা ধারণা হয়ে আছে যে, নিরাকার মানে শেষ কথা। নিরাকার কখনই শেষ কথা হয় না, চৈতন্য শেষ কথা। চৈতন্যকে আমরা নিরাকার রূপেও দেখতে পারি, চৈতন্যকে আমরা সাকার রূপেও দেখতে পারি। আবার চৈতন্যকে আমরা জীব, জগৎ, ঈশ্বর রূপেও দেখতে পারি। এই যে চৈতন্যের জ্ঞান, চৈতন্যই সত্য, এটাই প্রকৃত জ্ঞান, এখানে নিরাকার, সাকার কিছু নেই। বিভিন্ন ধর্মে যে বিভিন্ন কথা বলেন, কেউ যীশুর কথা বলছেন, কেউ বুদ্ধের কথা বলছেন। কিন্তু মূল কথা থাকছে সেটাই। ভগবান বুদ্ধকে যাঁরা শেষ কথা বলেন, যদি আপনি বলেন শেষ সত্য হল চৈতন্য, কোন দোষ নেই। কেউ যদি বলেন, আমার জন্য এই জগতে ভগবান বুদ্ধই ঈশ্বর, এখানেও আমাদের কোন আপত্তি নেই।

কথামৃত না পড়া থাকলে, কথামৃত মনন না করে থাকলে ধর্মতত্ত্বকে বোঝা অসম্ভব। আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত নন, তাঁদের যখনই ধর্মে রুচি হয়, তাঁদেরকে সবার আগে বলি কথামৃতটা একটু ভাল করে পড়ুন, তা নাহলে ধর্মতত্ত্ব আপনি বুঝতে পারবেন না। ধর্ম আপনি জেনে যাবেন, বেদ, উপনিষদ জেনে যাবেন; কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বুঝতে গেলে আপনাকে কথামৃত পড়তে হবে। যে ধর্মেরই লোক হোক, ধর্মতত্ত্ব যদি বুঝতে হয়, ধর্মের বিজ্ঞান যদি বুঝতে হয়, কথামৃত ছাড়া কোন পথ

নেই। ঠাকুরকে এখানে অবতার বলে মানতে হবে না, ভগবান বলে মানতে হবে না; কিন্তু যে কথাগুলো ঠাকুর বলছেন, সেই কথাগুলো তোমাকে বুঝতে হবে, বোঝার অন্তত চেষ্টা করতে হবে। কারণ কথামৃত হল science of religion, তার সঙ্গে technic of religion, তার সঙ্গে art of religion। ওই উচ্চস্তরে কথা বলতে বলতে একেবারে ঘরোয়া স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন, এই জিনিস আমরা কোথাও পাই না। বেদেও আমরা এই জিনিস পাই না। গীতাতেও আমরা পাই না। ওনারা পরিষ্কার করে শুধু তত্ত্বটুকু রেখে দিয়েছেন। যেমন স্বামীজীর দেববাণীতে শুধু তত্ত্বটুকু রাখা আছে, ওখানে ঘরোয়া কথা কিছু নেই। এখানে ঠাকুর নিজের সমস্যার কথা বলে যাচ্ছেন, অন্যের সমস্যার কথা বলে যাচ্ছেন, মনুমেন্টের উপরের কথা আসছে, সব কথার মধ্যে কেমন যেন আমরা জড়িয়ে আছি, অথচ তার মধ্যে চলছে, আর্ট, সাইন্স, টেকনিক, টেকনলজি অফ রিলিজিয়ান।

নরেন বলেছে, উনি এখনও কালীঘরে যান, সেই শুনে আবার তাঁর চিন্তা হচ্ছে। তত্ত্বের দিক থেকে ভুল হচ্ছে না, কিন্তু নরেনকে ভালবাসেন। নরেন বলে দিয়েছে কালীঘরে যাওয়াটা দোষ, এই ভেবে তাঁর মাথাটা গেছে বিগড়ে। আপনি বলবেন, ঠাকুর তাহলে জ্ঞানী হলেন কি করে? এটাই হচ্ছে তত্ত্ব। মন এখন সংসারে রয়েছে, এই মন নরেনকেও মনে করে নারায়ণ; নারায়ণ বলে দিয়েছেন কালীঘরে যাওয়াটা দোষের, সেইজন্য মনটা একটু এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেমনি আবার তিনি মনটাকে মা কালীর দিকে নিয়ে যাবেন, তারপর মাকে বলবেন, মা আমি মুর্খ বলে তুই আমাকে বোকা বানালি। মা আবার একটা কিছু বলে দিতেই ঠাকুরের মনটা আবার আগের অবস্থায় চলে আসবে বা মা যেই বলে দিলেন, নরেন কালী মানবে, অমনি মনটা শান্ত হয়ে গেল। তারপর সেই নরেনকেই হয়ত গালাগালি দিতে শুরু করবেন, বা হয়ত বলবেন –যাঃ শালা, তোর কথা আমি মানবোনি। সম্পূর্ণ ছবিটা না নিলে এগুলো বোঝা যায় না। সত্যিই তাই, কথামৃত বোঝা খুব কঠিন। সম্পূর্ণ ছবি যদি মাথায় না থাকে, পুরো এলেমেলো হয়ে যাবে। মনের জগতে যদি বাস হয়, তাহলে একটা যদি সত্য হয় তাহলে দ্বিতীয়টাও সত্য হবে। মা কালী যদি সত্য হয়, তাহলে নরেনও সত্য। ফলে এই সমস্যাটা হয়। মণি তখন ঠাকুরকে যেন বোঝাতে চাইছেন।

মণি –আজ্ঞা, আপনার নূতন নূতন অবস্থা –আপনার আবার অপরাধ কি? এই কথা শোনার পর ঠাকুর আরও কেমন একটা অবস্থায় চলে আসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, হৃদের জন্য সেনকে ওরা বলেছিল, "হৃদয়ের বড় অসুখ, আপনি তার জন্য দুইখানা কাপড়, দুটি জামা আনবেন, আমরা তাকে দেশে (সিওড়ে) পাঠিয়ে দিব"। সেন এনেছিল দুটি টাকা! এ কি বল দেখি, –এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! বল না।

আমরা ঠাকুরকে বলি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। কিন্তু হৃদয় ঠাকুরের সেবা করেছিল, তার এখন টাকার দরকার। একজনকে বলাতে সে দুটি টাকা দিল। আমার জীবনেও দু-চারবার এই রকম হয়েছে। এমনিই আমি কারুর কাছ থেকে নিই না, দিলেও নিই না। কিন্তু এক আধবার কখন কাউকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে। আমার উপর ঠাকুরের এমন অশেষ কৃপা যে, ভদ্রলোক আমাকে বেইজ্জত করে ছেড়েছে। আমি কল্পনাতেও যেটা কখন করিনি সেটাই আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। সেখান থেকে ভক্তদের প্রতি আমার পূর্ণ বৈরাগ্য আর অর্থের প্রতি একশ ভাগ বৈরাগ্য হয়ে গেল। আমি সেই ১৯৭২ থেকে স্বামী সুহিতানন্দজীকে দেখছি, ওদিকে আটাশ বছর, আর এদিকে চব্বিশ বছর, বাহান্ন বছর দেখে আসছি, কোন দিন কারুর কাছে একটি টাকা চাইতে দেখিনি। একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠে স্বামীজীর মূর্তি স্থাপন করা হবে বলে শহরের বড়লোকরা মিলে গিয়েছিলেন, উনিও গেলেন। কিন্তু একবারই গেলেন, গিয়ে বললেন, মূর্তি নাও কেনা হোক, আমি আর টাকা চাইব না। এ কি বল দেখি –এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! ছ্যাঃ! ঠাকুর সেইজন্য কৃপণ লোকেদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারতেন না। অল্প যেটা দেবে, সেটা নিলেও দোষ।

মণি –আজ্ঞে, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এরূপ করতে পারে না, –যাদের জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। দেখুন, কয়েকটা অন্য রকম কথা বলতে বলতে ঢুকে গেলেন আসল তত্ত্বে। পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ি –রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় অধরের বাড়ি শুভাগমন করিয়াছেন। ঠাকুর অধরের বৈঠখানায় বসিয়া আছেন। বৈকালবেলা। রাখাল, অধর, মাস্টার, ঈশান প্রভৃতি ও অনেকগুলি পাড়ার লোক উপস্থিত। খুব সংক্ষেপে – শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায় এসেছেন। আজ শনিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, **১৮৮৩** খ্রীষ্টাব্দ। (পৃঃ ২৬৭) ঠাকুর ঈশানকে সম্বোধন করে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) –তোমার সেই গল্পটি বল তো; ছেলে চিঠি পাঠিয়েছিল। আগেকার বাঙালী ব্রাহ্মণ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন; ঈশানও তখনকার দিনের একজন খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখনকার দিনে এখনকার মত শাস্ত্র, গ্রন্থ এগুলো সহজলভ্য ছিল না; পরম্পরা দিয়ে যে আচার-নিষ্ঠা চলে আসছিল, সেটাকে অবলম্বন করেই ধর্মের জ্ঞান আহরণ করা হত। ব্রাহ্মণদের উপর গুরু দায়ীত্ব ছিল এই পরম্পরাকে রক্ষা করা। ঈশান গায়ত্রী পুরশ্চরণ করতেন। ওনার সাধারণ ভাব ছিল নেতি নেতি সাধনা। নেতি নেতি মানে সব কিছুকে বাদ দেওয়া। বেদান্তে এই জিনিসটা প্রচলিত একটি সাধনা ছিল। ঠাকুর বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা দিতেন। এখন যাঁরা কথামৃত মন দিয়ে পড়েছেন, ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা ঈশানকে কিভাবে দেখবেন? ঈশান একজন ভাল মানুষ। ভিতরে সত্ত্বগুণ আছে, ভাল ভাব আছে; কিন্তু এতটুকু দিয়ে ঈশ্বরের দিকে এগোন যায় না। ইদানিং কালের ঠাকুরের বেশির ভাগ ভক্তরাই এই ভুলটা করছেন, তাঁরা মনে করছেন, ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরের ভাব নিয়েছি, ঠাকুরের মন্ত্র যতটা পারি জপ করছি আর মনে করছি এতেই সব হয়ে যাবে। না, কখনই সব হয়ে যাবে না। এই প্রচেষ্টা আপনাকে একজন সাত্ত্বিক মানুষ করে দেবে। তবে কিছু না করার থেকে এতটুকু করাও অনেক অনেক ভাল। যারা কিছুই করে না, এরা সবাই তামসিক। ঠাকুর হলেন কৃপাসিন্ধু, যার মধ্যে একটু সত্ত্বগুণের প্রকাশ দেখছেন, তাকে গিয়ে ধরতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলছেন –ভিতরে সোনা চাপা আছে খবর নাই।

ঈশান অনেক ধর্মীয় কথা ও কাহিনী জানতেন। ঠাকুরও তাই ঈশানকে বলছেন, তুমি সেই গল্পটা বলো তো। এগুলো প্রচলিত কথা ও কাহিনী।

ঈশান (সহাস্যে) –একটি ছেলে শুনলে যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই সে প্রার্থনা জানাবার জন্য ঈশ্বরকে একখানি চিঠি দিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিছিল। ঠিকানা দিছিল স্বর্গ। (সকলের হাস্য)। এগুলো হল বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –দেখলে! এই বালকের মতো বিশ্বাস। তবে হয়, (ঈশানের প্রতি) –আর সেই কর্মত্যাগের কথা?

'বালকের মতো বিশ্বাস' এর উপর আমাদের কয়েকটা কথা বলতে হয়। বিশ্বাস দুই প্রকার। একটা হল, যেখানে আপনি সচেতন ভাবে ধর্মজীবনে এগোচ্ছেন, সেখানে বিশ্বাস। এখানে আমার কথা বলতে পারি। আমি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী। আমার একটা বিশ্বাস আছে যে, আমার যাঁরা আচার্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে গত হয়ে গেছেন; তাঁদের কথার উপর বিশ্বাস। কি রকম বিশ্বাস? মায়ের উপর তাঁর সন্তানের যে রকম বিশ্বাস। ব্যক্তিগত ভাবে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমার কি কি সাধনা?

আমার এই একটাই সাধনা –বিশ্বাস। সেখান থেকে এই যে বেলুড় মঠ; স্বামীজী বলেছেন সঙ্ঘ হল ঠাকুরের স্থূল শরীর।

আমি এক সময় ছাপড়া আশ্রমে ছিলাম। সেখানে একজন সরকারি অফিসার আশ্রমের ভক্ত ছিলেন, আমার সময় ততটা না থাকলেও এখন রীতিমত একজন ভাল ভক্ত। ওনাকে আমি বারবার এই কথাই বলতাম, বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, এর কেন্দ্রগুলি এগুলো ঠাকুরের স্থূল শরীর। যদি সঙ্ঘের সেবা করা হয়, ঠাকুরের সেবাই করা হয়। উনি একজন বড় সরকারি অফিসার, আমার কথাতে তাঁর হৃদয় কোথাও ছুঁয়ে গেল। সেই সময় আর একজন পুলিস অফিসার, উনি এক সময় আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছিলেন, উনি সাহায্য না করলে ছাপড়া আশ্রমকে দাঁড় করানো খুব মুশকিল ছিল। কোন ভাবে এই পুলিশ অফিসার একটা কোন ঝামেলায় পড়েছিলেন। এই ঝামেলা থেকে এই বড় সরকারি অফিসার ভদ্রলোকই এখন এই পুলিশ অফিসারকে বাঁচাতে পারেন তাঁর নিজের ক্ষমতা দিয়ে। উনিও সরাসরি তাঁকে এই কথা বললেন। পরে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'আপনি যে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মঠ মিশন হল ঠাকুরের স্থূল শরীর। ওই পুলিশ অফিসার সেই সময় ছাপড়া আশ্রমকে দাঁড় করাতে গিয়ে ঠাকুরের অনেক সেবা করেছিলেন, এই সেবা যাতে নিষ্ফল না হয়; এই ভেবে আমি তাঁকে OK করে দিয়ে সব ঝামেলা থেকে বার করে এনেছি'। কিভাবে এই ঘটনাকে আপনারা নেবেন আমার জানা নেই? কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি মুগ্ধ।

এটাকে বলে বিশ্বাস। আমি নিজেও বিশ্বাস করি। জান্তা অজান্তায় আমাদের সঙ্ঘের কোন ক্ষতি হতে পারে ভেবে আমি কারুর ক্ষতি হতে দেব, কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু ওই ভদ্রলোক ওই পুলিস অফিসারকে ওই পর্যায়ে গিয়ে যে এই রকম সাহায্য করবেন, ভাবাই যায় না। কেন করলেন? উনি এক সময় সঙ্ঘের প্রচুর সেবা করেছিলেন, শুধু এইটুকু ভেবে ভদ্রলোক সাহায্য করলেন; এটাকে বলে বিশ্বাস। সাধু-সন্ন্যাসীরা হলেন ঠাকুরের সন্তান; এনাদের যখন সেবা করা হয় তখন ঠাকুরের স্থূল শরীরেরই সেবা করা হয়। আপনি হয়ত বলতে পারেন, অমুক সাধু তো ভাল না, তা হোক, উনি যদি খারাপ হয়ে থাকেন উনি ডুববেন, তাতে আপনার কি; আপনি কেন ঠাকুরের সেবা করার সুযোগ ছেড়ে দেবেন। যেভাবেই হোক, জো সো করে আপনাকে নিজের উদ্ধার করতে হবে।

এমনি একটা ব্যক্তিগত মজার কথা বলি। কম বয়সে আমার তেজটা একটু বেশি ছিল; তেজ বলতে রাগ। বড়রা মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন –অত রেগে যেও না। রেগে যাওয়া মানে খুব সাধারণ কয়েকটা জিনিস নিয়ে রেগে যেতাম। তর্কাতর্কি করতে নামলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, যতক্ষণ মাটিতে না ফেলছি ততক্ষণ ছাড়তাম না। এখন কেউ তর্কাতর্কি করলে চুপচাপ শুনে যাই। বড়দের কাছে শিখেছিলাম, কেউ কিছু বললে শুধু বলা –হ্যাঁ, হ্যাঁ; বেশ বেশ; ও তাই নাকি, ইত্যাদি। কারণ আমি জানি সে ডুববে। খুব আপনজন হলে যদি বুঝি ওর সর্বনাশ হতে যাচ্ছে, তখন তাকে আটকাবো, এ-ছাড়া সবাইকে ছেড়ে রেখে দিয়েছি। কারণ আমি জানি, তুমি তো ডুববে, তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নিজে কেন ডুবে মরি। আমার কথা আপনি কিভাবে নেবেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ আমাকে নিজে আগে বাঁচতে হবে। ঠিক তেমনি, এই যে ভাব, সেই বিশ্বাস –আধ্যাত্মিক জীবনে আমাকে বাঁচতে হবে; আমার নিজের উদ্ধার আমাকে করতে হবে। এই রকম বালকের ন্যায় বিশ্বাস থাকতে হবে, তা নাহলে এগোন যাবে না।

দ্বিতীয় যেটা হল, হ্যাঁ ঠিক আছে, বড়দের কথা শুনেছি –হচ্ছে, হবে, দিনগত কর্মক্ষয় করে চলেছি। আজকের দিনটা কাটল, কালকের দিনটা কেটে গেল। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমরাজকে বলছেন –*সস্যমিব মর্তঃ পচ্যতে সস্যমিব জায়তে পুনঃ*, এই মর্ত্যে ধান-গমের মত জন্মাতে থাকবে আর মরতে থাকবে। বেশির ভাগ মানুষের কাছে এটাই সত্য। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, মনন করছেন, তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গীটাও অবশ্যই পাল্টেছে। আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকেরা এসে তাঁদের

জীবনের অবসাদের কথা শোনান। কিন্তু ভাল লাগে জেনে যে, এই ধরণের শাস্ত্রের ক্লাশগুলো শোনার পর তাঁদের অনেকেই অবসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, এমনকি ওষুধ খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছেন। ভাল আছেন শুনে আমারও ভাল লাগে। শাস্ত্রের কথা শুনলে আমার ভাল হবে, ঈশ্বরকে ভালবাসলে আমারও ভাল হবে –বালকের মত এই বিশ্বাস চাই। *অনিত্যমসুখং লোকং ইমংপ্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, বুঝে নাও জগৎটা এই রকমই, যাদের ডোবার তারা ডুববেই। তবে তারাও একদিন উঠবে। আমিও নিজে একদিন হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, এখন বুঝেছি, আমার আর হাবুডুবু খেয়ে লাভ নেই।

ঈশান –ভগবানলাভ হলে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়। গঙ্গাতীরে সকলে সন্ধ্যা করে, একজন করছে না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, আমার অশৌচ হয়েছে, সন্ধ্যা করতে নাই। মরণাশৌচ, আর জন্মাশৌচ দুই-ই হয়েছে। অবিদ্যা মার মৃত্যু হয়েছে, আত্মারামের জন্ম হয়েছে। অবিদ্যা মা এবং আত্মজ্ঞান সন্তান। সন্ন্যাসীরা যে মুণ্ডন করেন, তার পিছনে এই একটাই কারণ, বলেন –অবিদ্যা মার মৃত্যু হয়েছে। আপনি আমাকে বলতে পারেন, আপনার কি অবিদ্যা মা মারা গেছে? তার উত্তরে এটাই বলার যে, সন্ন্যাসী দুই প্রকার, একজন যিনি জেনে গেছেন, আর-একজন যিনি জানার চেষ্টা করছেন; সেইজন্য তাঁকে সন্ন্যাসী বলা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আর আত্মজ্ঞান হলে জাতিভেদ থাকে না, সেই কথাটি?

জাতিভেদ প্রথা ভারতের এক আদি সমস্যা, কবে যে ভারত এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ভগবান জানেন। তার মধ্যে সরকার আবার শংসাপত্র বিলি করে জাতিভেদ প্রথাকে চিরস্থায়ী করে দিয়েছে। মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থে তাও আন্দোলনের সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন তো চাকরিতে সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রভাব খাটিয়ে, ঘুষ দিয়ে একটা কাস্ট সার্টিফিকেট জোগাড় করলেই হয়ে গেল, এই সুবিধা বংশপরম্পরায় চলতেই থাকবে। যাই হোক, ঠাকুর এখানে বলছেন, আত্মজ্ঞান হলে জাতিভেদ থাকে না। ঈশান শঙ্কারচার্য ও চণ্ডালের সেই খুব প্রচলিত কাহিনীটা বলছেন। শঙ্করাচার্য নাকি চণ্ডালকে বলেছিলেন, দূরম্ অপসর রে চণ্ডাল।

ঈশান –কাশীতে গঙ্গাস্নান করে শঙ্করাচার্য সিঁড়িতে উঠছেন –এমন সময় কুকুরপালক চণ্ডালকে সামনে দেখে বললেন, এই তুই আমায় ছুঁলি। চণ্ডাল বললে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই –আমিও তোমায় ছুঁই নাই। আত্মা সকলেরই অন্তর্যামী আর নির্লিপ্ত। সুরাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব আর গঙ্গাজলে সূর্যের প্রতিবিম্ব এ-দুয়ে কি ভেদ আছে? এই দেহটা জড়, দেহ কখন নিজেকে ছুঁতে পারে না, আর আত্মা সর্বব্যাপী ও নির্লিপ্ত, আত্মাও ছুঁতে পারে না। এই জিনিসটাকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি। এখান থেকে আবার সমন্বয় নিয়ে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –আর সেই সমন্বয়ের কথা, সব মত দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়?

ঈশান (সহাস্যে) –হরি-হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ, যিনিই হরি তিনিই হর। বিশ্বাস থাকলেই হল। এগুলো হল ধর্মকে আধার করে কিছু প্রচলিত গল্প। ঠাকুর আবার ঈশানকে ভক্তের হৃদয় কেমন সেই নিয়ে বলতে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –আর সেই কথাটি –সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

ঈশান (সহাস্যে) –সকলের চেয়ে বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ, মর্ত্য, আতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সেই বিষ্ণুপদ সাধুর হৃদয়ের মধ্যে। তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়। এ-সব কথা শুনে উপস্থিত ভক্তরা সবাই আনন্দ করছেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আদ্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রহ্ম-উপাসনা –ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবেন। গায়ত্রী ব্রহ্মমন্ত্র। একেবারে বিষয়বুদ্ধি না গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু কলিতে অন্নগত প্রাণ –বিষয়বুদ্ধি যায় না। মাস্টারমশাই এইসব বর্ণনা করার পর ঠাকুরের কথা শুরু হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) –কেন নেতি, নেতি করে বেড়াচ্ছ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় "অস্তি মাত্রম্"। কেবলঃ রামঃ। এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা। আমরা যখন মঠে জয়েন করেছিলাম, সেই সময় এই জিনিসগুলো প্রচলিত ছিল। হরিদ্বারের সাধু মহাত্মারা, হৃষিকেশ, উত্তরকাশীর সাধুদের তখন খুব গ্ল্যামারাস মনে হত। আমি নিজে উত্তরকাশীতে চারবার গেছি। এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, যা কিছু আছে সব বেলুড় মঠেই আছে, যা হবার এখানেই হবে। তবে আশ মেটাবার জন্য একটু ঘোরাঘুরি করে সব দেখে নিতে হয়। হরিদ্বারাদিতে গেলে ওই সব সাধুদের নেতি নেতি ইত্যাদি বড় বড় সব কথা, এখনও এক ভাবে চলছে। ঠাকুর বলছেন, কেন নেতি নেতি করে বেড়াচ্ছ। আসলে এগুলোকে নিয়ে থাকলে এগোন যায় না। ঠাকুর এবার শিক্ষা দিতে শুরু করছেন –ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় 'অস্তি মাত্রম্'। কেবলঃ রামঃ।

সাধনার ব্যাপারে বলতে গেলে রাজযোগের কথা অবশ্যই আসবে, কারণ রাজযোগের সাধনা খুব সিস্টেমেটিক। রাজযোগে সাধনার ব্যাপারে পুরো বিস্তারে আমাদের ব্যাখ্যা করা আছে। রাজযোগ যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন বা আমাদের লেকচারগুলো শুনেছেন, তাঁরা দেখতে পারবেন যে, পুরো রাজযোগ ব্যাপারটাই হল নেতি নেতি। আমরা যখনই কোন কিছু দেখছি, শুনছি, তখনই আমাদের মনে একটা ভাব ওঠে, মনে একটা ঢেউ ওঠে, এই ঢেউকে বলা হয় চিত্তবৃত্তি। যোগশাস্ত্র বলছেন, এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে শান্ত কর, নেতি নেতি। যদিও পতঞ্জলি পরে পরে আবার নাম জপ করার বিধি বলছেন। কিন্তু এদিকে যোগ আবার ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরকে যদি না মানি, তাহলে কিসের জপ করব? তখন বলছেন 'ওঁ'কারের জপ করতে। উপনিষদে ওঁ-এর যে ব্যাখ্যা আছে তার সাথে যোগের ওঁ-এর ব্যাখ্যা ঠিক মেলে না। সেইজন্য যোগশাস্ত্র ঘরে ঘরে যেতে পারল না, নেতি নেতিও তাই ঘরে ঘরে ধর্ম হতে পারল না। ঘরে ঘরে যোগকে না জানলেও যোগকে জানা সবারই জন্য খুব জরুরী। আমার খুব ইচ্ছে যোগকে আধার করে একটা বই লিখি –মনের সাম্রাজ্য।

যাবতীয় যা কিছু আছে সব মনের সাম্রাজ্যই আছে। মনের সাম্রাজ্যের পারে সেই পরম পুরুষ বিরাজমান। ঠাকুর বলছেন, এই যে তুমি বারবার বাদ দাও বাদ দাও বলছ, এগুলোকে ছাড়। মনের সাম্রাজ্যের পারে চৈতন্য যিনি, তাঁর উপর মনটাকে লাগাও। সেদিক থেকে ভক্তিশাস্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ। এই কারণে ভক্তিশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, একজন ইষ্টকে দিয়ে দেওয়া হল, সেই ইষ্টের উপর এবার তুমি ধ্যান কর। ইষ্ট হলেন সেই চৈতন্যের মূর্তরূপ, চৈতন্যের বিগ্রহ। এরপর ভগবান নিজে তোমার হাত ধরে নিয়ে যখন যেখানে যার যেমনটা দরকার সেখানে তেমনটা করাবেন। আপনি বলবেন, ভগবান ঠিক জমল না। এই যে একটু আগে বলা হল –বালকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে কি হয়? আপনি দেখবেন তিনি নিজে আপনাকে জানিয়ে দেবেন। যদি এতটুকু বিশ্বাস না থাকে, তাহলে ধর্মজীবনে আপনি কি করতে পারবেন? কিছুই করতে পারবেন না। মূল জিনিসটাতেই যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তো আপনার ধর্মজীবন এলেমেলো হয়ে যাবে। আমাদের কাছে অনেকে আসেন, কেউ বলে তিনি অমুক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, কেউ বলে আমি তমুক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের আমি বলি, অথচ দেখুন কেউই আপনারা মূল শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নন। শাস্ত্র যেরূপটি আছে, সেই রূপটি জানার আপনাদের কারুর কোন আগ্রহ নেই। আমাদের ভক্তরা এসে বলে, মহারাজ আমি অমুক অমুক মহারাজকে জানি; আমি অমুক আশ্রমে গেছি, আমি অমুক জায়গায় গেছি। কিন্তু একবারও কাউকে বলতে দেখলাম না –মহারাজ

আমি অমুক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, আমি অমুক শাস্ত্রের মনন করি; আর অধ্যয়ন ও মনন করে আমি শাস্ত্রের এই এই জিনিসগুলোকে ধারণা করতে পারছি।

এখানে আমার একটা প্রশ্ন আটকাচ্ছে। বাকিরা এসে যেসব প্রশ্ন করে, আর এমন বোকা বোকা প্রশ্ন করে যে, বিরক্ত হয়ে যেতে হয়। আমাদের হিন্দুদের যে মূল শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, গীতা আর তার সাথে সেখানে যদি ভাগবতকে রাখা হয়; দেখা যাবে এনারা কেউ কক্ষণ নেতি নেতি জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন না। ভাগবতে তাও নেতি নেতি একটু আসে, কিন্তু বেদ, উপনিষদ ও গীতা কোথাও নেতি নেতি জিনিসটাকে নিয়ে কিছু বলেন না; বলেন না বলতে, জোর দেন না; ওনারা অস্তি জিনিসটার উপর জোর দেন। এই নেতি নেতি জিনিসটা, আমাদের যোগের যে নেতি নেতি ভাব আর বেদান্তের যে নেতি নেতি ভাব, এটাকে নিয়ে নিলেন ভগবান বুদ্ধ; সেখান থেকে জন্ম নিল বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের যাঁরা শিষ্য, প্রশিষ্য হলেন, তখনকার দিনে তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ। অশোকের পর থেকে বৌদ্ধ ধর্ম রাজধর্ম হয়ে গেল। রাজধর্ম হয়ে যাওয়াতে যারা বৌদ্ধ ধর্মে আসত তাদের প্রচুর জমি-জায়গা দেওয়া হত। সেখান থেকে বিহার, উত্তরপ্রদেশে ভূমিহার জাতি এসেছে। এখন এদের দেখাতে হবে যে, আমি তোমাদের থেকে আলাদা এবং তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তারপর এরা এমন এমন সব দর্শন দিতে শুরু করল, আর নেতি নেতি জিনিসটাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেল যে, সেখান থেকে তারা নিয়ে এলো শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ইত্যাদি আর সেখান থেকে পুরো ধর্মটাকে সংশয়াচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে গেল।

এখানে ভগবান বুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে না, বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু এরা সবাই তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ ছিল, সেইহেতু বুদ্ধিটাও কুশাগ্র ছিল। আচার্য শঙ্কর এসে কচকচ করে কেটে সমূলে তাদের উপড়ে ফেললেন। বৌদ্ধ ধর্ম নাকি অহিংসার ধর্ম, অথচ শ্রীলঙ্কার দিকে তাকিয়ে দেখুন কি হচ্ছে, বার্মাতে দেখুন কি হচ্ছে, তিব্বতে কি হচ্ছে, চীনে কি হচ্ছে; যেখানেই গেছে সেখানেই হিংসা শুধু হিংসা, হিংসা ছাড়া এদের কিছু নেই। নেতি নেতি জিনিসটা মানুষকে ভিতর থেকে শুষ্ক করে দেয়। অন্য দিকে 'অস্তি মাত্রম্' ভালবাসার জিনিস। নেতি নেতিও একটা পথ, যারা এই পথ অবলম্বন করতে চাইবে করবে। কিন্তু আপনার পরম্পরায় যেখানে সুযোগ আছে, ভিতরটা মধুময় করে মাধুর্যমণ্ডিত করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, কেন আপনি ওই শুষ্ক জিনিসের দিকে যাবেন? ঠাকুর বারবার বলছেন, আমি শুষ্ক জ্ঞানী হতে চাই না। কেন অস্তি মাত্রম্ বলা হয়, আগে আগে আমরা বিস্তারে আলোচনা করেছি, আবার যখন সুযোগ আসবে, ওটাই যখন বিষয় থাকবে তখন আবার আলোচনা করা যাবে।

আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি, সবই সেই আদ্যাশক্তির, সেই চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য –সৃষ্টি, পালন, সংহার; জীবজগৎ; আবার ধ্যান, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম –সব তাঁর ঐশ্বর্য।

এখানে আমরা বিস্তারে ব্যাখ্যায় যাব না। আমি প্রথম যখন জয়েন করি, তখন আমার বয়স একুশ বছর। একুশ বছর বয়সের যুবকের কি আর বুদ্ধি থাকবে! এই কথাগুলো যখন পড়তাম তখন আমার দারুণ লাগত। নিজের লোকেদের সাথে এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতাম। এইভাবে বেশ কয়েক বছর চলতে থাকল। এখন ঠাকুরের কৃপায় বুঝতে পারছি, ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। ভক্তরা যাঁরা নিয়মিত কথামৃত পাঠ করেন, তাঁরা তখন শাস্ত্রীয় ওই কথাগুলোতে রমণ করছেন, আনন্দ পাচ্ছেন। এরপর আসে বোঝার চেষ্টা করা, তারপরে আসবে বোধ। কেনোপনিষদে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, কিভাবে আমরা যাবতীয় যা কিছু করছি, দেখছি, শুনছি; সমস্ত কিছু আসলে চৈতন্যই করছেন। মাণ্ডুক্য কারিকাতেও এই জিনিসটাকে বিস্তারে বলা হয়েছে।

মূল বক্তব্য হল, এই যে আমরা বোধ করি; এই কলমটা আমার কাছে আছে বা আমি বলছি, আমি কলমটাকে দেখলাম। কিন্তু কলমটাকে যখন আমি বোধ করছি, কলম আছে, এই বোধের জন্য দরকার চেতনার। যুক্তি দিয়ে, পুরো সিস্টেমেটিক্যালি আচার্য দেখাচ্ছেন, বোধ বাদে অন্য কিছু নেই, মানে চৈতন্য বাদে কিছু নেই। কিন্তু এই চৈতন্য থেকে এই জগৎকে আমরা আলাদা ভাবে দেখছি।

আমাদের স্বভাব জগৎকে আলাদা দেখা, ঈশ্বরকে আলাদা দেখা; সেইজন্য এটাকে বলা হয় শক্তি। এইজন্য বলা হয় ব্রহ্ম আর তার শক্তি। কারণ যিনি অখণ্ড, যিনি নিত্য, তিনি এখন খণ্ডিত ভাবে দেখা দিচ্ছেন। কঠোপনিষদে বলছেন, *নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। আবার বলছেন অগ্নি সেই এক, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকে বিভিন্ন ভাবে দেখায়। আত্মাও ঠিক সেই রকম, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে দেখায়, আসলে আত্মা এক। ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা কিছু নয়, যদি বলেন চৈতন্যই সব কিছু তাতেও দোষের কিছু নেই। যদি বলেন শক্তির ঐশ্বর্য, তাতেও দোষের কিছু নেই।

মূল বক্তব্য হল, এই যে আমরা বহু দেখছি, নানা কিছু দেখছি, এই দেখাটাকে বন্ধ করা। আর যখন আমি কিছু ভাবছি, কিছু দেখছি, সেখানে যে আমিত্বের ভাব, সেটাকে নাকচ করে দিচ্ছেন। আসলে সমস্ত কিছু শক্তির খেলা। ঠাকুর তারপরেই বলছেন –**ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ**। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এটা শুধু কথার কথা না। আমাদের একজন মহারাজ বলছেন, ঠাকুর হলেন শাক্ত অদ্বৈত। কিসের শাক্ত অদ্বৈত? অদ্বৈত মানে অদ্বৈত; পরিষ্কার বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, এই কথা ঠাকুর কি ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা ভেবে বলছেন? একেবারেই না। আমাদের বোধ হচ্ছে জগৎ ঈশ্বর থেকে আলাদা। এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা শব্দ নেওয়া হল –শক্তি। বেদান্ত এটাকেই মায়া বলছেন। আপনি একে শক্তি বলুন, মায়া বলুন, একই জিনিস। কোন তফাৎ নেই, শক্তিও যা মায়াও তাই। সাংখ্য ও যোগের প্রকৃতি বলুন, সেই একই জিনিস, কোন তফাৎ নেই।

ঠাকুর এখানে রামায়ণের পরম্পরা থেকে হনুমানের একটা কাহিনীকে অবলম্বন করে বলছেন – **লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান রামকে স্তব করছেন, বলছেন, হে রাম, তুমিই পরব্রহ্ম, আর সীতা তোমার শক্তি; কিন্তু দুজনে অভেদ। যেমন সর্প ও তার তির্যগ্‌গতি –সাপের মতো গতি ভাবতে গেলেই সাপকে ভাবতে হবে। দুগ্ধ ভাবলেই দুধের বর্ণ ভাবতে হয়, ধবলত্ব। দুধের মত সাদা অর্থাৎ ধবলত্ব ভাবতে গেলেই দুধকে ভাবতে হয়। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তিকে ভাবতে হয়**। অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব উচ্চমানের গ্রন্থ, সেখানেও নারদের স্তুতি আছে, তিনিও এভাবে শ্রীরামের স্তুতি করেছেন। ঠাকুর নারদের কথাও কথামৃতে বলেছেন, এখানে হনুমানের কথা বলছেন।

এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম', 'তাই হলুম'। 'আমিই তুমি' 'তুমিই আমি'।

চৈতন্য যিনি তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি আপ্তকাম। মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছেন, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*। যিনি আপ্তকাম, যার মধ্যে কোন কামনা নেই, কেন তিনি সৃষ্টি করবেন? কোন উত্তর নেই। উপনিষদ তাই বলছেন, জানা নেই তিনি কেন ভাবলেন; কি ভাবলেন? আম এক, আমি বহু হব। এই যে ভাবা, 'আমি বহু হব', এটাই মায়া, এটাই ঈশ্বর; এছাড়া কিছু না। এই যে বলছেন, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে, প্রথম প্রথম পড়ার পর আমাদের মনে হত, মানুষ যেমন গামছা দিয়ে নিজের মুখকে ঢেকে দেয়, সেই রকম কিছু। এটা তা নয়, এই যে তিনি ভাবছেন, সৃষ্টি হোক –এটাই আবরণ। কারণ আমরা জানি না, তিনি কেন সৃষ্টি করলেন, এই প্রশ্নের কোন উত্তর হতে পারে না। যিনি মনের পারে, তিনি কেন মনের সৃষ্টি করতে যাবেন। যিনি পদার্থের পারে তিনি কেন পদার্থের সৃষ্টি করতে যাবেন। যিনি কালের পারে, তিনি কেন কালকে সৃষ্টি করবেন। সেইজন্য আবরণ ছাড়া কোন শব্দ বলা যাবে না। এই আবরণকে কেউ বলেন প্রকৃতি, কেউ বলেন মায়া, কেউ শক্তি বলেন।

যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীদের সোঽহম্ অর্থাৎ 'আমি সেই পরব্রহ্ম' এ-কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। এই ব্যাপারে ঠাকুর বারবার সাবধান করে গেছেন। একজন খুব নামকরা ডাক্তারবাবু শুরু করলেন বেদান্তের প্রচার। প্রচুর লেকচার আদি দিলেন,

চারিদিকে তাঁর খুব নাম হল। সেই থেকে এখন দেখা যাচ্ছে, বাচ্চা বুড়ো অনেকেই সোঽহম্, সোঽহম্ বলে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ 'আমি' বোধ আছে ততক্ষণ এ-কথা বলা যায় না 'আমি সেই পরব্রহ্ম'। কিন্তু কে এদের বোঝাবে।

যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ মা – মা বলে ডাকা ভাল। এই কারণে অনেকে কথামৃত পড়তে গিয়ে দর্শনের দিক দিয়ে ভুল করে বসেন। আমাদের শঙ্করাচার্য ঠিক ওই রকম খুব সুন্দর করে –*মন্ত্রম্ হো যন্ত্রম্* এই সব বলে স্থাপনা করেছেন। আপনি বলবেন, নারী রূপে কেন দেখা হচ্ছে? কে জানে কেন দেখা হচ্ছে। আগেকার দিনে মায়েরাই ঘরবাড়ির সব কিছু সামলাতেন। জগৎরূপী এই বিশাল সংসারকেও মা সামলাচ্ছেন, এর বেশি কিছু মনে হয় না। আগেকার দিনে ঘরবাড়ির ব্যাপারে পুরুষরা কখন নাক গলাতেন না। বর্তমান কালে এসে সব ছোট ছোট পরিবার হয়ে গেছে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই রান্না করে। এখনকার দিনে তাই এই উদাহরণগুলো খাটবে না। আগেকার দিনে হাজার হাজার বছর ধরে যে জিনিসগুলো পরিবারে, অন্যান্য সমাজে চলে আসছিল, সেটাকে আধার করেই মা রূপে বলছেন, শক্তি রূপে বলছেন; এছাড়া আর কিছু না।

তুমি মা, আমি তোমার সন্তান –এই যে একটা ভাব, কি সুন্দর ভাব। **তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। এই দাসভাব থেকে আবার সব ভাব আসে –শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহলে আবার তাকে বলে, আয়, আমার কাছে বস; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বসতে যায়, মনিব রাগ করবে না?** যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চান, তাঁদের জন্য এই ভাব খুব ভাল। বেলুড় মঠে ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজমান, মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে এসে আপনি বলছেন –ঠাকুর, তুমি যা, আমিও তাই। বলতেই পারেন, তাত্ত্বিক দিক থেকে আপনি ঠিক হতে পারেন। কিন্তু এতে আপনি আধ্যাত্মিক পথে চলতে গিয়ে যে ভুল করছেন, এর চাইতে আর কিছু ভুল হতে পারে না; কারণ এতে আপনার কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না।

একটা প্রচলিত গল্প শুনেছিলাম, একজন পরম বৈষ্ণব দুর্গাপূজা দেখতে গেছে। মা দুর্গাকে দূর থেকে হাতজোড় করে বলছে, 'নমস্কার বৌদি'। তার মানে শিব হলেন তার দাদা। ফ্যানাটিসিজিম্ কোথায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারে কল্পনা করা যায় না, বলছে –'নমস্কার বৌদি'। যার বাড়িতে পূজা সে আর তাকে কিছু বলল না; মনে মনে ভাবছে একদিন তোমাকে এর উত্তর আমি দেব। কয়েকদিন পর বৈষ্ণবের সেই বাড়িতে নিমন্ত্রণ হয়েছে। বৈষ্ণব এসেছে, তাকে খুব আপ্যায়ন করে খেতে বসানো হয়েছে। সেই ভদ্রলোক তাকে খেতে বসিয়ে তার পাতে গাঁজা, ভাঙ, ধুতরার বীজ সব রেখে দিয়েছে, আর বড় একটা লাঠি নিয়ে ওর খাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'শিব তো তোমার দাদা, এখন সব তোমাকে খেতে হবে; তা নাহলে লাঠি দিয়ে এমন মার মারব, তোমার শিব দাদা এসেও বাঁচাতে পারবে না'। এই হল সব বোকা বোকা কথা –নমস্কার বৌদি। 'সোঽহম্', 'নমস্কার বৌদি' এগুলো সব বোকা বোকা কথা।

অবতারলীলা –এ-সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব। মাও বলছেন, অবতারও উড়ে যায়। যখন উড়ার তখন উড়বে, কিন্তু প্রথমেই উড়িয়ে দিলে কি করে চলবে। লেখাপড়া শুরু করতে হয় পাঠশালা থেকে, সেখান থেকে হাইস্কুল, হাইস্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়কেও এক সময় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তাই বলে লেখাপড়া শুরু না করেই কি করে বলবেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়কেই ছাড়িয়ে গেছি? এভাবে কোন কিছুই হয় না, শেষ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য পুরো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

ঈশান –হরি, হর এক ধাতু কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। (সকলের হাস্য) আমাদের যে হরিদ্বার তীর্থস্থান, এর নামই হল হরিহরদ্বার। একদিকে কেদারনাথ মহাদেবের স্থান, অন্যদিকে বদ্রীনাথ, যেখানে বিষ্ণু আছেন। হরি আর হর দুজনেই আছেন কিনা তাই বলা হয় হরিহরদ্বার।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁ, এক বই দুই কিছু না। বেদেতে বলছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম, পুরাণে বলছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ, আবার তন্ত্রে বলছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ। যদিও বেদ সরাসরি এভাবে ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম বলছেন না, কিন্তু বেদ মতে যাঁরা সাধনা করেন, তাঁরা এভাবেই করেন।

সেই চিচ্ছক্তি, মহামায়ারূপে সব অজ্ঞান করে রেখেছে। অজ্ঞান করে রেখেছেন বলেই তো আমি জানি না আমি কে, আমার প্রকৃত স্বরূপ কি। এইজন্য আমি বলছি, আপনি শুনছেন –এটাই অজ্ঞান। **অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, রামকে দর্শন করে যত ঋষিরা কেবল এই কথাই বলছে, হে রাম, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না**।

মায়া যে কিভাবে বাঁধবে, কত ভাবে বাঁধবে কারুর জানা নেই। কখন আপনার ভিতরে দয়া দিয়ে বাঁধবে, কখন কর্তব্যবোধ দিয়ে বাঁধবে বা অন্য কোন কিছু দিয়ে বাঁধবে। আমি অল্প বয়সে খুব কাঠখোট্টা ছিলাম। সেই সময় একজন মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমাকে বলছেন, সরাসরি বলছেন না –জানো বাপু, মায়া দয়া রূপে ঢোকে। আমি অমুকের ভাল করব, তমুকের ভাল করব। আর কর্তব্য দিয়ে বাঁধেন; আমার এটা কর্তব্য। কিসের কর্তব্য! সাধু সন্ন্যাসীদের একটাই কর্তব্য, ঈশ্বরের দিকে এগোন, এছাড়া অন্য সন্ন্যাসীর কোন কর্তব্য নেই। কত ভাবে মায়া এসে আমাদের ধরে, ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। ওস্তাদ জাদুকর কত রকমের খেলা দেখাতে পারে। মায়াও লাগ ভেলকি লাগ করে আমাদের কখনও এই ভেলকি, কখনও সেই ভেলকি দেখিয়ে যাচ্ছেন, আর আমরাও ওর মধ্যে একেবারে মজে আছি, আর ভাবছি, এটাই সত্য।

ঈশান –এ মায়াটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ –যা কিছু দেখছ, শুনছ –সবই মায়া। এককথায় বলতে গেলে, কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ। এর আগে ঠাকুর শক্তির ঐশ্বর্য বলেছিলেন, এখানে এসে বলছেন –মায়ার আবরণ, সবই মায়া। এটাকেই যখন অন্য দিক দিয়ে দেখা হবে, তখন দেখবে সবই চৈতন্য। আমিত্ব যখন এসে যাচ্ছে তখন মায়া, যখন আমিত্বকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন থাকে একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য।

পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা –এ-সব তাতে দোষ নাই। এ-সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ! গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, ভক্তিলাভ করে মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, মনে ত্যাগ –দুই-ই করবে।

মনে ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ, এই কথাগুলো কথামৃতে মাঝে মাঝেই আসে, সেইজন্য এর সংক্ষেপে একটা ব্যাখ্যা দরকার। তাতে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা চলছে, সেটারও ব্যাখ্যা হয়ে যাবে। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সবাই বহির্মুখী। বহির্মুখীর অর্থ –এই যে স্থূল জগৎ যেটা আছে, যেটাকে আমরা বহির্জগৎ বলছি, এই বহির্জগতের সাথে আমরা এমন ভাবে জড়িয়ে আছি যে, আমাদের কাছে জগৎকে বিরাট সত্য বলে মনে হয়। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই স্থূল জগৎকে একেবারে সিস্টেমেটিক্যালি একেবারে যুক্তি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। অথচ দিনরাত আমরা এই স্থূল জগৎকে বড্ড বেশি দাম দিয়ে থাকি, আমরা মনে করি স্থূল জগৎই সব কিছু। ফলে স্থূল জগৎ নিয়ে আমরা একেবারে obsessed – আমার এটা হল না, আমরা ওটা হল না, ও আমাকে সম্মান দিল না, ও আমাকে ভালবাসল না, আমি কাল কি খাব, আমার ছেলের কি হবে, আমার মেয়ের কি হবে, আমার পরিবারের কি হবে, আমার কি হবে, এই ভেবে ভেবে আমরা নিজেকে এমন অস্থির করে তুলি যে, বহির্জগতের বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে, সেটাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবসরই পাই না। বহির্জগৎটাই আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই যে আমরা বহির্জগৎকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি, এর কি কোন দরকার আছে? একটু বিচার করে দেখলে আমরা দেখি যে সত্যিই এর কোন দরকার নেই। কেন দরকার নেই? একেবারে খুব সাধারণ চিন্তা দিয়ে যদি আমরা দেখি –এই যে কলম আমার হাতে আছে, এই কলমের বোধটা আমার মনে হচ্ছে। তার মানে বহির্জগৎ যত বড় হোক, আর যাই হোক, জগতের ব্যাপারে যে আমার বোধ যেটা হবে, সেটা আমার মনের ভিতরেই হবে। সাধারণ বিজ্ঞান যদি জানা থাকে, তাহলে আমরা জানব যে, সমস্ত কিছুর বোধ হয় এই মনের ভিতরে; মনের বাইরে কিছু নেই। একটু আগে ঠাকুর প্রথমে বললেন, যা কিছু হচ্ছে সব তাঁরই ঐশ্বর্য। এরপরেই বলছেন, এটাই মায়া। এই যে কলম আমি দেখছি, এই যে কলমের জ্ঞান, এই জ্ঞান তিনটে স্তরে চলে। প্রথম স্তরে কলম বহির্জগৎ। দ্বিতীয় স্তরে আসে, আমি যে কলম দেখছি, এই দেখাটা হল শক্তির ঐশ্বর্য। তৃতীয় স্তরে হয়, আমি যেটা দেখছি, এই দেখা জিনিসটাই মায়া, আসলে আছেন সেই চৈতন্য, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই।

কোনটা চৈতন্য? যিনি দেখছেন, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য; যার মাধ্যমে দেখছেন, সেই মন শুদ্ধ চৈতন্য; যেটাকে দেখছেন, এই কলম শুদ্ধ চৈতন্য। এটাকে ধারণা করা অসম্ভব, কিন্তু এটাই সত্য। আমরা এত বেশি বহির্মুখী, আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয় এত স্থূল হয়ে রয়েছে, এমন ভাবে আমরা আহার, নিদ্রা, মৈথুনে জড়িয়ে আছি যে আমরা ভুলে আছি যে, আমাদের সমস্ত সুখ, আমাদের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত শোক, সমস্ত আনন্দ আসলে আমাদের মনে। মনের বাইরে কিছু নেই। আমাদের যত বন্ধন সব মনে, আমাদের যত ভালবাসা সব মনে, যত স্বাধীনতা সব মনে। আনন্দ একমাত্র সেই পায় যে স্বাধীন। ভালবাসাতে মানুষ যখন নিজেকে স্বাধীন মনে করে, তখন সে আনন্দ পায়। ভালবাসা আমাদের সেই স্পেস দেয়, যেখানে সে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। ভালবাসা পেলে তাই মানুষ মনে করে, আমি মুক্ত হয়ে গেলাম। স্বাধীনতাই আনন্দ। স্বাধীনতা ছাড়া, মুক্তি ছাড়া আনন্দ হতে পারে না। গানে, সিনেমাতে, গল্পে হাজারটা কথা বলুক; আসলে মানুষ যে জায়গাতে বন্ধন বোধ করে, যেখানে দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করে, সেখান থেকে সে ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু যেখানে মুক্তির আস্বাদ পায়, সেখানেই সে নিঃশ্বাস নিতে পারে।

আমাদের কাছে কত সাধু, সন্ন্যাসী আসছেন, কত লোকজন আসছেন, কেন আসছেন? আসার একমাত্র কারণ, এখানে এলে মুক্তির বোধ হয়। একটা মুক্তির বোধ হয়ে বলেই লোকজনরা আসছেন, তা নাহলে কেউ আসতেন না। এখানে ইউনিভার্সিটিতে কত ক্লাশ হচ্ছে, সেই ক্লাশ করার জন্য কত বয়স্ক বয়স্ক লোকের আসছেন, হাঁটাচলা করতে পারেন না, তাতে কি হয়েছে, ওয়াকার নিয়ে ক্লাশে আসছেন; কেন আসছেন? মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মুক্তির একটা আস্বাদ পাওয়ার জন্য। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, জগতের বেশির ভাগ মানুষই এমন ভাবে এই বহির্জগতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে আর মনে করছে বন্ধনেই আনন্দ। কিন্তু বুঝতে পারছে না যে, বন্ধনে আনন্দ নেই, আনন্দ মুক্তিতে। তাহলে কি আমাকে অন্য কিছু করতে হবে? না, কিছু করতে হবে না। যেমন আছেন, সুন্দর আছেন, ভাল আছেন; শুধু এই কয়েকটি জিনিস বুঝে নিন।

প্রথম এই যা কিছু দেখছেন, এই যে কলমটা দেখছেন, কলমটা বহির্জগতের একটি বস্তু; কিন্তু আসলে বোধটা হচ্ছে মনের ভিতরে। দ্বিতীয় এই যে কলম বা যে কোন কিছুর বোধ হচ্ছে, এই বোধ হল শক্তির ঐশ্বর্য, এটা নিজেই একটা শক্তি। তৃতীয় চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, শক্তি আর ব্রহ্ম এক। আমরা যদি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতায় না ঢুকে পুরো মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি – আমরা যাবতীয় যা কিছু অনুভব করছি, আসলে আমরা সবটাই মন দিয়ে অনুভব করছি। এই যে জ্ঞান জিনিসটা, বোধ জিনিসটা; এটাই মন, যেটাকে যোগের ভাষায় বলা হয় চিত্তবৃত্তি। চিত্তবৃত্তি কি? মন। যদি মনে ঢেউ না খেলে, ওটা মনই না, শান্ত মন ওটা মন না। ভক্তরা এসে বলেন, মহারাজ আমার নাতিটা খুব দুষ্টু। আমি বলি, বাচ্চা যদি দুষ্টু না হয় তাহলে সে বাচ্চাই না, আর তা নাহলে বুঝতে হবে ওর ভিতর কিছু গোলমাল আছে, চিকিৎসা করাতে হবে।

এই যে আমাদের মধ্যে বৃত্তির খেলা চলে, যোগশাস্ত্রে এই বৃত্তিকে পাঁচ প্রকার বৃত্তির কথা বলছেন। কি কি পাঁচ প্রকার বৃত্তি? প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। প্রমাণ হল, যেটা আমরা বহির্জগৎ থেকে কিছুটা পাই, ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান আমরা পাচ্ছি। অনুমান, যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, সেটাকে যখন আমরা লজিক দিয়ে, যুক্তিতর্ক দিয়ে যখন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছাই – এটাকে বলে অনুমান প্রমাণ। আর শাস্ত্র দিয়ে যে জ্ঞান আমাদের মধ্যে আসছে, যে জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে, আত্মার ব্যাপারে আমাদের একটা বোধ উৎপন্ন হয় –এটাকে বলে আগমপ্রমাণ বা শাস্ত্র প্রমাণ। আমরা প্রথমে দেখালাম ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জ্ঞান হয় আসলে সেটা মনেরই খেলা। আর অনুমান প্রমাণ সেখানেও মন সরাসরি যুক্ত, কারণ অনুমান প্রমাণ সবটাই যুক্তির খেলা, মন ছাড়া যুক্তি হবে না। শাস্ত্রও যখন বুঝছি বা বোঝার চেষ্টা করছি, সেখানেও সরাসরি মনেরই খেলা। প্রমাণের পর আসছে বিপর্যয়। বিপর্যয় মানে ভুল জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান। যেমন অন্ধকারে আমরা দড়িকে সাপ মনে করছি। দড়ি আছে ঠিকই, ওখানে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু গোলমাল করছে আমাদের মন। ইদানিং কালে প্রায়ই কিছু লোককে বলতে দেখা যায় –কারুকে ভালবাসতে নেই, সবই মায়া। তার মানে তুমি যাকে ভালবেসেছিলে, অর্থাৎ যেটাকে দড়ি মনে করেছিল, সেটাই দেখা গেল আসলে একটা সাপ। এই যে মানুষ বলে, এটা করে আমি কি ভুলই না করলাম। আরে ভাই, এক সময় তুমি তো এটাকে সত্য বলেই মনে করেছিলে, তাই তো তুমি করতে গেলে। আমরা সবাই ভুলের সম্রাট।

কেন ভুল করি? কারণ যখন করছিলাম তখন সেটাকে সত্য বলে করছিলাম, আজ এটাকে মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই এভাবেই বড় হই। কেউ যদি মনে করে জীবনে আমি কোন ভুল করিনি; সে তো অভাগা, একটা পাথর সে, একেবারে মুর্খ। ওর জীবনে কিছু হবে না, সারাটা জীবন এই একই রকম থাকবে। সত্য হল –যে ভুল করে, সেই এগোয়; যে দোষ করে সেই এগোয়। যে চলার পথে হোঁচট খায়, সেই শিক্ষা পায়, তাকে এগিয়ে যেতে শিখিয়ে দেয়। যাদের জীবনধারা মসৃন গতিতে বাধাহীন ভাবে চলে, বুঝতে হবে সে জীবনে এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না। আমাদের স্বামী যতীশ্বরানন্দজী খুব সুন্দর বলতেন –যদি তুমি দেখ তোমার ধর্মজীবন খুব সুন্দর চলছে, জানবে তোমার ধর্মজীবনের মধ্যে কোন গোলমাল আছে। এটাকেই বলছেন বিপর্যয়।

বিকল্প হল, কিছুই নেই আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি। একজন বলছে –একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পঞ্চাশ শতাংশ ঠিক হয়ে গেছে। পঞ্চাশ শতাংশ মানে? না, আমার তরফ থেকে আমি রাজি হয়ে গেছি, মেয়ের তরফ থেকে এখনও রাজি হয়নি। নিজে নিজে বিয়ের কল্পনা করে নিচ্ছে, এটাই বিকল্প। ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণাগুলি আছে, সবটাই বিকল্প। কবিদের যে কল্পনা, বেশির ভাগই বিকল্প। অনেক সময় আমরা যে কথাগুলো বলি, সবই প্রায় বিকল্প। আমরা কারুকে ভালবেসে ফেলি, কারুর উপর রেগে যাই, সবটাই বিকল্প। বিকল্প হল বস্তু শূন্য, আসলে কিছু নেই কিন্তু নিজের মত কল্পনা করে যাচ্ছি। মানুষ যে রোগব্যাধির চিন্তা করে অসুস্থ হয়, সবটাই বিকল্প।

চতুর্থ বৃত্তি হল, নিদ্রা; নিদ্রা হল অভাববৃত্তি। গভীর নিদ্রা থেকে ঘুম ভাঙার পর বলছে, আমার তো কিছু মনে ছিল না। নিদ্রাকে এখানে সুষুপ্তির একটা অবস্থা বলছেন, স্বপ্ন না; এটাও মন দিয়ে চলে। সব থেকে মারাত্মক হল পঞ্চম বৃত্তি –স্মৃতি। এই জন্মে বা আগের আগের জন্মে আমরা যা যা করেছি, সব স্মৃতি হয়ে থাকে আর এই স্মৃতি মনকে মন্থন করতে থাকে। মিক্সিতে কোন কিছুকে ঘোঁটাবার জন্য দিলে মিক্সি যেমন তীব্র একটা আওয়াজের সাথে এবং প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে, স্মৃতিও আমাদের মনকে ওই মিক্সির মত ঘরর্ ঘরর্ করে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে ঠাকুরের সামনে ধ্যানমুদ্রায় বসে গেলেন, এরপর যেমন যেমন আপনার মন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করবে মন তত ঘরর্ ঘরর্ আওয়াজে ঘুরতে থাকবে। যত মন শান্ত হতে থাকবে ততই যেন মিক্সির স্পীডটা বেড়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে বলবেন, মাগো, জীবনে যে কথার কল্পনাই আমি করতে পারি না, সেই

কথাগুলোই চিন্তার মধ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে এই যে ধ্যান করতে বসা, মন এখন সময় পেয়ে গেছে, ফাঁকা জায়গা পেয়েছে, আরও অনেক ধরণের সুবিধা পেয়ে গেছে। আমরা যেমন সময় সুযোগ পেলে ঘরের জিনিসপত্র, আলমারি গুছিয়ে নিই। মন এবার নিজের ঘর গোছাচ্ছে; স্মৃতিগুলিকে ঠেলে ঠেলে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। আমাদের সংসার মনকে নিয়ে, সংসারে মন ছাড়া কিছু নেই। বহির্জগৎ একটু খালি টোকা মারে। যা হবার সব ভিতরে, যেটা স্বপ্নের মধ্যে পরিষ্কার বোঝা যায় মন কি কি করে যায়।

কোন জিনিসগুলি সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় তৈরী করে, বিকল্প তৈরী করে, স্মৃতি তৈরী করে? একটাই উত্তর –কামিনী-কাঞ্চন। সেইজন্য ঠাকুর এখানে বলছেন, বারবার বলছেন, আগেও বলেছেন, পরেও বলবেন –টাকা-পয়সা, ভোগসামগ্রী আর সেক্স; কামিনী আর কাঞ্চন এই দুটো জিনিস মানুষকে একেবারে মিক্সির মত মন্থন করে দেয়। যেখানেই আমাদের খুব শক্তিশালী ইমোশান হয়, সেটা হয় টাকা-পয়সা নিয়ে, নয় তো সেক্স নিয়ে হয়। অন্য জিনিসেও ইমোশান থাকতে পারে, কারুর উপর কেউ হয়ত খুব রেগে গিয়েছিল; কিন্তু এই রাগ বা ক্রোধ অতটা শক্তিশালী নয়, আসল হল কামিনী-কাঞ্চন; আর জগতে আমাদের আশেপাশের যে জিনিসগুলিকে আমরা জড়িয়ে রেখেছি। বলে, আমি মাছ খাব না, পান খাব না, আমি এই করব না, এগুলোর কি কোন দাম আছে? ইদানিং কালে কিছু বৈষ্ণবরা এই খাওয়া, সেই খাওয়া নিয়ে কত রকমের কথা বলে যাচ্ছে আর ভারতের হিন্দি ভাষী অঞ্চলে তো বলেই বেড়াচ্ছে মাছ, মাংস খাওয়া নিষেধ। স্বামীজী অনেক আগেই বলেছেন, এদের ধর্মটা এখন রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। মাছ খাওয়া, পান খাওয়া এই জিনিসগুলো কোন ইস্যুই না, এগুলো মনে কোন ছাপ ছাড়ে না। ঠাকুরও তাই বলছেন, পান-মাছ ত্যাগ করে কি হবে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ।

অনেক আগেকার কথা, আমাদের একজন দক্ষিণ ভারতের মহারাজ হৃষিকেশে না হরিদ্বার কোথায় গিয়েছিলেন। গঙ্গায় না অন্য কোন নদীতে স্নান করতে গিয়ে বারবার নিজের ইষ্ট দেবতার নাম বলছেন, 'মুরগন্' 'মুরগন্'। দক্ষিণ ভারতে কার্তিককে মুরগন্ বলে। আর-একজন সাধু সেটা শুনে বলছেন –বাবাজী! আব্ সাধু বন্ গয়ে হো, মাস্, মছলি, মুরগা ভুল যাও। এই সাধু মুরগা মনে করছে আর দাক্ষিণাত্যের সাধু মুরগানের অর্থাৎ কার্তিকের কথা বলছেন। সাধু এখন সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আগে তাঁর নিজের যে সমস্যাগুলো ছিল, সেগুলো এখন স্মৃতিতে বসে আছে। কখন তারা স্বপ্নে আসছে, কখন এমনিই আসছে। দক্ষিণ ভারতের সন্ন্যাসী, বেচারী জন্ম থেকেই নিরামাশাষী, সে এখন নিজের ইষ্ট কার্ত্তিকেয়কে মনে করছেন। আর এই সাধু মছলি, মুরগার কথা ভাবছেন।

আমরা প্রায়ই এটা বুঝতেও পারিনা যে, যে জিনিসগুলোর সাথে আমরা জড়িয়ে আছি, তার ভিতর থেকে কোন জিনিসটা কেমন ধরণের ছাপ ছাড়ে। আমাদের এখানে অনেকেই থেকে থেকে বলেন, আমি এটা করব না, আমি এটা খাব না। এগুলো খুবই সাধারণ জিনিস, এমন কিছু না। আসল গোলমাল যেখানে, ওটাকে আগে ঠিক করতে হয়। কি কারণে ঠিক করতে হয়? কারণ আপনার মনটা একটা সমুদ্র, একটা পুকুর; ওই পুকুরের জলে যে জিনিসটা তোলপাড় করে দেবে আগে সেই জিনিসটাকে আটকাতে হবে। আটকাবো মনে করলেই আটকানো যায় না, অত সহজ না, জন্মজন্মান্তরের তপস্যা লাগে। মূল বক্তব্য, কামিনী-কাঞ্চনই আসল বিপজ্জনক, অন্য জিনিসগুলো অতটা বিপজ্জনক না। ঠাকুর এটাই এখানে বলছেন।

একবার যখন আপনি মনের ত্যাগ করতে শুরু করবেন, তখন এইভাবে মনকে বোঝাতে হবে – না বাপু, এখন এটা করতে যেও না, প্লিজ চুপ থাক। আপনি যখন একা চুপচাপ বসে আছেন, মনে কোন একটা চিন্তা-ভাবনা এলো, তখনও বলতে হয়, প্লিজ এখন এই চিন্তা থাক। কিংবা আপনি ধ্যানে বসেছেন, একটা চিন্তা উঠল –না ভাই, আমার এই চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিংবা ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে যদি আমরা প্রার্থনা করি, তাহলে এটা আমি বলতে পারি যে; ঠাকুরের কাছে টাকা চাইলে আমি নাও পেতে পারি, ঠাকুরের কাছে যদি কোন ভোগ্যবস্তু চাই, আমি নাও পেতে পারি। কিন্তু

আপনি যদি বলেন, হে ঠাকুর! আমি এই কামিনী-কাঞ্চন থেকে মুক্তি পেতে চাই; আমার কথা লিখে রাখুন –ঠাকুর আপনাকে কামিনী-কাঞ্চন থেকে সরিয়ে দেবেন। যখন আপনি ভিতর থেকে বলছেন, আমার কামিনী-কাঞ্চন যেন ত্যাগ হয়ে যায়; এটা হল সেই রকম –হাতে আপনি গরম লোহা ধরে রেখেছেন। আর আপনি চিৎকার করে বলছেন, আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে। তখন কেউ আপনার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখছে আপনি গরম লোহাকে হাতে ধরে চিৎকার করছেন। তিনি আপনাকে তখন এটাই বলবেন, আরে বুদ্ধু, লোহাটাকে হাত থেকে ফেলে দে। তখনও সন্দিহান, কোন জিনিসটা থেকে তোমার হাত পুড়ে যাচ্ছে, সেটাও বুঝতে পারছে না। বলছে, 'তুমি ফেলতে বলছ, ফেলব'?

একটা খুব নামকরা বই আছে The Lord of the Ring, সেখানে একজনকে একটা আংটি ফেলে দিতে হবে। যে তাকে নিয়ে যাচ্ছে, সে যেখানে ফেলার কথা সেখানে ফেলতে বলছে। কিন্তু এতদিন আংটিটা তার সঙ্গে রয়েছে, এখন আর সে আংটিটা ফেলতে চাইছে না। আমাদের সঙ্গে ঠিক এই সমস্যা হয়। জন্মজন্মান্তর ধরে অনেক দিন ধরে আমরা কামিনী-কাঞ্চনকে নিয়ে আছি কিনা, তাই যখন ফেলার সময় হয়, আমরা চিৎকার করে বলছি, আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে, হাতের চেটোতে জ্বলন্ত অঙ্গার, আরে ভাই তোমার হাত থেকে ওই জ্বলন্ত অঙ্গারটা ফেল। তোমার আচার্যরা বলে যাচ্ছেন, তোমার শাস্ত্র বলে যাচ্ছেন; কিন্তু আমরা ফেলতে চাই না। যেমনি আপনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, হে ঠাকুর, আমি আর কামিনী-কাঞ্চনে থাকতে চাই না, এখান থেকে আমায় তুলে নাও; আসলে আপনি নিজের মনকেই বলতে চাইছেন, হে মন, তুমি যেটাকে জোর করে ধরে আছ, ওটাকে ফেলে দাও। কামিনী-কাঞ্চনকে কি আপনি জোর করে ধরে আছেন? হ্যাঁ, আপনিই জোর করে ধরে আছেন। কারণ বহির্জগতের কোন গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব রয়েছে মনের জগতের। বহির্জগতের কোন দাম নেই, দাম রয়েছে অন্তর্জগতে, মনের জগতে। সেখানেই সব খেলা হয়, আপনি আমি সবাই সেখানেই ধরে রেখেছি। একবার যিনি মনের জগৎ থেকে নিজেকে ছেড়ে দিলেন, এরপর বহির্জগৎ আর কোন ব্যাপারই না, ফুস্ করে সব উবে যাবে। সাধনাতেও তাই হয়, জীবনের যে সুসময় আসে, তাতেও তাই হয়; আপনি যদি নিজের ভাল চান, তাতেও তাই হয়। মন থেকে বলুন, আমি এটা চাইছি, জড়ানো অর্থে না, ত্যাগ করার অর্থে। এই ক্ষেত্রে ভগবান আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ফল দিয়ে দেবেন। আপনি করে দেখুন, যে কোন জিনিস যদি সত্যিকারের ত্যাগ করতে চান, দেখবেন টপ্ করে কখন সেটা খসে পড়ে যাবে।

কিন্তু নূতন করে কিছু যদি ধরতে চান, তাহলেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে, কারণ সেখানে নূতন করে সৃষ্টি করার ব্যাপারটা আসে, তবে সেখান থেকেও বেরিয়ে আসা যায়; তবে তার জন্য অন্য ধরণের শক্তি দরকার। কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করছি ধর্ম ও ঈশ্বরকে নিয়ে, আমরা আলোচনা করছি জীবনে কিভাবে এগোন যায়, আমরা আলোচনা করছি ব্রহ্ম আর শক্তিকে নিয়ে। এই বাহ্য জগৎ, স্থূল জগৎকে ফেলে দেওয়াটা কিছু না। যদি কেউ ব্রহ্ম ও শক্তি চান, তাহলে আপনি মনের জগৎ থেকে বাহ্য জগৎটাকে যদি ফেলে দিতে পারেন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে স্থূল জগৎকে এবার ফেলে দেওয়াটা কিছুই না। একটা মজার গল্পে আছে, সাধুবাবারা রাত্রিতে বিশ্রাম করার পর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য নদীতে গেছেন। তখন একটা বড় ভালুক নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল। সাধুবাবা কম্বল মনে করে ভালুকটাকে ধরে নিয়েছেন। এরপর কম্বলও ভেসে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সাধুও ভেসে চলেছেন। অন্য সাধুরা ভাবছে একটা কম্বলকে সাধু ধরতে চাইছে কিন্তু পারছে না। তখন সাধুরা সবাই বললেন, 'আরে ভাই তুমি কম্বলটাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসো'। এই সাধুবাবা তখন বলছেন, 'আমি তো অনেক আগেই কম্বল ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়তে চাইছে না'। এগুলো গল্প, সমস্যা হল বহির্জগৎ আমাকে ছাড়বে না, যতক্ষণ আমি মন থেকে না ছাড়ছি। গল্পটার সঙ্গে পুরোপুরি মিল নেই ঠিকই, কিন্তু এটাকে বোঝানর জন্য বলা হল। কামিনী-কাঞ্চনকে একবার যদি মন থেকে ছেড়ে দিতে পারেন, কিছুদিন পর্যন্ত আপনাকে সে ধরে রাখবে। কিন্তু যখন দেখবেন মন থেকে সত্যি সত্যিই সব ফেলে দিয়েছেন, তখন বহির্জগৎ আপনাকে আর কিছু করতে পারবে না।

আমরা এতক্ষণ দেখলাম ঠাকুর কি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করছেন –আমরা যা কিছু করি, যা কিছু দেখি, শুনি, চিন্তা করি, সবই মায়া। আমরাও বিস্তারে এর ব্যাখ্যা করলাম। আবার পান, মাছ খাওয়ার ব্যাপারে বলছেন, এতে দোষ নেই; কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার, সেই ত্যাগই ত্যাগ। এখান থেকে এগিয়ে ঠাকুর আবার কথা বলছেন।

আমরা যদি কল্পনা করি, ঠাকুর একজন ভক্তের বাড়ি গেছেন, সেখানে কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের কথা শুনছেন। আসলে ঠিক ঠিক কথা বলার এটাই ধরণ। এখন কি হয়, আমাদের হাজার হাজার ভক্তরা চারিদিকে ছড়িয়ে আছেন, সবাই ধর্মের কথা, শাস্ত্রের কথা শুনতে চান। তার জন্য অনেক পাবলিক লেকচারাদি, ভক্ত সম্মেলন আদির আয়োজন করা হয়। স্বামীজীও যখন আমেরিকা গেলেন, সেখান থেকে ভারতে এলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিলেন। এর মধ্যে ওনার কিছু কিছু বক্তৃতা আছে, কিন্তু বাকি সবটাই ছিল ছোট্ট একটা গ্রুপে কয়েকজনকে নিয়ে ধর্ম ও শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করা। ঠাকুর কথা বলছেন, মনে হচ্ছে যেন সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে মাছ নিজের মত বিচরণ করে যাচ্ছে। একটা শাস্ত্রকে নিয়ে স্বামীজী যখন কয়েকজন ভক্তের সামনে কথা বলছেন, মনে হচ্ছে যেন তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন। এখনও স্বামীজীর রাজযোগ, জ্ঞানযোগ যখন পড়ি তখন ভাবি, বিদেশীদের সামনে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন, তখন কজন বুঝেছিলেন কে জানে। মহাপুরুষরা সবাই নিজের সঙ্গেই কথা বলেন। আইনস্টাইনের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থ আমি পড়েছি, ওনার জীবনী আমার খুব প্রিয় বিষয়। উনিও যখন কোথাও বক্তৃতা দিতেন, নিজের সঙ্গেই কথা বলতেন। থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি ব্যাখ্যা করছেন, নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। কারণ, এনারা এমন একটা স্তরে চলে গেছেন, জানেন যে এরা বুঝবে না। লোকেরা এনাদের সম্মান করছেন, আসছেন, শুনছেন; এর বেশি কিছু না। সেইজন্য যত ঘরোয়া ভাবে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আলোচনা হয় তত ভাল। কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনরাই বারবার আসছেন।

এবার এখানে কেশব সেনের প্রসঙ্গ আসছে। আমরা এই প্রসঙ্গটা শুরু করার আগে কয়েকটি কথা বলে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। আমাদের ইউনিভার্সিটি ২০০৫ সালে শুরু হয়, প্রথম দিন থেকে আমি এর সঙ্গে যুক্ত। ২০০৬ সাল থেকে কিছু ক্লাশ নেওয়া শুরু হয়। ২০০৭ সাল থেকে এখানে আমি কিছু কিছু শাস্ত্রের ক্লাশ নেওয়া শুরু করলাম। ২০০৮ সাল থেকে ক্লাশগুলো একটি গতি পেল।

তার কিছু দিন পর থেকেই আমাদের একজন ছাত্র তিনি লুকিয়ে এই ক্লাশগুলোর ভয়েস রেকর্ড করতে শুরু করলেন, যাতে আমি বিরক্ত না হয়ে যাই। সেখান থেকে তিনি নিজের সমৃদ্ধির জন্য কম্প্যুটারে টাইপ করতে শুরু করলেন। প্রথম তিনি রাজযোগের পুরো ক্লাশটা রেকর্ড করে টাইপ করলেন। আমাকে এনে দেখালেন, আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেই যে তিনি শুরু করলেন, এখনও ২০২৪ সালেও করে যাচ্ছেন। ওনার সব লেখাগুলো আমরা archive.org তে আপলোড করতে থাকলাম। আজ পর্যন্ত এ-ফোর সাইজের পাতায় প্রায় এগারো হাজার পাতায় উনি সব শাস্ত্রের ক্লাশগুলোকে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। একজন ভদ্রমহিলা অধ্যাত্ম রামায়ণের উপর পিএইচডি করবেন। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আমাদের অধ্যাত্ম রামায়ণের যে ক্লাশ হয়েছিল, তার সবটাই উনি রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ওই ভদ্রমহিলা ওই লেখা থেকে সব কিছু নিয়ে নিজের মত গুছিয়ে থিসিস তৈরী করে জমা করলেন, আর পিএইচডিতে ডক্টরেটও পেয়ে গেলেন। পরে অবশ্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছিলেন।

এই যে এগারো হাজার পাতার লেখালেখি আজকের দিনে ধন্য জীবন না হলে কেউ করতে পারে? আজ ষোল সতের বছর ধরে উনি এই কাজ করেই যাচ্ছেন। archive.orgতে সমস্ত শাস্ত্র আপলোড করা আছে, আপনাদের যাঁদের রুচি আছে তাঁরা দেখতে পারেন। যে কথা বলার জন্য আমি এই প্রসঙ্গ করা, তা হল, উনি এখন আমাদের এই কথমৃতের ক্লাশগুলোকে লিখছেন আর খুব মজার হল

যে, আমাদের ক্লাশগুলোর পায়ে পায়ে ওনার লেখার কাজ চলছে। কথামৃতেরও কিছু কিছু লেখা ওখানে আপলোড করা হয়েছে, প্রায় আড়াইশ থেকে তিনশ পাতা উনি করে দিয়েছেন। যাঁদের রুচি আছে তাঁরা ওখান থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। কারণ অনেকে শুনতে চান না, পড়তে চান। ওর মধ্যে আপনারা বিস্তারে ব্যাখ্যাগুলো পেয়ে যাবেন।

আমার সাধ্যি নেই যে কথামৃতের এই জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারব। জীবনে আমি কোন দিন ভাবিওনি যে কোন দিন আমাকে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতে হবে। ঠাকুরের কথা বলার জন্য, ঠাকুরের কথা ব্যাখ্যা করার জন্য যে ভাব ভিতরে থাকা দরকার, ঠাকুরই আমাদের ব্যাখ্যা করার জন্য সেই ভাব দেন। আমাদের কাছে এটা পূজা ছাড়া কিছু না, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজাই করে যাচ্ছি। আমাদের কাছে কথামৃতের উপর ক্লাশ করা এটা পূজা ছাড়া কিছু না। শুধু যে কথামৃত তাই না, বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর ক্লাশ নিতে গিয়ে যত ব্যাখ্যা করছি, আমার ক্ষমতাই নেই এই কাজ করার, আমার ক্ষমতার বাইরে। আমাদের এক শ্রোতা আছেন, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ার কলেজের তিনি কেমেস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। উনি আমাদের সব লেকচারই নিয়মিত শোনেন। মাঝে মাঝে এসে দেখা করেন। আগে তিনি আমার খুব প্রশংসা করতেন – মহারাজ আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেন, খুব ভাল বলেন ইত্যাদি। বর্তমানে উনি প্রশংসা না করে বলেন –মহারাজ এখন বুঝেছি, এগুলো আপনার কথা হতেই পারেনা। বলতে চাইছেন, এভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা আমার ক্ষমতার বাইরে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। আমাদের যে ছাত্রটি এই বিশাল কাজ করছেন, তিনিও তাঁর ইচ্ছাতেই যন্ত্রস্বরূপ করছেন। আপনাদের জানানো হল, আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে তাহলে archive.org থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। ঠাকুর এরপর বলছেন –

কেশব সেনকে বলেছিলাম, যে-ঘরে জলের জালা আর আচার, তেঁতুল, সেই ঘরে বিকারী রোগী থাকলে কেমন করে ভাল হয়? মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। এই কথা আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। আমরা সন্ন্যাসী, মঠ-মিশনের প্রচুর কাজ আমাদের করতে হয়, বাইরের লোকেরা কল্পনাও করতে পারবে না। যেখানে কাজকর্ম সেখানে অশান্তি অবশ্যই থাকবে। আমাদের এখানেও বড়রা সব সময় আমাদের প্রেরণা যোগান –বছরে অন্ততঃ খুব করে হলেও এক মাস কোথাও গিয়ে একান্তে থাকার চেষ্টা করবে, সাধক জীবনে একান্তে বাস অত্যন্ত জরুরী। আমাদের কেউ কেউ আবার তিন মাস, চার মাস একান্তে বাস করতে চলে যান। যাঁদের সেই আধার আছে, যার জন্য বলতে পারছেন, আমি পুরো জীবনটা সাধন-ভজনে কাটিয়ে দেব। সারা জীবন সাধন-ভজন নিয়ে থাকা মানে–এনারা অন্য একটা থাক। মুখে অনেকেই সারা জীবন সাধন-ভজন নিয়ে থাকার কথা বলে দিতে পারেন। ঠাকুরও বলছেন, বিকারী রোগী জ্বরের ঘোরে বলে, আমি এক জালা জল খাব। আবার অনেকের কাছে এটা একটা সহজ পথ। অল্প বয়সী একটি ছেলে খুব নামকরা একজন স্বনামধন্য বক্তার বক্তৃতা শোনার পর এসে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। ছেলেটি এখন পর্যন্ত জীবনে বিরাট কিছু করেনি, কিন্তু ওই লেকচার শোনার পর থেকে এখানে এলেই আমার কাছে আত্মজ্ঞানের নিচে কোন কথা বলবে না।

সবাই মনে করে, যে জিনিসটা আমি জানিনা, সেই জিনিসটা আমি সহজে পেয়ে যাব। কিন্তু এই পেয়ে যাওয়াটা যে কত কঠিন, আমরা এখানে আছি বলে জানতি পারছি। প্রত্যেক বছর নির্জনবাস কিছু দিন যদি করা হয়, সাত দিনের জন্য বা দশদিনের জন্য, সেটাও অনেক ভাল। রামকৃষ্ণ মিশনের এত সেন্টার রয়েছে, কোন আশ্রমে যদি কেউ চিঠি লিখে জানিয়ে দেন, এই আশ্রমে কিছু দিন থেকে আমি জপধ্যান করতে চাই; আমি একা আসছি, দিন সাতেক বা দশ দিন থাকব, আমি জপধ্যান করব; আশা করি তাঁরা তাঁকে অনুমতি দিয়ে দেবেন। একান্ত বাস সবারই দরকার; সাধারণ মানুষেরও দরকার, সন্ন্যাসীদেরও দরকার। আর যাঁরা পুরোদমে সাধন জীবনে আছেন, তাঁরা অন্য থাকের, এটা তাঁদের জন্য নয়। ওই কথার পর হঠাৎ একজন ভক্ত খুব উৎসাহ নিয়ে ঠাকুরকে কিছু কথা বলতে শুরু করলেন।

একজন ভক্ত –মহাশয়, নববিধান কিরকম, যেন ডাল-খিচুড়ির মতো। বলতে চাইছেন যে, ওর মধ্যে অনেক কিছু মিলেমিশে রয়েছে। আকবর যে দিন-এ-ইলাহি শুরু করেছিলেন, সেখানেও তিনি কিছুটা এখান থেকে কিছুটা ওখান থেকে এনে দিন-এ-ইলাহি দাঁড় করালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেউ কেউ বলে আধুনিক।

এই জায়গাতে একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার। ধর্ম ও ধর্মের যে কত সম্প্রদায় আছে আমরা চিন্তাই করতে পারব না। একা হিন্দুদেরই কত সম্প্রদায়। সম্প্রদায় বলতে আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত এই সম্প্রদায়গুলির কথা বলছি না; এদের মধ্যেও কত যে ছোট ছোট সম্প্রদায় আছে ভাবা যায় না। এই আলোচনার সাথে এর কি সম্পর্ক, এটাকে একটু গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সবচেয়ে প্রথম হয়, রাজযোগের আলোচনায় অনেকবার বলা হয়েছিল, যোগ হল চিত্তবৃত্তি নিরোধ। মনে যে বৃত্তিগুলি উঠছে, যে চিন্তা-ভাবনাগুলো আসছে এবং বিভিন্ন কারণে এই চিন্তা-ভাবনাগুলো আসাটা যখন পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়, তখন ওই পূর্ণ অবস্থায় যোগী যে নিজের স্বরূপ দেখেন, তখন সেই স্বরূপে অবস্থান করার পর যোগীর কি হবে? বলা মুশকিল।

এক মতে, যেটা ঠাকুরও বলছেন, ওই অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধিতে থাকলে যোগীর একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কিন্তু কেউ কেউ ওখান থেকে আবার ফিরেও আসেন। কেন ফিরে আসেন, কিভাবে ফিরে আসেন, আমাদের জানা নেই। যেটা জানা যায় সেটা হল –তিনি একজন অতি উচ্চ আধারের যোগী। তখন তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, আমি ঈশ্বরের সন্তান, যীশু যেমন নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলছেন। আবার কেউ বলেন, আমি ঈশ্বরের দূত। ঠাকুর আবার চিরদিন মায়ের সন্তান হয়েই থেকে গেলেন। ঋষিরা আত্মার সঙ্গে এক হয়ে আত্মভাবে অবস্থান করেন। তার মানে নির্বিকল্প সমাধি থেকে ফিরে আসার পর এনারা বিভিন্ন ভাব নিয়ে থাকেন।

সমাধি থেকে নেমে আসার পর এনারা যে কথাগুলো বলেন, এই কথাগুলোই হল ধর্মের ঠিক ঠিক আধার। এনাদের কথার মধ্যে আমাদের একটা জিনিস বোঝা দরকার। মোটামুটি তিন ভাবে আমরা জ্ঞান পাই। প্রথমটা হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যেটা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারি। হিন্দু ধর্মে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরাট সম্মান। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সবার উপরে, এর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। লোকেদের এই ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা আছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের কাছে কোন কিছু দাঁড়ায় না। ফলে কি হয়, বিজ্ঞান যাবতীয় যা কিছু আমাদের দিচ্ছে, এর সব কিছু হিন্দুরা একশ ভাগ মানে। এরপর দ্বিতীয় আসে অনুমান প্রমাণ যুক্তি দিয়ে আসে। তার মানে, থিয়োরেটিক্যাল বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞানকে আমরা হিন্দুরা পুরোদমে মানি। বিজ্ঞানকে নিয়ে খ্রীশ্চানিটিতে অনেক সমস্যা আছে; আমাদের হিন্দুদের কোন সমস্যা নেই। আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল সবার উপরে। তৃতীয় আসে শব্দ প্রমাণ বা শাস্ত্র প্রমাণ। কিছু জ্ঞান আছে যা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, যুক্তিতর্ক দিয়ে জানা যায় না, এই জ্ঞানটা আসে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে সত্যটা সাক্ষাৎ করেছেন সেটার মাধ্যমে, আর সেটাকে এবার ঋষি তিনি নিজে বা তাঁর কোন উপযুক্ত শিষ্যকে দিয়ে সুন্দর করে একটা জায়গায় গুছিয়ে রেখে দিলেন –এটাকে বলা হয় আর্ষ প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ বা শাস্ত্র প্রমাণ।

আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, আমাদের কাছে শেষ প্রমাণ হল বেদ। কিন্তু বেদের কোন প্রমাণ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্যথা হয়ে যায়, তাহলে আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই মান্যতা দেব। যেমন ধরুন, আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে ঠাকুর, মা, স্বামীজী সবকিছু। এবার আমরা যদি স্বামীজীর চিঠিপত্রগুলি দেখি, তাহলে সেখানে পরিষ্কার দেখতে পাই স্বামীজী লিখছেন, জল থেকে ম্যালেরিয়া হয়, তাই তোমরা জলকে ভাল করে ফিল্টার করে খাবে যাতে ম্যালেরিয়া না হয়। স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন, তখনও রোনাল্ড রসের ম্যালেরিয়ার উপর রিসার্চের খবর আসেনি। পরবর্তি কালে রোনাল্ড রস গবেষণা করে জানিয়ে দিলেন, ম্যালেরিয়ার মূল কারণ মশা, মশা থেকে এই রোগের

উৎপত্তি। স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের যাতে ম্যালেরিয়া না হয়, ম্যালেরিয়া হলে তোমাদের শরীর খুব দুর্বল হয়ে যাবে। তখনকার দিনের লোকেরা জানত জল থেকে ম্যালেরিয়া হয়। সেইজন্য স্বামীজীও জলকে ফিল্টার করে খাওয়ার কথা বললেন। পরে জানা গেল, ম্যালেরিয়া মশা থেকে হয়, তখন সবাইকে বলা হল, মশারি খাটিয়ে সবাইকে শুতে হবে। আমাদের কাছে এটাকে মানতে কোন আপত্তি নেই, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আমরা পুরোপুরি মানি। অন্যান্য ধর্মের কিছু ধর্মান্ধ লোকেদের কাছে এই সমস্যা। বিজ্ঞান আর ধর্মের লড়াই এই জায়গাতে। বিজ্ঞান বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণ, আমাদের কাছে এটাই শেষ কথা। কিন্তু আমরা হিন্দুরা হলাম জ্ঞানের ঠাকুরদা, প্রপিতামহ। আমরা জানি জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে আসেনা, শুধু যুক্তি দিয়েও আসে না।

আমাদের কাছে জ্ঞানের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ, তাতে বিজ্ঞান একটা ছোট্ট অংশ। ঋষিরা যে বাক্যগুলো দিয়ে গেছেন, এগুলো সব আধ্যাত্মিক ব্যাপারে। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর তিনটই সত্য। জগতের ব্যাপারে বিজ্ঞান যা বলবে বা আপনার অনুভব যা, সেটাই শেষ কথা। সেখানে বেদ বা অন্য কোন গ্রন্থ দাঁড়াবে না। খ্রীশ্চানিটিতে বিজ্ঞান আর ধর্মের যে লড়াই, এই কারণে। তাদের কাছে জগতের ব্যাপারে বাইবেলে যত কথা আছে, এটাই শেষ কথা। কে এদের বোঝাবে? অথচ আমরা হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে জেনে আসছি যে, ধর্মগ্রন্থের কথা একমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শেষ কথা হতে পারে, অন্য ব্যাপারে না। ঋষিরা যে কথাগুলি দিয়ে গেছেন, বা ঈশ্বরের দূত, যাঁদের আমরা প্রফেট বলে জানি, তাঁরা যে কথা বলে গেছেন, তাঁদের সেই কথাতেই ধর্ম দাঁড়ায়। দ্বিতীয় যেটা হয়, এনাদের থেকে যাঁরা একটু নীচে, বড় সন্ত মহাত্মা যাঁরা হন; অনেক সময় এনাদের কথাকে আধার করে কোন এক সম্প্রদায় দাঁড়িয়ে যায়, তাঁরা অনেক সময় ভুল করে এটাকে মনে করেন ধর্ম। এই ব্যাপারটা ভাল দেখতে পাওয়া যাবে উত্তর ভারতে কবীর পন্থী সাধু যাঁরা আছেন, এনারা বলেন, আমরা কবীর পন্থী সাধু। আবার রামায়েতী সাধু যাঁরা আছেন, এনারা রামকে মানছেন কিন্তু আসলে চলছে রামচরিতমানস। কবীর, তুলসীদাস ঋষিতুল্য, এনারা অতি উচ্চমানের সন্ত মহাত্মা, এনাদের কথাতেও সম্প্রদায় চলে, ধর্ম চলে। ঠাকুর যে বলছেন, কেউ কেউ বলে আধুনিক, এটাকে বোঝার জন্য এই জিনিসটা, যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, জানা খুব জরুরী।

তৃতীয় যেটা হয়, খুব ভাল মানের সাত্ত্বিক মানুষ, চরিত্রবান পুরুষ আর তার সাথে তাঁর ভাল উপলব্ধি আছে, যেমন আইনস্টাইন, তিনি ধর্ম নিয়ে দু-চারটে কথা বলে দিয়েছেন, সেটাকে নিয়ে লোকেরা নাচানাচি করে। আবার অনেক বড় প্রতিভাবান ব্যক্তিরা আছে, যাঁদের নাম নেওয়া যাবে না, বাংলাতেও এই ধরণের মানুষ আছেন, ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেও আছেন। এনারা সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসায় এই ধরণের কোন কোন ক্ষেত্রে কৃতকৃত্য হওয়াতে খুব নাম করেছেন; এখন তিনি দু-চারটে ধর্মের কথা বললেন, লোকেরা ওই দু-চারটে কথাকেই এখন ধর্মের কথা বলে মনে করছে। কিন্তু তারপরেও যেটা হয়, সাত্ত্বিক থেকেও যেটা নিচে চলে আসে, যেখানে সাত্ত্বিকভাব আর ধর্মভাব মিলে বুদ্ধি দিয়ে ধর্মের বিচার করা হয়। বুদ্ধি দিয়ে যখনই কোন ধর্ম বা সম্প্রদায় বা এই ধরণের কোন কিছু আসে, এটাই তখন সর্বনাশ করে দেয়। এনাদের কিছু সত্ত্বগুণ আছে, আবার ধর্মভাবও আছে, কিন্তু বিচার করছেন বুদ্ধি দিয়ে। এই ধরণের লোকেরাই ধর্মের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেন।

কেশবচন্দ্র সেনের যে নববিধান, এনাদের যে ব্রাহ্মসমাজ ঠিক এই জায়গাতে গোলমাল করেছে। ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রবর্তক, এনারা কেউ বড় ঋষিও নন, বিরাট সন্ত মহাত্মাও নন, কোন ছোটখাটো সন্ত মহাত্মাও নন। ওই সাত্ত্বিক একটা ভাব আছে, ওই সাত্ত্বিক ভাবের সাথে ধর্মভাবও রয়েছে। দুটো মিলেমিশে রয়েছে। সাধারণ মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, তারা আদর্শ পালন করতে চায় না। ব্রাহ্মণরা করতেন, ওনারা ওনাদের ধর্মকে পালন করতেন, ধর্মকে ধরে আছেন। বিশেষ করে জীবন্ত যিনি আছেন, তাঁকে তাঁরা পালন করতে চান। সাঁইবাবা একজন খুব নামকরা ধর্মগুরু, এক সময় রজনীশও বড় ধর্মগুরু রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এনারা ভাল বলছেন, কি মন্দ বলছেন, তাতে তাঁদের

সম্প্রদায়ের লোকেদের কিছু আসে যায় না। এনারা ছিলেন চোখের সামনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এখন তিনি যেটা দিয়েছেন সেটাকে যদি যাচাই করতে হয়, তাহলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যিনি দিয়ে গেছেন, তিনি চলে যাওয়ার একশ-দুশ বছর পরে বোঝা যায় তিনি কি দিয়ে গেছেন। আমরা এখানে দেখছি ধর্ম সম্প্রদায় কিভাবে তৈরী হয়।

সবচাইতে বাজে অবস্থা হয়, যাঁরা ইমোশান দিয়ে চলেন। কেউ একজন ভাল ভক্তিগীতি করেন, খুব সুন্দর সুন্দর গান রচনা করে দিলেন, পাড়ার লোকের শুনে আহা আহা করতে লাগল। এনারা কিন্তু কেউ ইমোশানাল নন, পরে পরে কিছু ইমোশান ঢুকে গিয়েছিল, এনারাই হলেন ঠিক ঠিক বৌদ্ধিক। আকবর যে দিন-এ-ইলাহি করেছিলেন, তিনিও কিছুটা বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে একটা নূতন ধর্ম তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতে আকবরের ধর্ম কোথায় হারিয়ে গেল। সেই তুলনায় ব্রাহ্ম সমাজ অনেক বেশি দিন চলেছিল। কারণ তখন ব্রাহ্মসমাজে অনেকে ছিলেন, যাঁরা রীতিমত সাধনা করতেন। কিন্তু শুধু সাধনাতে ধর্ম চলে না, সাধনার সিদ্ধিতেও ধর্ম চলে না। ধর্ম চলে একমাত্র যাঁরা সমাধিবান পুরুষ, হয় নির্বিকল্প, নয় তো সবিকল্প সমাধিবান পুরুষরা ওই সমাধি থেকে যাঁরা ফিরে এসে কিছু কথা বলেন, ওই কথার উপর আধার করেই ধর্ম চলে।

যেমন যেমন আমরা ধর্মজীবনে প্রবেশ করে এগোতে শুরু করব, সবার আগে এগিয়ে যাবে আমাদের ইমোশানগুলি। ধর্মের ব্যাপারে যদি কারুর ভিতরে সামান্য ইমোশান থাকে, জেনে রাখবেন তার দুটো পা আচ্ছা করে বেড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, এগোতে দেবে না। আমাদের ভক্তরা এই কথা শোনার পরেই বলবেন, ঠাকুর কৃপাময়, মা কৃপাময়ী, ঠাকুর দেখছেন, মা দেখছেন, ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেই হল, ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা থাকলেই হল, আর কিছু লাগবে না; কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারেন না যে তাঁরা কত সর্বনাশের মধ্যে পড়ে আছেন, বোঝার সেই ক্ষমতাটুকুও তাঁদের নেই, এতটাই দুরবস্থা। যখন আপনার কাছে শেষ কথা হল –শরতও আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে, বুঝবেন ধর্মপথে আপনার এগোনটা শেষ হয়ে গেছে, আপনি আর এগোতে পারবেন না। সেখান থেকে আরও যখন গভীরে যাবেন, যেখানে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আমার বুদ্ধি খুলেছে, শাস্ত্র আদি পড়ে কিছু কিছু বুঝতে পারছি, ধারণা করতে পারছি। তখন আস্তে আস্তে ধর্মের ছবিটা পরিষ্কার হতে শুরু হয়। সেখান থেকে ধীরে ধীরে আরও গভীরে যাওয়া শুরু হয়।

এইভাবে গভীরে যেতে যেতে একটা সময় তিনি সন্ত মহাত্মার স্তরে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু ঠিক ঠিক ধর্মজ্ঞান তখনই হয়, যখন ওই বন্ধনটাকেও ছেড়ে দেওয়া হল, এটাই আত্মসাক্ষাৎকারের অবস্থা। এই পুরো প্রসেসটার জন্য ঠাকুর বলছেন, ডুব দাও। কোথায় ডুব দিতে হবে? নিজের মনের ভিতর। নিজের মনের ভিতরে ডুব দিতে হয়, ডুব দিয়ে সবার আগে মনের যে খেলা, মনের খেলা মানে ইমোশানস্, এটাকে পার করতে হয়। ইমোশানের খেলা পার করার পর শুরু হয় বুদ্ধির খেলা; এই বুদ্ধির খেলাকেও পার করতে হয়। বুদ্ধির খেলা থেকে বেরিয়ে আসার পরে সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের খেলাকে অনেকটা পেরিয়ে যাওয়ার পর সন্ত, মহাত্মা হতে হয়। সন্ত, মহাত্মাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের ভাব খুব প্রবল থাকে। আর শেষে সত্ত্বগুণের ওই অবস্থাকেও পার করে ত্রিগুণাতীত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়। এই জন্মেই যদি এইভাবে আত্মজ্ঞানের অবস্থায় চলে যাওয়া যায়, খুবই ভাল; যদি না করা যায় তাহলে পরের জন্মে করতে হবে। পরের জন্মেও যদি না হয়, তার পরের জন্মে করতে হবে। তাও যদি না হয়, আবার পরের জন্মে চেষ্টা করতে হবে। যতদিন এই আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাল্যাবস্থায় স্কুলে পড়াশোনা করে আবার কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে বাইশ বছরে যখন একটু স্বাধীন হয়ে যাবে, তখন নূতন করে আবার এটাই করতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই।

একটু চেতনা যখন জাগবে তখন ভিতরে একটা আতঙ্ক তৈরী হবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিজের কথা যদি বলি, এই চেতনাটা আমার অন্তত হয়েছে যে, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, আবার আমাকে এই চক্রের মধ্যে ঘুরতে হবে; এটাই আতঙ্ক। সবার সাথে হাসিমজা করছি, এই কথা সেই কথা বলছি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা আতঙ্ক ঢুকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে –আবার যদি জন্মাতে হয়; হে ঠাকুর রক্ষা কর। সজ্ঞানে যেন আমাদের পা কাটা হবে, কিন্তু এখানে কোন ওষুধ নেই যে আমাদের পা'কে এ্যনাসথেসিয়া করা হবে।

পুরো কথামৃতে এই জিনিসটাকেই ঠাকুর বারবার বোঝাবার চেষ্টা করে গেছেন। ডুব দাও, কারণ ঠাকুর হলেন আধ্যাত্মিক জগতের রাজা; ঠাকুর কোন সাধু মহাত্মা নন, তিনি অবতার, ভগবান। তিনি যা বলছেন, বুদ্ধি করে, বিচার করে কোন গ্রাম্য কথা বলছেন না। ঠাকুর যা কিছু বলছেন, সবটাই স্বতঃ প্রমাণ। বেদ যেমন স্বতঃ প্রমাণ, তেমনি ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা স্বতঃ প্রমাণ, বিশেষ করে ঠাকুর নিজের উপলব্ধির যে কথাগুলো বলছেন, ওর আর কোন প্রমাণ লাগে না। আমাদের মনে যে বৃত্তিগুলি ওঠে এগুলো স্বতঃ প্রমাণ, ওর আর কোন প্রমাণ লাগে না। আপনি যেমন যেমন শুনছেন, আপনার ভিতর শব্দগুলো যাচ্ছে, এটাই প্রমাণ। আপনি জিনিসগুলো জানতে পারছেন এটাই আপনার জ্ঞান। এই জ্ঞানকে প্রকাশিত করার জন্য আর-একটা কিছু লাগে না। ঠাকুরের কথাকে সত্য রূপে প্রমাণিত করার জন্য আর অন্য কোন কিছু লাগে না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিক জগতে যাঁরা আছেন, এনারা সবাই ঠিক কিনা জানার জন্য ঠাকুরের কথাকে আশ্রয় করতে হবে। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে।

পুরো কথামৃতকে নিয়ে যখন বিচার করবেন, তখন একটা খুব মজার জিনিস দেখতে পাবেন। ঠাকুর মাঝে মাঝেই ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে, আজকে অমুককে দেখতে যাব, কাল তমুককে দেখতে যাব, আর যাচ্ছেনও, কথামৃতে এই ধরণের বর্ণনা প্রচুর আছে। ঠাকুর এই যে তৎকালীন সব নামজাদা লোকেদের দেখতে যাচ্ছেন, দক্ষিণেশ্বরেও অনেকে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। সবার সাথে ঠাকুর খুব সম্মান দিয়ে মিষ্টি করে কথা বলছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে কত বিনম্র ভাবে কথা বলছেন। অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল, কত বিনম্র ভাবে কথা বলছেন, কিন্তু দু মিনিট পরেই খ্যাঁচ করে বঙ্কিমকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। আর যখন আমরা কথামৃত থেকে ঠাকুরের কথাগুলো শুনছি, যত তাঁর জীবনী জানছি; প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাচ্ছি যে, তৎকালীন সমাজে এমন কোন জিনিস নেই, যেটাকে ঠাকুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছেন।

এ যেন একটা প্রতিঘাত, 'প্রতিঘাত' শব্দটা ঠিক হবে কিনা জানা নেই, তবে এভাবে বলাটা উপযুক্ত হবে –দুমদাম করে সব জিনিসকে ঠাকুর যেন উড়িয়ে দিচ্ছেন। কি কি ওড়াচ্ছেন? পাণ্ডিত্যকে, কিভাবে? পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য যদি না থাকে তাহলে সেই পণ্ডিতকে খড়কুটো বলে মনে হয়। বাংলার সেই সময়ের কত বড় বড় সাহিত্যিক, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র; সবাইকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের যে সেবার ভাব, সেটাকেও পর্যন্ত উড়িয়ে দিচ্ছেন এই বলে –ভিতরে সোনা চাপা আছে খবর নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত যে সাধক, তাঁকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন। আবার আর-একজনকে বলছেন, তোমাকে আমি রাজা-টাজা বলতে পারব না। অন্য দিকে ইমোশানস নিয়ে যারা চলছে, কিছু কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায় –ইনি কোন কৃষ্ণ মানেন, উনি কোন কৃষ্ণ মানেন; আবার ধর্মের নামে এদের যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব, কাউকেও ঠাকুর ছাড়ছেন না, বুম্‌বাম্‌ করে সব উড়িয়ে দিচ্ছেন। পুরো কথামৃতের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত দেখবেন একজন দুজন পণ্ডিত যাঁরা বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, এনাদের ছাড়া আর নরেন আদি কয়েকজন ছোকড়া, এই কয়েকজনের নামে খুব ভাল কথা বলা ছাড়া আর কারুর নামে ভাল কথা দেখতে পাওয়া যাবে না। কেন?

ঠাকুর হলেন একজন, one-man demolition army, ঠাকুর একাই যেন একটা বিশাল বুলডোজার, এক এক ধাক্কাতে এক একজনকে গুড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হল, ঈশ্বরজ্ঞানের জন্য এগুলো কোন কাজে লাগে না, সব উড়িয়ে দাও। যখন সমস্ত কিছু খসে পড়ে গিয়ে যেটা থেকে গেল; এটা হল নেতি নেতির পরে যেটা থেকে যায়, শেষ সত্যটাই থেকে যায়, এটাই স্পিরিচুয়ালিটি। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন, *যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্*। পরম সত্যটা কি? যেখানে ইন্দ্রিয় নেই, মন নেই, বুদ্ধি নেই। ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিসগুলিকে জানা হয়েছে, যেটাকে আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান বলে লাফালাফি করছি, সেই বিজ্ঞানকে ঠাকুর বলছেন –বিজ্ঞানে কি আছে, বিজ্ঞান শুধু বলে এটা থেকে ওটা হয়, ওটা থেকে সেটা হয়। বিজ্ঞানকে এক কথায় নামিয়ে দিলেন। সাংখ্যাদি দর্শনকে এক কথায় ফেলে দিচ্ছেন। হঠযোগ এক কথায় উড়িয়ে দিচ্ছেন। পুরো কথামৃতে একটা কিছু নেই ঠাকুর যেটাকে ok করছেন। ঈশ্বর সত্য, কিন্তু এর পাশে পাশে যা কিছু আছে, সব কটাকে ডেমলিশ করে দিচ্ছেন, দিয়ে শেষে যা থাকবে, এটাই হল সত্য। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন *–সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ*, ওই জায়গাতে গিয়ে কাষ্ঠ কাষ্ঠবৎ।

এই হলেন আমাদের ঠাকুর। যার জন্য আমরা দেখতে পাই, বিশ্বের ধর্মজগতে একটি ধর্মগ্রন্থ নেই, যেখানে এভাবে সব ডেমলিশ করে দিচ্ছে; আর একজনও প্রফেট নেই, যিনি এইভাবে ডেমলিশ করেছেন। এই ডেমলিশান যে একটা কোন সংহার মূর্তি, একেবারেই তা নয়। সংহার মুদ্রা কোন মতেই না, বরঞ্চ তিনি বিদ্যাকে সম্মান করছেন। যখন ঠাকুরকে বলা হচ্ছে, মহাশয়, আপনি তো কোন পড়াশোনা করেননি; তখন বলছেন, আমি শুনেছি কত। কথামৃতে আছে, মাস্টারমশাইকে বলছেন, তোমরা ইংরাজীতে তর্ক কর, আমি শুনব। সংহার নয়, আমি ডেমলিশান শব্দটা ব্যবহার করেছি এটা বলার জন্য যে, এগুলো আবর্জনা, আবর্জনাগুলো বুলডোজার চালিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। যেটা থেকে যাবে *–তামাহুঃ পরমাং গতিম্*। এই যে পরম গতি, এই পরম গতি আমরা কিভাবে পাব? আশেপাশে আলতু ফালতু যত আবর্জনা আছে, সব ফেলে দিন; তারপর দেখবেন *–তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*, নিজের স্বরূপে অবস্থান।

এত কিছু করে ঠাকুরে ধর্মের আসল স্বরূপকে স্পষ্ট করে আমাদের সামনে স্থাপন করে দিলেন। ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রে স্বামীজী তাই বলছেন, *ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য*। আর তাই না, *সর্বধর্ম স্বরূপিণে*, সমস্ত ধর্মের মধ্যে যে সত্যটা রয়েছে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, এই সত্যটাকে স্থাপন করে দিলেন। নরেনকে বলছেন, হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তোমাকে যত স্পষ্ট দেখছি, এর থেকেও স্পষ্ট ভাবে আমি ঈশ্বরকে দেখি। সমস্ত ধর্মের যে আধ্যাত্মিক সত্য, সেই সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের যে অনুভূতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এখান থেকে প্রেরণা পেয়েই আমি পৃথিবীর আটটি মূল ধর্মকে নিয়ে 'The World of Religion' লিখলাম। এই আটটি ধর্মের বাইরে বাকি যা কিছু ধর্ম আছে, এগুলো হয় ইমোশান দিয়ে চলছে, নয় তো বুদ্ধি দিয়ে চলছে। আবার হয়ত কারুর মনে কিছু একটা ভাব এসেছে, সেখান থেকে আরও পাঁচজন সেটাকে নিয়ে মাতামাতি করে যাচ্ছে, ভাবছে এটাই এই যুগের ঠিক ঠিক ধর্ম।

ঠাকুর বলছেন, **কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর-একটা ঈশ্বর? বলে নববিধান, নূতন বিধান; তা হবে**।

ঠাকুর এখানেও ছাড়ছেন না, কিন্তু কড়া ভাবে বলছেন না। কেন বলছেন না? কি করে বলবেন, কেশবচন্দ্র সেন ওনার প্রিয়, নরেন আবার সেখানে যাতায়াত করে, একটা নরম ভাব আছে, কিছু করার নেই। এটা যে কোন দুর্বলতা তা না। আর এত লোক জানছে, মানছে। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, ঠাকুর তো গড়তে এসেছিলেন, ভাঙতে আসেননি। এই যে কথাগুলো আমরা বললাম, এখানে ঠাকুর কোথাও ভাঙতে আসেননি, তিনি শুধু আবর্জনাগুলিকে সরাচ্ছেন। সব আবর্জনাগুলি সরে গেল, আর সত্যটা নিজের মহিমাতে দাঁড়িয়ে গেল।

যেমন ছটা দর্শন আছে, ষড়্ দর্শন, তেমনি আর-একটা কিছু হবে। কি ইনসাল্টিং কথা। ঠাকুর বলতে চাইছেন, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না –তোমার ঈশ্বর কি আর-একটা ঈশ্বর, নাকি ষড়্ দর্শনের মধ্যে তুমি একটি দর্শন? বক্তব্য হল, তোমার এগুলো কোনটাই কিছু না। তার মানে, তুমি যে ধর্মের কথা বলছ, তোমার এই ধর্ম ঋষিদের নয়। কোন সন্ত মহাত্মার নয়। তার নিচে সাত্ত্বিক ভাব দিয়ে যেটা আসে, সেটাও নয়। বুদ্ধির খেলা দিয়ে মিশিয়ে, ষড়্ দর্শনের মত একটা যে সিস্টেমেটিক ফিলজফি হবে, তাও নেই।

তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জানো? এই নিরাকারবাদী বলতে ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের কথা বলছেন। **ভুল এই –তারা বলে, তিনি নিরাকার, আর সব মত ভুল**। নিরাকারবাদীদের সাধারণ ভাবে এই সমস্যাটা আছে। খ্রীশ্চানরা আমাদের বলে পৌত্তলিক। অথচ ওদের চার্চে দেখুন, বড় বড় সব মূর্তি বসানো। আর সেন্ট, আজ এই সেন্ট, কাল সেই সেন্ট। সেন্টেও শান্তি হল না, এখন নিয়ে আসছে স্যান্ট ভ্যালেন্টাইন ডে দাঁড় করিয়ে দিল বিজনেস করার জন্য। পুরো চার্চের এটা হল বিজনেস। একটা একটা করে সেন্ট দাঁড় করাবে, আর আজ এই সেন্ট ডে, কাল সেই সেন্ট ডে; সেখান থেকে শুরু হয়েছে আজ মাদারস ডে, কাল হবে সিস্টার ডে। কিসের মাদার্স ডে, প্রত্যেকটা দিন মাদার্স ডে।

আমি জানি, তিনি সাকার, নিরাকার দুই-ই, আরও কত কি হতে পারেন। **তিনি সবই হতে পারেন**। ঈশ্বরকে কি ইতি করে বলা যায় যে, তিনি সাকার বা তিনি নিরাকার? আমরা যখন বলছি ঈশ্বর সাকার, আমরা যখন বলছি ঈশ্বর নিরাকারা, এগুলো আমরা সব বুদ্ধির দৌড়ে বলছি। আপনি যদি কল্পনা করেন, আর-একটা কোন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে যেখানে আরও উন্নত জীব আছে বা যাদের বুদ্ধি অন্য রকম, তারা তখন এই যে দ্বন্দ্ব, সাকার নিরাকার দিয়ে শুধু দেখবে না, আরও অন্য কোন কিছুতে দেখবে। যখন আমরা বলছি, ঈশ্বর হয় সাকার, নয় নিরাকার; তা নাহলে সাকার-নিরাকার; আমরা তখনও কিন্তু ঈশ্বরকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যাচ্ছি। সবচেয়ে ভাল হল এব্রাহামিক ধর্মগুলো; খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজিম্ এরা যখন নিরাকার নিরাকার বলতে চাইছে, এরা আগেই ঈশ্বরকে বেঁধে দিচ্ছে; অবশ্য অত বোঝার ক্ষমতা ওদের নেই। একজন একবার একটা কটূ কথা লিখেছিল, আমিও বললাম, ভাই এত বুদ্ধি থাকলে তুমি হিন্দু হয়ে জন্ম নিতে। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বোঝার ক্ষমতা থাকলে তুমি অবশ্যই হিন্দু হয়ে জন্মাতে।

যখনই আপনি বলছেন ঈশ্বর নিরাকার, তখনই আপনি নিজের বুদ্ধির সীমানাতে ঈশ্বরকে বেঁধে দিলেন। যখনই বলছেন, কৃষ্ণই ঈশ্বর, কৃষ্ণ বাদে কিছু নেই; আপনিও সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে আপনার বুদ্ধির সীমানাতে বেঁধে দিলেন। আমি যদি কাল বলি, শ্রীরামকৃষ্ণই ঈশ্বর, সেখানেও আমিও আমার বুদ্ধির সীমানাতে ঈশ্বরকে বেঁধে দিলাম। আমরা অনন্তকে বেঁধে দিলাম আমার বুদ্ধির সীমানাতে, এইবার ঈশ্বর ছটফট করবেন। জেলেদের জালে মাছগুলো যেমন ছটফট করে, ঈশ্বরও জালের মাছের মত ছটফট করবেন। যিনি অনন্ত, তাঁকে আমরা আমাদের বুদ্ধির সীমানাতে বদ্ধ করে দিচ্ছি। নিরাকারবাদীদের যতগুলি প্রচলিত গান আছে, সব কটা গানে ঈশ্বরকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এগুলো বোঝার ক্ষমতা এদের নেই। আপনি বলবেন, আপনার কি বোঝার ক্ষমতা আছে? আমার কেন বোঝার ক্ষমতা থাকবে না, এটা একেবারে খুব সাধারণ জ্ঞান; কোন রকেট ফিলজফি নয়।

একটা মজার ঘটনা বলি, ফিজিক্সে একটা খুব নামকরা আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু তার পিছনে যে সিদ্ধান্ত, সেটা একটা বিচিত্র সিদ্ধান্ত। যার অর্থ হল A x B is not equal to B x A। তার মানে তিন গুণ চার সমান হবে না চার গুণ তিন। তা কি কখন হয়? বেচারি যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি সেটা অনেক দিন বন্ধ করে রাখলেন, কারণ এটা তো হতেই পারে না। এরপর একটা নূতন গণিত বেরোল, যাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স, যেটা আজকাল ক্লাশ টেন, ইলেভেনে পড়ানো হয়। ম্যাট্রিক্সে একটা

মূল নিয়মই হল, A x B equal to B x A হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির দৌড়ে আমরা চিরদিনই জানি তিন গুণ চার সমান চার গুণ তিন। কিন্তু বুদ্ধির দৌড়ে হঠাৎ এমন পরিস্থিতিও হতে পারে A x B may not be B x A। এটা একটা পুরো গণিতের শাখা। ঠিক তেমনি, এই সাকার নিরাকার, এগুলো হল বুদ্ধির এলাকার। বুদ্ধির এলাকায় থেকে আমরা মনে করছি এটাই শেষ কথা। যিনি ওই নিরাকার নিয়ে যে গানগুলি লিখছেন, তিনিও ওই বুদ্ধির এলাকা থেকে লিখছেন, আমরাও আহা আহা করছি। কবীর দাস, কিছু না হোক তাঁর অনুভূতি ছিল। লোকেদের কোন অনুভূতি নেই, টুকটাক একটু হয়ত আছে, সেটাকে নিয়েই লোকেরা লাফালাফি করছে। কিন্তু যদি আপনি বলেন, এটাই শেষ কথা; না, শেষ কথা হতে পারে না। এটা শেষ কথা তাদের জন্য, যাদের কাছে বুদ্ধি শেষ কথা। অথচ কঠোপনিষদে বলছেন, *বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি*, বুদ্ধিরও কোন চেষ্টা থাকবে না। তাই যদি হয়, তাহলে নিরাকার সাকার দিয়ে আপনি কি করে বাঁধবেন? ঈশানকে তখন ঠাকুর বলছেন –

(ঈশানের প্রতি) –সেই চিচ্ছক্তি, সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। শক্তি ছাড়া কিছু নেই, এর আগেও আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি। সব কিছুতে মহামায়াই আছেন।

এখানে ঠাকুর একটা খুব উচ্চমানের অবস্থার কথা বলছেন। এগুলো আমাদের বিশ্বাস হয় না। আজ এত বছর আমি এই শাস্ত্রের মধ্যে আছি, তাও বিশ্বাস হয় না। যখন বিশ্বাস করতে চাই, তখন যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। ঠাকুর বলছেন, **আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ি**। রস্‌কে মেথর। নোংরা পরিষ্কার করতেন বলে ওনাদের নিচু জাত বলে মনে করা হত। এখন এসব মনে করার কিছু নেই, এখন পুরো সিস্টেমটাই পাল্টে গেছে। ঠাকুর ধ্যান করছেন, ধ্যান করতে করতে মন চলে গেছে রসিক মেথরের বাড়ি। **মনকে বললুম, থাক শালা ওইখানে থাক**। মা দেখিয়ে দিলেন। পুরো জিনিসটা ঘুরে যাচ্ছে, আপনি করছেন ধ্যান কিন্তু মন আপনার দৌড়াচ্ছে। কোথায় দৌড়াচ্ছে? সব জায়গায়। সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়, আপনি গ্যাসের উপর দুধ জাল দিতে বসিয়ে দিলেন; তারপর বসে গেলেন ধ্যানে। আপনার মনটা এখন কোথায় থাকবে বুঝতেই পারছেন। দুনিয়ার যত কাজ, দুনিয়ার যত কথা ধ্যান করার সময়েই সব মনে পড়বে।

ঠাকুরের মন যে রসিক মেথরের বাড়ি চলে গেল, এটা সেই অর্থে নয়। অন্য কোন কারণে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে। মা কিন্তু ওখানে ঠাকুরকে অন্য কিছু দেখাতে চাইছেন। ঠাকুর বলছেন –**মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র**। এই কথাগুলো পড়লে, এই কথাগুলো শুনলে হাত-পা যদি ঠাণ্ডা না হয়ে যায়, শরীর-মন যদি স্থির না হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, কথামৃত বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে। এর অর্থটা ধারণা করতে পারছেন? মা যে শুধু ঠাকুরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা নয়। আপনরা যে বাড়িতে আছেন, সেই বাড়িতে আপনার স্বামী/স্ত্রী, বাবা-মা, পুত্র-কন্যা যাঁরাই আছেন, সবাই এনারা খোল মাত্র। আপনার চোখের সামনে যারা আছে, সবাই খোল মাত্র। ব্যাটারি দিয়ে যে বাচ্চাদের যে খেলনা চলে, খেলনাগুলো খোল মাত্র, আসলে ভিতরে যে মোটরটা আছে সেটা আলাদা। প্রত্যেকটা খেলনার মোটর আলাদা, মোটর চলছে ব্যাটারি দিয়ে। সেই ব্রহ্ম হলেন ব্যাটারি, আমরা যেটাকে এনার্জি বলি। আর ভিতরের যে মোটর, যেটা পুরো খেলনাটাকে ঘোরাচ্ছে, যেটা খেলা করাচ্ছে –এটাই চিচ্ছক্তি। রসিক মেথর, যাকে তৎকালীন হিন্দু সমাজ এক নিচ জাতি বলে মনে করছে, কাজ দিয়ে মানুষের বিচার করা হচ্ছে, সে কি ধরণের মানুষ? আসলে সে কে? ঠাকুর প্রত্যক্ষ করছেন, এক্সরেতে মানুষের যেমন ছবি দেখা যায়, ছবিতে খোলটা উড়ে যায়, থেকে যায় কিছু কিছু হাড়ের আউটলাইন। এখানেও ঠাকুর দেখছেন, সেই খোলের মধ্যে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শুয়ে আছেন। কার ভিতর কুণ্ডলিনী মূলাধারে শুয়ে আছে? সবারই ভিতর। আপনি লোকাল ট্রেনে যাচ্ছেন, বাসে করে যাচ্ছেন; ট্রেনে বাসে যে প্যাসেঞ্জারসদের আপনি দেখছেন, বাসের যে কণ্ডাক্টর, বাসের ড্রাইভার, বাসের খালাসি, সবার ভিতর সেই কুলকুণ্ডলিনী শুয়ে আছেন। যারা আপনাকে গালাগাল দিচ্ছে, যাদের আপনি সহ্য করেন না, আপনাকে যারা সহ্য করে না, আসলে সবাই

সত্যিকারের নারায়ণ। সব খোল মাত্র, ভিতরে রয়েছেন কুলকুণ্ডলিনী। সবার মধ্যে সেই মহামায়ার অনন্ত ঐশ্বর্য, এক ষট্‌চক্র। এগুলোকে চিন্তা-ভাবনা করে যদি দম বন্ধ না হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ভিতর কিছু গোলমাল আছে, যেটা কিনা একটা চিন্তার কারণ।

সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না পুরুষ? আদ্যাশক্তি হলেন শক্তি, শক্তির আবার মেয়ে-পুরুষ কি। **আমি ও-দেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়িতে কালীপূজা হচ্ছে। মার গলায় পৈতে দিয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মার গলায় পৈতে কেন? যার বাড়ির ঠাকুর, তাকে সে বললে, ভাই! তুই মাকে ঠিক চিনেছিস, কিন্তু আমি কিছু জানি না, মা পুরুষ কি মেয়ে?**

এই ব্যাপারে আপনার কি মত? একটাই মত; ইমোশানালিজম্‌। এই যে যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনি ইমোশানালিজমের মধ্যে ডুবে আছেন, ইমোশান দিয়েই তিনি বলছেন। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন, তিনি অন্য স্তর থেকে বলছেন। কিন্তু এই ধরণের ইমোশানালিজিম, যেটা পরম সত্যকে সামনে আনছেন, সেখানে তাও চলে; কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুরের নামে, মায়ের নামে সবাই যা বলছেন, আমি দেখি, আর মাথা নত করে চুপ হয়ে যাই। সেইজন্য কোথাও শাস্ত্রের উপর লেকচারাদি দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালে আমি ক্ষমা চেয়ে নিই, লেকচার দেওয়া থেকে আমাকে রেহাই দিন।

বিভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্ন রকমের পৌরাণিক কাহিনী লুকিয়ে আছে। সেই রকমেরই একটি কাহিনী ঠাকুরে এখানে বলছেন –

এইরকম আছে যে, সেই মহামায়া শিবকে টপ্‌ করে খেয়ে ফেললেন। মার ভিতরে ষট্‌চক্রের জ্ঞান হলে শিব উরু দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন শিব তন্ত্রের সৃষ্টি করলেন।

এই কাহিনীতে বলা হয়, যতক্ষণ ষট্‌চক্রের পুরো জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ধর্মের জ্ঞান হয় না। মা বলুন, ঠাকুর বলুন, মৃত্যুর সময় কেউ আপনাকে কোথাও নিয়ে যাবেন না। যতক্ষণ আপনার কুলকুণ্ডলিনী ষট্‌চক্র ভেদ না করে, যতক্ষণ না মূলাধারে, ঠাকুর বলছেন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে যতক্ষণ পড়ে আছে; ওখান থেকে কিছু না হলে হৃদয় পর্যন্ত যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ ধর্মের আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। কুলকুণ্ডলী হৃদয়ে এসেছে কিনা বুঝব কি করে? তখন আপনি পরিষ্কার দেখতে পারবেন –এই জগৎ আলোময়। তার সাথে পরিষ্কার অনাহত ধ্বণি শুনতে পারবেন –সব সময় ওঁ ধ্বণি শুনতে পাবেন। যতক্ষণ না আপনি জগৎ আলোময় দেখছেন, আর অনাহত ধ্বণি শুনতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ এটা পরিষ্কার বোঝায় যে আপনি ইমোশানালিজমে পড়ে আছেন। আপনি মায়ের গান করছেন, ঠাকুরের আরতি করছেন আর বলবেন, মহারাজ একবার ওই গানটা করবেন, মহারাজ একবার এই গানটা করবেন। সত্যিই এমন এমন কথা ভক্তদের থেকে আমরা শুনি, অবাক হয়ে যেতে হয়। একদিন একটি ইয়ং ছেলে এসে আমাকে একজনের নাম করে বলছে, উনিই হলেন বর্তমান কালের স্বামী বিবেকানন্দ। জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর। আসলে মুর্খ হওয়ার জন্য কোন ডিগ্রিও লাগে না, পয়সাও লাগে না।

ঠাকুর বলে যাচ্ছেন – **সেই চিচ্ছক্তির, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়।**

ঈশান –আপনি কৃপা করুন। ঠাকুরের প্রতি ঈশানের সত্যিই কি ভক্তি। ঠাকুর তখন বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –সরলভাবে বল, হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ; আর বল, হে ঈশ্বর, কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর! একটু আগে ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাখ্যা করে বলছিলেন –যা কিছু দেখছ, যা কিছু শুনছ, সবই মায়া। আগে আমরা এর বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি।

আর ডুব দাও। এই পরিচ্ছেদ যখন আমরা শুরু করলাম, তখন এর ব্যাখ্যাতে পরিষ্কার করে বলা হল প্রসেসটা কি। সবার উপরে ঋষি, ঋষির ঠিক নিচে হলেন সন্ত মহাত্মারা, সেখান থেকে একটু

নিচে হলেন সাত্ত্বিক পুরুষ, যার মধ্যে ধর্ম ভাব আছে। সাত্ত্বিক পুরুষ হলেই যে তার মধ্যে ধর্ম ভাব থাকবে তা না। যেমন বৈজ্ঞানিকরা, এনারা মূলতঃ সাত্ত্বিক পুরুষ, কারণ জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা আছে, কিন্তু তাই বলে যে তাঁদের মধ্যে ধর্ম ভাব থাকবে তা না। তারও নিচে আসে, যারা বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করে, এদেরও নিচে হল যারা শুধু ইমোশানস দিয়ে চলে –প্রভু কৃপা করবেন, মা দেখছেন, হে প্রভু কৃপা কর –এরা সবাই হল অধমাধম, অধমেরও অধম। যখন ঈশ্বরের নামে আপনি সত্যিকারের ডুব দেবেন, ভিতর থেকে তখন প্রার্থনা করবেন, হে প্রভু, কৃপা কর, তখন বোঝা যাবে ডুব দেওয়া কি জিনিস।

আমার জীবনধারণ খুবই সীমিত। বেলুড় মঠের সামনে ইউনিভার্সিটি। সকালবেলায় ঘর থেকে বের হই; তিন-চার মিনিটের রাস্থা হেঁটে বেলুড় মঠে প্রবেশ করি। ঠাকুরকে প্রণাম করে কখনো একটু বসি, কখনো চলে আসি। এসে সেই যে ঘরে বন্ধ হলাম, বন্ধই থাকলাম, বাইরের জগতের কোন জ্ঞান আমার নেই। কোন কারণে হয়ত একদিন বের হলাম, তাই দেখে আমাদের এখানকার একজন কর্মি আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'মহারাজ, আপনি অনেকদিন পর বাইরে এলেন, তাই না'? ফলে আমাকে একটু সোস্যাল মিডিয়ায় থাকতে হয়ে, ফেসবুক আদিতে থাকতে হয়। ফেসবুক দেখে আমি অবাক হয়ে যাই, সবাই পোস্ট করে যাচ্ছে –শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী এই রকম বলে ছিলেন, শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এই রকম বলেছিলেন, অমুক মহারাজের এই জ্ঞান হয়েছে; আরে ভাই তোমার কি হয়েছে? তোমার কথা কিছু বলো? নিজের বুকের দিকে আঙুল রেখে বল, আমি যেটা বলছি, এটা সত্য। আমাদের সব বড় বড় বক্তা কিছু আছেন, লেকচারে শুধু কোট করে যাবেন। ঠাকুরের নামে বলছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার চারটে লাইনে তুলে বলবেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন।

ফেসবুক একটা সোস্যাল মিডিয়া, সেখানে বলা হচ্ছে আপনার কথা লিখুন, সেখানেও আপনি কোট করে যাচ্ছেন, অমুক এই বলেছেন, তমুক ওই বলেছিলেন –এটাই ইমোশানালিজম্। সবই করে যাচ্ছে, কিন্তু ডুব দেওয়ার ইচ্ছেটাই নেই। ঘরে একটা ঠাকুরঘরও আছে, ঠাকুরকে পায়েসও রান্না করে দিচ্ছে, কিন্তু ডুব যে দিতে হয়, সেটা দেবে না। ঠাকুর অবতার, তিনি জানতেন তাঁর ভক্তরা এই রকমই, ডুব দিতে চাইবে না। সেইজন্য ঠাকুর কথামৃতে বারবার বলছেন, ডুব দাও, ডুব দাও।

উপর উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়। যদি জীবনে একটা জিনিস শিখতে পারেন, কি করে ডুব দিতে হয় সেটাকে ভাল করে শিখুন; কারণ ডুব দিতে হবে। জীবনে এই একটি জিনিস যদি শিখতে পারেন –ডুব দিতে হয়। ঠাকুরে এই একটি শিক্ষা, সব ধর্ম শিক্ষার পরে ডুব দিতে হয়। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই না, যে কোন বিষয়ে আপনি যদি জ্ঞান পেতে চান; বিজ্ঞানের জ্ঞান পেতে চান? বিজ্ঞানে ডুব দিন। আমার পরিচিত একজন গান শিখতে যেতেন। যিনি তাঁকে গান শেখান, একদিন হঠাৎ দেখা গেল তিনি গান ছেড়ে কাপড়ের ব্যবসা করতে শুরু করেছেন। তারপর নাচ শিখছিলেন, তিনি নাকি গোল্ড মেডালিস্ট, নাচ-টাচ শেখান। তিনি এখন নাচ শেখানো বন্ধ করে নাকি বেকারির ব্যবসা শুরু করেছেন। শোনার পর আমার হাসি থামছে না।

কিসের জন্য আপনি এতটা সময় নষ্ট করলেন সঙ্গীত শিক্ষা নিয়ে? আরে যেটা করছিলেন, ওটাতেই ডুব দিন। আপনি বলবেন, শুধু গান শিখিয়ে খাওয়া জুটবে না। না জুটলে না জুটবে। কয়েক বছর আগে এমনিও তো খাওয়া জুটত না, কি হয়েছে তাতে। একটু দেখান, আপনার বিদ্যার প্রতি স্পৃহা আছে। একটু দেখান, আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের বাইরেও আপনি কিছু ভাবতে পারেন। আমার বইয়ে বারবার আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি –বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ; এই চারটের বাইরে কোন আদর্শ হয় না। শুধু পেটের জন্য দুটি টাকা আয় করার জন্য কেউ চানাচুরের দোকান খুলছে, কেউ ঝালমুরির দোকান খুলছে। তাহলে আপনি বিদ্যা অর্জন করলেন কেন? এতটুকু করার জন্য তো ওই বিদ্যা অর্জনের কোন দরকারই ছিল না। ঠাকুরের গল্প আছে, দশ বছর যোগ শিক্ষা লাভ করে নাকি সে

জলের উপর দিয়ে হাঁটা শিখেছে। দু পয়সা খরচা করে এমনিই তো নদী পার করা যায়। সঙ্গীত শিখেও আপনার পয়সা আয় করার দিকে মন? ভারতবর্ষে আগে এই জিনিস ছিল না। ভারতের সিস্টেম ছিল, গুরু শিষ্যকে বাড়িতে রেখে খাইয়ে-দাইয়ে নিঃশুল্কে বিদ্যা দান করতেন। এখন যে যেখানে ট্রেনিং দিচ্ছে, সবাই আয় করছে। সঙ্গীত শিখেছে, এবার এখান থেকে দুটি পয়সা আয় হবে। এরা শেখাবে সঙ্গীত, এরা শেখাবে নৃত্য?

অন্য দিকে মহাত্মাজীরা বড় বড় আশ্রম খুলে মানুষকে ধর্ম শেখাচ্ছে। মাথায় ঘুরছে কি করে লোকেদের থেকে মোটা টাকা কামানো যায়। এরা শেখাবে ধর্ম? আরে ভাই আগে নিজে ডুব দিন।

ঠাকুর আবার বলছেন, **গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুঁজতে ছিল। কেউ আবার বলে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটা গাছ দেখবে, সেই গাছের কাছে একটা ঘূর্ণি জল আছে, সেইখানে ডুব মারতে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়**। ওঁঙ্কারেশ্বরে নর্মদা নদীতে শিবলিঙ্গ পাওয়া যেত। তারপর নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে এখন আর পাওয়া যায় না। গুরুর কাছে আপনি সন্ধান জেনে গেলেন, এবার ডুব দিন।

ঈশান –আজ্ঞা হাঁ।

মূল কথা হল ডুব দিতে হবে। যে কোন ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল করতে চান, ডুব দিন; মা-ছেলের সম্পর্ক দৃঢ় করতে চান, ডুব দিন; যেটা করছেন, সেটাতে ডুব দিন। ডুব যদি না দেন, উপর উপর ভেসে যদি থাকেন, জীবনে আপনার কিছু হবে না। যে জিনিসে সফল হতে চান, সেই জিনিসে ডুব দিতে হবে। ব্যবসা করতে চান, ডুব দিন। ডুব যদি না দেন, কিছুই হবে না। নিজেকে ওর মধ্যে পুরো ডুবিয়ে দিন, ওতেই পুরোপুরি মজে যান; সাফল্য আসতে বাধ্য।

ডুব দেওয়ার কথা বলার পর ঠাকুর গুরু নিয়ে কয়েকটি কথা বলবেন। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের একটা কথা নিয়ে, যেটা কথামৃতকে নিয়ে বা ঠাকুরকে নিয়ে আমরা অনেকবারই বলেছি, সেটার উপর একটু আলোকপাত করা দরকার। ঠাকুর কে? ঠাকুর কি? ঠাকুরের যদি সঠিক বর্ণনা করতে হয়, তাহলে শুধু একটি কথাই আসবে –ধর্মস্থাপক। এর বাইরে ঠাকুরের ব্যাপার এলে যেমন বিভিন্ন মতের সাধনার কথা আসে, কিংবা ধর্মের সমন্বয়ের কথা আসে, এগুলো সবই ভাল। কিন্তু মূল জিনিসটা হল –ধর্ম সংস্থাপনা। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই ভগবান অবতার হয়ে আসেন। অবতারের একটাই কাজ –ধর্মের পুনঃস্থাপন। 'পুনঃস্থাপন' শব্দটা কি? ধর্ম তো আছেই, বা যে ধর্মগুলো আছে তাদের প্রত্যেকের একটি করে গ্রন্থ রয়েছে, যে গ্রন্থ তাদের প্রফেটরা দিয়ে গেছেন, সেটাকে আশ্রয় করেই তাঁরা চলছেন। তাহলে তফাৎ কোথায়?

তফাৎ হল, হিন্দু ধর্ম ঠিক ঠিক এক জীবন্ত ধর্ম। তাহলে বাকি ধর্মগুলি কি মৃত ধর্ম? না, কেউই মৃত ধর্ম নয়। মৃত ধর্ম বলে কিছু হয় না, আর ধর্ম কখনই মৃত ধর্ম হয় না, কারণ ধর্ম মৃত থাকলে সেটা কখনই ধর্ম হবে না, মানুষ মরে গেলে যেমন মানুষ থাকে না। এই অর্থে জীবন্ত ধর্ম –নিত্য নূতন তো বলা যাবে না, কিন্তু ভগবান নিজে নিয়মিত ভাবে এসে আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার থেকে যেমনটি দরকার, যুগোপযোগী ধর্মশিক্ষা দেন। বেদে আমাদের ধর্মের সব কিছু আছে। বেদের সঙ্গে তন্ত্রকে যখন মিলিয়ে দেওয়া হয়, তখন ধর্মের কোন কিছুই বাকি থাকে না। কেন তন্ত্রকে আলাদা করে বলা হল? কারণ পুরাণ, উপনিষদ এগুলো সব বেদের উপরেই সরাসরি আধারিত। মনুস্মৃতিও সরাসরি বেদের উপর আশ্রিত। কিন্তু তন্ত্র একটু যেন আলাদা মতের। তন্ত্র আর বেদ এই দুটোকে যখন সঙ্গে করা হয়, সেটাই তখন হয়ে যায় আধ্যাত্মিক জগতের মহা মহা ভাণ্ডার। কিন্তু এত কিছু করার, এত কিছু জানার, বোঝার সময় কার কাছে আছে? আমাদের জীবন চালাতে হবে, আমরা চাই আমরা যাদের ভালবাসি, তাদেরকে নিয়ে আমরা সবাই যেন ভাল থাকি। সবাই ভাল থাকতে চায়, আমরা সন্ন্যাসী, আমরাও ভাল থাকতে

চাই। আমারও খুব পরিচিত কেউ অসুস্থ হওয়ার খবর পেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়, আবার সুস্থ হয়ে গেলে আনন্দ হয়। আর নিজের শরীর ধারণের জন্যও অনেক কিছু করতে হয়।

ভগবান যখন দেহধারণ করে আসেন, কদাচিৎ কখন হয়ত একটা নূতন কথা বললেন; কিন্তু সেটারও কোন দরকার নেই; কারণ হিন্দু ধর্মের জ্ঞান ভাণ্ডার যেন মহাসমুদ্র। কিন্তু ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক, ধার্মিক ও সামাজিক মঙ্গলার্থে যে তত্ত্ব আমাদের জন্য আদর্শ, সেটাকে তিনি সংস্থাপন করে দেন আমাদের পালন করার জন্য। আর অনেকদিন ধরে ধর্ম পালন করে করে যে আবর্জনাগুলো জমে গেছে, সেগুলোকে অবতার কেটে উড়িয়ে দেন। কিভাবে উড়িয়ে দেন? কখন ঠাট্টা করে, কখন হেসে, কখন মজা করে, কিংবা অনেক সময় জোর দিয়ে কোন কিছু বন্ধ করে দেন। কথামৃতে আমার এর সমস্ত কিছুরই বিবরণ পাই। আমাদের বড় বড় মহারাজদের দেখেছি, যাঁদের বেশির ভাগই গত হয়েছেন, তাঁদের নিত্য কথামৃত পাঠ করা চাই। এই জিনিসটা তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রোজ পালন করতেন। কথামৃতের এক পাতা, কি আধ পাতা পড়ছেন, আর চিন্তন করছেন।

কথামৃত কোন নাটক, নভেল নয়; এটা কোন পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক নয়। ঠাকুর আর ঠাকুরের বাণী –দুটো এক। কথামৃত পাঠ আর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অনুভব করা –দুটো এক। বাংলায় এর খুব সুন্দর শব্দ হল ‘বাঙ্ময়রূপ’। বেদকে শব্দব্রহ্মও বলা হয়েছে। সৃষ্টি কোথা থেকে হয়? শব্দব্রহ্ম থেকে। কথামৃত হল সেই শব্দব্রহ্ম। ঠাকুর আর ঠাকুরের কথা আলাদা কিছু না। কথামৃতকে নিয়ে খুব মন দিয়ে চিন্তন করতে হয়, অনুধ্যান করতে হয়, ধ্যান করতে হয়। একপাতা পড়লেন, এবার সারাদিন ওইটুকু দৃশ্যকে নিয়ে চিন্তন করছেন, তার সাথে অন্যান্য কাজকর্মও চলছে। তখন দেখবেন ঠাকুরের ভাব আপনার মধ্যে আসবে, কিন্তু এর থেকেও জরুরী, আপনার চারিদিকে দেখবেন ঠাকুরের ভাব আপনাকে ঘিরে রেখেছে। যেমন একটা ঘট পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটের ভিতরেও জল, ঘটের বাইরেও জল। যখন সাক্ষাৎ ঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে, তাঁর ভাব নিয়ে প্রতিনিয়ত থাকা হয়, তখন ঠিক এই রকমই পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া ঘটের মত হয়।

এতগুলো জরুরী কথা আমরা প্রথমে বললাম, এই যে আমরা কথামৃত পাঠ করছি, এখানে আমরা দেখব এই রকমের কয়েকটা জরুরী কথা ঠাকুর আমাদের সামনে রাখছেন। আর যেগুলো জরুরী নয়, সেগুলোকে কেটে কেটে সরিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। এই কথা কথামৃতে যে কতবার ঠাকুর বলেছেন, হিসাব করা যাবে না। **মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে পূজা করত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে, তাইতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হল**।

হিন্দুদের যে ধর্মজীবন, এটাকে আমরা কয়েক প্রকারে বিভাগ করে দিতে পারি। প্রথম আমরা দেখতে পাই, যেটা বেদের সময় থেকে চলে আসছে, আজকেও আমরা করি –যজ্ঞ আদি আর পূজা আদি। যজ্ঞ যেটা অনুষ্ঠান করা হত, সেটাই পরে পূজা রূপে নিয়ে আসা হয়েছে। যজ্ঞকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু দেখা হত, যেমন বলা হয়, *যজ্ঞর্বৈ বিষ্ণুঃ*; যজ্ঞের একটা নাম বিষ্ণু। ঠিক তেমনি যাঁর পূজা করছেন, তিনি সাক্ষাৎ সেটা। যেমন আপনি ঠাকুরের পূজা করছেন, এই পূজাটাই সাক্ষাৎ ঠাকুর; বেদে যেমন যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় হল শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং চিন্তন। এগুলো সাধনার বিধি। প্রথমটা হল যজ্ঞ ও পূজাবিধি। দ্বিতীয় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও চিন্তন। অনেক সময় বলা হয় যে, শুধু শাস্ত্র পাঠও যদি কেউ করতে থাকে, তাতেও হয়। গীতাতে বলছেন, *শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে*, আপনি শুনে যাচ্ছেন, দিনের পর দিন শ্রদ্ধা

সহকারে শুনে যাচ্ছেন, এটাও সাধনা। কিন্তু শোনার পর সেটাকে যদি চিন্তন করা হয়, ফল তখন তাড়াতাড়ি আসে।

তৃতীয় হল যেটা আমাদের খুব পরিচিত –জপধ্যান। শুধু জপ দিয়েও সিদ্ধি হয়, আর ধ্যান তো সিদ্ধির রাজমার্গ।

শেষে আসে ভক্তিভাব। আমাদের মনে সংশয় আসতে পারে এই ভেবে যে, পূজার কথা বলা হল, ওর মধ্যেই তো ভক্তি জিনিসটা লেগে আছে, আলাদা করে ভক্তি কেন বলা? পূজা মানে, যেখানে অর্চনা করে যাচ্ছেন, ওর মধ্যে বিধিবাদীয় ব্যাপারটা লেগে থাকে। পূজা না করেও ভক্তিলাভ করা যায়। আসল হল ভাব, নিজের ইষ্টের সঙ্গে এক গভীর ভাবের সম্পর্ক। ঠাকুরকে একেবারে আপন মনে করা। নিজের ইষ্টকে আপন মনে করা একদিনে হয় না। আগেকার দিনে যে বিবাহ হত, সেই বিবাহে ছেলে ও মেয়ে এক অপরকে কেউ জানতে পারত না। বিবাহের পর এক সঙ্গে বাস করতে শুরু করল, এক অপরকে নিয়ে নানান চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে, এক অপরের ভাল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে, দেখা-শোনা করছে। করতে করতে একটা বন্ধু ভাব জন্ম নেয়। বন্ধু আসে বন্ধন থেকে, যেখানে ওই ভাবটা একটা দড়ির মত গিয়ে এক অপরকে একসাথে বেঁধে নেয়।

এই যে মোটামুটি চারটে শ্রেনী বলা হল, যার মধ্যে এই জিনিসগুলো সব সময় প্রয়োজন –যজ্ঞ, পূজা, অধ্যয়ন, চিন্তন, জপধ্যান, ভক্তিভাব। যে কটি সাধনার বিধির কথা বলা হল, তার প্রত্যেকটিতে গুরু লাগে; কোথাও আচার্য রূপে, কোথাও পুরোহিত রূপে, কোথাও মন্ত্রগুরু রূপে, কোথাও দীক্ষাগুরু রূপে। যজ্ঞ করার আগে যজমানকে যজ্ঞের দীক্ষা নিতে হয়। তার মানে যিনি ঋত্বিক, যিনি যজ্ঞ করাবেন, তিনি যজমানকে ওই ব্রতে প্রতিষ্ঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যান। সাধনার প্রত্যেকটি পথে গুরুর প্রয়োজন পড়ে। ইদানিং কালে কিছু কিছু যাঁরা ধর্ম প্রচারক হয়েছেন, তাঁরা এগুলোকে মানেন না। যেমন, কিছু দিন আগে পর্যন্ত খুব নামকরা একজন ফিলজফার ছিলেন, ডাঃ জে কৃষ্ণমূর্তি; উনি আজীবন গুরুবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে গেছেন।

সেদিক থেকে যদি দেখা হয়, ভগবান বুদ্ধও এই জিনিসগুলিকে মানতেন না, যদিও তাঁকে সবাই অবতার রূপেই দেখেন। কারণ ভগবান বুদ্ধের শেষ কথা হল *আত্মদীপো ভব*, তোমার উদ্ধার তুমি নিজে করবে। গীতাতে তো ভগবান পরিষ্কার বলছেন, *উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ*, নিজের উদ্ধার নিজেকেই করতে হয়। কিন্তু কোন শিশু জন্ম নেওয়ার পর প্রথম যখন চলতে শেখে, তখন তার মা কিংবা বাবা, বা বাড়ির কেউ শিশুর একটা হাত ধরে রাখে। ধীরে ধীরে হাঁটার ব্যালেন্স শেখানো হয়। চেষ্টা করে চলতে চলতে তার পেশী তৈরী হয়। তারপর একদিন এই শিশুদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে পিটি উষা, মিলখা সিংএর বড় বড় দৌড়বিদরা। পিটি ঊষাকেও এক সময় হাত ধরে চলতে শেখানো হয়েছিল। আমরা যখন গুরুর কথা বলি তখন ঠিক এই অর্থেই বলি। ধর্মপথে আপনি প্রথম পা রাখলেন। প্রথমের দিকে আপনার হাতটা যিনি ধরে আছেন, তিনিই তো আপনার গুরু। সাইকেল শেখানোতেও একই জিনিস করা হয়। বাড়ির বড়রা কেউ বা কোন বন্ধু সাইকেলটা ধরে ধরে শেখান।

সেইজন্য কি হয়, আমাদের এই যে পরম্পরাগত বিদ্যা, পরম্পরাগত কথাগুলোর বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলেন; এনাদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। বুঝে যাই যে এনারা সবাই হলেন সেই ধরণের লোক, যারা বলে, আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। যেখানে যেখানে সম্প্রদায় বিদ্যা, এই সম্প্রদায় বিদ্যা গুরু ছাড়া কখনই হবে না। সেইজন্য উপনিষদে গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে গুরুকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। এমনকি সুফি সম্প্রদায়েও সম্প্রদায় বিদ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে, যেটাকে ওনারা সিলসিলা বলছন। যেখানেই সম্প্রদায় বিদ্যা, সেখানে গুরু ছাড়া বিদ্যা অর্জন হবে না।

গুরুর কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে, গুরু চিনব কি করে? দিল্লির লোকেরা মাঝামাঝারি। মুম্বাইর বেশির ভাগ লোকেরা ভোগবাদী, ওরা পরিষ্কার টাকা-পয়সা ছাড়া কিছু চেনে না। একজনকে গুরু করতে হয়, সামনে তাই একজন গুরুকে রেখে দেয়। দিল্লি হল এমন জায়গা যেখানে সব কিছুর গুরু পাওয়া যাবে। কেউ রেইকি শেখাচ্ছেন, কেউ ম্যাগনিটিক থেরাপি শেখাচ্ছেন, কেউ প্রাণিক হিলিং শেখাচ্ছেন, কেউ আর্ট অফ লিভিং শেখাচ্ছেন। আর সবটাতে সবাই জড়িয়ে আছে। কেউ ধ্যান শেখাচ্ছে, কেউ এটা শেখাচ্ছে, আবার কেউ কেউ আছে, যার বলছে, তারা নাকি সরাসরি নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় নিয়ে যাবে। ঠাকুর এক কথায় এনাদের কথা বলে দিয়েছেন –ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা। আপনি একজন কাউকে ধরুন, যাকে খুশি। ধরে তার শিষ্য হয়ে যান। আপনার নিষ্ঠা যদি থাকে, প্রভু আপনার জন্য অবশ্যই আরও ভাল একজন গুরু নিয়ে আসবেন। যেমন যেমন আপনি উপরে উঠবেন, তেমন তেমন তিনি ভাল গুরু এনে দেবেন। কিভাবে আমরা বুঝব যে, আমার এখন ভাল গুরুর দরকার? বা যিনি এসেছেন, তিনি একজন ভাল গুরু কিনা?

একটা ঘটনা জানি, আমার বলতেও লজ্জা করছে। আমাদের মঠে-মিশনের একজন ভাল ভক্ত, পরম্পরাগত ভাবে ওনার বংশ থেকে মঠের অনেকে সন্ন্যাসী হয়েছেন, সবাই নামকরা সন্ন্যাসী। উনি নিজে আবার একজন খুব নামকরা পপুলার বাবাজীর চেলা হয়েছেন, বাবাজী এখন মারা গেছেন। কি বলছেন উনি? – ঠাকুরের কৃপায় আমি এই অবতারকে জেনেছি, ইদানিং কালের অবতার। ধর্মমার্গে আপনার যিনি গুরু, তিনি ঠিক ঠিক শিক্ষা দিচ্ছেন কিনা, এর একটি মাত্র পরীক্ষা। সংসার থেকে আপনার মন কত সরছে। সেই মন্ত্র জপ করে, সেই ভাব অবলম্বন করে সাধনা করছেন, কিন্তু সংসার থেকে আপনার মন সরছে না; তাহলে কিছু একটা গোলমাল আছে। আর আপনার গুরু যদি কামিনী-কাঞ্চন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন, নামযশের দিকে যদি দৃষ্টি থাকে, লোকজনের আনাগোনা লেগেই আছে, বুঝতে হবে আপনার গুরুর কিছু সিরিয়াস গোলমাল আছে। যদি দেখেন, গুরু যখন চলেন তখন চারটে গাড়ি তাঁর আগে পিছনে যাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন আপনার গুরুর কিছু সিরিয়াস গোলমাল আছে। গুরুকে এমন জ্ঞান ও বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন যে, তাঁর বৈরাগ্যের তেজে তাঁর ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না, দূর থেকেই লোকেদের প্রণাম করে বেরিয়ে যেতে হবে। যেখানেই দেখবেন লোকমান্যের ঐশ্বর্য, প্রচুর লোকের আসা-যাওয়া, নামযশ, প্রণাম-প্রণামী, ভক্ত-ভক্তানি; সন্দেহ করতে হবে। এটা হল ঠিক ঠিক গুরুকে চেনার প্রথম পরীক্ষা।

দ্বিতীয়, যেখান থেকে বা যাঁর কাছ থেকে আপনি মন্ত্র নিয়েছেন, সেখান থেকে যদি আপনার মন আরও ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায়, তবেই বুঝবেন তিনি আপনার ঠিক ঠিক গুরু। আমি এখানে গুরু পাল্টানোর কথাতে বলছি না। যিনি আপনাকে সিদ্ধমন্ত্র দিয়েছেন, তিনিই আপনার জন্য সঠিক গুরু। চেলা যেমন হয়, গুরুও তেমন জোটে। আমি যদি অসাধারণ কেউ হতাম, আমি যদি সত্যিকারের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হতাম, আমি যদি ঈশ্বরজ্ঞানের জন্য ছটফট করতাম, তাহলে আমি ঠাকুরের সময়ে আসতাম, আমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য হতাম।

শিষ্য যেমন হবে, গুরুও তার তেমনটিই জুটবে। এখান থেকে শিষ্যের দায়ীত্ব শুরু হয়ে যায়, গুরুর আর কোন দায়ীত্ব নেই। এই যে ঠাকুর একলব্যের কথা বলছেন; দ্রোণাচার্যকে গুরু করেছেন, দায়ীত্ব এবার একলব্যের। যে গুরুকে পেয়েছেন, তাঁকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ মনে করা, সেভাবে তাঁর বাহ্যিক পূজা করা আর হৃদয়ে আন্তরিক পূজা করা। কারণ তিনি আপনাকে সিদ্ধমন্ত্র দিয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া মুক্তির দ্বার কেউ দেখাতে পারেন না। কিন্তু অবতার যখন আসেন, তিনি মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন। এই যে সম্প্রদায় বিদ্যার কথা বলা হল, যাকে সিলসিলা বা পরম্পরা বল হয়, এর মাধ্যমে ওই সিদ্ধমন্ত্র আসতে থাকে। কোন এক চাষী ভাল বীজ দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করে বীজ বিক্রি করল। ওই বীজ হোলসেলারদের হাত বদল হয়ে হয়ে বাজারে বীজ বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, এবার এদের কাছ থেকে চাষীরা বীজ খরিদ করবে। বীজ বিক্রেতা দুই প্রকার হয়। যে কোন ব্যবসাতেই, ব্যবসা দুই

প্রকারের হয়। এক প্রকার হল, যিনি জিনিসটাকে জানেন, আর-এক প্রকার হল, যিনি জানেন না। যিনি জানেন, তিনি আর-একটু ভাল সাহায্য করবেন। আর যদি বিক্রেতা না জানেন, তাতেও কিছু অসুবিধা হবে না, কারণ আসল জিনিসটা আপনি পেয়ে যাবেন।

উত্তরকাশীতে আমি বিভিন্ন সময়ে চারবার গিয়ে প্রত্যেকবারেই অনেকদিন ধরে বাস করেছি। উত্তরকাশী আমার খুব ভাল লাগার একটা তীর্থ। সেখানে আমাদের বেলুড় মঠের একটা কুঠিয়া আছে। কুঠিয়া বলতে একটা ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম, তখন ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, জল পর্যন্ত ছিল না। কোন পূজার ঘর নেই, কোন রান্নার ঘর নেই। নটা-সাড়ে নটায় ওখানকার অন্নক্ষেত্রে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিক্ষা দেওয়া হত। একটা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়ালে তাঁকে ডাল আর রুটি দিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের অভ্যাস নেই। আমি দুটো পয়সা দিয়ে শশা কিনে নিতাম। সেটাকে আবার তিন টুকরো করে তিন দিন ধরে রুটি ডালের সঙ্গে খেতাম, এটাই ওখানে আমাদের খাওয়া। দিনে একবারই ভিক্ষা দেওয়া হয়। যদি আপনি রাত্রে খেতে চান, তাহলে ওই রুটি থেকে বাঁচিয়ে রেখে দিতে পারেন, নুন দিয়ে রাত্রেও খেতে পারেন; সকালেও খেতে পারেন। পরে যখন গেছি তখন দেখেছি আশ্রমে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। একদিন আমি ওখানকার সবজি বাজারে পটল কিনতে গেছি। দোকানদারদের সাথে আমার পরিচিতি হয়ে গিয়েছিল। দোকানদার আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'এই পটল জিনিসটা কিভাবে খান'? খুব মজার ঘটনা। উত্তরকাশীর সবজী বিক্রেতাদের বেশির ভাগই মুসলমান। পটল বিক্রেতা আমাকে জিজ্ঞেস করছে, স্বামীজী, পটল জিনিসটাকে খায় কি করে? ওরা আমাদের স্বামীজী বলে খুব সম্মান করে।

ঘটনাটা কুড়ি বছর আগেকার, কিছুতেই আমি ভুলে যেতে পারিনি, খুব মজার লাগে। সবজী বিক্রেতা বেচারী জানে না পটল কি রকম খেতে, কিভাবে রান্না করতে হয়। আমি ওনাকে বললাম, 'অনেক ভাবে এটাকে রান্না করা যায়। আপনি ভেজে নিতে পারেন, সিদ্ধ করে চটকে নিতে পারেন, এর ঝোল করতে পারেন, ইত্যাদি'। 'খেতে কেমন লাগে'? ভাবছে করলার মত কিছু কিনা। অথচ কলকাতার বাজারে পটল কিনতে যান, পটল বিক্রেতারা পটলের ব্যাপারটা সবাই জানে। আপনাকে উল্টে বলেও দেবে যে, এই পটলটা বেশি ভাল। কিন্তু এতে আপনার কিছু যায় আসে না।

আপনার হয়ত মনে হতে পারে, গুরু আর পটলের কি সম্পর্ক? সরাসরি সম্পর্ক আছে। আপনার দরকার সিদ্ধমন্ত্র, সেই সিদ্ধমন্ত্র এসেছে সাক্ষাৎ অবতার থেকে। রীলে রেসে যেমন একটা বাটনকে সামনের দৌড়বীরের হাতে এগিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি ভাবে সিলসিলাতে এই মন্ত্র চলে আসছে। শিষ্যের কর্তব্য দুটি –প্রথম হল, ভাল করে মন্ত্রকে ভিতরে বসিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয় যিনি আপনার গুরু তাঁকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ রূপে জানা। তৃতীয়, জানবেন যে এটা সিদ্ধমন্ত্র, যেমন বীজ জীবন্ত। বীজ মাটিতে বপন করে জল, সার দিলে অঙ্কুরোদ্‌গমন হয় আর সেখান থেকে এক মহিরুহতে রূপান্তরি হয়। ঠিক তেমনি, এই সিদ্ধমন্ত্রকে আপনি আপনার হৃদয়ে বপন করবেন এবং ভক্তিরূপী বারি সিঞ্চন করবেন, তখন আপনার হৃদয়ে বৃক্ষের উদয় হবে, এটাই জ্ঞানবৃক্ষ। আপনার যে শ্রদ্ধা, আপনার যে বিশ্বাস, আপনার যে ভালবাসা; আপনি ঢেলে যাচ্ছেন। কি রকম? কঠোপনিষদে বলছেন, গর্ভিণী যেমন নিজের গর্ভের রক্ষা করে, মন্ত্রের রক্ষা ঠিক সেইভাবে করতে হয়, বাস্তবে করতে হয়। শুধু সকাল-সন্ধ্যা জপ করছি, অতটুকু না; চব্বিশ ঘন্টা ওই ভাবে থাকা।

আমরা অনেক জায়গায়, অনেকবার আলোচনা করেছি, জপ কিভাবে করতে হয়। মনে মনে, বাসে-ট্রেনে যেতে যেতে; কোথাও বেড়াতে গেলেন বা কারুর বাড়িতে গেলেন, সেখানে চুপচাপ বসে একটু জপ করে দিলেন, কেউ যেন বুঝতে না পারে। বুঝতে পারলে অনেকে মনে করবে আপনি ঢং বাজী করছেন, শুধু তাই না, আপনার ক্ষতি হতে পারে। আপনার ভক্তি বাইরে লোকেরা জানতে পারলে, আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে। ঈশ্বরের প্রতি, ইষ্টের প্রতি ভক্তিকে একেবারে গোপনে রাখতে হয়। এই দুটি

কার্য, গুরুকে সচ্চিদানন্দ রূপে জানা, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঠাকুর এতটা বলে দিলেন, যদিও আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রাই; এই পর্যায়ে আমাদের নিয়ে যেতে হবে।

আর দ্বিতীয়, গুরুর কাছ থেকে আপনার কাছে যে সিদ্ধমন্ত্র এসেছে, সেই মন্ত্রকে আপনার নিজের জন্য সিদ্ধ করে নিতে হয়। তার মানে ওই বীজকে আপনাকে এবার পত্র-পুষ্প-ফলরূপী বৃক্ষে পরিণত করতে হবে। এই কাজে আপনাকে কেউ সাহায্য করবে না, ঈশ্বর সাহায্য করবেন না, গুরু সাহায্য করবেন না। যদি কেউ মনে করে থাকেন, গুরু আমাকে কৃপা করবেন, তাহলে মনে রাখবেন, গুরু কৃপা করেন এই অর্থে –মীরাবাঈএর নামকরা ভজন, পায়ো জী ম্যায়নে রাম রতন ধন পায়ো, বস্তু অমোলিক দি মেরে সদ্‌গুরু, কৃপা কর আপনায়ো, আর বলছেন, দিন দিন বড়ত সবায়ো। অর্থ হল গুরু আমাকে যে কৃপা করে গ্রহণ করেছেন, এটাই কৃপা করা হয়েছে, নূতন কোন কৃপা করবেন না। এই যে রাম রতন, আমার ভিতর এই যে সম্পদ রাখা হল, এই সম্পদকে আমাকে বাড়াতে হবে। ঈশ্বরের নামরূপী যে বীজ ভিতরে রাখা হল, সেই বীজকে ভক্তিভাব দিয়ে প্রথমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করে জ্ঞানবৃক্ষকে দাঁড় করাতে হবে।

ঠাকুরে এখানে এটাই বলতে চাইছেন। এই যে সিদ্ধমন্ত্রগুলি আসে, এগুলো অবতার দেন, ঋষিরা দেন, বড় বড় সন্ত মহাত্মারা দেন; আর যিনি দিচ্ছেন তিনি এই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। যখন আমার আপনার কাছে আসছে, তখন তিনটি জিনিস এক হয়ে যায় –ইষ্ট, গুরু ও মন্ত্র। যিনি ইষ্ট তিনিই গুরু রূপে এসেছেন; যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুর মুখ থেকে শব্দরূপী ব্রহ্ম হয়ে আমার আপনার কাছে এসেছেন। এই তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ধরুন গুরু আপনাকে একটি মন্ত্র দিলেন –*ওঁ নমঃ শিবায়*, যিনি এই মন্ত্র দিয়েছেন, তিনি, এই মন্ত্র আর শিব এক। এটাকে কি উপদেশ রূপে বলা হচ্ছে? একেবারেই না, আপনি, আমি, সবাই এই জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করব। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*; যখন আপনি জপ করবেন তখন মন্ত্রের অর্থ চিন্তন করবেন, তখন আপনি দেখবেন আপনার ইষ্টমন্ত্র এবং আপনার ইষ্ট এক। গুরু হলেন, মাঝখানে থেকে যিনি এই দুটোকে জুড়ে দিয়েছেন। যাঁর মাধ্যমে নাম আর নামী; যিনি নামী তিনি নামরূপ হয়ে আপনার কাছে এসেছেন। যিনি শিব, তিনি *ওঁ নমঃ শিবায়* রূপে আপনার কাছে গুরুর মাধ্যমে এলেন; গুরু এই কৃপাটি করেন। এটাকে নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই, এটা আপনার ভিতরের ব্যাপার। আপনার ভক্তির নাশ কিভাবে হবে? যেমনি আপনি মন্ত্রকে শব্দ রূপে নেবেন আর গুরুকে দেখবেন মানুষ রূপে। যেমনি গুরুকে আপনি মানুষ রূপে দেখবেন –বীজ তেমনি নাশ হয়ে যাবে। ওই বীজ আর আপনাকে কোন মতে ফল দেবে না।

এই পুরো জিনিসটার বক্তব্য একটাই –কয়েকটা যে পথ বলা হল –যজ্ঞ, পূজা আদি; এগুলোর দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন আপনি যেভাবেই চালান, এগুলো করতে করতে আপনার ভিতর শ্রদ্ধা বিশ্বাস জাগবে। আপনার মধ্যে যেমন শ্রদ্ধার উদয় হবে, তেমন আপনার গুরু লাভ হবে। এরপর গুরু আপনাকে সিদ্ধমন্ত্র দিলেন। এবার আপনার যে শ্রদ্ধা, আপনার যে বিশ্বাস, আপনার যে ভক্তি; এটাকে ভিতরে যদি দাউ দাউ করে আগুন জ্বালানো হয়, তবেই এই ফল দেবে, তা নাহলে ফল দেবে না। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়; তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে। মন্ত্র, ইষ্ট, গুরু, এই তিন হলেন এক। এই এক তিন হয়ে আমাদের সামনে আসেন। মন্ত্র সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ, গুরু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই গুরু; যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই মন্ত্র। এটা আমরা অনেক বিস্তারে বললাম ঠিকই, আর আপনারা যে এটা জানেন না, তাও না। তবে কি, *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*; গীতায় ভগবান বলছেন আমার ভক্তরা কি করে; তারা আমারই কথাদি প্রসঙ্গ করে ও আমারই বিষয় পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও বিপুল আনন্দ লাভ করে। এই ধরণের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনলে পরমতত্ত্ব বিষয়ক স্মৃতি জাগ্রত হয়, একটা পরম তৃপ্তি বোধ হয়।

ঠাকুর বিশ্বাসের উপর খুব জোর দিয়ে বলছেন –বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। আমাদের সমস্ত সমস্যার মূল –বিশ্বাসের অভাব। আমাদের ঠাকুরেও বিশ্বাস নেই, গুরুতেও বিশ্বাস নেই, ফলে মন্ত্রেও বিশ্বাস হয় না। মন্ত্র আমরা যন্ত্রবৎ করে যায়, গুরুকরণ করাটা একটা হুজুগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরকে আরও দশজন মানছে, আমিও না হয় মানলাম। এটা আপনার ভিতরের ব্যাপার। যার জন্য ঠাকুর একলব্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এই দৃষ্টান্তটাও যদি মনে আমরা মনে রাখি। ঠাকুর এখানে শূদ্র শব্দটা ব্যবহার করছেন। বক্তব্যটা হল, একলব্য দ্রোণাচার্যকে গুরু রূপে পেলেন না, কারণ তিনি শূদ্র ছিলেন। ঠিক আছে, আমি তো তাঁকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছি। একলব্য দ্রোণাচার্যের মূর্তি তৈয়ার করলেন –গুরুর মূর্তিকে সামনে রেখে আমি বাণশিক্ষা করব। কবীর দাসকেও একই কারণে রামানন্দ দীক্ষা দিলেন না।

রামানন্দ রোজ ভোরবেলা স্নান করতে যেতেন। কবীর দাস ওই রকম সিঁড়িতে শুয়ে আছেন। রামানন্দের পা কবীর দাসের গায়ে লেগে যেতেই রামানন্দ 'রাম' 'রাম' করে উঠলেন। কবীর দাস তড়াং করে উঠে বলছেন, 'ব্যস্, আপনার কাছে আমি মন্ত্র পেয়ে গেলাম'। কি সাংঘাতিক বিশ্বাস হলে মানুষ ওই স্তরে যায়! এই স্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি যদি আমার থাকত, ধন্য হয়ে যেতাম আমি। মুখে আমরা সবাই বলে দিতে পারি, আমারও শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস কিছু কম নেই; তা নাহলে কি দিনের পর দিন এই ক্লাশগুলো করতে পারতাম। আমরা যতই বলি না কেন, মুখে বলা সোজা, ওই স্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস হয় না। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস অর্জনের জন্য অনেক তপস্যা করতে হয়, অনেক সাধনা করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, আমি ষোল আনা করেছি, তোরা এক আনা কর। ঠাকুরের সাধনার কথা, তপস্যার কথা যদি আমরা পড়ি, তখন বোঝা যায় আমরা কোথায় অবস্থান করছি। ঈশ্বরে বিশ্বাস, গুরুতে বিশ্বাস আর মন্ত্রে বিশ্বাস; তিনটের মধ্যে একটাতে যদি বিশ্বাস হয়ে যায়, জীবন আপনার ধন্য হয়ে গেল, এই ব্যাপারে নিশ্চিত।

ঠাকুর এটাই বলতে চাইছেন, মন্ত্রে বিশ্বাস সহজে হয় না, ইষ্টে বিশ্বাস সহজে হয় না। তবে গুরুকে আমরা সাক্ষাৎ দেখেছি। গুরুকে সাক্ষাৎ দেখেছি বলে, তাঁকে ইষ্ট রূপে দেখাটা অনেক সোজা হয়ে যায়। কারণ আমাদের মন অত্যন্ত স্থূল, স্থূল মন সূক্ষ্ম জিনিসকে ধারণা করতে পারে না। গুরুকে তাই ইষ্ট রূপে দেখাটা একটা সহজ পথ। আপনি বলতে পারেন, আমি কি করে মানব গুরু সচ্চিদানন্দ? তার উত্তরে এটাই বলা যেতে পারে –সবারই ভিতর ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, মানতে সমস্যা কোথায়? তাহলে তো সবাইকেই মানতে হবে। সে তো আরও ভাল। সবাইকে আপনি ব্রহ্ম জেনে গেলেন, সবাই সচ্চিদানন্দ জেনে গেলেন, আপনি তো আত্মজ্ঞানী হয়ে গেলেন। তখন আপনারই পূজা হবে, আপনাকে কারুর পূজা করতে হবে না। এরপর ঠাকুর ঈশানকে সাবধান করছেন।

আর তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশি মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য। যেটা আমরা প্রথমে শুরুতে বললাম, যা কিছু আবর্জনা আছে, ঠাকুর সব কেটে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাহলে কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দরকার নেই? অবশ্যই দরকার আছে। অনেক লোক আছেন, যাঁদের জন্য দরকার আছে। কিন্তু ঈশান অনেকটা এগিয়ে গেছেন, তাঁকে ঠাকুর সাবধান করছেন।

আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করছে। তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে। (সকলের হাস্য)

বাস্তবে আমরা দেখেছি, আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের গ্রামে সত্যনারায়ণ কথা হত, সেখানে পুরোহিত মশাই গড়গড় করে পড়ে যাচ্ছে, আর একটা পাতা উল্টাতে গিয়ে দুটো পাতা উল্টে দিচ্ছেন। কারণ তিনি পুরোহিত, তাঁর কাছে এটা একটা কর্ম, দুটো পয়সার জন্য। সেইজন্য বলছেন, হে ঈশান তুমি আলাদা থাক, তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তিটাকে নষ্ট করো না। এই যে আপনরা দিনের পর দিন এই ক্লাশগুলো শুনছেন, কতটা নিষ্ঠা হলে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইছেন। আপনারাও এখন আলাদা থাক।

আজই আন্দুল থেকে একজন এসেছিলেন, ভদ্রলোক আগে এখানে ক্লাশ করতেন। স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, ছেলে কলেজে পড়ে। খুব বিনয়ের সাথে বলছেন, গীতার দুটি অধ্যায় উনি মুখস্থ করেছেন, ছেলেও মুখস্থ করেছে, ওনার স্ত্রীও মুখস্থ করেছেন। আন্দুলে ওনারা আবার পাঠচক্র চালাচ্ছেন, যেখানে সপ্তাহে একদিন গীতাপাঠ ও কথামৃত পাঠ করা হয়। সবারই নিজের নিজের এলাকায় এই ধরণের পাঠচক্রের আয়োজন করা দরকার। শুনে ভাল লাগল, উনি অকপট ভাবে বলছেন, 'আপনার এখানে যে ক্লাশ করেছি, আপনার অন লাইনের ক্লাশগুলো শুনছি, যার ফলে জীবনটা আমাদের এখন অন্য রকম হয়ে গেছে'। কত উত্তম কথা। বক্তব্য এটাই, যখন আপনি বুঝে গেছেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সত্য কি, তাহলে ওই বোধটাকে মিছিমিছি নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন কেন। আপনি এখন একটা হীরে। সবজীওয়ালার কাছে নিজেকে নয় সের বেগুনের বিনিময়ে বিক্রি করতে যাবেন কেন? তাই বলে হীরে বলে বেড়ায় না যে আমার লাখ টাকা দাম। লোকেরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, আপনি একটা হীরে। পাঁচটা জিনিসের পিছনে লোকেরা যেমন দৌড়ে যাচ্ছে, হুজুগে লোকেরা যেমন মেতে যাচ্ছে; আপনার জন্য আর এসব নয়। কারণ আপনি তত্ত্ব পেয়ে গেছেন, তত্ত্বকে এমন একটা সমৃদ্ধির অবস্থায় নিয়ে চলে যান, যখন লোকেরা এসে বলবে, আপনার কাছে এলে কেমন একটা শান্তি পাই, কত উৎসাহ পাই।

এই যে ঠাকুর মজা করে বলছেন –তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে; এগুলো হল, ধর্মে যে আবর্জনাগুলো ঢুকে গেছে, সেগুলোকে ঠাকুর কিভাবে কেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। অন্যান্য ধর্মে এই জিনিসগুলিকে ঠিক করার উপায় থাকে না, কারণ একজনকে সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। যেমন বৌদ্ধ ধর্ম, চাইলেও ওরা কিছু করত পারবে না। একজনকে বসিয়ে দিলে এই সমস্যাটা হয়।

নিজের বধের জন্য একটি নরুনেই হয়। পরকে মারতেই ঢাল-তলোয়ার –শাস্ত্রাদি।

খুব নামকরা কথা। আপনার তখন মনে হতে পারে, আমি তো মন্ত্র পেয়ে গেছি, আমার কেন এত দরকার? এগুলোও দরকার, কারণ আপনার মন্ত্রে এখনও বিশ্বাস হয়নি, ইষ্টে আপনার এখনও বিশ্বাস হয়নি, গুরুই যে সচ্চিদানন্দ এতে বিশ্বাস হয়নি। যেগুলো এখন বলছেন, এগুলো সব মুখের কথা। পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন; আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওনার কাছে প্রথম শুনেছিলাম –We belive that we belive God, আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। আসলে বলতে চাইছেন, আমাদের কারুর কোন বিশ্বাস নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস হলে জীবন পাল্টে যায়। রাজার ব্যাটা ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক বছর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর অনেক কষ্ট করে অনেক বছর পর পাওয়া গেল, এই রাজার ব্যাটা। রাজা তাকে যতই বলুক, তুমি আমার সন্তান, তুমি একজন রাজপুত্র; এই জিনিসটা তাকে মানতে অনেক সময় লাগবে, চট করে কেউ মেনে নিতে পারবে না। আমরাও যে ঈশ্বরের সন্তান, এই জিনিসটাকে আমাদের মন সহজে মেনে নিতে পারে না। মেনে নেওয়ার আগে অনেক সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রচর্চা এগুলো খুব দরকার; তাই বলে দশটা শাস্ত্র জানার দরকার নেই। কিন্তু যাঁরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করার জন্য লড়াই করবেন; তাঁদের নিজের ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র ভাল করে জানতে হবে। আর এমনিতে আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন হল নিজের উত্থানের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সেখানে থাকবে না।

নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই। যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন।

ষট্‌শাস্ত্র বলতে ঠাকুর ষড়দর্শনের কথা বলছেন। হিন্দুদের বেদের উপর আধারিত ছয়টি দর্শন – সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এগুলো একটু জানতে হয়, জানার জন্য একটু পড়তে হয়, শুনতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে গেলাম, মজে গেলাম, তাহলে আসল জিনিসটাই

হারিয়ে যাবে। একটা সহজ কথা বলা যেতে পারে –ঈশ্বরের সঙ্গে একটা ভাব আরোপ করতে হবে, ওই ভাবটাকে সবার উপরে রাখতে হবে, বাকি সব কিছু তার নিচে; ওই জায়গাতে কোন কম্প্রোমাইজ হবে না। ধরুন, আমার একজন সন্ন্যাসী ভাই, তিনি হয়ত ফিজিক্সের একজন বিরাট বড় পণ্ডিত। কিন্তু তাঁর কাছে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা; এটা হল সবার উপরে, ওখানে কখন কম্প্রোমাইজ হবে না। বাকি যা কিছু, তাঁর ফিজিক্সের পাণ্ডিত্য, ফিজিক্সের নূতন নূতন গবেষণার খবরাখবর, সব এর নিচে থাকবে। লেকচার দেওয়া তার নিচে থাকবে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা, নিচে আসবে। যাঁরা গৃহস্থ ধর্ম পালন করছেন, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সবার উপরে, বাকি সব কিছু তার নিচে। আমরা বেশির ভাগ সময় এই ভুলটা করে থাকি, যেটা বেশি প্রয়োজনীয় সেটাকে উপরে না রেখে নিচে রেখে জীবনে যত অশান্তি ডেকে আনি। আপনার জীবনে কি অশান্তি আছে? একটু ভেবে দেখবেন। যদি অশান্তি থাকে, তাহলে বুঝবেন, যেটা কম প্রয়োজনীয় সেটাকে আপনি উপরে নিয়ে চলে গেছেন। যেটা প্রয়োজনীয়, সেটাকে আপনি নিচে রেখে দিয়ে অবহেলা করে যাচ্ছেন। আমি সন্ন্যাসী, দু-চারটে বই লিখেছি; দু-চারটে শাস্ত্রের ক্লাশ নিই; কিন্তু যেহেতু আমি সন্ন্যাসী, আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ঠাকুরের প্রতি ভক্তি, এটাই শেষ কথা। আগামীকাল যদি মনে হয়, বই লেখালেখির জন্য ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তির হানি হচ্ছে, আমাকে লেখালেখি বন্ধ করে দিতে হবে, ওই জায়গাতে কোন কম্প্রোমাইজ করা যাবে না।

আমাদের বিগত অধ্যক্ষ মহারাজ, স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ১৯৮৫ সাল থেকে আমি ওনার কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। বিরাট লম্বা সময় –পনের বছর ওদিকে আর এদিকে প্রায় কুড়ি বছর, প্রায় পয়ত্রিশ বছর। পয়ত্রিশ বছর আমার আচার্য ছিলেন। মাণ্ডুক্যকারিকা প্রথম ওনার কাছেই শুনেছিলাম। ওনাকে প্রায়ই একটা কথা বলতে দেখতাম, অনেককেই বলতেন, আমাকেও বলেছেন – তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধি, তোমার যত গুণ, সব যখন ঠাকুরকে সমর্পিত করে দেবে, সমর্পিত করে দিয়ে তুমি যদি কাজে নামো, দেখবে তোমার দ্বারা কত বড় বড় কাজ হবে। ওই জায়গাতে কোন কম্প্রোমাইজ চলতে পারবে না।

মহাবীর হনুমান লঙ্কায় গেছেন, লঙ্কার রাক্ষসগুলিকে মারছেন। মেঘনাদকে পাঠানো হল। মেঘনাদ এসে হনুমানকে ব্রহ্মপাশ দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন। ব্রহ্মপাশ এমন এক বন্ধন, কারুর কোন ক্ষমতা নেই ওই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবে। হনুমান অত বড় বীর, তিনিও ব্রহ্মপাশের বন্ধনে পড়ে ছটফট করে যাচ্ছেন। রাক্ষসগুলি সব মুর্খ, তারা বুঝতে পারছে না, এটা একটা দৈবী পাশ। তারা আরও দড়ি, মোটা মোটা গাছের লতা দিয়ে খুব শক্ত করে হনুমানকে বাঁধতে লাগল। ঈশ্বরীয় যে দৈবী শক্তি, এখানে ব্রহ্মপাশ, ওর উপরে যদি জাগতিক পাশ লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন ঐ দৈবী পাশ আর কাজ করবে না। এই ব্যাপারটা মহাবীর হনুমান জানেন, মেঘনাদও জানেন। মেঘনাদ অবাক হয়ে ভাবছেন, রাক্ষসরা যে হনুমানকে আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল, ব্রহ্মপাশের প্রভাব শেষ। কিন্তু এই বানরটি কেন ভাণ করছে, যেন সে এখনও বাঁধা আছে? রামায়ণের এই অংশটা খুব মজার এবং গভীর।

যখন বুঝতে পারছেন দৈবী শক্তি আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তখন নিজের বুদ্ধিকে লাগাতে যাবেন না। ব্রহ্মপাশে আবদ্ধ কাউকে যদি ওই বন্ধনের উপর আবার লতা, দড়ি দিয়ে বাঁধতে যান, দৈবী শক্তি সঙ্গে সঙ্গে নাশ হয়ে যাবে। আমিত্ব ঢুকলে ঈশ্বরীয় ভাব আর থাকবে না। স্মরণানন্দজী মহারাজ এত স্নেহ করে এই কথা সবাইকে বলতেন। তোমার যা কিছু গুণ আছে, যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি আছে; যেমন কেউ একজন ভাল গান গাইতে পারেন, প্রাণ ঢেলে ঠাকুরকে গান শুনিয়ে যান। আ-আ-আ- করে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করার দরকার নেই, যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরা ওটা করবেন, আপনার ওটা লাইন নয়। আমি সন্ন্যাসী, আমি যদি এখন প্রেমের উপন্যাস লিখি, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমাকে যদি লিখতে হয়, তাহলে ঠাকুরকে কেন্দ্রে রেখে আমার লেখা চলতে থাকবে। ঠাকুরের যে মূল কথা, মুক্তি, এই মুক্তির কথাকে সামনে রেখে যদি লিখি ততক্ষণই আমার লেখা চলবে, তা নাহলে কদিন পর আমার ভক্তিভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটাই ঠাকুর এখানে বলছেন –নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নেই।

শাস্ত্র যদি হয়, তাহলে ওটাকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক হতে হবে। আর বলছেন, যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। শ্রদ্ধা ভক্তি যদি না থাকে, শ্রদ্ধা, ভক্তি তখনই থাকবে যদি বিবেক থাকে। বিবেক না থাকলে শ্রদ্ধা, ভক্তি থাকবে না। আর এই যে বলছেন, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। আমরা তো ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের পণ্ডিতদের সামনে থেকে দেখছি। পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু ওই পাণ্ডিত্যের পিছনে কি চলছে, সেটা আর বলার উপায় নেই।

ঠাকুরের একটি মূল্যবান উপদেশ –নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন। আমাদের অনেকে প্রশ্নাদি করেন, আমি সবাইকে একটা কথাই বলি –খুব করে সাধনা করুন, ঠাকুর নিজেই আপনাকে উত্তর দিয়ে দেবেন। এটা আমার কথা না, ঠাকুর কথামৃতে কতবার এই কথা বলেছেন। যেভাবে আমি বিস্তারে ব্যাখ্যা করি, এরপর আমি আর কি ব্যাখ্যা দেব? আমার তো নূতন আর কিছু বলার নেই। এতেও যদি আপনার স্পষ্ট না হয়ে থাকে, আর কে এসে আপনাকে স্পষ্ট করবে? আপনাকে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে। কিভাবে? জপধ্যান করুন, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনিই আপনাকে ব্যাখ্যা করে দেবেন। মূল বক্তব্য সব ওখানেই –দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরের নাম সত্য, মন্ত্র সত্য, গুরুই সচ্চিদানন্দ। এই যে শব্দ, মানে মন্ত্র, এটাও দিলেন; মন্ত্রের যে অর্থ, অর্থাৎ ইষ্টের যে রূপ, সেটাও আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। বাকিটা এবার আপনাকে নিজেকে করতে হবে। সব কিছু করবেন, অফিসের কাজকর্ম করবেন, বাড়ির কাজকর্ম করবেন, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা সব হবে। কিন্তু সব কিছুর কেন্দ্র একটাই –ঈশ্বরের দিকে এগোনো।

ঈশান ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ করিবার জন্য গঙ্গাকুলে আটচালা বাঁধিতেছিলেন, এই কথা ঠাকুর শুনিয়াছেন। ঠাকুর এগিয়ে ঈশানকে প্রশ্ন করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া ঈশানের প্রতি) –হ্যাঁগা, ঘর কি তৈয়ার হয়েছে? কি জানো, ও-সব কাজ লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। বলা হয়, *শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানী*, শ্রেয়ো কাজে প্রচুর বিঘ্ন। জপধ্যান যদি করতে হয়, পাঁচজন লোককে বলে করতে নেই, চুপচাপ করতে হয়। **যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে, কোণে, বনে; কখনও মশারির ভিতর ধ্যান করে**! নিয়ম মেনে আপনি মন্দির নিয়মিত যাচ্ছেন, দু-চারজন জানতে পারছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এর বেশি যদি হয়, তখন ওটা দেখানদারি হয়ে যাবে। আপনার যা কিছু সাধনা, জপধ্যান হোক, শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক যাই হোক, ওখানে যদি দেখানদারি থাকে তাহলে আজ হোক কাল হোক আপনি অবশ্যই ফাঁসবেন। শুধু যে আপনার ভক্তি কমবে তা না, বিপদেও পড়বেন। জপধ্যান নিয়ে দেখনদারি যাদেরই আছে, তার বিপদে পড়বে।

হাজরা মহাশয়কে ঈশান মাঝে মাঝে ভাটপাড়ায় লইয়া যান। হাজরা মহাশয় শুচিবায়ের ন্যায় আচার করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ওরূপ করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) –আর দেখ, বেশি আচার করো না। একটু আগে বলা হল, কিভাবে পণ্ডিতরা এগুলো উল্টে দেয়। এবার আচারের বিরুদ্ধে বলছেন। ঠাকুর একটা গল্প বলছেন। **একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল, সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললেন, তোমার ডোল (চামড়ার মোশক) কি পরিষ্কার? ভিস্তি বললে, মহারাজ আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেকরকম ময়লা আছে। তাই বলছি, আমার ডোল থেকে জল খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহ, তোমার পেট**।

হিন্দুদের এই একটা বিরাট বড় সমস্যা, আচার-বিচার আমাদের মধ্যে এত বেশি, বিশেষ করে বৈষ্ণব পরম্পরাতে এত বেশি ঢুকে গেছে, এতে মনের প্রচুর বাজে খরচ হয়ে যায়।

ঠাকুর আবার ওই এক জায়গাতে নিয়ে আসছেন –**আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তাহলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না**।

দুটো কারণে মানুষ তীর্থ করে। একটা হল, লোকেদের মনে বিশ্বাস যে ওই তীর্থে গেলে এই পূণ্য হয়, সেই তীর্থে গেলে এই পূণ্য হয়। দ্বিতীয়, প্রয়োজন নেই, তাঁকে ভালবাসি, দেখতে এলাম এখানে তাঁর কি রূপ, যে রূপে তিনি পূজা গ্রহণ করেন, সেই রূপের একটু আস্বাদ করতে এসেছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমার যেমন হরিদ্বার যেতে খুব ভাল লাগে, পূণ্যের জন্য না। আমার মনে হয় ঠাকুরের যে নিরাকার রূপ, হরিদ্বারে তাঁর সেই নিরাকার রূপ। নিজের মত একা একা ঘুরে বেড়াই, খুব ভাল লাগে। বলছেন, তাঁর নামে বিশ্বাস হলে, তীর্থাদিরও প্রয়োজন হয় না। এরপর ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে গান করতে লাগলেন –গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি।

গান সমাপ্তের পর বলছেন –**শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) –আর কিছু খোঁচ্ মোচ্ (সন্দেহ) থাকে জিজ্ঞাসা কর**।

ঠাকুর তাঁর নামে বিশ্বাস করতে বলছেন, আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করেছি; আরও আলোচনার দরকার। ঠাকুর যে ভক্তদের ভালবাসতেন, যাঁরা খুব শ্রদ্ধা, ভক্তি নিয়ে আসতেন; ঠাকুর কথা বলার পর অনেক সময় তাঁদের বলতেন –আর কিছু খোঁচ্ মোচ্ থাকে জিজ্ঞাসা কর। আমরা প্রায়শই একটা কথা বলে থাকি –প্রশ্ন করার জন্য পাত্রতা দরকার। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে প্রশ্নগুলি করা হয়, বেশির ভাগ প্রশ্নই এলেমেলো হয়। আমার প্রিয় কাহিনী –বোকা জামাই এসেছে, শ্বশুড়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছে, অনেকক্ষণ পরে বোকা জামাই প্রশ্ন করছে –শ্বশুড় মশাই, আপনার কি বিয়ে হয়েছে? আপনারা জেনে অবাক হবেন, আমাদের বেশির ভাগই যে প্রশ্ন করা হয়, প্রায় সবই হল –শ্বশুড় মশাই, আপনার কি বিয়ে হয়েছে? পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর একটা ঘটনা শুনেছিলাম। বোধ হয় ব্যাঙ্গালোরে এই ঘটনাটি হয়েছিল। তিনি দক্ষিণ ভারত গিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি দীক্ষাদি দিয়েছেন। দীক্ষার পর ভক্তরা সবাই বসেছেন। বলা হল, প্রশ্ন করতে পারেন। একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ব্যাপারে আপনার কি মত? রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, যাঁর কাছে আপনি দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁকে কিনা প্রশ্ন করছেন, শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ব্যাপারে আপনার কি মত? এটা একটা প্রশ্ন? কারণ এদের প্রশ্ন করার পাত্রতাই তৈরী হয়নি।

খোঁচ্ মোচ্, এই যে ঠাকুর কথাটা বলছেন, এই কথা তাঁদেরকেই বলছেন, যাঁদের একটা ধারণা হয়ে গেছে, কিন্তু কোথাও কোথাও একটু সংশয়, একটু গোলমাল থেকে গেছে। আমাদের ধ্যান শব্দটা চীনে গিয়ে হল ধাং, ধাং থেকে হল চাং, চাং থেকে হল জেন্। জেন্ মাস্টারদের কথা আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন, আমাদের ধ্যান শব্দটাই হয়ে গেছে জেন্। ওদের জেন্ মাস্টারকে যদি কোন প্রশ্ন করা হয়, জেন্ মাস্টার জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি খেয়েছ'? 'হ্যাঁ আচার্য, খেয়েছি'। 'যাও থালাটা ভাল করে ধোও'। ওখানেই প্রশ্ন করার প্রবৃত্তির ইতি হয়ে গেল। অর্থটা হল, তোমার কোন পাত্রতা নেই। ঠাকুর সবারই সাথে কথা বলতেন, যার মধ্যে দেখতেন একটু আধার আছে, তাদেরকে ঠাকুর বলতেন, কোন সন্দেহ থাকলে নিরসন করে নাও।

ঈশান –আজ্ঞা, যা বলেছিলেন, বিশ্বাস। ঈশান একজন ভক্ত লোক, একেবারে নৈষ্ঠিক ভাবে সাধনা করছেন। ইদানিং কালে এ-রকম নৈষ্ঠিক সাধক দেখাও যায় না, ইদানিং কালে বেশির ভাগই হল, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঠিক বিশ্বাসের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। আর, সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। গাভী যদি বেছে বেছে খায়, তাহলে দুধ কম দেয়; সবরকম গাছ খেলে সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়। ঠাকুর গ্রামে বড় হয়েছেন, ঠাকুরের উদাহরণগুলিও গ্রামের ভাব থেকে এসেছে। শহরে যারা বড় হয়েছে,

তারা হয়ত গরুর এই দুধ দেওয়ার ব্যাপারটা জানবেও না। গরু কি খায়, কি খায় না, শহরের বেশির ভাগ লোক জানেও না। আর হিন্দু বাদে বাকিরা গরু খেতে জানে, গরু কি খায় জানেও না।

'শ্রদ্ধা' আধ্যাত্মিক সাহিত্যে খুব নামকরা শব্দ। শ্রদ্ধা শব্দ প্রচলিত হয় কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার সংলাপের মধ্য দিয়ে। নচিকেতার বাবা একটা যজ্ঞ করেছেন। যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান করা হত। ব্রাহ্মণদের যখন দান করা হবে, তখন নচিকেতা দেখেছেন তাঁর বাবার মধ্যে একটা কার্পণ্য ভাবের উদয় হয়েছে। নচিকেতা বাবার কাণ্ড কারখানা দেখছেন আর ভাবছেন, এসব কি হচ্ছে? সেখান থেকে নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা কি? যে শাস্ত্রগুলি শুনে এসেছেন, সেই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিশ্বাস। কি বিশ্বাস? শাস্ত্র যেটা বলছেন –এটাই সত্য। বেদান্তে শ্রদ্ধা জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে পরিভাষিত করা হয়েছে –*গুরু উপদিষ্ট বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা*। শ্রদ্ধা জিনিসটা তাহলে কি? *গুরু উপদিষ্ট বেদান্তবাক্যেষু*, আপনার জন্য যেটা দরকার বুঝে নিয়ে আপনার গুরু আপনাকে বেদান্ত বাক্যের যে কথাগুলো বলবেন, আপনি সেই কথাগুলোকে শতকরা একশ ভাগ বিশ্বাস করবেন, এটাই শ্রদ্ধা। শ্রীঅরবিন্দের কি ফিলজফি, এটা বলার জন্য আপনার গুরু নন।

আমি আমার সন্ন্যাস জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েক হাজার সন্ন্যাসী দেখেছি। সবার কথা আমি বলতে পারব না। তবে এত বছর ধরে যখন এখানে আছি, তখন অনেক সন্ন্যাসীদের আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁদের কথাও আমি বেশি বলতে পারব না, কিন্তু আমি নিজের কথা বলতে পারব। বিশ্বাস জিনিসটা খুব কঠিন, বিশ্বাস হওয়া খুব কঠিন। আমি এখন যে বয়সে এসে পৌঁছেছি, এই বয়সে এসে রজোগুণ এমনিতেই কমতে শুরু হয়ে যায়, শক্তিও ক্ষয় হতে শুরু হয়। এই অবস্থায় এসে যাঁর সঙ্গে এতদিন আছি, সেই ঠাকুরের উপর একটু তো বিশ্বাস ভরসা এমনিতেই হবে। বেশ কয়েকজন মহারাজদের আমি সঙ্গ করেছি, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সঙ্গ হয়েছে পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দজী, সঙ্ঘের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। সেই ১৯৭২ সাল, আমি আমার ছাত্র অবস্থা থেকে ওনাকে দেখে আসছি। পঞ্চাশ বছরের উপর হয়ে গেছে। ঠাকুরের প্রতি ওনার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা এক রকম দেখে আসছি। তখন যা দেখেছিলাম, আজকেও যখন তাকাই, হয়ত আরও গাঢ় হয়েছে; কিন্তু শুধু ওপর ওপর, শুধু কথা মাত্র; এটা আমার কোন দিন মনে হয়নি। জীবনে যদি আমার কোন খেদ থাকে, তাহলে এটাই যে, জীবনে মহারাজের মত ওই রকম ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা, ওই রকম বিশ্বাস যদি আমার হত। ঠাকুরের প্রতি একবার যখন এই স্তরের ভালবাসা এসে যায়, এই রকম বিশ্বাস যদি হয়ে যায়, অন্তর জীবনে অনেক কিছু হয়ে যাবে, বাইরের জীবনে কি হবে জানা নেই।

এই যে বলা হল, *গুরু উপদিষ্ট বেদান্তবাক্যেষু* বিশ্বাস, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখছেন, এই বিশ্বাসটাই শ্রদ্ধা। গীতাতে ভগবান শ্রদ্ধার জন্য পুরো আলাদা একটা অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ রেখে দিলেন, যেখান তিনি তিন রকম শ্রদ্ধার কথা বলছেন। আঠারোটা অধ্যায়ের মধ্যে পুরো আলাদা একটা অধ্যায় এই বিশ্বাসের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শ্রদ্ধা জিনিসটা গীতাতে অনেকবার এসেছে। এখানে আমাদের দুটো জিনিস বোঝার আছে, বুঝে নিলে পুরো জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমি কি? আমার মন যা আমি তাই। আপনি কি? আপনার মন যা, আপনি তাই। আপনার যে মন, আপনি সেটা। রাজযোগে পতঞ্জলি বলছেন –*বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র*, আমি আর আমার বৃত্তি এক, আপনি ও আপনার বৃত্তি এক। বৃত্তি মানে মনে যে চিন্তা-ভাবনার ঢেউ উঠছে, মনের যে চিন্তা-ভাবনা, সেটাই আপনি। কি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা চলে? যেটাতে বিশ্বাস আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি শরীর, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জগৎ সত্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যুর পর কিছু নেই; একটু বিচার করে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে এটাই আমাদের বিশ্বাস। এর বাইরে বাকি যা কিছু বলি, ভাবি, এগুলো কিছুই না, সব উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। সব মুখের কথা। ঠাকুর এমনি যখন টুকটাক কথা বলছেন –জল খাব, সন্দেশ খাব; এগুলো ঠাকুরের সব মুখের কথা। ঠিক তেমনি, বিষয়ী লোকেরা যখন

ঈশ্বরীয় কথা বলে, সব মুখের কথা। বিষয়ীদের কাছে জগৎ সত্য, দেহ সত্য, এই জীবনটাই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। আপনি হয়ত মনে করতে পারেন, না, আমার এ-রকম মনে হয় না। আপনি হয়ত ঠিকই বলছেন। কিন্তু যদি সামনাসামনি কথা হয়, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যদি পাঁচটা প্রশ্ন করা হয়, তার মধ্যে আপনি হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে ফেঁসে যাবেন। একটা ফেঁসে যাওয়া থেকে বোঝা যায়, আসলে আমরা সবাই বিষয়ী।

অথচ সত্য হল –সর্বভূতে তিনি আছেন; এটা ভক্তিভাব থেকে বলা হল। জ্ঞানমার্গে বলা হয় – যা কিছু দেখছি আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, আত্মা ব্যতিরেকে কিছু নেই। আপনার আধ্যাত্মিক গুরু যখন আপনাকে ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছু বলছেন, যিনিই গুরু হয়ে থাকুন আর আপনি যেখান থেকেই দীক্ষা নিয়ে থাকুন, মন্ত্র তো সিদ্ধমন্ত্র, কেউ তো বানিয়ে আপনাকে বলছেন না। যে মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে সেটাই আপনাকে বলা হয়েছে। আমার প্রিয় ঘটনা, সন্ন্যাসীরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন না। আমার সন্ন্যাসের পর, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বললাম, 'মহারাজ, আমাকে আর গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না তো'? উনি আমাকে বলছেন, 'গায়ত্রীমন্ত্রে তোমার কি সিদ্ধি হয়ে গেছে'? বেদবিহঙ্গম বইতে আমি ঘটনাটা লিখেছি। কথাটা আমাকে ভীষণ ভাবে ছুঁয়ে গেল, আমি পরিষ্কার বুঝে গেলাম, মন্ত্র মানে সিদ্ধমন্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র মানে ওই মন্ত্রে আমাকে সিদ্ধ হতে হবে। কিন্তু আমরা আমাদের আমিত্বে এত বেশি জড়িয়ে, গুরু যখন কিছু বলছেন, সেটা আমাদের মনে অতি হাল্কা একটা ছাপ ফেলছে।

আগেকার দিনে বড় বড় হাড়ি কড়াইতে রান্না করা হত। কড়াইয়ে রান্না করা হয়েছে, সেই গরম কড়াইয়ে একটু জলের ছিটা দিলে, একটু ছ্যাঁৎ শব্দ মাত্র হবে, আর কিছুই হবে না। কিন্তু পাথরেও তো দাগ পড়ে, সেইজন্য লেগে থাকতে হয়। আমরা সন্ন্যাসীরা এখানে অনেক কিছু দেখে শিখি। স্বামী সুহিতানন্দজী দেওঘর বিদ্যামন্দিরের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সকালবেলা অফিসে এসে বসতেন। বসার পর প্রথম তাঁর কাজ শুরু হবে –একটা কাগজে 'ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' লেখা দিয়ে। এটা না লিখে কোন দিন উনি কাজ শুরু করবেন না। একবার উনি অফিসে যাওয়ার পথে মাঝ রাস্তায় আমি একটা অফিসিয়াল কাগজ নিয়ে এলাম, যেটা তাঁকে এক্ষুণি সই করে দিতে হবে। ওনার এখনও দিন শুরু হয়নি, অন্য কোন কাগজও নেই। তিনি বুড়ো আঙুলের নখে নিজের পেন বার করে লিখলেন, 'ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ', তারপর কাগজে সই করলেন। এই ঘটনাগুলি যদি মনের মধ্যে ছাপ না ফেলে, আর কিসে ছাপ ফেলবে! আমি অতটা লিখি না, কিন্তু ওঁ না লিখে আমি লেখালেখি শুরু করি না। এইজন্যই সাধুসঙ্গের কথা বলা হয়।

আপনারা বলবেন, সাধু কোথায় পাব? এটাই সমস্যা। সাধুসঙ্গ করলে সাধুর যেটুকু বিষয়বুদ্ধি আছে, সেটাই লোকেদের চোখে পড়ে। আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর অনেকবার বলেছি। আমার একজন পরিচিত শ্রোতা পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর একটা ছবি আমাকে পাঠিয়েছেন। কোথায় পেয়েছেন আমি জানি না, খুব সুন্দর ছবি। ওনার মনে কোথাও ছাপ পড়েছে বলেই, ছবিটা নজরে পড়েছে। ঠাকুরের এই কথাগুলো পড়তে পড়তে শুনতে শুনতে ছাপ পড়ে। এখনও হয়ত আপনার বিশ্বাস সেভাবে আসেনি। কিন্তু এভবে হতে হতে, লেগে থাকতে থাকতে একদিন ইচ্ছা জাগবে। খারাপের দিকেও জাগে, আবার ভালর দিকেও জাগে। এসব কথা শুনতে শুনতে একটু একটু করে ভালবাসা জন্মায়। রাজযোগে এটাও বলছেন যে, চেষ্টা যার যত তীব্র, লাভও তার সেই রকম তত জোরাল। পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা আমরা অনেকবার বলেছি। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে নিত্য পাঠ অবশ্যই থাকতে হবে। নিত্য গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, কথামৃত বা আপনি যে সম্প্রদায়ের, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হলে চৈতন্যচরিতামৃত রোজ পাঠ করুন। শৈব সম্প্রদায়ের যদি হন, শিবমহাপুরাণ নিত্য পাঠ করুন। নিত্য পাঠ না হলে হবে না। আমি বড় বড় মহারাজদের দেখেছি, বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামীজী, মা, ঠাকুরের বই নিত্য পাঠ করা চাই। আর সকাল-বিকাল জপ আর পূজা। আমরা বহির্মুখী বেশি বলে কাজের ছাপটা আমাদের মধ্যে বেশি পড়ে। সেইজন্য বাহ্যিক পূজার খুব দরকার, পূজা করা হলে ছাপ পড়ে, আর জপ করলে ভিতরে ছাপ পড়ে।

সাধুসঙ্গ করছেন, নিত্য পাঠ করছেন, জপ করছেন, পূজা করছেন; এইসব করতে করতে যখন বিশ্বাস জন্মাবে, তারপর ধীরে ধীরে বিশ্বাস থেকে ভালবাসা, এবার শুরু হল আপনার যাত্রা। যত বেশি বিশ্বাস করবেন, তত ভালবাসা হবে। হয়ত কোন সাধারণ মানের ঈশ্বরীয় কথা, সেটাকেও বিশ্বাস করুন। ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন, আর, সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। ঠাকুর বলছেন, মতুয়ার বুদ্ধি যে না হয়, কোন একটা মতকে ধরে বসে আছে আর সেটাকে একমাত্র সত্য মনে করে বাকিগুলোকে নস্যাৎ করে দেওয়া, ঠাকুর এ-রকম করতে নিষেধ করছেন। সব কিছু পড়বেন, কথামৃত পড়বেন, মায়ের কথা পড়বেন, গীতা পড়বেন, ভাগবত পড়বেন, চণ্ডীও পড়বেন, মনুস্মৃতিও পড়বেন তন্ত্রও পড়বেন। এগুলো যত ভিতরে যাবে, আপনার পাত্রতা তত বেশি হবে। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, সবাই ঈশ্বরেরই কথা বলছেন।

একজন নেতা মনুস্মৃতির নিন্দা করলেন, মনুস্মৃতি পোড়ান হল, খুব ভাল। কিন্তু মনুস্মৃতির মূল বক্তব্যটা কি? মূল বক্তব্য হল, শুদ্ধ আচারাদি পালন করে, নিজেকে শুদ্ধ করে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ কর; ঈশ্বরীয় কথাই না বলছেন। শুদ্ধ আচার কিভাবে হবে? তখনকার দিনে যা যা শুদ্ধ আচার বলে মানা হচ্ছিল, মনু সেগুলোকেই বলছেন। যারা আচারবিহীন লোক তারা তাই কেন এগুলো মানবে? সেইজন্য মনুকে গালাগাল দিচ্ছে, মনুস্মৃতি পুড়িয়ে দিচ্ছে। কদিন পর হয়ত গীতা পোড়ান হবে, কিছু দিন পরে দেখব উপনিষদও পোড়ান হচ্ছে। মুসলমানরা এসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। এত পুঁথি ও বই ছিল যে, ছ-মাস ধরে সমস্ত পুঁথি, বই পুড়ল। মুসলমানরা মানে না, তাই পুড়িয়ে দিল। আমরা হিন্দুরা সেকুলার, লিবারাল; উপনিষদ পুড়িয়েছে তো কি হয়েছে।

ঠাকুরকে দেখুন কি রকম, যে যেখানে ঈশ্বরীয় কথা বলছে, আর যে কথাতে এগোবে সেটাকে বিশ্বাস করে বলছেন –

রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জের ছেলে গল্প করেছিল যে একজনের প্রতি আদেশ হল, দেখ, এই ভেড়াতেই তোর ইষ্ট দেখিস। সে তাই বিশ্বাস করলে। সর্বভূতে যে তিনিই আছেন।

ঠাকুর বিশ্বাসকে কোন স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ পরে দেখব কপট ভক্তিকে নিয়ে ঠাকুর ঠাট্টা করছেন, আগেও দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধুদের সেই স্যাঁকরার গল্প বলতে গিয়ে; কেশব কেশব, গোপাল গোপাল, হাসিঠাট্টা করে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। অথচ ভেড়াকে ইষ্ট করা একটা সাধারণ গল্প –এই ভেড়াই তোর ইষ্ট; বলছেন কে; রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জের ছেলে। ঠাকুরের কথাটা ভাল মনে হল, তাঁর কাছে মনে হল এটাও একটা পথ। গুরু যদি বলে দেন, ভেড়া তোর ইষ্ট, তখন তার ইষ্ট ভেড়াই হবে। ভেড়াকে ইষ্ট ভেবে এবার সাধনা করুন, দেখবেন আপনার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে। কিছু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই নিয়ে কত কটূ কথা বলে বেড়াচ্ছে –এদের রামকৃষ্ণ নাকি ভেড়াকে ইষ্ট করতে বলছেন। ঠাকুর কি বলতে চাইছেন দেখুন; সর্বভূতে সেই ঈশ্বরই আছেন। যে কোন লোককে ভেড়াকে ইষ্ট করতে বলা হচ্ছে না। একটা বিশেষ অবস্থায় গুরু একজন শিষ্যকে বলছেন। বিশ্বাসে কি হতে পারে এবং বিশ্বাসের জোর কেমন, এটাকে বোঝাবার জন্য এখানে এভাবে বলা হয়েছে।

আপনাদের আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমরা এই যে বর্ণনাগুলি দিচ্ছি, একটা জিনিস আপনাদের বলতে পারি, নিজের বুদ্ধি আমি কোথাও লাগাই না। বুদ্ধি লাগানোর জন্য যে বুদ্ধি লাগে, সেই বুদ্ধিই আমার নেই। শাস্ত্রে যেমনটি আছে, তেমনটি আমি ব্যাখ্যা করছি। আপনি এর মধ্য থেকে দু-চারটে কথা বিশ্বাস করে নিন আর দশ বছর সেটাকে পালন করুন, দেখুন আপনার জীবন পাল্টায় কিনা। কিভাবে একজন ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন, অতি সাধারণ মানুষ, আমাদের ক্লাশগুলো মন দিয়ে শোনেন। ওনার সাথে একজন কি নিয়ে একটা তর্ক করতে এসেছিল, উনি তাকে খুব জোর দিয়ে বলছেন –মহাশয় তিন মাস আপনি পঞ্চ মহাযজ্ঞ পালন করুন, তারপর এসে কথা বলুন। শুনে

আমি নিজেই চমকে উঠলাম। খুব ভাল লাগল, দেখুন ভদ্রলোকের বিশ্বাস কি রকম! শুধু ক্লাশগুলো শুনেছেন, তাঁকে কেউ একজন আক্রমণ করেছে, তাকে বলছেন, আপনি তিন মাস পঞ্চ মহাযজ্ঞ পালন করুন, তারপর এসে কথা বলবেন। যে কোন দু-চারটে কথা লিখে নিয়ে ঠিক করে নিন, আমি জীবনে এটা পালন করব, মরে যাব তো যাব, আমি এটাকে পালন করে যাব। দেখুন আপনার জীবন পাল্টায় কিনা। ঠাকুর বলছেন, আমার একটা কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আমার সব কথা মিথ্যা হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, বিশ্বাসে তাঁকে পাওয়া যায়। বিশ্বাস করে আপনার জীবনে যদি পরিবর্তন না আসে, তাহলে ঠাকুরের সব কথা মিথ্যা হয়ে যাবে, আপনি করে দেখুন। তবে অনেক দিন ধরে সাধনা করতে হয়, *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারসেবিতা*। আমাদের সমস্যা হল, একদিন খুব করবেন, করে দু-দিন ছেড়ে দেবেন। না, এভাবে করলে হবে না। আপনাকে টানা করতে হবে, এই জিনিসটাকে আমি করবই করব। এখান থেকে আমি বিচলিত হব না। টানা দশ বছর করে দেখুন, জীবনে কি হয়। দেখুন নিজের ভিতর থেকে আপনি একজন মহাপুরুষ হয়ে যান কিনা, বাইরের লোক নাও জানতে পারে। যদি তিনি সর্বভূতে থাকেন, আর গুরু যদি বলে দেন, এই ভেড়াই তোর ইষ্ট, তাতে কি আছে!

গুরু ভক্তকে বলে দিছিলেন যে, 'রামই ঘট্ ঘটমে লেটা'। ভক্তের অমনি বিশ্বাস। যখন একটা কুকুর রুটি মুখে করে পালাচ্ছে, তখন ভক্ত ঘিয়ের ভাঁড় হাতে করে পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে আর বলছে, 'রাম একটু দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মাখানো হয় নাই'।

পওহারী বাবার নামে এই কাহিনীটি প্রচলিত। এগুলো ভাবের, এক-এক সময় এক-একটা ভাব থাকে। এই নয় যে আপনি সব সময় কুকুর, বেড়ালের পিছনে খাবারে ঘি লাগাবার জন্য দৌড়াবেন। ঠাকুরও ছারপোকা মারতেন, আরশোলাকে বাইরে এনে মারতেন। নিজের জীবন চালানোর জন্য কিছু জিনিস করা দরকার। এটা একটা ভাব, এই কাহিনীটা পওহারী বাবাকে নিয়ে, তখন তাঁর এই ভাব ছিল। চোর কিছু জিনিস নিয়ে পালাচ্ছে, উনিও চোরের পিছন পিছন দৌড়াচ্ছেন, ভাই এই এই জিনিসগুলো থেকে গেছে, এগুলোও নিয়ে যাও। সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁরা পারবেন না; কিন্তু ভাবটা দেখতে হয়।

আচ্ছা, কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বলত 'ওঁ কৃষ্ণ! ওঁ রাম! এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। এটি একটি প্রচলিত কথা।

আবার আমাকে কৃষ্ণকিশোর চুপিচুপি বলত, 'বলো না কারুকে, আমার সন্ধ্যা-টন্ধ্যা ভাল লাগে না'! এই কথাটার একটা বিশেষ দাম আছে এই জন্য যে, যখন এই জিনিসগুলো ঘটছে, তখন সন্ধ্যা-আহ্নিক ব্রাহ্মণদের জন্য জরুরী ছিল। ইদানিং কালের ব্রাহ্মণরা তো সন্ধ্যাদি করা ভুলেই গেছে।

আমারও ওইরকম হয়! মা দেখিয়ে দেন যে, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। ঠাকুরের একটি কথা যদি মিথ্যা হয়, সব কথাই মিথ্যা হয়ে যাবে। মা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তিনিই সব হয়েছেন; ঠাকুর দেখছেন, তিনিই সব হয়েছেন। **বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আসছি, পঞ্চবটীর দিকে, দেখি, সঙ্গে একটা কুকুর আসছে, তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান**। এর কি ব্যাখ্যা করব! চুপ করে বুঁদ হয়ে বসে যাওয়ার ছাড়া আর কি করার আছে। এই দৃশ্যটা যদি একটু চিন্তন করতে পারা যায় –দক্ষিণেশ্বর মন্দির, গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, ঝাউতলায় ঠাকুর বাহ্য করতে গেছেন। তখন ঠাকুরের মনে এই ভাব চলছে –মায়ই সব হয়ে রয়েছেন। ঠাকুর দেখছেন সঙ্গে একটা কুকুর আসছে, ওই ভাবের অবস্থায় তিনি দেখছেন, কুকুরটাও তিনিই হয়েছেন। মা যদি কুকুরকে দিয়ে কিছু বলান। কুকুর হয়ত ঘেউ ঘেউ করবে, তাতেই ঠাকুর পরিষ্কার বুঝে যাবেন, মা কি বলতে চাইছেন।

গীতাতে সমদর্শির কথা বলা হয়েছে, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবী হস্তিনী*, এখানে তা নয়; এটা পুরো একটা অন্য জিনিস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব মা নিজে হয়েছেন। যেখান থেকে যা কথা আসবে, স্বাভাবিক ভাবে মায়ের কাছ থেকেই আসবে। মার কাছ থেকে যে কথাগুলো আসবে, কথাগুলো বেদবাক্যই হবে। এসব ভাবলে আমাদের মাথা কাজ করা বন্ধ করে দেবে।

তাই তুমি যা বললে; বিশ্বাসে সব মিলে।

ঠাকুর ঈশানকে বোঝাতে চাইছেন, বিশ্বাস কত জরুরী। ঠাকুর এই গল্প, সেই গল্প বলে বলে মঞ্চ তৈরী করে দিলেন। তারপর দুম্ করে সেখানে নিজের কথা বলতে লাগলেন। ওই প্রস্তুতিটুকু না নিলেও কিছু হত না। রাজা যখন চলে, তখন তার সেনাপতি, অঙ্গ রক্ষক, মন্ত্রী, পার্ষদরা সবাই চলে। তাতে রাজার ঐশ্বর্য বাড়ে। চাইলে রাজা ছদ্মবেশে একাও যেতে পারে। ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন, তাঁর সব কথাই ঈশ্বরীয় কথা। তাঁর ঐশ্বর্য বাড়ানোর যে উদ্যোগ হচ্ছে, যখন অন্য জিনিসগুলো বলা হচ্ছে, অন্য কাহিনী বলা হচ্ছে, সাথে উদাহরণও দেওয়া হচ্ছে; তখন কথার ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। কথার ঐশ্বর্য যখন বেড়ে যায়, তখন যিনি শুনছেন, তাঁর ভিতর কথাগুলো ঠিক ঠিক প্রবেশ করে। আমরাও যখন ঠাকুরের কথা ব্যাখ্যা করছি, তখন সেখানে আরও চারটে কথা নিয়ে আসি। এই চারটে কথা নিয়ে আসা হয়, যাতে রাজার ঐশ্বর্য, কথার ঐশ্বর্য শ্রোতার মধ্যে প্রবেশ করে। ঈশান সেই পুরানো চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কথা বলছেন।

ঈশান –আমরা কিন্তু গৃহে রয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তা হলেই বা, তাঁর কৃপা হলে অসম্ভব সম্ভব হয়। রামপ্রসাদ গান গেয়েছিল, ‘এই সংসার ধোঁকার টাটি’। তাঁকে একজন উত্তর দিছিল আর-একটি গানের ছলে :

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি
জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।

এই গান সম্পর্কে একটা মজার কথা আপনাদের বলি। আমাদের শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের অনেকদিন, প্রায় দীর্ঘ বারো বছর বা তারও বেশি বছর সেবা করেছিলেন। প্রেমেশানন্দজী আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একজন খুব উচ্চমানের সাধু, সম্মানীত সাধু ছিলেন। প্রেমেশ মহারাজ অনেক গান রচনা করেছিলেন। সুহিতানন্দজী গান গাইতে পারতেন না। প্রেমেশানন্দজী সুহিতানন্দজীকে বলতেন, ‘দেখ্, তুই গান পারিস না, ঠিক আছে, কিন্তু গানগুলি পড়বি’। এইজন্য বলেছিলেন, প্রেমেশ মহারাজ গান রচনার সময় যে ভাবের অবস্থায় থাকতেন, ওই ভাবের সঙ্গে স্বামী সুহিতানন্দজী যাতে এক হতে পারেন। কিছু মনে করবেন না, আমাকে ক্ষমা করবেন; ভক্তিমূলক গান যখন করা হয়, তখন গায়ক যে আ আ আ, ই ই ই করে, এগুলোকে আমার অত্যন্ত কদর্য জিনিস বলে মনে হয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, স্বামী আত্মস্থানন্দজী তখন প্রেসিডেন্ট, তিনি একজনকে মন্দিরে এই ভাবে গান করছিলেন দেখে রীতিমত তিরস্কার করে বলে দিলেন –যেমনটি আছে তেমনটি গান কর। গান ভাবের জিনিস, কিন্তু যখন সব আ আ আ করতে শুরু করে, তখন গানের যে নিজস্ব একটা ঐশ্বর্য আছে, সেটা হারিয়ে যায়। যেটার জন্য গানের সৃষ্টি হয়ে সেটাই মাঝখান থেকে যদি হারিয়ে গেল, তাহলে ভক্তিমূলক গানের রইল কি।

যাঁরা এভাবে গান করে গানের ভাবকে নষ্ট করে দেন, তাঁদের আপনি বোঝাতে গেলে বুঝবেন না। নামকরা গায়করা গান করার সময় তাঁদের ওস্তাদি দেখান, কায়দা দেখান, সেখানেও ভক্তিভাবকে অনেক সময় আমাদের স্পর্শ করে না। আমার আপনার তো নুরুন হলেই হয়ে যাবে। আমি অনেক

মহারাজদের জানি যাঁরা খুব ভাল গান জানেন, কিন্তু কোন দিন গাইবেন না; নিজের মধ্যে যখন ডুবে থাকবেন, তখন একটু যা গুন গুন করে গান করবেন। সন্ন্যাসীরা, সাধুরা যে কতটা চাপা হন, একটা সত্যিকারের ঘটনা না বললে আপনারা বুঝতে পারবেন না।

শিলং রামকৃষ্ণ মঠে একজন মহারাজ ছিলেন, এক সময় খুব ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। কিন্তু পরে উনি বাজানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একবার ভারতের একজন খুব নামকরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পীকে অনেক কষ্টে শিলং মঠে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওনার সাথে যিনি পাখোয়াজ বাজাবেন উনি তখনও এসে পৌঁছাননি। পাখোয়াজটা বেঁধে দেওয়ার জন্য মহারাজকে বলা হল। উনি রাজি হচ্ছিলেন না, তাও গেলেন। মহারাজ পাখোয়াজে প্রথম একটা চাটি মারতেই ওই বিখ্যাত গায়ক চমকে উঠলেন। ওনার সাথে পাখোয়াজ বাজানো যাঁর কথা, উনি তাঁকে আসতে বারণ করে দিলেন। 'মহারাজ আপনিই আমার সঙ্গে বাজাবেন'। মহারাজ তাঁর অনুরোধে বাজাতে শুরু করলেন, আর সে কি উচ্চমানের। ওস্তাদজী বলছেন, 'মহারাজ আপনি যতদিন এই সেণ্টারে আছেন, আমি প্রত্যেক বছর এখানে আসব, আর যদি আপনি রাজি থাকেন, আপনাকে আমার গানের সাথে পাখোয়াজ বাজাতে অনুরোধ করব'।

আমি অনেকবার আপনাদের রাম মহারাজের কথা বলেছি। রাম মহারাজও খুব উচ্চমানের পাখোয়াজ বাজাতেন। কিন্তু কোন দিন কোথাও জনসমক্ষে বাজালেন না। এক আধ দিন, স্কুলে আরতির সময় পাখোয়াজ তুলে নিতেন। বাজনা শুনে পরিষ্কার বোঝা যেত রাম মহারাজ বাজাচ্ছেন।

এই যে এখানে ঠাকুর গানের কথা আনছেন, আসলে গানের ভাব জিনিসটাকে আনছেন। রামপ্রসাদ যখন বলছেন ধোঁকার টাটি, অর্থাৎ 'নেতি নেতি' আর মজার কুটি, অর্থাৎ 'ইতি ইতি'। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –

কিন্তু আগে নির্জনে গোপনে সাধন-ভজন করে, ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকলে 'জনক রাজা' হওয়া যায়। তা না হলে কেমন করে হবে?

যখনই ঠাকুর 'সংসারে হবে না কেন' বলবেন, বলেই ঠাকুর তখন এই যে একটা 'কিন্তু' লাগিয়ে দিয়ে কিছু শর্ত চাপিয়ে দেন, এরপর সংসারে থেকে কি করে সহজে হবে একটু ভেবে দেখতে হবে। কেন নির্জনে, গোপনে সাধন-ভজন করতে হবে? ওই বিশ্বাসটুকু আনার জন্য, ওই শ্রদ্ধাটুকু আনার জন্য, ওই ভালবাসাটুকু আনার জন্য। একবার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা এসে গেলে; তখন তিনি আর আপনাকে ছাড়বেন না। কারুর সাথে একটা ভাল সম্পর্ক তৈরী করতে গেলে, ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক হোক, দুই বন্ধুর সম্পর্ক হোক, কাজে কর্মের সম্পর্ক হোক, প্রথমের দিকে অনেক খাটাখাটনি করতে হয়। একবার যখন সম্পর্কটা তৈরী হয়ে যায়; তারপর বেশি খাটতে হয় না। আপনি যেখানে কাজ করছেন, আপনার উপর মহলের লোকেরা যদি একবার বুঝে যান, আপনি সত্যিকারের একজন কাজের লোক, আপনাকে আর ওরা ছাড়তে চাইবে না। একবার যখন এই ভালবাসার বিশ্বাস হয়ে যায়, এই জিনিসটা আপনাকে আর ছাড়বে না। তখন মীরাবাঈয়ের সেই গানের কথায় বলা যেতে পারে, দিন দিন বড়ত সহাই, দিন দিন ভালবাসাটা বাড়তেই থাকে।

ঠাকুর এখানেও বলছেন, ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকলে জনক রাজা হওয়া যায়। এই ঈশ্বরলাভ বলতে ঠাকুর ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালবাসার অর্থে বলছেন। কারণ যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে তিনি আর সংসার করবেনই বা কেন। জনক রাজাকে এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রেখে বলছেন, সংসারেও থাকা যায়, আধ্যাত্মিক জীবনেও থাকা যায়।

দেখ না, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই রয়েছে, কিন্তু শিব কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম করে নৃত্য করছেন।

আমরা সরস্বতীর পূজা করি। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, মা সরস্বতীর এক কণা জ্ঞানের আলো পেলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। মা লক্ষ্মীর সামান্য একটু কৃপা কটাক্ষ পেলে, বিলে গেটস্, টাটা, বিড়লা, আম্বানি হয়ে যাবে। অন্য দিকে গণেশ সিদ্ধিদাতা, কার্তিক অজেয়, অর্থাৎ সেই শক্তির ধারক ও বাহক। চারজনের সবাই শিবের সঙ্গে আছেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকের বাইরে এর বেশি আমরা আর কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বেশ কয়েকজন ব্রহ্মচারী জয়েন করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বিদেশে নামী দামী ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন। একজন ব্রহ্মচারী এখানে আসার আগে ওয়শিংটন ইউনিভার্সিটিতে কম্প্যুটার পড়াতেন। কেউ অক্সফোর্ডে, কেউ বাফেলোতে পড়াতেন। যে জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের ভারতের মত দেশের লোকেরা পাগলের মত ছটফট করছে, যদি ওখানে পৌঁছাতে পারি। আমাদের ব্রহ্মচারীরা ওখানে পৌঁছে সব কিছু পেয়ে সন্ন্যাসীর পথে চলে এলেন। অর্থ হল, আধ্যাত্মিক জীবন অনেক উঁচু। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই আছে, ভরা পুরা পরিবার; অঙ্গনে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। কিন্তু সব ছেড়ে শিব জ্ঞান ভক্তি নিয়ে কখন সমাধিস্থ, কখন রাম রাম করে নৃত্য করছেন।

আমরা যদি একটু পিছনের দিকে আমাদের পূর্বজদের কথা মনে করি; ঠাকুরদা, দাদুর কথা মনে করি; দেখা যাবে এনারা সবাই এই রকমই ছিলেন। বাড়িতে সবই আছে, হয়ত জমিদার, অনেকে রাজবাড়ির থাকতে পারেন, কিংবা সাধারণ বাড়ির থাকতে পারেন। সবাই যে যার নিজের মত কাজ নিয়ে থাকতেন। আজকে যে নারী, পুরুষ নিয়ে কত ঝামেলা, তখনকার দিনে ওনারা এই জিনিস কল্পনাই করতে পারতেন না। কিন্তু সবাই যে যার নিজের কাজ করছেন। মায়েরা ভিতর সামলাচ্ছেন, পুরুষরা বাইরেরটা সামলাচ্ছেন। আর এদের মধ্যে যাঁরা একটু ভক্তিমান, একটু ভক্তি ভাব যাঁদের আছে; তাঁদের জন্য ওটাই কাজ, ওটাই জীবন, ওটাতেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। আর ওনাকে কেন্দ্র করে বাকি সব চলছে। আজকে ঠিক উলটো হয়ে গেছে। আমাদের ভোগ জীবনকে কেন্দ্র করে বাকি সব কিছু চলছে। আগেকার দিনে ভক্তিকে কেন্দ্র করে বাকি সব কিছু হত। পাল্টান, পাল্টান, এখনও সময় আছে, যদি বাঁচতে চান, আপনজনকে বাঁচাতে চান, আপনার সমাজ, আপনার দেশ, আপনার ধর্মকে যদি বাঁচাতে চান, জীবনটা পাল্টান। এই যে ঠাকুরের কথা –যার বাড়িতে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবাই আছেন, তিনি সমাধিস্থ, তিনি আনন্দে রাম রাম করে নৃত্য করছেন।

এই হল দেখার –বিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসা, ভালবাসা থেকে ভাব ভক্তি। ভাব ভক্তি হওয়ার পর সব কিছুই আছে, কিন্তু তাও ঈশ্বরীয় ভাবে ডুবে আছে, কিছু নেই তাও ডুবে আছে। সব আছে তাতেও রাম রাম করে নৃত্য করছে। কিছু নেই, তাতেও রাম রাম করে নৃত্য করছে। এখানে এসে এই পরিচ্ছদে এখানেই শেষ হয়ে যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে –২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩

পরের দিন -২৩শে সেপ্টেম্বর (পৃঃ ২৭৪)। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। রাখাল, মাস্টার, রাম, হাজরা প্রভৃতি ভক্তগণ আছেন। তারক অর্থাৎ পরবর্তি কালের স্বামী শিবানন্দের কথা বলছেন –**তারকেরও অবস্থা অন্তর্মুখ; তিনি লোকের সঙ্গে আজকাল বেশি কথা কন না**। ঠাকুর একজনকে নরেন্দ্রের কথা বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (একজন ভক্তের প্রতি) –নরেন্দ্র তোমাকেও লাইক করে না। ঠাকুর কয়েকটা ইংরাজী শব্দ জানতেন, তার মধ্যে 'লাইক' একটা শব্দ। ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্রের এত গুরুত্ব যে, তিনি নরেন লাইক করে না বলে মজা করে সাবধান করে দিচ্ছেন। **(মাস্টারের প্রতি) কই, অধরের বাড়ি নরেন্দ্র এল না কেন?**

একাধারে নরেন্দ্রের কত গুণ! গাইতে, বাজাতে, লেখাপড়ায়! আবার অন্য জায়গায় বলবেন, আবার জিতেন্দ্রিয়, বলে বিয়ে করবে না। সংসারীরা যেমন সন্তান, নাতির প্রশংসা করে; –গাইতে, বাজাতে, লেখাপড়ায়, খেলাধূলায় খুব ওস্তাদ। **সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে এখান থেকে যাচ্ছিল; কাপ্তেন অনেক করে বললে, তার কাছে বসতে। নরেন্দ্র ওধারে গিয়ে বসল; কাপ্তেনের দিকে ফিরে চেয়েও দেখলে না।**

সাধু-সন্ন্যাসীদের এই একটা জিনিস দেখেছি –তেজ। তেজ যদি না থাকে, কিসের সাধু। এই তেজে ক্রোধ থাকে না, তেজে ক্ষমা ভাব থাকে, কিন্তু তেজ; এটা একটা আধ্যাত্মিক গুণ। গীতার ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে আচার্য ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কথা বলছেন –*স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন*, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ এই ছটি গুণ ঈশ্বরের মধ্যে সদা বর্তমান। তেজ ঈশ্বরের গুণ, তেজ না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবন কখনই সম্ভব না। হ্যাঁ মহারাজ যা বলেছেন, তাই হবে; আচ্ছা, মহারাজ দুটি প্রসাদ পাওয়া যাবে? এই মিনমিনে স্বভাব যাদের, তাদের এখনও সময় লাগবে। জীবনে কিছু যদি না পারেন, তেজটাকে বাড়ান। চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে, স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন, প্রথমেই সম্বোধন করে বললেন, Sisters and brothers of America, করতালিতে সমস্ত হল ফেটে পড়ল। এই হল তেজ, ওজঃ শক্তির প্রকাশ। ভক্তি নিজের জায়গায় ঠিক আছে, স্বামীজী তো ভক্তি ভাবে টগবগ করতেন।

শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? সাধন-ভজন চাই। সাধন-ভজন না থাকলে তেজও আসে না, কিছুই আসে না। **ইঁদেশের গৌরী –পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শাক্ত-সাধক, মার ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে যেত! মাঝে মাঝে বলত, 'হা রে রে, রে নিরালম্ব লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্'? তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত। আমিও আবিষ্ট হয়ে যেতুম। আমার খাওয়া-দাওয়া দেখে বলত, তুমি ভৈরবী নিয়ে সাধন করেছ?** আমার এই জিনিসটার অর্থ জানা নেই। ঠাকুর এক জায়গায় বর্ণনা করছেন – ঠাকুরের কাছে প্রথমবার এসে গৌরী পণ্ডিত শুরু করেছেন, হা রে রে। ঠাকুরের ভিতর থেকে কি একটা হতেই তিনি আরও জোরে হা রে রে করতে শুরু করেছেন। পণ্ডিত আরও জোরে করছে, ও যত জোরে করছে, ঠাকুর তার থেকেও জোরে করতে লাগলেন। হতে হতে ঠাকুরের জোর এত বেড়ে গেল যে, আস্তে আস্তে পণ্ডিতের আওয়াজটাও শান্ত হয়ে গেল। পণ্ডিতের একটা যোগশক্তি ছিল।

একজন কর্তাভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা করলে। নিরাকার অর্থাৎ নীরের আকার। গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল।

ঠাকুর কর্তাভজাদের পছন্দ করতেন না। কর্তাভজারা 'নিরকার' একটা শব্দ শুনে নিয়েছে মাত্র, কিন্তু বোঝার কোন চেষ্টা নেই। বেশির ভাগ ভক্তদের দেখি, কেউ অমুকের বক্তৃতা শুনছে, কেউ তমুকের বক্তৃতা শুনছে; কি শুনছে, কি বুঝছে, শব্দগুলোর অর্থ বোঝে না। তারপর হঠাৎ একদিন এসে প্রশ্ন করবে –ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করুন, জানুন জিনিসটা কি। ঠাকুর গৌরী পণ্ডিতের কথা বলে যাচ্ছেন।

প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া শাক্ত ছিল; তুলসীপাতা দুটো কাঠি দিয়ে তুলত –ছুঁত না (সকলের হাস্য) –তারপর বাড়ি গেল; বাড়ি থেকে ফিরে এসে আর অমন করে নাই। কাঠি দিয়ে তুলসীপাতা তোলা, ভাবতে পারছেন, গোঁড়ামি কোন পর্যায়ে ছিল ভারতে! চাইনিজদের চপস্টিক দিয়ে ভাত খাওয়ার মত। বর্তমান কালে যে বৈষ্ণবরা আছে, সব ওই রকম। একদিন আমি মজা করে বলছিলাম, চাইলেই ঠাকুরের দর্শন পাবেন না, ঠাকুর খুব ব্যস্ত। কারণ এই গোঁড়াদের জন্য তিনি এখন নরক সৃষ্টি করছেন। বাড়িতে গিয়ে পণ্ডিতের কিছু একটা হয়েছিল, বা ঠাকুরই হয়ত তাঁর মন পাল্টে দিয়েছিলেন।

আমি একটি তুলসীগাছ কালীঘরের সম্মুখে পুঁতেছিলাম; মরে গেল। পাঁঠা বলি যেখানে হয়, সেখানে নাকি হয় না। বলা খুব মুশকিল, এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে। কেউ লাগিয়ে দেখতে পারেন, তবে এখন তো পাঁঠা বলি বন্ধ হয়ে গেছে।

গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা করত। 'এ-ওই'! ব্যাখ্যা করত –এ শিষ্য! ওই তোমার ইষ্ট! আবার রাবণের দশমুণ্ড বলত, দশ ইন্দ্রিয়। তমোগুণে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণে রাবণ, সত্ত্বগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।

এগুলো খুব প্রচলিত। যেমন কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধকেও তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঠাকুরের এই কথাগুলি যখন শুনি, কেমন জীবন্ত মনে হয়। গীতার প্রথম অধ্যায়কে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে পুরো বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে সব যোদ্ধারা মরার জন্য বা মারার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে, গীতা তখন কেমন জীবন্ত মনে হয়। ওটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, শুধু দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে রাখা হত তখন কেমন একটা দার্শনিক দার্শনিক ভাব মনে হত, জীবন্ত মনে হত না। ঠাকুরের কথামৃতে এই যে নানা রকম জিনিসকে রাখা হচ্ছে –এই প্রসাদ এলো না, খাবার কোথায় যাচ্ছে, ঝাউতলায় বাহ্যে যাবেন, এঁর কথা বলছেন, তাঁর কথা বলছেন, এঁকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে সম্মান দিচ্ছেন আর সব কিছুর মাঝখানে ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বরের যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা সত্য, আমাদের ঠাকুরকে তখন কেমন যেন জীবন্ত মনে হয়। আর এনাদের মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। হে ভক্তবৃন্দ! ঈশ্বরের বিশ্বাস রাখুন, তিনিই সত্য, তিনিই নিত্য; বাকি সব আসছে যাচ্ছে। এই বোধ হলেই জীবন্ত মনে হবে।

দুপুর হয়ে গেছে। **ঠাকুর মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন**। আপনাদেরও বলি, দুপুরে যাঁরা খাওয়া-দাওয়া করেন, সুযোগ থাকলে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেবেন। আজকাল চারিদিকে এত দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, লোকেরা বিশ্রাম নিতে পারেন না, সম্ভব নয়। তবে যাদের সম্ভব, তারা অবশ্যই খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেবেন, এতে শক্তি অনেক বেড়ে যায়।

কলকাতা থেকে অনেকে এসেছেন। রাম, তারক (স্বামী শিবানন্দ) এনারাও আছেন। **রাম বলিতেছেন, 'আমরা খোল বাজনা শিখিতেছি'**। এগুলো কথার কথা। শ্রীশ্রীমায়ের কথাতে দেখবেন, যাঁরা স্মৃতিচারণ করেছেন, তাঁরা এই ধরণের কথা অনেক বেশি বলেছেন। কথামৃতে এই ধরণের কথা বেশি নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তাতে সেই সময়কার একটা জীবন্ত ছবি পাওয়া যায়। আর দেখা যায়, একটু অন্য ধরণের কথা হলেই সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর এমন এমন মন্তব্য দিয় প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে দিতেন, যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) –নিত্যগোপাল বাজাতে শিখেছে?

রাম –না, সে অমনি একটু সামান্য বাজাতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তারক?

রাম –সে অনেকটা পারবে। এরপর খুব মূল্যবান কথা আসছে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাহলে আর অত মুখ নিচু করে থাকবে না; একটা দিকে খুব মন দিলে ঈশ্বরের দিকে তত থাকে না। কোন একটা জিনিসে আপনি যদি খুব বেশি মন দিয়ে দেন, তাহলে ঈশ্বরের দিকে মন থাকবে না। গৃহস্থদের জন্য, সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য কথামৃতের এটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান কথা।

কথামৃত আমি নিয়মিত পড়ি। প্রথমের দিকে এই কথাটা আমাকে সেভাবে স্পর্শ করেনি। পরে পরে বুদ্ধিটা একটু পরিপক্ক হল, তখন কথাটা আমাকে স্পর্শ করল। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে

গিয়ে আমরা দেখলাম, কিভাবে আমাদের কিছু স্বামীজী বা মহারাজরা যাঁরা বেশি বেশি বক্তৃতা আদি দিয়ে বেড়ান বা প্রচুর কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন, দেখলাম কিভাবে তাঁদের জীবনটা একটু যেন কেমন এলেমেলো হয়ে গেল। অনেকে পরে রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে দিলেন, বা সঙ্ঘ ছেড়ে দিতে হল। সব কিছুর পিছনে কারণ একটাই –কোন একটা দিকে মন বেশি চলে গেছে। সবারই জন্য এটা একটা খুব দরকারী কথা।

মন হল আমাদের একমাত্র পুঁজি। আপনার জীবনে যাই থাকুক, টাকা-পয়সা, ক্ষমতা, পরিবার, সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধব, কোন কিছুই আপনার কাজে লাগবে না। কাজে লাগবে একমাত্র আপনার নিজের মন। রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, তিনি চারবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আমেরিকার ইতিহাসে এতবার কেউ প্রেসিডেন্ট হননি। চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ওনার পর থেকে নিয়ম হয়ে গেলে, দু-বারের বেশি কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। চারবার তিনি দেশের কর্ণধার নির্বাচিত হয়েছিলেন, অথচ পোলিওর জন্য ওনার দুটো পা অকেজো ছিল। আমেরিকার এত নামকরা প্রেসিডেন্ট, অথচ পা দুটো অকেজো। একটা স্টিক নিয়ে উনি খুব কায়দা করে হাঁটাচলা করতেন, কখন হুইলচেয়ার ব্যবহার করতেন। বর্তমান কালে বিশ্বের এতবড় নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী স্টফেন হকিং, ওনার পুরো শরীরটাই অবশ। অর্থ হল শরীর থেকেও বেশি দাম মনের।

এই যে দুটো ঘটনা বলা হল, এটাই দেখাচ্ছে –মনই সব কিছু। আমাদের যত ধর্মশাস্ত্র আছে, শাস্ত্রের যত ব্যাখ্যাগুলো আছে; সবাই ঘুরে ফিরে মনের কথাই বলতে চাইছেন। গীতাতে যে কথাগুলো বলছেন, ঘুরিয়ে আসলে মন নামক বস্তুটা যে কত জরুরী, সেটাই বলতে চাইছেন। এর মধ্যে যেটা আশ্চর্যের, সংসারে যত কাজ, যত রকম দৈনন্দিন কাজ আমাদের করতে হয়; শুনলে অবাক লাগবে – একটু যদি সংসারে মন দেওয়া যায়, তাতেই সংসারের সব কাজ হয়ে যায়, এটাকে বলে –অটোমেটন। আমাদের অনেকগুলো কাজ, তাতে আমাদের মনের যে শক্তি অপচয় হয়, তার বেশির ভাগ অপচয়টাই হয় কাজ বাছাই করতে গিয়ে। যখনই আমরা বাছাবাছি করব, তখনই আমাদের মনের শক্তি বড্ড বেশি অপচয় হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি যদি ভাবতে থাকেন, আজ কি খাব, কি রান্না হবে; এতে মনের অনেক অপচয় হবে।

আমরা সন্ন্যাসীরা মজা করে বলি, আমরা গরু-মোষের মত হয়ে গেছি। আমাদের টাইম ঠিক করা আছে, খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল, খাওয়ার ঘরে চলে গেলাম, যা দিল চুপচাপ খেয়ে নিলাম, খাওয়া শেষ ঘরে চলে এলাম। কোন চয়েস নেই। আমাদের শরীরটা একটা যান্ত্রিক পুতুলের মত হয়ে গেছে। খাবার সময় হল, যা দেওয়া হল, খেয়ে বেরিয়ে এলাম। ফলে কি হয়, মনের অপচয় হয় না। আমাদের মঠের যিনি ভাণ্ডারী মহারাজ হন, তাঁর ওটা পুরো বাঁধা আছে –আজকে এই সবজী, কাল এই সবজী; যেমন যেমন মরসুম পাল্টায় তেমন তেমন সবজী পাল্টায়, তাই তাঁকেও বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। যে রাধুনী, তাকেও বেশি মাথা খাটাতে হয় না। তেমনি মহিলাদের কত রকমের পোষাক, এই পোষাক বাছাবাছি করতে গিয়ে মেয়েদের কত সময় চলে যায় –এটা পরলে কেমন হয়, সেটা পরলে আমাকে কি রকম দেখাবে। কেউ আপনার দিকে ফিরে তাকাবে না। ঘুরেফিরে সবাই দেখবে, আপনার মন কেমন। কিন্তু এই জিনিসগুলিকে নিয়ে কত সময় অপচয় করি, মনের কত শক্তির অপচয় করি, আমরা একবার ভেবেও দেখি না। যেমনি এই জিনিসগুলির প্রতি একটু নজর দিতে শুরু করবেন, দেখবেন আপনার অনেক সময় বাঁচতে শুরু হয়ে যাবে।

আমাদের পরম্পরায় খুব নামকরা কথা, যে কথা রাজা মহারাজ খুব বলতেন –চোদ্দ আনা মন ঈশ্বরে দিয়ে দু আনা মন যদি সংসারের কাজে দেওয়া হয়, কাজের হেউঢেউ হয়ে যাবে। যখন কথাটা পড়েছিলাম, তখন বিশ্বাস হত না। চোদ্দ আনা ছেড়ে দিন, বারো আনাতে নিয়ে আসুন, ঠিক আছে আটা

আনাতেই নিয়ে আসুন। যদি বিশ্বাস হয় আটা আনা মন ঈশ্বরে আর আটা আনা মন সংসারে নিয়ে এলে, সংসারে কাজের হেউঢেউ হয়ে যাবে। অথচ আমরা সংসারের কাজও ভাল করে করতে পারিনা। আমি অনেক সেন্টারে ছিলাম, অনেক কাজকর্ম দেখেছি। বেশির ভাগ মানুষ, যারা কাজ করে, তারা কাজ পারে না। রীতিমত ভাল করে বুঝিয়ে, শিখিয়ে কাজ দেওয়া হয়, তাও দেখবেন, কাজে ভুল করবে। আসলে মনটাই চঞ্চল। সেখানে মনকে যদি একাগ্র করে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, তখন সে মনের অনেক কম খরচে ভাল কাজ করবে। সেইজন্য বলা হয়, আপনার কাজ দেখে বোঝা যাবে আপনি ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারবেন কি পারবেন না।

ধরুন আপনার মনটা একাগ্র, মনের একাগ্র ভাব অনেক রকমের হয়। যেমনি আপনি কোন বিদ্যাতে, তা ইতিহাস হোক, বিজ্ঞান হোক, অঙ্ক হোক, গান-বাজনা হোক, যদি মন ওদিকে বেশি চলে যায়; আপনার পুঁজিটা ওদিকে চলে গেল। এটা ঠিক যে, আপনার আশেপাশের লোকেরা, আপনার গুণমুগ্ধ লোকেরা আপনাকে বাহাবা দেবে, কিন্তু আপনার যে আধ্যাত্মিক জীবন যেটা, সেটার সর্বনাশ হতে বাকি থাকবে না। একটা নামকরা উপন্যাস আছে, তাতে একজন খ্রীশ্চান ফাদারকে দেখানো হয়েছে, যাঁর মধ্যে অনেক রকম গোলমাল। কিছু গোলমালের খবর গেছে চার্চের কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রধান চার্চের একজন ক্ষমতাবান ফাদারকে খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। উনি সেখানে পৌঁছে লোকেদের জিজ্ঞাস করছেন, অমুক চার্চ কোথায়? লোকেরা কেউ বলতে পারছে না। তখন উনি চার্চের ফাদারের নাম করলেন। ফাদার একজন ডাক্তার ছিলেন, লোকেদের চিকিৎসার করতেন, লোকেরাও তাঁকে ভাল করে চেনেন। লোকজনরা তাদের চার্চের নাম জানে না, কিন্তু চার্চের ফাদারের নাম জানে। কোথাও জিনিসটা অন্য দিকে চলে গেছে।

আর-একজন ফাদারের কথা আছে, তিনি খুব সুন্দর সাহিত্য রচনা করতেন। একটা সময় ধরে তিনি অনেক উচ্চমানের সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তারপর কোন একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর মনে হল, তাঁর মন ঈশ্বর থেকে সরে যাচ্ছে। মনে হওয়ার পর তাঁর যত লেখা ছাপানো হয়নি, সেগুলো সব পুড়িয়ে দিলেন। আমিও যখন লিখতে শুরু করেছিলাম, একজন-দুজন মহারাজ আমাকে সাবধান করেছিলেন, দেখো, মনটা যেন অন্য দিকে না চলে যায়। আমি তো এখন লেখালেখি প্রায় বন্ধ করার অবস্থায় এসে গেছি। কি হয়, যখনই সংসারের কোন একটা গুণ ভিতরে চলে এলে, তখন সাবধান হয়ে যেতে হয়। তার মধ্যে গান-বাজনাটা খুব বিপজ্জনক। কারণ, বিজ্ঞানের দিকে বেশি এগিয়ে গেলে বেশির ভাগ মানুষ আপনার বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বেশি বুঝবে না, যতক্ষণ না আপনার খবর মিডিয়াতে না আসে। কিন্তু গান-বাজনা মানুষকে আকর্ষিত করার ক্ষমতা রাখে, আর এর পারফরমেন্স সামনা-সামনি হচ্ছে, শ্রোতারা আপনার সামনে আপনাকে হাততালি দিয়ে, সাধুবাদ দিয়ে অভিনন্দিত করতে থাকবে। ওর মধ্যেই ভেসে যাবেন। তখন মনে হবে, আরও বেশি পপুলারিটি পেতে হবে।

দুজন মহারাজের কাছে আমি তাঁদের জীবনের কথা শুনেছি। ছাত্রাবস্থায় তাঁরা দুজনেই খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। গ্রাজুয়েশান করার পর ইচ্ছা হয়েছিল আরও পড়াশোনা করার। কিন্তু আমাদের বড়রা বারণ করে দিলেন। অনেক আগেকার কথা, এখন তো গ্রাজুয়েশানের কোন দামই নেই। আমিও অনেক ধরণের লোকেদের জানি, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইপিএস অনেককেই জানি। কদাচিৎ কখন কাউকে দেখেছি, যাঁরা ধর্ম জিনিসটা বুঝতে পারেন। একদিকে ভক্ত; ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনী পড়েন, কিন্তু ওই জায়গাটায় কেমন যেন অন্ধকার। যার জন্য স্বামীজী মাদ্রাজ লেকচারে বলছেন, আপনারা সবাই হলেন মোচওয়ালা শিশু। আধ্যাত্মিক ব্যাপার যখন আসে, ধর্মের ব্যাপারগুলি যখন আসে, সেখানে তোমরা সবাই মোচওয়ালা শিশু। কারণ মনটা একদিকে চলে গেছে, চলে গেছে বলে এদিকে মনটাকে নিয়ে আসা যায় না। কিন্তু তার থেকে মারাত্মক বিপজ্জনক হল, কোন দিকে মন কেন আমরা বেশি দেব? এই যেমন আমি, আমি স্বভাবে লেখক নই। আমি যদি লেখালেখিতে একটু উপরে উঠতে চাই, কেউ যদি গান-বাজনাতে উপরে উঠতে চান, বা কেউ বিজ্ঞান, কেউ অঙ্কের জগতে উপরে

উঠতে চান; কেন চান? কারণ তখন তাঁর কাছে ওটা সত্য বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু যে কোন বিদ্যা, তা গান-বাজনা হোক, বিজ্ঞান হোক, সাহিত্য হোক, সবটাই মনের জগতের; মনের জগতের মানে সংসারের। তার মানে, সংসারটা এনাদের কাছে সত্য বলে বোধ হচ্ছে। খুবই সহজ সরল যুক্তি।

কথামৃতে ঠাকুর বারবার বলছেন, ঈশ্বরই সত্য, আমাদের উপনিষদে বারবার বলছেন, ঈশ্বরই সত্য, আত্মাই সত্য। আমাদের একজন অল্প বয়সের শ্রোতা আছেন, খুব মনযোগ দিয়ে সব লেকচার শোনেন। খুব মনযোগ দিয়ে গীতা মুখস্থ করেন, শ্লোক মুখস্থ করে সেটাকে লিখে আমার কাছে পাঠান। মাণ্ডুক্য কারিকার ক্লাশ শুনছে, হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল। প্রশ্নটা হল, যদি কারুর আত্মা সত্য বলে মনে হয় আর জগৎটাও সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তাকে কি বলবেন? আমি বললাম, ইসলাম ধর্ম। এ্যব্রাহামিক ধর্মের কাছে ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন বলে, জগৎও সত্য। কোন হিন্দুর কাছে জগৎ কখনই সত্য বলে বোধ হবে না, কোন পরিস্থিতিতেই হবে না, হতে পারে না। আমরা যখন জীব, জগৎ, ঈশ্বর এই কথাগুলো বলছি, তাতেও শেষ সত্য জগৎ বা জীব হতে পারে না। সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, এনারা প্রকৃতিকে সত্য বলে মনে করেন ঠিকই, কিন্তু শেষ সত্য বলে মনে করেন না। ওনারা বলেন, আত্মার যে মুক্তি অবস্থা, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া –এটাই সত্য।

কিন্তু যেমনি আপনি বলছেন, আমি এই বিদ্যাতে মন দেব, তখন আপনার কাছে সংসার সত্য হয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বর সেখানে বাদ হয়ে যাচ্ছেন। খুব নামকরা গল্প আছে। একজন ত্যাগী সাধু, খুব ভাল সাধু, তিনি রাজার কাছে গেছেন। রাজা কিছুক্ষণ সাধুর সাথে কথা বলেই বুঝতে পেরেছেন, ইনি সত্যিকারের একজন ত্যাগী সাধু। রাজাদের এমনিতেই একটা অহঙ্কার থাকে। রাজা হাতজোড় করে বলছেন –আপনার কি ত্যাগ, সংসারের সব কিছু ত্যাগ করে দিলেন। সাধুবাবা হেসে বলছেন, 'আমার আর কি ত্যাগ, আমি তো শুধু সংসারকে ত্যাগ করেছি, আপনার ত্যাগ আমার থেকে অনেক বেশি, কারণ আপনি ভগবানকেই ত্যাগ করে দিয়েছেন'।

ধর্ম জীবন অত সহজ নয়। পূজা অর্চনাতেই যদি ধর্ম জীবনকে বেঁধে দেওয়া হয়, ধর্ম তখন খুব সহজ হয়ে যাবে। এটাকে বলে comfortable religion। স্রোতের সাথে সাথে ভেসে চলাতে সুখের সাঁতার দিয়ে আরামসে ভেসে যাওয়া যায়। স্রোতের বিপরীত যেমনি যাওয়ার চেষ্টা করবেন, তখন শুধুই কষ্ট, কষ্ট আর কষ্ট, কষ্টের আর শেষ নেই। কি হয়, যখনই কেউ ঠিক ঠিক ধর্ম জীবনকে ধরবেন, তখন এত বেশি আঁক-বাঁক আসবে কল্পনাই করা যাবে না। ওই আঁক-বাঁক সামলাত সামলাতে জীবনের দম বেরিয়ে যায়। যেমনি কোন একটা দিকে আপনার মন একটু বেশি চলে গেল, এই নিয়ে ইংরাজীতে খুব সুন্দর একটা কথা আছে, playing to the gallery; যারা ক্রিকেট খেলে, তারা অনেক সময় দর্শকদের মনোরঞ্জের জন্য লম্বা লম্বা শটস্ মারেন। তার মানে আপনি নামযশের দিকে চলে গেলেন, দ্বিতীয় মনের অপচয় হওয়ার সম্ভবনা তৈরী করে দিলেন; তৃতীয়, আপনার অজান্তায় সংসারটা সত্য হয়ে যায়। আর পরিণতি? আপনি আধ্যত্মিক জীবনের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। তার মানে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আপনার ঘোরাটা চলতে থাকবে।

ঠাকুর সেইজন্য এখানে সাবধান করছেন। কারুর যদি মনে হয়, আমরা সংসারে কত কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছি, কত দিকে মনকে লাগাতে হচ্ছে, তাহলে আমাদের কি হবে? সেইজন্যই তো *ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যার* কথা বলা হয়। আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে দেখুন, সবাই কত রকমের কাজ করছেন, কিন্তু সবাই জানে যে আমি ঠাকুরের ভাবে ঠাকুরের কাজ করছি। আমার তখন খুব অল্প বয়স, সেই সময় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজীকে আমি দেখেছিলাম, উনি কয়েক বছরের মধ্যে দেওঘর বিদ্যাপীঠকে বিরাট বড় করে দিয়েছিলেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠ খুব সুন্দর ভাবে তৈরী হওয়ার পর, সেই মন্দিরের উদ্বোধনের জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ দেওঘর এসেছিলেন। দেওঘরে মহারাজের সাত দিনের প্রোগ্রাম ছিল। মন্দির উদ্বোধনের পর, মহারাজ সবাইকে

আশীর্বচন দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী এই আশ্রমে বিরাট কাজ করেছেন, আমরা এবার ওনাকে এখান থেকে অন্য কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। উনি এখন থেকে সারদাপীঠের দায়ীত্ব পালন করবেন'। মহারাজরা কেউ জানতেন না, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী নিজেও জানতেন না। বিদ্যাপীঠে তিনি এত কিছু করলেন, তিল তিল করে ছ-সাত বছরের মধ্যে পুরো একটা সাম্রাজ্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। এই করে করে আমাদের মিশনের সমস্ত সাধু-সন্ন্যসীদের সমস্ত কর্ম কর্মযোগে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ আমাদের সব ইয়ং সাধুদের বারবার বলতেন –ঠাকুরের সেবা করছি, ঠাকুরকে অর্পণ করছি, এই ভাব নিয়ে যদি সব কর্ম করা হয়, জীবনে তাহলে হু হু করে এগিয়ে যাওয়া যায়। যে কোন কাজ; সংসার সামলানো, রান্নাবান্না, চাকরি, শিক্ষকতা, এই ভাব যদি থাকে; প্রথম –ঠাকুরের পূজা করছি, দ্বিতীয় –এই কাজই ধীরে ধীরে আমাকে চিত্তশুদ্ধির পথে নিয়ে যাবে; সেখান থেকে আমি ঠাকুরের পথে এগোব; এই ভাব নিয়ে যদি কাজ করা না হয়, তাহলে লক্ষ্যের পথটা আঁকাবাঁকা হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মে বিনাশ কারুর হয় না, তবে সময়টা কারুর জন্য বেশি লেগে যায়, রাস্থাটা একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়। অন্য ধর্মে অনেক সমস্যা হয়ে যায়; পাপ, নষ্ট হয়ে যাওয়া, নরকে যাওয়া; আমাদের এখানে এসব নেই। আমাদের হল, রাস্থা দিয়ে যাচ্ছি, কোন কারণে ভুল রাস্থা ধরে নিলাম; কিছু দিন এদিক-ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করে আবার মূল রাস্থায় ঠিক ফেরৎ চলে আসব; সময়টা একটু বেশি লাগবে, এই যা।

ঈশ্বরে কেন মান যায় না? কারণ আমরা অজন্তায় মনে করছি এই সংসার নিত্য। সংসার এটা ব্যবহারিক সত্য, কিন্তু ব্যবহারিকটা ভুলে আমরা সংসারকে নিত্য বলে মনে করছি; সেখান থেকে মনটাও চলে যায় সংসারের ভোগে, সংসারের কর্মে; একটা কর্তব্য বোধ নিয়ে আসে, আমার একটা দায়ীত্ব আছে। দায়ীত্ব তো আছেই। নিজেকে একটু নরম করা; আপনি কি সত্যিই মনে করেন ঠাকুর সদা সর্বদা আছেন? ঠাকুর কি ঈশ্বর? আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না, আপনি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি মনে করেন, আপনার যে সন্তান হয়েছে, এই সন্তান ঠাকুর আপনাকে দিয়েছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন, যদি ঠাকুর দিয়ে থাকেন, তাহলে ঠাকুর তাকে দেখবেন? আপনার দায়ীত্ব সন্তানকে তৈরী করে দেওয়া, তাতে আপনার কর্মফল কাটছে; সন্তানকে আসলে তো দেখছেন তিনি। শুধু আপনার সন্তানকে না, আমাকে, আপনাকে, সবাইকে তিনি দেখছেন। আমি যখন কারুর সেবা করছি, তখন তাতে আমার কিছু কর্ম কাটে। এক ভদ্রলোক একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ঋষি-মুনিরা এত রেগে যেতেন কেন'? রাগ দুই কারণে করা হয়, একটা হল, তাঁদের সংস্কার আছে; দ্বিতীয় যার উপর রাগ করা হয়, তাতে তার কিছু বাজে কর্ম পুড়ে যায়। কিন্তু একমাত্র যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষি তাঁরাই কারুর উপর রাগ করে তার বাজে কর্মকে পুড়িয়ে দিতে পারেন। আমার, আপনার, সবার যে রাগ এটা সংস্কারের জন্য। অতি সাধারণ এই কথাটা যদি আপনাদের মনে থাকে –সংসারকে এত বেশি সিরিয়াসলি নেবেন না। আমরা বড্ড বেশি সংসারকে সিরিয়াসলি নিয়ে নিই। যে কাজ করছে, তার বোধ এটাই –এই কাজের মাধ্যমে আমি আমার চিত্তশুদ্ধি করছি, ফলে এটাকে ঠাকুরের পূজা রূপে নিয়ে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

রাম –আমি মনে করি, আমি যে শিখছি, কেবল সংকীর্তনের জন্য। এই ভাব। রান্নাবান্না যা করছি, আমি ঠাকুরকে অর্পণ করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –তুমি নাকি গান শিখেছ?

মাস্টার (সহাস্যে) –আজ্ঞে না; অমনি উ আঁ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তোমার ওটা অভ্যাস আছে? থাকে তো বল না। "আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে, দে মা পাগল করে"। যে গানগুলির কথা ঠাকুর বলছেন, গানের এমনিতেই নিজস্ব একটা যেমন মাধুর্য আছে, তেমন প্রত্যেক গানের মধ্যে একটা ভাব থাকে। যাঁরা গান গাইতে পারেন না, তাঁদেরকেও গান জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হয় ওই ভাবটার জন্য, ওই ভাবটাও মানুষকে উন্নত করে।

দেখ, ওইটি আমার ঠিক ভাব।

মায়ের কথাতে আছে, অনেক ভক্ত এসে শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, মা, আশীর্বাদ করুন ঠাকুরের নামে যেন পাগল হয়ে যাই। অনেক আগেকার কথা, আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, কোন কারণে বয়সে মাথাটা একটু এলেমেলো হয়ে গিয়েছিল। তিনি দুঃখ করে বলতেন, 'ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যাও; আর আমি পাগল হয়ে গেলাম, সবাই আমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিয়েছে'। ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যাওয়ার অর্থ –ঈশ্বরের নামে ডুবে যাওয়া, ঈশ্বরে মজে যাওয়া, ঈশ্বরের ভাবে মত্ত হয়ে সাংসারিক ভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের নামে পাগল হয়ে যাওয়া মানে, পাগলের মত আচরণ করা না।

সর্বভূতে ভালবাসা, ঘৃণা ও নিন্দা ত্যাগ করা, এই জিনিসগুলি নিয়ে ঠাকুর এবার বলতে যাচ্ছেন। আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম কিভাবে সংসার আমাদের কাছে সত্য; এই জিনিসটাকে আমাদের মাথা থেকে নামাতে হবে। সংসারের একটা ব্যবহারিক সত্তা আছে। সংসারে থেকে খাওয়া, পরার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় হল সাধনা, সংসারে থেকে আমাদের সাধনা করা সহজ হয়, জীবনে একটা উত্থান হয়, এর বেশি সংসারের আর কোন উপযোগিতা নেই।

আমার খুব প্রিয় উদাহরণ, প্রত্যঞ্চল গ্রামের রেল স্টেশনের বাথরুমগুলো খুবই অপরিষ্কার থাকে, ঢুকলেই গা গুলিয়ে বমি এসে যায়। কোন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেল, আপনাকে এক্ষুণি ওই বাথরুমেই যেতে হবে, আপনি বেগ সামলাতে পারছেন না। তখন কি করবেন? কোন রকমে নাক, মুখ চেপে ওই বাথরুমেই ঢুকে আমাকে কোন রকমে কাজ সেরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই সংসার, এই জগৎ হল গ্রাম দেশের রেল স্টেশনের বাথরুম। এর বেশি যদি সংসারকে দাম দিয়েছেন কি, আপনি মরেছেন। এটা যেমন ঠাকুর বিদ্যাকে নিয়ে বললেন, এবার ঠাকুর ইমোশানসকে নিয়ে বলছেন।

এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য; লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; এগুলো আমাদের কেন হয়? কারণ সংসারকে আমরা অনেক বেশি সত্য বলে মনে করি। সংসারকে সত্য মনে করছি বলেই, আমি চাইছি, এই জিনিসটা যেন আমি পেয়ে যাই; এই জিনিসটা না পেলে আমি ওকে শেষ করে দেব। অথবা যাকে পছন্দ করি না, তাকে ঘৃণা করি। জগৎ যদি সত্য হত, অপরের আপনি গলা কাটতে পারতেন। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা হাজার বছর আগে থেকে এ ওর গলা কাটছে, ও তার গলা কাটছে। কারণ তাদের কাছে সংসার ভগবানের সৃষ্টি, সংসারটা সত্য। আমরা হিন্দুরা কখন ধর্মের জন্য গলা কাটাকাটি করি না। কারণ আমরা জানি, এই সংসারটা একটা মুসাফির খানা, সরাইখানা। আগেকার দিনে ট্রেন বদল করার জন্য কোন জংশন স্টেশনে সারা রাত অপেক্ষা করে থাকতে হত –কখন আমার ট্রেন আসবে। সংসার হল জংশন স্টেশনের মত, এখান থেকে আমাকে ট্রেন ধরতে হবে আমার গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য।

যাদের কাছে জগৎ সত্য বলে বোধ হয়, তাদের ইমোশানসগুলো খুব পাওয়ারফুল হয়। নয় থেকে এগারো বছরের বাচ্চাদের খুব পাওয়ারফুল ইমোশানস হয়। আরও যারা ছোট, তাদের পাওয়ারফুল ইমোশানস্ হয় না। ভক্তরা যদি এ-রকম করেন, তখন কি হয়, হয়ত ঈশ্বরকে নিচ্ছেন; কিন্তু যার উপর ক্রোধ আছে, যার প্রতি ঘৃণা আছে; অতটুকুকে বাদ দিচ্ছেন। এভাবে হয় না। ঠাকুর

বলছেন, ছুঁচের ভিতর যখন সুতো দেওয়া হয় তখন সুতো আঁশ একটু বেরিয়ে থাকলে ছুঁচের ভিতর সুতো যাবে না। কাউকে যদি বাদ দেন, তাহলে অতটুকু ঘাটতি না, কম না; আসলে পুরোটাই বাদ। তার থেকে বেশি যে সমস্যাটা হয়, যেটা এখানে ঠাকুর বলছেন।

হাজরা মহাশয় কারু কারু সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) –ও-দেশে একজনের বাড়ি প্রায় সর্বদাই গিয়ে থাকতাম, তারা সমবয়সী, তারা সেদিন এসেছিল; এখানে দু-তিনদিন ছিল। তাদের মা ওইরূপ সকলকে ঘৃণা করত। শেষে সেই মার পায়ের খিল কিরকম করে খুলে গেল আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত পচা গন্ধ হল যে, লোকে ঢুকতে পারত না। ঠাকুরের কথা শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার গ্যাংগ্রিং হয়ে গিয়েছিল।

হাজরাকে তাই ওই কথা বলি, আর বলি, কারুকে নিন্দা করো না।

ঠাকুর যেটা বলতে চাইছেন, এখানে নিন্দা হল একটা মাধ্যম। ইদানিং কালে আমেরিকার বাবুরা বার করেছেন নেগেটিভ ইমোশান কি, পজিটিভ ইমোশান কি, নিউট্রাল ইমোশান কি, আরও কি কি ইমোশানস। আসলে ইমোশান মানে ইমোশান, তা যেটাই হোক। কিছু ইমোশন খুব পাওয়ারফুল হয়। বিদ্যার প্রতি আগ্রহ, ইমোশান খুব জোরাল থাকে। সাধারণ লোকেদের কাম, ক্রোধ, লোভ জোরাল হয়। যারা উন্নত, যারা সাত্ত্বিক, তাদের কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো হাল্কা হয়। জিম করবেটের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন ইংরেজ দেশের রাজা। কিন্তু দেশের ভিতর আরও অনেক সামন্ত রাজারা ছিলেন। এই রকম একজন রাজা ছিলেন, তাঁর অনেকগুলো বড় জাতের কুকুর ছিল। রাজা একদিন বলছেন, আমার ওই প্রিয় কুকুরটা শিকারের সময় আজ আবার একটু অবাধ্য হওয়াতে ওকে আমি আচ্ছা করে শাসন করেছি। জিম করবেট জানতেন, ওনার আচ্ছা করে শাসন করা কি। জিম করবেট তাও জিজ্ঞেস করছেন, 'ও তাই! মাই লর্ড, আপনি কি বলে শাসন করলেন'? 'I told him, you are a fool'। অবাধ্য কুকুরকে অতটুকু বলেছেন, তাতেই রাজার কাছে মনে হচ্ছে কত কিই না বলেছি। এনারা হলেন খুব সভ্য সমাজের। ফ্রান্সের লোকেদের নামে বলা হয়, ওনারা খুব ভদ্র ভাবে কথা বলেন।

তমোগুণী লোকেদের ইমোশানস খুব পাওয়ারফুল হয়। সমস্যা হল, একে তো সংসার আমাদের কাছে সত্য, দ্বিতীয় ইমোশানসগুলি ঘুরে আমাদের কাছে চলে আসে। কারুর প্রতি আপনি যদি ক্রোধ পোষণ করে থাকেন, ওই ক্রোধ ঘুরে এসে আপনাকেই মারবে। এই জগৎ যেন একটা মস্ত বড় রিফ্লেক্টর, আয়না যেমন আমাদের চেহারাকে প্রতিবিম্বিত করে। জগতে যেমনটি আপনি ছাড়বেন, তেমনটি আপনাকে ঘুরে মারবে। দয়া করে এতটুকু যদি মনে রাখতে পারেন –আপনার ভিতর যদি প্রচুর ক্রোধ থাকে, ওই ক্রোধ ঘুরে আপনাকেই মারবে; আপনার ভিতর যদি প্রচুর লোভ থাকে, ওই লোভ ঘুরে আপনাকে মারবে। অনেকের প্রতি যদি আপনার ঘৃণার ভাব থাকে, এই ঘৃণা ঘুরে আপনাকে এমন মারবে, এই যে ঠাকুর এখানে বর্ণনা করছেন, এমন দুর্গন্ধ আপনার থেকে বেরোবে যে লোকেরা আপনার কাছে ঘেষতে চাইবে না। এটাকেই আমরা সহজ করে বলি, আপনার কর্ম আপনাকে ছাড়বে না। কর্ম আপনাকে ছাড়বে কি ছাড়বে না আমাদের জানা নাই, কারণ কর্মের ফল পরের জন্মেও হতে পারে, কিন্তু ইমোশানসগুলো আপনাকে এখানেই মারবে।

একটা ঘটনা আগেও বলেছিলাম, খুব মজার ঘটনা। আমার বিশেষ বন্ধু মহারাজ, আমার থেকে বয়সে ছোট, বর্তমানে উনি বিবেকানন্দ কলেজের সেক্রেটারি। উনি দুপুরবেলা ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে তিনি দেখছেন, একজন সন্ন্যাসী ভাইয়ের সাথে তাঁর ঝগড়া হয়েছে আর উনি ডান হাত দিয়ে ওনাকে একটা চড় মেরেছেন। উনি ক্রোধী নন, কিন্তু এখন স্বপ্নে ক্রোধ হয়ে গেছে। স্বপ্ন থেকে জাগ্রত অবস্থায় এসে সব মিটে গেল। তারপর ঘণ্টা তিনেক পর উনি বেলুড় মঠ যাচ্ছেন। বেলুড় মঠে ঢুকতেই ওনার হঠাৎ মনে হল তাঁর ডান হাতে যেন একগাদা বোলতা কামড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখেন

হাতটা সত্যিই ফুলে গেল, কোন কারণ ছাড়া। আগে যখন আমার বয়স কম ছিল, তখন যা ছিলাম, ছিলাম। কিন্তু এখন দেখেছি, কোন পুরনো কথা মনে করে বা কারুর কোন আচরণ দেখে হঠাৎ যদি মনে ক্রোধ বৃত্তি হয়, একদিনের মধ্যে আমার উপর একটা আঘাত এসে যাবে, আসবেই। আমি তো আতঙ্কে এখন রাগ করা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু ভক্তরা এসে বোকা বোকা প্রশ্ন করলে বকে দিই, ওটা ক্রোধ না। কিছু তো একটা বলতে হয়, কিছু করার নেই, নিজে থেকে সে বসে নিজের কাহিনী বলতে শুরু করবে। কিন্তু আতঙ্ক লাগে। যদি জিজ্ঞেস করেন, এতদিন সাধু জীবন নিয়ে এখানে আছেন, কি উপলব্ধি হল'? তার উত্তরে এটাই বলার –আমার নিজের ইমোশানসকে আমি প্রচণ্ড ভয় পাই। কারণ এমন একটা আঘাত দেবে, মন নড়ে উঠবে, মনটাই তো সম্বল কিনা।

খুব জরুরী দুটি কথা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করলাম। কিভাবে আমরা অজান্তায় মন নিয়ে খেলা করে বসি, আর অজান্তায় সংসারকে আমরা সত্য বলে মনে করি। সেখান থেকে কত অঘটন আমরা নিজেদের উপর ডেকে নিয়ে আসি।

হাজরাকে তাই ওই কথা বলি, আর বলি, কারুকে নিন্দা করো না –ঠাকুর হাজরার মাধ্যমে আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছেন। এরপরেও আপনি যে নিন্দা করছেন, তাতে আপনি আপনারই ক্ষতি করছেন। সংসারকে সত্য বলে ধরে নিচ্ছেন, আর আপনি এটা বুঝতেও পারছেন না যে, ঈশ্বর থেকে আপনি সরে যাচ্ছেন। ইমোশান যদি আপনার থাকে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার খুব তীব্র ইমোশান যদি থাকে, জানবেন ঈশ্বর থেকে আপনি দূরে আছেন।

এরপর বেলা চারটা হয়ে গেছে। কিছু কিছু বর্ণনা আছে, যেগুলো নিজেরা পড়লেই বুঝতে পারবেন, ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। এর মধ্যে কিছু হাসিঠাট্টাও হচ্ছে। ঠাকুর কিছু বলছেন না। একটু হয়ত হাসলেন, কিন্তু কোন মতামত দিচ্ছেন না। যখন কাউকে হাসিঠাট্টা করা হয়, তখন সব কিছুতে সায় দিতে নেই, এই ব্যাপারটা খুব জরুরী।

সন্ধ্যা হইল। উঠানে উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ।

সত্যি কথা বলি, কথামৃতে এই যে বর্ণনাগুলি, এই বর্ণনা আমরা আর কোথাও পাই না। লীলাপ্রসঙ্গে একটু একটু পাওয়া যায়। কিন্তু কথামৃতে এখানেই দেখুন; এতক্ষণ কি কি সব কথা হচ্ছিল। আর যেই সন্ধ্যা হয়েছে, মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে, তার মানে ঠাকুরের ঘর যেখানে, একেবারে দণ্ডায়মান, লাঠির মত সোজা। সমাধিস্থ। এমনি। আমরা যেমন চা খাই, বিস্কুট খাই; ঠাকুরের সমাধি হওয়াটাও যেন সেই রকম; কি আশ্চর্য। ধর্মের ইতিহাসে আমরা যত শাস্ত্র দেখেছি, কোথাও আমরা এই রকমটি দেখতে পাই না। দিনে হয়ত দশবারই সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন।

অনেকক্ষণ পরে বাহ্য জগতে মন আসিল। ঠাকুরের কি আশ্চর্য অবস্থা। আজকাল প্রায়ই সমাধিস্থ। সামান্য উদ্দীপনে বাহ্যশূন্য হন; ভক্তেরা যখন আসেন, তখন একটু কথাবার্তা কন; নচেৎ সর্বদাই অন্তর্মুখ। পূজাজপাদি কর্ম আর করিতে পারেন না।

এটা কেমন জানেন; যদি আপনি গীতা, উপনিষদ গ্রন্থাদি পড়েন, সেখানে কারুর সমাধি, কারুর এই ভাব, কারুর সেই ভাব; এই জিনিসটা ঠিক বোঝা যায় না। আরও বেশি হল, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত এগুলো কিছু বোঝা যায় না। আমরা ঠাকুরের যা দেখেছি, ঠাকুর পূজাদি করতেন; মা কালীকে ভালবেসে মায়ের দর্শন হল, জ্ঞান হল। কিন্তু সেখানে তিনি চৈতন্যটাকেও দেখছেন, মাকে সমস্ত জীবের মধ্যে দেখছেন। সেখান থেকে ঠাকুরের আবার অদ্বৈত সাধনা, নির্বিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প সমাধি থেকে যখন নেমে আসছেন, তখন মা কালীও আবার ফেরৎ চলে এসেছেন। এটাই হল হিন্দু ধর্মের প্রাণ। এর কথা আচার্য শঙ্করও বলেছেন। দুঃখের বিষয়, এটাকেই আমাদের অন্যান্য আচার্যরা ভুল করে বসেছেন।

ওনাদের সামনে বড় বড় আচার্যরা ছিলেন, তাঁদের সামনে আমি চুনোপুটি ছেড়ে দিন, কিছুই না। কল্পনাও করা যায় না, তাঁরা কত উচ্চমানের মহাপুরুষ। কিন্তু আমরা যখন বেদ বা সাধারণ বই বেদ-বিহঙ্গম যদি পড়েন, গীতা ও উপনিষদ আদির ভাষ্য যদি পড়েন, সবচেয়ে বেশি কথামৃত যদি পড়েন; তখন কেন এমন মনে হয় এটা আমরা জানিনা। এই মনের জগতে, মনের জগৎ মানে ঈশ্বর সত্য; তিনি কাকে কখন কিভাবে রাখবেন বলা অসম্ভব। আর এখন থেকে তখন, কি রকম অবস্থায় পরিবর্তন করবেন, বলা অসম্ভব।

সমাধি ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, “মা পূজা গেল, জপ গেল, দেখো মা, যেন জড় করো না, সেব্য-সেবকভাবে রেখো”।

স্বাভাবিক, নির্বিকল্প সমাধির পর কিসের পূজা আর কিসের জপ! এই জায়গাতে একটু ব্যাখ্যা করার আছে। আগেও আমরা এই জিনিসটার আলোচনা করেছি –একমাত্র বেদান্ত তিনটে জগতের কথা বলেন –স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ জগৎ। এই তিনটিই কিন্তু হল মহাকারণ বা আত্মা। উপনিষদ বারবার বলছেন, আত্মাই সত্য, আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। এই আত্মাই জাগ্রত অবস্থা রূপে থাকেন, স্বপ্নাবস্থা রূপে থাকেন আবার সুষুপ্তি রূপে থাকেন। এই আত্মাই স্থূল জগৎ রূপে থাকেন, সূক্ষ্ম জগৎ রূপে থাকেন, আর কারণ জগৎ রূপে থাকেন। আর মহাকারণ তো তিনি সাক্ষাৎ। আত্মাই সত্য, এই তিনটি আত্মার তুলনায় মিথ্যা।

কিন্তু ঠাকুর এখানে বলছেন, মা, সেব্য-সেবকভাবে রেখো। এই কথার জন্য, স্থূল জগতের গুরুত্ব এসে যাচ্ছে। এটাকে মেলানো অসম্ভব। যতক্ষণ মাণ্ডুক্য কারিকা পড়া না হয়, পড়ার পর যদি বুঝে না থাকেন, ততক্ষণ এই জিনিসগুলিকে মেলাতে পারবেন না। স্থূল জগতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সূক্ষ্ম জগতেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ জগতেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যদিও সবটাই আত্মা। মানুষ যেমন বাড়িতেও থাকে, আবার বাড়ি ছেড়ে অনেক সময় বেড়াতেও যায়, অনেক সময় খেলতেও যায়। ঠিক তেমনি স্থূল জগতের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আবার আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে; সুষুপ্তির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যতগুলো অবস্থা আছে, তার মধ্যে জাগ্রত অবস্থা, স্থূল জগৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, জাগ্রত অবস্থা, স্থূল জগৎ যদি না থাকত, তাহলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে জানতেই পারতাম না, আত্মার ব্যাপারে আমরা জানতেই পারতাম না আর আত্মজ্ঞানের প্রতি আমাদের কোন চেষ্টাই থাকত না। সাক্ষাৎ ঈশ্বর এই স্থূল জগতে দেহ ধারণ করে আসেন, আর আমরা এই স্থূল জগতের বাসিন্দা। মনে হতে পারে যে, এটা বিরাট একটা আনন্দের ব্যাপার। একটা ছোট্ট অচেনা অজ গ্রামে যদি প্রধানমন্ত্রী আসেন, সেখানে কত আনন্দের ব্যাপার হয়। এই স্থূল জগতে ঈশ্বরের আগমন হয়, কত আনন্দের ব্যাপার। শ্রীশ্রীমা নিজেও বলছেন, কে এই জগতে মরতে চায় বল, নিজের ব্যাপারে বলছেন না। কিন্তু স্থূল জগতে একটা আনন্দ আছে। এখানে থেকে ঈশ্বরকে যে আস্বাদন করা হয় তখন এক রকম আনন্দ হয়। আবার সূক্ষ্ম জগতে ঈশ্বরকে যে আস্বাদন করা হয়, সেটা আর-এক রকমের আনন্দ; কারণ জগতে থেকে যখন আস্বাদ করছেন, তখন আর-এক রকম। নরেন্দ্রনাথ সপ্তর্ষি মণ্ডলে ঋষি রূপে কারণ জগতে যে ধ্যান করছেন, সেখানে তাঁর এক রকম আনন্দ হচ্ছে। স্থূল জগতে এসে যখন ঈশ্বরের আস্বাদন করছেন, তখন সেটা আর-এক রকম।

ঠাকুরের একবার ইচ্ছে হল রূপোর গড়গড়ায় তামাক খাবেন। মথুরবাবু রূপোর গড়গড়া আনিয়ে দিলেন। ঠাকুর একবার বসে গড়গড়ায় মুখ দিয়ে টানছেন, একবার পাশ ফিরে টানছেন, একবার শুয়ে টানছেন –বিভিন্ন ভাবে আনন্দের আস্বাদ করছেন। আত্মা মানে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্বকে বিভিন্ন ভাবে আস্বাদ করা। নির্বিকল্প সমাধি, জড় সমাধি; সেটাও এক রকম আনন্দ। ঠাকুর তাই বলে যে স্থূল জগৎকে সত্য বলছেন, তা কখনই বলছেন না, লীলাপ্রসঙ্গে, কথামৃতে কোথাও বলছেন না। বলতে

চাইছেন, এতেও একটা মজা আছে। পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাদের দেখবেন, ওরা পা ফাঁক করে মাথাটা পায়ের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে উল্টো হয়ে জগৎটা দেখার চেষ্টা করে। ওটাও ওদের কাছে একটা মজার ব্যাপার। পাহাড়ে গিয়ে আমরা কখন দূরবীন দিয়ে দেখছি, কখন স্বাভাবিক ভাবে দেখছি।

স্থূল জগতের নিজস্ব একটা আনন্দ আছে। পূজা-অর্চনা এখানেই হয়। ভগবানের মূর্তির পূজা এখানেই হয়, মন্দিরাদি এখানেই হয়, শাস্ত্রাদির চর্চা এখানেই হয়, ঈশ্বরকোটি লোকের সাক্ষাৎ এখানেই মেলে। এই জগৎটা একটা মেলার মত। গ্রামের মেলাতে কত রকমের দোকান, খেলা, ম্যাজিক, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এখানেও কত রকম আত্মার সাথে আমাদের দেখা হয়, যোগাযোগ হয়। ঈশ্বরকে এখানে অবতার রূপে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি, যিনি অনন্ত, তিনি এই স্থূল জগতে দেহ ধারণ করে আসেন, আর আমরা সেই অবতারের বিগ্রহ নির্মাণ করে তাঁর পূজা-অর্চনা করছি। সূক্ষ্ম জগতে বা কারণ জগতে এসব হবে না। কারণ জগতে শুধু ধ্যানস্থ হয়ে থাকা, আনন্দ অনেক বেশি হবে ঠিকই। কিন্তু যদি বৈচিত্র পেতে হয় তাহলে স্থূল জগতেই বৈচিত্র পাওয়া যাবে। মায়েরা একটা সবজি দিয়েই কত রকম রান্নার প্রিপারেশন করেন, এক মাছেরই কত রকমের ব্যঞ্জন হয়। শুনেছি, বাংলাদেশে একই প্রকার মাছের ষাট রকমের ব্যঞ্জন করা হয়। খাবে তো মাছটাই, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে রান্নার বিভিন্ন স্বাদের প্রিপারেশান, এরও একটা আলাদা আনন্দ আছে। ঠাকুর, তাই বলতে চাইছেন, পূজা, জপ এগুলোরও একটা আনন্দ আছেন, তাই বলছেন, মা সেব্য-সেবকভাবে রেখো। এটা খুব উঁচু কথা, অতি মাধুর্যের কথা। ঠাকুর এই কথা দিয়ে জগৎ সত্য বলতে চাইছেন না, জগতের এক বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন।

ঠাকুর আরও বলে যাচ্ছেন –**মা, যেন কথা কইতে পারি। যেন তোমার নাম করতে পারি, আর তোমার নামগুণকীর্তন করব, গান করব মা**। জগৎরূপী মেলাতে যখন আছেন, তখন এখানে নানা রকম খেলা করবেন, নানা রকম খেলা দেখবেন। এই জগতে এসে যদি সমাধিস্থ হয়েই কাটিয়ে দিই, তাহলে তো পুরো জিনিসটা হারিয়েই গেল। এখানকার মজা এটাই, হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন, দুই বাহু তুলে নৃত্য করছেন, পূজা করছেন, আরতি করছেন।

আর শরীরে একটু বল দাও মা। যেন আপনি একটু চলতে পারি; যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি। এই কথাগুলো শোনার পর ঈশ্বর কেমন যেন স্পষ্ট বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সকালে কালীঘরে গিয়া জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। তিনি আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, মা আজ সকালে তোমার চরণে দুটো ফুল দিলাম; ভাবলাম; বেশ হল, আবার (বাহ্য) পূজার দিকে মন যাচ্ছে; তবে মা, আবার এমন হল কেন? আবার জড়ের মতো কেন করে ফেলছ! নির্বিকল্প সমাধির পরে বাহ্য পূজা। লোকেদের একটা ভুল ধারণা, অদ্বৈত জ্ঞান হলে পূজা অর্চনা আদি হয় না। খুবই হয়, অদ্বৈতের পর যে পূজা অর্চনা হয়, ওই পূজাই ঠিক ঠিক পূজা। এই অদ্বৈত ভাব, এই আবার ভক্তিভাবে তাঁকে আস্বাদ করার ইচ্ছে, ঈশ্বর কি করতে চান, কি করেন, কেন করেন, সত্যিই আমরা জানি না।

মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –**ভাদ্র কৃষ্ণা সপ্তমী। এখনও চন্দ্র উদয় হয় নাই। রজনী তমসাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবাবিষ্ট; সেই অবস্থাতেই নিজের ঘরের ভিতর ছোট খাটটিতে বসিলেন। আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন**।

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলছেন, এই জিনিসগুলি বোঝার জন্য ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক ভাব, একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকা খুব দরকার। এমনিতে যদি ইমোশানালি দেখা হয় বা উড়ো উড়ো ভাবে

দেখা হয়, এই জিনিসগুলোর মাহাত্ম্য বা গুরুত্বটা হারিয়ে যাবে। কথামৃতের একটা খুব দরকারী কথা, যেটা আমরা অনেকবার বলেছি, তা সত্ত্বেও এগুলো বারবার শোনা দরকার, বোঝা দরকার। যেমনি আমরা ঠাকুরকে একজন সাধারণ মানুষ বা এমনি একজন সন্ত-মহাত্মা, সাধু রূপে দেখব, তখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক গোলমাল হয়ে যাবে, কারণ এখানে অনেক কিছু মেলানো যায় না। তাঁরাই কথামৃত পড়বেন যাঁদের ভিতর শ্রদ্ধার ভাব আছে। আর শ্রদ্ধাই যখন করছেন, তাহলে যেমন বলা হয়েছে, স্বামীজী বলে গেছেন, সেইভাবে আমরা পরম্পরায় জানছি –ঠাকুর অবতার। অবতার আসেন জ্ঞান ভক্তি শেখাতে।

এই জিনিসটাকে সব সময় আমাদের মাথায় রাখা দরকার –ঠাকুরের কোন কর্ম, কোন কথা, কর্মপ্রেরিত নয়। কর্মপ্রেরিত মানে, আগে আগে যা যা কর্ম করা হয়েছে, সেই কৃত কর্মই একটা শক্তি হয়ে আমাদের ঠেলে এখনকার কর্মগুলো করাচ্ছে। যেমন ধরুন, আমি আপনাদের সামনে কথামৃতের ব্যাখ্যা করছি, এই কাজটা কর্মের জোরে হচ্ছে। কেন কর্মের জোরে? আমি আমার আচার্যদের কাছে যা কিছু শিখেছি, শুনেছি; নিজে যে বইগুলি পড়েছি, নিজে নিজে যেমন চিন্তা-ভাবনা করেছি, তারপর আমার সাধুজীবন, আমার সংস্কারগুলি; সব কিছু মিলে আপনাদের সামনে কথামৃতের ব্যাখ্যা রূপে আসছে। সব মানুষেরই এই একই জিনিস হয়। কিন্তু অবতারদের তা হয় না। ভগবান গীতাতে বলছেন, *জন্মকর্ম চ মে দিব্যং*, অবতারের জন্ম আর কর্ম দুটোই দিব্য। তার অর্থ দাঁড়ায়, অবতারের ছোট থেকে ছোট কথা, ছোট থেকে ছোট কর্ম, সব লোকশিক্ষার জন্য। এর মধ্যে দেহের ধর্ম থাকছে, দেহের ধর্ম থাকার জন্য খিদে পেলে খাচ্ছেন, তৃষ্ণা পেলে জল পান করবেন, বাহ্যাদির বেগ এলে মলমুত্র ত্যাগ করবেন, নিদ্রা পেলে ঘুমোবেন; এগুলোকে নিয়ে বলা হচ্ছে না, এগুলো এমন কিছু জরুরী না।

ব্যক্তিপূজাতে যারা নেমে যায়, তারা এই জিনিসগুলির দিকেও দৃষ্টি দেয়। এগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, বাকি জিনিসগুলো, বিশেষ করে যেখানে ধর্মের ব্যাপার আছে বা অপরের সাথে যে ব্যবহার, ব্যবহারকালে যে কথাবার্তা আছে, এগুলো বেশি জরুরী। এখানেও অনেকগুলো কথা আছে, যেমন অনেক সময় মনে হয় যেন, ঠাকুর এমনি হয়ত এই কথাগুলো বলছেন; কিন্তু ঠাকুরের কোন কথা এমনি হতে পারে না। ঠাকুরের যত কথা আছে, তাঁর সেই কথা দিয়ে হয় তিনি আমাদের পথ দেখাচ্ছেন, আর নয়তো যাঁরা সাধক বা সাধন জীবনে নামছেন, তাঁদেরকে কিছু কিছু কথা বলে দিচ্ছেন। আমি, আপনি যাঁরাই সাধক বা সাধন জীবনে নেমেছি, আমাদের ভিতরে অনেক কিছু এলেমেলো জিনিস থাকে। এলেমেলো মানে, সমাজ থেকে যে অনেক কিছু শিখেছি, সেটা ধর্ম জীবনে ঢুকে আমাদের সামনে সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, ওটাকে আমরা আলাদা করতে পারি না। তারপরে যেটা হয়, তা হল ভুলভ্রান্তি। সাধক জীবনে প্রচুর ভুলভ্রান্তি হয়, এত ভুলভ্রান্তি হয় যে বলে বোঝান যাবে না। আমরা সন্ন্যসী হওয়াতে আমাদের একটা সুবিধা হল, আমরা তো এটাতেই সব সময় আছি। একশ বছর আগে ভারতবর্ষে যিনি যেটা করতেন, নিজের যে জাতি তার মধ্যেই থাকতেন, ফলে যেটা করতেন সেটার ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে যেতেন। একা একা থাকলে এক রকম, আর একই মনের লোকেদের সঙ্গে থাকলে আর-এক রকম হবে। তাই স্বাভাবিক ভাবে আমরা সন্ন্যাসীরা আমাদের জাতি সমুদয়ের মধ্যে আছি বলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জিনিসগুলিকে অনেক বেশি জানি।

ভুলভ্রান্তি প্রচুর হয়। ঠাকুর সেই জিনিসগুলিকেও দেখিয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছেন, এই ধরণের ভুলভ্রান্তি হয়। এই নিয়ে কখন বারণ করছেন, কখন ঠাট্টা করছেন, কখন বিদ্রুপ করছেন, কখন জোর একটা ধাক্কা দিচ্ছেন। এই যে, প্রথম পথ দেখানো, দ্বিতীয় ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া আর তৃতীয় শুধু পথ দেখিয়ে দেওয়া না, যখন আপনি এগোচ্ছেন তখন পর পর একটা একটা করে যে ধাপ আসছে, আপনি বলতে পারেন এটাও পথের মধ্যেই পড়ে, ঠিক আছে; সেটাকেও ঠাকুর বলে আগে থেকেই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।

আপনাদের যাঁদের মন একটু ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছে, তাঁদের তখন একটু এদিক-সেদিক দেখে নিতে হয়; সংসার কি, জগৎ কি একটু দেখে নিতে হয়। সংসারে সুখভোগ কি জিনিস একটু দেখে নিতে হয়, সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণাগুলোও দেখে নিতে হয়। বিভিন্ন মত কি বলছে, একটু দেখে নিতে হয়। দেখে নিয়ে আপনার যেটার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিল, সেটাতে ফোকাস করতে হয়। তা নাহলে এই জিনিসগুলোই আপনার মনকে চঞ্চল করে রাখবে। বেশি গ্ল্যামারের দিকে যাবেন না। যেখানে গ্ল্যামার, বুঝবেন সেখানে গোলমাল আছে। আপনি দেখুন, কোন জিনিসটা আপনার মনের সাথে মিলছে। আপনারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন, ঠাকুরের যে ভাব, তার সাথে আপনার ভাব মেলে কিনা। একবার যখন যে ভাবের সাথে আপনার ভাব মিলে গেলে, এরপর আপনার সমস্ত শক্তি, বিধি-বিধান সব কিছুকে ওতেই লাগিয়ে দিতে হয়, আর এদিক-সেদিক করার কোন দরকার নেই, করতেও নেই। রাজযোগে একটা খুব নামকরা সূত্র আছে, যাতে বলা হয়, যা জানার জেনে গেছি, আর কিছু আমার জানার বাকি নেই। যেটা জানা হয়ে গেছে, এবার সেটাতে পুরো ডুবে যাওয়া।

চল্লিশ পেরিয়ে এসেছেন মানে, জীবনের অর্দ্ধেক পেরিয়ে এসেছেন, আরও অর্দ্ধেক বাকি আছে। চল্লিশ পর্যন্ত ঠিক আছে, যতটুকু করলেন। পঞ্চাশ হতে হতে কখন ষাটও পেরিয়ে গেল –এবার জগৎকে ভুলে যান। যীশু খুব সুন্দর বলছেন –মৃতেরা মৃতের সৎকার করুক, তুমি ঈশ্বরের নামে চলে এসো। জগৎ নিজের মত চলবে, আপনার চেষ্টায় জগৎ চলবে না। সাধুজীবনে তখন আমার বয়স কম, অনেক সময় মনে হত, ওকে তাকে সাহায্য করি, এই করি, সেই করি; ভিতরে রজোগুণ টগবগ করছে কিনা। এখন ভাবি, তার আপনজনরা তাকে ঠিক করতে পারল না; সমাজ, যেখানে এত কিছু রয়েছে, সেই সমাজও তাকে ঠিক করতে পারল না; শেষ হলেন ঠাকুর, তিনিও তাকে এই রকম রেখেছেন, সেখানে আমি তাকে আর কি ঠিক করব! এখন আর তাই মাথা ঘামাই না।

এই ভাবটা সবাইকে নিয়ে আসতে হয়, তখন পুরো ডুবে যেতে হয়। এখন যে কথাগুলো চলছে, এই ভাব নিয়েই চলছে। ঈশান ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন, ঠাকুরও খুব স্নেহ করতেন। সেই ঈশানের ইচ্ছে হয়েছে তিনি গায়ত্রী পুরশ্চরণ করবেন। গায়ত্রী পুরুশ্চরণাদি এগুলো হল বেদ মত। মনুস্মৃতিতেও বর্ণনা আছে, এই আয়োজন কর, সেই আয়োজন কর, এটা কর, সেটা কর ইত্যাদি অনেক ফিরিস্তি।

ঈশান মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছেন। ঈশান বলিয়াছিলেন, আমি ভাটপাড়ায় গিয়া গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলিয়াছিলেন যে, কলিকালে বেদমত চলে না। জীবের অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, দেহবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে যায় না।

এই যে বলছেন, জীবের অন্নগত প্রাণ, এটা খুব মূল্যবান কথা। অন্নগত প্রাণ, আগেকার দিনে লোকেদের যত টাকার দরকার হত, তার থেকে আজ আপনার বেশি টাকা দরকার, উপার্জনও আপনাকে বেশি করে করতে হবে। আগেকার দিনের লোকেদের চাহিদা কম ছিল, মোটা ভাত আর মোটা কাপড় হয়ে গেলেই হয়ে যেত। আজকে আপনি আর আগের মত জীবন কাটাতে পারবেন না। তাই বলে যে একেবারে ভোগে নিমজ্জিত হয়ে যাবেন তা না। আপনার প্রয়োজনটা এখন বেশি –অন্নগত প্রাণ, কারণ দেহবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি আপনার সঙ্গে সব সময় অবস্থান করে থাকবে। আগেকার দিনে অসুখ-বিসুখ হলে গ্রামের কোন এক বৈদ্যের কাছে যেত, দু পয়সার একটু ওষুধ দিয়ে দিতে, তাতেই তাদের চাহিদা মিটে যেত। কিন্তু এখন ডাক্তারের কাছে গেলে ফিজ্ই কত দিতে হয়, তারপর বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করতে কত খরচ, তারপর ওষুধের খরচ। আর সরকারী হাসপাতালে রোগী দেখাতে গেলে কত সময় অপেক্ষা করে তবে গিয়ে ডাক্তারের দেখা মেলে, আর নাও দেখা মিলতে পারে। সবারই এখন টাকার দরকার। আপনার বিষয়বুদ্ধি যদি নাও থাকে, তাতেও আপনার জীবন চালাতে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হয়। এখন সেখানে আপনি কি করে যজ্ঞাদি বা পূজা অর্চনা করার জন্য এত কিছুর আয়োজন করবেন,

অসম্ভব। **তাই ঈশানকে মাতৃভাবে তন্ত্রমতে সাধন করতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর ঈশানকে বলেছিলেন, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই মা, তিনিই আদ্যাশক্তি**।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "আবার গায়ত্রীর পুরশ্চরণ! এ-চাল থেকে ও-চালে লাফ! আমাদের এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা –সাধন জীবনে এ-চাল থেকে ও-চালে লাফ। সাধন পথে যিনি নামলেন, এবার তিনি যে পথটাকে ধরে নামলেন, সেই পথটাকেই ধরে তাঁকে এগোতে হবে। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; এমনকি এই বিষয়টা পরে আসবে। পণ্ডিত আর সাধু। একজন খুব নামকরা পণ্ডিত, আমি তাঁকে জানি। বয়স হয়ে গিয়েছে, কোন শ্লোক বলতে গিয়ে শ্লোক মনে পড়ছিল না, কিন্তু গড়গড় করে সব শ্লোক বলে দিতে পারতেব। পণ্ডিত খুব দুঃখ করে বলছেন, 'আমার স্মৃতি এখন চলে যাচ্ছে'।

আপনাদের কাছে রাম মহারাজের কথা অনেকবার বলেছি, বিশাল পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃতের মহা পণ্ডিত। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী সমান ভাবে বলতেন। ফ্রেঞ্চ জানতেন, আরও কত কি জানতেন। একবার উনি কিছু বলতে গিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে বলতেন, স্মৃতি আর সায় দিচ্ছে না। তিনি বলছেন, 'আর দরকারও নেই, যা কাজ সেটা হয়ে গেছে'। খুব মূল্যবান কথা। বলছেন, শাস্ত্রের কাজ হয়ে গেছে। শাস্ত্রে ওনার অগাধ পাণ্ডিত্য, সংস্কৃতের যেমন শাস্ত্র, সংস্কৃতের যেমন সাহিত্য, তেমনি বিদেশী বই, হিন্দি বই, বাংলা বই, সবটাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তিনিই শেষ সময়ে বলছেন –শাস্ত্রের কাজ হয়ে গেছে। একজন খুব নামকরা মহারাজ, বিদেশ থাকেন, ভারতে এলে দেখা করতে আসেন। কিছু দিন আগে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। এসে দেখছেন, আমার টেবিলে, র‍্যাকে অনেক বই রাখা আছে। দেখে বলছেন, 'বাঃ খুব সুন্দর সিলেকশান তো'। আমি বললাম, 'বইগুল রাখাই আছে, পড়ার সময় আর নেই; হয়ে গেছে, আর কোনও আগ্রহ নেই ওতে। এখন শুধু ঠাকুর, মা, স্বামীজী আর গীতা, উপনিষদ, কথামৃত; এই নিয়ে থাকতে পারলেই হল'।

এ-চাল থেকে ও-চালে লাফ, এটা সাধন জীবনে যে কত ক্ষতিকর আমরা জানি, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য বেশিই জানি। জপধ্যান করছেন, বেশ আছেন; হঠাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে বা হঠাৎ চললুম তীর্থে; এই ধরণের বাঈ আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু আপনারা যাঁরা সমাজে আছেন, সংসারে আছেন, আপনাদের সমস্যা অন্য ধরণের। হৃষিকেশের দিকে প্রচুর অন্নক্ষেত্র আছে, সাধুরা ওখানে গেলে পাঁচটা রুটি আর ডাল দিয়ে দেবে। সাধুদের লম্বা লাইন হয়। হঠাৎ একজন সাধু এসে বললেন, উধার লাড্ডু ভি মিল রহা হ্যায়। সেকেণ্ডের মধ্যে লাইন ফাঁকা হয়ে গেল। সবাই দৌড়াল সেখানে, যেখানে রুটি ডালের সঙ্গে লাড্ডু দিচ্ছে। আমাদের সাধুদের এই দুরবস্থা। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, এখানে তো শুধু রুটি ডাল পাওয়া যাচ্ছে, অন্য জায়গায় রুটি ডালের সাথে লাড্ডুও পাওয়া যাচ্ছে। সাধু জীবনে লেগে থাকা, সাধন জীবনে লেগে থাকা, সমস্যা এই লেগে থাকার অভাব।

কে ওকে ও-কথা বলে দিলে? আপনার মনে করছে!...আচ্ছা, একটু পুরশ্চরণ করবে। যেখানে ঠাকুর সাক্ষাৎ ওনার হাত ধরে আছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে ঠাকুরের হাত ছেড়ে নিজের মত করা, এর থেকে হঠকারিতা আর কি হতে পারে! যেটা বলা হচ্ছিল, যখন আপনার সাধন জীবন শুরু হবে, বিশেষ করে ষাট বছর বয়সের পর থেকে, তখন ঠাকুরের উপরে সব ছেড়ে দিতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, হে ঠাকুর! আমার পুরো মন, প্রাণ যেন তোমার সাধন-ভজনে লেগে থাকে। সংসার তিনি দেখবেন। সাধনায় নিজের অহঙ্কার, নিজের আমিকে লাগাতে নেই। যেখানে নিজের আমি লাগাবেন, সেখানেই সমস্যা এসে যাবে।

(মাস্টারের প্রতি) –আচ্ছা আমার এ-সব কি বাইয়ে, না ভাবে?

মাস্টার অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে এইরূপ কথা কহিতেছেন। তিনি অবাক হইয়া দেখিতেছেন। ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে, বাহিরে আবার অন্তরে। অতি নিকটে না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে কেমন করে কথা কচ্ছেন।

এই যে ঠাকুর বলছেন, আমার এ-সব কি বাইয়ে, না ভাবে? ঠাকুরের কি সন্দেহ হচ্ছে? তা কি কখন সম্ভব! গীতায় ভগবানের উপদেশ শোনার পর শেষে গিয়ে অর্জুন বলছেন, *গতসন্দেহঃ*, আমার সমস্ত সন্দেহ মিটে গেছে। যাঁর সাক্ষাৎ মা কালীর দর্শন হচ্ছে, মার সঙ্গে কথা বলছেন, যাঁর মুহুর্মুহু সমাধি হচ্ছে, অদ্বৈত জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কি কোন সন্দেহ হতে পারে? তার কি কখন মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এগুলো আমার বাই না মনের ভাব? ভবিষ্যতে এই কথাগুলোকে নিয়েই লোকেরা প্রশ্ন তুলবে। এখনও নিন্দুকরা আসতে শুরু করেনি। অবতারের ভাব যখন অনেক ছড়িয়ে যায়, তখন নিন্দা আসতে শুরু হবে। যখন নিন্দুকরা এসে নিন্দা করতে শুরু করবে, তখন তারা এই জিনিসগুলিকেই বেছে নিয়েই প্রশ্ন তুলবে। ঠাকুরের মাথার রোগ ছিল, বাই ছিল, এই ছিল, সেই ছিল। আগে থেকেই ঠাকুর এগুলো নিয়ে আসছেন, তোমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আসবে আমি জানি।

যীশুরও খুব সুন্দর ঘটনা আছে। থমাস ছিলেন ওনার শিষ্য, ওনার নামই দিয়েছিলেন, ডাউরিং থমাস, সন্দেহ করবে যীশুকে। অবতাররা আগে থেকে জানতে পারেন –আমার এই বিশেষ শিষ্য এই রকম করবে। আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন। কারণ, কি হয়, একবার যিনি চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তখন আর কোথাও কোন সংশয় আসবে না। মনে রাখবেন আপনি যখন জপধ্যান করবেন, তখন কিছু কিছু স্বপ্ন আসবে। স্বপ্ন আসছে, ভাল। স্বপ্ন দেখা এমন কিছু আহামরি না। আবার কিছু কিছু দর্শনও হবে। স্বপ্ন, দর্শন; এগুলোর কোন দাম নেই, সব মনের খেলা। কিন্তু চৈতন্যের যখন একবার দর্শন হয়ে যাবে, তখন এসব কিছু আসবে না, কোন সংশয় থাকবে না –আপনি ঋষির মত পরিষ্কার জানবেন, ঋষির মতই বলবেন –*বেদাহমেতং পুরুষং*, আমি সেই পুরুষকে জেনেছি। সংশয়, সন্দেহ এগুলো আমাদের জন্য, যাঁরা খুব ভাল ভক্ত, হয়ত একটু এগোতে শুরু করেছেন; তার প্রথম লক্ষণ হল, মনে সন্দেহ আসবে –ঠাকুরের কি সত্যিই এ-সব ছিল, সত্যিই কি এ-সব হয়, আমারও কি কিছু হবে; সাবধান করছেন –এগুলো বাই। মাস্টারমশাই একটা দুটো বাক্য দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। আবার অন্য জায়গায় দেখা যাবে, ঠাকুর নিজে অন্য রকম বলছেন। যেমন বলছেন, চৈতন্যের চিন্তা করে কি কেউ বেহেড হয়। ঠাকুর তো চৈতন্যের চিন্তা করেন না, তাঁর তো প্রত্যক্ষ, চৈতন্যের সাথে এক, কিসের বাই! ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ তারিখের প্রসঙ্গে এখানেই শেষ হয়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ
পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ –কলিযুগে নারদীয় ভক্তি

আজ বুধবার, (১০ই আশ্বিন) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা দশমী তিথি, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। (পৃঃ ২৭৮) বুধবারে ভক্তসমাগম কম। মাস্টারমশাইয়ের সাথে কথা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –হ্যাঁগা, নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? (সহাস্যে) ঠাকুর নিজেই হাসছেন, হাসতে হাসতেই বলছেন –**নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালীঘরে যান; যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না**।

কালীঘরে যাওয়ার উপর আগে আমরা আলাদা ভাবে বিস্তারে আলোচনা করেছি। **১৮৮৩** সালে ঠাকুর এই কথা বলছেন, ঠাকুরের কাছে স্বামীজীর যাতায়ত সবে দুটি বছর হয়েছে। খুব নামকরা কথা –ঠাকুর অবতার, কিন্তু স্বামীজী অবতার রূপে মানার অবস্থায় নেই; যদিও ঠাকুরের কাছে এই কয়দিনে নরেন অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু অনুভব করেছেন। কিন্তু ঠাকুর অবতার বরিষ্ঠঃ, নরেনের এটা বোঝার প্রশ্নই নেই এখন, কারণ নরেন তখন কুড়ি বছরের এক যুবক, এই বয়সে কতটুকুই বা বুদ্ধি

থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রশিক্ষিত। ব্রাহ্মসমাজের যে ভাব, সেই ভাবের দ্বারা নরেন তখন প্রভাবিত। ব্রাহ্মসমাজে তখন অনেক বড় বড় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে; কিন্তু সেটা একটা জিনিস আবার ধর্ম আর-একটা জিনিস। আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরের সঙ্গে বাস্তবে ঢুকে যাওয়া, এ জিনিস সম্ভব না, এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা জিনিস। সাধন ভজন একটা জিনিস, কিন্তু যেটা কোর স্পিরিচুয়ালিটি, এটা পুরোপুরি আলাদা। এটাই যদি জীবনে একবার বুঝে নিতে পারেন, বুঝবেন অনেক কিছু হয়ে গেল।

ধর্ম পালন, ধর্মের আচরণ করা এগুলো মনের জগতের আর ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে নিয়ে থাকা, এটা মনের রাজ্যের পারের ব্যাপার। বেদের উপর আমাদের একচল্লিশটি ক্লাশ হয়েছে। বেদের ক্লাশের উপর অন্য ধর্মের জনৈক একজন খুব করে হিন্দুদের গালাগাল দিয়েছে। যুক্তি কি? তোমরা তো তোমাদের মরাকে পুড়িয়ে দাও। তারপর তারা যে ঈশ্বরকে মানে, তার নাম করে বলছে, তিনি যখন তোমাকে আবার জীবিত করতে চাইবেন, তখন তোমাদের একজনকেও পাওয়া যাবে না, কারণ তোমরা সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছ; ওদের ধর্মগ্রন্থে নাকি এটা লেখা আছে। যদি উল্টোটা বলা হয়? আমাদের বাল্মীকি রামায়ণে আছে; অসুর, রাক্ষসদের মাটিতে পুতে শেষকৃত্য করা হত। তাহলে কি হবে? মুশকিল হল এটাই। আপনি একটা সিস্টেমে বড় হচ্ছেন, বড় হোন, বড় হওয়াতো ভাল। সেখান থেকে উঠে যদি আপনি ঈশ্বরের দিকে যেতে পারেন, এর থেকে ভাল আর কি হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি অপরকে নিন্দা-মন্দ করতে থাকেন, তাহলে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ কাঁচের বাড়িতে যারা থাকে তাদের কাঁচের বাড়ি থেকে অপরকে পাথর ছুঁড়তে নেই। আমরা কিছু বলি না। কিছু বললেই, দাঙ্গা, মারপিট লেগে যাবে, সে আর-এক অশান্তি।

এক রাজা, প্রচণ্ড অহঙ্কারী। একজন বড় দর্জি এসে রাজাকে বলল, হুজুর আমি আপনার জন্য এমন এক পোষাক বানাবো, যা কেউ কখন দেখেনি। তবে এর একটা শর্ত আছে –যে নিজের বাপের সন্তান নয়, সে এই অদ্ভুৎ পোষাক দেখতে পাবে না। রাজা খুব খুশি। দর্জি রোজ এসে রাজার মাপ নিচ্ছে, এই করে করে রাজার কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছে। শেষ একটা পোষাক নিয়ে আসা হল। আজ রাজাকে সেই পোষাক পরানো হবে। পোষাক পরাবার সময় দর্জি শুধু ভান করে যাচ্ছে। এই হাতা এটাতে এই হাতটা ঢোকান, এখান দিয়ে বাঁ পা ঢোকান। রাজা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কি করে দেখবে, কিছু তো পরানো হচ্ছে না। রাজা কোন পোশাকই দেখতে পাচ্ছেন না, বুঝতে পারছেন –আমি তো আমার বাপের ছেলে না। কিন্তু বলে যেতে হচ্ছে, সত্যিই কি দারুণ হয়েছে পোশাকটা। মন্ত্রীও তাই বলছে, সেনাপতিও তাই বলছে, সব আমলারা তাই বলছে। সবাই আতঙ্কিত, আমি যদি বলি কিছুই তো পোশাক দেখছি না, তাহলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে আমি আমার বাপের সন্তান নই, অন্যরাও জেনে যাবে। এবার রাজা হাতির পিঠে চেপে রাজমহল থেকে বেরিয়ে নগরের রাস্থায় ঘুরবেন। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে। সবাই বর্ণনা করে যাচ্ছে –কি সুন্দর ডিজাইন, জরির কাজগুলো কি সুন্দর, উত্তরীয়টা কি সুন্দর, রঙের কি সুন্দর সামঞ্জস্য। যে যেটা বলছে, সেটাই পুরো জনতা বলছে। ওই ভিড়ের মধ্যে একটা বাচ্চা তার বাবার হাত ধরে রাজার পোষাক দেখতে এসেছে। বাচ্চা ছেলেটি বাবার হাতটা টান দিয়ে বলছে, বাবা! রাজা যে উলঙ্গ, রাজার গায়ে তো কোন পোশাক নেই। বাবা তাড়াতাড়ি করে ছেলের মুখ চেপে ধরছেন –চুপ, চুপ, চুপ। সবাই জানে রাজা উলঙ্গ, কিন্তু কারুর বলার সাহস নেই।

আমরা যেটাকে নিয়ে বড় হই, আমরা মনে করি সেটাই সত্য। খ্রীশ্চানরা ওই সিস্টেমে বড় হয়েছে, ওটাকেই তারা বড় মনে করছে। শিকাগো পার্লামেন্ট যে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে কয়েকজন খ্রীশ্চান পাদরি গিয়ে ঘোর আপত্তি জানাল –বিশ্বধর্ম সম্মেলন বলতে আপনারা কি বলতে চান; খ্রীশ্চানের ধর্মের সমতুল্য অন্য কোন ধর্ম আছে? এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে আপনারা কত বড় পাপ করছেন বুঝতে পারছেন না। পাদরিরা ওই সিস্টেমে বড় হয়েছে, তাদের কাছে তাই ওটাই মনে হয়েছে।

কিন্তু ঠাকুর স্বামীজীকে স্নেহ করেন, স্বামীজীও বুঝতে পারছেন –ইনি সাধারণ কেউ নন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন। উনি উত্তর বলেছিলেন, আমি দেখিনি, কিন্তু তোমার যোগীর চোখ, তোমার হবে। ঠাকুর নরেনকে সেইভাবে কিছু বলেননি, হ্যাঁ আমি দেখেছি, চাইলে তোমাকেও দেখাতে পারি। আমাদের বর্তমান ভাইস চ্যান্সলার, স্বামী সর্বোত্তমানন্দ মহারাজ, উনি আইআইটি, কানপুরের one of the greatest geniuses, আপনারা ওনার খবর জানেন না, খুব নীরবে কাজ করে যান। কম্প্যুটার র‍্যাশানাল জেওমেট্রির উপর ওনার পেপারগুলো সারা বিশ্বে পড়ানো হয়। কানপুরে আইআইটি পড়ার সময় বি টেক, এম টেক আর পিএইচডি এক সঙ্গে তিন বছরে করেছেন। আবার একজন গোল্ড মেডালিস্ট। সোস্যাল সার্ভিস করার জন্য তিনি বস্তার জেলায় যেতেন। ওখানকার আদিবাসীরা ওদের সেবার কাজে খুব খুশি।

একবার ওখানকার একজন আদিবাসী মহারাজকে দেখে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ'? মহারাজ তখন পিএইচডি করছিলেন। মহারাজ সেই আদিবাসীকে বললেন, 'আমি কম্প্যুটারে পিএইচডি করছি'। আদিবাসী লোকটি কি বুঝল ওই জানে। কিন্তু মহারাজকে খুব করে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন –পাঁচমি পাশ কর যাও তো ম্যায়নে তুমোক ইঁহা পোস্টমাস্টার কি নকরি লাগাওয়া দেঙ্গে। বলতে চাইছেন, ক্লাশ ফাইভটা যদি কোন রকমে পাশ করে যেতে পার, আমি তোমাকে এখানে পোস্টমাস্টারের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। মহারাজ তখন কম্প্যুটারের পিএইচডি, ভারতের বেস্ট। আদিবাসীরা মহারাজকে ভালবাসে, তাদের যতটুকু জ্ঞান, ততটুকুই ভালবেসে বলছে। নরেনও ঠাকুরকে ভালবেসেই বলছেন –উনি এখনও কালীঘরে যান; যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন আর যাবেন না। আদিবাসী লোকটি যেমন বলছেন, পাঁচমি পাশ কর যাও, পোস্টমাস্টার কি নকরি লাগাওয়া দেঙ্গে। ঠাকুর কারুর নিন্দা করছেন না, এটাই ঠিক ঠিক শক্তির প্রতি, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা, তিনি অপরকে কখন ছোট করেন না।

এখানে মাঝে মাঝে আসে বলে বাড়ির লোকেরা বড় ব্যাজার। সেদিন এখানে এসেছিল, গাড়ি করে। সুরেন্দ্র গাড়িভাড়া দিছল। তাই নরেন্দ্রের পিসী সুরেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করতে গিছল।

সবাই চায় দেশে অনেক নেতাজী হোক, ক্ষুদিরাম হোক; কিন্তু আমার বাড়ি থেকে না, পাশের বাড়ি থেকে হোক। সাধু মহাত্মা হোক, খুব ভাল; কিন্তু আমার বাড়ি থেকে না। রেগে গেলে আমাদেরও গালাগাল দিতে ছাড়বে না, বলবে, সব সোস্যাল প্যারাসাইটস।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা কহিতে কহিতে গাত্রোত্থান করিলেন। কথা কহিত কহিতে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে হাজরা, কিশোরী, রাখালাদি ভক্তেরা আছেন। অপরাহ্ন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁগা, তুমি আজ যে বড় এলে? স্কুল নাই?

মাস্টার –আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেন এত সকাল?

মাস্টার –বিদ্যাসাগর স্কুল দেখতে এসেছিলেন। স্কুল বিদ্যাসাগরের, তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিদ্যাসাগর সত্যকথা কয় না কেন?

সত্য দুই প্রকার –একটা হল, যখন কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে, সেখানে যে রকমটি হয়েছে ঠিক সেই রকমটি বর্ণনা করা, এটা হল সত্য। আর-একটা সত্য হল, কাউকে কোন কথা দিয়ে সেই কথা

রাখা। আগে আগে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি। আপনার বাণীই আপনার ব্যক্তিত্বের একটি অঙ্গ। আমরা যে যা কথা বলি, এই কথাগুলো আমাদের ব্যক্তিত্বের অঙ্গ। অনেক সময় দেখবেন, যারা অশিক্ষিত, অত্যন্ত প্রাকৃত, তাদের যা ভাষা, তাদের যে শব্দ চয়ন, কোনটাই ভাল না। কাউকে যখন গালাগাল দেয়, এত নোংরা নোংরা শব্দের ব্যবহার করে যে কানে আঙুল দিতে হয়। এই ধরণের ভাষা যখনই শুনবেন, তখন পরিষ্কার বুঝতে পারবেন এর ব্যক্তিত্ব কেমন। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের পিছন পিছন তার বাণী যায়, বাণীর পিছন পিছন আপনার ব্যক্তিত্ব যায়। যিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন না, কোথাও এনাদের জীবনে অনেক এলেমেলো আছে।

আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে জয়েন করেছিলাম, তখন আমার বয়স কুড়ি-একুশ। এমনিতে আশ্রমে আমাদের ঘর-বাড়ি সব বড় বড়, ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া ভাল। কিন্তু আশ্রমের সাধুদের যে অবস্থা, খুব করুণ। সাধুদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তখনকার দিনে রোগ হলে যদি এ্যন্টি-বায়েটিক দিয়ে দেয়, বেশির ভাগ সেন্টারের সেক্রেটারিদের মাথা ব্যাথা হত এই চিন্তায় যে, এ্যন্টি-বায়েটিকের এত খরচ, সেন্টারের এই তো কটি টাকা, কি করে সেন্টার চালানো হবে। গরম জলের আমাদের খুব সমস্যা ছিল।

স্বামী সুহিতানন্দজী, বর্তমানে যিনি মঠের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ওনার জন্য গরম জল আনা হয়েছিল। আমার তখন গরম জল খুব দরকার ছিল। উনি তখন বললেন, 'তুই জলটা নিয়ে যা'। উনি একটু জল তুলে নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে সত্য রক্ষা করলেন। এই যে সত্য রক্ষা; গরম জলটা ওনার নাম করে আনা হয়েছে, কিন্তু কোন কারণে অপরকে দিয়ে দিতে হচ্ছে। ঠাকুর এখানে যে সত্য বচন বলছেন, এটাই সত্য রক্ষা। আপনি একবার যখন বলেছেন আপনি এখানে আসবেন, তখন আপনার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। আর ছবিটাকে যদি বড় করে দেখা হয়, তাহলে কি দাঁড়াবে? বিদ্যাসাগর মহাশয় যতক্ষণ এই সত্যকে পূর্ণ না করছেন, তাঁর মুক্তি হতে পারবে না।

তার মানে, ঠাকুর কবে আবার অবতার হয়ে আসবেন, আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি ঘুরে ঘুরে তাঁর কাছে পৌঁছে যান, তখন এটা পরিষ্কার হবে। তা নাহলে, আমরা অন্যদের যে কথাগুলো দিয়ে রেখেছি, বা যে কথাগুলো বলেছি, এই সত্যকে পূর্ণ করবার জন্য আমাদের বারবার আসতেই হবে। বাচ্চা বয়সে আমাদের বুদ্ধি পাকা হয়নি, তখন কাকে কি কথা দিয়েছিলাম হয়ত মনেও নেই, এখানে সেই কথাগুলোকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। আপনি সচেতন ভাবে যে কথা দিয়েছেন, তার কথা বলা হচ্ছে। সেইজন্য কাউকে কথা দেওয়ার সময় খুব সতর্ক হয়ে, সামলে কথা দিতে হয়। এমনকি হাসি-ঠাট্টাতেও যখন কথা বলছি, তখনও খুব সাবধান থাকতে হয়। রেগেমেগে কাউকে যদি বলেন, তোমাকে দেখে নেব; এই জন্মে যদি তাকে দেখে নিতে না পারেন, তাহলে আবার পরের জন্মে আপনাকে আসতে হবে ওকে দেখে নেওয়ার জন্য। আবার কাউকে যদি বলেন, আমি তোমাকে সারা জীবন ভালবাসব; তাহলে বুঝে নিন, এই ভালবাসা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাকে বারবার আসতে হবে, যতক্ষণ না মিটিয়ে নিতে পারছেন। আমরা এই জিনিসগুলির দিকে অতটা নজর দিই না, কিন্তু এগুলো সত্য।

ঠাকুর এখানে যখন বলছেন, বিদ্যাসাগর সত্যকথা কয় না কেন, ওই অর্থে বলছেন। যে কথা দেওয়া হয়েছে, সেই কথার সত্য রক্ষা এবার করতে হবে। সেইজন্য সত্য রক্ষা করার ব্যাপারটাকে খুব সম্মান করা হয়। যিনি সত্য রক্ষা করেন, কথা দিয়ে কথা রাখেন; এনাদের চিরদিন জয় হয়, কেউ এনাদের দাবাতে পারে না। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে বড় বড় কোম্পানীর যারা গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি এই ধরণের কথা দিয়ে রেখেছে; যারা ওই কথাগুলো রাখে, তাদের সম্মান অনেক বেশি হয়।

সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এই সে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান। ঠাকুরের কাছে অনেক সাধুরা আসতেন; তাঁদের কাছে অনেক দোঁহা আদি শিখেছিলেন, আর তার মধ্যে এই দোঁহাটাও

শিখেছিলেন। এখানে বলছেন, কেউ যদি সত্য রক্ষা করে আর অপরের স্ত্রীকে মাতৃসম দেখে, এদের এতেই হবে। এই দুটো নিয়মিত করলে মানুষ সাত্ত্বিক হয়ে যায়। একবার যিনি সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, তাঁর পক্ষে তিন গুণের পারে যাওয়াটা সহজ হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ঠাকুর কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একবারও মিথ্যাবাদী বলছেন না। এটাকে নিয়ে অনেকেই ঠাকুরকে নিন্দা আদি করতে ছাড়বে না। তবে এই ধরণের বড় মানুষরা যদি কাউকে কথা দেন, সেই কথা রাখতে হয়।

সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগির সেদিন বললে, এখানে আসবে, কিন্তু এল না। সত্যতে থাকলে কি হয়, আপনার বাণী ও আপনার ব্যক্তিত্ব এক হয়ে যায়। জিনিসটাকে অন্য দিক থেকে দেখলে –আপনি কাউকে কিছু কথা দিয়েছেন, যত হাল্কা ভাবেই দিয়ে থাকুন, আপনার মনে ওই কথা একটা দাগ ছেড়েছে। ওই দাগটা ততদিন থাকবে যতদিন ওই কথা রাখা না হয়। আপনি কাউকে বলেছেন, আমি অমুক দিন দেখা করব; যদি না দেখা করেন; বুঝে নিন, আপনাকে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে ওর সাথে দেখা করার জন্য –*পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*। কারণ আপনি যাকে যা কথা দিয়েছেন, সেটা আপনাকে রাখতে হবে। কিন্তু যেখানে মনে ছাপ ফেলছে, ওটা যদি ওয়ার্ক আউট না হয়, তখন ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এরপর ঠাকুর খুব নামকরা কথা বলছেন।

পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাত। সাধু, সন্ত-মহাত্মা, সন্ন্যাসী হন বা গৃহস্থ হন; একদিকে সাধু অন্যদিকে বাকিরা –পুরো আলাদা। সাধুর সঙ্গে অন্য আর কারুর মিল নেই। আমাদের সমস্যা হল, আমরা সবাই কর্তভজা সম্প্রদায়ের লোক। যিনি কর্তা তাঁরই ভজনা আমরা করি। যার ক্ষমতা আছে, তাকেই সবাই মানবে, ক্ষমতা ছাড়া আর কাউকে মানবে না। শক্তের ভক্ত, নরমের যম; বেশির ভাগ মানুষ এই ধরণেরই হয়। আমরা সব সময় গ্ল্যামারের পিছনে দৌড়াই, যেখানেই গ্ল্যামার দেখবে আমরা সেখানেই দৌড়ে যাব। পণ্ডিত দেখলে তার পাণ্ডিত্যের গ্ল্যামারে আমাদের চোখ ঝলসে যাবে। সাধুদের গ্ল্যামার থাকে না। যিনি ঠিক ঠিক সাধু, তাঁর কোন ঐশ্বর্য থাকে না; তাঁর ঐশ্বর্য ভিতরে প্রবেশ করে যায়, বোঝাই যায় না। ঠাকুরকে দেখে কজন বুঝতে পারত যে তিনি একজন সাংঘাতিক কিছু; কে বুঝতে পেরেছিল যে সমাজে, ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায় তিনি এতবড় আলোড়ন তৈরী করতে যাচ্ছেন? আপনরা দেখবেন, পুরো ভারতবর্ষে মানুষ একমাত্র চেনে জানে রাজনৈতিক নেতাদের, কবি, লেখক, সিনেমার স্টারদের মত সেলিব্রেটিদের। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপুষ্ট, তাঁদের কজন আর জানে। ঠাকুরকেই বা কজন জানতেন। ফলে পণ্ডিত আর সাধুতে তফাৎ কেউ বুঝতে পারে না।

আর একটা ছোট্ট গণ্ডিবদ্ধ সমাজ যদি থাকে, সেখানে একজন পণ্ডিতকে খুব সহজে জানা যায়, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, সংস্কৃতের শ্লোক বলছেন, পাণ্ডিত্য আছে; এমনিতেই লোকেদের চোখে পড়ে যায়। কিন্তু মানুষের চোখে তো এক্স-রে মেশিন নেই যে, পণ্ডিতের ভিতরে কি আছে সেটা জানতে পারবে। আপনি কজনের পিছনের ঘুরে বেড়াবেন। এইজন্য অবতার যখন আসেন, লোক তাঁকে জানতে পারে না। সাধু, মহাত্মাকেও বেশি লোক জানতে পারে না। তাঁর অন্তর্ধানের পরে ওনার শিষ্য ও অনুরাগীরা, যাঁরা ওনার ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা যদি তাঁকে জনমানসে তুলে ধরেন তবেই মানুষ জানতে পারে যে, তিনি এত কিছু ছিলেন।

শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী-কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। সাধু ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না, কোন কিছুতে রুচি নেই।

সাধুর পাণ্ডিত্যে রুচি নেই, পাণ্ডিত্যের বর্ণনা করাতে রুচি নেই; কাউকে যে প্রভাবিত করতে হবে, এসবে সাধুর কোন রুচি নেই। একটু আগে ঠাকুর বলছিলেন –আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনে মা, কোন কিছুতেই নেই। কে তাঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এটা কিন্তু আপনাদের জন্য আরও বেশি সত্য। এই যে বলছেন, সাধুর মন হরিপাদপদ্মে, চব্বিশ ঘন্টা মন

হরিপাদপদ্মে, পার্টটাইম কিছু নেই। ঠাকুরের বর্ণনা আছে, যাত্রা দেখতে গেছে, এখানে প্যালা দিতে হয় না, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোন রকমে ভিতরে ঢুকে সামনের সারিতে গিয়ে বসবে। মন্দিরেও আমরা দেখি, ঠেলেঠুলে কোন রকমে সামনের দিকে বসবে। তাতেই তার আত্মতুষ্টি, সামনে বসে আরতি দেখাটা যেন একটা বিরাট পূণ্যের কিছু।

পণ্ডিত বলে এক আর করে এক। এই যে আমরা ব্যক্তিত্বের কথা বললাম, যে কথা দেওয়া হল, কথা দেওয়ার পর তিনি যে কর্ম করছেন, এই কর্মটাও যে ঠিক তার পিছনে পিছনে চলবে, তা হয় না, ছিটকে যায়। **সাধুর কথা ছেড়ে দাও! যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা**। আলাদা মানে আলাদা থাকের, এনারা অন্য স্তরের হন। আমি সব সময়ই বলি, যেখানে গ্ল্যামার দেখবেন, বুঝবেন সেখানে সন্দেহের কিছু আছে। কারণ সাধারণ মানুষ গ্ল্যামার খোঁজে, ঐশ্বর্যকে ভালবাসে। সিনেমার চটুল গান সবাই বোঝে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদর মুষ্টিমেয় কয়েকজনই দিতে পারে। এটাও বোঝে না যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আছে বলেই চটুল গানগুলি আছে; আসলটা আছে বলে, সাধারণটাও আছে। আসল যদি না থাকে তাহলে সাধারণগুলি কিভাবে থাকবে। দিল্লিতে প্রাইম মিনিস্টার আছেন বলেই দিল্লির রাস্থায় চায়ের দোকানেও পলিটিসিয়ান পাওয়া যায়। কিন্তু যখন রাজা-রানীর দেশ চালাতেন, তখন কি আর পলিটিসিয়ান পাওয়া যেত? ওই পরম্পরাতে চলত।

সাধুদের যে কথাবার্তা, সাধুদের যে কাজ, সাধুদের যে চিন্তা-ভাবনা সমস্ত কিছুর কেন্দ্র হরিপাদপদ্ম। আমি যখনই সুযোগ পাই, যাঁরা আমাদের এখানে এসে অফ লাইন ক্লাশ করেন, যাঁদের সাথেই দেখা হয়, সবাইকে আমি বলি, জীবনের উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক হওয়া না; উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরীয় ভাবকে ধরা এবং ধরে রাখা। সাধু মানেই তাঁর ঈশ্বরীয় ভাব। ঈশ্বরীয় ভাবে কি হয়? অকাতরে দান, কোন চাহিদা নেই; কামিনী-কাঞ্চন ছেড়ে দিন, তাঁর দেহের প্রতিও কোন আসক্তি নেই। ঈশ্বরীয় ভাব, এটা একটা আলাদা জিনিস, এর সাথে গ্ল্যামারের কোন সম্পর্ক নেই, ঐশ্বর্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর পাণ্ডিত্যের কথা বলছেন, পাণ্ডিত্যের কথা ছেড়ে দিন অন্য কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নেই, মনটা পুরো ঈশ্বরীয় ভাবে ভরে আছে। মূল কথা হল, সাধু কাউকে ভরসা দিয়ে, কথা দিয়ে পিছিয়ে যাবেন না। যে করেই হোক একবার কথা দিয়ে দিলে, সেটা তিনি রাখবেনই রাখবেন, এতটাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য, সাধু যদি কাউকে কোন আশীর্বাদ দিয়ে দেন, ওই আশীর্বাদ ফলপ্রসু হতে বাধ্য। কারণ তাঁর নিজের কোন ইচ্ছা থাকে না, নিজের বলে কিছু নেই কিনা। সেইজন্য আপনার জন্য যদি তিনি নিজের কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে দেন; জোর করে না, ভিতর থেকে; ওই ইচ্ছা ফলপ্রসু হতে বাধ্য।

কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম। তার উমের তোমার মত। আমায় বলত 'প্রেমী সাধু' কাশীতে তাদের মঠ আছে; একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে লয়ে গেল। এই ঘটনাটা খুব টাচিং। মথুরবাবু ঠাকুরকে বৈদ্যনাথধাম, কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন। নানকপন্থী সাধু ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছেন। **মোহন্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'উপায় কি'? সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি**। নারদীয় ভক্তি –প্রাণ ঢেলে শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসা। **পাঠ কচ্ছিল। পাঠ শষ হলে বলতে লাগল –'জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'। সব শেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ**। এখানে ঠাকুর মহন্তের কথা বলছেন বলে আমার মনে হয় না, নানকপন্থী সাধুর কথাই বলছেন।

একদিন গীতা পাঠ করলে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না! কম বয়সে এই ধরণের আঁট বেশি থাকে। মহন্ত যিনি তাঁর বয়স একটু বেশি, আবার একজন গিন্নীর মত, সবার প্রতি ভালবাসা। **আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজোবাবু ছিল। সেজোবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগল**। কম বয়সী যারা হয়, তারাই এই রকম করে। কম বয়সে তেজটা বেশি থাকে কিনা। **সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায়, 'নারদীয় ভক্তি'**।

মাস্টার –ও-সাধুরা কি বেদান্তবাদী নয়? মাস্টারমশাই জানেন বেদান্তবাদীরা ভক্তিমার্গের কথা বলে না। সাধুটি নারদীয় ভক্তির কথা যেহেতু বলছেন, তাই মাস্টারমশায়ের মনে হতে পারে এনারা বেদান্তবাদী নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁ, ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে। গুরু নানক নিজেও ভক্তিমার্গকে মানতেন। **কি জানো, কলিযুগে বেদমত চলে না। একজন বলেছিল, গায়ত্রীর পুরুশ্চরণ করব**। ঠাকুরের মনের মধ্যে এখনও ঈশানের কথা চলছে। **আমি বললুম, কেন? কলিতে তন্ত্রোক্ত মত। তন্ত্রমতে কি পুরশ্চরণ হয় না?** একই বিষয় নিয়ে চলছে।

বৈদিক কর্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ওইরকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্তা পেয়ে যায়! তাদের রজঃ, তমোগুণ, জীব-হিংসা, বিলাস –এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে হয়। শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনশন খায়।

কি হয়, যারা বড়লোক, যদের ক্ষমতা আছে তাদের বেশির ভাগ লোক হিংসা না করে, অপরের ক্ষতি না করে কখনই বড়লোক হতে পারবে না, ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না; অসম্ভব। যারা দেখেন, নিজের এক জীবনেই বিরাট বড় হয়ে গেছেন, বুঝতে হবে, অনেকের মাথার উপর পা রেখে এখানে পৌঁছেছেন। ঠাকুর আবার একজন বেদান্তবাদীর কথা বলছেন।

একটি বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচত, ঝড়বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। ব্যক্তিগত ভাবে বলি, আমারও এ-রকম করতে খুব ইচ্ছে হয়। ঈশ্বরের যে এই বিরাট রূপ, যে বিরাট রূপের মধ্যে এই আকাশ, সেই আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘ দেখে আনন্দ কবিরাও পান, প্রেমিকও পান, আমরা সাধুরাও পাই। বেদান্তবাদী সাধু, তিনিও মেঘ দেখে আনন্দে নাচছেন।

ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত। আমি আমাদের সাধুদেরও দেখেছি, খুব বিরক্ত হয়ে যান। **আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত। সর্বদাই বিচার করত, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রঙ দেখা যায়; –বস্তুতঃ কোন রঙ নাই**। জগৎটা ঠিক তাই। মাণ্ডুক্য কারিকাতে বারবার এই কথা বলা হচ্ছে। সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্রই সত্য; ঢেউটা সত্য নয়। আত্মাই আছেন, চৈতন্যই আছেন; এই জগৎটা যেন তাঁর ঢেউ। **তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই**। ঠাকুর এই কথা বারবার বলছেন। জানি না কেন, কিছু কিছু শ্রোতা ও আমার কিছু পরিচিতরা বলেন, 'মহারাজ, মাণ্ডুক্য কারিকা খুব কঠিন বলে মনে হয়'। কথামৃতকে কি সোজা বলে মনে হয়? কিন্তু কথামৃত তো একই কথা বলছেন আর কথামৃতের কথাই মাণ্ডুক্য কারিকাতে আছে।

কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে। এই কথাই আমাদের উপনিষদ বলছে, মাণ্ডুক্য কারিকা বলছেন। আর জগৎকে কে দেখছেন? আত্মাই দেখছেন। আপনিই আত্মা। তাহলে এগুলো কোথায় হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? সবই তাঁর কল্পনা। আপনি নিজেকে দেহ রূপে দেখতে চাইছেন, সংসারকে সংসার রূপে দেখতে চাইছেন। আপনি বলবেন, আমি আর দেখতে চাই না। আপনি দেখতে চাই না বললেই কি আপনাকে ছেড়ে দেব? আপনি বললেই কি ছেড়ে দেবে? এতদিন ধরে এগুলোকে পুষে রেখেছেন, আর আপনার মনের বাসনাগুলি কি গেছে? মুখে আপনি বলছেন, আমি সব কিছু ছেড়ে দিতে চাইছি। সাধন, ভজন, তপস্যা করলে তবে এগুলো যায়।

পাছে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জিনিস একবার বই আর দেখবে না। স্নানের সময় পাখি উড়ছে দেখে বিচার করত। দুজনে বাহ্যে যেতুম। মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না।

আগেকার দিন যাঁরা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তা তিনি বেদান্তীই হন আর যাই হন, এই ব্যাপারে খুব গোঁড়া ছিলেন। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতে প্রত্যেক স্টেশনে জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকত। সেখানে পরিষ্কার হাঁক দিয়ে বলে দেওয়া হত 'হিন্দু পানি' 'মুসলমান পানি'। **হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা কল্লে, ব্যাকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হল। তিনদিন এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে সানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার ওই শব্দ শুনে সমাধি হয়**।

সানায়ের শব্দ এত মধুর আর মিষ্ট যে, আমাদের মত সাধারণ যারা, মনটা একটু শান্ত করে সানায়ের রাগরাগিনীর বাজনা শুনলে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মনটাও যে কোথায় লয় হয়ে যাবে, নিজেও বুঝতে পারা যায় না। ঠাকুরের একদিনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একদিন রাতে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় কেউ বাঁশি বাজাচ্ছিল, সেই বাঁশির সুর শুনে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এই যে ঈশ্বরীয় জীবন, ঈশ্বরকে নিয়ে থাকার কতগুলো ছবি আমরা এই একদিনে পাচ্ছি।

অষ্টাবিংশতম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ –পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন

কথামৃতের ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ এই দিনের আলোচনা চলছে। মাস্টারমশাই পরের পরিচ্ছেদে আলোচনাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেই আছেন। আমরা আগেও এই কথা বলেছি যে, কথামৃত যদি অধ্যয়ন না করা হয়, সাথে সাথে কথামৃতের অনুধ্যান যদি না করা হয়, ধর্ম সম্বন্ধে কোন কিছুই পরিষ্কার হবে না, ধর্মকে বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মকে বোঝা অসম্ভব। কথামৃত যদি ভাল করে অধ্যয়ন করা থাকে, গভীর ভাবে চিন্তন যদি করা থাকে, তবেই বোঝা যাবে ধর্ম জিনিসটা কি।

প্রথমেই মাস্টারমশাই বর্ণন করছেন –**ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। সেই বালকের ন্যায় চলন! মুখে এক-একবার হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! কোমড়ে কাপড় নাই, দিগম্বর, চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে! ঠাকুর ছোট খাটটিতে আবার বসিলেন। আবার সেই মনোমুগ্ধকরী কথা**।

কল্পনাই করা যায় না। এই সেই দক্ষিণেশ্বর, সেখানে ঠাকুরের সেই ঘর। ঘরে লোকজন আছেন। ঠাকুর নির্বিকার, বালক স্বভাব, কোমড়ে কাপড় নাই, দিগম্বর, চোখ দুটো আনন্দে ভাসছে। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে গেছেন, সেখানেও তিনি জামার বোতামের ব্যাপারে সাবধান। কিন্তু ঠাকুর যখন নিজের মত পরমহংস অবস্থায় আছেন, সব কিছুতে নির্বিকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) –ন্যাংটার (তোতাপুরী) কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"। বাজিকর এসে কত বাজি করে; আমের চারা, আম পর্যন্ত হল। কিন্তু এ-সব বাজি। বাজিকরই সত্য। বাজি মানে জাদু। একটু পরেই ঠাকুর আবার বলবেন, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি' আবার 'মজার কুটি'ও বলছেন।

এখানে ভূমিকার একটু ব্যাখ্যা করে দিলে পরে বুঝতে সুবিধা হবে। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' আমাদের খুব প্রচলিত কথা। অনেকের ধারণা, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', এই কথা উপনিষদ থেকে এসেছে। আমাদের এখানেও একজন আছেন, তাঁকেও বলতে দেখেছি, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' অমুক উপনিষদে আছে। আমি যতদূর পড়াশোনা করেছি, তাতে বলতে পারি যে, এই কথা আমাদের কোন উপনিষদে নেই; এটা আমাদের প্রচলিত কথা। উপনিষদের বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা আমরা দেখি, সেখানেও দেখা যাবে এই কথার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এটাই –ব্রহ্ম, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। ঠাকুর আবার অনেক জায়গায় বলছেন –ঈশ্বরই বস্তু, বাকি সব অবস্তু; একই কথা, তফাৎ কিছু নেই। এই

ভাবের উপর উপনিষদে আমরা অনেক মন্ত্র পাই –যেমন, *নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*, কঠোপনিষদের খুব নামকরা মন্ত্র। মাণ্ডুক্যকারিকাতেও এই জিনিসটাকে স্পষ্ট করছেন –*আত্মৈবং সর্বং*, আত্মাই সব কিছু; আত্মা ছাড়া কিছু নেই। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা দেখছি, স্বপ্নাবস্থায় যা দেখছি, গভীর নিদ্রায় যে অভাববোধ –সব সেই আত্মা।

এখানে আমরা বিষয় থেকে একটু সরে গিয়ে একটা সাধারণ জিনিসকে ব্যাখ্যা করছি। যে কোন বিষয়ের মূল বক্তব্য এক বাক্যে বলে দেওয়া যায়। তাহলে ওই বিষয়ের সঙ্গে যে এত কিছু জড়িত থাকে, সেটার ব্যাপারে কি বলা হবে? সেটা হল ওই জায়গাতে পৌঁছানর পথ। পৌঁছে গিয়ে সেখান থেকে যে বিস্তার, সেখানে এসব কিছুই নেই। প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে একই জিনিস হবে। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী, গ্রীক, যে কোন সাহিত্য নিন; সাহিত্যের একটাই কথা –মানুষ গাড্ডায় পড়ে; কিছু মানুষ ওখানেই পড়ে থাকে, কিছু মানুষ ওখান থেকে উঠে বেরিয়ে আসে। পুরো সাহিত্য এর মধ্যেই শেষ। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রের, সমস্ত ধর্মের একটাই বক্তব্য –আত্মাই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি; এখানেই সব শেষ। বাকি সব শাস্ত্র ওখান পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে আর যে কোন ধর্মে যা কিছু আছে সব তার ব্যাখ্যা; শুধু শব্দগুলো একটু উপর নিচ হয়। ঠাকুর বলছেন –ঈশ্বরই বস্তু, বাকি সব অবস্তু; একই জিনিস বলছেন।

বিজ্ঞানে আইনস্টাইন বললেন $E=MC^2$, পুরো বিজ্ঞান ধীরে ধীরে এই জিনিসটাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে; আর ওখান থেকে বাকি সব কিছুর বিস্তার হচ্ছে। আপনি আইনস্টাইনের এই ইক্যুয়েশান জেনে গেলেন, তাই বলে আপনি কি বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন? রান্না করতে চাল লাগে, ডাল লাগে, সবজি লাগে, লঙ্কা লাগে, হলুদ, লবণ লাগে; আমরা সবাই জানি। তাই বলে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলে সবাই কি ভাত, ডাল, সবজি দিয়ে দু-তিন পদ রান্না করে দিতে পারবেন? আমাকে ঢুকিয়ে দিলে এক বিচিত্র জিনিস তৈরী করে দেব; কারণ আমি রান্না করতেই জানি না। আপনি একটা জিনিসকে থিয়োরেটিক্যাল ভাবে জানেন বলে, সেই জিনিসটাকে জেনে গেছেন বলে মনে করছেন, কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা না। ঠাকুর এটাকেই খুব সহজ ভাবে বলে দিলেন –তবলার বোল মুখে আনা খুব সহজ, কিন্তু হাতে আনা খুব কঠিন। ওই যে সত্য, সেখানে পৌঁছানর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালবাসেন, তাঁরা একটা রাগের সুরটা হয়ত জানেন; কিন্তু গলা দিয়ে বার করার চেষ্টা করতে গেলে দম বেরিয়ে যাবে। সা রে গা মা সবাই জানে, কিন্তু গলা দিয়ে ঠিক ঠিক সা রে গা মা সুরটাকে বার করে দেখুন, গায়ক যদি না হয়ে থাকেন, আপনার দম বেরিয়ে যাবে।

ধর্মের ব্যাপারেও ঠিক একই জিনিস হয়। সবাই মনে করে আমি সত্যটা জেনে গেছি। ধর্মের একটা দুটো কথা যে জেনে গেছে, সেও মনে করে আমি ধর্মের সব জেনে গেছি। কিন্তু এটা তারা বোঝে না, ধর্মের যে শেষ কথা, সেটা জেনেছে মাত্র। কিন্তু যে কোন জ্ঞান; সাহিত্যের হোক, ধর্মের হোক, বিজ্ঞানের হোক, যতক্ষণ কেউ ওই জ্ঞানের সাথে এক হয়ে না যাচ্ছে, ততক্ষণ কোন জ্ঞানই জ্ঞান নয়। আইনস্টাইন যখন নামকরা তত্ত্ব থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি দিলেন, তখন কজন সেটা বুঝতে পেরেছিল? এখনও অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা এই থিয়োরি মানতে চান না। কিন্তু অনেক জায়গায় এখন গ্রাজুয়েট লেভেলে আইনস্টাইনের এই থিয়োরি পড়ানো হয়। যারাই পড়ছেন, সবাই একেবারে নিচ থেকে শুরু করে ওইখানে পৌঁছাচ্ছেন।

অহং ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা –ঠাকুরই আছেন, ঠাকুর আমাদের দেখছেন, ঠাকুরের কৃপা হবে –এগুলো হল ধর্মের শেষ কথা। ধর্মের শেষ কথাতে পৌঁছাবার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, সাধনা লাগে। ঋষিরা যে সাধনা করেছিলেন, যোগীরা যে সাধনা করেছিলেন; হেটমুণ্ড হয়ে কত তপস্যা; আর ঠাকুর যে সাধনা করেছিলেন, কোনটাই আমাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব না। সময় পাল্টে গেছে, শরীরের চাহিদা পাল্টে গেছে, শরীরের শক্তিও পাল্টে গেছে। আর ওই ধরণের সাধনা করার মত সময়ও কারুর কাছে নেই। ফলে খাটনিটা অন্য রকমের হয়ে গেছে। এখন জীবনকে যদি একটু নিয়মিত করে

নেওয়া হয়, এই যে আপনারা নিয়মিত শাস্ত্রের আলোচনা শুনছেন; দিনের পর দিন শুনে যাওয়া এটাও একটা সাধনার অঙ্গ। আপনারা যাঁরা নোটস্ নিচ্ছেন, এটাও সাধনা। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পঞ্চ যজ্ঞ করা, এটাও একটা সাধনা। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ঠাকুরের দিকে মনটাকে নিবিষ্ট করা, এটাও সাধনা। যেমন যেমন আপনি প্রস্তুতি নেবেন, সত্য তেমন তেমন আপনার সামনে পরিষ্কার হতে শুরু হবে। আর ধর্মের যে শেষ কথা –ঈশ্বরই বস্তু; এখানে পৌঁছানর জন্য অনেক বেশি খাটতে হয়। তবে আমরা তো এখন আর ওই সাধনা করার জন্য প্রস্তুত নই, কিন্তু কাজের কথা হল, জিনিসটা কি আগে একটু শুনে নিতে হবে। বাচ্চারা যখন প্রথম স্কুলে যায়, তাদের বাবা-মায়েরা বলে, জানো, আমরাও তোমার বয়সে স্কুলে গিয়েছিলাম, তোমার দাদা, দিদিও স্কুলে গেছে –এইসব বলে বলে আগে তৈরী করে দিতে হয়, তবেই সে স্কুলে যেতে প্রস্তুত হয়।

জগৎ মিথ্যা, এই কথার অর্থ কি? বেদান্তে ওনারা দুটি শব্দ নেন, প্রথমটা হল পরমার্থ –যার অর্থ হল শেষ সত্য। দ্বিতীয় শব্দ, ব্যবহার; যেটা আমাদের চোখের সামনে আছে। এই ব্যবহার বাংলা ব্যবহার না, বেদান্তের একটা টেকনিক্যাল শব্দ। পরমার্থের পরিভাষা কখন পাল্টায় না; ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, অর্থাৎ ত্রিকালে পাল্টায় না। ত্রি-জগতে, অর্থাৎ ভূর্ভবঃ স্বঃ, কোথাও পাল্টায় না। দ্বিতীয় পরিভাষা 'ব্যবহার' বা আমরা বলি ব্যবহার কালে –এটা অনবরত পাল্টাতে থাকে। কাল ছিল না, আজ আছে; আগামীকাল থাকবে না। এই কলম, একদিন এই কলমটা তৈরী হয়েছে, তার আগে ছিল না; এখন আছে, ভেঙে গেলে আর থাকবে না –এটাকে বলছেন, ব্যবহারিক সত্তা বা শুধু ব্যবহার। স্বাভাবিক ভাবেই সত্য দুই প্রকার হয়ে যায় –একটা চিরন্তন সত্য, অন্যটি অচিরন্তন সত্য; একটা পার্মানেন্ট, অন্যটি টেম্পোরারি। এই টেম্পোরারি জিনিসটাকেই মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা বলতে আমরা আমাদের ভাষায়, আমাদের যে বোধ দিয়ে যেটাকে আমরা মিথ্যা বোধ করি, মানে জিনিসটা নেই; তা কিন্তু নয়। ঋষিরা, জ্ঞানীরা, বেদান্তীরা বলবেন –এই যে কলম দেখছ, ঠিকই দেখছ; কলম রূপে দেখছ, ঠিকই দেখছ; আসলে এটা সেই ব্রহ্ম, এটাও সেই ব্রহ্মই হয়েছেন।

এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য তাঁরা কয়েকটি জিনিসের উদাহরণ দেন। প্রথমেই যে উদাহরণ দেন তা হল সমুদ্র আর ঢেউ। দ্বিতীয় উদাহরণ দেন সোনা আর তার গয়নার। তৃতীয় উদাহরণ মাটি আর মাটির পুতুল। যাঁরা গয়না পরে আছেন, এই গয়না সুবর্ণ রূপে সত্য, গয়না রূপে অস্থায়ী। কারণ আপনি যদি মনে করেন আমার গলার হারটা ভাল লাগছে না, এটাকে হাতের বালা বানিয়ে নেব। আপনি স্বর্ণকারের কাছে যাবেন, স্বর্ণকার আপনার গলার হারটা পাল্টে ওই সোনা দিয়েই একটা হাতের বালা তৈরী করে দেবে। সোনার যে নামরূপ ছিল, সেটা এখন পাল্টে গেল। কিন্তু সোনা যা ছিল সেটাই আছে। ঠিক তেমনি এই জগৎ হল নাম আর রূপের খেলা।

এই জায়গাতে এসে খুব মজার ব্যাপার হয়। আমরা জেনে গেলাম ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা বলতে অলীক না, মিথ্যা বলতে অনিত্য। জগৎ অনিত্য যখন বুঝে গেলাম, তখন জগৎটা ফেলে দিলেই হল? তা নয়। এই জায়গাতে এসে যার যেমন মন, যার যেমন ভাব, সেটা পাল্টে যাবে। জীবনে যদি কেউ প্রচুর আঘাত পেয়ে থাকে; রোগ, শোক, দুঃখ যদি প্রচুর পেয়ে থাকে; তখন সে বলবে, সংসার নিপাত যাক। কিন্তু যার জ্ঞানীর ভাব, আত্মাকে যে সব রূপে দেখতে চাইছে, তখন সে দেখবে – সংসারটা তো তাঁরই রূপ, সমস্যার কি আছে। ঠাকুর সেইজন্য একটা গল্প নিয়ে আসছেন। কোথায় এই গল্প তিনি পেয়েছিলেন আমরা জানি না। বোধ হয় কোন প্রচলিত গল্প আছে, বা কোন রামায়ণে আছে।

রাবণের মায়ের নাম ছিল নিকষা। রাবণ মারা যাওয়ার পর রামচন্দ্র, লক্ষণ, হনুমানদের দেখে নিকষা পালাচ্ছেন। ধরে আনার পর তাঁকে জিজ্ঞেসে করা হল, 'তুমি কেন পালাচ্ছিলে'? নিকষা তখন বলছেন, 'হে রাম, এতদিন বেঁচে ছিলাম বলে তোমার কত লীলা দেখলাম, বেঁচে থাকলে আরও কত লীলা দেখতে পাবো'। নিকষার মনের এই যে ভাব, মজা করে আমি এর নাম দিয়েছি –নিকষা যোগ।

নিকষা জগৎকে ফেলে দিচ্ছে না। এই জায়গাতে এবার সাবধান হওয়া দরকার। যারা বিষয়ী মানুষ, যাদের দেহের প্রতি আসক্তি, সংসারের প্রতি আসক্তি; তারা তো এটাই বলবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন –অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসারে যা করার কর। এই নিকষা যোগে সে সংসারকে মজা করে দেখবে। মজা করে দেখার আগে দরকার অদ্বৈত জ্ঞান। আপনাকে জেনে নিতে হবে সব কিছু সেই সচ্চিদানন্দ, তবেই এটা হয়।

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, ছাদে উঠতে গেলে ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, অর্থাৎ ত্যাগ করে যেতে হয়। যখন দেখলেন যে বস্তু দিয়ে ছাদ তৈরী হয়েছে, সেই বস্তু দিয়ে সিঁড়িও তৈরী হয়েছে। যেটা দিয়ে সিঁড়ি তৈরী, ছাদ সেই জিনিস দিয়ে তৈরী। সিঁড়ির প্রয়োজন আলাদা, ছাদের প্রয়োজন আলাদা। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন আলাদা আর সংসারকে সত্য মনে করে চলার প্রয়োজন আলাদা। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন সংসারটাই সত্য, যদি মনে করেন জগৎ সত্যম্ ব্রহ্ম মিথ্যা, সমস্ত পদার্থবিদরা তাই বলে। কিন্তু আপনার সেই ভাব না; এখানে সমস্ত ভাবের কথা। মাণ্ডুক্যে আছে, *যং ভাবং দর্শয়েৎ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি*। গুরু যেমন ভাব দেখিয়ে দিয়েছেন, শিষ্য তেমন ভাব নিয়েই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। হিন্দু মানে আপনি বিশেষ, কারণ হিন্দুদের কাছে ধর্ম জগতে এখন পর্যন্ত যত জ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। অন্যান্য ধর্ম যা বলে, হিন্দু ধর্মে সেটা একটা ছোট্ট অংশ।

আপনি কেন এই রাজ খাজানা ছেড়ে দুটো মাটির ঢেলা, কি দুটো সোনার টুকরো নিয়ে বেরিয়ে যাবেন? আমার একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে, আমেরিকার গল্প। একজন নূতন দম্পতি, বিবাহ হয়েছে, অনেকে অনেক রকম উপহার দিয়েছে। প্রচুর উপহার পেয়েছে। এক বছর পর এই দম্পতি ঠিক করল, এত উপহার রেখে কি হবে, বিক্রি করে দিলে হয়, নিলামের মত। নিজেদের পরিচিত লোক ও বন্ধুদের বলল, যার যেটা লাগবে নিয়ে নাও। ওর মধ্যে একটা ছবি ছিল, ছবিটা খুব একটা ভাল ছিল না, ছবিটার জন্য ওরা দাম রাখল পাঁচ ডলার। পরিচিতরা এসেছে, সবাই সব কিছু কিনে নিচ্ছে, যাতে দম্পতিরা কিছু টাকা পেয়ে যেতে পারে। ছবিটা দেখে বলল, এর দাম পাঁচ ডলার? যাই হোক পাঁচ ডলার দিয়ে একজন ছবিটা নিয়ে নিয়েছে।

যারা কেনাকাটা করল, তারা বলল, 'এই ছবিটার দাম মাত্র পাঁচ ডলার কেন রাখলে? এত সস্তায় ছেড়ে দিলে কেন'? দম্পতি বলল, 'না, এই দামটা ঠিকই আছে'। পরে দেখা গেল, এই ছবিটা খুব উচ্চমানের একটা পেইন্টিং, যার দাম দশ হাজার ডলারের উপর হবে। ছবিটার উপর একটা কভার লাগানো ছিল। কভারটা খোলা দরকার। যেমনি কভারটা সরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে অতি সুন্দর সোনালী রঙের একটা ছবি বেরিয়ে এলো। ওরা ছবিটা নিয়ে চলে গেল, কারণ দম্পতি বিক্রি করে দিয়েছে।

ঘটনাটা যখন পড়েছিলাম, পড়ার পর ঘটনাটা আমি নিতে পারলাম না। আমাদের কাছে এই রকম অনেক অতি মূল্যবান জিনিস আছে, আমরা জানিও না। আপনার শুনে অবাক হবেন, অনেক বাড়িতে অতি প্রাচীন সব পাণ্ডুলিপি ছিল। পরিবারের লোকজনরা জানে না এগুলো কি জিনিস; শাস্ত্রের ব্যাপারে অতটা জানে না। অনেক সময় ভারতের গিন্নিরা জ্বালানি কাঠ জ্বালানোর ঝামেলা এড়াতে এই প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাতাগুলোকে ফালতু কাগজ মনে করে আগুন ধরানোর কাজে ব্যবহার করেছে। এই ধরণের অনেক সব ঘটনা আছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা তাই করছি। মূল্যটা জানা নেই বলে দশ হাজার ডলারের জিনিস পাঁচ ডলারে ছেড়ে দিচ্ছি। খুলেও দেখছি না, খুলে দেখলে আপনি জানতে পারবেন।

ব্রহ্মকে ছেড়ে জগৎকে সত্য মনে করা, এটাই আমরা করছি –দশ হাজার ডলারের জিনিস পাঁচ ডলারে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি রাজা, রাজবংশের আপনি একা রাজকুমার। নিজের রাজপাট, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আপনি ধুলো কাদায় খেলতে চান, তাতে কার কি বলার আছে। তর্কের খাতিরে কেউ অবশ্যই বলতে পারে, সংসারও তো সেই ব্রহ্মই, সংসার নিয়ে থাকতে দোষ কোথায়।

এগুলোই ফাঁকিবাজি কথা। কারণ যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ঈশ্বরজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ এসব কথা মুখে সাজে না। সেইজন্য প্রথমে নেতি নেতি করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। আমার এটা লাগবে না, আমি আগে জানতে চাই সত্যটা কি। তারপরে আপনার খুশি, সংসারে থাকুন আর নাই থাকুন, কিছু এসে যায় না। আপনি বললেন, আমি এখানেই থাকব; থাকুন। আপনি বললেন, ঠিক আছে, যতদিন দেহ আছে ততদিন সংসারটাও আমার জন্য সত্য। যার যেমন ভাব। কারণ যিনি বেদান্তী সন্ন্যাসী তিনি তো সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর-পরিবার নেই, বিয়ে-থা করেননি, সন্তান নেই; স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বলবেন, সংসার মিথ্যা। তিনি এসব কিছুই চান না, কোন কিছুই তাঁর লাগবে না। এগুলো ছেড়ে কবেই তো তিনি বেরিয়ে গেছেন, তাঁর সাধনাটাও তাই, তাঁর কাছে শেষ সত্যটাও তাই। কিন্তু সেখান থেকে বলা, শেষ সত্য এটাই; ভুল কথা। শাস্ত্র কখনই এই কথা বলছেন না, আচার্য শঙ্করও কোথাও বলছেন না, ঠাকুরও কোথাও বলছেন না। এই প্রসঙ্গটাই এবার এখানে পর পর চলতে থাকবে। এবার দেখবেন আপনার বুঝতে সুবিধা হবে।

মণি –জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম! এইটি বোঝা যাচ্ছে সব ঠিক দেখছি না। যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই তো জগৎ দেখছি; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে? এগুলো বিভিন্ন ফিলজফি। পাশ্চাত্য দর্শনে অনেকেই এই ধরণের কথা বলেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –

ঠাকুর –আর-একরকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি না; বোধ হয় যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। ঠাকুরও এটাকে মানছেন। দুজনেরই বক্তব্য হল, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যেটা দেখছি, যেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলছি, সেটা শেষ সত্য নয়। ফরাসী বিপ্লবের পর বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেকটাই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ তখন ওরা বলছিল, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যেটা দেখছি সেটাই সত্য; যুক্তিকেও তারা মানবে না। তবে আজকের দিনে এই মত আর চলে না। আপনি যদি বলেন, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা অনুভব করছি, জানছি, সেটাই আমার কাছে সত্য, তাহলে আপনি কিন্তু ফেঁসে যাবেন। এখানে এসে সে পদার্থবাদী বা যে ফিলজফিরই হোক, ওরা ফেঁসে যায়। আহার-নিদ্রা-মৈথুনে এদের জীবন আটকে যায়। **তেমনি কেমন করে মানুষ ঠিক দেখবে? ভিতরে বিকার**। চোখে যদি দোষ থাকে জিনিসটাকে অন্য রকম দেখবে।

সঙ্গে সঙ্গে **ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেছেন, বিকার ও তার ধন্বন্তরি** –

এ কি বিকার শঙ্করী! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরি। কিন্তু দেখুন ঠাকুর এবার কোথায় চলে আসছেন। এই অংশটা খুব জরুরী অংশ। আপনারা কথামৃত পড়বেন, পড়ে এই কথাটা বুঝবেন, এবং বুঝিয়ে আপনাদের পরিচিতদের বলবেন –

বিকার বইকি। দেখ না, সংসারীরা কোঁদল করে। কি লয়ে যে কোঁদল করে তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক, তোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল। গ্রামদেশে যাঁরা গরীব ছিলেন, তাঁরা এ-রকম করতেন না। কিন্তু বর্তমান কালে যখন চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে অভাব আদি বেড়ে যাচ্ছে, আর দেশে কেমন আমরা একটা পরিবর্তনের মুখে চলছি। ইদানিং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত লোকেরা যে এক অপরের প্রতি যে-ধরণের ভাষা ব্যবহার করে –তোমার এই হোক, তোমার সেই হোক; নিন্দা ছাড়া আর কিছু নেই, অভিশাপ, কটূ বচন ছাড়া কিছু নেই। আমাদের ইউটিউবে এমন এমন সব কমেন্ট দেয়, দেখে হাসি পায়। আমি রেখে দিই, থাকুক, লোকেরা দেখুক কি বলছে। কাউকে যে আপনি সত্যিকারের, ভিতর থেকে নিন্দা করবেন, আগে ওর ব্যাপারে একটু জানুন, জেনে নিন, তবেই না আপনি নিন্দা করবেন। তা নাহলে বলতে হবে, আপনি হলেন ফ্রীলেন্সার নিন্দাকারী, যেখানেই সুযোগ পেলেন নিন্দা করে দিলেন। মানুষ কতটা হাল্কা মনের হলে এ-রকম করতে পারে।

আমাদের যতগুলো ব্যাখ্যা আছে, এগুলো আপনারা যদি শোনেন, তাতে আপনি আর কিছু না কিছু শিখুন, একটা কথা যদি শিখে রাখেন –কাউকে গালাগাল দেবেন না; না সামনে, না পিছনে। আর চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না, গলার আওয়াজ তুলবেন না। খুব নামকরা কথা A man raises his voice, is not a gentleman, যিনি সত্যিকারের ভদ্রলোক, গলার আওয়াজ তুলবেন না। ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন –কি লয়ে যে কোঁদল করে তার ঠিক নাই।

আমার খুব প্রিয় গল্প। এক গ্রামের দুই বুড়ি খুব ঝগড়া করত। সব সময় নিজেরা ঝগড়া করত। একদিন এক বুড়ির ছেলে মারা গেছে। শ্রাদ্ধ হয়েছে, শ্রাদ্ধে গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছে, অন্য বুড়িকে ডাকা হয়নি। বুড়িটা প্রচণ্ড রেগে গেছে। পরের দিন সারা গ্রামে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'আমাকে না ডেকে সে কি মনে করেছে, আমারও ছেলে আছে'। আপনি একজনকে গালাগাল দিচ্ছেন, অভিশাপ দিচ্ছেন, আপনার এই বোধটুকুও নেই যে আপনি আপনার কত ক্ষতি করছেন। মানুষ রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করে, কত কি বলে, তাতে অপরের কি ক্ষতি হবে, নিজেরই ক্ষতি করছেন। সবটা ঘুরে আপনার কাছেই তো আসবে।

মণি –কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাক্সের ভিতর কিছু নাই –অথচ দুইজনে টানাটানি করছে –টাকা আছে বলে। এই ধরণের অনেক মজার গল্প আছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের উপর যখন আসে, তখন আমরা আর পেরে উঠি না। না পেরে নিজেরাও সেই ফাঁদে পড়ি। তারপরেই মাস্টারমশাই খুব মজার কথা বলছেন –

আচ্ছা, দেহটাই তো সব অনর্থের কারণ। ওই সব দেখে জ্ঞানীরা ভাবে খোলস ছাড়লে বাঁচি। (ঠাকুর কালীঘরে যাইতেছেন।) ঠিকই, আহার-নিদ্রা-মৈথুন এই দেহের জন্যই। সংসার আর বহির্জগতে আমাদের যা কিছু হয় সব দেহকে নিয়ে। আপনারা হয়ত জানেন, মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রীর মাথার গণ্ডগোল ছিল; মাস্টারমশাই সংসার থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে এসেছিলেন, তখনই তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয়। পরেরটা ইতিহাস।

গীতার প্রথম অধ্যায় যেমন অর্জুনবিষাদযোগ, মাস্টারমশাইও প্রথমে বিষাদযোগে ছিলেন। তারপর কত কি হয়ে গেল। কিন্তু ভিতরের যে মূল ভাব, ভিতরে যে অবসাদ, এটা ওনার থেকে গেছে। তাই এখনও সেই ভুলটা করছেন, মাঝখানে 'জ্ঞানী' শব্দটা লাগিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে, দেহটা চলে গেলে খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাহলে তো হয়ে গেল। তিনি এর সঙ্গে জ্ঞানীদের কথা নিয়ে আসছেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিচ্ছেন। কারণ মাস্টারমশাইএর কথা যদি ঠিক হয় –জ্ঞানী যদি এ-রকম করতে পারেন, তাহলে তো সাধারণ লোকেরাও করতে পারে, তাহলে তো আত্মহত্যা করতে কোন দোষ নেই। কেন আটকে দিচ্ছেন?

ঠাকুর –কেন? "এই সংসার ধোঁকার টাটি", আবার "মজার কুটি"ও বলছে। দেহ থাকলেই বা। "সংসার মজার কুটি" তো হতে পারে।

টাটি হল নদীতে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের মত। কুটি হল মজা। সংসার যদি সত্যিই মিথ্যা হয়, ধোঁকার টাটি হয়, তাহলে তো সত্যিই আত্মহত্যা করে নিলেই হয়; মরে গেলেই হয়, খোলস ছাড়লেই হয়। খোলসটা ছেড়ে যাবেনটা কোথায়? এই যে ব্রহ্মের বিস্তার, সমুদ্র আর তার ঢেউ, একটা ঢেউ যদি ছেড়ে দেন, আর-একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়বে। সেইজন্য খোলস ছাড়লেও আপনার অস্তিত্বের নাশ হয়ে যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, সংসার মজার কুটি। ঠাকুর যে বলছেন, সংসার মজার কুটি, উনি এটা বলতে চাইছেন না যে, তুমি ভোগ করতে নেমে পড়, তুমি নেমে পড় মজা করতে, আহার-নিদ্রা-মৈথুনে নেমে পড়; একেবারেই এই কথা বলতে চাইছেন না। বলতে চাইছেন, এই যে বিরক্তির ভাব, এই বিরক্তি ভাব নিয়ে হিন্দু ধর্ম হয় না।

বৌদ্ধরা বলতে পারেন *সর্বং দুঃখম্*। ভগবান বুদ্ধের কি দুঃখ ছিল? নিজের স্ত্রীকে, নবজাত সন্তানকে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, কিসের দুঃখ? আবার এই বৌদ্ধরা নাকি হিন্দুদের গালাগাল দিয়ে বলে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কেন পরিত্যাগ করেছিলেন? এরাই আবার মনুস্মৃতির নিন্দা করে। মনুস্মৃতিতে বারবার দায়ীত্ব পালনের কথা বলছেন। যাদের ভিতরে দুঃখ আছে, তারা বাইরেও দুঃখ দেখবে। তারা দুঃখকেই মূল দর্শন বানিয়ে এগিয়ে চলে যাবে। বেদান্ত তা নয়। একটু আগে যেটা বলা হল, উদ্দেশ্য যদি আপনার একটা থাকে, গন্তব্যস্থল যদি আপনার একটা থাকে, সেখানে অবশ্যই আপনি যাবেন। সবটাই সেই এক। জীবন এখন যা, মৃত্যুর পরেও তাই, কোন তফাৎ নেই। শুধু জীবনে যেখানে কিছু ভাল লোকের সঙ্গে আছেন, মৃত্যুর পরে প্রেতলোকে গিয়ে কয়েকটা ভূতপ্রেতকে সঙ্গে পাবেন। হতাশাগ্রস্ত, অতৃপ্ত কয়েকটা জীবাত্মার সঙ্গে থাকবেন। আপনার থেকে জ্ঞানে, ব্যবহারে, কথাবার্তাতে নিকৃষ্ট লোকের সঙ্গে যদি থাকতে হয়, এর থেকে কষ্ট কি আর কিছু আছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা জ্ঞানী, প্রচুর পড়াশোনা আছে, সুসংস্কৃতবান; আপনাকে যদি একটা অতি প্রাকৃতলোকের সঙ্গে, যার ভাষা পর্যন্ত ঠিক নেই, থাকতে হয়, কত কষ্টের হবে, এটাই তো নরক, এটাই তো প্রেতলোক।

ধোকার টাটি মনে করে কেউ যদি খোলস ছাড়তে চায়, সে সত্যিকারের একটা মুর্খ। একটা অতৃপ্ত, হতাশাগ্রস্ত জীবাত্মা, যার ভাষার কোন ঠিক নেই, এদের সঙ্গে কি আপনি থাকতে চাইছেন? এই যে একটা মানবজীবন পেয়েছেন, কত বড় সুযোগ লাভ করেছেন, যেখানে আত্মজ্ঞান পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারেন, আত্মজ্ঞান না হোক, ইন্দ্রপদ পেতে পারেন; ইন্দ্রপদ না হোক, আপনি একজন বিরাট কবি, বিরাট বৈজ্ঞানিক হয়ে যেতে পারেন। আপনি কি এই মানবজীবনের এই সম্ভবনাগুলিকে খোলস ছেড়ে উড়িয়ে দিতে চান? ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই শরীরের মাধ্যমেই হয়।

মাস্টার –নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া নিরবচ্ছিন আনন্দ কোথাও নেই। দেহ ছাড়লেও হবে না।

ঠাকুর –হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর কি আর বলবেন, কত আর তর্ক করবেন। সেখান থেকে ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে এসেছেন। দেখুন ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি জানেন তিনি অবতার, তাও কি রকম কালীঘরের সামনে এসে মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। কি রকম নিরাসন হয় কালীঘরের সামনে নিচের চাতালের উপর মা-কালীর বিগ্রহকে সামনে রেখে বসে আছেন। পিছনে নাটমন্দিরের একটা স্তম্ভ। আর ইদানিং কালের পুচকে পুচকে ছোকরারা ইউটিউবে বড় বড় বাবাজীদের লেকচার শুনে সবাই বেদান্তী হয়ে গিয়ে বলছে –আমরা মূর্তিপূজা মানি না। আর কলকাতার লোকেরা আবার ব্রাহ্ম মত, এই মত সেই মতের কথা বলে বলছে হিন্দুরা সব পৌত্তলিক; এরাই আবার শিবলিঙ্গকে লিঙ্গ দেখে। কি আর করবে, আহার-নিদ্রা-মৈথুন ছাড়া তো আর কিছু জানে না। হিন্দু ধর্ম বলেই বেঁচে আছে, অন্য ধর্ম হলে কোথায় থাকত কে জানে। মাস্টারমশাই সেই অবসাদ থেকে আবার বলছেন –

মণি –তাই যদি হল, তাহলে দেহধারণের কি দরকার? এ তো দেখছি, কতকগুল কর্মভোগ করার জন্য দেহ। কি করছে কে জানে! মাঝে আমরা মারা যাই।

এই কথাগুলো মাস্টারমশাই নিজের মনের অবসাদগ্রস্ত ভাব থেকে বলছেন। আমাদের জীবনে কখন, কিভাবে অবসাদ আসে, আমরা জানি না। যখনই মনে এই ধরণের নেতিবাচকমূলক চিন্তাভাবনা আসে, সাবধান হয়ে যেতে হয়। আমার তখন বয়স কম ছিল, এই ধরণের দু-চারটে কথা মহারাজদের বলতাম। স্বামী প্রভানন্দজীকেও আমি একটা চিঠিতে এই ধরণের অবসাদের কথা লিখেছিলাম। এইসব লিখে শেষে লিখলাম –ঠিক আছে, দেখা যাক ঠাকুর কি করেন। সঙ্গে সঙ্গে ওনার চিঠি এসে গেল।

এটাই ইনি আমাকে লিখলেন, এখনও আমার মনে আছে, প্রায় সাতাশ আটাশ বছর আগের কথা, আমার নাম করে প্রথম বাক্য –স্বামী সমর্পণানন্দ, তুমি বুঝতেও পারছ না, অজ্ঞাতসারে তুমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ। বক্তব্য হল, তুমি সাবধান হয়ে যাও, এগুলো সামলে চলো। ঠাকুরও এখানে সঙ্গে সঙ্গে সামলে দিচ্ছেন।

ঠাকুর –ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়।

মাস্টারমশাই বললেন, আমরা মারা যাই। আপনি কে? আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা। দেহধারণ করেছেন, ঠিক আছে, মানলাম; ধোঁকার টাটি; তাও মানলাম যে এটা মিথ্যা। কিন্তু আপনি কে? আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা। কার সাধ্য যে আপনাকে কিছু করে দেবে। একজন যে বীর যোদ্ধা সে যদি ভেড়ার পালে যায়, আর যদি ভেড়ার পালের ভেড়াগুলো ম্যা ম্যা করতে করতে লড়াই করতে আসে, সেই বীর যোদ্ধা কি ভয় পেয়ে যাবে? বীর যোদ্ধা জানে, তলোয়ারের এক কোপে দুটো ভেড়াই উড়ে যাবে। আপনারা যাঁরা কথামৃত শুনছেন, আপনারা নিশ্চয় জ্ঞানের একটা সীমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। আপনাকে যদি বাড়ির ছয়-সাত বছরের শিশু এসে বলে, তুমি কিছু জানো না। আপনি তাকে কি বলবেন? আপনি শুধু একটু হাসবেন।

যদি আপনার ঠিক ঠিক বোধ হয়, আপনি সেই আত্মা, তখন এই সংসার ধোঁকার টাটি কি মজার কুটি, এগুলোতে কিছু আসবে যাবে না। এখানে এসেই বেদান্তের বিরাট বড় তফাৎ হয়ে যায়। যারাই শুধু নেতি নেতি বলে, যারাই সারাক্ষণ বলে, ত্রিকাল মে জগৎ নেহি হ্যায়; এরা সবাই অজ্ঞানী। আচার্য শঙ্কর কোথাও এই ধরণের কথা বলছেন না। উপনিষদের কোথাও বলছেন না। বলতে চাইছেন, বাপু, আগে তুমি এই জিনিসটা জেনে নাও; তারপর তুমি ঠিক করে নাও, এটা তুমি রাখবে না ছাড়বে। যে কজন সাধুকে দেখবেন বলছেন, ইউ আর্ আত্মন্, ইউ আর্ ব্রহ্মন্, তুমি এই, তুমি সেই, এই জগৎ মিথ্যা; বুঝবেন কিছু জানেন না। তার থেকেও বেশি, ভিতরে বিরাট অবসাদ আর হতাশা আছে, তা নাহলে জোর কামনা আছে। ঠাকুর অবতার, ঠাকুর জীবের কল্যাণের জন্য এসেছেন। প্রত্যেক মানুষকে কত ভাবে সাবধান করছেন। ওহে, তুমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা। তুমি পাতালে যাও, নরকে যাও, স্বর্গে যাও, তুমি এই জীবনে থাক, তুমি শুদ্ধ আত্মাই থাকবে, যাঁর ভিতরে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি সব সময় বিদ্যমান। এই বোধ যদি আপনার হয়ে যায়, তাহলে আপনি কোন পরিস্থিতিতে আছেন, কোথায় আছেন, তাতে আপনার কি আসে যায়।

একটা ব্যক্তিগত ঘটনা আমার মনে পড়ছে, খুব মজার। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন ফার্স্ট ইয়ারে আমার এক ক্লাশমেট ছিল, যে প্রায়ই ক্লাশে আসত না। কলেজে বেশির ভাগ সময় কাফেতে, কমনরুমে আড্ডা মারত; মাঝে মাঝে ক্লাশে আসত। একদিন এক প্রফেসর ওকে খুব ধমক দিয়েছেন – তোমাকে আমি প্রায়ই দেখি কাফেতে থাক, ক্লাশে আসো না। ক্লাশমেট প্রফেসরকে বলল –সরি স্যার, আর হবে না। একদিন আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? তখন ও খুব মজার কথা বলল। ওর বাবা মিলিটারির বিরাট বড় অফিসার, ওর নিজেরও মিলিটারিতে চাকরি হয়ে গেছে। কিছু দিনের মধ্যে মিলিটারিতে চলে যাবে। কিন্তু ওর শরীরে একটা সমস্যা ছিল, যেটার অপারেশান করা দরকার। অপারেশনটা হয়ে গেলে ওর আর-একবার ইন্টারভিউ হবে, ওখানেই ওর সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এমনিতে ওর সমস্ত কিছুই ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ওই অতটুকুর জন্য অপেক্ষা করছে। এখন এই ছয় মাস কি করে কাটাবে, তাই সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। নামকরা কলেজ, ভর্তি হয়ে গেলাম, অনেক কিছু দেখা হয়ে গেল, আর তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ঠিক দেখি, ছয় মাস পরে চলে গেল, আর্মির বিরাট বড় অফিসার হয়ে গেল। এই ঘটনাটা আমার মনে কি রকম একটা দাগ কেটেছিল। ছেলেটি জানে, আমি ছয় মাস পরে মিলিটারিতে ঢুকে যাব, বিরাট অফিসার হয়ে যাব। কিছু দিন এখানে আছি, ছয়

মাস হয়ে গেলেই চলে যাব। এই ভাব, আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা, একবার জ্ঞান যখন হয়ে গেল তখন আমি কোথায় কিভাবে আছি, তাতে আর কি আসে যায়।

মণি –তাহলেও অষ্টবন্ধন তো আছে? ঠাকুর তাঁকে ঠিক করে দিচ্ছেন।

ঠাকুর –অষ্টবন্ধন নয়, অষ্টপাশ। যেটার যে নাম, সেভাবেই বলতে হয়। **তা থাকলেই বা**। সমস্যা হল, মাস্টারমশাই যে সমস্যার কথা বলেছেন, এগুলো আমার আপনারও সমস্যা। আমাদের কাছে মনে হয় অষ্টপাশ, এটা সত্য, আমি তো অভাগা, আমার তো এই সমস্যা সব সময় হয়। এগুলো সত্য নয়। এই জগতে একটি মাত্র সত্য –আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা। আপনার সামনে সংসার খেলো, সংসার যিনি করেছেন, সেই প্রকৃতি, তিনিও খেলো; অষ্টপাশ, ষড়রিপু, সব খেলো। আপনি রাজার রাজা, আপনি ঈশ্বরের সন্তান, আপনি শুদ্ধ আত্মা। কিছু দিনের জন্য সংসারে এসেছেন, যেমন আমার বন্ধুর কথা বললাম, কলেজে কয়েকদিন নির্বিকার ভাবে কাটিয়ে চলে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, **তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে**। ঠাকুর এখানে, 'তুমি ইচ্ছে করলে' না বলে 'তাঁর কৃপা' বলছেন, জিনিসটা কিন্তু এক। আপনি ইচ্ছে করলে, তাঁর কৃপা হলে –কোন তফাৎ নেই; জ্ঞান-ভক্তিতে কোন তফাৎ নেই। অদ্বৈত আর ভক্তিমার্গে কোন তফাৎ নেই। যাঁরা তফাৎ দেখেন, কেন দেখেন আমি জানি না। তাঁর এটাই মত বা তাঁর গুরু এভাবেই তাঁকে শিখিয়েছেন। তাঁর ভিতরের অন্তর্যামী তাঁকে সেভাবেই বলেছেন। আমার নিন্দা করার কোন অধিকার নেই।

ঠাকুর বলছেন, **কিরকম জানো, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর; আলো লয়ে এলে অন্ধকার একক্ষণে পালিয়ে যায়**। আমাদের যে এই অষ্টপাশ, ষড়রিপু, কামিনী-কাঞ্চনের সমস্যা, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের স্পৃহা, নামযশের স্পৃহাও একক্ষণে কেটে যায়। যতদিন আছে একটু মজা করে নিন। কিন্তু ভুলবেন না, আপনার জীবনে উদ্দেশ্য কি। চেষ্টা সব সময় ওই দিকে থাকবে, এরপর বাকি যা কিছু আসার আসছে, আসছে ঠিক আছে, আসতে দিন। সাঁতার কেটে নদী পার হওয়া যার উদ্দেশ্য, তার কাছে ঢেউ এলেও যা, না এলেও তাই, কলাগাছ ভেসে আসছে, তাতেও কিছু না; মরা কুকুর ভেসে আসছে, তাতেও কিছু না। তার একটাই উদ্দেশ্য সাঁতরে পারে যাওয়া।

অন্ধকার পালিয়ে যায়, **একটু একটু করে যায় না**। জ্ঞানও একটু একটু করে হয় না, দপ্ করে জ্ঞান হয়, যদি তিনি চান। কিন্তু সাধনপথে যখন যাচ্ছেন, তখন আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, আপনি এগোচ্ছেন। কিন্তু শেষে যখন জ্ঞান হবে, তখন চট করে হয়ে যাবে।

ভেলকিভাজি করে, দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর-একধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে দুই-একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়।

গুরু বলতে সচ্চিদানন্দই গুরু। আপনার যিনি অন্তর্যামী, তিনি যখন বলবেন, অনেক হল এবার চল। বক্তব্য আমাদের অতি সহজ –বেদান্ত বেদান্ত করে কিছু ভুলভাল ধারণা হয়ে যাওয়া, যেমন জগৎ মিথ্যা, জগৎকে ত্যাগ করতে হবে; ত্যাগ বলতে একটা বিশ্রী অর্থে। ত্যাগ তো করতেই হবে, মন থেকে ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের দিকে যাবেন কি করে। সংসার মজার কুটি, সেখান থেকে আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারটিই পেতে পারি। জ্ঞানের পরে দেখবেন, আরে তাই তো, এটা তো ওটাই। জলও যা বরফও তাই; এ-ছাড়া আর কিছু নাই।

ঠাকুর কিভাবে আমাদের উৎসাহিত করছেন এই বলে –গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়। এরপর আমরা কথামৃতের যে জায়গার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করব, এখানে খুব জরুরী জিনিস

জানার আছে, বিশেষ করে ধর্ম জীবনের। এমনি হয়ত সাধারণ জীবনে এগুলো কতটা কাজে লাগবে বলা মুশকিল। কিন্তু যাঁরা ধর্মজীবন যাপন করছেন; যাঁরা ভাবছেন কিভাবে ঠাকুরের দিকে, নিজের ইষ্টের দিকে এগোন যাবে, তাঁদের জন্য এই অংশটা খুব মূল্যবান। শুধু রামকৃষ্ণের ভাবানুরাগীদের জন্য নয়, সবারই জন্য জরুরী। প্রথমে ঠাকুর কেশব সেনকে নিয়ে কথা বলছেন। কেশব সেন তখনকার ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, আর খুব নামকরা ব্যক্তিত্ব। কেশব সেন নিজের সময় কলকাতায় যতটা বিখ্যাত ছিলেন, আমি জানি না, বর্তমানে ওই রকম বিখ্যাত কেউ আছেন কিনা। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ছিলেন, এই ব্রাহ্মবাদীরা হিন্দু ধর্ম থেকে কিছু কিছু জিনিস নিয়েছেন, অন্য দিকে খ্রীশ্চান ও ইসলামের কিছু কিছু ভাব থেকে নিয়েছেন। আপনারা যাঁরা নিয়মিত কথামৃত ও অন্যান্য ক্লাশগুলো শুনছেন, এতদিনে তাঁরা হয়ত বুঝে থাকবেন যে, ধর্মের ব্যাপার মন দিয়ে হয় না। মনের চিন্তা দিয়ে, কবিতা লিখে, প্রবন্ধ রচনা করে, বক্তৃতা দিয়ে ধর্ম হয় না। একমাত্র যিনি ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেছেন, বা এমন কেউ যিনি এই ধরণের মহাত্মার শিষ্য, এই দু-জন ছাড়া কেউ ধর্মের শিক্ষা দিতে পারেন না।

ইতিহাসে অনেকবার এমন হয়েছে, যার ক্ষমতা আছে, যেমন কেশবচন্দ্র সেনের ক্ষমতা ছিল, এত লোক যখন তখনকার দিনে তাঁকে মানতেন, আমাদের স্বামীজীও তাঁর ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন । ঠাকুরের কথা দিয়ে আমরা জানি, কেশবচন্দ্র সেন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেন না। ওনারা তখন এগুলোর বিরোধী ছিলেন। কিভাবে কিভাবে ঠাকুরের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ হল; ঠাকুর ওনাকে দেখতে গেলেন। উনিও ঠাকুরকে দেখতে অনেকবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। সেই কেশব সেনকে নিয়ে ঠাকুর এবার বলছেন।

আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলাল কেন, বল দেখি? ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর কেশব সেন অনেক পাল্টে গিয়েছিলেন। এই নিয়ে পরে পরে ব্রাহ্ম সমাজে প্রচুর অশান্তি হয়েছিল, ব্রাহ্মদের অনেকেই তখন মনে করতে লাগলেন যে, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই কেশব সেন হয়ত আর ব্রাহ্ম থাকলেন না। এই হল মুশকিল। তবে কি, ইতিহাসের এত দূরে এসে আমরা যখন পিছনের দিকে তাকাচ্ছি, তখন এই কথাগুলো আমাদের পক্ষে বলা অনেক সহজ। বর্তমান কালে সমাজের যাঁরা নেতা, তাঁরা অনেক কিছু ভুল করছেন, যেটা এখন আমরা বলতে পারব না। অনেক সময় মনেও হয় না যে, এনারা ভুল করছেন।

ঠাকুর বলছেন –**এখানে কিন্তু খুব আসত। এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে**। কেশব সেন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন না, ওই একটু হাতজোড় করে সম্ভাষণ গোছের করতেন। ঠাকুর হলেন যুগশিক্ষক, সব ধরণের মানুষকেই তিনি শিক্ষা দিতেন। সেই কেশবচন্দ্র সেন, যিনি তখনকার দিনের এত মানী লোক, তিনিও পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেন। কথামৃতে আমরা বিদ্যাসাগর বা অন্যান্য গণ্যমান্যদের দেখি, তাঁদের সম্বন্ধে ঠাকুর যে খুব উচ্চ ধারণা রেখেছিলেন, তা না; কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন এত বেশি পাল্টালেন, এর অর্থ হল, তাঁর উপর ঠাকুরের প্রভাব বেশি পড়েছিল। আপনারাও দেখবেন, আপনাদের আশেপাশে যাঁরা আছেন, বাবা, মা, ভাই, বোন, সম্বন্ধী; আপনার কোথাও হয়ত দুটি ভাল কথা শিখলেন, সেটা যদি তাঁদের শোনাতে যান তাঁরা শুনবেন না, বিশেষ করে যদি ধর্মের কথা, যে কথাগুলো আপনি ভালভাবে শিখেছেন, যদি ওনাদের বলতে যান, ওনারা শিখবেন না।

আমরা এখন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আছি, যেখানে প্রায়ই অনেক লোকজন আমাদের কাছে আসেন। আর ইউটিউব হয়ে অনেক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তাঁরাও অনেকেই আসেন। নিজেদের পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে অনেকেই বলেন, 'ইউটিউবে ক্লাশগুলো শুনে আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে'। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পরিবর্তন হয় না, বিশেষ করে যাদের ভাব – উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম। 'মহারাজ আপনার বক্তৃতাগুলো শুনি' বলে আরও পাঁচজন বক্তার নাম নিয়ে নেবে। এইভাবে কি পরিবর্তন হয়? একটা জায়গায় খুঁটি বেধে স্থির হয়ে শুনতে হয়। যখন মনে হবে,

এখন আর এনার কাছে শেখার মত কিছু নেই, তখন অন্য জায়গায় যেতে হয়। তা নাহলে, এগুলো মনোরঞ্জনের জন্য সময় কাটানোর একটা মাধ্যম হওয়া ছাড়া কিছুই হবে না। এই যে শাস্ত্রের কথাগুলো ভিতরে যাবে, গিয়ে ভিতরে এরপর একটা পরিবর্তন আসবে; এনারাই হলেন উত্তম শিষ্য। উত্তম শিষ্য মানে –জীবনটা পাল্টাচ্ছে। একটু একটু করে খুব ধীরে পাল্টাচ্ছে, কিন্তু পাল্টাচ্ছে। কেশব সেন ছাড়াও তখনকার দিনে কলকাতায় যে বড় বড় লোকেরা ছিলেন, যাঁরা ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এনাদের জীবনে ঠাকুরের কথার কোন প্রভাব পড়ল না। কেশবচন্দ্র সেন এনাদের ব্যতিক্রমী ছিলেন। ঠাকুরের যে সন্তানরা ছিলেন, নরেন, রাখালাদি; এনাদের উপর বিস্তর প্রভাব পড়ল। কেশবের ব্যাপারে ঠাকুর বলছেন –এখান থেকে কেশব নমস্কার করতে শিখল।

একদিন বললুম, সাধুদের ওরকম করে নমস্কার করতে নেই। সাধুদের সব সময় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়। আপনি বলবেন, আমি এগুলো মানি না; তাহলে সাধুদের কাছে যাওয়ার কি প্রয়োজন? একবার গেলেন, দু-বার গেলেন ঠিক আছে, কিন্তু তৃতীয়বার যখন যাচ্ছেন, তখন আপনাকে যাঁকে যেমন, যে-ভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, তাঁকে ঠিক সেইভাবে সম্মান দিতে হবে। অনেক আগেকার কথা, আমি তখন ইলেভেন কি টুয়েলভে পড়ি। তখন আমিও ব্রহ্মচারী। একজন এসে আমাকে বলল, ‘জানিস সাধুদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হয়? কিন্তু আমি করিনি। কারণ ওই পায়ে কত ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস থাকে’। তখন আমার বয়স কম ছিল, বয়স কম মানে, মুখ দিয়ে চট্ করে উত্তর বেরিয়ে আসত। আমি অত্যন্ত একটা নোংরা উদাহরণ দিলাম। ‘তুমি যখন কোলাকুলি কর, করমর্দন কর, তখন ভাইরাস ব্যক্টেরিয়া লাগছে না? আর পা ছুঁলেই যত ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া এসে যাবে’? ছেলেটি আমার কথা শুনে হেসে ফেলেছিল, খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। কিন্তু তারপর থেকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করত।

মুশকিল হল, বর্তমান কালের লোকেরা দুটো ইংরাজী পড়ে নিয়েছে, আর একটু লিবারাল ভাব; পায়ে হাত দিতে যাব কেন? তুমি দিয়ো না। কিন্তু একবার, দুবার তিনবার যদি সাধুর কাছে আসেন, তাহলে তাঁকে সাধুর মতই দেখবেন, আর ব্যবহাটাও ঠিক সেভাবেই করবেন, যেভাবে একজন সাধুর সাথে ব্যবহার করতে হয়। কেশবচন্দ্র সেনের পাল্টানোর কোন কারণ ছিল না। তিনি সেই সময়কার কত বিখ্যাত একজন লোক, তিনি কেন দক্ষিণশ্বরের একজন অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাবেন? কিন্তু তাঁকে ঠাকুর বলে দিলেন –সাধুদের ওরকম করে নমস্কার করতে নেই। কেশব সেন নিজেকে পাল্টে ফেললেন। আসলে ঠাকুরের যে ব্যক্তিত্ব, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি অবতার। অবতারের একটাই কাজ, ধর্মজীবন কিভাবে যাপন করতে হবে, সেটা তিনি মানুষকে শেখান। এক এক যুগে অবতার এক এক ভাবে শিক্ষা দেন। এই যুগে ঠাকুর এসে দেখালেন ভক্ত কেমন হবে, একজন ভক্তের সাথে ভগবানের কি রকম সম্পর্ক হবে; আত্মজ্ঞানের দিকে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা কেমন হবে, অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁদের কেমন থাকবে।

এই যে বারবার ঠাকুর নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, এর ভিতরে দুইজন আছে –এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। অবতার মানেই আচার্য, যুগাচার্য। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় খুব সুন্দর বলছেন –শ্রীকৃষ্ণ কেন অর্জুনকে শিক্ষা দিলেন? তাঁর উত্তর আচার্যই দিচ্ছেন –ভাল শিষ্য পেয়ে তাকে ভাল শিক্ষা দিলে, সেই শিক্ষার ভাল প্রচার প্রসার হয়। তাই ঠাকুরের একদিকে কেশবচন্দ্র সেন, অন্য দিকে স্বামীজী; শিষ্য ভাল কিনা। গুরু পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু শিষ্য পাওয়া যায় না। আধার না থাকলে ছিটকে যাবে; অনেক দিন শুনলেও পরিবর্তন হয় না। উত্তম শিষ্য যদি পায়, যার আধার ভাল; তাকে যদি ওই বিদ্যার শিক্ষাটা দেওয়া যায়, তবেই ওই বিদ্যা চলবে। কেশবচন্দ্রকে ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন, পরে তিনিই আবার খবরের কাগজ আদিতে ঠাকুরের কথা প্রচার করলেন। তার জন্য ঠাকুরের কথা অনেক বেশি ছড়িয়ে গেল।

একদিন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে। হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব চেক পাশ করে নিতে হবে, তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে। (ঠাকুরের হাস্য)

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সেই সময় ব্যাঙ্কিং সিস্টেম এসে গিয়েছিল, তবে তখনও উন্নত হয়নি। ঠাকুরও চেক জিনিসটা জেনে গেছেন, চেক পাশ করাটাও জেনে গেছেন। চেক লিখে সই করে দিল, ব্যাঙ্কের কর্তা চেকের সই, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স মিলিয়ে দেখে নিলেন সব ঠিক আছে কিনা, সব ঠিক থাকলে 'ওকে' করে দিলেন। সেই চেক খাজাঞ্চির কাছে নিয়ে যাওয়া হল, খাজাঞ্চি টাকা দিয়ে দিল। হরিশের এই কথাটা অতি সুন্দর কথা। এই কথা হরিশ বলছেন, ঠাকুর আবার কোট্ করে হরিশের এই কথা বলছেন –এই কারণে কথাটা অত্যন্ত দামী কথা। আমি যখন কথামৃত পড়তে শুরু করি, যবে থেকে মঠে জয়েন করেছি তবে থেকেই নিয়মিত পড়েই যাচ্ছি। কিন্তু এই লাইনটা যখনই পড়ি তখনই আমাকে খুব গভীর ভাবে স্পর্শ করে –এখান থেকে সব চেক পাশ করে নিতে হবে, তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে। যাঁরা নিয়মিত কথামৃতের ক্লাশগুলো শুনছেন, তাঁদের এই কথা না বোঝার কারণ নেই।

অর্থ হল, এই যে আমাদের ধর্ম জীবন, আমাদের যে ধর্ম আচরণ; এই ধর্ম জীবন, ধর্ম আচরণকে ঠাকুরের জীবন ও ঠাকুরের কথা দিয়ে বিচার করে নিতে হবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। এটা অনেক পুরনো সিস্টেম। আপনি যে কোন ধর্মে যান, খ্রীশ্চানিটিতে যান, ইসলামে যান, বৌদ্ধ ধর্মে যান, যে ধর্মে যান; এটা খুব পুরনো সিস্টেম। এই সিস্টেমে বলে, তাঁদের যিনি আচার্য, যেমন ধরুণ খ্রীশ্চানদের যীশু খ্রীষ্ট বা ওনাদের অন্যান্য যে সম্প্রদায়গুলো রয়েছে, তাঁদের যিনি আচার্য; সেই আচার্যের যে জীবন, তাঁর যে আচরণ, সেটা দিয়ে তাঁরা নিজের জীবনধারাকে বিচার করেন। খুব নামকরা বই, 'The Imitation of Christ'। যীশুর জীবন যেমনটি ছিল, সেই রকমটি করা। অন্যান্য ধর্মেও ওনারা এই রকম করেন। হিন্দু ধর্মে কি হয়, হিন্দু ধর্ম আসলে নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম। কিন্তুই এটাই আশ্চর্যের যে, আমাদের নামে যে দুর্নামগুলি করা হয়, যে নিন্দাগুলি করা হয়, হিন্দু ধর্ম ঠিক তার বিপরীত। আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, আমাদের ধর্মও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। দয়া করে এই কথাটা আপনারা মনে বসিয়ে নেবেন, আর যাদের সাথেই দেখা হয়, তাদেরকেও বলবেন –হিন্দু ধর্ম একমাত্র ধর্ম যেটা ব্যক্তিকেন্দ্রিত নয়। হিন্দু ধর্ম ঋষিদের দেওয়া সনাতন ধর্ম, যে ধর্ম কোন ব্যক্তির কথার উপর চলে না, শুধু সিদ্ধান্তের উপর চলে। মনুস্মৃতি আদিতেও বারবার বলছেন, *এষ ধর্ম সনাতনঃ*, এই ধর্ম সনাতন ধর্ম। অর্থ হল, হিন্দু ধর্ম সিদ্ধান্তের উপর চলে, কোন ব্যক্তির কথা দিয়ে চলে না; উনি এই রকম বলে গেছেন, অমুক এই এই বলেছেন, এভাবে হিন্দু ধর্ম চলে না।

তাহলে ঠাকুর এই রকম কথা বলছেন কেন? কারণ, যে ধর্ম দশ হাজার বছর ধরে চলছে, যে ধর্ম শত শত ঋষির উপলব্ধি দিয়ে পুষ্ট হয়েছে; স্বাভাবিক ভাবে সেই হিন্দু ধর্ম আধ্যাত্মিক সম্পদের এক বিরাট ভাণ্ডার। যার ফলে এত কিছুর মধ্যে আমরা কোনটা নেব, কোনটা ছাড়ব, বাছতে বাছতে একটা জায়গায় গিয়ে আমরা হারিয়ে যাই। ফলে হিন্দু ধর্মে মাঝে মাঝে অবতাররা এসে, জিনিসগুলিকে আবার ঠিক করে সাজিয়ে দেন। সেইজন্য অবতারের জীবনটা ওই সময়ের জন্য হয়ে যায় চেক পাশ করার অথোরিটি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে এসে গীতার মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন, কিভাবে চেক পাশ করতে হয়। কোন জিনিসটা আমাদের ছাড়তে হবে, আর কোন জিনিসটা আমাদের নিতে হবে, এটাই আমাদের বেছে দেন। কারণ অনেক দিন ধরে যখন ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, একটা জাতি যখন অনেক দিন ধরে ধর্মের অনুষ্ঠান করে আসছে, তখন সেই ধর্মের মধ্যে অনেক ধরণের আবর্জনা আসবেই, কারুর কিছু করার নেই। যত ভাল ধর্ম হোক, যত ভাল সংস্থা হোক, যত ভাল সম্প্রদায় হোক, আবর্জনা আসবেই, কেউ আটকাতে পারবে না।

আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখছি, ঠাকুর নিজের দর্শনের কথা এত কিছু বললেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমা প্রায় কিছুই বলছেন না; স্বামীজী একেবারেই বলছেন না; অথচ ইদানিং কালে দেখছি সবাই এখন একে তাকে বলে যাচ্ছে, তার এই অনুভূতি, তার সেই দর্শন, তার অমুক ভাব হচ্ছে। সমস্যা হল, এই মিরাকেলগুলো ধর্মকে খেলো করে দেয়। অন্ধ্র প্রদেশে আমাদের একটা প্রাইভেট সেন্টার হয়েছে, রামকৃষ্ণ ভাবধারায় চলে কিন্তু বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই সেন্টারে জামাইষষ্ঠিকে উপলক্ষ করে একটা বিরাট বড় উৎসব হয়। ওখানকার মানুষ জামাইষষ্ঠি দিয়েই বোঝে, তাই জামাইষষ্ঠির দিন ওরা বিরাট বড় করে আয়োজন করে। কিছু করার নেই, এটা এভাবেই হবে। মানুষের যতটুকু বোঝার ক্ষমতা, ততটুকুই সে নেবে। হিন্দু ধর্ম একটা বিশাল বটবৃক্ষের মত। যার জন্য যারা আমাদের নিন্দা করে দেখবেন, যেটা আমাদের আবর্জনা, আমাদের হিন্দু ধর্মেও যেটার নিন্দা করা হয়ে থাকে, সেই আবর্জনাটাকে নিয়েই অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের নিন্দা করা হয়। আরে ভাই, আমরাও জানি জিনিসটা ঠিক না। উপনিষদকে নিয়ে কারুর ক্ষমতা নেই নিন্দা করার; কারণ উপনিষদ আমাদের ধর্ম, আমাদের ধর্ম বেদ। উপনিষদ পড়েইনি, বোঝার ক্ষমতাই নেই। কিসব কিসব আচরণ নিয়ে বলবে ঠিক নেই, ভাই আমরা যদি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে বলতে শুরু করি, সারা দেশে হানাহানি শুরু হয়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন করে দিলেন, ঠাকুরও একই জিনিস করলেন। ধর্মের যেগুলো আড়ম্বর, ধর্মের যেগুলো ভুষিমাল, সেগুলোকে এনারা সরিয়ে দিলেন –এগুলোর কোন দরকার নেই। আপনারা যাঁরা কথামৃত শুনছেন, কথামৃতে কত কিছু আছে। ঠাকুর কেমন মজা করে বলছেন, কেশব কেশব, গোপাল গোপাল, হরি হরি, হর হর। ব্যাখ্যা করছেন, ভক্তের ভেক ধারণ করে কিভাবে কত আজেবাজে কাজ করছে। হরিশ যখন চেক পাশের কথা বলছেন, ঠাকুর তখন এই কথা অনুমোদন করছেন। যাঁর জন্য আমি বারবার সবাইকে বলি, আপনি যদি ঠাকুরের ভক্ত নাও হন, কথামৃত আপনার নিয়মিত পড়া উচিত। বিশেষ করে যিনি ধর্ম জীবন যাপন করতে চাইছেন, তার জন্য কথামৃত অবশ্যই পড়া উচিত। কথামৃত পড়লে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, ধর্মের কোনটা ভুষিমাল, কোনটা আসল জিনিস। কথামৃত পড়ার সময় আমরা দেখতে পাই, যত রকম আবর্জনা আছে, ঠাকুর তার সব কটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি যেটা কথামৃতে বলেছেন, পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, ভক্ত এই রকম থাকবে। এমনকি যারা সাধারণ মানুষ, তারাও এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা জরুরী, আমাদের যে পুরো শাস্ত্র, বেদ বলুন, উপনিষদ বলুন, গীতা বলুন, ভাগবত বলুন, মহাভারত বলুন; পরিষ্কার বোঝা যায় শাস্ত্রের অর্থ কি। আমার একটা বই আছে, আপনারা অনেকে হয়ত পড়ে থাকবেন –'বেদ বিহঙ্গম্' যেখানে বেদের কি বক্তব্য, বেদের কিছু সুক্ত ও মন্ত্রের অর্থ করে বেদের পুরো ছবিটা সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে। খুব সুন্দর কাজ হয়েছে, একটা ভাল কাজ হয়েছে। যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরা একই কথা বলেন। আমি জানি, কথামৃত আমি ভাল ভাবে জানি, আর ওই জন্যই এই কাজটা করতে পারলাম। কথামৃত যদি না জানা থাকত, তাহলে আমার পক্ষে, বেদ, উপনিষদ, গীতা বোঝা সম্ভব হত না। কিছু দিন আগে এক জায়গায় গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক পড়াশোনা করা লোক উপস্থিত ছিলেন। নানারকমের কথা হচ্ছিল, ধর্ম নিয়েও কথা বেশ চলছিল, নানা রকম গ্রন্থের কথা উঠল। আমি হেসে পরিষ্কার বললাম, 'আমি কিন্তু এত বই পড়িনি'। সবাই চমকে উঠলেন; এই দিককার লোক হয়ে এত কম পড়াশোনা করেছেন? আমি বললাম, 'আমি বাইরের বই বেশি পড়েছি'। আমাকে যদি বলেন, অমুক মহাত্মা আছেন, তাঁর লেখা অমুক বই; আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, হ্যাঁ কোথায় একটা নাম শুনেছি, আর বই, পড়ার প্রশ্নই উঠছে না। মূল কটি বই ছাড়া আর কোন বই আমি খুলেও দেখিনা।

আমাদের শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ছিলেন মহা পণ্ডিত, ওনার মত শাস্ত্রজ্ঞ ইদানিং কালে আমরা দেখিনি। আমাদের স্বামী তপস্যানন্দজীও একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, উনিও স্বামী ভূতেশানন্দজীর নামে বলতেন, ইনি হলে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ। একবার তিনি একজন নামকরা ব্যক্তিকে, যাঁর

লেখা অনেক বই বেরিয়েছে; পরিষ্কার করে বললেন –দেখো, তোমার মত অত বই আমি পড়েনি, যেটা পড়েছি ভাল করে পড়েছি; মহারাজের খুব নামকরা কথা। বেশি বই পড়ার দরকার হয় না, মনন বেশি করে করতে হয়। আর শাস্ত্র যদি বুঝতে চান, বেদ তো এখন কেউ পড়েই না, পড়া সম্ভবই না, উপনিষদ, ভাগবত, গীতা এই যে তিনটে শাস্ত্র; কথামৃত যদি খুব ভাল করে না পড়া থাকে, এই তিনটে শাস্ত্রের কথা কেউ বুঝতেই পারবেন না। যার জন্য এখন ঠাকুর বিরোধী যে অনেকগুলো সম্প্রদায় হয়েছে, ওনাদের পক্ষে শাস্ত্র বোঝা সম্ভব না। এনাদের প্রতি আমার করুণা যাগে, আপনারা বুঝতে পারবেন না। খ্রীশ্চানরাও যদি খ্রীশ্চানিটিকে বুঝতে চায়, কথামৃত পড়লে অনেক ভাল করে তাদের ধর্মকে বুঝতে পারবে।

স্বামীজী সেইজন্য ঠাকুরের নামে বলেছিলেন –শ্রীরামকৃষ্ণ মুসা। স্বর্ণকারদের কাছে একটা পাত্র থাকে, যার মধ্যে এ্যসিড জাতীয় তরল পদার্থ থাকে। সোনাকে শুদ্ধ করার জন্য ওই পাত্রে দিয়ে শুদ্ধ করা হয়। স্বামীজী একটা অতি সুন্দর শব্দ ঠাকুরের নামে বলছেন –শ্রীরামকৃষ্ণ মুসা। তার মানে আমরা যদি আমাদের জীবনকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শুদ্ধ করতে চাই, তাহলে ঠাকুরের যে জীবন, ঠাকুরের যে কথা, এর মধ্যে নিজেকে ঢেলে পরিষ্কার করে দিতে হবে। তার মানে, ইমিটেশান অফ্ খ্রাইস্ট যেটা টমাস কেম্পিসেসকে বলা হচ্ছে, যেখানে আমাকে ঢালতে হবে তার মত, এই ভাবটা কিন্তু এখানে নেওয়া হচ্ছে না।

আধ্যাত্মিক জীবন দু-ভাবে চলে; একটা হল নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করা, শুদ্ধ পবিত্র করার পর যা থাকবে সেটাই সত্য। দ্বিতীয় হল, তাঁর মত করা বা হওয়া। যে কোন ধর্মকে নিয়ে যদি পড়াশোনা করেন, তখন দেখবেন ওনার বলবেন –তিনি হলে আদর্শ, আমাকে তাঁর মত হতে হবে। অনেক সময় স্কুল কলেজে ছাত্রদের উদ্দেশ্য বলা হয়, নেতাজী হলেন আদর্শ, তোমাদের নেতাজীর মত হতে হবে বা স্বামীজী হলেন আদর্শ, তোমাদের স্বামীজীর মত হতে হবে। কিন্তু স্বামীজী ঠাকুরের নামে যে শব্দ ব্যবহার করছেন, অতি সুন্দর। আমি যখন এই কথাটা –শ্রীরামকৃষ্ণ মুসা, প্রথম শুনেছিলাম আমি চমকে উঠেছিলাম; এই কথাটা সেদিন থেকে আমার অতি প্রিয় একটি কথা। এই কথাটা সন্ন্যাসীরাই জানেন। স্বামীজী সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য একটা নিয়মাবলী করে দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি এই শব্দটা –শ্রীরামকৃষ্ণ মুসা, ব্যবহার করেছিলেন। তার মানে, ঠাকুর যেটা করেছেন সেটা আমাদের করতে হবে না, অর্থ হল, ঠাকুরে যেটা করেছেন, ঠাকুর যেটা বলেছেন, সেটাকে দিয়ে নিজেকে বিচার করে, যাচাই করে যেটা ভুল, সেটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। বাকি যা সত্য থাকবে, নিজে থেকেই ভেসে উঠবে।

আপনাকে ঠাকুরের মত হওয়ার দরকার নেই; এটাই শুদ্ধ বেদান্ত। তিনি যা যা আচরণ করেছিলেন, সেগুলো আমাদের করার দরকার নেই। কিন্তু তিনি যে আচরণগুলো করেছিলেন, যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্তে আমাদেরকে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের ভিতরের আবর্জনাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। চেক আপনি পেয়েছেন, টাকা আপনার; ঠাকুর চেকটা পাশ করে দেবেন –ইয়েস ভ্যালিড চেক। যার জন্য দেখবেন, আমরা কখনই ওই অর্থে বলি না, ঠাকুর আমাদের আদর্শ। ওই অর্থে কখনই আমাদের বলা হয় না যে, স্বামীজী তোমার জীবনের আদর্শ। যেমন ধরুন, স্বামীজী বলছেন, Strength is life weakness is dead, খুব নামকরা কথা। স্বামীজীর মত হতে গেলে এখন আমাকে চিকাগো, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বিদেশে গিয়ে মানুষের সামনে লেকচার দিতে হবে? না, দরকার নেই। আপনি বলবেন, স্বামীজীর মত, ঠাকুরের মত আমার যদি একজন গুরু হত; না কোন দরকার নেই। Strength is life, এটা হল মুসা, নিজেকে নিজের জীবনকে আপনি এর মধ্যে ঢালুন, পরিষ্কার করতে শুরু করুন। ভাল করে দেখুন আপনার জীবনে কি কি জিনিস আছে, যেখানে শক্তির অভাব দেখছেন, যে খানে দুর্বলতা আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই দুর্বলতাকে এবার ঘষে মেজে ঠিক করুন; এরপর যা থাকবে, সেটা নিজেই ভেসে উঠবে। এটাই মুসার কাজ। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। এবার আপনি দেখুন, যে জিনিসটাকে আপনি জানেন ঈশ্বর নয় বলে, কাজ হল

সেটাকে সরিয়ে দেওয়া। তাই বলে গঙ্গার তীরে বসে মাটির ঢেলা আর টাকা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলবেন আর বলতে থাকবেন, টাকা মাটি, মাটি টাক; লোকেরা আপনাকে পাগল মনে করে পাগলাগারদে ঢুকিয়ে দেবে। আপনার জন্য এগুলো করা দরকার নেই। মন্দিরে গিয়ে মা মা বলে চেঁচাবার দরকার নেই। দরকার যেটা, সেটা হল ভক্তি। এটাই চেক পাশ করানো। কেশব সেন হাতজোড় করে প্রণাম করতেন; ঠাকুর নিষেধ করে দিচ্ছেন –সাধুদের ওভাবে প্রণাম করতে নেই।

মণি অবাক হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বুঝিলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করান।

মাস্টারমশাইর কাছে একেবারে পুরো পরিষ্কার –ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। একবার যখন ভগবান অবতার রূপে আসেন, গুরুরূপে আসেন; তাঁর যে জীবন, তাঁর যে কথা, সেটাই রামকৃষ্ণ মুসা। অনেক সময় কি হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, ওনার যে ব্যক্তিত্ব; ওই ব্যক্তিত্বের কথা শুনলে ছোটবেলায় আমরা চার্জড আপ হয়ে যেতাম, হ্যাঁ, আমাকে এটাই করতে হবে, এই রকমই হতে হবে। সেখানে কিন্তু আমরা নেতাজীর একটা দিককে নিচ্ছি –নিচ্ছি তাঁর শৌর্য। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এ-রকম হয় না। স্বামীজী যখন বলছেন –শ্রীরামকৃষ্ণ মুসা, তখন সমস্ত চেক, যাবতীয় যা কিছু আমরা করছি – কিভাবে খাবেন, কিভাবে জল পান করবেন, একাদশী করবেন কি করবেন না; সমস্ত কিছু এখান দিয়ে পেয়ে যাবেন। ঠাকুর বলছেন, মেয়েরা উপোস করবে, আমার ভাল লাগে না। দরকার নেই উপোস করার। কিন্তু আপনার মন খুঁতখুঁত করছে, সন্তানের মঙ্গলের জন্য উপোস করতে চাইছেন, কোন আপত্তি নেই আপনি করুন। যদি নিয়মিত কথামৃত পড়েন, সাধন-ভজন করেন; আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে –এই এই জিনিসগুলো ফালতু, এই এই জিনিসগুলো জরুরী। এই প্রসঙ্গ থেকে সরে ঠাকুর এবার অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন।

ঠাকুর –বিচার করো না। তাঁকে কে জানতে পারবে? ন্যাংটা বলত শুনে রেখেছি, তাঁরই এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড।

গীতার বিভূতিযোগের শেষ শ্লোকে ভগবান এই কথা বলছেন –*একাংশেন স্থিতো জগৎ*। ঠাকুর কি রকম এখানে নিজের গুরুকেও শ্রদ্ধা করছেন। গুরুর নাম নিতেন না, তোতাপুরী বলতেন না; আমাদের পরম্পরায় এটা নিয়ম; বাবা-মাকে নাম ধরে ডাকা হয় না। ইদানিং বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নাকি বাবাকে নাম ধরে ডাকছে; কি হচ্ছে এগুলো? সংস্কৃতি গেল কোথায়? গুরু, গুরুজনকে নাম ধরে ডাকতে নেই, পরম্পরার এই ধারাটাও চলে যাচ্ছে। ঠাকুর এবার হাজরার কথা বলছেন।

হাজরার বড় বিচারবুদ্ধি; হাজরা সত্যিই মজার মানুষ ছিলেন। এমনিতে ভাল মানুষ, কত জপতপ করতেন। তিনি ছিলেন বলে আজকে আমরা বুঝতে পারি, আমরা কোথায় ভুল করি। **সে হিসাব করে, এতখানিতে জগৎ হল, এতখানি বাকি রইল**।

এই কথা শোনার পর আপনাদেরও হয়ত হাসি পাচ্ছে, কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন, আমরা সবাই দিনরাত হাজরার মত ঈশ্বরে হিসাব লাগাতে থাকি। যদি এটা এই রকম হয়, তাহলে সেটা ওই রকম হবে। ধর্ম এখন একটা ফ্রী-হ্যণ্ড এক্সারসাইজের মত হয়ে গেছে, বাচ্চাদের দেখবেন স্কুলে ফ্রী-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ শেখানো হয় –হাত তোল, হাত নামাও; ধর্ম যখন এইভাবে এসে যায়, তখন ধর্ম পালন করা খুব সহজ হয়ে যায়। আমাদের কাছে অনেকেই এসে বলেন, মহারাজ, আপনি যদি দুটি কথা বলে দেন, যেটাকে নিয়ে সারা জীবন চালাতে পারব। কি করে বলব; এটা তো ধর্ম নয়। হিন্দু ধর্ম মানেই স্বাধীন। হিন্দু ধর্ম আমাদের কোথায় নিয়ে যায়? একত্বের দিকে। ফলে কি হয়, হিন্দু ধর্মকে বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মকে পালন করা আরও বেশি কঠিন হয়ে যায়। ফলে, অন্যান্য ভাবধারা যারা নিয়ে আসে, তাদের পক্ষে ধর্মান্তরণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কারণ সাধারণ মানুষ

হিন্দু ধর্মকে ধরতেই পারেনা। তাদের কাছে সব কিছু পরিষ্কার থাকতে হবে; যখন বললেন রামচন্দ্রজী হ্যাঁয়, হাঁ হ্যাঁয়; বুঝে গেল একজন আছেন। এরপর রামচন্দ্রজী ধনুভঙ্গ করলেন, ধনুভঙ্গ করে বিবাহ করলেন। এই পর্যন্ত মানুষ সব বুঝতে পারছে –আহা কি দারুণ কথা। কিন্তু যেমনি আপনি বলবেন, ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, মুহূর্তে সব গুলিয়ে যায়। ব্রহ্মই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন, তাহলে ইট পাটকেল এগুলো কি করে হল? বিচার-বুদ্ধি করবে যে তার উপায় থাকে না।

অন্যান্য ধর্মে ঠিক এই সমস্যা হয়, সত্যিকারের দার্শনিকরা যখন বিচার করতে শুরু করেন, তখন ওদের ধর্মটা ফেটে বেরিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা হয়। বিজ্ঞান যত এগোবে, দর্শন যত এগোবে, তত বেশি হিন্দু ধর্ম শক্তিশালী হবে। কারণ হিন্দু ধর্মে ড্রিলিং হয় না, মিলিটারিতে যে ড্রিলিং হয়, লেফট রাইট, লেফট রাইট, হিন্দু ধর্মে হয় না। ভক্ত যেমন আছে তেমন, সহজ করে আপনাকে কিছু বলবে না। আপনাকে আপনার গুরু কিছু করতে বলে দিতে পারেন, কিন্তু ধর্মের টোটালিটিতে, এই জিনিস হয় না।

ঠাকুর হাজরাকে নিয়ে বলছেন ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যাটা আমাদের সবার। ঠাকুরের আশেপাশে হৃদয়রাম, হাজরা, হলধারীর মত যে কজন ছিলেন, এনারা তো আমরাই। হৃদয়রাম এত ঠাকুরের সেবা করেছেন, তাঁর ভিতর অধিকারবোধ চাড়া মারল। আমরা কত ভক্তকে দেখি তাঁদের জীবনে কিছু অঘটন ঘটলে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ ঠাকুর তুমি দেখলে না। হাজরা জপতপ করছেন, কিন্তু ধারণা হচ্ছে না। ঠাকুর পরে বলবেন, এত কিছু করেও কিছু হয় না। হবে কি করে, এভাবে তো হয় না। হলধারী এত বড় একজন পণ্ডিত, ঠাকুর তাঁর কাছে কত কি শুনেছেন, কিন্তু যে জিনিসটা হওয়ার কথা, সেটাই হল না। হল নরেন রাখাল আদিদের। ঠাকুরের আশেপাশের লোকগুলির চরিত্র বিচার করে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখবেন, আমাদের ব্যবহার এদের মতই। আমরা মুখে বলছি, আমরা ঠাকুরের দিকে এগোচ্ছি, স্বামীজী, রাজা মহারাজ আমাদের প্রণম্য, কিন্তু আসলে আমাদের ব্যবহারের সাথে হৃদয়রাম, হাজরা, হলধারীর ব্যবহার কোন তফাৎ নেই। সবাই নিজের নিজের বৃত্তের মধ্যে গিয়ে আটকে যাচ্ছে।

তার হিসাব শুনে আমার মাথা টনটন করে। আমি জানি, আমি কিছুই জানি না। বলতে চাইছেন, সংসারের ব্যাপারে এত বেশি মন লাগাতে নেই। এরপরেই ঠাকুরের খুব নামকরা কথা –**কখন তাঁকে ভাবি ভাল, আবার কখনও ভাবি মন্দ। তাঁর আমি কি বুঝবে**।

আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় অনেকেই আছেন, যাঁদের অনেক সময় জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে, কষ্ট হয়েছে, চোখে জল এসে গেছে। ভেবেছেন, হে ঠাকুর তুমি থাকতে আমার কেন এমন হল। দ্বিতীয়, আশেপাশে যখন এত অন্যায় অবিচার দেখছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যে অন্যায় অবিচারের কথা বলছেন, তখন মনে হয়, সত্যিই তো ঠাকুর থাকতে কেন চারিদিকে এত অন্যায় অবিচার। তখন অনেক সময় মনে হয়, ঈশ্বর মন্দ। ঠাকুর এখানে এত সুন্দর ভাবে বলছেন, কিন্তু অন্য জায়গায় একজন যখন বলেছেন, ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ আছে, ঠাকুর তখন রেগে গিয়ে বলছেন, তোদের যেমন বেণে বুদ্ধি।

ব্যাপারটা কি হয়, এই যে সংসার, যেখানে আমরা বাস করছি, এই সংসারের রাজা হলেন মন। মন সমস্ত কিছুকে দেখছে আর সংসার নিজের মত চলছে। কিভাবে চলে? সংসারে এক বস্তু আর-এক বস্তুর উপরে, এক কথা আর-এক কথার উপরে, এক ব্যক্তি আর-এক ব্যক্তির উপরে ঘাত-প্রতিঘাত করে যাচ্ছে। দ্রষ্টা আমি, দেখছি আমার মন-বুদ্ধি দিয়ে। আর আমার ভিতরে একটা ভাল-মন্দের বিচার আছে। আপনি যদি কোন বাচ্চাকে দেখেন, তাদের পরিষ্কার, এটা ঠিক, ওটা ভুল; এই চিন্তা-ভাবনা থাকে। বাচ্চা যেমন যেমন বড় হয়, তেমন তেমন ভাল-মন্দের বিচার পাল্টাতে শুরু হয়ে যায়। আজকে আমি যেখানে আছি, আজকে আপনি যেখানে আছেন; যে পরিস্থিতিতে আছেন, সেখানে আপনার ভাল-মন্দের

একটা ভাব, একটা বিচার আপনার মধ্যে আছে। ফলে আপনি যখন জগতের দিকে তাকাচ্ছেন, তখন আপনার মনে হচ্ছে, জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না। দোষটা আমরা সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি ভগবানের উপরে। কারণ আমরা মনে করছি, তিনি সৃষ্টি করেছেন। সমস্যা কোথায় হয়, আমরা বেছে বেছে দোষটুকু ভগবানের উপর চাপিয়ে দিই, দুষ্টুমিগুলো ভগবানের উপর চাপিয়ে দিই, যত আবর্জন ভগবানের উপর ফেলে দিই; ভগবান যেন একটা বিরাট ডাস্টবিন। ওই লোকটা যে বদমাইশি করছে, সেটার দিকে আপনি তাকাচ্ছেন না?

আজ যদি ভারত গরীব দেশ হয়ে যায়, এর জন্য ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া কতটা ঠিক? কে দায়ী এর জন্য? আমি আপনি কি দায়ী নই? ভারতের লোকেরা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় কিনা? সব ধরণের সুবিধা নিতে চায় কিনা? ফ্রীতে জিনিস নিতে চায় কিনা? সারা দেশ তাই করে যাচ্ছে, নিজেরটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে, এরা যাবে সারা দেশের কথা ভাবতে? আর মাঝখান থেকে সবাই বলতে থাকবেন, সরকার কিছু করছে না। এটাই আমাদের সমস্যা। মানুষ নিজের মত করে আর প্রকৃতি নিজের মত চলে, আমরা নিজের মত বিচার করি আর ঠাকুরকে দোষ দিই।

যারা আর-একটু ভাল ভক্ত, তাঁরা কিছু ভাল হলে বলেন –ঠাকুরের কৃপা। কিন্তু একশ ভাগ যে ভক্ত, বা যদি আপনি ঠিক ঠিক ভক্ত হতে চান, আপনাকে জেনে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে; যে জিনিসগুল আপনার চোখে পড়ছে, আপনার বুদ্ধির জন্য কখন সেটা ভাল মনে হয়, কখন সেটা মন্দ মনে হয়। আর আপনি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন, যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, সব তিনি করাচ্ছেন; ফলে আপনার মনে হবে কখন তিনি মন্দ, কখন মনে হবে তিনি ভাল। আসলে ভগবান ভাল-মন্দ সব কিছুর উর্ধ্বে, এই জিনিসটাকে মনে করে সেইখানেই জিনিসটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলে যেতে হবে। সবাই জানে লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। আমরা বলছি ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, তার মানে, ভাল যেটা সেটা তিনি, মন্দ যেটা সেটাও তিনি। প্রথম কথা, শুধু একটা জিনিস তাঁর উপর চাপাবেন না; ভাল দিলে মন্দটাও দিতে হবে, মন্দ দিলে ভালটাও দিতে হবে। তখন কি হবে? কখন মনে হয় তিনি ভাল, কখন মনে হয় তিনি মন্দ। কোনটা দিয়ে কি করছেন, কেন করাচ্ছেন, কে জানে। কারণ আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের কার্য বোঝা অসম্ভব। আমরা যেটা বুঝতে পারি, সেটা হল, আমরা কি চাইছি? আপনি কি চাইছেন? আপনি চাইছেন ইষ্টের দিকে এগোতে।

তাই যদি হয় তাহলে দুই হাত দিয়ে ইষ্টকে ধরুন, এরপর তিনি যা চাইবেন করবেন। কথার কথায় মনে করুন, আপনি হরিদ্বার গেলেন, আপনি বলছেন, আহা, মা গঙ্গা এখানে ধরায় নামছেন; হয়ে গেল। এবার আপনি ব্রহ্মকুণ্ড, হর কি পৈরী দর্শন করুন, গঙ্গা আরতি দেখুন। কিন্তু সেখানে বসে আপনি যদি বিচার করতে শুরু করেন, এখানকার পৌরসভা এই রকম, এখানকার পুলিশ এই রকম। আপনার আবর্জনাগুলিকে সাথে করে তীর্থে চলে এসেছেন। এটাই বারবার বলছি, ঠাকুর হলেন আমাদের একজন আদর্শ ভক্ত, আদর্শ ভক্ত কেমন জীবন-যাপন করবেন দেখিয়ে গেলেন। এরপর আপনি বলুন না, কখন মনে করি তিনি মন্দ, কখন মনে করি তিনি ভাল। কিন্তু তিনি ভাল হন, আর মন্দ হন –তিনি আমার, আমি তাঁর। কাহিনী এখানেই শেষ।

এটাই উদ্দেশ্য, অত বিচার করার কি আছে। যদি আপনার তাঁকে মন্দ মনে হয়, তাহলে ছেড়ে দিন। একবার আমার এক সন্ন্যাসী ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল –শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে অনেকে নিন্দা করে, তিনি কেন সীতাকে ত্যাগ করলেন, তিনি কেন বালিকে এভাবে বধ করলেন। উনি হেসে খুব সুন্দর কথা বললেন, আমি কখন ভাবিনি এই রকম উত্তর হতে পারে। উনি বললেন, 'উত্তর সব সময় এটাই দেবেন, আমাদের রামচন্দ্র এই রকমই; তা সত্ত্বেও যদি তুমি তাঁকে অবতার রূপে, ইষ্ট রূপে নিতে চাও নাও, না হলে চলে যাও, এটা তোমার জন্য নয়'। উত্তরটা আমার খুব সুন্দর লাগল, কাটাকাটা উত্তর

কিনা, পরিষ্কার উত্তর। এক কথায় কোপ মেরে দাও –হ্যাঁ ভাই, আমাদের ঈশ্বর এই রকমই, মন্দ করেন; নেবে আমাদের ঈশ্বরকে? নাও তো থাকো। নেবে না, গেট আউট; তোমার এখনও সময় হয়নি।

একবার স্বামীজী এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার মাঝে হঠাৎ একজন শ্রোতা বলতে লাগলেন, আমি আপনার কথার সাথে এক মত নই। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, তাহলে এটা তোমার জন্য নয়। অর্থ হল, এটাকে নেওয়ার জন্য তুমি এখনও প্রস্তুত হওনি, যখন প্রস্তুত হবে নেবে। সব কথা নেওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত না। তোমার যদি এখনও মনে হয়, ঈশ্বর এটা কেন করলেন, ওটা কেন করলেন; আমাদের ঈশ্বর এই রকমই। তা সত্ত্বেও যদি নিতে হয়, নাও। তোমার যদি মনে হয় এই ঈশ্বর নেওয়ার মত নয়; তাহলে তুমি দূরে থাক, তোমার এখনও সময় হয়নি ভাই। এখন তুমি শরীর ধারণ করে সংসারে থাক। সংসারে এদিক গেলে ঝাঁটা দিয়ে মারব, ওদিক গেলে কাস্তে ছুঁড়ে মারব। কয়েক জন্ম মার খাও, তারপর আসবে।

মণি –আজ্ঞা হাঁ, তাঁকে কি বুঝা যায়? যার যেমুন বুদ্ধি সেইটুকু নিয়ে মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলেছি। আপনি যেমন বলেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিছল, তার একদানায় পেট ভরল বলে মনে করে –এইবারে সব পাহাড়টা বাসায় নিয়ে যাব।

ঠাকুর আবার আমরা যে জিনিসটাকে নিয়ে বললাম, সেটার ব্যাখ্যা করছেন।

ঠাকুর –তাঁকে কে জানবে? আসলে আমাদের মনটা সীমিত আর ঈশ্বর অনন্ত। সীমিত দিয়ে অনন্তকে জানা যায় না। অনন্তের সঙ্গে এক হওয়া যায়, অনন্তকে জানা যায় না। **আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল মা বলে ডাকি।** এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা। ঠাকুর অবতার, ঠাকুর আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন; ঠাকুর সন্ন্যাস নিয়েছেন; আমি সেই ব্রহ্ম, এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত; তাও বলছেন, আমি কেবল মা মা বলে ডাকি। ঠাকুরের কত রূপ, ঠাকুর সাকার, ঠাকুর নিরাকার, ঠাকুর আরও কত কি, তাতে আমার কি! আমি এই রূপটাকে জানি, এতেই আমি খুশি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দু মিনিটের জন্য নিজের ঘরে বসবেন আর জোর গলায় বলবেন, হর হর ব্যোম ব্যোম, দেখবেন মনটা একেবারে ফ্রেশ হয়ে যাবে। আমার শিব এই রকমই। করে দেখুন, মনে যত আবর্জনা জমে আছে সব পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আপনার যত রকম অবসাদ আছে, সব কেটে যাবে। দরজা বন্ধ করে ঠাকুরের ভজন গান, কালীকির্তন চালিয়ে নিজের মত দু হাত তুলে নৃত্য করুন কিছুক্ষণ, মন তরতাজা হয়ে যাবে।

মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বেড়ালছাঁর স্বভাব। বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে –কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোটছেলে মাকে চায়। মার কত কত ঐশ্বর্য সে জানে না। জানতে চায়ও না।

একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করলাম, ঠাকুর যিনি তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নির্গুণ নিরাকারের সাধনা করে অদ্বৈত তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তারপরেও মা মা করছেন, এগুলো হল ভাব। সত্যিকারের আমাদের যিনি ইষ্ট, তিনি কিভাবে আমাদের রেখেছেন, আমরা কিভাবে জানব? জানার উপায় নেই। এই বিশ্বে তিনি কাউকে বৈজ্ঞানিক করে রেখেছেন, কাউকে তিনি কবি করে রেখেছেন; সেখান থেকে তিনি তাঁকে সেই ভাবে আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা রাজনীতি করে নেতা হয়ে গেছেন, তাঁদের তিনি সেইভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদে তিনি সন্ন্যাসী করে রেখেছেন, সন্ন্যাসের অর্থ হল ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত থাকা। আপনাকে হয়ত তিনি সংসারে রেখেছেন, সংসারে তুমি ভক্ত রূপে এখন থাক। সংসারে থাকা, এটা একটা ভাব। তেমনি সন্ন্যাসে থাকা এটাও একটা ভাব। কবি হওয়াটাও একটা ভাব, তেমনি বৈজ্ঞানিক হওয়াটাও একটা ভাব আর রাজনীতিতে একজন নেতা হওয়াটাও একটা ভাব। সগুণ সাকার চিন্তন একটা ভাব, কৃষ্ণকে ভালবাসা একটা ভাব, নিরাকারে ডুবে যাওয়া একটা

ভাব। যখন তিনি যে ভাবের মধ্যে রেখেছেন, তখন সেই ভাবের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি এক করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। কম-বেশি আমিত্বের বোধ সবার থাকে। আমিত্বের বোধ যার নেই, সে তো ঠাকুরের মত কথামৃতের প্রবচন দিতে শুরু করে দেবে।

ঠাকুরের আমিত্ব চলে গেছে, এই যে একটু 'আমি' 'আমি' করছেন, অতটুকু 'আমি' মা রেখে দিয়েছেন যাতে লোকশিক্ষা হয়। আমাকে আপনাকে ওটার জন্য মা রাখেননি, আমাদের শিক্ষা নেওয়া এখনও শেষ হয়নি, আমাদের এখন শিক্ষা নেওয়া চলছে। তার মানে আমাদের আমিত্ব বোধ আছে। আমিত্ব বোধ যতক্ষণ তিনি রেখে দেবেন, ততক্ষণ ঈশ্বর যে ভাব দিয়ে রেখেছেন ঠিক সেই ভাবকে পুষ্ট করার জন্য এই আমিত্বের সাহায্যে নিজেকে নিজের ভাবেতে স্থির থাকা। গৃহস্থ হয়ে সন্ন্যাসীর মত ব্যবহার করা, সন্ন্যাসী হয়ে গৃহস্থের মত ব্যবহার করা, ভক্ত হয়ে নাস্তিকদের মত যুক্তিবাদী হওয়া, আর নাস্তিক হয়ে ভক্তের মত হওয়া, এই জিনিস কখনই হওয়া উচিত নয়। নিজের ভাবে স্থির থাকুন, নিজের ভাবে সৎ থাকুন; ঈশ্বর আপনাকে ঠিক নিয়ে যাবেন। এটাই এখানে বলছেন, বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে।

সে জানে আমার মা আছে, আমার ভাবনা কি? চাকরানীর ছেলেও জানে, আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, "আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে"! আমারও সন্তানভাব।

আসলে এটাই ঠিক ঠিক বেদান্ত, ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক ভাব এটাই। আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক পথ, আমাদের সমস্ত শাস্ত্র এটাই আমাদের দেখান, এটাই তাঁরা আমাদের শেখান। যত ভাব বলা হল, আপনি যদি একটু বিচার করেন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি এখন ওর মধ্যে কোন না কোন একটা ভাবে আছেন। বুঝে নেওয়ার পর ওই ভাবে সৎ থাকা। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল, আমরা আমাদের ভাবটাকে ছেড়ে দিয়ে আমিত্বটাকে বড় করে দিই। তখন আবার বলব, আমিত্বটাই আমার ভাব। অহঙ্কার কি করে কারুর ভাব হতে পারে! ভাব হবে, এতক্ষণ যে যে কথাগুলো বললাম, এগুলোই ভাব হয়।

হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, "আচ্ছা এতে কিছু আছে; তুমি কি বল"?

মাস্টারমশাই কিন্তু বুঝেছিলেন। যদিও ঠাকুরের সঙ্গ পাওয়ার বেশ কিছু বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর মাষ্টারমশাই কথামৃত লিখতে শুরু করেন, ফলে তত দিনে তিনি আরও অনেক কিছু বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও ঠাকুর বোঝানর চেষ্টা করছেন, ওহে বাপু, বুঝে নাও। এতে কিছু আছে, বলে ঠাকুরের যেটা বোঝাচ্ছেন, সেটা শুধু ঠাকুরেরই নেই, আপনারও আছে; একই জিনিস, সেই অন্তর্যামী, সেই ঈশ্বর। ঠাকুরের ক্ষেত্রে ঠাকুর জেনে গেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন। আমার আপনার ক্ষেত্রে, আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না। মাস্টারমশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কি বল? মাস্টারমশাই কি বলবেন –

তিনি অবাক হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? জীবের মঙ্গলের জন্য।

মাস্টারমশাই ভাবছেন, মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? আশ্চর্য দেখুন, মাস্টারমশাই প্রথম যেদিন থেকে ঠাকুরের কাছে আসতে শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি সাকার মানতেন না। তখন ব্রাহ্ম সমাজে পুরোপুরি নিরাকার ভাবের উপাসনা চলছে; কিন্তু তিনি ভাবছেন, মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? আমাদের বেশির ভাগ লোক এই রকমই হয়, মুখে একটা বলে, যেটা বলছে সেটা বোঝেও

না, না বুঝেই বলে। একবার যদি বুঝে নেওয়া যায়, ঠাকুরের যে ভাব, ঠাকুর যেটা বলছেন পরিষ্কার দুটো রূপে বলছেন –আচার্যরূপে ও ভক্তরূপে। আচার্য মানে, অবতার। মাস্টারমশাই ভাবছেন –মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? জীবের মঙ্গলের জন্য। ঠিক তাই, আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি যদি অবতার না হয়ে আসতেন, তা হলে আমরা একটা বৃত্তের মধ্যে ফেঁসে থাকতাম, ওই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরঘুর করতাম। উপায় –দু হাত দিয়ে ঠাকুরকে ধরে রাখা, যে যার নিজের ইষ্টকে ধরে রাখা। ভাল-মন্দ নিজের মত আসবে, নিজের মত চলে যাবে। বেদান্তও এটাই বলে –*তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*। শুভ আসবে, অশুভও আসবে। যদি কাউকে দোষ দেওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে বলো, হ্যাঁ কখন তিনি মন্দ, কখন তিনি ভাল। কিন্তু ওতে তুমি জড়াতে যেও না। যদি তুমি ভাল ভক্ত হতে চাও তাহলে –*সর্বত্রানভিস্নেহঃ*, অভিস্নেহ ত্যাগ কর, নির্বিকার হয়ে থাক –তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ। ঠাকুরের মূল কথা এই –সব চেক এখান থেকে পাশ করানো, গীতাতেও এই কথা বলছেন। ঠাকুর যখন বলছেন, তখন আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমরা বুঝতে পারছি, আর সত্যিকারের ঠাকুর এই রকম করে দেখিয়েছেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ ২৬শে সেপ্টম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, বিকালবেলা (পৃঃ ২৮২)। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। মাস্টারমশাই এই দিনের খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন –**ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরের সম্মুখে চাতালের উপর উপবিষ্ট। জগন্মাতাকে কালী-প্রতিমামধ্যে দর্শন করিতেছেন**। মন্দিরের গর্ভগৃহে যে মাকালীর প্রতিমা, ঠাকুর সেই প্রতিমায় সাক্ষাৎ জগতের মাকে দেখেছেন। প্রতিমার মধ্যে জগন্মাতাকে দর্শন করার ব্যাপারে আমরা আগে আগে বিস্তারে বর্ণনা করেছি, পরে আরও আরও করব কেন এর এত গুরুত্ব।

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে ঠাকুর বলিতেছেন, "ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু হিসাব করবার জো নাই"। এই প্রসঙ্গে একটু আগে আমরা বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি, আরও দুটি কথা বলব। **"তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য। মানুষ মুখে কি বলবে। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিয়ে, একদানা চিনি খেলে। তার পেট ভরে গেল; তখন সে ভাবছে, এইবার এসে সব পাহাড়টা গর্তের ভিতর নিয়ে যাব"**। ঠাকুরের খুব বিখ্যাত গল্প, আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো বোঝার জন্য এই ধরণের গল্প খুব দরকার। এখানে এই একটা বিষয়কে অনেকবারই ব্যাখ্যা করতে হয়, বোঝাতে হয়; বিশেষ করে ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে বিভিন্ন গুরুজীরা, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রচারকরা যা বলছেন, সেগুলো শুনে আমরা ভুল বুঝে, নিজের মত একটা ধারণা করে নিয়ে আমরা ধর্মের পথে চলি। তার জন্য অনেক সমস্যা তৈরী হয়ে যায়। আমি ভাবি, ভাগ্যিস ঠাকুর এসেছিলেন; ঠাকুর যদি না এসে থাকতেন, তাহলে যে কি হত কে জানে। আমাদের সময় আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন তাও একটু ধর্ম ভাব ছিল; ধর্মকে ঠিক ঠিক জানেন, এই রকম লোক তখনও পাওয়া যেত। বর্তমান কালে সোস্যাল মিডিয়া হয়ে গেছে আমাদের গুরু। এখান থেকে মানুষ কি শিক্ষা পাচ্ছে, কেউ জানে না। এখান ওখান থেকে দু-চারটে পপুলার কথা শুনে এমন এমন ভাব দেখান যে, সত্যিই এদেরকে কোন কিছু বোঝান খুব মুশকিল।

এক ব্যক্তি একজন জনপ্রিয় বক্তার বক্তৃতা শুনে আমার কাছে এলেন বেদান্ত শিখতে। আমি বলেই ফেললাম, 'কি বেদান্ত শিখবেন? কথামৃত তো বেদান্ত, এরপর আর কি বেদান্ত শিখবেন'? সে বুঝতে চাইছে না, আমার কথা মানতে চাইছে না। তার ধারণা যতক্ষণ না পঞ্চদশী, বিবেকচূড়ামণি এগুলো থেকে বেশ বড় বড় কথা একটা কিছু না বলা হয়, ততক্ষণ যেন ঠিক ঠিক বেদান্ত হবে না। আমি তাকে বললাম, 'এগুলো শাস্ত্রও না। কম বয়সে আমিও কয়েকজনের দেখাদেখি এই গ্রন্থগুলি পড়েছিলাম। এখন গীতা, উপনিষদ, কথামৃত ছাড়া কিছু পড়িও না, আর জানিও না'। তবে হ্যাঁ, যতটুকু পড়েছি, ভাল ভাবে পড়েছি; যতটুকু পড়েছি, পড়ার পর তার গভীরে গেছি।

একটা অতি সাধারণ জিনিস, বেদান্তের মূল কথা –ঈশ্বর অনন্ত। এখানেই সব শেষ হয়ে যায়, এরপর আর কিছু নেই; এছাড়া বেদান্তের অন্য কোন বক্তব্য নেই। আপনার মনে হবে, কেন এই যে বেদান্ত বলছেন, অহং ব্রহ্মাস্মি বা তত্ত্বমসি? ঈশ্বর যদি অনন্ত হয়, তাহলে অহং ব্রহ্মাস্মি ছাড়া অন্য কোন কিছুর সম্ভবনাই নেই। কারণ অহং বলে কিছু নেই কিনা। তত্ত্বমসি যখন বলছেন, তুমিই সেই; এটা হতে বাধ্য, কারণ অন্য কিছু নেই কিনা। গভীরে ঢুকুন, ঢুকে একটু ভেবে দেখুন। আপনি একটা সমুদ্রের কল্পনা করুন। সমুদ্রে অনেকগুলো বরফ ভাসছে। তার মধ্যে একটা বরফ, সে হচ্ছে সবার গুরু। সেই গুরু বরফ ছোট ছোট বরফের যে চাঁই ভেসে যাচ্ছে, তাদের বলে যাচ্ছেন, সমুদ্রই সত্য, এছাড়া আর কিছু নেই। ছোট ছোট বরফের যে চাঁই, এরা হাজারটা তর্ক করবে – কেন আমরা সমুদ্র যে দেখছি এটা তো তরল, আপনি তো জমাট। গুরু এদের কি বোঝাবে? সমুদ্রই সত্য, বাকি সব মিথ্যা; এছাড়া বলার তো আর কিছু নেই। এটাকে বোঝানর জন্য হাজারটা কথা বলতে হবে –ওহে তুমিই সেই, ওহে সমুদ্র আর তোমার মধ্যে শুধু নাম আর রূপের তফাৎ। শাস্ত্র বারবার এই কথাই বলছেন, অতি সহজ কথা। আজকে আমি সহজ বলছি ঠিকই, রামকৃষ্ণ মিশনে পয়তাল্লিশ বছর পড়াশোনা করে, সাধুসঙ্গ করে তারপর আজ সহজ বলতে পারছি। একদিনে এই তত্ত্ব ধারণা করা হয় না, মানছি। কিন্তু একবার যখন বুঝে নেবেন তখন এতটা কঠিন বলে মনে হবে না।

আসলে মজার ব্যাপার হল –তিনি অনন্ত; বেদান্ত ছাড়া আর কেউ এই কথাতে জোড় দেন না। এমনকি আমাদের যে সম্প্রদায়গুলো, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়; যাদের কথা পরে আসবে; এরা তো এই ধরণের কথা মুখেও আনবে না। বর্তমান কালে কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায় খুব নাম করেছে। ওদের কথা হল –কৃষ্ণই ভগবান। কৃষ্ণই যদি ভগবান হন তাহলে বাকিরা কি? তখন ওরা কলা, অংশ এসব হিসাব নিয়ে এসে বলবে, কৃষ্ণের অংশ। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনি যখন এই কথা বলছেন, তখন আপনারা অজান্তায় কৃষ্ণকে একজন মানুষ বানিয়ে দিচ্ছেন, আপনি মানুন আর নাই মানুন। আপনাদের অনুরোধ করছি একটু ভেবে দেখতে। একটু ভেবে যদি দেখেন, আপনার ইষ্ট যদি শিব হন, শ্রীকৃষ্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ হন; যখনই তাঁর কথা বলেন, অজান্তায় তাঁকে একজন দিব্য পুরুষ বানিয়ে দিচ্ছেন আর তাঁকে সীমিত করে দিচ্ছেন। প্রত্যেক ধর্মের এই সমস্যা, বেশির ভাগ হিন্দু সম্প্রদায়গুলোর এই সমস্যা, আর ভক্তজন যাঁরা, তাঁদের সবারই সমস্যা। যেমনি আপনি একটা নাম দিয়ে একটা জোর দিচ্ছেন, তেমনি আপনি ভগবানকে সীমিত করে দিলেন। আপনার যে মতুয়া বুদ্ধি, আপনি যে মৌলবাদী; এগুলো তো পরে হবে। মতুয়া বুদ্ধি মানে, আমার যে মত, এই মতটাই ঠিক, অন্য মত ঠিক না। মৌলবাদী – বোমা মারা, গলা কাটা, কিংবা তোমার সাথে আমি কথা বলব না। এই জিনিসগুলো অনেক পরে আসবে। কিন্তু আপনি নিজের জন্য আপনার ইষ্টকে আপনি সীমিত করে দিলেন।

ঠিক তেমনি নামের পরে এসে যায় রূপ; আমি এই রূপেই দেখব। ভগবানকে আপনি অজান্তায় সীমিত করে ফেললেন। আর তার সঙ্গে আপনি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে কোন গুণ লাগিয়ে দেন, এখানে এসে আমরা সবাই ফেঁসে যাই। আমরা মনে করি, ভগবান ভালকে ভাল দেন, মন্দকে মন্দ দেন। আমরা এই ধরণের ব্যাখ্যার কোন একটা ব্যাখ্যাতে মজা করে বলেছিলাম –আমাদের একটা ধারণা যে, ভগবান উপরে কোথাও রাজার মত বসে আছেন, সেখানে বসে তিনি ভালকে ভাল দিচ্ছেন, মন্দকে সাজা দিচ্ছেন ইত্যাদি। আমাদের এক পরিচিত মেয়ে, বেশ কিছু দিন আগে তিনি সারদা মঠে জয়েন করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি প্রশ্ন লিখে পাঠান। একদিন খুব মজা করে লিখলেন –আমাদের ধারণা ছিল ভগবান উপরে দাদুর মত বসে আছেন, ভালই ছিলাম। কিন্তু আপনার মাণ্ডুক্যকারিকা আর উপনিষদ শুনে শুনে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, কিছুই মেলাতে পারছি না; আর দুর্ভাগ্য যে, জানি এগুলোই সত্য।

বালবুদ্ধি দিয়ে যখন আপনি ঈশ্বরকে পরিভাষিত করেন, তখন আপনি নিজের জন্য বা অপরের জন্য আর যাই হন, আপনি ধর্মপ্রাণ হতে পারেন না। আপনি যেমনি বলছেন, ঈশ্বর ভাল, ঈশ্বর দয়াময়;

আগামীকাল আপনার পরিবারে একটা অঘটন ঘটে যাবে, যেখানে আপনার সব দয়াময় ভাব উড়ে যাবে। অনেক আগে আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন স্বামী চন্দ্রানন্দজী মহারাজ, ওনার কাছে আমি বড় হয়েছি। অতি মধুর প্রকৃতির সাধু ছিলেন। ওনার মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। উনি আগে দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলেন, পরে পাটনা আশ্রমে গিয়েছিলেন। পাটনাতে পরিচিত একজন বিহারের ভদ্রলোক, কিভাবে কিভাবে ঠাকুরের ভক্ত হলেন, ঠাকুরের উপর অনেক বই পড়শোনা করলেন। যাই হোক এত বই পড়েও তাঁর ভক্তি কোথাও সেই আগের মত আবেগপূর্ণ থেকে গেল। তারপরে ভদ্রলোকের জীবনে কিছু অঘটন ঘটে। ছেলে মারা যাবার পর ভদ্রলোক ভেঙে পড়লেন। এমনই ভেঙে পড়লেন যে ধর্ম থেকে তাঁর অরুচী এসে গেল। উনি এক সময় বড় অফিসার ছিলেন। একদিন আশ্রমে এলেন মহারাজকে ধর্মীয় সমস্ত বই ফেরত দিতে। ফেরত দিয়ে বলছেন, 'আমার আর ধর্মে কোন রুচি নেই, ধর্মের এই বইগুলো এখানকার আশ্রম থেকে কিনেছিলাম, আপনারা বইগুলোকে আপনাদের লাইব্রেরিতে রাখবেন'। মহারাজ বুঝে গেছেন, তিনি এখন একজন আর্ত, শোকার্ত। তিনি বইগুলো রেখে দিলেন। ভদ্রলোককে তিনি নিজের ঘরে বসালেন, জল দিলেন, চা খাওয়ালেন।

কথামৃত হিন্দিতে অনুবাদ আছে, তিনটে খণ্ড। হিন্দির খুব বড় সাহিত্যকার সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা কথামৃত হিন্দিতে অনুবাদ করেন। মহারাজ ভদ্রলোককে বললেন, 'এই তিনটে বই আপনি রেখে দিন, কে জানে আপনার আবার হয়ত রুচি হতে পারে'। একটু না না করেও ভদ্রলোক বই তিনটে রেখে দিলেন। আশ্রমে আসা বন্ধ। বেশ কিছুদিন পরে, এক বছর কি দু বছর পর আবার তিনি এলেন। খুব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণাম করে মহারাজকে বললেন, 'আপনি সেদিন বলেছিলেন, তাই আপনার কথা মত আমি বই তিনটে রেখে দিয়েছিলাম। একদিন কি মনে হল, দেখি একটু উল্টেপাল্টে পড়ি। আমার মন এখন স্থির হয়ে গেছে'। সমস্যা কি হয়, আপনি যখনই ঈশ্বরের উপর একটা গুণ চাপিয়ে দেবেন, এই যেমন খ্রীশ্চানরা ইদানিং শুরু করেছে, Jesus loves you, তাহলে তোমাদের এত দুরবস্থা কেন? কিছু দিন আগে পর্যন্ত এরা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত, সব দেশে লুটপাট চালাত। চারশ পাঁচশ বছরে চালাকি করে, বিভিন্ন ভাবে এখন একটু উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন অন্যরা চালাকি শিখে নিয়েছে, আবার এখন এদের ভিক্ষাপাত্র নেওয়ার অবস্থা এসে গেছে। Jesus loves you, তাহলে এত খুনোখুনি করার কি দরকার? আপনারা বলে থাকেন, ঈশ্বর দেখছেন; কেন দেখবেন? আমার খুব প্রিয় কথা –আমার ঠাকুর নিজের কোমরের ধুতি সামলাতে পারতেন না, আর তিনি জগতকে দেখছেন –এর থেকে কি ভাল সামলাবেন। কিছু দিন আগে আমাদের এক সন্ন্যাসী ভাই এসে বলছেন, 'ঠাকুরের কৃপায় আজ আমাদের সবার খাওয়া-পরা ভালই চলে যাচ্ছে'। আমি হেসে মজা করে বললাম, 'ঠাকুরের কৃপা যদি সত্যিই আপনার উপর হত, না খেয়ে বসে থাকতে হত আপনাকে। ঠাকুরের জীবন দেখুন, চিরদিন পয়সার অভাবে থাকলেন, কাশীপুরে থাকার সময় চাঁদা করে তাঁকে খেতে হত। ঠাকুর চলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীমার খাওয়া জুটত না, পরার কাপড় জুটত না'।

সন্ন্যাসী ভাই তখন বলছেন, 'ওনারা তপস্যা করেছিলেন বলেই আজ আমরা ভালমন্দ খেতে পাচ্ছি'। বললাম, 'হ্যাঁ, স্বামীজীরা যখন বরাহনগরে নূতন মঠ করলেন, খাওয়া-পরা কিছুই ছিল না। অত সব ছেড়ে দিন, আশির দশকে আমরা যখন জয়েন করেছি, তখনও ওই একই অবস্থা'। ১৯৮০ সালে দেওঘরে আমি জয়েন করেছিলাম, জয়েন করার পর বাবা-মার এমন অত্যাচার শুরু হল যে, পিছনের গেট দিয়ে আমাকে পালিয়ে জামতারা আশ্রমে চলে আসতে হয়েছিল। জামতারা আশ্রমে এসে দেখি, মোটা চালের ভাত আর জোলো ডাল সাথে কুমড়োর ঘ্যাঁট। রাত্রে কোন রকমে দু দানা ভাত খেলাম। সকালে ব্রেকফাস্টে এক ধামা মুরি, দুপুরে আবার সেই ভাত, সেই ডাল আর কুমোড়োর ঘ্যাঁট। মনে মনে আমি নিজেকে বলতে লাগলাম, এই খাওয়ার চেয়ে বাবা-মায়ের মুখোমুখি হওয়া আমার পক্ষে অনেক জরুরী, এই খাওয়া আমি পারব না। কিন্তু ওই খাবার খেয়েই তো সাধুরা দিনের পর দিন দিব্যি সেখানে পড়ে আছেন। আমি মজা করেই বলছিলাম, 'ঠাকুরের কৃপা যদি আপনার উপর হয়, মনে

রাখবেন, কামিনী-কাঞ্চন আর নামযশ, তিনটেই আপনার নাশ হবে। আর যে সংসারকে ভাল মনে হচ্ছে, সেই সংসার ভেঙে আপনার সর্বনাশ করে দেবে। এরপরেও যদি বুক ঠুকে বলতে পারেন, আহা, আমার উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা, তাহলে বুঝবেন আপনার দম আছে'। যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ, তবু যে করে আমার আশ, আমি হই তার দাসের দাস।

আমি তখন সবে দেওঘর বিদ্যাপীঠে জয়েন করেছি, সেই সময় দেওঘরে স্বামী সুহিতানন্দজী ছিলেন, তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট অনুরাগী ছিলেন, তিনি আমাকে চৈতন্যচরিতামৃতের অনেক কথা বলতেন। নূতন জয়েন করেছি, এই কথা শুনছি আর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি –হায়রে কি সর্বনাশ হবে কে জানে। ভয় তো করারই কথা, তখন কাঁচা মন কিনা। এই যে ঠাকুর দয়াময়, কৃপাময়; এইসব ভাব রাখলে, আপনার জীবনে অনেক ভাঙন আসবে। সেইজন্য কি হয়, কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হয়। এই যে ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর কি, বোঝা অসম্ভব, বোঝার চেষ্টাও করবেন না। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য কি, জানা সম্ভব না, জানার চেষ্টাও করবেন না। আর ঈশ্বরের কাজ কিরূপ, জানা যাবে না, জানার চেষ্টাও করবেন না। আগের দিন ঠাকুর বলছিলেন, কখন ভাবি তিনি ভাল, কখন ভাবি তিনি মন্দ। যখন দেখছেন জগতে কত লোকের কত কষ্ট, কম বয়সী মেয়ে বিধবা হয়ে গেল; এখন তো তাও অনেক রকম ব্যবস্থাদি আছে, কিন্তু আগেকার দিনে অল্প বয়সী বিধবা মেয়ে মানে জীবনটা শেষ; বাচ্চা অনাথ হয়ে যাচ্ছে; যুদ্ধে কত কি হচ্ছে। তখন মনে হয় ঈশ্বর কি করছেন? এগুলোকে নিয়ে মাথা খাটাতে নেই। কারণ কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

মূল জিনিসটা সব সময় মনে রাখতে হবে, যেটাকে কক্ষণ ছাড়া যাবে না –তিনি আছেন। আপনি বলবেন, তিনি আছেন, কিন্তু এগুলো যদি আমার না হয় তাহলে এই ঈশ্বর আমার কি কাজে লাগবে। এখানেই আপনি ভক্ত। যাদের মনে চাহিদা আছে, তারা তো দু নম্বরী ভক্ত। আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বেলুড় মঠে যাই, মাঝে সাজে এর ওর সাথে দেখা হয়ে যায়। দেখেই দৌড়ে এসে বলে, 'মহারাজ আপনার লেকচারগুলো শুনছি, কিন্তু কতটুকু নিতে পারছি বুঝতে পারছি না'। সব কিছুতে আপনারা এত বিচার করেন কেন? ঠাকুরের কথায় বেণে বুদ্ধি। এক ঘন্টা সমর্পণানন্দকে শুনলাম – আমার কতটুকু লাভ হল। শুধু লাভ-লোকসান। গত জন্মে এরা সব হয়ত দাঁড়িপাল্লা ছিল, নয়তো মরে দাঁড়িপাল্লা হবে, ভগবান জানেন। এত হিসাব কেন করবেন? শাস্ত্রের কথা শোনা, এটাই সাধনা। বছরের পর বছর, জন্ম-জন্মান্তর ধরে যখন শাস্ত্র শুনবেন তখন শুভ সংস্কার তৈরী হবে। কোন তো সংস্কার ছিল না, একটু শুভ সংস্কারের জন্য এখন শাস্ত্রের কথা শুনছেন।

প্রথম হল, তিনি আছেন। দ্বিতীয়টা হল –যাবতীয় যা কিছু আছে, সব তিনিই হয়েছেন। ভাল যেটা হচ্ছে, সেটাও তাঁরই হচ্ছে; খারাপ যেটা হচ্ছে, সেটাও তাঁরই হচ্ছে। আর যেখানে যা হচ্ছে, কেন তিনি করছেন? জানি না। ঠাকুর পরে বলবেন, ভগবান একজন শিশু। শিশু মাকে ছাড়া আর কিছু জানেনা। এই জিনিসগুলোকে বোধের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে, যদি না রাখেন সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের সীমিত মন। এই সীমিত মন দিয়ে আমরা যখন অনন্তকে জানতে যাই, তখন অন্তকেও আমরা সীমিত করে দিই। এই গল্প আপনার অনেকেই জানবেন, নরেন্দ্রনাথ তখন বালক বিলে। বিলে কোন দুষ্টুমি করার পর বড়রা তাকে মারতে যেত, তখন বিলে চট করে নর্দমায় নেমে দাঁড়িয়ে থাকত। ওখান থেকে বিলে ওদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলত, এসো এসো, আমাকে মারো। বিলে জানত, এরা নর্দমাতে নামবে না।

আমাদের মন সীমিত, নর্দমার মত। ভগবানকে সেখানে নামিয়ে ছাড়ব। আমরা যেমন বিষয়ী, ভগবানকেও সেই রকম বিষয়ী বানিয়ে ছাড়ব; এ-রকম করতে নেই। এই ভুলটা যাতে আমরা না করি, সেইজন্য অবতার আসেন। অবতার এসে বারবার এটাই আমাদের বোঝান, তুমি এই যে সীমিত বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে, ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করছ, এ-রকমটা কোরো না। যত ধর্মশাস্ত্র আপনি পড়বেন, বিশেষ

করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, দেখবেন সেখানেও একই কথা বারবার বলছেন, বারবার এই জিনিসটাকে শাস্ত্র আমাদের বোঝানর চেষ্টা করছেন –অনন্ত ভাব অনন্ত ঐশ্বর্য। এটাকে যদি একটু ধারণা করে নিতে পারেন, দেখবেন জীবনে আপনার অনেক সমস্যা কমে যাবে। কষ্ট হবে, হচ্ছেও; কিন্তু কি জানি কেন হচ্ছে। চোখের জল তো বেরোবেই, কেন বেরোবে না, কষ্ট হচ্ছে বলেই বেরোচ্ছে। আমাদের দেহবোধ আছে, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ আছে, আমার দুঃখ বোধ হবে। ছোট বাচ্চাকে মা কি বাবা যদি একটু বকে দেয়, বাচ্চা ভাবে, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। ওইটুকু বাচ্চা কত দূর আর যাবে। দু পা ফেলে আবার ফেরত চলে আসবে বা মা নিজেই ধরে আনবে।

ঠাকুর এখানে যে কথা বলছেন, এই দুটি কথা, আগেও বলা হয়েছিল, আবারও বলব, বিশেষ করে আপনারা যাঁরা ভক্ত, ঠাকুরের ব্যাপারে এই দুটি কথা সব সময় মনে রাখবেন। ঠাকুরের মধ্যে কক্ষণ কোন অবস্থায় মানুষ জ্ঞান আনবেন না। ঠাকুরকে মানুষ জ্ঞান এনেছেন কি, আপনার কথামৃত বোঝা ভুল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ভগবান যখনই অবতার হন, তিনি এসে লীলা করেন। তিনি যা কিছু করেন সেটাকেই লীলা বলা হয়। এখন তাঁর পূর্ণ শক্তি থাকে, কি পূর্ণ শক্তি থাকে না; এগুলো আমাদের ব্যাপার না। আমাদের কাছে যে ব্যাপারটা জরুরী, সেটা হল, ভগবান যে অবতার হয়ে আসেন, তখন একটা ভাব নিয়ে তিনি থাকেন; অন্য ভাবও এর সঙ্গে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের ভাব ছিল মর্যাদা, মর্যাদাকে তিনি কখন, কোন অবস্থায় লজ্ঘন করতেন না। তাই বলে কি তাঁর মধ্যে ভালবাসা ছিল না? পুরোদমে ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা আছে, অযোধ্যার লোকেরা কাঁদছেন আর বলছেন –শ্রীরামচন্দ্র যুবরাজ, আমাদের জন্য কত ভাবতেন। তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রকে ভালবাসতেন। শ্রীকৃষ্ণ –মর্যাদা লজ্ঘন পদে পদে করতেন, কোন জায়গা নেই যে তিনি মর্যাদা লজ্ঘন করছেন না। তিনি ভগবান, সবটাই তাঁর, করতেই পারেন। কিন্তু ভালবাসায় পরিপূর্ণ। কি রকম ভালবাসা? মা কিভাবে ভালবাসে, বন্ধু কিভাবে ভালবাসে, প্রেমিক কিভাবে ভালবাসে, গরু-বাছুর পরস্পরকে কিভাবে ভালবাসে, ভালবাসা জিনিসটা কি রকম হয়, কি হয়, শ্রীকৃষ্ণ শেখালেন। ঠাকুর ঠিক সেই রকম আমাদের শেখালেন, ভক্ত কেমন হয়। আদর্শ ভক্ত কেমন হবেন, ঠাকুরের মত একটু থাকার চেষ্টা –কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে, নামযশ থেকে দূরে, সব চাইতে যেটা জরুরী –নিজের জন্য চাহিদা যত কমানো যায় আর ঈশ্বরে যত বেশি মন দেওয়া যায়। আমরা সন্ন্যাসীরাও ভক্তই। ঈশ্বরের যে অনন্ত ভাব, সেই ভাবের সাথে ঈশ্বরের কথা নিয়ে ঠাকুরের যে কথাগুলো, সেই কথাগুলোকে নিয়েই আমরা থাকি। যেমন ঠাকুর বলছেন, তাঁকে কি বুঝা যায় গা? না তাঁকে কক্ষণ বোঝা যায় না। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া যায়, বোঝা যায় না।

তাঁকে কি বোঝা যায়। তাই আমার বিড়ালের ছানার ভাব, মা যেখানে রেখে দেয়। আমি কিছু জানি না। ছোট ছেলে মার কত ঐশ্বর্য তা জানে না।

এটাই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। ঈশ্বরের কার্য, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য আর ঈশ্বরের যে সীমা; এদিকে তাকাতে নেই। কারণ আমাদের বুদ্ধি সীমিত, সীমিত বুদ্ধি দিয়ে আমরা ঈশ্বরের শুধু এই জিনিসগুলি কেন, কোন কিছুই ধরতে পারব না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরের চাতালে বসিয়া স্তব করিতেছেন, "ওমা! ওমা! ওঁকার-রূপিণী! মা! এরা কত কি বলে মা –কিছু বুঝিতে পারি না! আসলে কথামৃতের এই কথাগুলি অত্যন্ত জরুরী কথা। আমাদের ভক্তদের জন্য কথামৃত পড়া, কথামৃতের কথাগুলো বোঝা, বোঝার চেষ্টা করা; বোঝার চেষ্টা করা মানে এটাকে চিন্তন করা, আর আমরা তো বিস্তারে ব্যাখ্যা করছি; যত ভাববেন তত মজে যাবেন। যত মজে যাবেন তত ধর্মের জিনিসগুলো পরিষ্কার হতে থাকবে। যত পরিষ্কার হবে, তত জগৎ থেকে আপনি নিস্তার পাবেন। ভক্তরা সবাই এসে আমাদের বলবে, মহারাজ, আমাদের কি কিছু হবে না? কেন হবে না, জগৎ থেকে আসক্তি যদি কমে যায়। কি ভাবে কমবে? ঠাকুরের প্রতি যত মজে যাবেন তত জগৎ থেকে মন উঠে যাবে। বোঝার চেষ্টা করুন, ঠাকুর যিনি অবতার, ঠাকুর যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে

গেছে, তিনি বলছেন –ওমা! ওমা! ওঁকার-রূপিণী! মা! আর ইদানিং কালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা, ইউটিউবের ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন –আমরা কোন বিধি-বিধান মানি না। ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মরা মরে গিয়ে সব এখন বেদান্তী হয়েছে।

এরা কত কি বলে মা –কিছু বুঝিতে পারি না। কথা শুনে হাসিও পায়। লোকেরা কত কি বলছে। এখানে সেখানে লেকচার শুনে আমাদের কাছেও মাঝে মাঝে এই রকম লোক আসে। আমিও বলে দিই, দেখুন, আমি অত শত বই পড়িনি, আমি জানিও না। আমার বই পড়া সীমিত, তবে ভাল কিছু সাধুর সঙ্গ করেছি, সেবা করিনি; তাঁদের কাছে দু-চারটে কথা শিখেছি, বুঝেছি, সেটাই আপনাদের সামনে রাখছি। **কিছু জানি না মা! –শরণাগত! শরণাগত! কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা**! আদর্শ ভক্ত কি রকম হবে, সেটাই ঠাকুর এখানে দেখাচ্ছেন।

আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, মা! শরণাগত! শরণাগত! ঠাকুর কিভাবে মায়ায় মুগ্ধ হবেন, কখন কি সম্ভব! যিনি অবতার, যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, যোগের ভাষায় যাঁর চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেছে, যিনি দগ্ধবীজ হয়ে গেছেন, তিনি কি করে আর ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হবেন! কি সুন্দর ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন, যে ভক্ত হবে সে কিভাবে প্রার্থনা করবে; এই ভাবে প্রার্থনা করবে। আপনি যেখানে ঠাকুরের আসন পেতেছেন, যেখানে বসে আপনি জপধ্যান করেন, সেখানে নিত্য মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা করুন –হে ঠাকুর এই এই দুর্বলতা আমার দূর করে দাও।

ঠাকুরবাড়ির আরতি হইয়া গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহেন্দ্র মেঝেতে বসিয়া আছেন।

মহেন্দ্র নামে এই ভক্ত আগে ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন। ঠাকুরের কাছে আসার পর তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে দিলেন। আসলে এটাই হয়, একবার যখন ঠিক জিনিস পেয়ে যাবেন; মিছরির সরবৎ খাওয়ার পর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। ঠাকুর ওনাকেও সেই একই কথা বলতেন বাকিদের যেটা বলতেন –**ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার; ভক্তের জন্য তিনি রূপ ধারণ করেন**, ইত্যাদি। এই কথাগুলো মাস্টারমশাই সংক্ষেপে বলছেন বলে আর ব্যাখ্যা করছি না। কারণ যেখানে যেখানে এই কথাগুলো এসেছিল আমরা ব্যাখ্যা করেছি। **কিন্তু এটি জানবে যে, তাঁর সবই সম্ভব; সাকার নিরাকার; আরও কত কি তিনি হতে পারেন**। ঠাকুর এটা কক্ষণ বলছেন না যে, তিনি অনন্ত তিনিই আবার সীমিত। এটা বলছেন যে, তিনি আরও কত কি হতে পারেন, কিন্তু অনন্তের ব্যাপারে তিনি কখন অন্য রকম কথা বলছেন না। এবার ঠাকুর মহেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি) –তুমি একটা তো ধরেছ –নিরাকার?

এখানে কয়েকটা কথা বলতে হয়। তখনকার দিনের যে কলকাতা সমাজ, কলকাতা তখন প্রেসিডেন্সি, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন। ইংরেজী শিক্ষা হওয়ার জন্য কি হল, সবার জন্য ভবিষ্যত খুলে গেল। বর্তমান কালেও দেখবেন, আগেও তাই ছিল, ব্রাহ্মণরা সমাজের শীর্ষে, ব্রাহ্মণ মানেই শিক্ষা। বর্ণ ব্যবস্থাটা কোথাও যখন এসে গেল, তখন বলা হল, ঠিক আছে তুমি যদি জন্মগত ব্রাহ্মণ হও, আমরা ধরেই নিচ্ছি তোমার কাছে শিক্ষা আছে। যেমন আজকের দিনে কেউ যদি বলে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি, আমরা চোখ বুজে ধরে নিই, তিনি ভাল শিক্ষা পেয়েছেন। প্রবাদ আছে – কাবুল দেশের ঘোড়া খুব বিখ্যাত, কিন্তু কাবুল দেশে গাধাও হয়। ঠিক তেমনি, প্রেসিডেন্সি থেকে যারা পাশ করেছে সবাই যে তারা বিরাট কিছু, তা নয়। আমাদের একটা ধারণা যারা বিদেশে আছে, তারা বিরাট কিছু। বিদেশেও সব রকম আছে, কারও পয়সা আছে, কারুর পয়সা নেই; কারুর বিদ্যা আছে, কারুর বিদ্যা নেই।

কলকাতার তখনকার লোকেরা ইংরাজী বিদ্যার জন্য অনেক এগিয়ে গেলেন। সেখান থেকে হঠাৎ কিভাবে যেন, যেটা মাদ্রাজে হল না, বম্বেতেও হল না, আর কোথাও হল না, কলকাতাতেই হল, আশ্চর্যের ব্যাপার; কেন হল এটা ইতিহাসের যারা বড় বড় পণ্ডিত তাঁরা বলবেন –একদিকে প্রচণ্ড ধর্ম বিরোধী আর অন্য দিকে প্রচণ্ড ধর্মপ্রাণ লোক। আর সত্যিই দেখুন, ঠাকুর এই কলকাতাতেই এলেন, স্বামীজী এলেন, ভারত সেবাশ্রমের স্বামী প্রণবানন্দজী এলেন, ঋষি অরবিন্দ এলেন, আরও কত সব বড় বড় লোকেরা এলেন, আশ্চর্য। একদিকে এনারা ধর্মে এত জোর দিচ্ছেন, অন্য দিকে ধর্ম বিরোধী বড় বড় লোকেরাও ছিল। আমাকে না হয় আপনি বলবেন ভণ্ড, আপনি কিছুই জানেন না, মানলাম; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে কেন আপনারা উড়িয়ে দিচ্ছেন। এখন যেমন একটা বাই হয়েছে, কথায় কথায় বলবে, আমরা বেদান্তী; ভাল। এই জগতে কেউ নেই যে, বেদান্তী নয়। স্বামীজী একটা বড় উক্তিতে বলছেন, By religion is meant Vedanta, বেদান্তই ধর্ম। যখন কিছু আচার-বিচার এখানে এসে যায়, তখন তাকে হিন্দু ধর্ম বলে। যোগ বেদান্তের একটা অঙ্গ, সেই যোগের একটা অঙ্গ দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে যায়। স্বামীজী খ্রীশ্চান, ইসলাম সব কিছু বেদান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। একটা মেয়ে, খুব শ্যালো, একবার আমাকে খুব বিচিত্র একটা টোনে বলছে, Actually I believe in formless। খুব ভাল, আমার অত বুদ্ধি নেই, আমি কি তোমার সাথে কথা বলব। এই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে নিরাকার? যারা যারা ফর্মলেস ফর্মলেস বলে যাচ্ছে, জানবেন এরা ধর্মকে কিছু বোঝে না। একমাত্র যাঁদের নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে, তাঁরাই নিরাকারের কথা বলতে পারেন।

মহেন্দ্র –আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আপনি যেমন বলেন, সবই সম্ভব; সাকারও সম্ভব। মহেন্দ্রের চরিত্র আমার খুব ভাল লাগে; ঠাকুরের কাছে আসার পর কিভাবে তিনি ধর্মটাকে ধরতে পারছেন; সবাই পারেন। দিনের পর দিন শুনছেন, তাও অনেকে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বেশ; আর জেনো যে, তিনি চৈতন্যরূপে চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

এই লাইনটা আরও দুটো লাইনে আসবে, এই দুটো লাইনে ধর্মের সার ঢেলে দেওয়া হয়েছে। মহেন্দ্র নিরাকার মানেন, কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনে বলছেন, সাকারও মানতে রাজী আছি। ঠাকুর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছেন –জানবে চৈতন্যরূপে তিনি চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। ঈশোপনিষদে ঠিক এই কথাই বলছেন –*ঈশাব্যাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, জগতে যা কিছু আছে, স্থাবর জঙ্গম; সব কিছুতে ঈশ্বর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। এটা যে একটা কোন সিদ্ধান্ত, তা না; ঠাকুর এই জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করে উপনিষদের কথাকে সত্য প্রমাণিত করে দিলেন। ঠাকুর উপনিষদের কথা বলছেন না। এই যে আগে বলা হল, সব চেক এখান থেকে পাশ করিয়ে নিতে হয়। ঠাকুর প্রত্যক্ষ করছেন, চর অচর সেই চৈতন্য। এখন উপনিষদের কথা, গীতার কথা ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়ে গেছে; কারণ ঠাকুরের কথা এখন বুঝি; বুঝি মানে, বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বোঝা যায়। মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলছেন।

মহেন্দ্র –আমি ভাবি, তিনি চেতনেরও চেতয়িতা। মহেন্দ্র বলতে চাইছেন, আমাদের যে মন, এই মনেরও চেতয়িতা তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে হবে, খুব সুন্দর কথা। কিন্তু ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটকে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এখন ওইভাবেই থাক; টেনে-টুনে ভাব বদলে দরকার নাই। ধর্ম জীবনে আমাদের সমস্যা হল, জোর করে এটা সেটা করতে যাওয়া! এখান ওখান থেকে দুটো কথা শুনে নিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। আসলে ভাব বলে তো কিছু নেই। যখন আপনি জোর সাধন ভজন করবেন, জোর সাধন মানে, চব্বিশ ঘন্টা ওই ভাবে থাকা। একদিন আমার কাছে একজন এলেন। যা হয়, ইংরাজী পড়া লোক, কথা বলেই যাচ্ছেন। ওনাকে দেখে আমি বলেই ফেললাম, ‘আপনাকে দেখে আমার কি মনে হয় জানেন, আপনি আপনার গলার আওয়াজ শুনতে খুব ভালবাসেন, তখন থেকে কথা

বলেই যাচ্ছেন। অন্য দিকে থেকে থেকে বলে যাচ্ছেন, আপনার কাছে শুনতে এসেছি। আপনি এসেছেন আমার কাছে শুনতে? আপনিই তো বলে যাচ্ছেন'। ওনাকেও আমি এটাই বললাম, চব্বিশ ঘন্টা একটা জিনিসকে নিয়ে মন যদি না থাকে, কোন কিছুতেই এগোন যায় না। যাঁরা ফিজিক্স চর্চা করেন তাঁরাও এই রকম, ধর্ম যাঁরা করেন তাঁরাও এই রকম। যাঁরা বেদান্ত জানতে চাইছেন, তাঁদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা; ঠাকুরের ভাবে যাঁরা এগোতে চাইছেন, তাঁদের জন্যও চব্বিশ ঘন্টা লেগে থাকার ব্যাপার থাকবে।

তখন ভদ্রলোক বলছেন, 'মহারাজ! তাহলে কি আমি ঘর-সংসার ছেড়ে দেব? সংসারটাও তো সামলাতে হবে'। 'কি বলছেন, ঘর সংসার ছাড়বেন কেন? আমরাও তো সংসার করছি, আমরা এত বড় সঙ্ঘ চালাচ্ছি, এত গুলো সেন্টারস্ চালাচ্ছি। তা সত্ত্বেও আমরা এটা জানি, চব্বিশ ঘন্টা যদি ঠাকুরে মন না থাকে, আমরা এগোতে পারব না। আমরা কেন, কেউই এগোতে পারবেন না, আপনিও পারবেন না। তার চাইতে কাজ একটু কমিয়ে দিন'। 'তাহলে তো ধর্ম ছেড়ে দিতে হবে'। একটা যে স্থির ভাব থাকবে, সেটা নেই, পেণ্ডুলামের মত একবার এদিকে যাচ্ছে, আর-একবার ওদিকে যাচ্ছে। ঠাকুরের কথাটা কি সুন্দর –'টেন-টুনে', টানবেন না, একটা কিছু বুঝুন আপনি; *ঈশাব্যাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, এই একটাকেই নিয়ে থাকুন। তা না, তার পরেও আবার বড় বড় শব্দ নিয়ে আসছেন – তিনি চেতনেরও চেতয়িতা। তার মানে, আপনি মনের খেলাতে নেমে গেছেন, এটা করবেন না। বেশি যদি বুদ্ধি লাগাতে যান, বেশি যদি বোঝার চেষ্টা করতে থাকেন, ধর্ম জীবনে প্রচণ্ড হানি হয়। যাদের মধ্যে সত্যিকারের যদি নিষ্ঠা থাকে, তাঁরা ঠাকুরের এই কথাটাকে ভাল করে মনে রাখবেন –এখন ওইভাবেই থাক; টেনে-টুনে ভাব বদলে দরকার নাই।

কোন সাধুর সঙ্গে যদি আপনার ভাল সম্পর্ক থাকে, এমনিতে চলতে ফিরতে যদি কোন সাধুর সঙ্গে কথা বলতে যান উত্তর দেবেন না; তাঁদের কাছ থেকে কখন ধর্মের কথা শুনবেন না। বোঝার চেষ্টা করবেন, তিনি কি করেন। একটা হাসির কথা বলি, যদিও এর সাথে কোন মিল নেই। কিন্তু এই কথাটা আমার মনের উপর খুব জোর ছাপ ফেলেছিল বলে বলছি। অনেক আগেকার কথা, সেই সত্তর সালের কথা। আমাদের ছিলেন স্বামী গোপেশানন্দজী মহারাজ (সৌরীন মহারাজ), ওনার উপর আমার একটা লেখা আমার ব্লগে রাখা আছে। উনি স্পীকারে রেডিওতে নিউজ চালিয়ে দিতেন। একদিন কোন কারণে কিভাবে নিউজ না হয়ে হিন্দি সিনেমার গান বাজতে শুরু হয়ে গেল। সেখানকার ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ মিশ্র, খুব ভালো মানুষ ছিলেন। রেডিওতে হিন্দি সিনেমার গান বাজতেই উনি বলতে লাগলেন, 'মহারাজ, রেডিও বন্ধ করুন, সিনেমার গান চলছে'। সৌরীন মহারাজ বলছেন, 'আপনার কি গানগুলো জানা'? 'হ্যাঁ জানি, তাই তো বলছি বন্ধ করুন'। সৌরীন মহারাজ বলছেন, 'এই গানগুলো জেনেও যদি আপনার মত মানুষ হয়ে থাকতে পারে, তাহলে ছেলেরাও শুনুক, আমার কোন আপত্তি নেই'। সৌরীন মহারাজ হিন্দি জানতেনই না, আর হিন্দি গান জানবেন, প্রশ্নই নেই। কথাটা কি সাংঘাতিক –এই গানগুলো শুনেও যদি আপনার মত লোক হয়ে থাকে, এই গান শোনায় আপত্তি কিছু নেই।

এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা যাবে, আমরা ওতে যাচ্ছি না। আসল যে কথাটা বলতে চাইছি – যখন আপনি একটা মূল জিনিসকে ধরে নিয়েছেন, বাহ্যিক জিনিসগুলোর তখন অত কিছু দাম থাকে না। ঠাকুরকে ধরে থাকুন, চব্বিশ ঘন্টা ধরে থাকুন। আর যে সাধুকে জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি করে এতটা হলেন। সাধু বলবেন, ঠাকুরের কৃপায়। ঠিক কথা। কিন্তু ঠাকুরের কৃপা আপনার মধ্যে কিভাবে কাজ করল, এটা একটু জানতে চাইছি। সেইজন্য কি হয়, সাধুদের যদি না জানা হয়, কোন সাধুকে যদি আপনি ব্যক্তিগত ভাবে না জানেন, ধর্ম জীবনে এগোন মুশকিল। সেখানে অনেকে বলতে পারেন, কেন, ঠাকুরের জীবন দেখ। ঠাকুরের জীবন বইয়ে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো জীবনটা চোখের সামনে দেখতে চাইছে। কিন্তু যাদের মধ্যে গ্ল্যামার আছে, তাদের দিয়ে হবে না। যার মধ্যে

ঐশ্বর্যের প্রকাশ নেই, কিন্তু তাঁর ছোট ছোট কার্যকলাপ দেখে আপনি জানেন, ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সেখান থেকে শিখতে হয়।

ঠাকুর মহেন্দ্রকে বলে যাচ্ছেন –**ক্রমে জানতে পারবে যে, ওই চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য; তিনি চৈতন্যস্বরূপ**। ক্রমে জানতে পারবে, কিন্তু আপনি টেনে-টুনে বলে যাচ্ছেন, আমি তো মানি ঈশ্বর এক, আমি তো ওটা মানি; এসব বন্ধ করুন। বন্ধ করে যতটুকু ধরেছেন, সেটাকে ধরে থাকুন।

আচ্ছা, তোমার টাকা ঐশ্বর্য এতে টান আছে?

মহেন্দ্র –না, তবে নিশ্চিন্ত হবার জন্য –নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানচিন্তা করবার জন্য।

উত্তরটা খুব সুন্দর। অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। মানুষের যদি অন্নচিন্তা থাকে, বুদ্ধিহারা হয়ে থাকতে হবে, ঈশ্বরচিন্তা অনেক দূরে সরে থাকবে। সেইজন্য নিজের যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তা হবে বইকি। এট খুব জরুরী কথা।

মহেন্দ্র –লোভ, না। মহেন্দ্রের লোভ নেই, কিন্তু যতটুকু দরকার, ততটুকু হলেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, তা বটে, তাহলে তোমার ছেলেদের কে দেখবে?

তোমার যদি অকর্তা জ্ঞান হয়, তাহলে ছেলেদের উপায় কি হবে?

ঠাকুরের বক্তব্য হল, তোমার লোভ নেই, জীবন চালাবার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু হলে তোমার চলে যাবে। কিন্তু সন্তানাদি আছে, তাদের কে দেখবে, তোমার তো হয়ে যাবে? ঠাকুর একদিকে একটু দুশ্চিন্তাও করছেন, অন্য দিকে একটু বাজিয়েও নিচ্ছেন।

মহেন্দ্র –শুনেছি, কর্তব্য থাকতে জ্ঞান হয় না। কর্তব্য মার্তণ্ড। খুব সুন্দর বলছেন, 'শুনেছি'। উনি আমাদের মত ঢং ঢাং করে কিছু বলছেন না, কোন ন্যাকামো করছেন না। এই যে মহেন্দ্র বলছেন, কর্তব্য থাকতে জ্ঞান হয় না; কর্তব্য মার্তণ্ড। মানুষের যতক্ষণ কর্তব্যবোধ আছে, ততক্ষণ ঈশ্বরের দিকে মন যাবে না। ঠাকুর আবার সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এখন ওইভাবে থাক; তারপর যখন আপনি সেই কর্তব্যবোধ যাবে তখন আলাদা কথা। কর্তব্য করতে করতে নিজে থেকেই আপনার কর্তব্যবোধ চলে যাবে।

সাধু জীবনে আমার যখন বয়স কম ছিল, তখন চাঞ্চল্য বেশি ছিল, কাঁচা মন; যেখানে যা কিছু হত ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বভাব ছিল। এক্ষুণি করে দিতে হবে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে –এগুলো রজোগুণ আর তমোগুণের মিশ্রণ। ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করা, ওকে সাহায্য করতে হবে, তাকে দেখাশোনা করতে হবে, এটা যে নিজের মান-সম্মানের জন্য করছে তা না, রজোগুণের জন্য। এখন আর কারুর ভাল করার চেষ্টা করি না, ভাবি, ঠাকুর নিজেই ভাল করছেন না, সেখানে আমি আর কি ভাল করব! ঠাকুর চাইলে তো তিনি করেই দেবেন বা আমাকে একটু দায়ীত্ব দেবেন –করে দিও। আমার কর্তব্য কি হবে? আমার বেলুড় মঠ থেকে যখন আদেশ আসবে, এই কাজটা করে দাও; আমাকে করে দিতে হবে। আমার উপর এখন যেমন কিছু আদেশ আছে কিছু কাজ করার।

আজ আমার বয়স হয়ে গেছে, রজোগুণ স্বাভাবিক ভাবেই কমে গেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে এটা করা, সেটা করা; এই ভাব কমে গেছে। তার সঙ্গে বাস্তবে এই যে কর্তব্যবোধ, কমে গেছে। সমাজ আছে দেখার জন্য, আমাদের সঙ্ঘ আছে দেখার জন্য; সর্বোপরি ঠাকুর আছেন দেখার জন্য। আমি হলাম

চিনির পাহাড়ের সামনে একটা পিঁপড়ে, এক দানা হলেই আমার হয়ে যাবে, এখন একটা নুড়ুন হলেই হয়ে যাবে। এটা যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন, ধর্ম জীবন আপনার খুলে যাবে। আপনারা যাঁরা শুনছেন, পরিষ্কার দুটি ভাগ। একটা থাক, যাঁরা শোনাকেই ধর্ম করে রেখেছেন। অন্য ধর্মকাজ তো হয় না, আগেকার দিনে মুনি-ঋষিরা যে তপস্যা করতেন, সেই তপস্যা হবে না; মন দিয়ে শুনছেন, এটাও একটা তপস্যা। আপনাদের অনেকবার বলেছি, আপনারা নোটস্ নেওয়ার অভ্যাস করবেন। নোটস্ নেওয়ার কথায় মনে পড়ল, গতকাল আমার কাছে একজন ইয়ং ছেলে এসেছিল, অনেক দূর থেকে এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য চার ঘন্টা আমার জন্য বসে থাকল। এমন সময় এসেছে, সেই সময় আমি ঘর থেকে বেরোই না। ওনার এমবিবিএস করা ছিল, এমএস-এ এ্যাডমিশান পেয়েছেন। তিনি আবার রাজ্যে তৃতীয় স্থান পেয়ে মনের মত সাবজেক্ট পেয়ে খুব খুশি। ইয়ং ছেলে, বারবার একটাই কথা বলছেন –আপনার ইউটিউব ক্লাশ আমি নিয়মিত শুনি। আপনার অনেকগুলো কথা লিখে রেখে দেখছি বাস্তবে আমার জীবন অনেক পাল্টে গেছে।

তার মধ্যে একটা কথা, খুব ভাল লেগেছে –জপযজ্ঞ, যেখানে যাবেন জপ করা; ট্রেনে উঠেছেন জপ করুন, বাসে উঠেছেন একটু জপ করুন। এমন কি রিক্সায় উঠেছেন একটু জপ করে দিন, রিক্সাওয়ালার মঙ্গল হবে। ট্রেনে একটু জপ করে দিলে কামরায় যে কজন বসে আছেন, সবার মঙ্গল হবে। যিনি ট্রেন চালাচ্ছেন, তাঁরও কিছু ভাল হবে; এইভাবে সবার ভাল করুন। কারুর বাড়ি গেলেন, চুপচাপ কিছুক্ষণ জপ করুন, কেউ যাতে বুঝতে না পারে। যদি অন্যদের বুঝিয়ে জপ করেন, বুঝতে হবে ঢং করছেন। উনি বলছেন, এটা লিখে রাখার পর, আমি তো এখন বেশির ভাগ সময় জপ করছি। আগে তো আসনে বসে কোন রকমে একশ আটবার জপ করতাম। তার সঙ্গে সেখানে আপনি দশখানা পয়েন্ট বলেছিলেন, মনে করলে আনন্দ হয়। এই ইয়ং ছেলেটির মত আপনারও লিখে রাখবেন, টাঙিয়ে রাখবেন। মন যখন বিষণ্ণ হবে ওদিকে তাকাবেন, মন ভাল হয়ে যাবে। ছেলেটি বলছেন, 'আমি কুড়িখানা পয়েন্ট করে লিখে টাঙিয়ে রেখেছি। ওদিকে তাকালেই আমার অবসাদ কেটে যায়। আমার ভিতরে অন্য ধরণের শক্তি এসে গেছে। আমি যে মাস্টার অফ সার্জারিতে এ্যাডমিশান পেয়েছি, আপনার এই ইউটিউবের ক্লাশ শোনার জন্য; তাই আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি'। আমি বললাম, 'ভাই তোমার ভিতরে ক্ষমতা আছে তাই এ্যাডমিশান পেয়েছ। আমি তো পরীক্ষাও পাশ করতে পারতাম না'। এই যে আপনারা মন দিয়ে শুনছেন, কেউ কেউ লিখছেন। লেখা খুব দরকার, পয়েন্টসগুলো যদি না লেখেন, ধারণা করতে পারবেন না। লেখাতে কি হয়, মন যখন একটা জিনিসকে ধরে নিয়েছে, এরপর গুছিয়ে সেটাকে যখন লিখছেন, এটা এবার আপনার সম্পত্তি হয়ে গেল। আমার এই লেকচারগুলো এখন এগুলো ইউটিউবের সম্পত্তি, যখন কেউ নিজের মত লিখে নিল, সেটা তখন তার সম্পত্তি।

সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনা যে এত সুন্দর, পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

মহেন্দ্র –কতক জ্ঞানের পর সংসার! সে সজ্ঞানে মৃত্যু –ওলাউঠা!

শ্রীরামকৃষ্ণ –রাম! রাম!

মৃত্যু সময় জ্ঞান থাকলে খুব যন্ত্রণাবোধ হয়; যেমন কলেরাতে হয়; এই কথা বুঝি মহেন্দ্র বলছেন। চেতনা থাকলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ হয়। মৃত্যু নিয়ে এখানে কয়েকটি কথা বলা দরকার। স্বাভাবিক মৃত্যু যখন হয়, অর্থাৎ সময় যখন হয়ে গেছে; তখন বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি আগে বন্ধ হয়ে যায়। আত্মা ছেড়ে এবার চললেন, মনের শক্তি কমে আসছে। আমরা যখন এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি যাই, তখন আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বন্ধ করি। বেরোবার আগে ঘরের জানলা, দরজা সব বন্ধ করতে শুরু করি। ঠিক তেমনি মৃত্যুর আগে বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি বন্ধ হতে শুরু হয়ে যায়। এরপর ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলো ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু হয়ে যায়। সে হয়ত শুনতে পাবে, কিন্তু বলতে পারবে না।

এইভাবে আস্তে আস্তে মনটাও শান্ত হয়ে আসে। এরপর থাকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, শেষ কার্য বায়ু, ঠক্ করে বন্ধ হয়ে যায়।

অকাল মৃত্যু, অর্থাৎ আত্মার এখনও যাওয়ার সময় হয়নি, কোন কারণে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল বা কোন মহামারী এসে গেল; এখানে যেমন কলেরার কথা বলছেন। আগেকার দিনে কলেরা হলে গ্রাম কে গ্রাম উজাড় করে লোক মারা যেত। কিছু দিনে আগে করোনা মহামারীতে কত লোক ছটফট করতে করতে মারা গিয়েছিল। কারণ জীব অর্থাৎ জীবাত্মা এখন যেতে চাইছেন না, অঙ্গগুলো এখনও সক্রিয়। যদিও আমি কখন দেখিনি, শুনেছি মুরগীর মুণ্ডুটা কাটা হয়ে গেছে, কিন্তু কোন ভাবে ছিটকে গিয়ে মুরগী ওই অবস্থায় দৌড়াতে থাকে, বলা হয় 'হেডলেস চিকেন'। অকাল মৃত্যুতে জীব দেহ ছেড়ে যেতে চাইছে না, কিন্তু এমন একটা অঙ্গ হানি হয়ে গেছে, ফলে ভিতরে একটা চিৎকার চেঁচামেচি হতে থাকে, অনেক সময় এই মৃত্যু যন্ত্রণা বাইরে থেকে বোঝাও যায়। আসলে মৃত্যু যন্ত্রনা হয় না, ভিতরে ইন্দ্রিয় দেহের অঙ্গের সঙ্গে যোগযোগ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, ফলে একটা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। স্বপ্নেও এই জিনিস আমাদের হবে। স্বপ্নে মনে হবে, আপনার কিছু একটা হারিয়ে গেছে, স্বপ্নের মধ্যেই চিৎকার চেঁচামেচি হতে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুতে এই ছটফটানিটা হয় না। এমন কি, সাধন-ভজন করা থাকলে, অস্বাভাবিক মৃত্যুও যদি হয়, এই রকম ছটফটানি হয় না।

অবিদ্যার সংসার দাবানল তুল্য –তাই বুঝি ঠাকুর "রাম! রাম"! বলিতেছেন।

মহেন্দ্র –অন্যলোক তবু বিকারের রোগী, অজ্ঞান হয়ে যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ থাকে না।

মহেন্দ্র এখানে পরিষ্কার করে বলছেন না। স্বাভাবিক মৃত্যু যখন হয়, তখন সিস্টেমগুলো ডাউন হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –দেখ না, টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন, অত টাকা আছে কিন্তু দুঃখ করে, ছেলেরা তেমন মানে না। কি আর করবে, মানুষ নিজের সত্তাকে টাকা-পয়সা, পরিবার সন্তান আদিতে ছড়িয়ে রেখেছে। টাকা আছে সন্তানরা মানে না। সন্তান আছে আবার টাকা নেই।

মহেন্দ্র –সংসারে কি শুধু দারিদ্রই দুঃখ? এদিকে ছয় রিপু, তারপর রোগ-শোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আবার মন-সম্ভ্রম। লোকমান্য হবার ইচ্ছা। ঠাকুর আবার নিজের কথা জিজ্ঞেস করছেন।

"আচ্ছা, আমার কি ভাব?"

মহেন্দ্র -ঘুম ভাঙলে মানুষের যা, যা -হবার তাই। ঈশ্বরের সঙ্গে সদা যোগ। মহেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের শাস্ত্র জানতেন, আরও অন্য মতের শাস্ত্র হয়ত পড়েছেন। ঠাকুর আবার সেই নামকরা প্রশ্ন রাখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তুমি আমায় স্বপ্নে দেখ?

মহেন্দ্র –হাঁ, অনেকবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কিরূপ? কিছু উপদেশ দিতে দেখ?

মহেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যদি দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ।

আমরা এক্ষুণি এই দুটি কথা বলছিলাম, ঠাকুরের মধ্যে কক্ষণ মানুষ জ্ঞান করবেন না। তিনি ভগবান; সাধক রূপে, ভক্ত রূপে তিনি লীলা করছেন। দেখুন, কি রকম এক অধ্যায়ের মধ্যে সমস্ত কথা এসে যাচ্ছে। আপনারাও কেউ যদি স্বপ্নে দেখেন ঠাকুর আপনার জীবনকে নিয়ে, সাধন জীবন নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন, বুঝবেন এটা স্বয়ং ভগবানই আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ড্রীম সাইকলজি, এটা একটা বিরাট বিষয়। মাণ্ডুক্যকারিকার ক্লাশে স্বপ্ন নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। স্বপ্ন কেন হয়, কি হয়, আমাদের কাছে জানা নেই। বর্তমান কালের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এটা একটা অন্য অবস্থা। যার জন্য, যোগশাস্ত্র মন নিয়ে এত কিছু বলছেন, স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু কিছু বলছেন না। কিন্তু বলছেন, স্বপ্নে যদি কোন জ্ঞান হয়ে থাকে, সেটার উপর ধ্যান করা যেতে পারে। স্বপ্ন একটা পুরো অন্য অবস্থা; আমাদের যে জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্ন এই জাগ্রত অবস্থা থেকে পুরো আলাদা একটা অবস্থা। দেব-দেবীর স্বপ্ন দেখা ভাল। তবে ইদানিং কালে এগুলোকে নিয়ে অনেকে এত লাফালাফি করেন, আমি এই স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্ন দেখেছি; স্বপ্ন দেখেছেন তাতে কি হয়ে গেল। আমি তো ব্রহ্মচারী অবস্থায় কত ঠাকুরের স্বপ্ন দেখেছি, তাতে কি হয়ে গেল। একবার আমি এক মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মহারাজ ঠাকুরের স্বপ্ন দেখেন'? মহারাজ পরিষ্কার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ঠাকুরের স্বপ্ন দেখি, আবার আজেবাজে স্বপ্নও দেখি'। ওই ভাব যদি আপনার থাকে, ঠাকুরের ভাব যদি থাকে, তাহলে স্বপ্ন দেখা, না দেখাতে কিছু আসে যায় না। আমি একবার স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজকে আমার ঠাকুরের প্রচুর স্বপ্ন দেখা নিয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি পরিষ্কার বলে দিলেন, 'এর অর্থ হল তুমি ঠিক পথে আছ, ভাল পথে আছ, এর বাইরে বেশি জোর দিতে নেই'। কিন্তু কেউ কেউ জোর দেন, খুব বেশি কেউ দেন না।

ঠাকুর এখানে যেটা বলতে চাইছেন, যদি দেখ শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ। আমার কিন্তু মনে হয়ে, এই কথা সবার উপরেই খাটে। তিনি আপনাকে কখন ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন, বুঝবেন সচ্চিদানন্দ উপদেশ দিচ্ছেন।

মহেন্দ্র স্বপ্নে যা যা দেখেছিলেন, সব বললেন। ঠাকুরও মনযোগ দিয়ে সব শুনলেন

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি) –এ খুব ভাল! তুমি আর বিচার এনো না, তোমরা শাক্ত।

কোথায় ব্রাহ্ম, সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে এত আলোচনা করে শেষে পরিষ্কার ঠাকুর বলছেন – তোমরা শাক্ত। জন্মজন্মান্তর ধরে আপনার মধ্যে যে ভাব দাঁড়িয়ে আছে, কিভাবে স্বপ্নরূপে ফুটে উঠল। মত পথ, এইবার সাধনা করলে আপনি সেখানেই পৌঁছাবেন যেখানে বেদান্তীরা পৌঁছাবেন। কথামৃতকার এখানেই এই পরিচ্ছেদ শেষ করছেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি দুর্গাপূজা মহোৎসবে

আমরা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি, যেমন যেমন কথামৃতে আসছে। এর আগে ঠাকুর বলছিলেন, জোর করে কিছু করতে নেই; সব ধীরে ধীরে করতে হয়। মুশকিল হল আমরা ধর্ম ভাব ধরে রাখতে পারিনা, ধর্ম ভাবকে যদি ধরে রাখতে পারি তাহলে ঠাকুর নিজেই দেখিয়ে দেবেন কি করতে হবে। আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করেন, কত কি প্রশ্ন; বুঝতে পারি সাধন-ভজনে কোন নিষ্ঠা নেই, কোন পড়াশোনা নেই, পড়ে বা শুনে যে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, সেটার অভাব। সবচেয়ে বড় মুশকিল হল, ধর্ম পথে টিকে থাকার জন্য যে পাত্রতা থাকা দরকার, সেটাই নেই। আমি কি আর করব, উত্তরে লিখে দিই –ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন। যদি আপনার ঠিক ঠিক ধর্ম ভাব হয়। এই ধর্ম ভাব এমন যে, যদি গাছের পূজাও করেন, গরুর পূজাও যদি করুন, নদীর পূজা, পাহাড়ের পূজা, যে পূজাই করুন;

প্রভু ঠিক আপনাকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবেন। মুখের কথা দিয়ে কিছু হয় না, মুখে বলে দিচ্ছেন – আমার ঈশ্বরই সত্য; এসব কথা দিয়ে কিছু হয় না। ঠাকুর তাই এর আগের দিন মহেন্দ্রকে বললেন – জোর কিছু করো না, এখন যে ধর্ম ভাবে আছ, সেটাকে নিয়েই থাক। ঠাকুরের এই কথার উপর সেদিনের ব্যাখ্যা করাটা আমাদের পক্ষে খুব জরুরী ছিল।

যাই হোক, আমরা আজ বুধবার, ১০ই অক্টোবর, ১৮৮৩ সালের বর্ণনাতে আসছি (পৃঃ ২৮৪)। ঠাকুর দুর্গাপূজায় অধর সেনের বাড়ি এসেছেন। তখনকার দিনে যাঁরা সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার ছিলেন, তাঁরা বাড়িতে বড় করে একটা ঠাকুর দালান করতেন। এখনও কলকাতায় অনেক পরিবারে এই রকম দালান দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজীর পৈতৃক বাড়িতেও সেই দালান দেখা যায়। ঠাকুর দালানে ওনারা দুর্গাপূজা করতেন, বা যে পরিবারের যেমন পরম্পরা সেই দেবদেবীর পূজা করতেন। সেই উপলক্ষে আত্মীয়রা আসতেন, পাড়ার লোকেরা, বন্ধুরা এবং অনেক সাধারণ মানুষরাও সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন। ঠাকুরকেও অধর সেন এই বছর দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা সবাই জানি, অধর সেন ঠাকুরকে প্রচুর শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। অধর সেন ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছেন। বাড়িতে দুর্গাপূজা, ঠাকুরকে নিয়ে গেছেন। ঠাকুর ভাবে বিভোর, সুন্দর বর্ণনা; বর্ণনাতে আমাদের বেশি কিছু বলার নেই।

অধর গৃহীভক্ত, আবার অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত (নবমী পূজা)**, ত্রিতাপে তাপিত**। তাপ মানে যে জিনিস গরম করে। মানুষকে তিন প্রকার তাপ তাপিত করে –আধ্যাত্মিক, আধিভৌতীক ও আধিদৈবীক। সমস্ত রকম কষ্টই আমাদের ভিতর তাপ সৃষ্টি করে, তবে সমস্ত তাপ মানুষের মধ্যে তাপ সৃষ্টি করে না। যারা নির্লজ্জ তাদের পিটিয়ে দিলেও এদের ভিতর কোন তাপ সৃষ্টি হয় না, কোন অনুতাপ নেই। আবার যাঁরা খুব উচ্চমানের, তাঁদেরও সহজে তাপ হয় না। কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের সামান্য দুঃখ-কষ্টেও প্রচুর তাপ তৈরী হয়ে যায়।

শরীরের ভিতর থেকে যে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট থেকে যে তাপ হয়, সেটাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক তাপ। সর্দি, কাশি, জ্বর, এগুলো আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্ম মানে শরীর। আধিভৌতিক –আমাদের আশেপাশে যে জীব, জন্তু, মানুষ আছে, এরা যে কষ্ট দেয়। আধিদৈবিক –অদৃশ্য শক্তি থেকে যে কষ্টগুলো আসে; যেমন ভূমিকম্প, বন্যা এসে গেল, খরা হয়ে গেল, জল নেই, বিরাট ঝড়-তুফানে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এই তিনটির মধ্যে আমাদের সমস্ত তাপ বাঁধা। সংসারে সবাই এই তিনটে তাপে তাপিত; কেউ কম, কেউ বেশি। সেটাই মাস্টারমশাই এখানে বলছেন, গৃহীভক্তরা এসেছেন, সবাই ত্রিতাপে তাপিত। এই ত্রিতাপ থেকে রেহাই কি করে হবে? জ্বর যদি খুব বেশি হয়ে যায়, ১০৪ কি ১০৫ ডিগ্রি যদি জ্বর হয়ে যায়, ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার আগে বলবেন, আগে জ্বরটা নামান, মাথায় জলের পট্টি দিন, প্যারাসিটামল দিন, জ্বরটা আগে নামান।

ঠিক তেমনি তিনটে তাপে যারা একেবারে দগ্ধ হয়ে আছে, আগে এই তাপটা একটু কমাতে হবে। এই তাপ কমাবার একটাই ওষুধ, ঈশ্বরে ভক্তি। ঈশ্বরে ভক্তি তো আমাদের সহজে হবে না। ভক্তি হওয়ার আগে আপনাকে মেনে নিতে হবে বা বুঝতে হবে যে আপনার ভিতরে তাপ সৃষ্টি হয়ে আছে। যে মানছে না, তার দরকারও নেই, কিছু বলেও কোন কাজ নেই। কিন্তু যার মনে হচ্ছে আমার ভিতরে কষ্ট আছে, আমি একটু শান্তি পেতে চাই। তখন তাকে মন্দিরে যেতে হয়, মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে বসে থাকতে হয়, বসে ফ্যাঁচফোঁচ করে কাঁদতে শুরু করে দেবেন না। যিনি রসময়, যিনি আনন্দময়, তাঁর কাছে বসে আপনি কাঁদবেন? দুর্গাপূজার সময় আপনারা এটা ভাল বুঝবেন। কলকাতার অলিতে গলিতে দুর্গাপূজা হয়। সারা শহর, মফঃস্বল থেকে লোক বেরিয়ে পড়ে ঠাকুর দেখতে; সারা রাত ঘুরবে। ওখানে ঝালমুরি খাচ্ছে, সেখানে ফুচকা খাচ্ছে। এর জন্যই কি দুর্গাপূজা?

কিন্তু যাঁরা ভক্ত, বিশেষ করে যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠাকুরের ভক্তি লাভ করতে চান, তাঁরা সবাই বেলুড় মঠে দূর্গাপূজা দেখতে আসেন। আরও অন্যান্য জায়গায় যান, কিন্তু বেলুড় মঠে অবশ্যই আসা চাই। লক্ষ্য করলে দেখবেন, বিশেষ করে মহিলাদের দেখেছি, সেই সকালবেলা এসে মঠের দূর্গামণ্ডপে বসে থাকবেন। যেখানে বসবেন সেই এক জায়গায় তিন ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা বসে থাকবেন, সাংঘাতিক ক্ষমতা। দেখলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোথাও ভক্তিভাব আছে। ভক্তিভাব না থাকলে এতক্ষণ বসা যায় না; চেষ্টা করে দেখবেন সবাই পারবেন না। দ্বিতীয় কথা, যদি দেখেন মাঝে সাজে আপনার ভিতরে ত্রিতাপ হচ্ছে, তখন একটু আধটু কোথাও চলে যেতে হয়। দক্ষিণেশ্বর এখন ট্যুরিস্টদের জায়গা হয়ে গেছে। কালীঘাটে বসার অসুবিধা আছে। আমাদের মঠ ও মিশনের যে কেন্দ্রগুলি আছে, সেসব জায়গায় এখনও পবিত্রতার ভাব আছে, আর খুব নিরাপদ। সকালবেলা বেরিয়ে পড়লেন, কি বিকালবেলা বেরিয়ে পড়লেন, সেখানে চলে গেলেন, একটু নিরিবিলি বসে চিন্তন করলেন, জপধ্যান করলেন। ওখানে গিয়ে যে আপনাকে আরতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে, কারুর প্রবচন শুনতে হবে তা না, চুপচাপ নিজের মত বসে থাকলেন, তাতেই হবে। এসব করলে কি হয়, তাপের ভাব কমতে শুরু হয়। তাপের ভাব যখন কমতে শুরু হয়, তখন চিন্তা-ভাবনা খুলতে শুরু হয়।

এখানে মাস্টারমশাই বলছেন, অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত, ত্রিতাপে তাপিত। সেখানে বলরামের পিতাও বসে আছেন। বলরামবাবুর পিতার এত সুন্দর ও মজার চরিত্র, ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুব ভাল লাগে। তিনি একজন গোঁড়া বৈষ্ণব, সব সময় মালা জপছেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের ওই এক সমস্যা, বাকি কাউকে মানবেন না। ওখানে গান হচ্ছে –তার তারিণী! এবার তারো ত্বরিত করিয়ে, ইত্যাদি। ঠাকুরের সম্পূর্ণ মন পুরো মায়ের পাদপদ্মে। মনটা পুরো মায়ের ভাবে ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর **নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'ও বাবুরা, আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও'**।

এটা একটা সাংঘাতিক কথা, কারণ ঠাকুর এখনও কিছু খাননি। মাস্টারমশাই ভাগ্যিস এই কথা লিখেছেন, তা নাহলে বোঝাই যেত না, ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। **অধরের নৈবেদ্য পূজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার আবেশে বলিতেছেন, "আমি খেয়েছি, এখন তোমরা প্রসাদ পাও"?** যাঁরা অনেক ধর্মীয় কথা ও কাহিনী শুনে থাকবেন, তাতে প্রচুর এই ধরণের কাহিনী পাবেন, যেখানে যিনি অবতার পুরুষ, যেটা অর্পণ করা হচ্ছে, সেটাকে তিনি নিজে নিয়ে নিচ্ছেন। তাই না, কোন ভক্ত, যিনি ঈশ্বরের ভাবে পুরো ডুবে রয়েছেন, তাঁরও এই ভাব হয়। নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়েছে মাকে, ঠাকুর মায়ের ভাবে এমন এক হয়ে আছেন, ঠাকুর বলছেন, আমি খেয়েছি। ঠাকুর আর মা এক। এটা খুব অতি উচ্চ অবস্থার কথা, আর বিশ্বাস করা যায় না, এমন উচ্চস্তরের কথা। ভাগ্যিস এই ধরণের ঘটনা অন্যান্য গ্রন্থেও আছে, ভাগবত আদিতেও আছে। ঠাকুর যে সব সময় এই রকম করছেন তা না। কখন সখন করছেন, তাতে বোঝা যায় অবতার আর তিনি এক।

ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি খাব? না, তুমি খাবে? মা কারণানন্দরূপিণী"। কারণানন্দরূপিণী, যিনি সব কিছুর কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখিতেছেন? যিনি মা তিনিই কি সন্তানরূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাই কি ঠাকুর "আমি খেয়েছি" বলছেন?

এটাই ঠিক কথা, মাস্টারমশাই একেবারে সঠিক বর্ণনা করছেন। ঠাকুর ভগবান, ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, ভক্ত কেমন হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এটাই দেখিয়ে যাচ্ছেন। এরপর আরও গান হচ্ছে। সেখানে শ্রীযুক্ত সারদাবাবু বলে একজন এসেছেন, তিনি পুত্রশোকে অভিভূত। ঠাকুর তাঁকে একটার পর একটা গান গেয়ে শোনাচ্ছেন, তাঁর পুত্রশোক কাটাবার জন্য। এই সব কিছুর পর আবার একটা নূতন পরিচ্ছেদ শুরু হয়, মাস্টারমশাই খুব সুন্দর ভাবে পরিচ্ছেদগুলিকে বিভাজন করে দিচ্ছেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয় – বলরামের পিতার সঙ্গে কথা

বলরামবাবুর পিতার উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় জমিদারী আছে, ভদ্রকেও জমিদারী আছে। বলছেন, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি নানা জায়গায় ওনাদের দেবসেবা অতিথিশালা আছে। **তিনি শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর কুঞ্জে তাঁহার সেবা লইয়া থাকিতেন**।

মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –**বলরামের পিতা মহাশয় পুরাতন বৈষ্ণব**। বৈষ্ণব বংশের লোক কিনা। **অনেক বৈষ্ণবভক্তেরা শাক্ত, শৈব ও বেদান্তবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি করেন না; কেহ কেহ তাঁহাদের বিদ্বেষ করেন**। এখনও বৈষ্ণবদের অন্যান্য মতের প্রতি মানসিকতা একই রকম। ভিতরে এদের প্রচুর হিংসা, প্রচুর অসহিষ্ণুতা। মাস্টারমশাই 'বিদ্বেষ করেন' বলছেন, কিন্তু হাল্কা শব্দই ব্যবহার করেছেন। মৌলবাদীরা, যারা কথায় কথায় বোমা মেরে বেড়ায়, এরা প্রায় এদের কাছাকাছি। সরাসরি হিংসা করা যায় না, তাই মানসিকতায় হিংসা, অসহিষ্ণুতা প্রতি পদে পদে এদের প্রকাশ পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ সঙ্কীর্ণ মত ভালবাসেন না। আমরা একটু পরেই এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করব। **তিনি বলেন যে, ব্যাকুলতা থাকিলে সব পথ, সব মত দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়**। মত ও পথ মানে, ঈশ্বরের বিভিন্ন ভাবকে ধরে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় বলতে চাইছেন। **অনেক বৈষ্ণবভক্ত বাহিরে মালা, গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করেন কিন্তু ভগবানলাভের জন্য ব্যাকুলতা নাই**। ভাগ্যিস রামকৃষ্ণ মিশনে ওইসব বাহ্যিক জিনিস নেই। তিলক কাটছে, গ্রন্থ পাঠ করছে, মালা জপ করছে, সব করছে; কিন্তু ভিতরে ঈশ্বরের জন্য ভক্তি নেই, ব্যাকুলতা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –ভাবলাম কেন একঘেয়ে হব। ঠাকুর নিজের কথা বলছেন, এই নয় যে বলছেন, একঘেয়ে হব না, একই রকম কেন হব। **আমিও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-বৈরাগীর ভেক লয়েছিলাম; তিনদিন ওই ভাবে ছিলাম। আবার দক্ষিণেশ্বরে রামমন্ত্র লয়েছিলাম; দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় হীরা; আবার কদিন পরে সব দূর করে দিলাম**। ঠাকুর তিনদিন যদি একটা কোন ভাবে থাকেন, সেটা বিরাট জিনিস।

একজনের একটি গামলা ছিল। লোকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আসত। গামলায় রঙ গোলা আছে। কিন্তু যার যে রঙ দরকার ওই গামলাতে কাপড় ডোবালেই সেই রঙ হয়ে যেত। ম্যাজিক্যাল গামলা, আগেকার দিনে ধোপাদের বড় বড় পাত্র থাকতে, তার মধ্যে বিভিন্ন রঙ দেওয়া থাকত, তাতে কাপড় ডাইং করে দিত। **একজন তাই দেখে অবাক হয়ে রঙওয়ালাকে বলছে, এখন তুমি যে রঙে রঙেছ সেই রঙটি আমায় দাও**।

ঠাকুর কি বলিতেছেন, সকল ধর্মের লোকই তাঁর কাছে আসিবে ও চৈতন্যলাভ করিবে?

ঠাকুর আবার বহুরূপীর গল্প বলছেন। গিরগিটি আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন। পরিস্থিতি অনুসারে গিরগিটি তার শরীরের রঙ পাল্টায়। **একটা গাছের উপর একটি বহুরূপী** (গিরগিটি) **ছিল। একজন লোক দেখে গেল সবুজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখল কালো, তৃতীয় ব্যক্তি হলদে। এইরূপ অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রঙ দেখে গেল। তারা পরস্পরকে বলছে, না জানোয়ারটি সবুজ। কেউ বলছে লাল, কেউ বলছে হলদে আর ঝগড়া করছে। তখন গাছতলায় একটি লোক বসেছিল তার কাছে সকলে গেল। সে বললে, আমি এই গাছতলায় রাতদিন থাকি, আমি জানি এইটি বহুরূপী। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। আবার কখন কখন কোন রঙ থাকে না**।

মাস্টারমশাই বলছেন –**শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর সগুণ, নানারূপ ধরেন? আবার নির্গুণ কোন রঙ নাই, বাক্যমনের অতীত? আর তিনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ সব দিয়াই ঈশ্বরের মাধুর্য রস পান করেন?**

কথামৃতের এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের জন্য খুবই জরুরী। এই জিনিসটাকে যদি একবার বুঝে নিতে পারেন, ধর্মের মর্ম বুঝতে পারবেন। এই বহুরূপী গল্পের সাথে আমি বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছি। অনেক বছর আগে, সালটা আমার এখনও মনে আছে, ১৯৯৮। সেই সময় দেরাদুন কিষেণপুর আশ্রমে কয়েক দিনের জন্য ছিলাম। সেই সময় আমেরিকার একজন প্রফেসার যিনি আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলত্মক ধর্ম পড়ান। তিনি কি একটা বিষয়ে তর্ক করার জন্য মহারাজদের কাছে এসেছেন। ওখানকার বড় মহারাজ ভদ্রলোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তখন আমার বয়স বেশি না। আমাকে ডেকে পাঠালেন। ভদ্রলোক ঠিক এই বহুরূপীর রঙ জিনিসটাকে নিয়ে আক্রমণ করলেন। ওনার কথা শুনে আমার খুব জোর হাসি বেরিয়ে গিয়েছিল; ছেলেমানুষীটা তখনও আমার যায়নি, ছেলেমানুষী থাকলে অনেক ভুল করে ফেলে। আমি বলেই ফেললাম, 'একেই আমেরিকা, তারপর আবার ইউনিভার্সিটি, শুনছি এখন নাকি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এই সব ডিগ্রি দেয়। আমেরিকা জানবে ধর্ম'? এখনও এদের ভোগ শেষ হল না; অর্থাৎ এখনও এদের ভোগে মন ভরেনি। এরা জানবে ধর্ম? তবে ঠিক এই শব্দে না, তাও মোটামুটি ভদ্রলোককে বলেই দিলাম। আমেরিকা থেকে আপনারা বুঝবেন ধর্ম, সেটা আবার ইউনিভার্সিটিতে বসে?

স্বাভাবিক, ভদ্রলোক আমার উপর রেগে গেলেন। যাই হোক, বহুরূপীর কথা প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলছেন, 'এই গল্প দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন? একদিকে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলছেন, অন্য দিকে এই গল্প দিয়ে বলতে চাইছেন যে, তিনিই একমাত্র ধর্মকে বুঝেছেন'। আমি বললাম, 'আদপেই না। ঠাকুর বলতে চাইছেন, যিনি ধর্মকে ঠিক বোঝেন, তিনি এই রকম ভাবেই বলবেন'। বলছেন, 'না, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এ-রকম নেই'। আমি বললাম, 'এই জন্যই নেই, কারণ সেই ধর্মের যাঁরা পালন করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না বলেই নেই। হিন্দুরা বোঝে বলে সমস্ত কিছু এইভাবে আছে'। যাই হোক, অনেক কিছু আলোচনা হল। সেখান থেকে যা হয়, এদের ওই একটা চটি বই বাইবেল, সেটাকে দিয়ে হিন্দু ধর্মকে মাপতে যায়।

এখন নাকি আমাদের মহারাজদেরও কেউ কেউ কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি যেতে চান। হার্ভার্ডে গিয়ে তুমি ধর্ম শিখবে? মানুষ যখন ধর্ম জীবনে যায়, তখন তার সাথে রঙের গামলা, বহুরূপী গল্পের পরিষ্কার সম্পর্ক আছে। আপনি যখন ধর্ম জীবন শুরু করছেন, একদম প্রথমের দিকে, যেখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, ধর্মের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন না। সেখানে প্রথম যে সিদ্ধান্তটা আসে, তা হল –আমি সত্য, জগৎ সত্য। এই দর্শনটা হল যাঁরা পদার্থবাদী, তাঁদের। এখান থেকেই ভোগবাদীদের যাত্রা শুরু হয়, আর এটাই সাধারণ মানুষের ভাব। ম্যাটেরিয়ালিজম্, যার মধ্যে মার্ক্সীস্টরাও আছেন, যাঁরা নিজেদের ডাইলেক্টিক ম্যাটেরিয়ালিজম্ বলে, এনাদের কাছে আমি সত্য, জগৎ সত্য। জগৎ কোথা থেকে এলো, জানা নেই। আমি কোথা থেকে এলাম, জানা নেই। আর জানার কোন দরকারও নেই। কিন্তু এটাই সত্য যে, সেখান থেকে যদি আপনার ধর্ম চেতনা জাগে, যেভাবেই জেগে থাকুক; আপনার কোন দিব্য দর্শন হয়ে থাকুক, স্বপ্নে কোন অনুভূতি হয়ে থাকুক, কিংবা যে সমাজে আপনি বড় হচ্ছেন, সেই সমাজের কোন সাধু, মহাত্মার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়ে গেল; তখন এই দুটি সত্যের মধ্যে আর-একটি সত্য এসে যায়, আর তা হল ঈশ্বর।

তখন এই তিনটি সত্য আসে –আমিও সত্য, জগতও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। এই যে তিনটে সত্যের কথা বলা হল, এটা কোন মুখের কথা না –এটাই ঠিক ঠিক বিশ্বাস। কোন ভাল বৈষ্ণবের সঙ্গে যদি আপনি কথা বলেন, দেখবেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমিও সত্য, জগতও সত্য, আর আমার কৃষ্ণও

সত্য। কোন নিষ্ঠাবান মুসলমানের সঙ্গে যদি কথা বলেন, দেখবেন তাঁরাও এই কথাই বলবেন। একজন ভাল খ্রীশ্চানও এই কথাই বলবেন। একজন সাধারণ মানুষ, আমার আপনার মত লোকেরা প্রথম পয়েন্ট আর দ্বিতীয় পয়েন্টের মধ্যে বাচ খেলে। কোথাও আমরা শুনেছি ঠাকুর সত্য, ঈশ্বর সত্য। শোনার পর আমরা মেনে নিচ্ছি, অনেক সময় আমরা ঈশ্বরকে ভয় পাই। অনেক সময় ভাবি ঈশ্বরকে পূজা দিলে আমি ভাল ফল পাব।

কিন্তু তৃতীয় যেটা বলা হচ্ছে, যেখানে ঠিক ঠিক বিশ্বাস। যেমন, এই বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর ভগবান আমাদের ভাল স্বর্গে নিয়ে যাবেন, ইত্যাদি। এটা মূলতঃ ধর্ম ভাব, তার সাথে হাল্কা একটু আধ্যাত্মিক ভাব। এবার কিন্তু আপনার ধর্ম জীবনের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। যখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়ে যাবে ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদের দেখছেন; এবার আপনার ধর্মের গাড়ি চলতে শুরু করল। চলতে চলতে যদি আপনি আরও গভীরে ঢুকে যান, তখন তিন নম্বর সত্য আপনার সামনে আসবে। কি সেই সত্য? আমার ভিতরে যে চৈতন্য আছে, সেটাই আমার আসল আমি। অন্যান্য ধর্মেও এই সত্য হয়। যাঁরা জপধ্যান করেন, খ্রীশ্চানিটিতে অনেক ডেজার্ড ফাদারস্ ছিলেন, ইসলামে অনেক সাধক দেখেন যে –আমার ভিতর এক চৈতন্য সত্তা আছেন, বাস্তবে আমি সেটাই। তখন আমি বলতে যে দেহটা ছিল, সেটা খসে পড়ে যায়। দেহের তখন আর গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব হল, আমার ভিতরে যিনি জীবাত্মা আছেন, খ্রীশ্চানরা যাঁকে সোল্ বলেন, এটাই আমার আসল আমি। জগৎ কিন্তু তখনও আছে –জীব, জগৎ, ঈশ্বর এই তিনটেই আছে। দেহের গুরুত্বটা খসে গেল। এতক্ষণ ছিল, আমি, জগৎ আর ঈশ্বর। এবার এসে গেল জীব, জগৎ, ঈশ্বর; আমি সেই জীব, আমি সেই আত্মা যেটা মন, বুদ্ধি দিয়ে ঢাকা। এইবার যদি আপনি ঠাকুরকে ধরে রাখেন, আপনার ভাব যদি সত্য হয়, তিনি যদি চান তিনি দেখিয়ে দেবেন, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, তার ভিতরে এই চৈতন্য সত্তা আছেন। আপনার আমার মধ্যে জীব রূপে যে চৈতন্য সত্তা আছেন, এই কলমের ভিতরেও সেই চৈতন্য সত্তা আছেন। ঠাকুর যেমন দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দিরের গর্ভগৃহে দেখেছেন, কোশাকুশি, পূজার নৈবেদ্য, পাত্র সব কিছু চৈতন্যময়। এটা খুব উচ্চ অবস্থা। সমস্ত কিছু সেই চৈতন্য সত্তা আছেন, এই জ্ঞান হল অতি উচ্চ অবস্থা। আপনি যাঁকে ঈশ্বর বলে মনে করছিলেন, আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে বললাম জীব, জগৎ, ঈশ্বর বা দ্বিতীয় পয়েন্টেও জীব, জগৎ, ঈশ্বর; এতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর ছিলেন, আপনার যিনি ইষ্ট। যেমন বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণই ঈশ্বর, আবার তাঁদের ইষ্ট।

কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় যিনি চলে আসবেন, তখন তাঁর ভাব পাল্টে যাবে। তখন তিনি ঈশ্বরকে অনন্ত রূপে জানবেন। তখন তিনি জানবেন, অন্যান্য ধর্মের যে ঈশ্বর, সেটাও তাঁর জন্য সত্য। পঞ্চম ধাপ, যেটা প্রায় অসম্ভব –অদ্বৈত জ্ঞান; এই জ্ঞান যাঁর হবে তিনি দেখবেন, চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। এই যে কলম দেখছি, এটাও চৈতন্যের একটা ঢেউ।

পাঁচটি পয়েন্ট – প্রথম হল, আমি সত্য জগৎ সত্য। দ্বিতীয়, আমি দেহরূপে সত্য, জগৎ সত্য, ঈশ্বর সত্য। তৃতীয়, জীব সত্য, জগৎ সত্য, ঈশ্বর সত্য। চতুর্থ, জীব সত্য, জগৎ সত্য কিন্তু জগৎ রূপে না, সমস্ত কিছুর পিছনে যে চৈতন্য, চৈতন্যরূপে সত্য। পঞ্চম, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। এই পাঁচটার মধ্যে তাহলে সত্য কোনটা? পাঁচটি অবস্থাই সত্য, কোনটাই ভুল না। যখন আমি যে ভাবে আছি, এটাকে যদি আমরা ধাপ রূপে দেখি, প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ; আবার এর সব কটার মধ্যে আমরা আনাগোনা করতে পারি। যখন যে ভাবে আছি, তখন সেটাই সত্য। কিন্তু শেষ ধাপে যদি পৌঁছে থাকেন, অদ্বৈত জ্ঞান যদি আপনার বাস্তবে হয়ে থাকে, বা শাস্ত্র শ্রবণ করে, চিন্তা-ভাবনা করে যদি একটা গভীর অনুভূতি হয়ে থাকে; তাহলে কিন্তু পরিষ্কার আপনি বুঝতে পারবেন, কেন একজন প্রথম ধাপে আছেন, কেউ কেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ ধাপে আছেন। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে –কেন অদ্বৈতের সাথে কোন বিবাদ নেই। এটাই ঠিক ঠিক বেদান্ত।

তাহলে আচার্য শঙ্কর কি বলতে চাইছেন? আচার্য খুব দারুন কথা বলছেন –সৃষ্টি হয়েছে, আচার্যও বলছেন সৃষ্টি হয়েছে; স্বর্গ আছে, আচার্যও বলছেন স্বর্গ আছে; নরক আছে, নরক আছে; জীব আছে, জীব আছে; জীবের দুঃখকষ্ট আছে, জীবের দুঃখকষ্ট আছে আর যখন বলা হচ্ছে জগৎ বলে কিছু নেই, আচার্য তখনও বলছেন, জগৎ বলে কিছু নেই। তাহলে জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনার কি ভাব সেইটা বলুন। আচার্য শঙ্করের ভাব তাহলে কি? এই যে পাঁচটি সত্য বলা হল, পাঁচটাই সত্য। কিন্তু ভাই, পঞ্চমে না গিয়ে যদি তুমি বাকি পাঁচটিতে থাক, আজ হোক, আগামীকাল হোক, দুঃখ তোমাকে মারবে। যতক্ষণ না তুমি দেখছ যে, সব কিছু তুমিই হয়েছ, ততক্ষণ তোমার দুঃখকষ্ট আসতেই থাকবে। আমরা ত্রিতাপ দিয়ে শুরু করেছিলাম। প্রথম ধাপে যদি থাকেন, তাহলে তো আপনার দুঃখকষ্টের শেষ থাকবে না, লেগেই থাকবে। দ্বিতীয় ধাপে যদি থাকেন, তখন কেবলই মনে হবে, হে ঠাকুর আমাকেই কেন এত দুঃখকষ্ট দিলে, হে ঠাকুর তুমি শুধু আমারই পরীক্ষা নিচ্ছ কেন, হে ঠাকুর আমাকে যদি কষ্ট দাও, কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাটুকু দিও। এই ধরণের নানা রকমের ডায়লগ চলতেই থাকবে।

এই রকম হতে হতে একটা সময় এই ডায়লগবাজী কমতে শুরু হল, ঢং ঢাং কমতে শুরু হল, চোখের জল ফেলা কমতে শুরু হল। চতুর্থ ধাপ অতি উচ্চমানের, এটা প্রায় শেষ অবস্থা। পঞ্চম ধাপে এবার উপর থেকে নিচে বাচ খেলতে শুরু হবে; কখন চারে যাবেন, কখন তিনে যাবেন। সাধারণ লোকেদের সঙ্গে ফচকিমি করবেন, ঠাট্টা তামাসা করবেন। ঠাকুর বলছেন, একটু ভোগ করতে কোন দোষ নেই। কাদের বলছেন? যাদের দেখছেন, যাদের কাছে আমি সত্য জগৎ সত্য; কিন্তু এর মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, এগোতে পারবে, তখন তাকে একটু ভোগ দিয়ে ওখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসছেন। ঠাকুর ভগবান, অবতার; এনারা ঠিক চিনতে পারেন কে আমার লোক। কায়দা করে তিনি ঠিক তাকে বার করে আনবেন।

এই যে ধর্মের পঞ্চ সত্য, বিশ্বে যত ধরণের ধর্ম আছে, যত ধর্ম দর্শন আছে, যত ধর্ম বিজ্ঞান আছে; সমস্ত ধর্ম এই পাঁচটির মধ্যে বাঁধা, এই পাঁচটির মধ্যে খেলা করছে, এর বাইরে কিছু নেই। কিছু মন্দ বুদ্ধির আচার্য আছেন, যাঁরা বলেন, আমি সত্য, জগৎ সত্য, ঈশ্বর সত্য; এটাই শেষ কথা। তাঁদের কাছে জগৎটাও সত্য, আমিও সত্য, ভোগও সত্য, ঈশ্বরও সত্য, ঈশ্বর হলেন কামধেনুর মত, যতটা ভোগ আদায় করে নেওয়া যায়, মৃত্যুর পরেও যাতে তাঁর কাছ থেকে স্বর্গ আদায় করে নেওয়া যায়। এরাই হল ভয়ঙ্কর গোঁড়া। রামানুজাদি এনারা তিন নম্বর আর চার নম্বরে বাচ খেলা করেন। বৃক্ষ আর তার পাতা; কেউ বলবে বৃক্ষ আর তার পাতা আলাদা, কেউ বলবে এক; এটাই দ্বৈতবাদ আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। পাঁচ নম্বর সত্যকে এরা মানবে না। কিন্তু যিনি পাঁচ নম্বরে পৌঁছে গেছেন? ঠাকুরের কথা অনুযায়ী একুশ দিন সমাধিতে থাকলে দেহ আর থাকে না। ফলে কি হয়, ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী জগতে মেলা ভার। যাঁরা প্রথম পয়েন্টকে সত্য বলছেন, এনারা হলেন ভয়ঙ্কর ভোগবাদী। পঞ্চম ধাপে যারা নিজের জোরে বলে বেড়াচ্ছে আমরা অদ্বৈত, এরা হল প্রতারক। ঠাকুর এদের নিয়েই বলে গেছেন, ইতাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা। এরা অদ্বৈতের নিচে কথা বলবে না।

যাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ তাঁরা দুই, তিন আর চার, এর মধ্যে খেলা করবেন। ঠাকুরের খুব কৃপা হলে, আর শাস্ত্রাদি যদি প্রচুর পড়ে থাকেন, মন যদি ঈশ্বরীয় ভাবে ডুবে থাকে, তখন মনে হয় আমি পাঁচ নম্বরকে উপলব্ধি করব। পাঁচ নম্বর যদি উপলব্ধি নাও করা হয়, অন্তত আপনি যদি প্রচুর বিচার করে থাকেন, এত বিচার করেছেন যে আপনার জীবনটাই সেই রকম, যেখানে সত্যিকারের আমি-তুমির বোধ থাকবে না। দক্ষিণেশ্বরে এক বেদান্তীর কথাতে ঠাকুর রেগেমেগে বলছেন, তোমার এই বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। বেশির ভাগ বেদান্তীই হল ইত্যাদি করার। চার নম্বর ধাপেও যদি আপনি পৌঁছে যান, যেখানে দেখছেন সব কিছুতে সেই চৈতন্যই রয়েছেন, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং*, বিরাট উচ্চ অবস্থা। অন্তত তিন নম্বর ধাপও যদি হয়ে যায়, আপনি এক উচ্চকোটির মহাত্মা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের বেশির ভাগই এক নম্বর আর দুই নম্বরের মাঝখানে খেলা করে। মুখে আমরা ঈশ্বর বলি, কিন্তু ভিতরে

কোন ভাব নেই। আমাদের কাছে দেহ সত্য, জগৎ সত্য আর মুখের কথায় ঈশ্বর সত্য। ঠাকুর ঠিক এই জিনিসটাকে আক্রমণ করছেন।

মাস্টারমশাই যেটা বললেন, ভেক ধারণ করছে, তিলক কাটছে, মালা জপ করছে, কিন্তু সেই ব্যাকুলতা নেই। আমি এক জায়গায় লেকচার দিচ্ছিলাম, প্রথমের দিকে একজন খুব কড়া করে লিখলেন, 'এই ভদ্রলোক গীতার উপর বলছেন, এর মালা কোথায়, তিলক কোথায়'? ওদের ধারণা হল, মালা না পরলে আর তিলক না কাটলে নাকি গীতা পাঠ করা যায় না। ঠাকুর যে এই কথা বারবার বলছেন, এই কথাটিই আবার ঘুরেঘুরে আসবে –এত জপ করছে, এত শাস্ত্র পড়ছে, কিন্তু তাও তো কিছু হচ্ছে না কেন? তার কারণ এরা প্রথমটাতে আটকে আছে। এদের কাছে দেহ সত্য, জগৎ সত্য, ঈশ্বর মুখের কথা। কিন্তু ঘুরে আবার সেই একটি কথা আসছে; তাহলে সত্য কি? পাঁচটাই সত্য। কারণ যিনি পঞ্চম ধাপে পৌঁছে গেছেন, তিনি দেখছেন চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন। দেহ তিনিই হয়েছেন, জগৎ তিনিই হয়েছেন; সেইজন্য *ততো ন বিজুগুপ্সতে,* তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না, কোন কিছু গোপন করেন না। যাঁরা ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী, তাঁরা কখন কাউকে নিচু চোখে দেখেন না। আর সবচেয়ে বড় হল, কাউকে বুদ্ধি দিতে যান না –*ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসংঙ্গিনাম্,* গীতাতে ভগবান বলছেন, যারা এক নম্বর কি দু নম্বর ধাপে আছে, জোর করে এদের বুদ্ধি বিচলিত করতে যেও না। বুদ্ধি বিচলিত করো না মানে, ওদের কাছে ওটাই সত্য।

যে মনে করছে, আমি সত্য, জগৎ সত্য; আপনি তাকে জোর করে বলছেন জগৎ মিথ্যা, সে কিছুই বুঝবে না, তার উপর আবার ভারতবর্ষে বেশির ভাগ লোক ধর্ম শিখতে আসে শেষ বয়সে। ঠাকুর বলছেন, টিয়া পাখি এমনি সময় রাধাকৃষ্ণ বলে, আর বিড়ালে ধরলে ক্যাঁ ক্যাঁ করে। আপনাকে বুড়ো বয়স ধরে নিয়েছে, এখন শুধু ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দই বেরোবে। এনাদের জন্য হল সকাল সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে খুব করে হরিবোল হরিবোল করা। কিন্তু শুনতে আসে বেদান্ত। বেদান্ত শিখতে হলে কম বয়স থাকতে নামতে হয়। বিজ্ঞান বৃদ্ধ বয়সে শেখা যায় না। যদি তাও শিখতে চান, তাহলে আগে জিনিসটাকে বোঝাতে হয়। আর ঈশ্বর, যিনি চৈতন্য, সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি ঠিক না হয়ে থাকে, আপনি শেষ অবস্থায় তাহলে কি করে যাবেন! আমার পরিচিত কয়েকজন আছেন, যাঁদের কথা শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ভগবানে একটুও বিশ্বাস নেই, চৈতন্যে একটুও বিশ্বাস নেই; কিন্তু এনাদের কেউ অদ্বৈতের নিচে কথাই বলবেন না। অথচ সবাই ঘোর বেদান্তী। কেন? কারণ, ঈশ্বরকে যদি মেনে নেয়, ভগবানকে যদি মেনে নেয়, তাহলে তাদের মন্দিরে যেতে হবে। মন্দিরে গেলে, যদি বাঙালী হয় তাহলে সে হয়ে যাবে গেঁয়ো। কয়েকদিন আগে আমি এই কথাটা শিখেছি, মন্দিরে গেলে নাকি গেঁয়ো হয়ে যায়। গেঁয়োরা নাকি মন্দিরে যায়, বা যারা গেঁয়ো তারাই মন্দিরে যায়। তাহলে ঠাকুরের কাছে আসছে কি করে? কারণ আমাদের কলকাতা সমাজে রামকৃষ্ণ মিশন এখন একটা স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে গেছে।

এভাবে হয় না। কালীঘাটে মন্দিরে যান, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যান, গড়াগড়ি দিন, লুটোপুটি খান। যে তীর্থের যে রীতি সেটা করুন। দেওঘর বা তারকেশ্বরে গেলে দু হাত তুলে হর হর ব্যোম ব্যোম করুন। আমি তখন দেওঘরে ব্রহ্মচারী রূপে আছি। সেই সময় এক শ্রাবণ মাসে আমাদের পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এলেন। দেওঘরে শ্রাবণ মাসে প্রচণ্ড ভিড় হয়। মহারাজ যশিডি স্টেশনে যে ট্রেন থেকে নেমেছেন, সেই ট্রেনের ছাদ পর্যন্ত সব তীর্থযাত্রীদের ভিড়, সবাই বাবার মাথায় জল ঢালতে আসছেন। তীর্থযাত্রীরা সবাই হর হর ব্যোম ব্যোম করছেন, অবাক হয়ে আমি দেখছি মহারাজও আনন্দে মশগুল হয়ে হর হর ব্যোম ব্যোম করছেন। আমার বয়স তখন কম ছিল, দেখে চমকে উঠেছিলাম, তিনি তখন আমাদের মঠ মিশনের এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি। এই ভাব না থাকলে সরাসরি অদ্বৈতে নামা কখনই সম্ভব না। যতক্ষণ এই ভাব ভক্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ বেদান্তে পৌঁছান যাবে না।

ঠাকুর রঙের গামলা কেন? কারণ তিনি এই পাঁচটাকে জানেন, আর জানেন পাঁচটাই সত্য। জুহুরী যখন দামী হীরার উপর কাজ করে, ভাল করে কাটিং করে তখন হীরার কোণাগুলো পরিষ্কার ফুটে ওঠে। সত্যের এই পাঁচটি কোণা বা পাঁচ মুখ, পঞ্চমুখ। সত্য যেটা, যেটাকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়, তাঁর পাঁচ মুখ। আমি সত্য, জগৎ সত্য আবার আমি সত্য, জগৎ সত্য, ঈশ্বর সত্য আবার জীব সত্য, জগৎ সত্য, ঈশ্বর সত্য; চতুর্থ, সব কিছুতে সেই চৈতন্যই আছেন, যেটা আমার ভিতর আছে। আর শেষ পঞ্চম, চৈতন্যই সব কিছু হয়েছেন। যদি মনে করেন, ধাপে ধাপে সেখানে পৌঁছে গেলাম, তা না, পাঁচটাকেই আপনাকে নিতে হবে, পাঁচটিই সত্য। যার জন্য ঠাকুরকে দেখবেন যখন তিনি মা কালীর ভাবে আছেন, তখন মা কালীর ভাবেই আছেন; যখন মা দুর্গার ভাবে আছেন, তখন মা দুর্গার ভাবেই আছেন; আবার যখন অদ্বৈত ভাবে আছেন তখন অদ্বৈত ভাবেই আছেন। কখন এই ভাবে, কখন সেই ভাবে; কারণ সবটাই সত্য।

যদি এই পাঁচটা পয়েন্ট মনে রাখতে পারেন, ধর্ম জীবন বুঝতে কক্ষণ আপনার কোন অসুবিধা হবে না। মাস্টারমশাই এই কথাই বলছেন –শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর সগুণ, নানারূপ ধরেন? না, কারণ ঠাকুর জানেন, ঈশ্বর বই আর কিছু নাই। তিনিই সব কিছু হয়েছেন বলেই সব কিছুর ভিতর সেই চৈতন্য সত্তা আছে। কিন্তু এই চৈতন্য সত্তা যখন মন, বুদ্ধি রূপে এসে যায়, তখন মানুষ আর চৈতন্য সত্তা রূপে দেখে না, দেখে সেই চৈতন্যকে যেটা মন বুদ্ধি দিয়ে ঢাকা। সেখান থেকে ভুলেই যায় যে চৈতন্য বলে কিছু আছে, তখন মন, বুদ্ধিটাই সত্য হয়ে যায়। এটাই ধর্ম, এছাড়া আর কিছু না, অতি সহজ জিনিস। কেন যে মানুষ ধর্মকে এত জটিল বিষয় করে ফেলে, কেউ বিজ্ঞানবাদ নিয়ে আসছেন, কেউ এই বাদ নিয়ে আসছেন, কেউ সেই বাদ নিয়ে আসছেন। ঠাকুরও তাই বলছেন, মা আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কলিযুগে এই রকমই হবে।

আমাদের ছিলেন স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ, খুব পণ্ডিত ও উচ্চমানের একজন সাধু, আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি একটা নূতন বাদ বার করলেন –শাক্ত বেদান্ত। একজন বিজ্ঞান বেদান্ত, একজন শাক্ত বেদান্ত, এরপর আর-একজন নিয়ে আসবেন বৈষ্ণব বেদান্ত। সহজ বিষয়টাকে যতটা জটিল করা যেতে পারে। খুব সহজ ব্যাপার, সত্যের পাঁচটি রূপ, এর পরে আর এর আগে আর কিছু নেই। কেউ বলে এটাই সত্য, কেউ বলে এই দুটি সত্য; কিন্তু ঠাকুর বলছেন –সবটাই সত্য, যে যখন যেখানে আছে তখন সেটাই সত্য। আচার্য শঙ্করও এটাই বলছেন, ব্যাসদেব এটাই বলছেন, উপনিষদ এটাই বলছেন আর পুরো হিন্দু ধর্ম এটাই বলে।

কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। এই যে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন কর, এই পুরো জিনিসটাকে যতক্ষণ আপনি ধারণা না করতে পারছেন, ততক্ষণ আপনি ধর্ম জগতে টিকে থাকতে পারবেন না। আপনি মুখে যতই এই বাদ, সেই বাদ বলে যান; যতক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ইচ্ছে না হয় 'হর হর ব্যোম ব্যোম' করে উঠি, যতক্ষণ পর্যন্ত হাততালি দিয়ে হরিনাম করে আপনার আনন্দে ভাসতে ইচ্ছে না হয়, ততক্ষণ আপনি কিসের বেদান্তী, কিসের আপনি এই বাদ, সেই বাদ নিয়ে লাফালাফি করছেন। যিনি বেদান্তী তিনি আনন্দের শেষ অবস্থার সাক্ষী হন। আকাশের মেঘ দেখে মানুষ কবিতা লিখবে, 'ওহে মেঘ তুমি চলে যাচ্ছ, দু ফোঁটা জল দিয়ে যাও'। অথচ আমাদের বেদে পর্জন্য সূক্তম্ দেখুন, বেদের ঋষি মেঘকে কিভাবে দেখছেন। সেখানেও ঋষি ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখছেন।

নীল আকাশের বুকে মেঘের টুকরোকে ভেসে যেতে দেখে আপনি যদি ওটাকে মেঘ রূপেই দেখেন, তাহলে আপনি সত্যের প্রথম পয়েন্টে আছেন –আমি সত্য, জগৎ সত্য। এতে দোষের কিছু নেই, শুধু এইটুকু –আপনি যদি প্রথম পয়েন্টে থাকেন, তাহলে আপনার আর পশুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। লিবারাল, পদার্থবাদী, বিজ্ঞানী সবাই ওই দলেরই। আমি সত্য, জগৎ সত্য; একটা ছাগলও তাই

জানে, একটা গরুও তাই জানে। ভাল করে ঘাস খেয়ে নিলাম, আহার হলেই হল আর নিদ্রা তো সময় হলেই হবে। সময় এলে মৈথুনও হবে, এখানেই সব শেষ। মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, ভাব আছে; তাই আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়ে একটা দুটো কবিতা লিখে দিতে পারে, ওগুলো নিয়ে একটা গান গেয়ে দিতে পারে, একটু না হয় বাঁশি বাজিয়ে দিল। কিন্তু আপনি থেকে গেলেন ওই প্রথম পয়েন্টে, যেখানে আমি সত্য, জগৎ সত্য।

দ্বিতীয় পয়েন্টে যখন গেলেন, তখন আপনি হয়ে গেলেন গোঁড়া –আমার ধর্মকে মানবে না? দেব গলা উড়িয়ে। বৈষ্ণবরা অত কঠোর ভাবে বলে না, কিন্তু ওই ভাব।

তিনি রস, ভক্ত রসিক সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে। পরের প্যারাগ্রাফে ঠাকুর খুব সুন্দর কথা বলছেন।

ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌*, জ্ঞানী তো আমার আত্মা। **তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন; তাই রাধাকৃষ্ণলীলা।**

এই যে বলছেন, তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন। কোন দুটি? তিনি আর আপনি। আপনি কে? আপনি তাঁরই রূপ, ভগবানরই রূপ। তিনি রস আস্বাদন করতে চাইছেন। আপনি বলতে পারেন, আমার মধ্যে রস-টস নেই; তাহলে আপনি অন্য জায়গায় যান। কেন বলছেন? কারণ আপনি মানেন, আপনি সত্য আর জগৎ সত্য, আপনার অস্তিত্বকেই আমি মানিনা। আপনি একটু ভেবে দেখবেন তো, আপনি কে? আপনি মানুন আর নাই মানুন, আপনি ঈশ্বরেরই আর-একটা রূপ। ঈশ্বর কেন আপনাকে রচনা করেছেন? যাতে তিনি নিজেকে আস্বাদ করতে পারেন।

তীর্থ, গলায় মালা, আচার –এ-সব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তুলাভ হলে ভগবানদর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে কমে যায়। তখন তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ-মনন।

ঠাকুর বলরাম বোসের বাবাকে চিনতেন না। পিতা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব, বলরামবাবু নিজেও প্রথমের দিকে গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। ঠাকুরের জীবনে অনেককে নিয়ে আমরা অনেক মজার মজার কাহিনী পাই। বলরামবাবুর বাবা ঠাকুরের পাশে বসে জপ করে যাচ্ছেন। ঠাকুর ভক্ত নিয়ে কথা বলছেন। যাঁরা ভক্ত হতে চান, ভিতরে খুব ভক্তিলাভের ইচ্ছা যাঁদের, তাঁদের জন্য এই অংশটা খুব দরকারী। আমরা যখন কথামৃত পাঠ করি, তখন আমরা মেনেই চলি যে ঠাকুর অবতার। অবতারের কথা আর অন্যান্য সন্ত-মহাত্মা, সাধকদের কথার মধ্যে তফাৎ থাকে। অবতারের কথা অতি সহজ সরল, মনে হয় কথাগুলো সবারই জন্য; কিন্তু আসলে সবারই জন্য হয় না। বেদ, উপনিষদ, গীতা, কথামৃত পড়লে মনে হয় এর কথাগুলো সবার জন্য; কিন্তু গীতা, উপনিষদ, কথামৃত পড়লে বোঝা যায় অত সহজ না। আচার্য শঙ্কর গীতা ভাষ্য লিখতে গিয়ে খুব সুন্দর কথা বলছেন –উত্তম শিষ্যকে শিক্ষা দিলে, শিক্ষার প্রচার প্রসার খুব ভাল হয়।

বিভিন্ন জায়গায় আমরা পড়ে জানতে পারছি, ঠাকুর ওকে সেখান থেকে এনেছেন, তাকে ওখান থেকে এনেছেন। কেন? সনাতন ধর্মের প্রচারের জন্য। ঠাকুর তাঁর শিষ্য বা ভক্তদের যে কথাগুলো বলছেন, এগুলো যেন জাল ছড়াচ্ছেন। ঠাকুরের যাঁরা আপনজন, যাঁরা অবতারের কাজে সাহায্য করবেন, তাঁরা যাতে ঠাকুরের কথাগুলোকে ধরতে পারেন ঠাকুর আসলে কি বলতে চাইছেন, তিনি তাঁদের সেইভাবে কথাগুলো বলতেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের জীবনী পড়লে দেখতে পাবেন, সেখানে ঠিক এই জিনিসটাই হয়েছে। ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন, যাঁরা অতি সাধারণ ভক্ত, তাঁদের জন্য একটু

সহজ করে করে বলতে চাইছেন, আসলে এই কথাগুলো ঠিক তাঁদের জন্য নয় কিনা। যদিও কথামৃতে আমরা দেখছি থিয়েটারওয়ালা, মারোয়াড়ি ভক্ত ইত্যাদিরা এসেছেন, তাঁদেরকেও ঠাকুর এই ভাবে ধর্মের কথা বলছেন।

খুব সাধারণ একটা উদাহরণ দিলেই জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বৈষ্ণবদের মতে জীবে দয়া; প্রসঙ্গক্রমে এই কথা একবার ওঠার পর হঠাৎ ঠাকুর থু থু করে বলছেন, জীবে দয়া করার কে তুমি, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। সেখানে এত লোক বসেছিলেন, ঠাকুরের এই কথা কেই বা বুঝতে পারলেন। ওখানে নরেন্দ্রনাথও বসেছিলেন। কথাবার্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নরেন্দ্রনাথ বলছেন –আহা! আজ এক সাংঘাতিক কথা শুনলাম, ঈশ্বর যদি কৃপা করেন একদিন আমি এটা করে দেখাব। এখন এই জীবে দয়া নিয়ে অনেকে তর্ক করতে পারেন; আমরা তর্কে যাচ্ছি না। কথাটি হল এই, ঠাকুর যে কথাটি বলছেন, এই কথাটি স্বামীজী সেখান থেকে ধরলেন; বাকিদের কাছে আহা কি সুন্দর কথা। কথামৃত শুনলে, কথামৃত পড়লে এটাই মনে হয় –আহা কি সুন্দর কথা।

কিন্তু কথামৃতের কথাগুলো আসলে যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক তাঁদের জন্য। তাঁরা আবার ওই কথাকে আর-একটু সহজ করে অন্যদের কাছে বলবেন; অন্যরা আরও সহজ করে শেষে নিচে আমাদের মত যাঁরা আসবেন তাঁদের কাছে এইভাবে আসবে –কিছু করতে হবে না ভাই; হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে করে যাও, এতেই হবে। সেই কোথায় উপনিষদের সত্য, সেখান থেকে নামতে নামতে হরে রাম হরে রামে নেমে এলাম। এটাই হল ধর্মের অধোগতি। ধর্ম তাও থাকবে। এই যে ধর্ম বিশেষের লোকেরা যে মারামারি কাটাকাটি করে বেড়াচ্ছে আর বলছে, আমার ধর্মই সত্য; তারা কি কোন ভুল বলছে? না, কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থে ওই রকম কিছু আছে, ওরা ওই অতটুকুকেই ধরে রেখেছে। আমাদের এখানেও ঠিক একই জিনিস হয়। আত্মাই আছেন, আত্মাই সত্য, অহং ব্রহ্মাস্মি; এখান থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে এই জায়গাতে পৌঁছায়, যেখানে যারা ভক্ত তারা হাততালি দিয়ে বলবে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। আর যাদের মধ্যে একটু রজোগুণ এসেছে, তারা কোন দিন বিশেষে মন্দিরে গিয়ে একটু পূজা দিয়ে এলো। এগুলো ধর্মের অতি প্রারম্ভিক অবস্থা।

ঠাকুর এদের জন্য অবতার হয়ে আসেননি। কোন অবতারই এনাদের জন্য আসেন না। অবতাররা আসেন মানুষ তৈরী করতে। কারণ অবতার যদি অন্তত দশজনকেও তৈরী করে দিতে পারেন; ওই দশজন এবার হাজার হাজার মানুষকে তৈরী করে দেবেন। শেষমেশ পুরো জিনিসটা অবতারের জন্যই সম্ভব হয়, কিন্তু হয় এইভাবে।

এখানে ঠাকুর বলরামের পিতাকে এখন যেটা বলছেন –বই আর পড়ো না, তবে ভক্তিশাস্ত্র পড়ো যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। সেখান থেকে ঠাকুর বলছেন –কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। তিনি রস, ভক্ত রসিক সেই রস পান করেন। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে। তারপরেই আবার বলছেন –ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা। এই প্রসঙ্গটা যে কত গভীর এক ভাব, কল্পনা করা যায় না। আমরা এর আগে একটু হাল্কা আলোচনা করেছি, জিনিসটাকে এবার আমরা বিস্তারে আলোচনা করছি।

প্রথমে আমরা আমাদের যে স্তর, সেই স্তর থেকে আলোচনা করছি। মানুষকে যদি ভক্তির দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করতে যান, তাহলে পরিষ্কার চারটে শ্রেনীতে বিভাজন করা যেতে পারে। প্রথমে থাকবেন, যাঁরা ঈশ্বরে কোন বিশ্বাসই করেন না। বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষই ভগবানকে বিশ্বাস করে না। এর উপরে হলেন, যাঁদের দেশে, সমাজে, পরিবারে একটা সংস্কার আছে। তাঁরা মানেন যে, হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে ঈশ্বর একটা শব্দমাত্র। একটা পাথর নিয়ে তাতে ভাল

করে তেল মাখিয়ে দেওয়া হল, তারপর জলে ফেলে দিলেন। এই পাথর যতটা জল টানবে, আমরা সাধারণ মানুষরা ভক্তি ঠিক ততটাই নেব; একেবারে বাস্তব কথা। কিন্তু যিনি সাধনা করতে থাকেন, জপধ্যান করতে থাকেন, সর্বোপরি ভাল কোন সাধুসঙ্গ যদি হয়, ভাল মহাত্মার সঙ্গ যদি হয়, কিংবা কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়ে কেউ ঈশ্বরের দিকে চলে গেলেন। এটা কিভাবে হয়, কেন হয়, কেউ জানে না।

তুলসীদাসজী খুব সুন্দর বলছেন –বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হই, রামকৃপা বিনু শূলবন সই। সাধুসঙ্গ যতক্ষণ না হয়, বিবেক-বুদ্ধি জাগে না; আর রামজীর কৃপা না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। তুলসীদাসজী কেন এই রকম বলছেন? তিনি নিজে একজন ভক্ত কিনা। তাঁর কাছে রামজীর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতা পর্যন্তও নড়ে না। ঠাকুর যেটা বলছেন, ভগবানের ইচ্ছা; যিনি ভগবান তিনিই রাম, যিনি রাম তিনিই ভগবান। কেন কেউ সৎসঙ্গ করার সুযোগ পায়, কেন কেউ পায় না; বলা খুব মুশকিল। আমি আমার জীবনে দেখেছি, কত লোক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, বেশির ভাগ লোক শতকরা পচানব্বই জন কিছু দিনে থেকে সঙ্গ ছেড়ে চলে যান, কিছু লোক থেকে যান। আমি ভালমন্দের কথা বলছি না, আমি শুধু একটা স্টাণ্ডার্ড বলছি। আপনাদের জীবনেও দেখবেন কিছু লোক আসে, কিছু লোক চলে যায়।

মুর্শিদাবাদ থেকে একজন শ্রোতা আমাকে অনেক মেইল করেন, যোগাযোগ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এসে দেখেন আমি ফাঁকা চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসে কম্প্যুটারে নিজের মত কাজ করছি, সে তো হতবাক। উনি হয়ত ভেবেছিলেন আমার কাছে লোকের হিড়িক লেগে থাকবে, কিন্তু দেখছেন কেউ কোথাও নেই। আমার কাছে এসে লোকেরা করবেটা কি? যা বলার তো ক্লাশে আমি বলেই দিয়েছি। এখন কেন কেউ কারুর সঙ্গে জুড়ে যায়, কেন কেউ সরে যায়, বলা খুব মুশকিল। আমি হাতজোড় করে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি, অন্যথা নেবেন না। আপনারা এতজন এই ক্লাশ শুনছেন, নিশ্চয় আপনারা অনেক সাধু, সন্ন্যাসীদের জানেন; দেখা হলে কজন সাধুদের সঙ্গে ধর্মীয় কথা বলেন? আমার কাছে কেউ এলে বলতে থাকবেন, মহারাজ, আমি অমুক মহারাজকে জানি, আমি অমুক মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছি, অমুক অমুক সেন্টারে বেড়াতে গেছি, অমুক সেন্টারের খাওয়া খুব ভাল, ইত্যাদি। পাঁচ মিনিট পরে বলে দিই, ঠিক আছে এবারে আসুন। আর তা নাহলে বলবে, মহারাজ ঠাকুরের দুটি কথা বলুন। আচ্ছা আমরা কি আপনাদের এন্টারটেইনার?

গীতার কথা –*তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*; ঈশ্বরীয় জ্ঞান যদি পেতে হয়, সাধুদের কাছে এসে তাঁর সঙ্গ করতে হয়, বড় করে তাঁকে প্রণাম করতে হয়, সেবা করতে হয়, তারপর প্রশ্ন করতে হয়। কজন আপনারা এই রকম করেন? আমাদের বেলুড় মঠে নিত্য দিন ভাত আর ঝোল চচ্চড়ি খেতে হয়, কদাচিৎ কখন হয়ত কোন একটা তরকারির আইটেম ভাল খাওয়ার মত হল, সেটাও আবার বেশি না, অল্প একটু হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে গেল। এরপর যখন চালাতে শুরু করবে, তখন বালতির মধ্যে হাতা দিয়ে শুধু আওয়াজ করে যাবে। আমি মজা করে বলতাম, 'আরে ভাই ভিতরে তো কিছু নেই, আপনি শুধু আওয়াজ করতে করতে চলে যাচ্ছেন'? আমাদের বেশির ভাগের অবস্থা এই রকম। ফাঁকা বালতিতে আপনি শুধু হাতা চালিয়ে যাচ্ছেন। আওয়াজ প্রচুর হচ্ছে, কিন্তু হাতাতে কিছুই উঠছে না, ভিতরে কিছু নেই তো, বেরোবে কোত্থেকে। প্রশ্ন করতে গেলে পড়াশোনা থাকা দরকার। পড়াশোনা নেই, সাধন-ভজন নেই, কি প্রশ্ন করবে? এনাদের কাছে ভগবান একটা শব্দ মাত্র।

আমি আমার কথা বলি। রামকৃষ্ণ মিশনে তখন আমার দশ-বারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তখনই আমি অনেক মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলাম, মহারাজরাও খুব স্নেহ করতেন। একদিন একজন সিনিয়র মহারাজকে ওই রকম কিছু উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করাতে মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'ভগবান তোমার কাছে এখন একটি শব্দ মাত্র'। কথাটা খুব অপমানসূচক মনে হল, এর থেকে

অপমানজনক কথা আর কি হতে পারে। তখন রামকৃষ্ণ মিশনে দশ বারো বছর হয়ে গেছে। তারপরেও একজন সিনিয়র মহারাজ বলছেন –ঠাকুর তোমার জন্য একটি শব্দ মাত্র। আজকে যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকাই, এখন আমি জানি যে, মহারাজ ঠিকই বলেছিলেন। এখন থেকে আপনি যদি শাস্ত্র পাঠে, জপধ্যানে লেগে থাকেন; তাঁর কৃপায় কিছু হয়ে যেতে পারে। এটা আমি একটা পথ বললাম, হাজারটা পথ আছে। অথবা একটা এমন কিছু হয়ে গেল, তখন ঈশ্বর সত্য বলে একটা বোধ হয়। ঠাকুর একটু পরেই এই কথা বলবেন। তার আগে আমরা যে জায়গাটা ছেড়ে এসেছি, সেটার আগে একটু ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঈশ্বর যখন সত্য বলে বোধ হন, জীবনটা তখন পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। একটা বিশ্বাস জন্মে যায়। বিশ্বাস জন্মে গেলে কি হয়, ঈশ্বরকে নিয়ে আর কোন আবেগ ও আবেগের উচ্ছাস থাকে না। ঈশ্বর দেখছেন, তিনি আছেনই আছেন; এই ধরণের ছেলেমানুষী আবেগগুলো খসে পড়ে যায়। আর তার সাথে বাহ্য আচরণগুলো কমে যায়।

একটা অতি সাধারণ কথা বলি, আপনারা অনেকেই এটা অনুভব করে থাকবেন। রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করার পর নয় বছর সবাইকে ব্রহ্মচারী রূপে থাকতে হয়। আমিও তখন এই রকম একজন ব্রহ্মচারী। একজন ভক্ত অন্য একজন মহারাজকে একদিন বলছেন, 'মহারাজ আপনাকে এখন প্রণাম করতে পারছি না, আগে মন্দিরে ঠাকুরকে গিয়ে প্রণাম করে আসি'। কথাটা শুনে আমার খুব ভাল লাগল। কি সুন্দর কথা, বেলুড় মঠে ঠাকুরের কাছে এসেছেন, আগে ঠাকুরকে প্রণাম না করে কাউকে প্রণাম করবেন না। একটু বয়স হওয়ার পর, এই ঘটনাটা মনে পড়তেই মনে হল, ভক্তটির কথাগুলো কি বোকা বোকা কথা। সাধুর পায়ে হাত দিলে তো শুধু হাত না, শরীর মন সব শুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রথমটা ছিল আবেগ; আগে আমি ঠাকুরকে প্রণাম করব। দ্বিতীয় অবস্থায় সাধুকে দেখে যখন প্রণাম করছেন, খুঁত-খুতানি থাকলে একটু হাতটা ধুয়ে নেবেন, হয়ে গেল। বেলুড় মঠের মন্দিরের গায়ে তো অনেক ট্যাপ্ আছে, সেখানে হাতটা ধুয়ে নিলেন। এটা হল ভক্তির লক্ষণ, যেখানে সাধুদের প্রতি আপনার বিশ্বাস, ভরসা, শ্রদ্ধা জন্মেছে; ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস এসেছে। আমাদের ঠাকুর কি এমন ঠাকুর যে, তিনি রেগে যাবেন? হ্যাঁরে, তুই আমাকে আগে প্রণাম না করে ওই সাধুকে প্রণাম করলি কেন? আমি তোর প্রণাম নেব না। আমাদের ঠাকুর কি এই রকম? অন্যান্যদের ধর্মে এই রকম ভগবান পাওয়া যাবে –আমাকে ছাড়া অন্য কারুর দিকে যদি তাকিয়েছ, আমি তোমার সর্বনাশ করে দেব, চিরদিনের জন্য নরকে পাঠিয়ে দেব। আমাদের ধর্ম অত কাঁচা না; আপনাদের ভক্তিও যেন অতটা কাঁচা না থাকে। আশা করি এই উদাহরণে বুঝতে পারবেন আবেগ কাকে বলে আর আবেগ বিহীন ভক্তি কেমন হয়।

কেনই বা এটা বলতে যাবে যে, ঠাকুরকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। বেলুড় মঠে এসেছ ভাল, তাই বলে অত বলার কি আছে যে ঠাকুরকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। কে আবেগে ভাসছে আর কে আবেগ বিহীন, আচার আচরণে বোঝা যায়। কিন্তু তৃতীয় যেটা সেটা হল ঋষি, মহাত্মারা, ঈশ্বরকে যিনি সাক্ষাৎকার করে নিয়েছেন। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন –*চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিহোর্জুন*, চার ধরণের মানুষ আমাকে ভজনা করে, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থি ও জ্ঞানী; চারজনই এনারা পূণ্যকর্মা। আমরা সবাই হলাম জিজ্ঞাসু; জানি না ঈশ্বর সত্যিই আছেন কি নেই। যাঁদের বিশ্বাস হয়ে গেছে, তাঁরাই জ্ঞানী। ঠাকুর অবতার, কখন তিনি ভক্তের মত আচরণ করছেন, কখন তিনি জ্ঞানীর মত আচরণ করছেন।

ওই শ্লোকের একটা শ্লোক পরেই ভগবান বলছেন –*জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী আমার আত্মা, কারণ তিনি আত্মার সাক্ষাৎকার করেছেন, আত্মাই কৃষ্ণ। যিনি এই অবস্থায় চলে যান, তাঁর দেহ, সংসার সব উড়ে যায়; অর্থাৎ সবই থাকে কিন্তু তাঁর কাছে এগুলোর আর কোন গুরুত্ব থাকে না। আমাদের উদ্দেশ্য হল এই শেষ অবস্থায় যাওয়া। আপনারা 'ঈশ্বর-ফীশ্বর কিছু নেই' এই অবস্থা থেকে

বেরিয়ে এসেছেন, তা নাহলে কেন কথামৃতের ব্যাখ্যা শুনবেন। 'ভগবান একটা শব্দ মাত্র', হয়ত এই অবস্থায় আছেন, বা সেখান থেকে আর-একটু এগিয়ে বিশ্বাস পর্যন্ত আসা গেছে। আর তারপরই সিদ্ধ। বিশ্বাস হওয়া আর সিদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রচুর খাটতে হবে। খাটতে খাটতে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। কিন্তু চতুর্থ, যেটা আমাদের উদ্দেশ্য; ভগাবানকে আপনি সাকার দেখুন, নিরাকার দেখুন; দেখবেন চৈতন্য রূপে। আর নিজেকে আপনি কি রূপে দেখবেন? চৈতন্য রূপেই দেখবেন।

তেল আর জল মিশিয়া একটা বোতলে রাখা হল। বোতলটাকে খুব করে ঝাঁকুনি দিলেন, তাতে তেল আর জলে মিশে গেল। এবার একটা বড় গামলায় এক গামলা জলে বোতলের পুরো জলটা ঢেলে দিন। তেল তেলের দিকে যাবে, জল জলের দিকে যাবে। সংসার আর আত্মা ঠিক এই রকম ঝাঁকুনি দেওয়া বোতলে তেল আর জল। আর এই ঝাঁকুনি ক্রমাগত চলছে। প্রকৃতি কখন শান্ত থাকতে পারে না, সংসার মানেই যেটা অনবরত চলছে, জগৎ মানেই যেটা সব সময় চলছে। কাকে নিয়ে চলছে? জড় আর চৈতন্যকে নিয়ে চলছে; তেল আর জলে ঝাঁকুনি লাগছে, মিশে এক হয়ে আছে, বোঝার উপায় নেই কোনটা জল আর কোনটা তেল। আবার যখন ঝাঁকুনি থাকে না, তখন তেল তেলের দিকে যেতে থাকে, জল জলের দিকে যেতে থাকে। জীবনে যখন স্থৈর্য এসে যায়, ঈশ্বরকে যখন সত্য বলে বোধ হয়; তার মানে এতক্ষণ যে ঝাঁকুনিটা ছিল, সেটা কমে গেছে। এবার তেল তেলের দিকে চলল, জল জলের দিকে চলল। ঈশ্বরকে যখন সত্য বলে বোধ হতে থাকে, তখন সংসার সংসারের দিকে আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে আর চৈতন্য চৈতন্যের দিকে আসতে থাকে।

সমুদ্র আর জলের এক বিন্দু ফোঁটা। জলের ফোঁটাও ছটফট করছে সমুদ্রের সঙ্গে এক হওয়ার জন্য। সমুদ্রও ছটফট করছে, জলের ফোঁটাকে নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে। বেদের ঋষি এক জায়গায় প্রার্থনা করছেন –হে প্রভু তুমি আমার দিকে এসো। কিভাবে আসতে বলছেন? গাভী যেমন বৎসের দিকে ধাবিত হয়। কি অপূর্ব উপমা, গাভী যেভাবে বাছুরের দিকে ছুটে যায়। বাছুর মাকে পাওয়ার জন্য হাম্বা হাম্বা করছে, সেই আওয়াজ শুনে মা গাভী দৌড়াচ্ছে। ঠাকুর আবার অন্য ভাবে সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, মা সংসারের যত কাজই করুক, শিশুর কান্না শুনলে দৌড়ে চলে আসে। দুজন দুজনকে চাইছে, ভক্ত ঈশ্বরকে চাইছে, ঈশ্বরও ভক্তকে চাইছেন। এটা গেল একটা দিক। কিন্তু তারপরেই ঠাকুর যেটা বলছেন, আরও গভীর।

তিনিই দুই হয়েছেন, তিনি নিজের মাধুর্যের আস্বাদন করার জন্য দুটি হয়েছেন। তাই রাধাকৃষ্ণলীলা। আপনারা যাঁরা অনেকদিন ধরে আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যাগুলো শুনছেন বা অন্যান্য মহারাজদের কথাও যদি শুনে থাকেন এবং আপনাদের চেতনা যদি জাগ্রত হয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবেন, এখানে এই কথা দিয়ে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। সমস্যাটা হয়, যিনি অদ্বৈতী, যাঁর মধ্যে কোন কামনা-বাসনা নেই, আপ্তকাম; তিনি কি করে দুই হলেন? তার মানে ঈশ্বর আর সংসার কি করে তৈরী হল? আমার আপনার কাছে সংসার সত্য, আমাদের বোধ হচ্ছে সংসার আছে। ফলে এটা তিন প্রকার হয়ে যায়। প্রথম –ঈশ্বরও সত্য, সংসারও সত্য। বেশির ভাগ ধর্ম এভাবেই শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয় –সংসার ঈশ্বরেরই একটি রূপ; ভক্তির শেষ কথা। তৃতীয় –সংসার বলে কিছু নেই; বেদান্তের মূল কথা। তিনটে ভাবেরই বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে।

দ্বৈতবাদীরা প্রথমটাকেই মানেন, সংসারও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। যে কোন ধর্মের যিনি ভক্তির শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন, তিনি বলবেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন। যাঁরা জ্ঞানমার্গের, তাঁরা বলবেন, সংসার বলে কিছু নেই, আত্মাই সব কিছু। তুমি যে সংসার দেখছ, এটাই মায়া। কিন্তু আমরা যখনই সংসার শব্দটা বলি, তখন সংসারের দুটো জিনিস এসে যায় –চৈতন্য আর জড়। আপনি জানেন আপনার ভিতরে চৈতন্য আছে, আর এটাও জানেন যে আপনি একজন দেহধারী, আপনার দেহ আছে। দেহ আর আত্মা মিলিয়ে সংসার, এটাকেই বলে চিজ্জড়গ্রন্থি, চিৎ আর জড় দুটো মিলিয়ে চিজ্জড়গ্রন্থি।

আমরা না হয় সংসারটাকে ছেড়েই দিলাম, তাও চৈতন্যের দুটি প্রকার এসে যায়। এক হল যিনি সংসারে আছেন, আর-এক হল যিনি সংসারের বাইরে –এক ভগবান আর তাঁর ভক্ত। কেন এটা হয়? এখানে কি তৃতীয় কোন শক্তি আছে যে কিনা সংসারের সৃষ্টি করে ভগবানকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে? এটা কখনই সম্ভব না। আসলে এর কোন উত্তর নেই।

তাহলে ঠাকুর কেন উত্তর দিচ্ছেন? এইজন্যই উত্তর দিচ্ছেন; আপনার ভিতরে যে ভাব, আপনি সেই ভাব অনুযায়ী জীব আর ঈশ্বরের সম্পর্ক দেখবেন। দ্বৈতবাদীর বলবেন, হ্যাঁ ঠিকই তো, ঈশ্বরই এই সংসারের সৃষ্টি করেছেন। প্রাণ এসে গেল। কেন প্রাণ করেছেন? তাঁর ইচ্ছা তাই করেছেন; আমরা জানিনা। বেদান্তী বলবেন, সৃষ্টিই তো হয় নি, সেখানে ভগবান কি সৃষ্টি করবেন; এরপর কি নিয়ে বেদান্তীকে প্রশ্ন করবেন আর কিসেরই বা প্রশ্ন। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, যাঁরা ঈশ্বরের মাধুর্য রস পান করতে চান; ঘরের দরজা বন্ধ করে ঠাকুরের নাম করতে করতে তাঁরা আনন্দে নৃত্য করবেন। তাহলে কে কাকে চাইছেন? সন্তান মাকে, মা সন্তানকে; গাভী বৎসকে; বৎস গাভীকে। কিন্তু চৈতন্য তো দুই হয় না। সেইজন্য বলছেন, চৈতন্য যেন দুই হয়ে যান, কৃষ্ণই যেন রাধা হয়ে যান। তাতে কি হয়? নিজের ভালবাসাকে নিজে আস্বাদ করার জন্য দুই হয়ে যান।

শ্রোতাগণ আমরা কিন্তু ধর্মের অতি সূক্ষ্ম, অতি গূঢ় জিনিসের আলোচনা করছি। যদি বুঝতে না পারেন; এতে আপনারও দোষ নেই, আমারও দোষ নেই, কালে বুঝতে পারবেন। ভিতরে যদি ভক্তির উদয় হয়, বুঝতে পারবেন। ভক্ত কখন ঈশ্বর থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে না। তার মানে, ঈশ্বর আর সংসার এই যে দুটো আলাদা সত্য, এভাবে দেখবে না। ধর্মের যারা কাঁচা লোক তারাই ঈশ্বর আর সংসারকে আলাদা দেখে। অন্য দিকে প্রত্যগাত্মা রূপে আমিই ঈশ্বর, সেটাও এরা মানবে না। এনারা মাঝখানেরটাকে মানেন –তিনিই এই জগৎ হয়েছেন। কেন এই রকম হয়েছেন? নিজেকে আস্বাদন করার জন্য। নিজের আস্বাদন কিভাবে করবেন? লীলা করে। সেইজন্য এনারা জগৎকে মিথ্যাও বলেন না, সত্যও বলেন না; এনারা বলবেন, লীলা। ভক্তিশাস্ত্রে লীলা শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। লীলা শব্দের অর্থ হল, জগৎ সত্যও না, জগৎ মিথ্যাও না, জগৎ হল লীলা। তিনি নিজে হয়েছেন, কি তিনি সৃষ্টি করেছেন, যাই করে থাকুন; বাস্তবিক অর্থে জগৎ নেই, অন্য দিকে নেই তাও না। হয়ত আপনারা এই তফাৎটা ধরতে পারবেন না। দ্বৈতবাদীরা বলবে, আমিও সত্য, জগতও সত্য। অদ্বৈতবাদীর বলবে, তুমি কলম দেখছ ঠিকই, আসলে এটা নাম আর রূপের খেলা, আত্মাই আছেন। ভক্ত বলবেন, আত্মাই এই কলম হয়েছেন। তার মানে দ্বৈতবাদীদের মত বলবেন, কলমের সত্তা আছে; কিন্তু পারমার্থিক সেই সত্তা নেই, যেভাবে অদ্বৈতবাদীর বলেন।

এবার আপনি কোনটা মানবেন আপনার উপর নির্ভর করবে। মাণ্ডুক্যকারিকাতে খুব সুন্দর বলছেন –গুরু আপনাকে যেমনটি ভাব শিখিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনিও সেই রকমটি হবেন। দ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেক বড় বড় সন্ত হয়েছেন, বিরাট বড় বড় মহাত্মা হয়েছেন, ভক্ত মহাপুরুষ হয়েছেন। আবার অদ্বৈতবাদীদের মধ্যেও অনেক বড় বড় মহাত্মা, মহাপুরুষ হয়েছেন। এই তিনটের মধ্যে কোনটা নেবেন, কোন প্রশ্নই নেই, যে কোন একটাকে নিয়ে, যেটা আপনার ভাল লাগে, সেটাকে নিয়ে আপনি এগিয়ে যান। বাকিটা তিনিই আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। ভক্তের দৃষ্টিতে, বিশেষ করে যাঁরা খুব অতি উচ্চমানের ভক্ত; যেমন আমরা শ্রীমতি রাধার উপমা নিই, শ্রীমতি রাধা কিভাবে কৃষ্ণকে দেখবেন? তুমিই আমি, আমিই তুমি। কিন্তু বিভেদ আছে। তুমি কৃষ্ণ রূপে, আমি রাধা রূপে; তা নাহলে আস্বাদ কি করে হবে।

যাঁরা অদ্বৈতবাদী, বেদান্তী, তাঁরা বলবে, *রসো বৈঃ সঃ*, তিনি নিজেই রসস্বরূপ, এর আস্বাদ করার কি আছে! তিনি যে নিজের স্বরূপে আছেন, সেটাই হল তাঁর আস্বাদ করা, সেখানে আর বিচার-টিচার কিছু লাগে না। এই জিনিসগুলো অতি সূক্ষ্ম, অতি গূঢ়; গুহ্য না, না বোঝার কিছু নেই। একটু

যদি নিজেকে আপনি গভীরে নিয়ে যান, পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। ঠাকুর এখানে যে কথাগুলো বলছেন, অতি উচ্চমানের ভক্তদের জন্য বলছেন। যার জন্য, সাধারণ মানুষেরও মনে হবে কথাগুলো তো কিছুই না, কি সুন্দর কথা। আমি প্রথম কথামৃত পড়ি ক্লাশ ফাইভে। জেনে আপনারা আরও অবাক হবেন, জীবনে প্রথম যে বইটা আমি কিনেছিলাম, সেটা কথামৃত। বালবুদ্ধিতে যা হয় আর কি। এখনও আমার মনে আছে, বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গটা পড়েছিলাম। বিদ্যাসাগর তখন আমার কাছে একজন বিশাল মাপের পণ্ডিত, আর তাঁকে ঠাকুর কেমন উপদেশ দিচ্ছেন। এখনও ভাবলে নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হয়। তখনকার অনুভূতির কথা একটু একটু মনে আছে।

১৯৭০ সাল, পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা। বিদ্যাসাগরের ওই অংশে ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম কখন উচ্ছিষ্ট হননি। পড়ে আমি অবাক হয়েছিলাম, কি বলছেন, ব্রহ্ম কখন এঁটো হননি? কথাটা মাথায় থেকে গেল। তারপর বেশ কয়েক বছর পর রামকৃষ্ণ মিশনে আমি জয়েন করলাম, তখনও কথাটা বুঝতে পারছি না। তারপর সন্ন্যাস হল, তখনও অর্থটা কেমন একটা আবছা আবছা মনে হচ্ছে। এখন গিয়ে বুঝতে পারছি, ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে কি বলতে চাইছেন। ধর্মের কথা বুঝতে গেলে সময় লাগে। বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান যদি না থাকে, গীতার জ্ঞান যদি না থাকে, কথামৃতের জ্ঞান যদি না থাকে, স্বামীজীর বাণী ও রচনার জ্ঞান যদি না থাকে, তাহলে, এই যে পাঁচটি গ্রন্থের নাম বলা হল, এই পাঁচটি গ্রন্থ সম্যক রূপে অধ্যয়ন করা না থাকলে ধর্মের কোন কিছুই বুঝতে পারবেন না। পঞ্চ পাণ্ডবের মত এই পাঁচজনও এক সঙ্গেই থাকেন – বেদ, উপনিষদ, গীতা, কথামৃত ও বাণী ও রচনা। যে কোন একজনকে বুঝতে গেলে বাকি চারজনকেও আপনাকে জানতে হবে। যাঁরা মনে করছেন, আমি তো একটা দিয়েই সব বুঝতে পারছি; ভাল, বুঝুন সেই রকমই। যখন আসলটা জানতে পারবেন তখন নিজের উপর হাসবেন; ভাইরে আমি কি বোকাই না ছিলাম। আমি যখন ক্লাশ ফাইভে কথামৃত পড়তে শুরু করেছিলাম, তখন নিজেকে ভাবিনি যে আমি বোকা। মনে হত আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে বিরাট বুঝে ফেলেছি।

মূল বক্তব্য, তিনি এক, তিনি দুই হয়েছেন। কেন হয়েছেন? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর –তাঁর ইচ্ছা। দ্বিতীয় উত্তর –তিনি কখন দুই হননি। আর তৃতীয় ভক্তিমার্গের উত্তর –নিজের লীলা, নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তিনি দুই হয়েছেন। তৃতীয় উত্তরটা অন্যান্য ধর্মও মানে। নিজের রূপ দেখার জন্য যেমন আয়নার দরকার, যেন ঠিক সেইভাবে তাঁর মনে হয় নিজের মাধুর্যকে একটু আস্বাদন করি। আবার বলি, এটা ভক্ত বিশেষদের মত, এই কথা বলা যাবে না যে, এটাই একমাত্র ঠিক ব্যাখ্যা। বেদান্তীরা অন্য রকম বলবেন, দ্বৈতবাদীরা আর-এক রকম বলবেন। ঠাকুর কেন বললেন? সেটাই এতক্ষণ লম্বা ব্যাখ্যা করা হল।

পরের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমরা আগে বলেছিলাম যে, প্রথম শ্রেনীরা হলেন, যাঁরা ভগবানের কথা মানেই না। তাঁদের কথা বাদ দিন। এরপর থাকল, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনী। এতক্ষণ যে কথা হল, এটা হল চতুর্থ শ্রেনীর অবস্থা থেকে। এবার বলছেন –

তীর্থ, গলায় মালা, আচার –এ-সব প্রথম প্রথম করতে হয়। আগে যে বলা হয়েছিল, বেলুড় মঠে এসে বলছেন, সবার আগে ঠাকুরকে প্রণাম করব। তাহলে কি গেটের কাছে যে মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি কি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন? নাকি, মহারাজ তাঁকে বলবেন, ভাই তুমি যাও ঠাকুরকে প্রণাম করে এসো, তুমি প্রণাম করে আসা পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। সব বোকা বোকা কথা। কিন্তু প্রথমের দিকে এই জিনিসগুলো একটু করতে হয়; প্রথমের দিকে একটু নিষ্ঠা রাখতে হয়।

বস্তুলাভ হলে ভগবানদর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর কমে যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে সবই তো চলে যাবে, কোন আড়ম্বরই আর থাকবে না। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়, ঠাকুর এখানে বলতে চাইছেন, সেখান থেকে যদি কেউ ভক্তির একটু উচ্চ অবস্থাতেও উপরেও চলে যায়, **তখন তাঁর নামটি নিয়ে**

থাকা আর স্মরণ-মনন। এখানে যদিও ঠাকুর ভগবানদর্শন বলছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি এটাই বলতে চাইছেন, এখানে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর যেমন বলছেন, জ্ঞানের পথে যাঁরা পা রেখেছেন, তাঁরাও জ্ঞানী; এই অর্থেই ঠাকুর ভগবানদর্শন বলছেন। কারণ ঠিক ঠিক যদি ভক্তিলাভ হয়ে যায়, তখন আর বসে জপধ্যান এগুলো করতে হয় না। তখন দেখবেন সব সময় আপনি ভিতরে ভিতরে জপ করে যাচ্ছেন, মালা হাতে নিয়ে জপ করা দেখাতে হবে না। কিন্তু বৈষ্ণবরা মানুষের মধ্যে এই ভাবটা ঢোকাবার জন্য কিছু বাহ্যিক আচার করেন, মালাতে জপ করেন। তা নাহলে তো লোকেরা কিছুই করবে না, ঠিক আছে ভাই, তুমিও এই রকম চলতে ফিরতে ভগবান নামজপ করতে থাক।

ষোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলটি টাকা যখন করলে, তখন আর অত কাঁড়ি দেখায় না। এখন তো শুনি এক টাকার কয়েনও অনেকেই নিতে চায় না। আগেকার দিনে আনা, পয়সা হত; ষোল আনা মানে এক টাকা। আমরাও ছোটবেলায় একশ পয়সায় এক টাকা দেখতাম। দশ টাকা যদি হত, তখন একশ গুণিতক দশ সমান এক হাজার পয়সা হত, এক কাঁড়ি পয়সা হয়ে গেল। অথচ টাকায় একটা দশ টাকার নোট। **তাদের বদলে যখন একটি মোহর করলে; তখন কত কম হয়ে গেল। আবার সেটি বদলে যদি একটু হীরা কর, তাহলে লোকে টেরই পাবে না**। ষোল টাকার হীরে কতটুকুই বা হবে।

ঠাকুর বলতে চাইছেন, ভক্ত যখন হাভাতে থাকে, ভিতরে ভক্তি যার এখনও প্রবেশ করেনি; তখন অনেক কিছু মনে হয়। **গলায় মালা আচার প্রভৃতি না থাকলে বৈষ্ণবরা নিন্দা করেন; তাই কি ঠাকুর বলিতেছেন যে, ঈশ্বরদর্শনের পর মালা ভেক এ-সবের আঁট তত থাকে না? বস্তুলাভ হলে বাহিরের কর্ম কমে যায়** –এটা মাস্টারমশাইএর কথা। স্বাভাবিক ভাবেই কর্ম কমে যাবে, বস্তুলাভের পর কেন কর্ম করতে যাবে। অনেক আগে প্রথমের দিকে গীতার উপর আমার অনলাইন ব্যাখ্যা চলছিল, সেই সময় একটি মেয়ে কমেন্ট বক্সে আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল, গলায় তুলসির মালা নেই, কপালে তিলক নেই এদিকে গীতা ব্যাখ্যা করছে। ওদের সম্প্রদায় বিশেষের লোকেরা মাথায় এইসব ঢুকিয়ে দিয়েছে, গীতার আলোচনা করতে হলে এসব বাহ্যিক আচরণ নাকি করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতার প্রতি) –কর্তাভজারা বলে, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, গলায় মালা রাখে; আর আচারী। সাধক –তাদের অত বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল। সিদ্ধ –যার ঠিক বিশ্বাস যে ঈশ্বর আছেন।

ঠাকুর যেখানে ভগবানদর্শন বলেছিলেন, সেখানে আমরা ঠিক এটাই বলেছিলাম, তিনি হলেন সিদ্ধ, ঠিক ঠিক বিশ্বাস এসে গেছে যে, ঈশ্বর আছেন। আপনি বলতে পারেন, আমারও তো বিশ্বাস আছে। খুব ভাল; আপনার মনে এই বিশ্বাস যদি থাকে যে, আমার বিশ্বাস আছে; তখন এই বিশ্বাসের জোরে আপনি অপরকেও বিশ্বাস দিয়ে দিতে পারেন যে, আপনার বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসে তাঁরাও বিশ্বাস করে নেবেন; সেই বিশ্বাস তাঁরা আর-একজনকে বিশ্বাস করিয়ে দেবেন। বিশ্বাস শব্দের আড়ম্বর; এ-ছাড়া আর কিছু না। যাঁর বিশ্বাস হয়ে গেছে, তাঁর সব সময় জপ চলবে; স্নান করতে করতে, খেতে খেতে, ঘুরতে ফিরতে, যা কিছু করবেন সব সময় জপ চলতে থাকবে।

আর শেষ থাক, **সিদ্ধের সিদ্ধ –যেমন চৈতন্যদেব। ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন, আর সর্বদা কথাবার্তা আলাপ**। আগে যেখানে ঠাকুর ভগবানদর্শন হওয়ার কথা বলেছিলেন, আর এখন সিদ্ধের সিদ্ধ যেটা বলছেন, এখানে এই দুটোতে এই তফাৎ। যাঁর ঠিক ঠিক ভগবানদর্শন হয়েছে, তিনি সদা-সর্বদা তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন, কথাবার্তা বলবেন। তার আগে যে সিদ্ধের কথা বলছেন, যার ঠিক বিশ্বাস যে ঈশ্বর আছেন, পুরো বিশ্বাস। **সিদ্ধের সিদ্ধকেই ওরা সাঁই বলে। সাঁইয়ের পর আর নাই**। এটা প্রবর্তকদের মত। প্রবর্তকের মতে না গিয়ে আপনি যদি সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করেন, ভক্তরা কেমন, কি রকম; পরিষ্কার বোঝা যায়।

মূল বক্তব্য, তিনি এক, তিনিই দুই হয়েছেন নিজেকে আস্বাদ করার জন্য। কিভাবে আস্বাদ করেন? সবটাই তাঁর; লুচ্চাররূপী নারায়ণকে তিনিই আস্বাদ করছেন, এই নয় যে কেউ বাদ যাচ্ছেন। বদমাইসরূপী নারায়ণ, দুষ্টরূপী নারায়াণ, খলরূপী নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, সবাইকেই তিনি আস্বাদ করছেন। কিন্তু আমরা তো আমাদের বুদ্ধিতে এগুলো বিচার করতে পারিনা। আমাদের শাস্ত্রের কথাকে আশ্রয় করে চলতে হবে। সেইজন্য বলছেন, যিনি জ্ঞানী *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি*। ঠিক ঠিক আমার যে ভক্ত সে কখন আমাকে ভুলে থাকে না, আমিও তাকে ভুলে থাকতে পারি না।

ঠাকুর এবার দেখাবেন ঠিক সাধক কেমন হন। শুরু করার আগে সংক্ষেপে পুরো জিনিসটাকে একবার আমরা দেখে নেব। ফলে ঠাকুর যেটা বলতে যাচ্ছেন, সেটা বুঝতে আমাদের খুব সুবিধা হবে। আপনারা অনেকেই আমার 'The Hindu Way' বইটা পড়ে থাকবেন, যাঁরা পড়েননি তাঁরা দয়া করে পড়বেন। হিন্দু ধর্মের এর থেকে ভাল ব্যাখ্যা হতে পারে না। ওখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে, হিন্দু কত প্রকার হয়। এটা যে শুধু হিন্দু কত প্রকার হয় নিয়ে বলা হচ্ছে তা না। যে কোন ধর্মে চার শ্রেনীর লোক পাওয়া যায়। প্রথম হল, যাঁরা জন্মগত সেই ধর্মের লোক, যেমন হিন্দু, জন্মগত হিন্দু; এনারা কিছু করে না। একবার একটি কথায় একজন আমাকে বলল, 'আমি এই ধর্মাচার মানিনা'। আমি তাঁকে খুব মিষ্টি করে বললাম, 'ভাই, ধর্মাচরণ এগুলো হল যাঁরা দৈবী স্বভাবের তাঁদের জন্য, যারা আসুরিক স্বভাবের তাদের জন্য না। তোমার জন্য এটা না, হিন্দু হয়ে জন্মেছ বলে যে তোমার দৈবী স্বভাব থাকবে তার কোন কথা নেই। এগুলো তো অসুরদের জন্য নয়, এগুলো ওরা করবে না। অসুরদের সব কিছুই হল লোক দেখানো'। এসব কথা বলতে হয়। হিন্দুরা ভাল মানুষ হতে হতে কবে যে কাপুরুষ হয়ে গেলে বুঝতেই পারলাম না।

রামকৃষ্ণ মিশনে আমি জয়েন করলাম, স্বামী সুহিতানন্দজীর কাছে বড় হলাম। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, ভাল সাধু অনেক দেখা হয়েছে, ভাল সাধু না হয়ে আত্মজ্ঞানী সাধু, ঈশ্বরদর্শন লাভ করা সাধুর নিচে কোন কথাই হয় না। আপনারা জেনে অবাক হবেন, আমরা যে এই ব্যাখ্যা করছি, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে কথাগুলো বলি, মণিপুরের একটি ছেলে নিয়মিত আমাদের বিভিন্ন ক্লাশগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। কিছু দিন আগে উনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছেন। তাঁর মা মণিপুরী, ছেলেকে আশীর্বাদ দিলেন, 'যাও বাবা! ধ্রুবের মত, সপ্ত ঋষিদের মত একজন হও'। ছেলেটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল, সে আমাকে লিখল, 'মহারাজ আশীর্বাদ করবেন যেন ভাল সাধু হয়ে শেষ না হয়ে যাই'। কথাটা পড়ে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কারণ আমারই কথা শুনে শুনে এই কথা বলছে। ঠিক তেমনি হিন্দুরা ভাল মানুষ হতে হতে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভাবলেই অবাক লাগে।

কিসের ভাল মানুষ! ভাল মানুষ মানে, একটা অপদার্থ। ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না। বিধর্মীরা বাড়ির বউ-মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, কারুর কিছু বলার নেই। আক্রমণের পর আক্রমণ করে যাচ্ছে কেউ কিছু বলছে না। কেন না, আমরা ভাল মানুষ। সেখান থেকে কিছু মানুষ হন, যাঁরা ধর্মকে ঠিক মানেন না, কিন্তু ওই ধর্মের কিছু আদর্শগত জিনিসকে নিয়ে তাঁরা জীবন-যাপন করেন। যেমন একজন হিন্দু, তিনি হয়ত ধর্মাচার করছেন না, কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার দেখে বুঝতে পারবেন, তিনি হিন্দু। তেমনি একজন মুসলমান, তিনি হয়ত ধর্মাচার করছেন না, কিন্তু দেখে বোঝা যাবে যে ইনি মুসলমান। ইংরাজীতে এখন একটা নূতন শব্দ এসেছে, 'প্র্যাক্টিসিং', He is practicing Hindu। আমার প্রথম বই বেরিয়েছিল 'টিয়া'। সেখানে আমার পরিচিতি দিয়ে গিয়ে লিখেছিলেন –He is a practicing monk। কি আজব কথা, monk আবার প্র্যাক্টিসিং হয় নাকি? পড়াশোনা করা লোকেদের অজ্ঞানের সীমা; আর না বোঝার ক্ষমতা কি সাংঘাতিক আপনার কল্পনা করতে পারবেন না।

প্রথমটা হল একটা ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর দ্বিতীয় একজন ভদ্রলোক হওয়া আর তৃতীয় হল যাঁরা ধর্মাচার করছেন। এই তৃতীয় যাঁরা, এনারা চেষ্টা করছেন। এটা খুব ভাল দেখা যাবে, গ্রামে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা দেখে থাকবেন, বড়রা যাঁরা ছিলেন, বিশেষ করে ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমারা খুব সচেতন ভাবে সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় গিয়ে প্রদীপ জ্বালাতেন, নিত্য গীতা, চণ্ডী, চৈতন্যচরিতামৃত আদি ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করতেন। বাড়িতে কুলদেবতার পূজা সবাই করতেন। এখন অনেকে আমাদের ব্যাখ্যাগুলো শুনে আমাদের কাছে আসেন দেখা করতে। খুব আনন্দ সহকারে বলেন, মহারাজ ইউটিউবে আপনার কথা শুনে আমরা এখন এগুলো করছি। আরে ভাই, এই জিনিসগুলো আপনাদের ঠাকুরদা, ঠাকুরমারা নিত্য করতেন, আপনি নূতন করে কি আর করছেন। আমাকে যেন ধন্য করে দিচ্ছেন, আমাকে যেন কৃতার্থ করছেন, না, সেই রকম কিছু না। যাঁরাই ধর্মপ্রাণ হিন্দু, তাঁরা সবাই এটাই করেন।

চতুর্থ হলেন, যাঁরা মনে প্রাণে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করে দিয়েছেন, এনারাই হলেন সাধক। ঠাকুরের এই পুরো কথামৃত, এটা হল এই চতুর্থ শ্রেনীদের জন্য, সাধকদের জন্য। কথামৃতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বাইরেও এমনি অনেক সাধারণ কথাও আছে; যেমন আমাদের মহারাজদেরও বক্তৃতাতে, লেখাতে 'গৃহস্থদের জন্য রামকৃষ্ণ' ইত্যাদি আছে। কিন্তু ঠাকুর হচ্ছেন শুধু সাধক, সাধনা ও সিদ্ধি। অনেক আগে 'সাধক, সাধনা ও সিদ্ধি' এটা নিয়ে আমি একটা বড় কাজ করছিলাম। কাজটা শেষ করতে পারিনি, www,archive.orgতে 'Milestone in Spiritual Life' নামে একটা লেখা ওখানে আছে। বোঝা যায় যে কি বলতে চাইছেন। এর মধ্যে প্রথম যেটা বলা হল, যাঁরা জন্মগত হিন্দু, তাঁদের কি নিয়ে এমন কিছু বলা হচ্ছে না। ভদ্রলোক হও, ভাল মানুষ, সে তো যে কেউ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বই পড়লেও হয়ে যাবেন। তৃতীয় আচার-আচরণ, কুল পরম্পরা দিয়ে চলেন, এটা তাতেও হয়ে যাবে। কিন্তু একজন সাধক হওয়া, আধ্যাত্মিক হওয়া, সাধক-সাধনা-সিদ্ধি; এই ব্যাপারে এত গুছিয়ে কথামৃত ছাড়া কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত এগুলো তো আধাত্মিক রত্নের ভাণ্ডার; কিন্তু ঠাকুর যে ভাবে হাত ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছেন, এটা কোথাও পাওয়া যাবে না। আর আমার এই তো জীবন, আমার বেশির পড়াশোনা নেই, কিন্তু শাস্ত্র ঘাঁটাঘাটি আছে; আমি জানি কোথায় কি আছে।

ঠাকুর এখন এখানে সাধকদের নিয়েই বলছেন। এখন প্রথম যে তিনজন –যাঁরা জন্ম থেকে একটা ধর্মে আছেন, যাঁরা ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করছেন, আর ধর্মপ্রাণ। এই তিনজনেরই গোঁড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা সাংঘাতিক। কারণ তাঁরা ধর্মতত্ত্বটা বোঝেন না। ধর্মতত্ত্ব না বোঝা থাকলে, না জানলে গোঁড়ামি আসবেই। ইদানিং কালে দেখবেন আমাদের দেশে প্রচুর গোলমাল লেগেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ, বাংলাদেশেও প্রচুর গোলমাল চলছে। কারণ একটাই, যে কোন সমাজে যে ধর্মের পালন হচ্ছে সেখানে মূল হল এই তিন শ্রেনীর মানুষ। নামে হিন্দু, কি একটু ভদ্রলোক, আর একটু ধর্মপ্রাণ; এরা কিন্তু গোঁড়া হবেই। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে ঢুকে গেছেন, তাঁরা অতটা গোঁড়া হন না। কোথাও যদি একটু মুক্ত ভাব দেখা যায়, অথচ ধর্মের অনুশীলন করছে, আমাদের বর্তমান কালের লিবারাল না; কয়েকজন আছেন ইংরাজীতে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেন আর বড় বড় উপদেশ দেন, এদের সবার ভিতরে একটা এজেণ্ডা আছে, পিছন থেকে ক্ষমতা পাওয়ার ইচ্ছা। যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরে মন-প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের মন খোলা। কারণ তাঁরা জানেন ঈশ্বর অনন্ত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি বলেন, হ্যাঁ আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, আধ্যাত্মিক ভাবে ডুবে আছেন, সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুরুষ, কিন্তু তাও একটু গোঁড়ামি আছে। যেমন জেরুজালেম অঞ্চলে তিনটি ধর্মের লোকেদের বাস –জহুদি, খ্রীশ্চান আর ইসলাম; শত শত বছর ধরে এরা মারামারি করে আসছে। খ্রীশ্চানদের ব্যাপারটা আমি ভাল জানি, ওদের মধ্যে যাঁরা সেন্টস, নিজেদের যাঁরা সেন্ট বলছেন, ওনারা এটাকে ভদ্র নাম দিয়ে বলছেন, হোলি ওয়ার। জিনিসটা তো একই। এই যে গোঁড়ামি জিনিসটা যেটাকে ঠাকুর এখন বলবেন। আজকেই খবরকাগজে পড়ছিলাম, আমেরিকাতে একজন হিন্দু পলিটিসিয়ানকে

বলছে –আপনি হিন্দু ধর্ম পালন করেন, হিন্দু ধর্ম হল ডেভিলের ধর্ম। কত অজ্ঞান হলে মানুষ এই রকম কথা বলে! যে দেশ তৈরী হল ওখানকার স্থানীয় লোকেদের মেরে তাড়িয়ে, ওদের মাটি কেড়ে নিয়ে; তাদের কাছ থেকে মুক্ত ভাব আমরা কি করে আশা করব? অথচ এরাই আবার সারা জগতকে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছে, তার সাথে বলবে আমরা লিবারাল, আমরা গণতন্ত্রিক। হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম, ঋষিদের দেওয়া ধর্ম; শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক যে মন হতে পারে, একজন দুজন না, শত শত উচ্চ মন যে ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সেই ধর্মকে বলছে, Religion of Devil। আমেরিকার যদি একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে –সেটা হবে Ignorance, মুর্খ, এছাড়া আর কিছু বলা যায় না। Jesus is God, কেন? বাইবেল বলেছে। বাইবেলকে কেন মানব? এটা ভগবানের কথা। আর যদি না মানি? নরকে যাবে। ঈশ্বর অনন্ত, এই এতটুকু যদি আপনার বোধ হয়, তখন আপনার বোধ হবে যে যিনি অনন্ত, সেই তিনিই আমার সামনে এভাবে আসছেন।

বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বলে, তাদের ঈশ্বর নাকি নিরাকার, আরও কত কি বলে; অবাক লাগে, এত কিছু বলার পরেও এটা বাস্তব যে, সেই নিরাকার ঈশ্বরকে একজন সুপারম্যান রূপে দেখে। সব থেকে ভাল উদাহরণ হল, ইদানিং কালে বৈষ্ণবদের কিছু সম্প্রদায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খুব করে কীর্তন করে, অথচ স্বামীজীর নামে, ঠাকুরের নামে নিন্দার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণকে আপনারা কি দেখছেন? যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাঁকে যখন মানুষ রূপে দেখছেন, তখন এই দেখার মাধ্যমে আপনারা কৃষ্ণকে এমন সীমিত করে দিচ্ছেন যে, অনন্তই সীমিত হয়ে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত সহজ যুক্তি। যখন বলছেন কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণই ভগবান ভক্তি জাগরণের জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যখন বলছেন, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই কৃষ্ণ, একমাত্র কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ; সঙ্গে সঙ্গে আপনি না বুঝে কৃষ্ণকে সীমিত করে দিচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় হল সচ্চিদানন্দকে সীমিত করে দিচ্ছেন। তার থেকেও বাজে, যিনি অনন্ত, অখণ্ড তাঁকেই সীমিত করে দিচ্ছেন। আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন না যে, আপনি একেবারে অযৌক্তিক।

মানুষ কবে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? আমিও লোকেদের সঙ্গে টুকটাক মেলামেশা করি, সব ধরণের লোককে জানি; অবাক হবেন যে, বিজ্ঞানের শিক্ষক, এনাদের মত অযৌক্তিক লোক আমি কম দেখেছি; শুধু মুখেই বলে যাবে সাইন্টিফিক্। এনাদের কাছে সাইন্টিফিক্ মানে আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক, তুমি যেটা বলছ সেটা ভুল। যুক্তিবাদীদের আরও বাজে অবস্থা। এসব কথা শুনে আপনি হয়ত অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু আমি fact বলছি। যে কোন যুক্তিবাদী, যে কোন বৈজ্ঞানিককে বলুন, পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে আমার সামনে এসে কথা বলবে, কোন শ্রদ্ধার দরকার নেই, আমার সাথে তর্ক করেই হোক, মারামারি করেই হোক; পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে পারবে না। তারপরে কি করবে? আমাকে দুটো তিনটে গালাগাল দিয়ে চলে যাবে। ইউটিউবে প্রচুর এই ধরণের মানুষ আসে, মাঝে মাঝে অন্ করে দিই; তবে বেশি নোংরা ভাষা ব্যবহার করলে ডিলিট্ করে দিই।

যাঁরা আধ্যাত্মিক হন, তাঁদের একটি সমস্যা হওয়ার সম্ভবনা থাকে, এনারা হলে একনিষ্ঠ; তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানিনা। ঠাকুর মা যশোদার উদাহরণ দিচ্ছেন –মা যশোদা ব্যাকুল হয়ে বলছেন, আমি যে কৃষ্ণকে বড় করেছি, যাঁকে আমি মাখন খাওয়াতাম, আদর করতাম, স্নেহ করতাম; আমি সেই কৃষ্ণকে অনন্ত রূপে, অখণ্ড রূপে চাই না, আমার লাগবে না। ঠাকুর গোপীদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন –গোপীরা দ্বারকাতে গিয়ে দেখছেন, মুকুট পরা, রাজবেশ; সঙ্গে সঙ্গে গোপীরা বলছেন, আমাদের এই কৃষ্ণ লাগবে না, সেই ময়ূরপুচ্ছধারী, গলায় বনফুলের মালা, আমরা সেই কৃষ্ণকে চাই। এগুলো হল নিষ্ঠা, ভগবানের ওই রূপের প্রতি তাঁদের ভালবাসা। কিন্তু এটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত। পরে তাঁর যে সন্তানাদি হবে, শিষ্য হবে, তারা যদি লাঠি, বন্দুক বার করে সবাইকে বলে বেড়ায়, এই কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কৃষ্ণ নয়; তখন বুঝতে হবে তারা ধর্ম বোঝে না। তবে সবাই না, এক আধজন এদিক সেদিক আছে, যারা গোলমাল করছে।

যাঁরা ঠিক ঠিক সিদ্ধপুরুষ, যাঁর অনন্তের বোধ হয়েছে, তিনি এই ধরণের কাঁচা কথা কখনই বলবেন না। ফলে কি হয়, তাঁর যারা শিষ্য-প্রশিষ্য হবে, ওই পরম্পরাতে শিক্ষা পেলে কখন কাঁচা কথা বলবে না। নিষ্ঠা অবশ্যই দরকার, শুধু গোঁড়ামিটাই সর্বনাশ করে। আপনার মধ্যে যে গোঁড়ামি থেকে থাকে, আপনার সময় পর্যন্ত হয়ত চলে যেতে পারে। কিন্তু আপনার পরে যারা আসবে, ওদের সর্বনাশ হবেই হবে, ওরা আর বেশি দূর যেতে পারবে না। যিনি ওই পরম্পরায় ঠিক ঠিক সাধক, তিনি ঠিক ঠিক এই জিনিসগুলোকে জানেন।

আমরা যেমন রামকৃষ্ণ মিশনে আছি, ঠাকুরের পরম্পরায় বড় হয়েছি, আমরা এই জিনিসগুলোকে ঠাকুরের পরম্পরা দিয়ে জানি, ফলে আমাদের মধ্যে গোঁড়ামি জিনিসটা আসার সম্ভবনা নেই। আমাদের কাছে ঠাকুরই সব, কিন্তু আমাদের কাছে ঠাকুর অনন্ত। যিনি অনন্ত তিনিই ঠাকুর, যিনি ঠাকুর তিনিই অনন্ত। আর অনন্তের কত রূপ হতে পারে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ঠাকুর বলছেন, সাধক নানারকম। আপনাদের কারুর কারুর মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এই যে বারবার আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক শব্দ আসছে, এই আধ্যাত্মিক জিনিসটা কি? খুব সহজ ভাষায় আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ দাঁড়ায় –ঈশ্বরের সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়া। একজন ছেলে আর একজন মেয়ে যখন এক অপরকে ভালবাসে, তখন তার আচরণ এক রকম হয়; এক অপরের জন্য কবিতা পাঠায়, কবিতা শোনায়। তারাই যখন বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল, তখন তাদের ভালবাসার কথা জনসাধারণের মধ্যে আলোচিত হয় না। তখন দুজনে এক হয়ে যায়। ইংরাজী খুব সুন্দর কথা আছে –Public display of emotion। জনসাধারণের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা দেখানোটা বিয়ের পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক যিনি, তিনি হলেন সেই, যাঁর ঈশ্বরের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে; এবার আর কোন public display থাকবে না। যেটা হবে সেটা আপনার আর ইষ্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। খ্রীশ্চানদের মধ্যে যাঁরা নান হন তাঁরা ওই রকম, marry to Jesus এই ভাবটাকে নিয়ে তাঁরা থাকেন। এটা সাধারণ বিবাহ নয়, এটা আধ্যাত্মিক বিবাহ। একটু বেশি বয়স হয়ে যাওয়ার পর কেউ নিজের মায়ের প্রতি ভালবাসাকে public display করে না, কিন্তু একশ ভাগ ভালবাসা দিয়ে মায়ের সাথে জুড়ে আছে। যাই হোক আমরা আবার মূল আলোচনায় ফিরছি। ঠাকুর সাধকের কথা বলছেন।

সাধক নানারকম। সাত্ত্বিক সাধনা গোপনে, সাধক সাধন-ভজন গোপনে করে, দেখলে প্রাকৃত লোকের মতো বোধ হয়, মশারির ভিতর ধ্যান করে।

কথাগুলো অত্যন্ত জরুররী। এমন ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে গেছেন, সেটা বাইরের কাউকে কক্ষণ বুঝতে দেবেন না। কেন অন্যকে বুঝতে দেবেন? এটা যে তাঁর আর ইষ্টের মধ্যেকার একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক, এই যে সম্পর্কের নিবিড়তা, একটা যে গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে, অন্যকে কেন তিনি জানতে দেবেন? আমাদের কাছে অনেকে আসেন। এসে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বলবেন, মহারাজ ঠাকুরের দুটি কথা বলুন। আমি তখন বলি, এবার আপনারা আসুন। ভক্তিকে কত খেলো করে দিচ্ছেন, ভিতরে কোন ওজন নেই, ফাঁকা উড়ে বেড়াচ্ছে।

সাত্ত্বিক সাধক সাধন-ভজন গোপনে করে, মশারির ভিতর ধ্যান করে। আপনি বলবেন, আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি তো সবাইকে দেখাচ্ছেন। আমরা সন্ন্যাসটাকে দেখাচ্ছি। সন্ন্যাসী হলেন বড়লোক বাড়ির কুকুরের মত। আজকেই আমার সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সেখানেও আমি এই কথাটা বললাম –আমরা হলাম বড়লোক বাড়ির এ্যালসেসিয়ান কুকুরের মত। কুকুরের গলায় বকলেস দেওয়া থাকে, ওটা চিহ্ন, এটা অমুকের কুকুর। আমরা ঠাকুরের কুকুর। সন্ন্যাসের চিহ্নটা লোকেদের সাবধান করে দেওয়া। নিজের সম্পত্তিকে কোন দিন মনে করতে যেও না, তোমার কোন দিন সম্পত্তি হতে পারে না। কিন্তু সাধন-ভজন এগুলো নিজের ভিতরের, এর খবর কেউ পেতে পারেন না, কাউকে ভিতরের

খবর দেওয়া যায় না। কতবার বলা হল public display of emotions, যেখানেই দেখা যাবে ভাবাবেগ আছে, আবেগ আছে, বুঝবেন এর কিছু গোলমাল আছে। আর public display of emotions যদি থাকে, বুঝবেন অনেক গোলমাল আছে। ঠাকুর এত পরিষ্কার করে গেলেন, কিন্তু তাও আমরা এই জিনিসগুলো থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছি না।

রাজসিক সাধক বাহিরের আড়ম্বর রাখে, গলায় মালা, ভেক, গেরুয়া, গরদের কাপড়, সোনার দানা দেওয়া জপের মাল। যেমন সাইন বোর্ড মেরে বসা।

ঠাকুরের ভাষা –সাইন বোর্ড মেরে বসা। তবে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে এই জিনিসটা বেশি নেই। অর্থাৎ অত বেশি লোক দেখানি নেই, যদিও অল্প একটু আধটু আছে। কারণ আমাদের এখানে বিশেষ ভেক ধারণ করার রীতি নেই কিনা। বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সাইন বোর্ড মেরে বসা ব্যাপারটা খুব বেশি –গলায় তুলসীমালা, কপালে তিলক, হাতে জপের মালা, গায়ে নামাবলী, কত কিছু। এগুলো খারাপ কিছু না, ভাল; তবে কি হয়, মানুষ এসবের মধ্যেই ডুবে যায় এবং আসল উদ্দেশ্যটাকেই ভুলে যায়।

বৈষ্ণবভক্তদের বেদান্তমতের অথবা শাক্তমতের উপর তত শ্রদ্ধা নাই। আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, এটা কেন হয়? এটা এইজন্য হয়, কারণ সাধনার গভীরে তাঁরা ঢোকেননি। সাধনার গভীরে যদি ঢুকে থাকতেন, তাহলে এই রকম কাঁচা কথা বলতেন না। আমি গ্রামে বাচ্চা বয়সে বড় হয়েছি, সেখানে সব কিছু খোলামেলা ছিল, আর সব রকমেরই ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করার পর বড়দের কাছে শাক্তদের, বৈষ্ণবদের নিয়ে অনেক গল্প শুনতাম। শুনে আমি চমকে উঠতাম, এ আবার কি ধরণের কথা বৈষ্ণবরা বলছেন? কিন্তু হিন্দু ভাব এই রকম নয়।

বলরামের পিতা মহাশয়কে ওইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে ঠাকুর উপদেশ দিতেছেন। ঠিক গভীরে যদি আপনি না গিয়ে থাকেন, আর ওই পরম্পরায় আপনি যদি বড় না হয়ে থাকেন, এই সমস্যা আপনার হবে। আজকে সারা বিশ্বে যে এত বোমাবাজি, গোলাগুলি, কত রকমের সমস্যা, সব কিছুর মূলে এই জিনিসগুলো। এক সময় ১৯৩০, ১৯৪০তে সারা বিশ্ব জুড়ে কত রকম সমস্যা চলছিল। এর মধ্যে পলিটিক্যাল টার্মওয়েল অনেক ছিল; কিন্তু এখন যে বিশ্বব্যাপি যে মারামারি হচ্ছে, বেশির ভাগই ধর্মকে কেন্দ্র করে।

সাকার রূপ নিয়ে যাঁরা চলেন তাঁদের মধ্যে গোঁড়ামি ভাব এসেই যায়। ঠাকুর এই ব্যাপারটা বিস্তারে বলবেন। তার আগে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। সেখানে বলরামের পিতা আছেন, যিনি একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। আমাদের যত হিন্দু শাস্ত্র আছে, সব কটাকে যদি একটু ভাল করে নেড়েচেড়ে খতিয়ে দেখেন আর তার সাথে যদি বিশ্বের যত ধর্মশাস্ত্র আছে সেগুলোকে দেখেন; ওগুলোকেও ভাসা ভাসা না, গভীরে গিয়ে যদি দেখেন; তিনটে কথা আপনার বেরিয়ে আসবে।

প্রথম হল, প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ বলবে ঈশ্বর সত্য, তাঁরা হয়ত নিজের ঈশ্বরকে মানেন, যেমন জহুদিরা জেহোবাকে মানেন, খ্রীশ্চানরা গড মানে। নাম যাই নিক, কিন্তু বলবেন তিনি সত্য, তিনি আছেন। এটাকে কোন ধর্মই না করবে না। দ্বিতীয় কথা বেরিয়ে আসবে –ঈশ্বর অনন্ত। অনন্ত জিনিসটা খুব মজার। অনন্ত বলতেই সাধারণ ভাবে আমাদের ধারণাতে আসবে আকাশ বা সমুদ্র, আমাদের স্বভাবেই এই ধারণাটা ঢুকে আছে। অনন্ত বলতে আমাদের মনে হয় বিশাল কিছু। ধর্মগ্রন্থ বলছেন ঠিকই যে, ঈশ্বর অনন্ত; কিন্তু অনন্ত জিনিসটাকে বোঝার জন্য দরকার সমাজের সেই জ্ঞান, যেটা কোথাও নেই। যদি আমার কথাকে বিশ্বাস করেন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এরা একটা উন্নত সমাজ, তার সঙ্গে এদের বিজ্ঞানের একটা উপলব্ধি আছে। বিজ্ঞানীরা অনন্তকে খুব ভাল বুঝেছেন, আর অনন্তের উপর অর্থাৎ

ইনফিনিটির উপর তাদের খুব ভাল ভাল বই আছে। অনন্তকে বোঝানর জন্য অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু ওনাদের যে সমাজ, ওনাদের যে দর্শন; সেখানে অনন্ত কখনই ঢুকতে পারেনি।

এক সময় পাশ্চাত্য দর্শন পড়ার আমার আগ্রহ হয়েছিল। পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, পড়তে গিয়ে কেন জানি না পাশ্চাত্য দর্শন আমার পছন্দ হচ্ছিল না। পড়া যখন ছেড়ে দিলাম, তারপরে গিয়ে বুঝলাম ওদের গোলমালটা কোথায়। এত কিছু বলেন, কিন্তু ঈশ্বর যে অনন্ত, এই ধারণাটা ওরা করতে পারেনা। কারণ সমাজে সেই ধারণাটা নেই। ভারতের সমাজে ঈশ্বর অনন্ত এই ধারণাটা প্রথম থেকে রয়েছে। অন্য দিকে বিজ্ঞানের যে অনন্ত, সেটা থেকে যে অনেক কিছু ব্যাপার হতে পারে, ভারত সেইদিকে খুব বেশি জোর দেয়নি। কারণ হিন্দুদের কাছে বিজ্ঞান হল অতি নিম্নস্তরের। বিজ্ঞান মনের জগতে একটু সুখ-সুবিধা করে দিচ্ছে ঠিকই, এর বেশি ভারতের সমাজ বিজ্ঞানকে দাম দেয় না। সুখ-সুবিধা একটু বেশি হলে বাবুরা একটু অন্য রকম খাবেন, সাধারণ মানুষ আর-এক রকম খাবেন। কিন্তু যতটুকু পেট ততটুকুই সবাই খাবে, তার বেশি খাবে না।

বিজ্ঞানের অনন্তের ধারণা থাকা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্য জগতে আর পাশ্চাত্যের ধর্মগুলো; ধর্মগ্রন্থ বলছি না, কারণ যে কজন সেইসব ধর্মে এসে ধর্মের কথা বলেছেন, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই জানেন, ঈশ্বর অনন্ত; কিন্তু তাদের শিষ্যরা বুঝতে পারবে না। কারণ তাদের ওই ধারণাটাই নেই। সমাজে যতক্ষণ এই ধারণা না ঢোকে, প্রত্যেক মনে যতক্ষণ এই ধারণা না ঢোকে; ততক্ষণ তাদের পক্ষে সম্ভব না যে, ঈশ্বর অনন্ত। ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদে এত মন্ত্র আছে, বিভিন্ন শাস্ত্রে এত শ্লোক আছে, আর তাতে অনন্তকে নিয়ে এত বর্ণনা রয়েছে যে, যে সাধারণ মানুষরা বিজ্ঞান বোঝে না, তারাও ঈশ্বর অনন্ত এই জিনিসটাকে বোঝে। গ্রাম্য চলতি ছড়ায়, প্রবাদে, চলতি কথাতে অনন্তকে নিয়ে প্রচুর কথা পাওয়া যাবে। কবির দাস আদি কবিরা অনন্তের ধারণাকে নিয়ে প্রচুর দোঁহা, কবিতা লিখেছেন।

তৃতীয় যে জিনিসটাকে নিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলো বলেন তা হল –এনারা সবাই জানেন মানুষের বুদ্ধি সীমিত, কিন্তু একদিকে অনন্ত, অসীম আর অন্য দিকে মন সীমিত; এই দুটোকে মিলিয়ে কোথায় গোলমালটা হবে, এটার উপর ধর্মপ্রবর্তকরা এবং তাঁর শিষ্যরা ব্যাখ্যা করেননি। এর ব্যাখ্যা করাটা প্রবর্তকের কাজ না, কাজটা হল তাঁর পরের প্রজন্মের শিষ্যদের। ঠাকুর যে কথাগুলো বলেছেন, সেই কথাগুলোকে আরও বিস্তারে স্বামীজী বললেন, বললেন ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানরা এবং পরে পরে আমাদের যে বড় বড় পণ্ডিত মহারাজরা এসেছিলেন তাঁরাও প্রচুর লেখালেখি, ভাষণের মাধ্যমে বিস্তারে ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন; এটা তাঁদের কাজ। কিন্তু সমাজে সার্বিক ভাবে অনন্তের ধারণাটা স্পষ্ট না থাকাতে, সেভাবে এখন অনন্তের ভাবকে মানুষ নিতে পারছে না। শ্রেষ্ঠ মন, কিন্তু সীমিত মন, ফলে বাধ্য হয়ে মানুষ ভগবানকে সীমিত করে দেয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করবেন, সবাই ভগবান অনন্ত বলছেন, তিনি অসীম বলছেন; কিন্তু ভগবানের বর্ণনা করার সময় তাঁকে সীমিত করে দেন। ওদের ধর্মগ্রন্থ কিন্তু এ-রকম কথা বলছেন না, কিন্তু এদের কথায় ভগবান সীমিত হয়ে যাচ্ছেন। স্বাভাবিক যে, সীমিত মন দিয়ে অনন্তকে দেখে তার মত ভগবানের অবধারণা করছে, সেখানে ভগবান তো সীমিত হবেনই হবেন। সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাবেন দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব পরম্পরার মধ্যে। এই দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে সব সময় এই নিয়ে লড়াই চলে আসছে –শিব বড় না বিষ্ণু বড়। বাংলায় এসে এর মধ্যে মা কালীও ঢুকে যান –শিব, বিষ্ণু ও কালী; কে বড়।

একটা মজার গল্প আছে। কোন এক রাজ্যের রাজা মারা গেছে। রাজার পার্ষদরা সবাই গেছে রাজার গুরুর কাছে। সেখানে গিয়ে তারা রাজগুরুকে জিজ্ঞেস করছে, 'হে গুরুদেব, আমরা এখন কাকে রাজা করব'? গুরু তাদের বলে দিলেন, 'এই একশটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে এখানে নিয়ে

এসো'। ওরা অনেক খুঁজে খুঁজে একজনকে পেল, তাকে গুরুর সামনে নিয়ে এসেছে। বলছে, 'গুরুদেব আমরা এর মধ্যে একশটি গুণ পাইনি কিন্তু আটানব্বইটা গুণ পেয়েছি, আর একেই আমরা রাজা করেছি'। গুরু বললেন, 'কি আর করা যাবে, ঠিক আছে যাও, রাজ্য শাসন কর'। কিছুদিন পরে রাজপার্ষদরা আবার গুরুর কাছে এসেছে, এসে বলছে, 'গুরুদেব রাজ্যের সব কিছু সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে'। গুরুদেব ওদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দুটি গুণ ওর মধ্যে নেই'? ওরা বলল, 'প্রথম দুর্গুণ হল, ও কিছুই জানে না। দ্বিতীয় দুর্গুণ –কারুর কথা মানে না। লোকটির মধ্যে এই দুটো ছাড়া সমস্ত গুণে পূর্ণ'। শুধু দুটি গুণের অভাব –প্রথম কিচ্ছু জানে না এবং দ্বিতীয় কারুর কথা মানবে না। এই যে ইদানিং যাঁরা ধর্মের শিক্ষা দিচ্ছেন, এনাদের বেশির ভাগেরই সব কটা গুণ রয়েছে। তিলক কাটবে, নিরামিষ খাবে, উপোস করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দুটি জিনিস –শাস্ত্র জানে না এবং কেউ কিছু বললে মানবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে এসে কি করলেন? শাস্ত্রকে একদিকে রেখে দিলেন, কারণ তিনি পড়াশোনা করা লোক ছিলেন না, অল্প একটু জানতেন, পুরোহিতের কাজ করতেন তাই কিছু মন্ত্র জানতেন। কিন্তু নিজে সাধনা করে দেখালেন ধর্ম সত্য। ঠাকুর তো তাঁর মা কালীকে নিয়ে কোন প্রচার করলেন না। আমাদের সন্ন্যাসী ভাইরা ও ব্রহ্মচারী ভাইরা মাঝে মাঝে একসাথে বসে অনেক কথাবার্তা, আলোচনা করি। কয়েকদিন আগে সেই রকম আলোচনা হচ্ছিল, সেখানে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ বলছেন, খুব নামকরা বই শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রপ্রমাণ। সেটাকে নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি থামিয়ে দিয়েছি।

'ভাই শুনুন, একশ বছর আগে বইটার হয়ত দাম ছিল, কে লিখেছেন জানা নেই, তবে শুনেছি এই রকম একটা বই আছে; এর বেশি আমার কোন আইডিয়া নেই। বইটা খুলে কোন দিন দেখিনি, দেখবও না। একশ বছর আগে লোকেদের আপনাকে বলতে হবে, ঠাকুর যে জীবনযাপন করেছেন, ঠাকুর যে কথা বলেছেন, তার সব কিছুই শাস্ত্রের সঙ্গে মিল আছে। আজকের দিনে পুরো বিপরীত –শাস্ত্র সত্য, কারণ ঠাকুর এটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা ঠাকুরের ভাবে ঠাকুরের সম্প্রদায়ে পড়ে আছি; তিনিই আমাদের ইষ্ট, তিনিই আমাদের গুরু, আমরা তাই বলি গুরু মহারাজজী কি জয়। এ তো কালকের কথা, ১৯০২ সাল অব্দি স্বামীজী ছিলেন, ১৯২০ অব্দি শ্রীশ্রীমা ছিলেন। আপনাদের অনেকেরই জন্ম ১৯৪০ থেকে ১৯৬০এর মধ্যে। আমিই এখন প্রায় সত্তর বছরের হতে চললাম। আমি জন্মাবার ৩৫ কি ৪০ বছর আগে শ্রীশ্রীমা এই ভূমি ছেড়েছিলেন। মনে হয় গতকালের কথা। অনেক পরিবারের বাচ্চারা তাদের ঠাকুরমা, ঠাকুরদাকে দেখেনি; আমাদের শ্রীশ্রীমা সেই রকমই, যেন কয়েক বছর আগেকার কথা। এটা যদি সত্য না হয়, তাহলে আর কি সত্য হবে। শাস্ত্র সত্য, কারণ ঠাকুর শাস্ত্রের সব কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন উল্টো। স্বামীজী আমাদের জন্য কাজ দিয়ে গেছেন –শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নূতন ভাবে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দিয়ে। শাস্ত্রের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হল প্রমাণ'।

জানি না, ব্রহ্মচারী মহারাজ কতটুকু বুঝলেন। ওনাকে আমি এটাই বলতে চাইলাম, আমার যে 'বেদবিহঙ্গম' বই, তাতে এই জিনিসটাকেই দেখানো হচ্ছে। দেখুন কিভাবে ঠাকুরের সঙ্গে এর মিল আছে; ঠাকুর এই জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। গীতার উপর আমার যে 'আরোহণ' বই, তাতে একই জিনিস দেখানো হয়েছে। ঠাকুরের ঘটনা নিয়ে আমাকে বলতে হবে না, হ্যাঁ ঠাকুরের ঘটনা গীতাতে আছে। ঠাকুর যাবতীয় যা কিছু বলে গেছেন, এটাই আজকে প্রমাণ –শাস্ত্র সত্য, ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য। সীমিত মনের ভিতর দিয়ে দেখে আপনি যে মনে করছেন, আমার ঈশ্বর সত্য; এতে দোষের কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। জানলা দিয়ে একটা বিরাট পাহাড় বা সমুদ্র যদি দেখেন, ওই রকমই মনে হবে। ঠাকুর একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন, একটা প্রাচীরের ওপারে খুব আনন্দ হচ্ছে। প্রাচীরের গায়ে ছোট ছোট ফুটো আছে। আপনি তার একটা ফুটো দিয়ে প্রাচীরের ওপারে কি হচ্ছে দেখছেন। ওই এক-একটি ফুটো হল, আমার মন, আমার শাস্ত্রজ্ঞান। অবতার হলেন একটা বড় ফুটো। ঠাকুরের জীবন দিয়ে

যখন দেখবেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবন দিয়ে যখন দেখবেন, গীতা দিয়ে যখন ঈশ্বরকে আর জীবনকে দেখবেন, তখন আরও পরিষ্কার ভাবে দেখবেন। শুধু নিজের বোঝাটুকু দিয়ে যদি দেখেন তখন সেই দেখাটা হবে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে দেখা।

বেদে এই কথা বার বার আসে, তিনি অনন্ত। ফলে *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, এটা যে একটি মন্ত্রেই আছে তা না, এই ধরণের প্রচুর মন্ত্র বেদে ছড়িয়ে আছে। আমাদের জন্য কি শিক্ষা? তোমার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রাখ, ইষ্টকে আঁকড়ে ধরে রাখ, ইষ্টই আমার সব কিছু। কিন্তু জানবেন, যত ঈশ্বরীয় ভাব, যত ঈশ্বরীয় রূপ সব সত্য, তিনিই হয়েছেন। আমার খুব প্রিয় ঘটনা। একজন বড় মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার, তাঁর লেখা খুব সুন্দর একটা বই আছে। সেখানে তিনি তাঁর বাচ্চা মেয়ের কথা বলছেন। তিনি মেয়েকে সব সময় শিক্ষা দিতেন, তোমার মধ্যে সব সময় প্রতিযোগিতার ভাব যেন কম থাকে। একদিন বাড়িতে তার বন্ধু আসবে বলে কুকিস বানানো হয়েছে। বারবার ওকে বলে দেওয়া হয়েছে, সব কুকিস্ কিন্তু এক রকম। বাচ্চা মেয়ে, অত কিছু মাথায় থাকে না। বন্ধুকে কুকিস দেওয়া হয়েছে, ওকেও দেওয়া হয়েছে। বন্ধুকে মেয়েটি বলছে, 'তোমার কুকি আমার সমান না, তোমারটা আমার সমান'। অর্থ হল, তোমার যাবতীয় যা কিছু সব আমার মধ্যে আছে, আমারটা তোমাতে নেই। লেখক শব্দটা ব্যবহার করছেন 'সমান'। ঠিক তেমনি যার গোঁড়া তারা ব্যবহার করবে, তোমার যিনি ইষ্ট, সেটা আমারই কৃষ্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্রুপের ভাব। কিন্তু তা তো না, তিনি ততটাই সত্য যতটা তোমার কৃষ্ণ সত্য। আপনার যিনি ইষ্ট, তাঁর প্রতি পুরো নিষ্ঠা রেখে অপরে কোথায় কি বলছে, কি করছে, সেদিকে ফিরেও তাকাবেন না।

ঠাকুরও এই কথাই বলছেন, পুরো কথামৃতের বক্তব্য আর যে কোন ধর্মগ্রন্থের মত সেই এক – ঈশ্বরই সত্য, তিনি অনন্ত, মন সীমিত হওয়ার ফলে এক সত্যকে আলাদা আলাদা দেখবে। আলাদা আলাদা দেখতে কোন দোষ নেই, কিন্তু তোমার নিষ্ঠাটা যেন ঠিক থাকে। তাই বলে একবারও কিন্তু ভেবো না, তোমারটাই ঠিক। কারণ তুমি বলবে, ধর্ম বিশেষ আছে, যারা চারিদিকে অশান্তি করে বেড়ায়, তার কি বলবেন? তারা তো এটাই বলবে –আমার ধর্ম ঠিক, তোমার ধর্ম ধাপ্পাবাজী ধর্ম। ভাল, ঠিক, আমি মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি তোমার ধর্মই ঠিক, তোমার প্রভুই ঠিক। কিন্তু তার সাথে জেনে রাখো, অজান্তায় তুমি তোমার ঈশ্বরকে সীমিত করে দিচ্ছ। কিন্তু মুর্খদের উপরে ঈশ্বরের এমনই কৃপা যে, এই সত্যটা বোঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। যিনি অনন্ত ঈশ্বর, তিনি কি করে কাউকে নিজের থেকে আলাদা করবেন। হেরেটিক, কাফের, কোথা থেকে আসে এইসব শব্দ? এটা তখনই হবে যখন আপনি ধরে নিচ্ছেন সে ঈশ্বরের বাইরে। ঈশ্বরের বাইরে মানে সে তো সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাবান হয়ে গেল, কারণ সে ঈশ্বরকে সীমিত করে দিচ্ছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়, তখনকার আভিজাত্যরা তাদের সমাজকে ধরে রেখেছিল, পরে তাদেরই ধরে ধরে সবার মুণ্ডু কেটে দিচ্ছিল। তখন একজন মহিলা বলছিলেন, এই লিবার্টির কি মূল্য? ফরাসী বিপ্লব ছিল লিবার্টির জন্য, ফ্রীডমের জন্য, ইক্যুয়ালিটির জন্য। যারাই এই ধরণের কথা বলে জানবেন, সব কটা হল ফ্রড। আমারটা তোমার মত, তোমারটা আমার মত নয়। আমার কথা মানলে তোমার কথা ইক্যুয়ালিটি, জাস্টিস; না মানলে এসো গলাটা কেটে দিচ্ছি। কিসের ইক্যুয়ালিটি, আমার কথা যদি নাই মানো?

ঈশ্বর যদি অনন্ত হন, তাহলে আমি তোমার ঈশ্বরের বাইরে কি করে হলাম? তোমার ঈশ্বরের বাইরেই যদি হলাম, তাহলে আমি নরকে কেন যাব? উত্তর নেই, কথাই বলবে না। কথা না বলে তলোয়ার বার করে বলবে, এসো বিচার করে নিই। গ্যালিলিওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলতে বলছে, 'বল, তুমি বাইবেলের বিরুদ্ধে গেছ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গেছ'। কি করবে বেচারি, ব্রুনোর পরিণামের কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে তখন বলতে হচ্ছে, 'হ্যাঁ, আমি যা বলেছি ভুল বলেছি, আমাকে ক্ষমা করুন'।

যারা যুক্তিবাদীরা আছে, এদের যত যুক্তি সব হিন্দুদের বিরুদ্ধে। অথচ হিন্দু ধর্মের একটি শাস্ত্রও এরা উল্টে দেখেনি। আমার কাছে একজন আসে, অনেক ধর্মীয় কাজ করে। যখনই দেখা হয় আমি ওকে ভালবেসে বলি, 'ভাই, হিন্দু ধর্মের একটি কোন বই পড়ে তুমি দেখেছ? আচ্ছা অন্য বই ছেড়ে দাও, আমি যে বইগুলো লিখেছি তার মধ্যে একটি চটি বই 'The Hindu Way', বাংলায় 'হিন্দু জীবনধর্ম', এটাও কি তুমি পড়েছ'? বলছে, 'আমার কাছে একটা e.Copy আছে'। 'দেখ, তুমি হিন্দু ধর্মের সেবা করতে চাইছ, একটা বই কিনে বাড়িতে রাখলে কিছু লোকে জানতে পারবে হিন্দু ধর্মের উপর কোন বই আছে, কম্প্যুটারে থাকলে কে জানতে পারবে'। নিন্দুকরাও হিন্দু ধর্মের কিছু জানে না। আর যারা হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে চাইছে তারাও হিন্দু ধর্মকে জানে না। অশান্তি হলে কে বাঁচাবে হিন্দু ধর্মকে? অন্যান্য ধর্মে একটা চটি বই, ওই অতটুকু পড়ে জেনে নিল, অন্তত এটা জানে যে, আমার ধর্মে এই এই আছে। আপনারা কিছু একটা পড়ুন, অন্তত গীতাটা পড়ে বোঝার চেষ্টা করুন। শুধু শ্রীশ্রীচণ্ডীও যদি পড়েন আপনি হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু জেনে যাবেন। কিন্তু কিছুই করবে না, লাল শালুতে বেঁধে রেখে দুটো ফুল দিয়ে পূজা করবে, আর বিশেষ বিশেষ দিনে কয়েকটা মন্ত্র পাঠ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতির প্রতি) –যে ধর্মই হোক, যে মতই হোক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে, অনন্ত ঈশ্বর, ঈশ্বর অনন্ত। স্বামীজী তাঁর লেকচারে এক জায়গায় বলছেন, যে কোন আত্মা, যিনি মুক্তির দিকে এগোচ্ছেন, তাঁকে ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। মনে রাখবেন মুক্তি আপনার অন্য জিনিস, ধর্ম আলাদা জিনিস। ধর্ম যে কোন জায়গায় পালন হতে পারে। কিন্তু মুক্তির জন্য আগে আপনাকে অনন্তকে বুঝতে হবে। কৃষ্ণ চাইলে আপনাকে মুক্তি দেবেন, ভক্তির থেকে মুক্তি নিচে; এগুলো সব মুর্খদের কথা। গেঁয়ো লোক রাজা হয়েছে, গুণে পরিপূর্ণ শুধু দুটো গুণ নেই –কিছুই জানে না আর কাউকে মানে না। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার আশেপাশে এই ধরণের লোক আছে কিনা, যাদের ওই দুটো গুণের অভাব।

একটু পড়াশোনা করুন, বোঝার চেষ্টা করুন আমাদের শাস্ত্রগুলি কি বলতে চাইছেন। যে কোন মানুষ ঈশ্বরকে ডাকতে পারে, যেখানকারই হয়ে থাকুন। পরীক্ষার সময় বাচ্চারা ভয়ে মা কালী, শিব ঠাকুর, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে –প্রভু পরীক্ষায় যেন পাশ করি। সেও সেই ঈশ্বরকেই ডাকছে, কিন্তু এই ঈশ্বর সীমিত ঈশ্বর। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই জিনিস মেনে নেওয়া যায়, কারণ এর বেশি ওরা বুঝবে না, বোঝারও তাদের দরকার নেই। কিন্তু বড় হয়েও যদি এই একই জিনিস কেউ করতে থাকে, তাহলে সে বনসাইএর মত হয়ে যাবে। বনসাই মানে, গাছের শিকড়টা কেটে প্রকৃতির নিয়মে তার স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠাকে রুদ্ধ করে খর্ব করে রাখা, যে কোন গাছের প্রতি যেটা খুব অন্যায়। আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র করে নেওয়া উচিত, আমাদের বাড়ির ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি, পাড়া-প্রতিবেশী, যাদের ভালবাসেন, স্বামী, স্ত্রী; কাউকে বনসাই হতে দেবেন না। Be free and make others free, নিজে মুক্ত হন, স্বাধীন হন; অপরকে মুক্ত করুন, স্বাধীন করুন।

কিন্তু আপনি নিজেই একটা বনসাই হয়ে বসে আছেন। কে বানিয়েছে আপনাকে বনসাই? আপনিই আপনাকে বনসাই বানিয়েছেন। নিজের শিকড় নিজেই কেটে রেখেছেন। আর বলছেন, তোমাকেও আমার মতই হতে হবে; তোমাকে শিকড় কেটে, তোমার ডালপালা কেটেছেটে তোমাকে আমি বনসাই বানাবো। একটু ভেবে দেখুন তো, আপনি আপনার কজন নিজেদের সন্তানদের বনসাই বানানোর চেষ্টা করছেন। তার মত হতে দিন; শুধু একটু গাইডেন্স দেবেন। ভাল মালিরা তাই করে, ভাল জাতের গোলাপের শিকড়ের মাটি শীতের সময় আলগা করে দেয়, যাতে শিশির পড়ে আরও ভাল বড় সাইজের প্রচুর গোলাপের কুড়ি আসে। তাই বলে শিকড়টাই কেটে দেওয়া? এটা পুরো অন্য জিনিস। ধর্মের নামে যদি শিকড় কেটে দেন, সামাজিক উত্থানের নামে যদি শিকড় কেটে দেন, শিক্ষার নামে যদি শিকড় কেটে দেন; কত বড় অন্যায় করছেন বুঝতে পারছেন না।

ঈশ্বরকে যে ডাকে, যে কোন কারণের জন্যই সে ঈশ্বরকে ডাকতে পারে। একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলে, *ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ*, ধর্মের অবিরোধী যদি কাম হয়, অর্জুন! বুঝবে সেখানে আমিই আছি। জীবের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের অবিরোধী যে কামনা-বাসনা, আমি ভগবান তার মধ্যে বিরাজমান। এই উদার ধর্ম কোথায় পাবেন? কাম যদি অবৈধ না হয়, অধর্মে যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, ভগবান সেখানে নিজে সাক্ষাৎ আছেন। ওখান থেকে আরও উপরে যখন যাওয়া হবে, সেখানে অবৈধ প্রেমটাও তিনি; পরিকীয়া প্রেম, যেটা আধ্যাত্মিকতার খুব উচ্চ অবস্থা।

সকলেই সেই ঈশ্বরকেই ডাকছে, **তাই কোন ধর্ম, কোন মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে নাই**। ঠাকুর এটাকে প্রত্যক্ষ দেখছেন, তিনি যে এই মতটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, বনসাই করছেন; তা না। ঠাকুর মুক্ত করছেন। ধানের বীজগুলিকে আগে একটা ছোট জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে বীজ থেকে ঘাসের মত চারা বেরোয়, একটু বড় হলে সেই চারাগুলোকে গোছা গোছা করে অনেকটা বড় জায়গায়তে গ্যাপে গ্যাপে রোপন করা হয়। ঠাকুর যখন এই কথাগুলো বলছেন, আমরা হলাম সেই এক টুকরো ছোট্ট জমিতে ছোট ছোট চারা; তিনি আমাদের তুলে বিশাল মুক্ত ক্ষেতে রোপন করে দিচ্ছেন –তোমরা যার যেমন প্রকৃতি, সেই অনুসারে বড় হোও। কেউ ঘাস হবে, কেউ ধান বা গম গাছ হবে, কেউ গুল্ম হবে, কেউ লতা হবে, কেউ বা বিশাল বটবৃক্ষ হবে। গামলা থেকে তুলে মুক্ত মাটিতে রোপন করে দিলেন। এতেও যদি বুঝতে না পারেন, আর কে বোঝাবে আপনাকে।

বেদে তাঁকেই বলছে, সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম; ভাগবতাদি পুরাণে তাঁকেই বলছে, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ, তন্ত্রে বলছে, সচ্চিদানন্দ শিবঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দ।

যেটা এতক্ষণ ব্যাখ্যা করা হল, সেই এক, তিনিই অনন্ত যাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় –সৎ, চিৎ, আনন্দ; তিনি আছেন, এটা হল সৎ; তিনি চৈতন্য, এটাই চিৎ আর আনন্দ, তিনি আনন্দময়। ফলে যেখানেই আপনি দেখছেন লোকে বাঁচার চেষ্টা করছে, এটা সেই সৎএর রূপ; নিম্নমানের লেখা উপন্যাস পড়ছে, নিম্নমানের টিভি সিরিয়াল দেখছে, বুঝেবন সেটাও চৈতন্যেরই রূপ, কিন্তু অশুদ্ধ বিকৃত রূপ; লারেলাপ্পা ফিল্মি গান শুনে আনন্দ পাচ্ছে, স্বল্পবসন পরে নারী নৃত্য করে আনন্দ পাচ্ছে, এও সেই আনন্দেরই রূপ; কারণ এই জগতে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু ওটাই যখন ঈশ্বরের স্তরে আসে, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। যিনি কালী তিনিই সচ্চিদানন্দ, কৃষ্ণ যিনি তিনিও সেই সচ্চিদানন্দ।

বৈষ্ণবদের নানা থাক থাক আছে। বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলে, একদল বৈষ্ণবেরা তাঁকে বলে, আলেক নিরঞ্জন। আলেক অর্থাৎ যাঁকে লক্ষ্য করা যায় না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। তারা বলে রাধা আর কৃষ্ণ আলেকের দুটি ফুট।

অলক্ষ্য, যাঁকে লক্ষ্য করা যায় না। বেদের নাসদীয় সূক্তেও বলছেন, *ন সদাসীন্ নো সদাসীৎ*, তাঁকে ইঙ্গিত করা যায় না যে, এটা সেই। জহুদিরা তাঁদের ঈশ্বরের এত সুন্দর নাম দিয়েছেন জিহোবা, কিন্তু এই শব্দের বানান কি? YHWH, উচ্চারণ করা যায় না। যাঁকে লক্ষ্য করা যায় না, তাঁকে মন জানতে পারবে না, যাঁকে মন জানতে পারবে না, তাঁকে ইঙ্গিতও করা যাবে না। কারণ, তিনি অনন্ত। দেখুন জহুদিরা কিভাবে অনন্তের পূজা করে, অথচ গলা কেটে বেড়াচ্ছে। খ্রীশ্চানরা, মুসলিমরা ক্ষমতাশালী হল, তারপর ওরা জহুদিদের উপর অত্যাচার করল। তারাও করেছে, যীশুর মত লোককে তারা ক্রুশবিদ্ধ করে দিল। অনন্তের উপাসক কি করে এত ক্রূঢ় হয়? আমার তো চিন্তা করলে মাথা ঘুরে যায়। তুমি অনন্তের উপাসক হয়ে অপরের উপর অত্যাচার কি করে করতে পারছ? অনন্তের বাইরে কিছু থাকতে পারে না। যাকে অত্যাচার করছ সেও অনন্তেরই রূপ। এগুলো হল, spiritual dishonesty। হয় তুমি আধ্যাত্মিকতা বোঝ না, না হয় তুমি জেনেশুনে বদমাইসি করছ। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা এমন এক জিনিস, ধর্ম এমন জিনিস, তুমি যদি বুঝে থাক, কোন দিন তুমি dishonesty করতে পারবে না।

বেদান্তমতে অবতার নাই, বেদান্তবাদীরা বলে রাম, কৃষ্ণ, এরা সচ্চিদানন্দ সাগরের দুটি ঢেউ। এগুলো হল খুব তর্কের ব্যাপার। আপনারা দয়া করে এই কথাগুলো কোথাও আলোচনা করতে যাবেন না। কারণ আপনাদের অধিকার নেই, আপনাদের পাত্রতা এখনও তৈরী হয়নি। বেদান্তমতে অবতার না থাকলেও অবতার সম্বন্ধে কোন কোন বেদান্তবাদীরা এমন এমন ধরণের কথা বলেন, যেগুলো আপনাদের ধারণাতেই আসবে না। যেমন আচার্য শঙ্কর যিনি বেদান্তের শিরোমণী, তিনি গীতার ভাষ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যা করছেন, তখন সেখানে বলছেন, *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ,* ভগবান অবতার রূপে যখন আসেন তখন তাঁর মধ্যে এই ছয়টি ঐশ্বর্য সব সময় বিদ্যমান থাকে –জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ। কিন্তু পরে পরে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এলো, এদের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বেদান্তীরা এমন এমন বিচিত্র সব সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বর্তমান কালে বেশির ভাগই যে অদ্বৈতীদের দেখেন, যাঁরা পঞ্চদশী, বিবেকচূড়ামণিকে নিয়ে আসেন; এগুলো কার লেখা ভগবান জানেন, তাতে যে সব অদ্বৈতের ভাব, এগুলো সব হল post Shankar।

আচার্য শঙ্করের ভাব তা নয়, আচার্য শঙ্কর হলেন ঠাকুরের ভাবের, এটাই বেদান্ত। ব্যাসদেব, আচার্য শঙ্কর ও আমাদের ঠাকুর, এই তিনজন হলেন যাঁরা ঠিক ঠিক বেদান্তকে আমাদের সামনে রাখলেন। এখন কে কোথায় কি লিখছে, কি বলছে, তাতে আমাদের আর কিছু আসে যায় না। আজ যদি তাদের বলার অধিকার থাকে, আমাদেরও বলার অধিকার আছে। এদের সাথে কি তর্ক করব? তুমি কি কিছু বোঝ, তুমি কি আচার্য শঙ্করকে পড়েছ, সাধনা করেছ? তোমাদের মনে একটা বিকার ওঠে আর একটা কিছু লিখে দাও; তোমার সঙ্গে কি কথা বলব, কিসের তর্ক করব? অন্য ধর্মেরই হোক, যে মতরই হোক, আমি তোমার সঙ্গে কি তর্ক করব? বিজ্ঞান নিজে পড়ে বুঝে নেওয়া যায়; সম্প্রদায় বিদ্যা এভাবে আসে না, সম্প্রদায় বিদ্যা গুরুমুখে শুনতে হয়, গুরুর পায়ের তলায় বসে শুনতে হয়, বই পড়ে এই বিদ্যা হয় না।

ভারতে বিবেকানন্দ বইতে স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন –যখনই নূতন কোন পথ হয়, সেই পথ দিয়ে সারা বিশ্বে ভারতের ভাব ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকানরা ইন্টারনেট আবিষ্কার করল, ইউটিউব, গুগুল আমেরিকানরা আবিষ্কার করে বাজারে ছেড়ে দিল, আজকে আমরা হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ধর্মের ভাব বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারছি। হিন্দু ধর্ম জানার জন্য কাউকে কষ্ট করে বেলুড় মঠে আসতে হচ্ছে না। আপনি বলবেন, অন্য ধর্মের লোকেরাও তো তাদের মত ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক, কিন্তু অন্য ধর্মের দোষগুলো ফেটেফুটে বেরিয়ে আসছে। মানুষের এখন বিচার ক্ষমতা, বুদ্ধি অনেক উন্নত, তাদের কাছে এখন সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

এক বই তো দুই নাই –অনন্ত মানে এটাই। এক বই তো দুই নাই –জীব নাই, জগৎ নাই, আমি নাই তুমি নাই; যা আছে তা মুখে বলা যায় না, শুধু এটুকু বলা যেতে পারে –তিনি অনন্ত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জগৎ, আমি, তুমি সবটাই তিনি, তিনি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। এই যে আমরা বহু দেখছি, এই জগৎকে দেখছি, ব্রহ্মাণ্ডকে দেখছি, আমি আমাকে দেখছি, তোমাকে দেখছি, চেয়ার, টেবিল, মাইক্রোফোন এই যা কিছু দেখছি; এটাই মায়া। তবে এটা সত্য না মিথ্যা? পুরোদমে সত্য। কিন্তু এই সত্যের পিছনে আর এক বাস্তব সত্য আছে, সব কিছু সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বরই এই কলম হয়েছেন, ঈশ্বরই এই টেবিল, মাইক্রোফোন সব কিছু হয়েছেন। এই জিনিসটাকেই বোঝাবার জন্য পুরাণ কি সুন্দর একটা কাহিনী নিয়ে এলেন।

প্রহ্লাদ তাঁর পিতা হিরণ্যকশ্যপুকে বলছেন, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান আছেন। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছেন, এই স্তম্ভের মধ্যেও কি তোমার বিষ্ণু আছেন? হ্যাঁ এই স্তম্ভেতেও তিনি আছেন। শুনেই হিরণ্যকশ্যপু সেই স্তম্ভের গায়ে তলোয়ার চালিয়ে দিল। তলোয়ার কোপ পড়তেই সেই স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহ অবতার। পুরাণের এই কাহিনীগুলোর মাধ্যমে ওনারা কি বোঝাতে চাইছেন? এটা

কি কোন জাদুবিদ্যার খেলা শেখানোর জন্য বলছেন? যে কোন জিনিস থেকে ভগবান বেরিয়ে আসবেন? না, আসলে বলতে চাইছেন, সব জায়গাতে ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া কিছু নেই।

অনেক আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি যে মহারাজের কাছে ঘটনাটা শুনেছিলাম, তখনই তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। মহারাজ বলছেন, একবার একজন খ্রীশ্চান ভদ্রলোক একজন সন্ন্যাসীকে সামনে পেয়ে বলছেন, 'এই যে আপনারা বলছেন ঈশ্বর সর্বত্র, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী; তাহলে আপনারা যখন প্রস্রাব করেন, বাহ্য যখন করেন, তখন তো ঈশ্বরই করছেন'? দেখছেন, কিভাবে জিনিসটাকে একটা নোংরা আবর্জনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সবটাই তিনি হয়, তাহলে আমি আর তুমি কোথা থেকে আসবে। এগুলোই হল কুতর্ক। মহারাজ খুব বুদ্ধিমান, তিনি বললেন, 'আমরা আগে ওখানে একট ক্রুশ বানিয়ে দিই'। নাও উত্তর, এবার মারামারি কর। যেমনটি তোমার প্রশ্ন, তেমনটি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।

একবার এক খ্রীশ্চান ফাদার খুব বড় গলায় বলছেন, 'দেখো, আমাদের যীশু মানুষের মঙ্গলের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে গেলেন, আর তোমাদের কৃষ্ণ মেয়েদের নিয়ে নাচানাচি করতে থাকল'। তার উত্তরে অন্যজন বলছেন, 'যার যেমন কপাল'। যেমনটি কথা বলবে, তেমনটিই শুনতে হবে। যেমনটি বলবে, উত্তর তেমনটি পাবে, খুব সাবধান। তাও কিন্তু শিখবে না। হাতে টাকা আছে, বন্দুক আছে। আল্ কাপনি এক সময় শিকাগোর খুব নামকরা ক্রিমিনাল ছিল। কারুর কাছে কিছু চাইতে গেলে হাতে বন্দুক রেখে বলত –প্লীজ্ দিয়ে দিন। মানুষ কি করবে, মানুষ বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যান। কিভাবে নিল, প্লীজ্ দিয়ে দিন, বললাম। অন্য দিকে হাতে বন্দুক। এই বাবুদের হাতে সোনাও আছে, বন্দুকও আছে, গান্ এণ্ড গোল্ড বোথ্। মানুষ কি করবে, ভয়ের চোটে বলে দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

যে যা বলে, যদি আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর কাছে নিশ্চয় পঁহুছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল। অর্থ এখানে স্পষ্ট। এর আগেও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তদের এই সকল কথা বলিতেছিলেন। ঈশ্বর ঈশ্বর করতে করতে ঠাকুর একেবারে ভাবে বিভোর হয়ে আছেন, ঈশ্বরের ভাবে একেবারে ডুবে গেছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর একটু একটু করে প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন। **এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ও বলিতেছেন, "তুমি বলরামের বাপ"? দেখছেন মন কোথায়**।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন, বলরামের বৃদ্ধ পিতা নিঃশব্দে হরিনামের মালা জপ করিতেছেন। ঠাকুরের দুরবস্থা দেখছেন? তাও ঠাকুর ভাল কিছু ভক্ত পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের যে আরও কি দুরবস্থা হয়েছিল কল্পনা করা যায় না। এটা ধর্মের কেমন একটা আছে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মে। যত পাগল, ছাগল সব এখানে এসে ঘুরঘুর করতে থাকে। কেউ যখন আমাদের কাছে দেখা করতে আসে, প্রথমে ভাল করে দেখি মাথা ঠিক আছে কিনা। কারণ আমাদের কাছে যখন এসেছে, তখন মাথায় কিছু গোলমাল থাকতেই হবে। কারণ সেই দিন চলে গেছে যখন সব স্বাভাবিক লোক ধর্ম পালন করত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) –আচ্ছা, এরা এত জপ করে, এত তীর্থ করেছে, তবু এরকম কেন? যেন আঠার মাসে এক বৎসর। বলরামের বাবা নির্বিকার, এসব কথায় তাঁর কিছু আসে যায় না।

করোনার সময় ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক রকম বিতর্ক হয়েছিল। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনিও সেই সময় ভ্যাকসিন নিতে গেছেন। নার্স ইঞ্জকেশান পুশ করতে এসেছেন। তিনি নার্সকে জিজ্ঞেস করছেন, 'এই সরু ছুঁচে আমাকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে তো'? নার্স ঘাবড়ে গিয়ে বলছেন, 'কেন স্যার? এই ছুঁচ দিয়েই তো সবাইকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়'। 'না, লোকেরা বলে, রাজনীতি যারা

করে তাদের চামড়া নাকি মোটা হয়’। সবাই হেসে ফেলেছে, হাসার জন্য মনটা হাল্কা হয়ে গেল। তারপর ইঞ্জেকশান পুশ করা হল। আমাকে সেদিন একজন বলছেন, ‘আপনি সোস্যাল মিডিয়াতে আছেন, আপনাকে একটু মোটা চামড়ার হতে হবে, কেননা লোকেরা অনেক গালাগাল, উল্টোপাল্টা মন্তব্য করবে’। আমি বললাম, ‘না ভাই, বিনয় দেখানোর গুণ আমার মধ্যে নেই। আমার যাই গুণ থাকুক, বিনয়ী আমি নই। আমি বেশ কিছু উত্তর তৈরী করে রেখেছি, জায়গা বুঝে উত্তর দিয়ে দিই; আর নোংরা ভাষার কিছু থাকলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দিই’। ধর্মের অর্থে বলরাম বসুর বাবার মোটা চামড়া। আপনি যতই ধর্মসমণ্বয়ের কথা বলে যান বা যাই বলে যান, আমি পাল্টাবো না।

হরিশকে বললুম, কাশী যাওয়ার কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে, এখানেই কাশী।

তাহলে কি তীর্থাদি করা বন্ধ করে দিতে হবে? ঠাকুর নিজেও তো তীর্থে গিয়েছিলেন। ধর্মবুদ্ধি দুটো স্তরে চলে –ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা। যাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ধর্মলাভ করা তাঁরা এইগুলো করবেন। ধর্ম বলতে আমরা ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতা দুটোকে মিলিয়ে ধর্ম বলি; আসলে দুটো আলাদা শব্দ। যেমন উপনিষদ আর বেদ, বেদ পুরোটাই ধর্ম, অন্য দিকে উপনিষদ একেবারে কোর স্পিরিচুয়ালিটি। অনেকবার এর উপর আমরা আলোচনা করেছি, এখানে আর করছি না। আচার্য শঙ্কর বেদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *ধর্মার্থ লভতে*। বেদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, এই ঈশ্বরলাভ উপনিষদের মাধ্যমে হয়। ঠাকুরের কথামৃত কি? শুদ্ধ উপনিষদের কথা। কিন্তু সাধারণ ধর্ম মানে, আমাকে কি কি করতে হবে, একাদশী পালন কিভাবে করতে হবে, তীর্থে গিয়ে কিভাবে থাকতে হবে; এগুলো হল ধর্ম। এর উপদেশ অন্যরা দেবেন। ঠাকুর জ্ঞান-ভক্তি শেখাতে এসেছেন। ঠাকুরকে যদিও ধর্মমূর্তি বলা হয়, কিন্তু এটা আধ্যাত্মিকতার অর্থেই বলা হয়। এখানে ঠাকুর কাশী যাওয়ার ব্যাপারে যে কথা বলছেন, তিনি তাঁর বিশেষ কয়েকজন শিষ্যকে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলছেন।

এত তীর্থ, এত জপ করে, হয় না কেন? ব্যাকুলতা নেই। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন।

মনে রাখবেন, ব্যাকুলতা আনার জন্যই এই তীর্থ, জপ এগুলো করা হয়। ভাব আনার জন্যও করা হয়, আবার পূণ্য অর্জনের জন্যও করা হয়। কিন্তু এখানে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন, তুমি নিজেকে দেখাচ্ছ যে তুমি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত, কিন্তু তাও হচ্ছে না কেন? কারণ তোমার ভিতর ব্যাকুলতা নেই। ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন –

যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে; তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন, আর বলেন, ধবলী রও! ধবলী রও!

একটু বিচার করে দেখুন, জীবনে আপনি কি চাইছেন? আপনি অর্থ চান, কাম চান, ধর্ম চান। ঈশ্বরলাভ পুরো অন্য জিনিস, এটা সবার জন্য নয়। কথামৃত মোক্ষশাস্ত্র, মায়ের কথা মোক্ষশাস্ত্র; আর সেখানে আপনারা বলছেন, অমুক মহারাজ কি সুন্দর মায়ের কথা পাঠ করেন; আপনারা এটাকে পুরো এন্টারটেইনমেন্টে নামিয়ে দিচ্ছেন; মোক্ষশাস্ত্রকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। কাঁচা লোকের হাতে এইভাবেই ধর্মের দুর্দশা হয়। ঈশপের গল্প আপনারা পড়ে থাকবেন। এক কৃপণ বৃদ্ধা ভেড়ার লোম কেটে বিক্রী করত। কাঁচি দিয়ে ভেড়াল লোম কাটছে আর এত নিচে দিয়ে কাটছে যে, ভেড়া রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। বছরে একবার কেটে উল বিক্রী করবে কিনা। ভেড়া তখন বৃদ্ধাকে বলছে, ‘আমার উল যদি কাটতে হয় তাহলে উলের কারখানায় নিয়ে চল, ওরা ঠিক ভাবে কেটে দেবে, আমাকে রক্তারক্তি হতে হবে না। আর

আমার মাংস যদি চাও তাহলে কশাইয়ের কাছে নিয়ে চল, এক কোপেই শেষ করে দেবে। এভাবে আমাকে যন্ত্রণা দিও না’। হিন্দু ধর্ম ওই ভেড়া পালিকা কৃপণ বৃদ্ধার হাতে পড়ে রক্তারক্ত হয়ে নিজের উল দিচ্ছে; এছাড়া আর কিছু না। আপনারা জ্ঞানী ভক্ত, পূজ্য; নিজেকে পাল্টান আর অপরকেও পাল্টাতে সাহায্য করুন। এরপর অন্য একদিনের বর্ণনা দেওয়ার জন্য মাস্টারমশাই আমাদের পরের পরিচ্ছদে নিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা –১৮৮৩

(রাখাল, বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাস্টার, মণি মল্লিক, ঈশান কিশোরী গুপ্ত প্রভৃতি সঙ্গে)

আজ মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৩ (পৃঃ ২৯০)। **বলরামের পিতা মহাশয় ও অন্যান্য ভক্ত উপস্থিত আছেন। বলরামের পিতা পরম বৈষ্ণব, হাতে হরিনামের মালা সর্বদা জপ করেন**।

আজকের প্রসঙ্গগুলি খুব গভীর। আপনাদের মনে হবে আজকের প্রসঙ্গ কতটা আপনাদের জন্য দরকার, বা মনে হতে পারে আপনাদের আদপে শোনার দরকার আছে কিনা। একটা হল, ঈশ্বর কেমন, ঈশ্বরদর্শন কত প্রকার হয়? কিন্তু যাঁদের ধর্মে রুচি আছে, আধ্যাত্মিক ভাবে রুচি আছে, যাঁরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে বুঝতে চাইছেন, তাঁদের জন্য আজকের প্রসঙ্গ খুবই জরুরী। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান খুব নামকরা বিষয়, যদিও বেশির ভাগ খ্রীশ্চানরাই এই বিষয়ের উপর লেখালেখি করছেন। আসলে হিন্দু ধর্ম খুব ভালভাবে না জানা থাকলে, আর ঠাকুরের কথামৃত না জানা থাকলে, ধর্মকে বোঝা একটু মুশকিল হয়। দ্বিতীয় উপায় হল, পুরো বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, পুরাণ মোটামুটি এই কটি গ্রন্থ, পারলে মনুস্মৃতি পড়া থাকলে তখন গিয়ে হিন্দু ধর্মের একটা ছবি পাওয়া যাবে। সহজ উপায় হল কথামৃত। কথামৃত যদি নিয়মিত পড়েন আর কেউ যদি পুরোটা ব্যাখ্যা করে দেন, তাহলেও হিন্দু ধর্মের একটা পরিষ্কার ছবি আপনারা পেয়ে যাবেন।

আমার এক পুরনো পরিচিত ব্যক্তি, তিনি ভাবা এটোমিক রিসার্চের ডিরেক্টর ছিলেন, একজন বড় বৈজ্ঞানিক, মহারাষ্ট্রের লোক, এখন শেষ বয়সে ধর্মভাব নিয়ে বাণপ্রস্থির মত আছেন। কিছু দিন আগে আমাকে বলছিলেন, ‘সবাই কথামৃত কথামৃত করে, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি কথামৃত বোঝা খুব কঠিন, অতি সূক্ষ্ম’। ঠিকই বলছেন। কারণ হিন্দু ধর্মের যে বিভিন্ন দিক, সবটাই কথামৃতে ভরা। আমি কোন ভাবাবেগ নিয়ে বলছি না, এমনিও আমার ভাবাবেগ একটু কম, সাংসারিক ব্যাপারে যদিও একটু থাকতে পারে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শূন্য। ভগবান ছাড়া হিন্দু ধর্মের সম্পূর্ণ দিককে নিয়ে আসা কারুর পক্ষে সম্ভব না। যার জন্য গীতা, আর গীতার পরে কথামৃত, এই দুটি বই ঠিক ঠিক হিন্দু ভাবকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ইংরাজীতে আমার বই ‘আরোহণ’, যেখানে গীতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেখানে দেখবেন কিভাবে হিন্দু ভাবকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই কারণেই ঠাকুরের কথামৃত বোঝা একটু কঠিন হয়ে যায়। আপনি প্রত্যেক দিন লাল শালু দিয়ে মোড়া গীতাটা খুলে পাঠ করছেন, খুব ভাল; এর থেকে ভাল নিষ্ঠা আর কি হতে পারে। কিন্তু যদি ওর মধ্যে ডুব দিতে চান, তাহলে আপনার জন্য একজন ভাল আচার্য দরকার।

আগের পরিচ্ছেদে আমরা দেখলাম, ঠাকুর কথা বলে যাচ্ছেন আর বলরামের পিতা জপ করে যাচ্ছেন। আজও দক্ষিণেশ্বরে বলরামের পিতা এসেছেন। মাস্টারমশাই ইংরাজী পড়া লোক, ধর্মের নামে গোঁড়ামি তাঁর পছন্দের ছিল না। আপনাদেরও অনেকের এই ধরণের গোঁড়ামি কোন মতেই পছন্দের নয়। মাস্টারমশাই যথারীতি বলছেন, **গোঁড়া বৈষ্ণবরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের তত পছন্দ করেন না**। বর্তমান কালেও বৈষ্ণবদের এই রোগটা আছে। **বলরামের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার ওই সকল বৈষ্ণবের ন্যায় ভাব নাই**। পুরো ওই ভাব থাকলে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতেই আসতেন না, কথাও বলতেন না। কিন্তু গোঁড়া ভাব একটু ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যাদের উদার ভাব তারা সব দেবতাকে মানে –কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি।

এটাই inclusiveness। অনেকবার এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিস্তারে আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। ঈশ্বর মানেই বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ ও আনন্দ; সচ্চিদানন্দ। তিনিই আছে, তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য, তিনি আনন্দস্বরূপ। জগতের সুখ পেয়ে যে আনন্দ হয়, এটা সেই আনন্দ না, বিশুদ্ধ আনন্দ। এই পদার্থের জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, সেখানে কোন পদার্থে এ-রকম আনন্দ হতে পারে না। সেইজন্য তিনি অনন্ত। অনন্ত মানেই অনন্ত, সমুদ্রের মত বিশাল আকার, আকাশের মত বিশাল; তা না। সমুদ্র, আকাশ, হিমালয় এরা সবাই বিশাল, কিন্তু সীমিত। আমাদের মনটাও সীমিত, এই সীমিত মন দিয়ে যখন অসীমকে দেখবেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সেই অসীমকেও সীমিত দেখাবে। অসীমকে জানার জন্য আমাদের অসীমের সাথে এক হতে হবে। একটা খুব সুন্দর গান আছে –সীমাকে বিচ্ কৌন্ অসীম দেবতা আয়া। অবতার হলেন সীমার মধ্যে অসীম দেশের অতিথি। সেইজন্য কি হয়, আমরা কক্ষণ বলতে পারব না যে, ঈশ্বর মানে এই। বিভিন্ন ধর্মে বলে আমার ঈশ্বর গড্, আমার ঈশ্বর জহোবা ইত্যাদি; তাঁরা জানেন না যে, কিভাবে অজান্তায় নিজের ভগবানকে তাঁরা সীমিত করে দিচ্ছেন।

খুব মজার কথা, আমি সহজ করে বলছি। আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, তাঁদের অনেকেই বাবা, অনেকেই মা। আপনারা যখন নিজের সন্তানকে নিয়ে ভাবেন, নিজের সন্তানকে নিয়ে বলেন, তখন সবাই নিজের সন্তানকে বড় করে বলেন। যদি বলেন যে, আমার ছেলে তেমন কিছু না, ভিতরে ভিতরে কিন্তু এই ভাবটা চাপা আছে –আমার ছেলের মত অন্য কারুর ছেলে নয়। আপনজনকে সবাই বড় করে দেখে। অজান্তায় আমরা আমাদের ঈশ্বরকে ঠিক এইভাবে ছোট করে দিচ্ছি। বর্তমান কালে কিছু আছে যারা বলে, আমার যীশু খ্রীষ্টই আসল, কেউ হরিবোল হরিবোল করে বলবে কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান। জানতে পারছে না, বুঝতেও পারছে না যে, এরা নিজেদের ইষ্টকে ছোট করে দিচ্ছে। আসলে বোঝার ক্ষমতাটাই নেই। এরা কেউ কথামৃত অধ্যয়ন করেনি।

কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, পুরো কথামৃতে কি আছে একটি কথায় বলুন? তখন এটা বলতে যাবেন না যে, সব ধর্মই সত্য। বলবেন, একটা জিনিস বুঝেছি, ঈশ্বর অনন্ত; অনন্ত মানে অনন্ত। এই একটি কথা থেকেই পুরো কথামৃত বেরিয়ে আসবে, বেদবেদান্ত বেরিয়ে আসবে, গীতা বেরিয়ে আসবে। আপনি বলবেন, আমরা তো শুনেছি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। সেটাও এই একটি কথা থেকে বেরিয়ে আসবে। সমস্ত ধর্মের সার, সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সার, সমস্ত অবতারের কথার সার, সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার সার –ঈশ্বর অনন্ত। এবার এটাকে আপনি ব্যাখ্যা করতে থাকুন। সমস্ত বেদ, উপনিষদে যা পড়েছেন, গীতাতে যা পড়েছেন; তার সমস্ত কথা এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ অনন্তের অবধারণা করতে পারে না।

আপনি বলবেন যে, কথামৃতে নূতন কিছু কি আছে, মানে এই কথা কি আগে কোথাও বলা হয়নি? বেদে, উপনিষদে, গীতায় এই কথা হাজারবার বলা হয়েছে? তাহলে ঠাকুরের কি দরকার? ঠাকুরকে এই জন্য দরকার, এই যে ব্রহ্মবিদ্যা, এই যে ঈশ্বর অনন্ত; কালের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এর মর্মকে ভুলে যায়, তত্ত্বকে ভুলে যায়; ভুলে গিয়ে শব্দ মাত্র বানিয়ে দেয়। ভগবান অবতার হয়ে এসে নূতন করে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির শিক্ষা দিয়ে পুনরায় এই সত্যকে প্রাণবন্ত করে দেন। বেদান্তে যে মহাবাক্যগুলি আছে, অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি, খুব প্রচলিত কথা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; কিছুরই দরকার নেই। পজিটিভ দিক থেকে যান, ঈশ্বর অনন্ত; আর কোন কিছুর দরকার নেই। যত ধর্মগুরু হয়েছেন, যত আচার্য হয়েছেন সবারই কথা একটি কথাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় –ঈশ্বর অনন্ত। আমরা জানি আমরা সীমিত, আমাদের মন সীমিত, স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরের নানা রূপ হবে, হতে বাধ্য। ঈশ্বর অনন্ত, সেইজন্য এক বই দুই হতে পারে না। এটা গণিতের অনন্ত নয়, এটা পদার্থবিজ্ঞানের অনন্ত নয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আধ্যাত্মিক সত্য, ফলে দুই হতে পারে না।

ঈশ্বর অনন্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক এই জিনিসটা বুঝেছেন, এনারা হলেন উদার ভাবের। আমরা যে অর্থে উদার বলি, তাঁর হৃদয় উদার, সেই অর্থে না। উদার ভাব হল, বেদের ভাব। এই একটি কথা যদি আপনারা ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন, তাহলে কাগজ কলম নিয়ে লিখুন, ঈশ্বর অনন্ত; এরপর আপনার নিজের ব্যাখ্যা লিখুন, আপনি কি ভাবছেন, আপনার মনে কি কি চিন্তা আসছে। অনেকবার আমি বলেছি, শুধু শুনে গেলে হয় না, ওটা কিছু না, বর্ষার জলের মত নামল আর নালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। চাষের জন্য ক্ষেতে, মাছ চাষের জন্য পুকুরে জল ধরে রাখতে হয়। ধরে রাখতে হলে, আপনাকে লেখালেখি করতে হবে, লেখালেখি করে ওটাকে আপনার নিজের করে নিতে হবে। আজকে যেমন বলা হল ঈশ্বর অনন্ত। এর উপর আপনি এতদিন এখানে কি কি শুনেছেন, ঈশ্বর অনন্ত হলে কি কি হয়; এটাকে যদি লিখতে থাকেন তাহলে পুরো জিনিসটা বুঝতে পারবেন। না লিখলে শুধু পড়লে বা শুনলে বিষয়টা আপনার নিজের হবে না। বেশির ভাগ ছাত্রদের আমরা শেখাই না, কিন্তু সত্য হল, যতক্ষণ না লিখে পড়া হয়, ছাত্ররা বিষয়টাকে ঠিক ভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। বলরামের পিতা তখন বলছেন –

বলরামের পিতা –হ্যাঁ, যেমন এক স্বামী ভিন্ন পোষাক।

উপমাটা কতটা ঠিক আমার সন্দেহ আছে। চলচ্চিত্রে বা নাটকে যখনই একজনকে নিয়ে বেশি ফোকাস করা হয়, তখন আপনি ধরে নিচ্ছেন একজন অভিনেতা বিভিন্ন ভূমিকায় আসছেন। তখনই কিন্তু হয়ে যাবে কৃষ্ণ সত্য, যে কথা সম্প্রদায় বিশেষরা বলে থাকে। এটা তা নয়। অনন্ত কি রূপ ধারণ করবেন, কি রূপে তিনি আমাদের কাছে আসবেন, আমরা কেউ বলতে পারব না, সম্ভব না। শুধু রাম বা কৃষ্ণ নয়, যে কোন অবতারের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ভিন্ন পোষাক নয়। এখানে আমি ঠিক এক মত নই। ঠাকুরও এখানে হ্যাঁ না কিছুই না বলে নিজের মত এগিয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কিন্তু নিষ্ঠাভক্তি একটি আছে। এই শুরু হল, আমরা ধর্মকে যেভাবে বুঝি, তার ব্যাখ্যা। ঈশ্বর অনন্ত, স্বাভাবিক ভাবে রূপ অনন্ত। কত রূপ হতে পারে? যত মন তত রূপ। বেদ যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন বা আমাদের বেদের ক্লাশগুলো যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা দেখবেন সেখানে ঈশ্বরের কত রূপ, কত ভাব। বেদে কত রূপে আর কত ভাবে যে ঈশ্বরকে দেখা হয়েছে; এমন কোন সম্পর্ক নেই, যেটা দিয়ে ভগবানকে দেখা হয়নি। কাকে ভালবাসবো? আমার যাঁকে ভাল লাগে। গানে আছে, তুমি ব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণ; শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি ব্যক্তি রাম, ব্যক্তি কৃষ্ণ ওই অর্থে নয়। তিনি সেই সচ্চিদানন্দ, তিনি তাঁর মায়া-শক্তি দিয়ে কখন এই রূপে, কখন এই ভাব নিয়ে আসছেন। এই সচ্চিদানন্দ কোন ব্যক্তি নন, তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য। জীব আর শিবের মধ্যে এটাই তফাৎ -শিব বিশুদ্ধ চৈতন্য, আর আমরা হলাম মলিন-চৈতন্য। আমাদের উপর উপাধির পর উপাধি চাপানো, ওনার উপর যে উপাধি, সেটা তিনি নিজের উপর একটা আবরণ নিয়ে নিচ্ছেন।

নিষ্ঠা ভক্তি যদি না থাকে? পাঞ্জাবের ওদিকে একটা খুব প্রচলিত কথা মুখে মুখে চলে –সব কা মালিক এক। রাস্তাঘাটে অনেক জায়গায় এই লেখা দেখতে পাওয়া যাবে। ওরা এক বলতে নিজের ভগবানকে বলবে, কথায় কথায় বলবে। নিষ্ঠা ভক্তি হল –হ্যাঁ, অবশ্যই শ্রীরাম আছেন, শ্রীকৃষ্ণ আছেন। ঠিকই, কিন্তু সব সচ্চিদানন্দরই রূপ। কিন্তু আমার ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্যস্, হয়ে গেল। একজন স্ত্রী নিজের স্বামীকে ভালবাসে; তাই বলে কি বাড়ির অন্য সদস্যদের পছন্দ করে না? তার পাড়ার বা গ্রামের লোকেদের পছন্দ করে না? সবাইকেই পছন্দ করে, সবার সাথেই জুড়ে আছে। এই নিষ্ঠা ভক্তিই আবার কখন যে গোঁড়ামিতে পাল্টে যায়, অন্যান্য ধর্মকে দেখলে বোঝা যায়।

আমাদের অনেকে কমেন্টে লেখেন, হিন্দু ধর্মের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে; কি করবে হিন্দুরা বলুন। আমরা তো অন্যদের সাথে ফ্রডগিরি করতে পারিনা। ধর্মের দিক থেকে আমরা জানি, সমস্ত ধর্মই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ। আমরা তো বলতে পারিনা, যারা হিন্দু ধর্মের নও, তারা ট্যাক্স দাও।

আমরা তো বলতে পারিনা, যারা হিন্দু নন, তাদের গলা কেটে দেব। আপনি যদি জহুদিদের ইতিহাস পড়েন, খ্রীশ্চানদের ইতিহাস পড়েন, রক্ত হিম হয়ে যাবে, কি নৃশংস খুনোখুনি। হিন্দুরা ধর্মের নামে কখন এ-রকম করেনিন। কি করে করবেন? ছোটবেলা থেকে আমরা এই সত্যকে জেনেছি যে, আমার ইষ্ট যেমন ঈশ্বরের রূপ, তেমনি অন্য কারুর ইষ্ট যিনি তিনিও সেই ঈশ্বরেরই রূপ। তিনি আমার ইষ্ট না হতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই ঈশ্বরেরই একটি রূপ। ফলে এর জন্য আমরা কারুর গলা কাটতে পারিনা। আর আমাদের কাছে এটা সামাজিক সমস্যা, ধর্মের সমস্যা না।

সামাজিক সমস্যা হলে, আমাদের উপর অত্যাচার হলে, তখন আমাদের বলতে হবে, আমাদের রক্ষা নিজেদেরকেই করতে হবে, নিজেকেই প্রতিরক্ষা করতে হয়, সেটাই হিন্দুরা চেষ্টা করে যায়। কিন্তু শুধু যদি প্রতিরক্ষা করেন, তাতে আপনার দল ভারি তো হবে না। দল ভারি করার জন্য ধরে নিয়ে আসতে হয়। হিন্দুরা এটা করতে পারে না বলে, সমস্যা খুব জটিল হয়ে যায়। আমি তো ওই লাইনের লোক নই যে, সামাজিক আর এই জিনিসগুলিকে নিয়ে শিক্ষা দেব। তাও অনেকে করছেন, তারা জানেন কিভাবে কি করতে হবে। আমি শুধু একটাই কথা জানি, হিন্দু ধর্ম হল science of spirituality, encyclopedia of spirituality, super store of spirituality, ocean of spirituality, যে বিশেষণই আপনি লাগিয়ে নিন। অন্যকে তো আমি এখানে আনতে পারব না, কিন্তু এখানকার যাঁরা আছেন, তাঁদের যে জ্ঞান, তাঁদের যে বোঝাবুঝি, সেটাকে পরিষ্কার করে দিতে পারি। আমার কথা দিয়ে না, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে।

তোমার পূর্বপুরুষরা, সেই ঋষিরা, তোমার জন্য এই জ্ঞানের ভাণ্ডার রেখে গেছেন। রিলে রেসে যেমন একজন একটা ব্যাটন নিয়ে দৌড়ায়, কিছু দূর গিয়ে সে আর-একজনের হাতে ওই ব্যাটনটা তুলে দেয়; আমি সেই দণ্ডবাহক। আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, এবার আপনাদের দায়ীত্ব এই দণ্ডবহন করার। হিন্দুরা এটাতেই শক্তি পান। যার যেমন বোঝার সে তেমন বুঝবে, শিখবে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়। যার নিজের জীবনকে ধন্য করার, সে ধন্য করে দেবে। যার জীবনকে সমৃদ্ধ করার, সে সমৃদ্ধ করে দেবে। জল সব সময় গোড়ায় দিতে হয়। অন্যরা অন্য রকম করছেন, হিন্দু ধর্ম গোঁড়ামির অনুমতি দেয় না। নিষ্ঠা একটা জিনিস, গোঁড়ামি একটা আলাদা জিনিস। ঠাকুর এরপর খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন।

গোপীরা যখন মথুরায় গিয়েছিল তখন পাগড়ি-বাঁধা কৃষ্ণকে দেখে ঘোমটা দিল, আর বললে, ইনি আবার কে, আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায়? যদিও ভাগবতে এই ধরণের কোন ঘটনার বর্ণনা নেই। তবে কি জানেন, আমাদের হিন্দু গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল, লোকসাহিত্যে শাস্ত্রের কাহিনীগুলো ঢুকে গিয়ে ওর মধ্যে অনেক কিছু সংযোজন হয়ে যায়। আমাদের ঠাকুরের কথাগুলো এখনও লোকসাহিত্যে প্রবেশ করেনি। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, মায়ের কথার বর্ণনাগুলো স্পষ্ট ভাবে এসেছে কিনা, তাই এখনও ঠাকুরের লীলাখেলাগুলিকে নিয়ে পৌরাণিক কাহিনী শুরু হয়নি। আমি যখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম, তখন কলকাতা থেকে একজন খুব গুণী ব্যাক্তি কিছু দিনের জন্য ওখানে এসেছিলেন। ওনাকে আমি বলেছিলাম, 'আপনি যদি স্বামীজীর বাল্যাবস্থা নিয়ে একটা চিত্রলেখা করেন'। তিনি লিখলেন, আর এত সুন্দর উনি চিত্রাঙ্কন করেছিলেন যে কল্পনাতীত। বাঙালীদের ক্রিয়েটিভিটি অতুলনীয়। ক্রিয়েটিভিটি যদি দেখতে হয়, আর্ট হোক, সাহিত্য হোক, কবিতা হোক, মিউজিক হোক, বাঙালীদের কাছে আসতে হবে। ভদ্রলোক স্বামীজীর ছোটবেলার খুব সুন্দর একটা স্ক্রীপ্ট দাঁড় করালেন। তখন আমার মনে হয়েছিল, ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে এইভাবে যখন শুরু হবে, তখন ঠাকুর, মা, স্বামীজী আপামর জনগণের মধ্যে ঢুকবেন। এখনও সাধারণ জনগণের মধ্যে ঢোকার সময় আসেনি, এর জন্য অন্ততঃ তিনশ-চারশ বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যাই হোক, এই গল্পগুলো প্রচলিত গল্প, ভাগবতে এই কাহিনী নেই।

এখানে গোপীরা বলছেন, আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায়? অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, গোপীরা বলছেন, এনার দিকে তাকিয়ে আমরা কি দ্বিচারিণী হয়ে যাব? গোপীরা ভালবেসেছেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে, নিষ্ঠা বৃন্দাবনের সেই কৃষ্ণের প্রতি।

হনুমানেরও নিষ্ঠাভক্তি। দ্বাপর যুগে দ্বারকায় যখন আসেন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, হনুমান রাম রূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই রামরূপ ধরে বসলেন। এটা শুধু পোষাক পাল্টানোর মত নয়, জিনিসটা পুরো অন্য জিনিস। এরপর ঠাকুর ঈশ্বরদর্শন কত রকম হয় বলছেন। তার আগে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলতে হয়।

একটু আগে আমরা বললাম, ঈশ্বর অনন্ত; এটাই একমাত্র সত্য। বেদ, বেদান্তে আমাদের ঋষিরা, আচার্যরা এই কথা বলেছেন; ঠিক আছে মেনে নিলাম এটা সত্য। কিন্তু তার সাথে মনের যে জগৎ, এটাও তো সত্য। যে জগৎ আমি সামনে দেখছি, স্থুল জগৎ; স্থুল জগৎটাও মনের জগৎ। মনের জগৎ এক সঙ্গে অনন্ত আবার সীমিত। এটাই সংসার। দেববাণীতে স্বামীজী বলছেন, দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলে। আমি পারব, আর আমি পারছি না; এই দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলে। বন্ধন আর মুক্তির ভাব এক সঙ্গে চলে। কারণ এটা আমাদের স্বভাবেই আছে। শুদ্ধ চৈতন্য রূপে আমি মনে করি, আমি যা খুশি আমি পারব। কিন্তু জড় রূপে আমি পারছি না। আমাদের আসল প্রকৃতি সব সময় বলছে, আমি স্বাধীন, আমি যা খুশি করতে পারি। কিন্তু জড়ের যে আবরণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যে আবরণ রয়েছে; সেটা আটকে দিচ্ছে, তুমি করো না। আমরা সিনেমা দেখি, নাটক দেখি, দেখে কত মজা পাই; এগুলো না দেখে নিজের জীবনকে একবার দেখুন, এর থেকে মজা আর কিসে পাবেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, fact is stranger than friction, জীবনে যেটা দেখি সত্য, সেই সত্যই কল্পনায় গিয়ে ছাপিয়ে যায়।

একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। অনেকেই হ্যারি পটার বই পড়ে থাকবেন। আমি পুরো সাতটা খণ্ডই পড়েছি। আমি যখন পড়ছিলাম, তখন ভাবছিলাম, হ্যারি পটারের বই পড়ে বাচ্চারা কি রকম লাফাচ্ছে। কিন্তু হ্যারি পটারের পুরো বইটা কিসের উপর লেখা? সবটাই অলৌকিক শক্তির উপর লেখা, যার মধ্যে শুভ শক্তি আছে, অশুভ শক্তিও আছে। সেখানে বিভিন্ন প্রানীকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু মূল্যবোধ, যেমন মায়ের ভালবাসা আর বাকিটা সাহিত্যিকের কল্পনা। আপনারা হ্যারি পটারের এটা ভেবে দেখেছেন? যেটা উনি কল্পনা করে একটা ম্যাজিকাল ওয়ার্ল্ড দাঁড় করালেন, আমাদের এখানে যে যোগশক্তি, যোগীরা যেটা অনুভব করেন, যেটা চিরন্তন সত্য, সেটাকেই লেখক হ্যারি পটারে দেখাচ্ছেন। আমি যে ক্রতু বইটা লিখলাম, সেখানেও এটাই দেখালাম, কিন্তু এগুলো সত্য, ক্রতু কোন কল্পনার বই না। শুধু তফাৎ হল, ক্রতু তার সমস্ত জন্মকে মনে রেখেছে, সব জীবনকে মনে রেখেছে, আমরা মনে রাখিনি। যত বড় লেখক হন, সে পুরাণের লেখক হন, মহাভারতের লেখক হন; আমার আপনার যে বাস্তবিক কাহিনী, তার ধারে কাছে এরা দাঁড়াতে পারবে না। কত জন্মে কত জীবন-যাপন করেছি আমরা, কত যোনিতে ভ্রমণ করেছি, কত রকমের মাতৃস্তন্য পান করেছি; কত রকমের আমাদের অনুভূতি। কি বর্ণনা করবেন? কারণ একদিকে আমরা সাক্ষাৎ অমৃতের সন্তান, শুদ্ধ আত্মা; আবার প্রকৃতির আবরণ দিয়ে আবৃত। তখন ঋষিরা আমাদের অমৃতের সন্তান সম্বোধন করে বললেন –*শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা*। এখন যখন সীমিত মন, সীমিত ভাব দিয়ে সেই অনন্তকে দেখছেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরদর্শন এক রকম হতে পারে না।

ঠাকুর এখানে তিন স্তরে বলছেন। ঈশ্বরজ্ঞান তিন প্রকার –প্রথম হল, যেটা আমরা স্বাভাবিক মনে করি, ভগবান উপরে আছেন তিনি দেখছেন, আর ঈশ্বর স্রষ্টা। গীতার নবম অধ্যায়ের প্রথমের দিকে ঠিক এই বর্ণনাটাই আছে। কি আশ্চর্য, বেদ এটাই বলছেন, গীতাও এই কথা বলছেন, ঠাকুরও একই কথা বলছেন। তবে এখানে জোরের ব্যাপার আসছে, ঠাকুর নিজের অনুভব থেকে বলছেন। তিনি

এটাকে প্রত্যক্ষ করছেন, আর বেদের কথাকে, গীতার কথাকে সত্য প্রমাণিত করছেন। আমাদের একটা খুব ভুল ধারণা যে, ঠাকুরের কথা বেদের সাথে মেলে না; এখানে তিনি চেক পাশ করাচ্ছেন; এটাই সত্য, এর বাইরে যা আছে, বাদ। প্রথম হল, ঈশ্বর স্রষ্টা। দ্বিতীয় বেদে হিরণ্যগর্ভসূক্ত আছে, সেখানে বলছেন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। মাণ্ডুক্যকারিকার ব্যাখ্যাতেও এই কথা বলছেন, তিনিই সব হয়েছেন, আত্মাই সব হয়েছেন।

তৃতীয় অবস্থায় স্রষ্টা, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন; এই কথার পর যা কিছু বলা হল, এসব আর কোন কিছুই থাকে না। কারণ এই অবস্থায় মন নেই; মনের লয় হয়ে গেছে। সব বোধ আর থাকবে না। কুম্ভকাররা মাটি থেকে পাত্র তৈয়ার করছে, মাটি থেকে পাত্র, আমরা মাটির ঘটি, বাটি ইত্যাদি সব আলাদা দেখছি। আরও জ্ঞান বাড়ার পর দেখছে, মাটি থেকেই হাড়ি, কলসি সব কিছু হয়েছে। আর-একটা হল, মাটিই আছে, আর কিছু নেই। এই জিনিসগুলিকে ঠাকুর কোন থিয়োরেটিক্যালি বলছেন না, ভেবেচিন্তে, বই পড়ে যে বলছেন, কারুর কাছ থেকে যে শুনে নেওয়ার পর বলছেন তাও না। ঠাকুর নিজে প্রত্যক্ষ করছেন। এই জিনিসটা সব সময় আমাদের মনে রাখা দরকার, ঠাকুর সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন। ঠাকুর প্রত্যক্ষ করে এটাই প্রমাণ করছেন যে, আমাদের শাস্ত্র সত্য। ফলে হিন্দু ধর্ম সত্য। আর, একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তাহলে বাকি সব ধর্মই সত্য। স্বামীজীও এই কথা বলছেন, স্বামীজীর খুব নামকরা কথা –একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, সমস্ত ধর্ম সত্য হবে। কারণ ঈশ্বর অনন্ত। সেইজন্যই তো স্বামীজী ঠাকুরের নামে প্রণাম মন্ত্র রচনা করলেন –*স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে*।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসবে, ঠাকুর কি করে সর্বধর্মস্বরূপ হবেন, সাধনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সর্বধর্মস্বরূপ তো হবেন না? এই ভাবে হয়েছিলেন। যে কথাগুলো ঠাকুর এখানে বলছেন, তার ফলে তিনি ধর্মকে সত্য করছেন, হিন্দু ধর্ম যে সত্য এটাকে তিনি প্রমাণ করছেন; আর সেখান থেকে সমস্ত ধর্মকে সত্য প্রমাণিত করে দিচ্ছেন। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, অমুক ধর্ম কি সত্য? তার উত্তরে এটাই বলবেন, অবশ্যই সত্য, কারণ ঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয় বলতে আমরা যে মত পথ নিয়ে বলি, এগুলো সাধারণ বুদ্ধিতে বলছি। ঠাকুর ধর্মকে দেখাচ্ছেন, ধর্ম কিভাবে সত্য, কেন সত্য। বিজ্ঞানে কোন জিনিস যখন ইক্যুয়েশানসে চলে আসে, তখন বলেন জিনিসটা সত্য, এই থিয়োরিটা সত্য। এরপর আর কোন প্রশ্ন থেকে যাবে না। আইনস্টাইনের যত সিদ্ধান্ত ছিল, উনি যখন স্টেপ বাই স্টেপ গিয়ে $E=MC^2$এ ওয়ার্ক আউট করলেন, সব সিদ্ধান্ত সত্য হয়ে গেল। আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যক্ষ করলে ওটা সত্য হয়। এই যে এত প্রকার বলা হচ্ছে, মনে রাখবেন, এটা আমার আপনার প্রয়োজনে নয়, আমরা পারব না; আমাদের জন্য নিষ্ঠা ভক্তি, যে ভাব নিয়ে আছেন সেই ভাবেতে নিষ্ঠা নিয়ে থাকা। নিজের ভাবের বাইরে যাওয়া যাবে না। মানুষ যখন রেস্টুরেন্টে যায়, সবটাই যে খেয়ে ফেলে তা না; যেটা খাবে, যতটা খাবে সেটুকুই সে অর্ডার করে। ঠিক তেমনি যার যতটুকু দরকার তার বাইরে যেতে নেই। ঠাকুর এবার এক এক করে এখানে ব্যখ্যা করছেন।

কে জানে বাপু, আমার এই একরকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।

নিত্য মানে সেই অবস্থা যেখানে মন নেই, যেখানে *মৃত্তিকৈব সত্যম্* এই অবস্থা। লীলা মানে, মাটি থেকে এবার বিভিন্ন জিনিস হাড়ি কলসি তৈয়ার হচ্ছে। এখানে মনে রাখবেন একটাতে থাকলে অন্যটার বোধ থাকবে না। নিত্যে যখন আছেন তখন লীলার বোধ থাকবে না, লীলায় যখন আছেন তখন নিত্যের বোধ থাকবে না। ফলে লীলাতে থেকে যাঁরা আধ্যাত্মিক অনুভব করছেন, তাঁদের জন্য তাঁদের ঈশ্বর সত্য হয়ে যাবে, তার বাইরে সব মিথ্যা; হতে বাধ্য। এব্রাহামিক ধর্মের এই সমস্যা। ওনারা কথা বলেন অনন্তের, আসলে কিন্তু ব্যাখ্যা করেন লীলাতে থেকে।

নিত্যে পঁহুছানোর নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বড় কঠিন। বেদান্তের উপর যাঁরা লেকচার দেন, বেশির ভাগই ভাওতাবাজী। একজন খুব নামকরা বক্তা, অনেক বইটই লিখেছেন; ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে লেকচার দেন। একজন ইয়ং ছেলে লেকচার শুনে বেরিয়ে এসেছে, একজন তাকে জিজ্ঞেস করছেন, কি রকম লাগল? সঙ্গে সঙ্গে ইয়ং ছেলেটি বলছে, Oh! Wonderful, I am Brahman। তুই যে কলুরে সেই কলু, আর বলছে, I am Brahman।

একেবারে বিষয়বুদ্ধি না গেলে হয় না। কিন্তু আমাদের সবার ভিতরটা বিষয়বুদ্ধিতে ভরে আছে। যাঁর কথা বললাম, উনি লেকচার দিতে ভাল চার্জেস নেন। কি কথা বলার জন্য চার্জেস নেই? আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য, অহং ব্রহ্মাস্মি। আর কি বলতে? জগৎ মায়া। একদিকে বলছেন সমস্ত জগৎ মায়া, অন্য দিকে মোটা চার্জ নিয়ে ফাইভ স্টার হোটেলে বেদান্তের জ্ঞান বিতরণ করছেন।

হিমালয়ের ঘরে যখন ভগবতী জন্মগ্রহণ করলেন, তখন পিতাকে নানারূপে দর্শন দিলেন। হিমালয় বললেন, মা, আমি ব্রহ্মদর্শন করতে ইচ্ছা করি। তখন ভগবতী বলছেন, পিতা, যদি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার সাধুসঙ্গ করতে হবে। সংসার থেকে তফাত হয়ে নির্জনে মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন। বিষয়বুদ্ধি পুরো চলে যেতে হবে, বিষয়বুদ্ধি চলে গেলে সে কি করে সংসারে থাকবে? ঠাকুর অবতার বলে নিত্য আর লীলা দুটোতে আনাগোনা করতে পারছেন।

সেই এক থেকে অনেক হয়েছে –নিত্য থেকেই লীলা। দ্বিতীয় অবস্থার কথা বলছেন। আমাদের উপনিষদাদি তিনটে অবস্থারই বর্ণনা করেন। আমরা যাবতীয় যা কিছু দেখছি, সব সেই নিত্য থেকেই হয়েছে। **এক অবস্থায় 'অনেক' চলে যায়, আবার 'এক'ও চলে যায় –কেননা এক থাকলেই দুই**। এটাকে একটু ব্যাখ্যা করার দরকার।

প্রথম অবস্থা, যেটা আমার আপনার অবস্থা, সেখানে অনেক –আমি সত্য, আমার বন্ধুরাও সত্য, জগৎটাও সত্য, ঈশ্বরও সত্য; ঈশ্বর আমাদের দেখছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন করে বলি, প্রভু দেখবেন, একটু কৃপা করবেন; সব সত্য। সেখান থেকে হয়ে হয়ে আসে; ভালটাও তিনি, মন্দটাও তিনি, এক বোধ। এই 'এক'কে আপনি বিশিষ্টাদ্বৈত বলুন, যাই বলুন, আপনার খুশি। তিনি সব হয়েছেন –এটাই দ্বিতীয় অবস্থা। তৃতীয় অবস্থা হল, যেখানে এক চলে যায়। এক চলে গেলে কি থাকে? বলা যায় না। কারণ এক বোধ থাকলেই দুইএর বোধ থাকবে। আপনি যখন বলছেন, তিনিই সব হয়েছেন –এখানে 'তিনি' বোধটা আছে, 'সব' বোধটাও আছে। আসলে এক বোধ হয় না, ওটা বোধ হয়ে 'দুই'এর। সেইজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত শব্দটাই ভুল, দ্বৈতের বিশিষ্ট রূপ হতে পারে, অদ্বৈতের বিশিষ্ট রূপ নয়। কারণ আপনার দুইএর বোধ আছে। এক-এর বোধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বাকি সব কিছুর বোধ থাকবে। অদ্বৈত অদ্বৈতই। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, অদ্বৈতম্। তিনি দুই নন, এক নন, শূন্য নন। কারণ শূন্য হলে সেটা আবার বৌদ্ধ দর্শনে ঢুকে যাবে, ওটাও আবার একটা এলেমেলো জিনিস। তাহলে কোনটা সত্য? সবটাই সত্য। বহুটাও সত্য, একটাও সত্য আর অদ্বৈতও সত্য। তাহলে শূন্যবাদ? হ্যাঁ শূন্যবাদও সত্য, যদি আপনি ওটাকে মন, জগৎকে নিয়ে শূন্য বলেন। কিন্তু যদি বলেন চৈতন্যটাও শূন্য? এই শূন্যকে পাওয়ার জন্য এত সাধনা? বৌদ্ধদের যে এত কিছু, এত সাধনা, কি পাওয়ার জন্য? শূন্য অবস্থা পাওয়ার জন্য। লোকেরা এগুলো শোনেও।

তিনি যে উপমারহিত –উপমা দিয়ে বুঝাবার জো নাই। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। আমরা যে আলো দেখি সে আলো নয় –এ জড় আলো নয়।

বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ আর মনের সংসারটা হল জড়ের সংসার। মাঝামাঝি তিনি সেই এক। কারণ বিশুদ্ধ চৈতন্যে চলে গেলে সেই এক থাকবে না, অদ্বৈত হয়ে যাবে। এই জগতে এলে অনেক হয়ে যাবে। তিনি মাঝামাঝির অবস্থা। এগুলো খুব গভীর। নিজের থেকে একটু চিন্তা-ভাবনা না

করলে, ধ্যান-ধারণা না করলে কথামৃত শব্দ মাত্রই থেকে যাবে। আর আমার এই ব্যাখ্যাগুলো সব শব্দের আড়ম্বর হয়ে যাবে। এত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শাস্ত্র, এটাকে ছোট করবেন না। আমার পরিশ্রমকে বৃথা করবেন না। একটু চিন্তা-ভাবনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন –যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন –তখন দেখি ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ -তিনি সব হয়েছেন।

তার মানে এই যে অবস্থা –ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ, যে কোন দর্শনকে, বিজ্ঞানকে এই তিনটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হয় –ঈশ্বর, জীব আর জগৎ। বিজ্ঞান বা পদার্থবাদীরা ঈশ্বরকে মানেন না; তাঁদের কাছে জীব আর জগৎ আছে, জগৎ থেকে জীবের সৃষ্টি। আমরা ঈশ্বরকে মানি, কিন্তু আমরা জানি মায়া ছাড়া ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না। ঠাকুর এখানে পরিষ্কার ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ বলছেন, তিনি ঈশ্বর-জীব-জগৎ রাখছেন না।

আবার কখনও তিনি দেখান তিনি এই সমস্ত জীবজগৎ করেছেন –যেমন বাবু আর তার বাগান। এটা হল আমাদের ভাব, এতে আমরা শান্তি পাই। একজন মা শান্তি পায় এই ভেবে, আমার সন্তানকে ঈশ্বর দেখছেন; এটাই ঠিক ঠিক দ্বৈত ভাব। **তিনি কর্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীবজগৎ -এইটির নাম জ্ঞান**। এই জীবজগৎ তাঁর, এখানে তিনি এইসব কিছু হননি। আর-একটা হল, এক-দুইয়ের পারে, সেখানে গেলে মনের লয় হয়ে যায়। ঠাকুর এটাকেই বলছেন, ঠিক ঠিক জ্ঞান। জ্ঞান আর বিজ্ঞান একই জিনিস। **আর আমি কর্তা, আমি গুরু, আমি বাবা –এরই নাম অজ্ঞান। আর আমার এই সমস্ত গৃহপরিবার, ধন, জন –এরই নাম অজ্ঞান**।

বলরামের পিতা –আজ্ঞে হ্যাঁ। কতটুকু উনি বুঝলেন বলা খুব মুশকিল। এটা হল জ্ঞানচর্চা। এরপরে আমরা আলোচনা করব, অজ্ঞান জিনিসটা কি, জ্ঞানের সঙ্গে তার কি তফাত।

১৬ই অক্টোবর ১৮৮৩, মঙ্গলবারের আলোচনা চলছে। আমি সন্ন্যাসী ভাইদের মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করি, যিনি সন্ন্যাসী তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে ঈশ্বরের নামে বেরিয়ে এসেছেন, কি করে আমরা বুঝব যে, তিনি জীবনে এগিয়েছেন? সন্ন্যাসী ও অনেক গৃহস্থদের মধ্যে প্রচলিত একটা কথা আছে –মরবে সাধু উড়বে ছাই, তবে সাধুর গুণ গাই। সাধুর মৃত্যুর পর চিতায় দাহ করার পর তাঁর ছাই উড়ল, তখন তাঁর গুণগান করতে হয়। তার কারণ, জীবদ্দশায় কখন সংসারের কোন মায়াজালে সন্ন্যাসী ফেঁসে যাবেন বলা খুব মুশকিল, সত্যিই খুব মুশকিল। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে। আমরা তো জ্ঞানী অবস্থাতেও পৌঁছাইনি, ত্রাস তো থাকবে।

অনেক আগে একজন মহারাজ, বর্তমানে তিনি গত হয়ে গেছেন, তিনি বলেছিলেন, যদিও প্রচলিত কথা, 'সন্ন্যাসী ষাট কি পয়ষট্টি বয়সের হয়ে যাওয়া মানে রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁর পয়ত্রিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, তখন মোটামুটি বোঝা যায় উনি কোন দিকে যাচ্ছেন, কোন দিকে চলেছেন'। তার মানে ষাটের আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনটা ভাল ছিল, ভাল ছিল বলেই না জীবনটা ভাল হবে, চল্লিশ বছর সঙ্ঘ জীবন কাটিয়ে দিলেন, কম কথা! আমি ব্যক্তিগত ভাবে কত সন্ন্যাসী দেখেছি, খুব ভাল; জপধ্যান, তপস্যা খুব ভাল। তারপর কোন কারণে অন্য দিকে চলে গেলেন, নিজের মত তপস্যাদি করতে থাকলেন। তবে বাইরে বেরিয়ে গেলে অনেক সমস্যাও হয়ে যায়। কিন্তু তাও প্রশ্নটা থেকে যায়। কি করে বুঝব যে তিনি এগোচ্ছেন?

কথামৃতকে আধার করে আমার একটা রিসার্চ পেপার 'Milestone in Spiritual Live', আছে, ওখানে ধাপে ধাপে বলা হয়েছে, কি ভাবে বোঝা যায়। কিন্তু মূল যে জিনিসটা থাকে, আমি যেটা বুঝেছি; আমার মতের সাথে আপনারা অনেকেই এক নাও হতে পারেন, আমার অন্য সন্ন্যাসী ভাইয়েরাও

একমত নাও হতে পারেন; সেটা হল যে, যাঁর আচরণে, যাঁর কথায় আপনার যে আধ্যাত্মিক ভাব, সেটা আরও উপরে উঠবে। শুধু যে জেগে উঠবে তা না, আরও উপরে উঠবে। আমার তখন বয়স কম, স্বাভাবিক ভাবে বুদ্ধিও কম ছিল, সেই সময় একজন মহারাজকে মন্তব্য করেছিলাম –এনাকে দেখে মনে হয়, হয় এনার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, নয় তো হতে বেশি দেরী নেই। যাঁকে বলছিলাম, তিনিও ব্রহ্মচারী ও জ্ঞানীগুণী। উনি খুব বিরক্তি সহ বললেন, 'এতোটা বোঝার ক্ষমতা আমার হয়নি'। আমার খুব খারাপ লেগেছিল, এ-রকম কথা কেন বললেন? পরে একজনের কাছে শুনলাম, মৃত্যুর সময় ওই মহারাজ ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা শুনতে চাইতেন না। কেউ দেখা করতেও এলে উনি ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলতেন না। খুব মজার কথা। ওনার ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল কি হয়নি, এর আমরা কিই বা জানব, কারণ এটা স্বসংবেদ্য, যার হয় তিনিই জানেন, অন্য কেউ জানতে পারে না। যিনি আমাকে এই কথা বলেছিলেন, বলতে বলতে ওনার চোখে জল চলে এলো। দেখুন যবে আমি জয়েন করলাম তবে থেকেই এনাকে দেখে এসেছি, ঘুরেফিরে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না। কিন্তু যারা হরিনাম করে, ভিক্ষা চাইতে গিয়েও হরিনাম করে ভিক্ষা নিত, সেটাকে আপনি কি বলবেন? সেটা মাপকাঠি না। যাঁর সঙ্গে কথা বললে, যাঁর আচার-আচরণ দেখলে আপনার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়, ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছা জাগে, শাস্ত্র জানার ইচ্ছা হয়, আপনি মনে মনে জানবেন যে তিনি একজন সতিই ঈশ্বরলাভ করা পুরুষ।

এই যদি মাপকাঠি হয়, তাহলে ঠাকুর কোথায় দাঁড়াবেন? সাংঘাতিক, কথা বলা তো দূরের কথা, সামান্য স্পর্শে মানুষকে ভাবসমাধিতে নিয়ে যাচ্ছেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছেন, ইচ্ছামাত্রেই দিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি স্বপ্নে এসেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছেন। কথামৃতে সবচেয়ে ভাল যেটা বোঝা যায়; খুব সাধারণ কয়েকটা কথা বলতে বলতে একটা কি দুটো ধাপে এসে নেমে যাচ্ছেন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে হয় সমাধিস্থ নয়তো ভাবস্থ। কেউ এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কি বল? সামনের লোকটি কথা বলার আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের কথা।

আমি একটা খুব ব্যক্তিগত কথা বলছি, এটাও হয়ত আপনারা মানতে রাজী হবেন না। যখনই ধর্মের কথা আসে, যুগপুরুষের কথা আসে, অবতারের কথা আসে, ধর্মগুরুর কথা আসে, প্রবর্তকের কথা আসে; আমাদের মনে ভগবান বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, এনাদের যে জীবনচরিত, এনাদের যে কথাগুলো; এগুলো চলে আসে। কিন্তু আমরা এটা জানি যে, এটা হল স্যানিটাইজড্ ভার্সান। স্যানিটাইজড্ ভার্সান্ মানে, উনি যে কথাগুলো বলেছিলেন, তার কোনটাই সংরক্ষণ করা হয়নি বা লেখা হয়নি। ওনার পার্থিব শরীর চলে যাওয়ার অনেক পরে, পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে মূল কথাগুলো লিখে রাখা হয়েছে। ফলে তাঁর কোন কিছুর প্রতি ভালবাসা, কোন খাবারের প্রতি ভালবাসা, এগুলো কোন কিছুই জানা যায় না। আর সাধারণ কথা থেকে কিভাবে ঈশ্বরীয় কথায় চলে যাওয়া যায়, এইরূপ দৃষ্টান্তের শিক্ষা একেবারেই পাওয়া যায় না। ফলে ঠাকুরকে মেনে নেওয়া, গ্রহণ করা একটু কঠিন। সাধারণ লোকেরা তো এটাকে ধরতেই পারবে না, অসম্ভব। সেইজন্য সাধারণ লোকের পক্ষে ঠাকুরকে মেনে নেওয়া একটু কঠিন হয়ে যায়। ঠাকুর হাসিঠাট্টা করছেন, ফচকিমি করছেন, আর এমন এমন কথা বলছেন যে শোনার পর মনে হয়, এত বড় একজন মহাত্মা, যিনি ঈশ্বরের সাথে সর্বদা কথা বলছেন, দর্শন করেছেন, তিনি এই রকম কথা বলতে পারেন, তাই এটাই ঠিক।

ভাগবতাদিতে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিত্র লেখা হয়েছে, ঠিক এভাবেই লেখা হয়েছে। যখন ঝেড়েমুছে, সাজিয়ে-গুছিয়ে কোন কিছু রাখা হয়, তখন সেখানে পুরো ছবিটা পাওয়া যায় না। দুই বছরের বাচ্চা বাড়িতে সারাক্ষণ কি ভাবে থাকে ভেবে দেখুন? যতক্ষণ জেগে থাকবে তক্ষণ কি যে করবে আর কি যে করবে না ভগবান জানেন, বাড়ির সবার মাথা খারাপ করে ছাড়বে। কিন্তু যেদিন বাড়িতে অতিথি আসবে, বা বাচ্চাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হবে; তখন ভাল করে স্নান করিয়ে, সুন্দর পরিষ্কার

জামা-কাপড় পরিয়ে ভদ্র শান্ত-শিষ্ট সাজিয়ে রাখা হবে। কিন্তু শ্রীমান তো আসলে এ-রকম নন। বাড়িতে ছোট্ট বাচ্চা মানে এক-একজন একটা সাদ্দাম হোসেন, বাড়িশুদ্ধু জ্বালিয়ে রেখে দেবে।

শাস্ত্র যখন স্যানিটাইজড্ হয়ে আসে, তখন শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় হল, সঠিক ছবিটা পাওয়া যায় না। পাশাপাশি লীলাপ্রসঙ্গে, কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলো শোনার পর আপনার কি মনে হয়? ঠাকুর বলছেন, ভবনাথ পান-মাছ ত্যাগ করেছে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগটাই ত্যাগ। আপনি বলবেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হলে সংসার কি করে চলবে? ঠাকুর সেখানে তাই বলছেন, স্বদারায় গমনে দোষ নাই। পুরো ছবিটা এক সঙ্গে না নিলে জিনিসটা পরিষ্কার হয় না।

মূল কি? ঈশ্বরে পুরোপুরি মন দিতে হবে। যত মন ঈশ্বরে দেওয়া যাবে, নিজে থেকে আবর্জনাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে না। অনেক সময় আমার কাছে ইয়ং ছেলেরা এসে বলে, কুসঙ্গে পড়ে আমি কিছু কুসংস্কার অর্জন করেছি। কি বলব ওকে, বেশ করেছ। ইয়ং ছেলে এখন মন একটু এদিক ওদিক যাবে, এটাই স্বাভাবিক। জোর করে ওটাকে আটকাতে গেলে হয় পাগল হয়ে যাবে, নয় সাইকোসোমাটিক ডিজিজ এসে যাবে। সন্ন্যাসী যদি এ-রকম হয়ে যান, তাহলে সেটা অন্য ব্যাপার হয়ে যাবে। সমাজে থাকতে গেলে এই সমস্যাগুলো হবেই। মন যদি ঈশ্বরে রাখা হয়, তাহলে মুখ দিয়ে সব সময় ভর্ ভর্ করে ঈশ্বরীয় কথা বেরোবে? বেরোতে পারে, নাও বেরোতে পারে। কিন্তু তাঁর সঙ্গ করলে আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চারিত হবে, আপনাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। এই একটা ভাব ঠাকুরের পুরো কথামৃতে আমরা দেখতে পাই –যেখান থেকে খুশি আপনি দু-পাতা পড়ে নিন –সাংঘাতিক মনে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যতদিন না "তুমি কর্তা" এইটি বোধ হয় ততদিন ফিরে ফিরে আসতে হবে – আবার জন্ম হবে। "তুমি কর্তা" বোধ হলে আর পুনর্জন্ম হবে না।

যতক্ষণ না তুঁহু তুঁহু করবে ততক্ষণ ছাড়বে না। গতায়াত পুনর্জন্ম হবেই – মুক্তি হবে না। আর 'আমার' 'আমার' বললেই বা কি হবে। বাবুর সরকার বলে 'এটা আমাদের বাগান, আমাদের খাট, কেদারা'। কিন্তু বাবু যখন তাড়িয়ে দেন, তার নিজের আম কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না।

'আমি' আর 'আমার' সত্যকে আবরণ করে রেখেছে – জানতে দেয় না সত্যটা কি। সংসার কি, মায়া কি, বন্ধন কি, পুনর্জন্ম কেন হয়, এত ভোগান্তি কেন, জীবনে এত কষ্ট কেন, শান্তি পাই না কেন; এতগুলো প্রশ্নের একটি ছোট্ট উত্তর। আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম তখন পরীক্ষায় উত্তর মেপে নম্বর দেওয়া হত; যত লম্বা লিখবেন নম্বর তত বেশি হবে। এখানে উল্টো, প্রশ্নটা ছোট, কিন্তু উত্তরটা লম্বা। আবার বর্তমান কালে হয়েছে –এক বাক্যে উত্তর দাও। একটি প্রশ্ন, তার উত্তর এক বাক্যে। হাজারটা প্রশ্ন, সংসার কি, মায়া কি, বন্ধন কেন, পুনর্জন্ম কেন, দুঃখ-কষ্ট কেন; এক শব্দে এই প্রশ্নের উত্তর – 'আমি' ও 'আমার'।

যখন ভাবছেন 'আমি' ও 'আমার' তখন এই এই জিনিসগুলো এসে যায় –বন্ধন এসে যায়, মায়া এসে যায়, পুনর্জন্ম এক্সে যায়, সব রকম দুঃখ-কষ্ট এসে যায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জড়িত থাকার দরুন আমি অনেক ছেলেদের জানি। একটি ট্যালেন্টেড ছেলেকে আমি জানতাম, পরে বিরাট বড় হয়েছে। কি করে একটি মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল। ছেলেটি তখন কলেজে পড়ে। ছেলেটি এসে দুঃখ করে বলত, মেয়েটি তাকে চিঠিতে লিখছে, তুই আমাকে কাঁদিয়েছিস, আমি বদলা নিয়ে ছাড়ব। কি হয়েছিল? সে-রকম কিছু হয়নি; মেয়েটি কোথায় আসতে বলেছিল, ছেলেটি বলেছে, যাওয়া যাবে না। একবার ভাবলাম বলি, তোমাকে ছেলেটি কাঁদায়নি, তোমাকে তোমার 'আমি' কাঁদিয়েছে। প্রথম থেকেই গভীরে গিয়ে কথামৃত পড়তাম। যখনই এই 'আমি' ও 'আমার' এসে যায়, জীবন শেষ। অথচ যখনই

আপনি নিজেকে ভাবেন, এই যে আমি সমর্পণানন্দ, আমি নিজেকে কি ভাবি? নিজের দেহকে, নিজের মনকে, আর আমার সাথে যে কজন জড়িয়ে আছেন, যাঁদের আমি আমার আপনজন মনে করি, সন্ন্যাসী ভাইয়েরা আছেন, সিনিয়র মহারাজরা আছেন, আর কিছু বন্ধু-বান্ধবরা আছেন। তাঁদের খারাপ কিছু হয়ে গেলে আমারও খারাপ লাগে। বিশেষ করে একটা অবস্থা থেকে তাঁদের যদি পতন হয়, আমার চোখে জল আসবে। কখন কখন যখন শুনতাম, যাঁকে খুব কাছ থেকে জানতাম, সন্ন্যাসী জীবন থেকে সরে গেছেন বা অন্য কিছু হয়ে গেছেন, তখন চোখে জল চলে আসত। একদিকে আপনি আর আপনার যে বিস্তার, এটা আমার চোখের সামনে সত্য।

যোগে আটটি ধাপের বর্ণনা আছে, প্রথম পাঁচটি আমাদের আলোচ্য নয়, ওই পাঁচটি বিভিন্ন ভাবে করা যায়। কিন্তু শেষের তিনটি ধাপ –ধারণা, ধ্যান ও সমাধি; এই তিনটে সবারই হতে হবে। জ্ঞানযোগে হতে হবে, ভক্তিযোগে হতে হবে আর রাজযোগে তো হবেই, কর্মযোগেও হতে হবে। ধ্যান, ধারণা আর সমাধি এই তিনটে যোগের টেকনিক্যাল শব্দ। যিনি জ্ঞানলাভ করতে চান, তাঁকে এই তিনটে ধাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ধারণা হল, যখন একটা কোন বস্তুতে বা কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করে সেটাকে ধারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধারণারই আরও গভীর অবস্থা হল ধ্যান আর সমাধি জ্ঞানীর অবস্থা। সমাধি বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোথাও মন বেশিক্ষণ লেগে থাকলে সেটাও সমাধি। তবে সব সমাধিতে জ্ঞান হবে না। কিছু সমাধি আছে, যেখানে জ্ঞান হয়। যিনি ভক্তিমার্গের, তাঁর যদি সবিকল্প সমাধি হয়, তখন তাঁর জ্ঞান হবে –ঈশ্বরই সব। যদি নির্বিকল্প সমাধি হয়, তখন তিনি দেখবেন আমিই সেই চৈতন্য।

যোগ পথে যদি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, সেখানেও সেই জ্ঞানটাই হবে। নিজেকে চৈতন্য জানা, আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য; যদি এই জ্ঞানটা কারুর হয়ে যায়; তা যে করেই হোক, গুরু কৃপাতেই হোক; এখানে সাধারণ গুরু হলে হবে না, যেখানে ঈশ্বর অবতাররূপে নিজে গুরু হয় আসেন, তাঁর কৃপাতেই হবে; অন্য গুরুর কৃপাতে হবে না। লোকেদের মনে এই নিয়ে একটা ভুল ধারণা হয়ে আছে। গুরু বলতে আমাদের এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ; তাঁর কৃপা হলে ওই জ্ঞানটা হয়ে যাবে। জ্ঞানপথ, যোগপথ, যে পথেই আপনি সাধনা করুন, এগুলোকে মিলিয়ে যে পথ দাঁড় করাবেন, সেখানে এই বোধ যদি হয়, আমি চৈতন্যের সঙ্গে এক, জীবন পুরোপুরি পাল্টে যাবে। আপনার মুখের হাসিটাই পাল্টে যাবে। সমস্যা হল, এই জ্ঞান সহজে হয় না। সমাধি, চৈতন্য নিয়ে বর্তমান কালে সোস্যাল মিডিয়াতে এসে অনেকে বড় বড় কথা বলে দেন, আর তাতেই এনারা ফেমাস হয়ে যান। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি চৈতন্যের সঙ্গে এক, এই জ্ঞান একেবারেই হতে চায় না, এ পুরো আলাদা জিনিস।

কি রকম হয়; আপনি বাঘের কথা প্রচুর পড়ে থাকতে পারেন, বিশেষ করে জিম করবেটের বইগুলো পড়ে থাকতে পারেন; কিন্তু একবার যদি বাঘ নিজের চোখ দিয়ে কোথাও দেখে নেন, একক্ষণের জন্যেও, জ্ঞান পুরো পাল্টে যাবে। ১৯৯৪ সাল, গরমকাল, তখন গাড়িঘোড়া বেশি চলত না। মায়াবতী থেকে আলমোড়া যাচ্ছিলাম, রাস্থায় বাই চান্স একটা গাড়ি ফাঁকা যাচ্ছিল, আমাকে নিয়ে নিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, হঠাৎ রাস্থায় দেখছি একটা চিতা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার থমকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল, আমিও চমকে উঠেছি, কিছুক্ষণ পরে একটা লাফ দিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। এই ঘটনাটা আমার স্মৃতি থেকে জীবনে কোন দিন চলে যাবে না, চিরদিন থেকে যাবে। ঠিক তেমনি চৈতন্যের যখন জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান কোন দিন আর যাবে না, শুধু যে যাবে না, তা না, সব কিছুর প্রতি পুরো দৃষ্টভঙ্গীটাই পাল্টে যাবে। আপনি তখন জেনে যাবেন, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার সুখও নেই দুঃখও নেই, আপন-পর বলতে কিছু নেই।

ঈশোপনিষদের ঋষি বলছেন, *অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।* যাঁদের এই আত্মজ্ঞান হয় না, তাঁরা আত্মঘাতী। কেনা আত্মঘাতী বলা হচ্ছে

এদের? কারণ এই যে সে বারবার জন্ম নিচ্ছে আর মরছে, মরে আবার জন্ম নিচ্ছে; এর জন্য সে নিজে দায়ী। আর প্রত্যেক জন্মে যে তার মৃত্যু হচ্ছে, এই মৃত্যুর জন্য সে দায়ী, কেননা আত্মজ্ঞান না হওয়ার জন্য নিজেকে নিজেই মারছে, আত্মহন্তা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করব কি করে? এর জন্যই তো কথামৃত, এর জন্যই কোরান, এর জন্যই বাইবেল, এর জন্যই ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ। কিন্তু সবটাকে যদি নিয়ে আসা হয়, তখন মূলে ওই একটাই কথা, যেটা ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলছেন, *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*। জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুকে যদি ঈশ্বর ভাবে দেখো, তুমি এখনও জানতে পারোনি, যখন জানবে তখন জানতে পারবে; কিন্তু এখন দেখতে তো শুরু করো। এর অর্থ কি, যে কথা ঠাকুর সহজ ভাষায় বলছেন –তোমার 'আমি' ও 'আমার' ত্যাগ কর। *মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*, কোন কিছুতে লোভ করো না, কোন কিছুতে মোহ করো না; 'আমি' ও 'আমার' এটাকে ছাড়ো। ঈশ্বরজ্ঞানে দেখলে হবে, 'তুমি' ও 'তোমার' বা দ্বিতীয় মন্ত্রে যেটা বলছেন, সংসারে থেকে যদি ভোগ করতেও চাও, তাহলে অনাসক্ত হয়ে করো। তার মানে যেটাই ভোগ করবে, সেটাই ঈশ্বরে অর্পণ করে ভোগ কর, বা ঈশ্বরের পূজা করছি এই ভেবে ভোগ কর।

এটাকে আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতা ভাষ্যে খুব সুন্দর ভাবে বলছেন, সংসারে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মা-সন্তানের যে সম্পর্ক, বন্ধু-বন্ধুর সম্পর্ক, তিনি বলছেন না যে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু ভাবটা এই থাকবে, আমি সেই কর্তা, কিন্তু *ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। যা কিছু করছি ঈশ্বরের জন্য করছি, তাঁর ভৃত্যবৎ করছি। একজন বড়লোকের সেবক যেমন সব কিছু তার স্বামী বা প্রভুর জন্য করছে, নিজের আমিকে সে ভুলে যায়। আমি এক সময় বিহারে ছাপরা আশ্রমে ছিলাম। আশ্রমের লাইব্রেরির কিছু বই কেনার ছিল। একজন বড় আইপিএস অফিসারের গাড়িতে আরও কয়েকজন মিলে আমরা গেলাম বই কিনতে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার ফিরে এসে আমি অফিসারকে বললাম, 'ড্রাইভারকে তো খুঁজে বার করতে হবে'? উনি হেসে বলছেন, 'চিন্তা নেই ড্রাইভার আমাদের খুঁজে বার করে নেবে'। বলার পরেই খুব সুন্দর কথা বললেন, 'ওর কাজই হল আমার উপর দৃষ্টি রাখা'। আর বলতে না বলতেই ড্রাইভার দূর থেকে দৌড়ে চলে এলো – স্যার, স্যার, গাড়ি রেডি। কি সুন্দর ট্রেনিং! স্যার দোকানে দোকানে ঘুরছেন, ড্রাইভারের ঠিক দৃষ্টি আছে। যেমনি গাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। কতটা ট্রেইনড্। *অহম্ কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। এই ভাব নিয়ে মানুষ যখন সব কাজে এগোয়, মন তখন শুদ্ধ হয়। ঠাকুর এটাই বলছেন –**'আমি' আর 'আমার' এই জ্ঞান আমাদের সত্যকে আবরণ করে রেখেছে –জানতে দেয় না**। আম কাঠের সিন্দুকের উদাহরণ ঠাকুর অন্য জায়গাতেও দিয়েছেন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, জগতে কেন এসেছি আমরা? কিছু অনুভব পাওয়ার জন্য। ভাল লাগলে বসে বসে ভোগ করে যাওয়া, আর খারাপ লাগলে সেখান থেকে পালিয়ে আসা? তা নয়, সব কিছু থেকেই সরে আসাটাই উদ্দেশ্য। সিনেমা, নাটকে যেমন ভালবাসার দৃশ্যও দেখছি, মারামারির দৃশ্য দেখছি, কান্নার দৃশ্যও দেখছি, সব রকম দৃশ্যই দেখে যাচ্ছি, সিনেমাও এগিয়ে এগিয়ে চলেছে। দু ঘন্টা কি আড়াই ঘন্টার পর সব খেল খতম; এবার ঘরে ফেরার পালা। মোবাইলে সব সিনেমাই দেখা যায়, যেটা ভাল লাগছে সেটাকে চারবার চালিয়ে দেখা যায়; তা না, ত্যাগের ভাব দরকার। এই সংসার আমাদের ত্যাগ শেখায়। যোগশাস্ত্রে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। রাজযোগের একেবারে শেষের দিকে বলছেন –প্রকৃতি আমাদের মায়ের মত, জীবাত্মাকে সমস্ত দৃশ্য দেখিয়ে মুক্তির পথে নিয়ে চলে যান। এই সংসারে প্রকৃতি কাউকে বেশিক্ষণ থাকতে দেন না। প্রত্যেক জন্মে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আপনার যত ভালবাসাই থাকুক আর যাই থাকুক, মৃত্যুর সময় আপনাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

আম কাঠের যে সিন্দুক সেটাও নিয়ে যাবার জো নেই। আমার জানা ছিল না, ইদানিং নাকি আমেরিকাতেও কর্মচারীদের সঙ্গে এই ধরণের আচরণ করে। সেখানে আবার ভারতীয়রাও ঢুকে গেছে। হঠাৎ বলে দিল, আপনার চাকরি চলে গেছে, আপনার জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা নাকি খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে আমেরিকায়। আজকের দিনে এই জিনিস সব জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

একজনকে আপনি চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, অন্তত তাকে একটু সম্মান দিয়ে বিদায় জানান। আমরা তো কথামৃত পড়ে শিখেছি, আম কাঠের সিন্দুকটাও নিয়ে যাবার জো নেই। আগেকার দিনের জমিদাররা এই রকমই ছিলেন। মৃত্যুর সময় ঠিক তাই হয়, মৃত্যু যখন আসবে, তখন তার আশেপাশে কেউ থাকবে না। আর বর্তমান কালে সেই যৌথ পরিবার নেই; ছেলে এক জায়গায়, মেয়ে এক জায়গায়, কোথায় আপনি একা একা পড়ে আছেন, কোথায় মরে পড়ে থাকবেন, কারুর জানারও পথ নেই। বাবা-মা নিজের নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য এক সন্তান করে। সেই সন্তান আবার সারা বিশ্বে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা-মা দুজনের কেউ মরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না। যার উপর নিজের সমস্ত ভালবাসা, যে সন্তানের কথা ভেবে ভেবে মুখে এতদিন লালা পড়ছিল, সেও মৃত্যুর সময় পাশে থাকবে না। তাতে কি হবে, কিছুই হবে না, মৃত্যু এলে আপনার জীবাত্মা ওই শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে, শরীরটা এখানে পড়ে থাকবে।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে, আরও অন্যান্য অনেক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, পুনর্জন্ম কিভাবে হয়। জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে এখানে সেখানে ঘুরঘুর করবে আর দেখতে থাকবে কোথায় জন্ম নেওয়া যায়। কিছুটা নিজের ইচ্ছা, কিছুটা নিজের কর্ম, তার সাথে সংস্কার ও শেষ সময়ের চিন্তা ও ইচ্ছা সব মিলিয়ে যেটা ভাল হবে, সেটাই নেবে। তবে সবটাই যে আপনার ইচ্ছামত হবে, তা কখনই হবে না। এর মধ্যে যেটা ভাল সেটাই হবে। অনেক সময় মানুষ তার বাবা-মাকে নিজের কৃতকর্মের জন্য দোষ দেয়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, বাবা-মা আপনিই বেছে ছিলেন। বাকি যেগুলো পড়ে ছিল, সেগুলো আরও বাজে ছিল। বাধ্য হয়ে আপনিই আপনার বাবা-মা বেছে নিয়েছিলেন। সকালে বাজার বসেছিল, সেই বাজারে দুপুরের পর যদি যাই, আনাজগুলো একটু অন্য রকম পাব। যা পড়েছিল তার থেকে বেছেবুছে বাড়িতে আনার পর বলবেন, যা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে ভালটা নিয়ে এসেছি। আপনার এখন জন্ম নেওয়ার সময়ে হয়ে গেছে, আপনি তো আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছেন, তখন যেটাকে ধরা যায় সেটাকেই আঁকড়ে ধরবেন।

অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্যদর্শন হয় না। চৈতন্যদর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ।

অনেক লোক ঠাকুরের কথাকে ভুলভাল ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন মানসিকতার লোকের জন্য ঠাকুর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদাহরণ দেন। আমাদের একজন মহারাজ বিজ্ঞানবাদ নিয়ে অনেক কিছু বলেন, আমার জানা নেই; তিনি আবার অন্য এক মহারাজকে কোট্ করেন। ঠাকুর নিজে যেখানে বলে গেছেন, অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্যদর্শন হয় না, আর চৈতন্যদর্শন না হলে মুক্তি হয় না; সেখানে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর বেল ও বেলের শাঁস, এত কিছুর নিকুচি করেছে। শ্রীশ্রীমা পরিষ্কার বলছেন, তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈত ছিলেন, তোমরা সবাই অদ্বৈতী, এরপর তো আর কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়। যাঁরা এই ধরণের কথা বলে, হয় তাঁরা অদ্বৈত জিনিসটাই বোঝেন না। আমার সঙ্গে কারুর কথা হলে বলি, এক কাজ করুন, আপনি মাণ্ডুক্যকারিকাটা একটু ভাল করে পড়ুন, বুঝতে পারবেন অদ্বৈত জিনিসটা কি। এতটুকু দ্বৈত, এতটুকু বিশিষ্টাদ্বৈত, এতটুকু অদ্বৈত –তা নয়। অদ্বৈত মানে পুরোটা। যার মধ্যে দ্বৈত আছে, বিশিষ্টাদ্বৈত আছে আর আচার্শ শঙ্করের পরে যে অদ্বৈত মতগুলো এসেছে (post Shankar Vedanta) যেখানে কি একটা বিচিত্র অদ্বৈতের ভাব নিয়ে এসেছে, শুধু শুদ্ধ চৈতন্যটুকু।

বাকিগুলো তাহলে কোথায় যাবে। জ্ঞানীদের যেটা ঠাকুর নিন্দা করছেন, জ্ঞানীরা জীব-জগৎ উড়িয়ে দেন। কি করে আপনি জীব-জগৎ উড়িয়ে দেবেন? হয় জীব-জগৎকে সত্য রূপে রাখতে হবে, নয় জীব-জগৎকে সেই আত্মা রূপে নিতে হবে। দুটো ক্ষেত্রেই দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে যায়। এনারা হয় চিন্তা-ভাবনা করেননি, নয়তো ভাল আচার্য পাননি। ইউটিউবে অনেকে উদ্ভট সব কথাবার্তা লেখেন। আমিও একটা স্ট্যাণ্ডার্ড উত্তর ঠিক করে রেখেছি –মনে হয় আপনি ভাল আচার্য পাননি। মুর্খদের সাম্রাজ্য –প্রথম গুণ, কিছু জানে না; দ্বিতীয় গুণ, কারু কথা শুনবে না। বিশেষ করে ইন্টলেকচুয়ালরা,

লিবারালরা এত টুইস্ট করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলবে, আর এই করতে গিয়ে এরা শিবলিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গ খুঁজে পায়। এ-ছাড়া তো আর কিছু ভাবতে পারে না, শিবলিঙ্গের মধ্যে এরা লিঙ্গই খুঁজবে। ঠিক তেমনি হল যাঁরা আমাদের ধর্মের শিক্ষা দেন। ভাল আচার্য না পেলে এটাই হবে। এরা যেটা বলবে গায়ের জোরে সেটাকেই সত্য প্রমাণ করে দেবে। আমাদের আর বলার কি অধিকার আছে, এনারা প্রণম্য। কিন্তু প্রণম্য হলেও, আমার গুরু তো ঠাকুর, আমার আচার্য তো ঠাকুর, আমার ইষ্ট ঠাকুর। শাস্ত্রকে নিলে তার পুরোটাই নিতে হয়, বেছে নেওয়া যায় না। চৈতন্য জ্ঞান যেটা হয়, এটাই অদ্বৈত। অদ্বৈত অবস্থা না হলে চৈতন্য জ্ঞান হয় না। ঠাকুর কাশীখণ্ডের বর্ণনা করেছেন, কাশীতে মরলে কিভাবে মুক্তি হয় –শিব দেখিয়ে দেন, এই দেখ্ আমার অখণ্ড রূপ। ভগবান যতক্ষণ আপনাকে অখণ্ড রূপ না দেখিয়ে দেন ততক্ষণ আসা-যাওয়া চলতে থাকে।

এখানে আর-একবার বলি, ঠাকুর যখন চৈতন্যদর্শন শব্দটা কয়েকবার বলছেন, আমরা মনে করছি, যেন আমাদের সামনে একটা সমুদ্র রয়েছে, যে সমদ্রের কিনারায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, সমুদ্র দেখছি। কি রকম? যেমন হিমালয়কে দেখি; পুরীতে, দীঘাতে যেমন সমুদ্র দেখি। কিন্তু চৈতন্যদর্শন জিনিসটা তা নয়। চৈতন্যদর্শন হল চৈতন্য জ্ঞান, চৈতন্য বোধ। তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়, তাঁকে জানা যায় না। সমস্ত কথা সবাই তো বুঝতে পারবেন না, বোঝাবার জন্য এত কিছু বলা। দেববাণীতে স্বামীজী অনেকবার এগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। শুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে এক হওয়া যায়, জানা যায় না।

আমাদের এখানে একবার একটা বড় সেমিনার হচ্ছিল। দিল্লি থেকে আমার একজন পরিচিত ভদ্রলোক এসেছেন, উনি বিভিন্ন জায়গায় সেমিনারে ঘুরে বেড়ান। ওনার কাছেই শুনছিলাম, সেখানে নাকি একজন বক্তা বলছিলেন, আমরা কি চৈতন্যের কোন ছবি নিতে পারি? আমি ভদ্রলোককে বললাম, ইটস্ এ ওয়াইজ্ এনসার, ক্লেভার এনসার। ভদ্রলোক আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন, এই রকম উত্তর কখন শোনেননি। আমি ওনাকে বললাম, আমি ওখানে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বলতাম, ইয়েস, আই ক্যান টেক এ পিকচার অফ কনসাসনেস্, আমি ছবি তুলে দেখাতাম, যদি নিজের উপর ক্রিয়া করা যেত। নিজের উপর যদি ক্রিয়া করা যেত, তাহলে অবশ্যই আমি চৈতন্যের ছবি তুলে দেখিয়ে দিতাম। একজন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীনি কখন এই ধরণের কথা কি করে বলতে পারেন, যেখানে গীতায় বলছেন, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* –আমরা চৈতন্যের ছবি তুলতে পারি? ঠাকুর বলে গেছেন –ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা। চৈতন্যের উপর কোন ক্রিয়া হতে পারে না, কারণ স্ব-ক্রিয়া অভাব। স্ব-ক্রিয়া অভাব বলেই চৈতন্যের দর্শনও হয় না, স্পর্শনও হয় না, জানাও যায় না। চৈতন্যদর্শন ঠাকুর কেন বলেছেন? বোঝানর জন্য। ঠাকুরই আবার অনেক জায়গায় বলছেন, মুকাস্বাদবৎ।

বেদান্তমতে অবতার নাই। সে-মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট।

চৈতন্যদর্শন কিরূপ? এক-একবার চিনে দেশলাই জ্বেলে অন্ধকার ঘরে যেমন হঠাৎ আলো।

তখনও মনে হয় চকমকি পাথর ছিল। পরে এলো চিনে দেশলাই, ফায়ারওয়ার্কস জিনিসটা চিন থেকে এসেছে। চিন থেকে ঘুরে ঘুরে আরব দেশে পৌঁছে গেল। ওরা দেখল, এটা দিয়ে তো দারুন বোমাবাজি হতে পারে। বলা হয় যে, চিনের দুটি বড় আবিষ্কার –Explosive and Examination। পরে প্রবাদ হয়ে গেল, Examination is more harmful than explosive। চিনারাই প্রথম পরীক্ষার প্রথা চালু করে, তার আগে বিশ্বের কোথাও পরীক্ষার প্রথা ছিল না। মোমফালিকে চিনেবাদাম বলা হয়, কেন বলা হয় জানা নেই।

চকমকি পাথর ঘষলে জ্বলে উঠত না, একটা স্পার্ক হত, ওই স্পার্ক থেকেই আগুন ধরিয়ে নিতে হত। কিন্তু দেশলাই আসার পর একটু ঘষলেই দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে। এই যে সংসার দেখছি, কল্পনা করুন, একটা অন্ধকার আর অর্দ্ধ অন্ধকার জায়গায় আমরা আছি। সেখানে হঠাৎ একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দিলেন, সঙ্গে ওই জায়গাটা আর তার আশপাশটা আলোকিত হয়ে গেল, দেশলাই জ্বলল

আলোকিত হয়ে গেল, নিবে গেল, আবার অন্ধকার। কারণ যদি ওটা সব সময় জ্বলে থাকে সংসার চলবে না, অসম্ভব চলা। আর সত্যিই যদি ও-রকম হয়, তখন দেখবেন আপনার পুরো দৃষ্টি চলে যাবে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির দিকে। বরঞ্চ অন্ধকারে আপনি আরও ভাল দেখতে পারবেন। একটা বিশেষ কোন জিনিস যদি দেখার থাকে, সেটা অন্য জিনিস। আর এগুলো উদাহরণ। উদাহরণ দিয়ে কখন মূল জিনিসকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

যিনি মূলকে, চৈতন্যকে দেখে নিয়েছেন, সে জগতে আর কি করে থাকবে? একবার যিনি ওই আলো দেখে নিয়েছেন, অন্ধকার আর কোন দিন তাঁকে ঘিরে রাখতে পারবে না। যিনি জেনে গেলেন উনিই কর্তা, 'তুমি' আর 'তোমার' এই ভাবটাই থাকবে, তার 'আমি' আর 'আমার' এই ভাব কোন দিন থাকবে না। গীতার শেষ অধ্যায়ে বলছেন, *যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী*, জীবেরা যেখানে জেগে আছেন, জ্ঞানীরা সেখান ঘুমিয়ে আছেন; জ্ঞানীরা যেখানে জেগে আছেন, জীব সেখানে ঘুমিয়ে আছে। চৈতন্য বোধে জীবেরা ঘুমিয়ে আছে। একবার যদি কেউ চৈতন্যকে জেনে যায়, সংসার বোধে সে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়বে। ঠাকুর পরে বলছেন –ভক্তি মতে অবতার নাই।

১৬ই অক্টোবর, ১৮৮৩, তারিখের আলোচনা চলছে। এই দিন ঠাকুর অনেক বিষয়ের উপর কথা বলছেন। একটু পরে ঠাকুর বলবেন –মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। কারণ প্রানী মাত্রেরই মৃত্যু হবে, জীবের মৃত্যু হবে, এটাই কালের বিধান। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, যে জন্মেছে তার মৃত্যু হবে। আপনার জীবনদর্শন যাই হোক, যে ধর্মেরই লোক হন, মৃত্যু সবার জন্যই অপরিহার্য। মহাভারতে, পুরাণে কয়েকজনকে বলা হয়েছে, এনাদের মৃত্যু নেই –এটাই অশ্বত্থামার জন্য অভিশাপ। মহাভারতে একটা প্রসঙ্গ আছে যেখানে কাকভূষণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, অনেক দিন বেঁচে থাকার জন্য কি কি কষ্ট হতে পারে, কি কি অসুবিধা হবে? অনেক দিন বেঁচে থাকলে চোখের সামনে সব আপনজনরা একে একে মারা যাচ্ছে দেখতে হবে, এর থেকে বেশি কষ্ট কি হতে পারে। কিন্তু তার থেকেও আমাদের জন্য বেশি কষ্ট হল, যেটা আমরা সব সময় চারিদিকে দেখছি, অশুভ শক্তির বিকাশ, অধর্মের আস্ফালন। আপনি যে ধর্মেরই হোন না কেন আর যে জীবনদর্শনকেই মানুন, সবার মৃত্যু হবেই।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলি, মৃত্যুর কথা ভাবলেই আমার খুব মজা লাগে। জানিনা কেন মজা লাগে? এটা যে আমার কোন মানসিক রোগ, তা নয়। কারুর হয়তে তাই মনে হবে। অনেককেই আমি দেখেছি, যাঁরা মৃত্যুকে ভয় পান। আমি এক পরিবারকে জানতাম, আমার অনেকদিনের পরিচিত। সেই পরিবারের গৃহবধূ একদিন আমার সামনে হাতজোড় করে বলছেন, স্বামীজী মৃত্যুকে আমার খুব ভয় করে, আপনার কাছে আমার মিনতি যে, মৃত্যুর সময় যদি আমার পাশে থাকেন। তখন আমার অবাক লাগত, কেন মানুষ এই ধরণের কথা বলে? তারপর আরও কিছু কিছু লোকের সঙ্গ হল, বুঝতে পারলাম, মৃত্যুর দেবতা যমের নাম শুনলেই মানুষ ভয় পায়। একটা কারণ হতে পারে, মৃত্যুর পরে কি হবে, সবটাই অজানা। আমি শুনেছি, মুরগীকে যখন কাটা হয়, মুণ্ডুটা কাটার পর মুরগী নাকি দৌড়াতে থাকে, হেডলেস্ চিকেন। যে কোন প্রানী মৃত্যুর সময় অন্ধকারের দিকে চলে যায়। এইসব দেখেই হয়ত মানুষ মৃত্যুকে আরও বেশি ভয় পায়।

কিন্তু একমাত্র মানুষই মৃত্যুর সময় আলোর দিকে আসে। এটা একটা খুব নামকরা কথা, কেন এমনটা হয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু এটা একটি সত্য। মানুষ দিনের প্রানী, কিন্তু দিনের প্রানী আরও অনেক আছে, ছাগল, গরু, ভেড়া এরাও আমরা জানি দিনের প্রানী। যার জন্য কোন জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ ওরা মৃত্যুর সময় এলে ঝোপ-জঙ্গলে কোথায় অন্ধকারে চলে যায়, দেখা যায় না। কেন এ-রকম হয় আমার জানা নেই।

মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভীতি প্রথম থেকে চলে আসছে। আমাদের আশেপাশে যারা আছে, নিজের আপনজন, পরিবারের লোক কেউ মারা গেলে আমরা শোকে আকুল হয়ে যাই। মূল কথা এটাই যে, কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। দ্বিতীয়, যিনি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁর আপনজন যাঁরা আছেন, তাঁদেরও কষ্ট হবে। মৃত্যুজনিত শোক নিবারণের জন্য আমরা অনেক কিছু করি। রোগ-ব্যাধি হলে যেমন আমরা ওষুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করি, ঠিক তেমনি এই শোক, মৃত্যু ভয় থেকে বাঁচার জন্য আমাদের তো কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। বেশির ভাগ বাড়িতেই কিছু কিছু দরকারি ওষুধ রাখা থাকে, যেমন মাথা ব্যাথার ওষুধ, পেট খারাপের ওষুধ, সর্দিজ্বরের ওষুধ রাখা থাকে। ঠিক তেমনি মৃত্যু যন্ত্রণা যখন আসবে, তখন আমরা কি করব, এর প্রস্তুতি রাখা অত্যন্ত জরুরী। হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, এই ধর্ম মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করিয়ে দেয়। আমাদের হিন্দু ধর্মে যে বর্ণাশ্রমের প্রথা রয়েছে, এই প্রথা যেন মানুষকে বাচ্চা বয়স থেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করিয়ে দিচ্ছে। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর একটা বই পড়ছিলাম, তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন, সেখানকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, এখানকার লোকেদের মৃত্যু নিয়ে এত ভয় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। হিন্দুরা, বৌদ্ধরা, জৈনরা মৃত্যুকে ভয় পায় না।

আমেরিকাতে ধর্মমহাসভা শুরু হওয়ার আগে মিস্টার রাইটের সৌজন্যে স্বামীজীর এখানে ওখানে যেতেন আর সেখানে পার্লার মিটিংএর মত হত, তার কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এক জায়গায় কিছু কথাবার্তা হতে হতে স্বামীজী বলছেন, আমরা প্রাচ্যের লোকেরা মানুষকে মরতে শেখাই, কিভাবে মরতে হয় শিখিয়ে দিই। স্বামীজী আরও অনেককে এই কথা বলেছেন, Come, I will help to teach you how to die। Dignified deathএর জন্য আপনার দরকার dignified withdrwal। যদি dignified withdrwal না হয়, এই সংসার থেকে, জগৎ থেকে যদি একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে না আসেন, কিভাবে সরিয়ে আনবেন, in a dignified way, কাপুরুষের মত না, চোরের মত না। চোর অন্ধকারে লুকিয়ে সবার চোখকে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়, এভাবে না; in a dignified way। Dignified withdrwal না হলে dignity in death থাকে না। তখন একজন ভদ্রলোক স্বামীজীকে বলছেন, we know how to live। স্বামীজী তার উত্তরে বলছেন, you know nothing। অর্থ হল, যে মরতে শিখল না, সে বাঁচতে কি করে শিখবে। এই তত্ত্বকে বোঝা খুব কঠিন।

বর্তমান কালে ভারতের লোকেরা যেখানেই যায়, প্রচুর খরচ করে। ভারতে একদিকে যেমন বেশির ভাগ লোকের কাছে টাকা-পয়সা নেই, অন্য দিকে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে যাদের আছে তারা প্রচুর খরচ করছে। তীর্থাদিতে গিয়ে পয়সা খরচ করাটা ভারতের পরম্পরাতেই ছিল। কি রকম খরচ করে? জীবন-যাপন কেমন হবে? রাজার মত। কিন্তু মাঝখান থেকে আমরা ভুলে যাচ্ছি, মরতে কিভাবে হয়। মৃত্যু যখন সামনে আসে তখন কিভাবে আপনি dignified wayতে দাঁড়াবেন? এটা যদি না শেখেন, জীবন জিনিসটাকে কোন দিন শিখতে পারবেন না। জীবনকে যদি বুঝতে হয়, মৃত্যুকে বুঝতে হবে। এর জন্য প্রথমে দরকার দেহ, মন ও বুদ্ধি থেকে নিজেকে আলাদা করা।

চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, এবার সময়ের সাথে সাথে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়, নিজেকে বুঝতে হয় কিভাবে আমরা দেহ, মন ও বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে আছি। বুঝে নিয়ে এবার নিজেকে ওই দেহ, মন ও বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে না থেকে ওখান থেকে কিভাবে নিজেকে সরিয়ে আনা যায়। সরিয়ে আনার জন্য দরকার সাধন-ভজন; জপধ্যান করা, পূজা-অর্চনা করা, শাস্ত্র পাঠ করা; এর প্রত্যেকটাকেই দিনে দিনে একটু একটু করে বাড়াতে হয়। এগুলোকে একটু একটু করে না বাড়ালে বৃদ্ধ অবস্থায় খুব কষ্ট হবে, নানা রকম দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা এসে মনকে গ্রাস করে নেবে। মনের ভিতরে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, সাধন-ভজন না থাকলে এই ইন্দ্রিয়ের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। বয়স হলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষমতা কমে আসে। ভাল উপাদেয় খাবার দেখলে খেতে ইচ্ছে হবে, কিন্তু হজম করার ক্ষমতা তখন আর নেই। চোখের সামনে দিয়ে সব বেরিয়ে চলে যেতে দেখলে স্বাভাবিক মনে কষ্ট হবে। বয়সের সাথে সাথে

সংসারের প্রতি টানটা কমানো, যার জন্য আমাদের ঋষিরা বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা নিয়ে এলেন। একটা সময় থেকে বাড়িতে থেকেই বাণপ্রস্থী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে। সময়ের সাথে সাথে বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসীর ভাব না বাড়ালে অনেক রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তার সঙ্গে সাধন-ভজনের কোন একটি পথ, যেমন ইষ্টে মন দেওয়া।

আমাদের ঠাকুর একটা নূতন যুগের সূচনা করে দিয়ে গেলেন। ঠাকুর এই কিছু দিন আগের লোক, অবতার পুরুষ, তাঁর প্রতি মন দেওয়া খুব সহজ। কথামৃতে ঠাকুর আমাদের অনেক কিছুর শিক্ষা দিচ্ছেন। একটু পরেই বলবেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। কিন্তু কথামৃতের মূল একটা বৈশিষ্ট্য হলে, আধ্যাত্মিকতা কি জিনিস, আর সেটা যে সত্য; ঈশ্বর যে সত্য, পদে পদে ঠাকুর কথামৃতে শিক্ষা দিচ্ছেন। তার সঙ্গে আমাদের যে বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন যে মতগুলো আছে, তাঁরা জিনিসগুলোকে কিভাবে দেখেন, সেগুলোকে মাঝে মাঝে বলা। মূলে হল আমাদের এটা বোঝান যে, ঈশ্বর সত্য।

এবার ঠাকুর বলছেন, **ভক্তিমতে অবতার**। অবতার তত্ত্ব, অবতার, এই বিষয়ের উপর আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি, বর্ণনা করেছি। ভগবান যখন নরদেহ ধারণ করে আসেন, তখন তাঁকে বলছি অবতার। এই স্থূল জগতে ভগবান শুধু নরদেহ ধারণ করেই এসেছেন, তা না; যে কোন প্রানীর দেহধারণ করে তিনি আসতে পারেন, যেমন কখন বরাহ অবতার, কখন মৎস্যাবতার বা নৃসিংহ অবতার। মানুষ রূপ ধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর প্রতি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ তৈরী হয়, তাঁকে আমাদের মতই একজন মনে হয়। কাকে আমরা অবতার মানব, কাকে মানব না, এই নিয়েও অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। অবতারের আশেপাশে যাঁরা থাকেন, ওনারা পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে ইনি অবতার হয়ে এসেছেন এবং সময়ের সাথে সাথে তাঁর প্রভাব বিস্তার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারেই আমরা দেখছি, সময়ের সাথে সাথে ঠাকুরের প্রভাব কিভাবে বেড়েই চলেছে।

ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেকেই ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যখন শরীরে ছিলেন, তখনও অনেকেই তাঁকে অন্য জায়গায় প্রত্যক্ষ করছেন। আজকের দিনেও যদি কেউ ঠিক ঠিক ধ্যান করেন, তিনিও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করবেন। কারণ তিনি হলেন চৈতন্যের মূর্তরূপ। কল্পনা করে মানুষ এক রকম দেখে, স্বপ্নে আর-এক রকম দেখে; কিন্তু যখন চৈতন্যের মূর্তরূপ দেখবে, তখন অন্য রকম দেখবেন। আপনি যাকে ভালবাসেন, তার কথা চিন্তা করলে চিন্তায় তাকে এক রকম, সামনে থেকে দেখলে অন্য রকম দেখবেন; আবার স্বপ্নে আর-এক রকম, ছবিতে অন্য রকম দেখবেন। ঠাকুরের উপর যখন ধ্যান করবেন, তখন যে ঠাকুরকে দেখছেন, সেখানে তিনি জীবন্ত। ঠাকুরের ছবির উপর ধ্যান করতে নেই। এর অর্থ, ধ্যানটা কল্পনা, মন দিয়ে ওই কল্পনাটা করতে হয়। মন যদি একাগ্র হয়ে যায়, তখন চৈতন্য যিনি আমাদের ভিতরে আছেন, তিনি চৈতন্য রূপে আমাদের সামনে ভেসে উঠবেন। আপনার অনুভব না থাকার জন্য এখন এটাকে বোঝান অসম্ভব যে, ওই দর্শনটি কেমন হবে। সত্যি যখন দর্শন হবে তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, দর্শনটি কেমন হয়েছে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন, এটা কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, একেবারে বাস্তব।

অবতার ব্যাপারটা জ্ঞানমার্গীরা কিভাবে দেখেন? জ্ঞানমার্গীরা মনে করেন, চৈতন্য যেন একটা মহাসমুদ্র আর সবটাই ঢেউ; এক-একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে, যেন চৈতন্য মহাসমুদ্রে একটা ঢেউ উঠল। সেই ঢেউএর মধ্যে অবতারও আছেন, বিভিন্ন জীবরাও আছে। কোনটা ছোট ঢেউ, কোনটা বড় ঢেউ। জ্ঞানীরা এভাবে দেখেন। কিন্তু ভক্তিমতে ভগবান সাক্ষাৎ। জ্ঞানীরা বলবেন, তিনিও একটি বড় ঢেউ। এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করাটা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য না; ঠাকুর যেমনটি বলেছেন সেটাকে নিয়েই আমরা এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করছি।

কর্তাভজা মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, 'বাবা, ভিতরে বস্তুলাভ হয়েছে, অত নেচো-টেচো না'। আসলে ভিতরে যখন বস্তুলাভ হয়, আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত হয়, তখন মানুষ অনেক ধীর-স্থির

হয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুর অবতার, তিনি জ্ঞান-ভক্তি শিখাতে এসেছেন, ঠাকুরের জন্য এগুলো খাটে না। কর্তাভজারা জানেন না যে ঠাকুর অবতার। **আঙুর ফল তুলোর উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না**। কঠোপনিষদেও যমরাজ নচিকেতাকে এই কথা বলছেন। সাধনা করার সময়ও জিনিসটাকে ঠিক এই ভাবে দেখতে হয় –গর্ভিণী যেভাবে নিজের গর্ভ রক্ষা করেন, আধ্যাত্মিক ভাবকে ঠিক সেইভাবে রক্ষা করতে হয়।

ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে কর্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর মানুষ রতন আছে। এখানে একটু ব্যাখ্যা করার আছে। আমাদের যখন বয়স কম ছিল, তখন অনেক ধরণের উল্টোপাল্টা আলোচনা শুনতাম যে, কাজ করতে নেই। আমাদের অনেক মহারাজরা আছেন, যাঁদের এই নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। কাজের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর সেখান থেকে যখন বস্তুলাভ হয়, তারপর যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হল, তারপর এক অন্য ধরণের কর্ম হয়। কিভাবে? আমাকে এই কাজ করতে হবে, কারণ আমাকে এই কাজের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা আমার দায়ীত; এতে কর্মের বন্ধনটা চলে যায়। তার জায়গায় হয়, আহা! আমি জেনেছি, আমি এবার চারজনকে জানাব। ঠাকুর যখন প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন, এবার তিনিই আপনাকে বলে দেবেন, কি করবে, কি করবে না।

আগেকার দিনে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কথা ভাবুন, পরিবারের একটি মেয়ে, সবাই তাকে ভালবাসে। মা ছোটবেলা থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে কিভাবে রান্না করতে হয়, ঘরদোর কিভাবে সামলাতে হয়। বাবা তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, দাদা, দিদিরা ভালবাসে, বিশেষ করে বাড়িতে যদি একটিই কন্যা সন্তান থাকে। বিয়ের বয়স হল, বিয়েও হয়ে গেল, এরপর বিদায়। কন্যা এবার শ্বশুড় বাড়ি চলে যাচ্ছে, সবাই কাঁদছে। মেয়ের বিদায়ে সব বাড়িতেই কাঁদে। এখন আর আগের মত সেই কান্নাকাটি অতটা নেই, সব এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। সেই আদুরে মেয়ে এখন একজন পুরুষের অধীন হয়ে গেল, সে তার স্বামী। কন্যা এখন গৃহবধূ, সে এখন তার স্বামীর কথামত চলবে। যেটা করতে যাবে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে সেই কাজে এগোবে, বাপের বাড়ি যেতে গেলেও স্বামীকে জিজ্ঞেস করে যাবে। এটাই ছিল আমাদের এখানকার বিধান। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হলে ঠিক এই রকমই হয়। সংসারটা হল বিবাহিতা নারীর বাপের বাড়ির মত। বিয়ে হয়ে গেল, বাপের বাড়িকে বিদায় দিয়ে চলে এলো স্বামীর ঘরে। ঈশ্বরদর্শনেও এই সংসারকে বিদায়, এবার আপনি ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুরই আপনাকে সব কিছু বলে দেবেন, আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি আপনাকে বলে দেবেন, এটা করো, এটা করো না। এসব কথা কোন কল্পনা করে বলা হচ্ছে না, কোন ভাবাবেগের উচ্ছাসে বলা হচ্ছে না। সেইজন্য বেশি ছটফট করবেন না। সংসারে কাজ করুন, ঠাকুরকে ভালবাসুন, মাথা ঠুকে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন; এই সব করতে করতে জানতে পারবেন, আগে যে কাজগুলো করছিলেন, সেগুলো এক রকম ছিল, এই কাজগুলোই আপনাকে ওখানে নিয়ে গেছে। বাবা-মা আপনাকে তৈরী করলেন, সেখান থেকে আপনার ভাল জায়গায় বিয়ে হল। এরপর পুরো ব্যাপারটা অন্য রকম চলতে শুরু করল।

আমার খাওয়ার সময় সে বলত, বাবা তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছো?

এই 'আমি' জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলেছিল 'এ আমি যত যাবে, তাঁর আমি তত আসবে'। মানুষ প্রজাতির মধ্যে এত বেশি অহঙ্কার যে, জ্ঞান হতে চায় না। নরেন্দ্রনাথ যেটা বলছেন, এটা একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্য। অনেকেই এটা মানতে চাইবেন না, একগুচ্ছ প্রশ্ন করবেন, এখানে তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। আমি দেখেছি, আমাদের রামকৃষ্ণ গোষ্ঠিতে যাঁরাই বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসেন, কেউ পিএইচডি, কেউ পোস্ট ডক্টরেট, দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় সব ডিগ্রি নিয়ে আসা, কোথাও এনাদের এই 'আমি'টা এমন থাকে যে, ঈশ্বরকে ঢুকতেই দেন না। অথচ আমাদের এখানে যাঁরা অতি সাধারণ ছিলেন, তাঁরা কত ঠাকুরের কাজ, সঙ্ঘের কাজ করে গেছেন। এমন এমন কাজ করেছেন, এখনও ভাবলে অবাক লাগে। এটা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁর 'আমি' যত কম, তিনি তত বেশি কাজ করেছেন। আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী

গম্ভীরানন্দজী এখানে আসার পর সংস্কৃত ভাষা শিখলেন। শাস্ত্রের অনুবাদে তিনি পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বন্যা এনে দিলেন। **কেদার বলে, কুম্ভের ভিতরের মাটি যতখানি থাকবে, ততখানি এদিকে জল কমবে**।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে আমায় পাবে না। একটু শক্তি হতে পারে। গুটিকা সিদ্ধি, ঝাড়ানো, ফোঁকানো; ঔষধ-দেওয়া ব্রহ্মচারী; তবে লোকের একটু উপকার হয়। কেমন? ছোট হয়ে যাওয়া, বড় হয়ে যাওয়া, ভারি হয়ে যাওয়া, হাল্কা হয়ে যাওয়া এই ধরণের আট রকমের সিদ্ধির কথা বলা হয়; বলে তপস্যা, সাধনা করলে এগুলো নিজে থেকেই আসে। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলো আমিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সংসারের আমিত্ব যতটা থাকবে, ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বরের প্রবেশ ততটা কম হবে। অষ্টসিদ্ধি হল সাংসারিক ক্ষমতা, যেটা আমিত্বের আর-একটি রূপ।

তাই মার কাছে আমি কেবল শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলাম; সিদ্ধাই চাই নাই।

ঠাকুর যদি অবতার হন, তার চাওয়া না চাওয়াতে কি আর আসে যায়। আমাদের জন্যই চাওয়া। সেই ছোটবেলা থেকে আমরা ভগবানের এমন বর্ণনা শুনে এসেছি, যখন যা দরকার পড়ে, যখন যা কিছুর অভাব হয়, ঠাকুরের কাছে আমরা হাতজোড় করে প্রার্থনা করি –প্রভু, আমার এটি তুমি করে দাও। শ্রোতাদের অনেকেরই বয়স হয়েছে, এবার তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নিয়মিত একটাই প্রার্থনা করতে হয় –হে প্রভু! কৃপা কর, আমি যেন তোমার মধ্যে আরও বেশি বেশি ডুবে যেতে পারি। তার মানে আমার যে আমিত্ব, তোমার ভিতরে গিয়ে যেন নাশ হয়ে যায়। কঠোপনিষদে বলছেন, শুদ্ধ জল যেমন শুদ্ধ জলে মিশে একাকার হয়ে যায়, আমিও যেন শুদ্ধ জল হয়ে তোমাতে মিশে যাই। এই ভাব নিয়ে, এই প্রার্থনা নিত্য করে যেতে হয়। এক মাস, দু মাস, এক বছর, দু বছর, দশ বছর, কুড়ি বছর, না হলে আগামী জন্মে করতে করতে আমিত্বের ভাব চলে যেতে শুরু করবে। আমিত্বের ভাব কমে যাওয়ার আরও অনেক কিছু আছে, যেমন কারুর দোষ দেখতে পেয়েও কিছু না বলা, নিজের বাক্ এবং মনের উপর সংযম রাখা ইত্যাদি।

বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাস্টার, মণি মল্লি প্রভৃতিকে এইকথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্যশূন্য, চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। এই বর্ণনাগুলো পড়তে পড়তে আমি অবাক হয়ে ভাবি, কত কাতর হয়ে ঠাকুর মায়ের কাছে শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলেন, শুধু এই কথাটুকু বলতে বলতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন; কল্পনা করা যায়! আমাদের এতটা হয়ত হবে না, কিন্তু কাছাকাছি হবে। ঠাকুরের কাছে যখন যাচ্ছেন, তখন প্রার্থনা করছেন, ঠাকুর তোমার যে শুদ্ধস্বরূপ, সেই শুদ্ধস্বরূপে যেন আমি প্রবেশ করতে পারি। প্রবেশ করতে হলে আমাকেও শুদ্ধ হতে হবে, তা নাহলে তো রং আলাদা হয়ে যাবে। আপনি কাঁচের গ্লাশে এক গ্লাশ শুদ্ধ জল রেখেছেন, সেই জলে যদি এমন জল দিলেন যাতে রং আছে বা ময়লা আছে, তাতে তো জল শুদ্ধ হবে না। ঠাকুরের মধ্যে প্রবেশই হবে না। আসলে মন সূক্ষ্ম না হলে পেরোতে পারবেন না, আমিত্ব থাকলে মন সূক্ষ্ম হবে না।

বাহ্যশূন্য, চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন –মাস্টারমশাই এই বর্ণনাগুলো না দিলে আমরা ঠাকুরের সমাধির কিছুই বুঝতে পারতাম না। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা টুকটাক যেটুকু বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা দিয়ে হয়ত একটু ধারণা হত। আমাদের চারটি বেদে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বেদের পর একমাত্র কথামৃত ছাড়া আমরা আর কোথাও ঈশ্বরের এই রকম সাক্ষাৎ বর্ণনা পাই না। শাস্ত্ররূপে আর হয়নি, এই ব্যাপারে বেদের পরেই কথামৃতেই ঈশ্বরের এত সুন্দর বর্ণনা এসেছে। গীতা, পুরাণ বেদেরই বর্ণনা করছেন, তবে একটু অন্য ভাবে। সেই দৃষ্টিতে কথামৃত নূতন বেদ। বেদের যে মূল উদ্দেশ্য –স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ এবং মহাকারণ, এগুলোর বর্ণনা করা; এখানে কথামৃতেও নূতন করে ঠিক তাই বির্বিবা করা হচ্ছে। যার জন্য বেদ আর কবিতা বলে মনে হয় না। বর্তমান কালে বেদকে সমস্ত কিছুর অর্থে নেওয়া হয়, কেউ কবিতার অর্থে নিচ্ছেন, কেউ ইতিহাস অর্থে নিচ্ছেন, কেউ আবার ভূগোলের জ্ঞান আহরণের জন্য বেদ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বেদ যে আধ্যাত্মিক সত্য, সেটা

লোকেরা প্রায় ভুলেই যাচ্ছে। **সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন – হলাম যার জন্য পাগল তারে কই পেলাম সই**।

ঠাকুরের গানের মাঝখানেই রামলাল এসেছেন, ঠাকুর ওনাকেও গান গাইতে বলছেন। রামলালও কয়েকটা গান গাইলেন। প্রথমে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গাইলেন। পরে ঠাকুরের ইঙ্গিতে রামলাল আবার গোপীদের উন্মাদের অবস্থার গান গেয়ে শোনালেন। এই পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশাই বর্ণনাটা পরের পরিচ্ছেদে নিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিভক্তি হইলে আর জাতিবিচার থাকে না। জাতি হল কর্ম। বিদ্যার প্রতি সম্মান যে কোন সমাজেই আছে। ইউনিভার্সিটিতে যাঁরা পিএইচডি করছেন আর যাঁরা সবে কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছেন, দুজনের মধ্যে তফাৎ তো একটা থাকবেই। হিন্দু সমাজ যেন একটা ইউনিভার্সিটি, তখনকার দিনে যে সমাজের লোকেদের মধ্যে সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি, তাদেরকে নিচু করে দেখা হত, আবার যাঁরা নিজেদের সুসংস্কৃত করে নিয়েছেন, সমাজে তাঁদের স্থান উপরের দিকে চলে যেত। মনুস্মৃতিতে বারবার দেখানো হয়েছে যে, উদ্দেশ্য হল সবাইকে ব্রাহ্মণত্বে নিয়ে আসা, তারপর সেখান থেকে যার যার নিজের পেশার কাজে নিযুক্ত হবেন; যেটা বর্তমান কালে হচ্ছে। হিন্দু ধর্মের ডায়নামিক নেচার হিন্দু সমাজকে উপরে নিয়ে এসেছে; বাকি কিছুটা ইংরেজদের অবদান, কিছু মুসলমানদের অবদান, অবশিষ্টটা সংবিধানের অবদান। যার ফলে আজ আমরা সবাইকে সমান দেখছি। কিন্তু ঠাকুরের সময় সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এগুলোকে নিয়ে ভেদাভেদটা প্রবল ছিল। যারা ভেদাভেদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যেতেন, তাদেরকে সমাজ শোধারক বলে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিত। কিন্তু ওই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও ঠাকুর বলছেন –হরিভক্তি থাকলে জাতবিচার থাকে না। আপনারা আজ কল্পনাও করতে পারবেন না, আগে যাদের নিচু জাতি বলা হত, আজ তাঁরাই আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে এসে কি কি কাজ করছেন। সবাই আমরা এখানে একসাথে আছি, কোথাও কোন ভেদাভেদ নেই, প্রশ্নই নেই। কারণ আমরা এখানে ঠাকুরের ভাবে সবাই একজোট হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আর এটাই ঠিক ঠিক হিন্দু ভাব।

আসলে ঠাকুর এখানে ভক্তির মহিমা বলে যাচ্ছেন। ১) ভক্তি অবতার মানে, ২) ভক্তি আমিত্বকে নাশ করে, ৩) ভক্তি সিদ্ধাই আদি থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ৪) ভক্তি জাতিভেদ মিটিয়ে দেয়।

ঠাকুর মণি মল্লিককে বলছেন, তুমি তুলসীদাসের সেই কথাটি বল। তখন মণি মল্লিক বলছেন – **চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় –গঙ্গা, যমুনা, সরযূ আর কত নদী ও তড়াগ রয়েছে, কিন্তু কোন জল খাবে না। কেবল স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে থাকে**।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অর্থাৎ তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা।

ঠাকুর ভক্তিমতে অবতার এটা দিয়ে শুরু করে এখানে এসে বিচারটা শেষ করছেন –ভক্তি কেন দরকার, ভক্ত ধ্রুবের কাহিনী আমরা সবাই জানি। ধ্রুব তার পিতার কোলে বসতে গেল, সৎ মা তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। কাঁদতে কাঁদতে সে মায়ের কাছে চলে এসেছে। মা ধ্রুবকে বলছেন –ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা কর। একটা পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা, কার ভরসায় বড় হবে এখন? তার মা অসহায়, বাবা অসহায়। বাবা সৎ মায়ের সামনে একটা ভেড়া হয়ে আছে, স্ত্রীকে কিছু বলতে পারছে না, কি কারণ বলা যায় না। ধ্রুবকে কোল থেকে নামিয়ে দিল, বাবা স্ত্রীকে কিছুই বলতে পারল না। যার শক্তি নেই সে তো নির্বল, যাঁর শক্তি আছে সেই ভগবান। তোমার নালিশ করার জায়গা যখন কোথাও নেই, যার কাছে গিয়ে যে তুমি কিছু বলবে, সে-রকম কেউ যখন নেই; তখন তুমি তোমার সব কষ্টের কথা ঠাকুরকে বল, কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বলো। কারণ ঈশ্বর সত্য, তাঁর হাত, পা, চোখ, কান সব জায়গায় আছে। তিনি সব দেখছেন, সব শুনছেন; উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ হলে হবে না। মন-প্রাণ এক করে

ঠাকুরকে বলুন, প্রভু! আমার তো আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, আমি তাই তোমার শরণাগত। ভক্তি এই ভাবে আমিত্বের পুরো নাশ করে দেয়, যেটা যোগপথে হয় না, জ্ঞানপথে হয় না, কর্মপথে হয় না। তুলসীদাস ভক্তিমার্গের একজন খুব উচ্চমার্গের সাধক; তাঁর কথাই এবার বলা হচ্ছে।

মণি মল্লিক –আর একটি তুলসীদাসের কথা –অষ্টধাতু পরশমণি ছোঁয়ালে সোনা হয়ে যায়। তেমনি সব জাতি –চামার, চণ্ডাল পর্যন্ত হরিনাম করলে শুদ্ধ হয়, "বিনা হর্‌নাম চার জাত চামার"।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যে চামড়া ছুঁতে নেই, সেই চামড়া পাট করার পর ঠাকুরঘরে লয়ে যাওয়া যায়।

সত্যিকারের ঘটনা, বিসমিল্লা খান সানাই বাজাতেন। ওনাকে একবার কোন একটা মন্দিরের প্রোগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখনও তাঁর সেই রকম নামডাক হয়নি। অনেকে আপত্তি করেছে, একজন মুসলমানকে কেন মন্দিরের প্রোগ্রামে আনা হয়েছে। তখনকার দিনে এই জিনিসগুলো বেশি মাত্রায় ছিল। সেখানে এক ভদ্রলোক ঠিক এই উদাহরণটাই দিয়েছিলেন। আপনারা চামড়ার জুতো মন্দিরের বাইরে ছেড়ে এসেছেন, সেই চামড়ারই ঢোল করা হয়েছে, যাকে কিনা মন্দিরের ভিতর রাখা হয়েছে। ইনি একজন ভক্ত, ওনার আর কোন পরিচয় নেই। মহম্মদ রফি খুব নামকরা গায়ক। মুম্বাইয়ের রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুর্গাপূজার সময় তিনি একবার এসেছিলেন। তিনি পর পর ভক্তিমূলক গান গেয়েই চলেছেন। এক-দুজন তাঁকে সিনেমার গান গাইতে অনুরোধ করলেন। রফি সাহেব স্পষ্ট করে বলে দিলেন, এখানে ওসব গান আমি করতে পারব না।

ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। ঠাকুর এটাই বলতে চাইছেন। নিজেকে যদি পবিত্র করতে হয়, ঈশ্বরের নাম করলেই তিনি পবিত্র হয়ে যাবেন। তিনি তো পবিত্র হবেনই, তার সাথে অপরকেও তিনি পবিত্র করে দেবেন। যে তাঁকে স্পর্শ করবে, যে তাঁর সংস্পর্শে আসবে, তাকেও তিনি পবিত্র করে দেন।

একটা অতি সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার ভিতরে কি ভক্তি বাড়ছে? আপনার ভিতরে কি আধ্যাত্মিক ভাব বাড়ছে? আপনি কি ধর্মপথে এগোচ্ছেন? হয়ত আপনাদের মনে এই ধরণের প্রশ্ন আসতে পারে। এর উত্তর অতি সহজ। আপনার আশেপাশে যাঁরা আছেন, আপনার যাঁরা সঙ্গ করেন, কজন তাঁদের মধ্যে সোনা হয়ে যাচ্ছেন? কারণ ঠিক ঠিক ভক্তিভাব আপনার ভিতরে এলে আপনি পরশমণি হয়ে যাবেন। যিনি ভক্ত, যাঁর মধ্যে ধর্মভাব জেগেছে, তিনি পরশমণি হয়ে যান। আপনার সংস্পর্শে এসে মানুষ কি ভগবানের দিকে যাচ্ছে? যদি বোঝেন যাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন আপনি এগোচ্ছেন। যদি সে-রকম কিছু না হয়ে থাকে, তাহলে বুঝবেন আপনি এগোচ্ছেন না। খুব সহজ মাপকাঠি। ভক্তরা এসে আমাদের বলেন, মহারাজ আমাদের কি কিছু হবে? হবে কিনা জানিনা, তবে হয়েছে কিনা সেটা আমি বলতে পারি। কিভাবে? আপনার সংস্পর্শে যাঁরা আসছেন, তাঁর কি সোনা হয়ে যাচ্ছেন? **তাই নামকীর্তন করতে হয়**। ঈশ্বরের নামগুণগান না করলে ভক্তি কি করে হবে!

আমি যদু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসার চিন্তাই আসবে। স্বাভাবিক, সারা জীবন যেটা করে এসেছেন, মৃত্যুর সময় ওই চিন্তাই আসবে। **পরিবার, ছেলেমেয়ের চিন্তা –উইল করবার চিন্তা –এই সব আসবে; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নামজপ, নামকীর্তন অভ্যাস করা**। শুরু করুন, সকাল-বিকাল দরজা বন্ধ করে হাততালি দিয়ে গান করুন – রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ শুভনাম। রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ ভগবান। জয় জয় রামকৃষ্ণ শুভনাম। জয় জয় রামকৃষ্ণ ভগবান। অথবা নিজের মত একটা গান পছন্দ করে হাততালি দিয়ে দু-বেলা করুন। এই অভ্যাস যদি থাকে, তবে গিয়ে মৃত্যুর সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। যদি অভ্যাস করতে থাকেন তবেই আসবে, তা নাহলে আসবে না। আপনি কষ্ট পাবেন, আপনার লোকেরাও কষ্ট পাবেন। আপনি চলে যাওয়ার পর লোকেরা এসে জানতে চাইবে, ওনার মৃত্যুটা কেমন হল? 'আর বলবেন না, মৃত্যুর সময় অসহ্য যন্ত্রণায় পুরো চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল, সর্বাঙ্গে বেদনার ছাপ'। যদি বলেন, 'আহা, আমার বাবা হরিনাম করতে করতে কি সুন্দর চলে গেলেন'। কত আনন্দের কথা।

আপনার বাড়ির লোকেদের কথা একটু ভাবুন। হয়ত সারা জীবন আপনাকে নিয়ে তাঁদের অহঙ্কার করার কোন সুযোগ দিতে পারেননি, কিন্তু যদি বলেন, ‘আমি চললাম তোমরা এখন একটু হরিনাম করো সবাই’। ভাবুন, বাড়ির লোকেদের সারা জীবন এই ভেবে কত আনন্দ হবে, আমার বাবা কেমন হরিনাম করতে করতে চলে গেলেন, বাড়ির লোকেদের সারা জীবন আনন্দ হবে। সেটাই ঠাকুর এখানে বলছেন –**এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। বিড়াল ধরলে পাখির ক্যাঁ ক্যাঁ বুলিই আসবে, তখন আর ‘রাম রাম’ ‘হরে কৃষ্ণ’ বলবে না**।

নিজকে আগে থেকেই প্রস্তুত করতে হয়। পাখিকে যতই রাম রাম বুলি শেখান, বেড়াল ধরলে সে ক্যাঁ ক্যাঁই করবে। কারণ মৃত্যুর সময় প্রানী অন্ধকারের দিকে যায়, মানুষই একমাত্র প্রানী যে আলোর দিকে যায়। মানুষের ক্ষমতা আছে, মৃত্যুর সময় সে হরিনাম করতে পারে।

মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁহার নাম করা। হাতি নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে আর ধুলো কাদা মাখতে পারে না। ঠাকুর নির্জন বাসের কথা বলছেন, নির্জনবাস না করলে ঠাকুরের নাম কি করে হবে! আপনারা যখন হরিদ্বার যান, কাশী যান, বৃন্দাবন যান, পুরী যান, পুরো গুষ্টিশুদ্ধুকে নিয়ে যাবেন; একা একা যান না। কোথাও কোন আশ্রমে থাকবেন, দুটি দুটি খাবেন আর হরিনাম করবেন। যদি আশ্রমে জায়গা না পান, সঙ্গে একজনকে নিয়ে যাবেন, একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকুন কিছু দিন; একটু কষ্ট অন্তত করুন। সারা জীবন তো আরামেই থাকলেন। নির্জনবাস করলে মনটা গভীরে যাবে, মনটা সূক্ষ্ম হবে, এই সূক্ষ্ম মনটাই আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করাবে।

ঠাকুর বলরামের পিতা, মণি মল্লিক, বেণী পাল আদি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মৃত্যুর সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল, এই বিষয়ের উপর আমরা একটা লম্বা আলোচনা করলাম। ভোগবাদীরা ইদানিং ভোগ করার জন্য নূতন নূতন উপায় বার করে, যেমন একটা খুব প্রচলিত কথা হল –You live only ones। যত যাই কর তুমি একবারই বাঁচবে, তার মানে যা ভোগ করার এই জীবনেই ভোগ করে নাও। এগুলো নূতন কিছু কথা না। চার্বাকদের একটা প্রধান বাক্য হল, *যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*; যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, দরকার হলে ঋণ করে ভোগ করবে। দুই ধরণের লোক আছে –যোগী আর ভোগী। তৃতীয় এক ধরণের লোক আছে, রোগী; এদের কথা বলে আর লাভ নেই। ভোগী অনেকেই হন, যোগী কম হন। আমার আপনার মত সাধারণ লোকেরা ভোগীদের সঙ্গে থাকলে ভোগী হয়ে যাব, যোগীদের সঙ্গে থাকলে যোগী হওয়ার চেষ্টা করব, কারণ যোগী হওয়া সহজ নয়। তুমি একবারই বাঁচবে, এটাও ওই একই সিদ্ধান্ত। মৃত্য আসবে, ভোগী বলবে, চল যতটা পারি ভোগ করে নিই। কিন্তু যিনি যোগী, যাঁর ভিতরে ভক্তিভাব জেগেছে, যাঁর ভিতরে ধর্মভাব জেগেছে বা যাঁর মন উচ্চচিন্তা নিয়ে থাকতে চাইছে, তিনি বলবেন; আমার তো সময় নেই তাই যতটা সম্ভব শ্রেষ্ঠতা লাভ করে মৃত্যুকে বরণ করি।

আপনি যে মন্দিরে যেতে ভালবাসেন, আমি যেমন বেলুড় মঠের মন্দির ছাড়া কিছু জানিনা, তখন মন্দিরের বিগ্রহের দিকে যখন তাকাবেন, তখন হয়ত হাতজোড় করে বলবেন, প্রভু! কে জানে, এই হয়ত তোমাকে শেষ দেখছি; কাল সকালে হয়ত বিছানা থেকে নাও উঠতে পারি। আপনজনকে যখন বললাম, আমি চললাম, কতটা আপন বোধ থাকে, ভালবাসার বোধ থাকবে, আপনার যিনি অতি প্রিয় তাঁকে কিভাবে বাই বাই করবেন? ছেলে যখন বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়তে বা চাকরি করতে যায়, তখন মা কিভাবে স্টেশনে এসে ছেলেকে ছাড়ে; ঠিক সেইভাবে প্রভুকেও বিদায় জানাতে গিয়ে বলবেন, এই জীবনে এই হয়ত শেষ দেখা। ভোগীরা বলবে, শেষের দিকে যখন চলেই এলাম, তখন যতটা পারি ভোগ করে নিই। যত প্রেমের সাহিত্য, সিনেমাদি ওই ভাবকে নিয়েই এরা চলে। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, এই জীবন একটা বিরাট সুযোগ, কেন এই জীবনটাকে নষ্ট হতে দেব। শ্রেষ্ঠতা লাভ! যিনি কবি তিনি চাইবেন একটা শ্রেষ্ঠ কবিতা যেন দিয়ে যেতে পারি, যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি সেইভাবে ভাববেন।

আপনিও সেইভাবে ভাবুন, ঈশ্বরের প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসার ভাব, সেইটাকে অনুভব করে মারা যাব। যাই হোক, এই বিষয়ের উপর বিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। মাস্টারমশাই এবার লিখছেন –

বলরামের বাবা, মণি মল্লিক, বেণী পাল, এদের বয়স হয়েছে; তাই কি ঠাকুর বিশেষ তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য, এই সকল উপদেশ দিতেছেন?

আসলে প্রথমের দিকে সবাইকে একটু ভোগ করে নিতে হয়। কুড়ি-পঁচিশ বয়সে একটু দেখে নিতে হয় ভোগে কি আছে। কিছুই নেই। হাড়ির একটা ভাত টিপলেই বোঝা যায় হাড়ির ভাত কেমন। একটা জিনিস ভোগ করলেন, এবার আপনি ওর পুরো যে জাতি, সেটাকে জেনে গেলেন। যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে বুঝতে হবে বুদ্ধির অভাব আছে। আর তাই আমরা বারবার একই ভুল করি আর কাঁদি, আবার ভুল করি, আবার কাঁদি। এগুলো একটা সময় পর্যন্ত করার পর, জীবনটাকে একটা শ্রেষ্ঠ ভাবের দিকে নিয়ে যেতে হয়, কোন উচ্চচিন্তা, কোন সৃজনমূলক, সমাজসেবামূলক কোন কাজ; একটা অবদান রাখতে হয়, জীবনের একটা ছাপ ছেড়ে দিয়ে গেলেন। ষাট বছর হয়ে যাওয়ার পর, এবার নিজের জন্য ভাবতে হবে। শূন্য থেকে তিরিশ নিজের জন্য ভোগ, তিরিশ থেকে ষাট সমাজের জন্য অবদান আর ষাটের পরে যেটা হবে নিজের জন্য, সেটা ভাল হবে সমাজের জন্য –পুরোদমে আধ্যাত্মিক জীবনে ঢুকে যাওয়া। কিন্তু মূল কথা হল, প্রথম থেকে অভ্যাস যদি না থাকে তাহলে পুরোদমে আধ্যাত্মিক জীবনে ঢুকে যেতে পারবেন না। প্রথম থেকে যদি নিয়মিত সকালে উঠে একটু জপধ্যান, নিয়ম করে গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, কথামৃতপাঠ বা যেটা আপনার প্রিয় গ্রন্থ্ সেটার নিয়মিত পাঠ, এগুলো করতে থাকলে কি হয়, সেটা ঠাকুর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –নির্জনে তাঁর চিন্তা ও নাম করতে বলছি কেন? সংসারে রাতদিন থাকলে অশান্তি। দেখ না একহাত জমির জন্য ভায়ে ভায়ে খুনোখুনি। শিখরা বলে, জমি, জরু আর টাকা এই তিনটির জন্য যত গোলমাল অশান্তি। ঠাকুর যে কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলেন, জমি-জায়গা ওই কাঞ্চনের মধ্যেই পড়ে।

এই যে ঠাকুর বলছেন, সংসারে রাতদিন থাকলে অশান্তি; এটা প্রায়ই দেখা যায়, এই সমস্যাতে জর্জরিত লোকেরাই বেশি আমাদের কাছে আসেন। যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথা হয়, দু-চারটে কথার পরেই এই একটাই কথা, সংসারে অশান্তি, জীবনে কিছু হল না; একটু আশীর্বাদ করবেন যাতে একটু ভাল হয়, ইত্যাদি। আগে বয়স কম ছিল, সহানুভূতি জেগে যেত, লোকেদের সঙ্গে জড়িয়ে যেতাম। কিন্তু এখন বুঝে গেছি, যারা এই ধরণের কথা বলে, বুঝবেন এরা সংসারে পুরোদমে ডুবে আছে।

ছোট্ট একটা প্রশ্ন; আপনার জীবনে কি অশান্তি আছে? যদি থাকে, তাহলে অশান্তি দূর পরে হবে, আগে কারণটা দেখুন। কারণ কি? সংসারে মত্ত হয়ে আছেন, সংসারে পুরো মজে আছেন, এক মিনিটও সংসার ছাড়া থাকতে পারছেন না। অশান্তির কারণ যেটা, শান্তির উপায় সেখানেই। মাঝে মাঝে যদি সংসার থেকে বেরিয়ে আসা হয়, একটা শান্তির আভাস, শান্তির এক আলো, শান্তির এক আনন্দ আপনার জীবনে নেমে আসবে। তখন এর কাছে ওর কাছে দৌড়ে আপনি বলতে যাবেন না, সংসারে কেন অশান্তি। আমাদের সন্ন্যাসীদেরও যদি কোন কারণে মনটন চঞ্চল হয়ে যায়, মনে কোন অশান্তি হলে; বড়রা এটাই বলেন –ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসো, ঠাকুরের নাম করো। সমস্যা কি হয় জানেন, বেশির ভাগ লোক, সংসার যেটা, এটাকে আপনি সংসার সাগর বলুন, সংসার নর্দমা বলুন, সংসার স্বর্গ বলুন, সংসার সুখ বলুন, যাই বলুন; এটাতেই তাঁরা আনন্দ পান, এটাতেই তাঁরা বড় হন; তাঁদের সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি সব এটাতেই হয়। চাষবাশে গোবর দিলে যেমন ভাল ফসল হয়, তেমনি সংসার-গোবর দিলে তাঁরা আনন্দে থাকে। সেইজন্য যারা বলে সংসারে থাকব না, সংসার ছেড়ে চলে যাব; পারবে না, সংসার ছাড়া থাকতেই পারবে না, মরে যাবে।

কারণ আমরা যেখানে আছি, আপনারা যেখানে আছেন, সবাই আমরা কর্মবন্ধনে পাশবদ্ধ হয়ে আছি, আষ্টেপৃষ্টে আমরা বাঁধা, আমাদের উপরে কর্মবন্ধন এত বেশি যে, কোন দিকে যেতে দেয় না। এই কর্মবন্ধনকে কেটে দেওয়ার জন্য সংসারের মত এত ভাল জায়গা আর নেই। কর্মবন্ধনকে যদি কাটাতে চান, তাহলে আপনি ভেবে দেখুন, আপনার মনের ভাব, আপনার আবেগগুলো কিসের? কাম ভাবের আবেগ আছে? সংসার ছাড়া কামের পূরণ আর কোথায় হবে। ক্রোধ আছে? একা একা থাকলে কি ক্রোধ চলে যাবে? একা একা যদিও থাকেন, আপনার ক্রোধ বীজাকারে জমে থাকবে। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, আমাকে লোকেরা জানুক, আমাকে মানুক, এই জিনিসগুলো সংসারেই পূরণ হয়। ঈর্ষা, সংসারেই পুরো হয়। সমস্যা হল, সংসারে এই জিনিসগুলোর বৃদ্ধিও হয়। সংসারে যা কিছু করছেন, এটাকে যদি ওষুধ রূপে নেওয়া হয়, আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। যেমন যারা ড্রাগাসক্ত, ওই ড্রাগটাই যখন ওষুধ রূপে একটা বিশেষ মাত্রায় নিয়মন করে নেওয়া হয়, তখন ওই ড্রাগই নেশামুক্ত করে। তেমনি সংসারে যে আসক্তি, এই আসক্তি থেকে সংসারই মুক্তি করায়।

সমস্যা হল আমাদের আশেপাশে সেই রকম উত্তম বৈদ্য নেই। বড় বড় সন্ত-মহাত্মা, অবতাররা হলেন জীবনের ডাক্তার। কিন্তু এনাদের সব সময় পাওয়া যায় না, ফলে আমরা আমাদের রোগ বুঝতে পারিনা। ওষুধের মাত্রা কতটা হবে ঠিক করতে পারিনা। ফলে ওষুধ নিতে উল্টে আরও নেশা হয়ে যায়, তাই নেশা ছাড়াতে পারিনা; এ-ছাড়া আর কিছু না। ড্রাগস্ আদি নিয়ে যতই আপনি নেশা করে থাকুন, কিছু চিন্তার নেই; ওই ড্রাগসগুলিকে যখন ওষুধ রূপে দেবেন, নেশা কাটতে শুরু করবে। আমাদের আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত এটাই, হোমিওপ্যাথিরও তাই সিদ্ধান্ত। একটা কিছুর জন্য শরীরে রোগ হলে, ওই জিনিসটাই নিয়মিত করে দিলে, ওটাই ধীরে ধীরে রোগ সারিয়ে তুলবে। যেমন বিষ; সর্পদংশনে যে ওষুধ দেওয়া হয়, তাতে বিষই থাকে। এখানে সমস্যা হল, সংসারে আমরা ডুবে যাচ্ছি। ডুবে যাচ্ছি কেন? সংসার আমার ভাল লাগছিল। আপনি যেটাকে কেঁচো মনে করেছিলেন, সেটা ধরতে গিয়ে দেখছেন আসলে ওটা একটা সাপ। শুধু এইটুকু মনে রাখার –সংসার হল আমার মনের বন্ধন ক্ষয় করার জন্য।

এইটুকু মনে করে সংসারের সব কিছু করে যান, দেখবেন রাতারাতি আপনার জীবন পাল্টে যাবে। আপনি যদি চান সংসারে আপনার অশান্তি কেটে যাক, কষ্ট কমুক; তাহলে আপনার জন্য একটাই রাস্থা –যেমনি সংসারকে একটা হাসপাতালের মত দেখবেন, কর্মকে দেখবেন ওষুধের মত, সব কিছু মেপে মেপে করতে হবে, একেবারে মাপা থাকবে; তখন এই সংসারটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। ছোটবেলায় আমরা একটা ছড়া খুব শুনতাম –খেলাধূলা করে যে গাড়িচাপা পড়ে সে। ছড়ার মাধ্যমে বলতে চাইছেন, বাচ্চা বয়সে পড়াশোনা না করে শুধু খেলাধূলাতে মত্ত থাকলে জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত; সত্যিই তাই। অল্প বয়সে আমরা সবাই খেলাধূলা করতে ভালবাসতাম, কিন্তু সবাই তো শচীন তেণ্ডুলকার বা গাভস্কর হতে পারবে না। কিন্তু ছোটদের স্কুলে গেলে দেখা যাবে সব জায়গায় নিয়ম করে স্কুলে খেলার ব্যবস্থা করা আছে। রুটিন অনুসারে খেলার পিরিয়ড একেবারে নির্দিষ্ট করা আছে, ওই সময় সবাইকে খেলতেই হবে। যাঁরা বড় খেলোয়াড় হন, তাঁরাও একটা ডিসিপ্লিন বজায় রেখে খেলা করেন, দৈনন্দিন জীবনে একটা অনুশাসন আছে। খেলায় যারা মত্ত হয়ে মজে যায়, তারাই ডোবে। অনুশাসনের মধ্যে যারা খেলাধূলা করে, একই জিনিস।

সেইজন্য আপনারা যে আমোদ-আহ্লাদ করছেন, সিনেমা, টিভি দেখছেন এগুলোর জন্যও একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিতে হয় –এই সময়ই দেখব, অন্য সময় দেখব না। এই অনুশাসন মনকে পরিষ্কার করে ঠিক পথে চালিত করবে। শুধু মনে রাখবেন, আপনার কষ্টের কারণ –বন্ধন; কর্মবন্ধন, সংসারবন্ধন; এটাই অশান্তি করে, বিনাশ করে। যারা সংসার চাইছে, তাদের বন্ধন হোক; কিন্তু যিনি চাইছেন নিজের উত্থান হোক, যিনি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছেন; তাঁরা কি করবেন? সব ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা সবাই মুখে বলতে পারে, কিন্তু কজন পারবে; আপনারা পারবেন? পারবেন না। ভিতরে

হয়ত ইচ্ছাও আছে, কারণ সংসারের জ্বালা আর নিতে পারছেন না। সংসারজ্বালা নিতে পারছে না, তখন বলবে, কাশী যাব। আগেকার দিনে লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে কাশীতেই যেত। এখন উত্তরকাশী, হরিদ্বার আদির নাম যোগ হয়েছে। থাকতে পারবেন? প্রস্তুতি নেই, থাকতে পারবেন কি করে।

আমাদের যখন সন্ন্যাস হয়, তখন অনেক নবীন সন্ন্যাসী দিন পনেরো বা এক মাসের জন্য কর্মবিরতি নিয়ে তীর্থে চলে যেতেন। আবার কেউ কেউ আছে একান্তে তপস্যাদি করার জন্য উত্তরকাশী চলে যান। সন্ন্যাসের পর আমিও এক মাসের জন্য উত্তরকাশী গেলাম। ওখানে আমাদের আশ্রমের একটা কুঠিয়া আছে, সেখানে ইলেক্ট্রিসিটিও নেই। সারাদিনে এক ঘন্টার জন্য জল আসে, ওর মধ্যেই আমাদের সব কিছু করে নিতে হবে। তা নাহলে গঙ্গার ওই ঠাণ্ডা জলে গিয়ে স্নানাদি সারতে হবে। সেই সময় হরিদ্বারে স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ থাকতেন, মঠের খুব নামকরা পণ্ডিত মহারাজ। স্নেহ করতেন আমাকে। তাঁকে গিয়ে বললাম, 'আমি এসেছি, উত্তরকাশীতে তপস্যা করব'। আমার কথা শুনে খুব রেগে গেলেন, 'এক মাসে তোমার মনই তো ওখানে বসবে না। এই যে এগারো বছর, বারো বছর ধরে কাজের মধ্যে ডুবে ছিলে, ভিতরে রজোগুণের ঢিপি হয়ে আছে। আর হঠাৎ এসে বলছ, উত্তরকাশীতে তপস্যা করব, অন্নক্ষেত্রে ডাল-রুটি ভিক্ষা করব, দিনে একবার খাব। তোমার মনই বসবে না ওখানে'। আমি বললাম, 'তাহলে কি আর করব, ছ-মাসের জন্য তো ছাড়বে না, এটাকেই মেনে নিতে হবে'। 'ঠিক আছে যাও'।

বাস্তবে তাই দেখলাম। ঠিক ঠিক যে মন বসানো, আমি এই জায়গার, এই জায়গাটা আমার –এ হয় না। তাহলে উপায় কি? এটাই ঠাকুর বলছেন –মাঝে মাঝে নির্জনবাস। ঠাকুর আগেও বলেছেন, পরেও অনেকবার এই কথা বলবেন। ঠাকুরের এই সমস্ত কথা সংসার ধর্মে যাঁরা আছেন, যাঁরা সংসারে আছেন, তাঁদের জন্য। সব কিছু ছেড়ে সারা জীবনের মত কেউ ওখানে থাকতে পারবে না। তাহলে উপায় কি? স্ব অর্থাৎ নিজেতে বাস। আপনি যখন ঘুমোতে যান, বিশ্রামে যান, তখন আপনি নিজেতে থাকেন, স্ব-বাস। শরীর যখন খারাপ হয়, তখন নিজেতে পড়ে থাকেন –স্ব। নিজেতে বাস করা; সেইজন্য বাংলাতে বলে স্বাস্থ্য, নিজেতে অবস্থান করা। নিজেতে অবস্থান করা মানে, সব ঠিক আছে। নির্জনবাস বা একান্তবাস যখন করা হয়, তখনই ঠিক ঠিক স্ব-তে বাস করা হয়। মানুষ অসুস্থ হলে হাসপাতালে যায়, সেখানে তাকে বিশ্রামে রেখে দেওয়া হয়। ওষুধ দিচ্ছে, কিন্তু রাখছে বিশ্রামে। যখন আপনি নির্জনবাসে যাচ্ছেন, সেখানে ওষুধ হল ইষ্টনাম, মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছেন, ওটাই আপনার ওষুধ, আর একা। হাসপাতালে আরোগ্য লাভের জন্য যেমন রোগী একা থাকে, নির্জনবাস তাই।

আধ্যাত্মিক আরোগ্য লাভের জন্য নির্জনবাস দরকার। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য যখন যাবেন, তখন আপনার পরিষ্কার থাকবে –আমি কিসের জন্য নির্জনবাসে যাচ্ছি –আধ্যাত্মিক আরোগ্য লাভের জন্য। সারাদিনের জন্য ঠিক করে নিতে হবে –এতক্ষণ পাঠ করব, এত সময় জপ করব, এতক্ষণ হেঁটে হেঁটে আমি জপ করব। এক সপ্তাহের জন্য হোক, তিন দিন হোক বা একদিনের জন্যই হোক; এর প্রস্তুতির জন্য প্রথমে বাড়িতে নিত্য কিছুক্ষণের জন্য আলাদা থাকার অভ্যাস করতে হবে। ছেড়ে দিন, আপনাকে জপধ্যান করতে হবে না, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে না, শুধু চুপচাপ একা আলাদা কিছুক্ষণ থাকুন।

আমার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের লোকের পরিচয় থাকাতে অনেকে অনেক সময় বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। সবাইকে আমি একটি কথাই বলে দিই, কিছু করতে হবে না আপনাকে; বাড়িতেই থাকুন বা অফিসেই থাকুন, দিনে কয়েকবার পাঁচ মিনিটের একটা ব্রেক দিন। চোখ বন্ধ করে বসে থাকুন। মনের মধ্যে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, সেগুলোকে দেখতে থাকুন; আর কিছু করতে হবে না। এইটুকুতেই দেখবেন, ধীরে ধীরে মন শান্ত হয়ে আসবে, শক্তি আসবে, আনন্দ আসবে, জীবনে একটা শান্তি আসবে। তার থেকেও বেশি, যেটা খুব প্রয়োজনীয় কথা –এই যে আপনার সামনে সংসার, এই

জগৎটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমি যা কিছু ব্যাখ্যা করছি, এগুলো থিয়োরেটিক্যাল কিছু না, নিজে করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। দিনে পাঁচ মিনিট দু-বার তিন-বার যদি বসতে না পারেন, তাহলে আপনি শান্তি পাওয়ার যোগ্য নন। সহজ কথা; আপনার জীবনে কি অশান্তি আছে? দিনে তিনবার পাঁচ মিনিট করে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে থাকুন, শুধু দেখে যান মনের মধ্যে কি কি চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। কোন মোড় ফেরাতে হবে না, কিছু করতে হবে না, শুধু দেখতে থাকুন। যদি খেয়াল হয়, এটা আমি কি করছি, তখন মনে করবেন, আমি বাচ্চাদের খেলা দেখছি। আপনার চিন্তা-ভাবনাগুলো যেন শিশু, তারা খেলা করছে, আপনি সেই খেলা দেখে যাচ্ছেন। দিনে অন্তত তিনবার করে দেখুন, মন শান্ত হয়ে যাবে, মনের শক্তি বাড়বে, সমস্যাগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সমস্যাগুলো যে দংশন করে যাচ্ছে, কমে যাবে। এবার দেখব, ঠাকুর কি বলছেন।

তোমরা সংসার আছ তা ভয় কি। এরপর বিষয়টা পাল্টে যাচ্ছে, এটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব, আগে দেখি ঠাকুর কি বলছেন। **রাম যখন সংসারত্যাগ করবার কথা বললেন, দশরথ চিন্তিত হয়ে বশিষ্ঠের শরণাগত হলেন। বশিষ্ঠ রামকে বললেন, রাম তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে? আমার সঙ্গে বিচার কর, ঈশ্বর ছাড়া কি সংসার? কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে? তিনি ছাড়া কিছুই নাই। তিনি ‘ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ’ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন**।

বলরামের পিতা –বড় কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সাধনের সময় এই সংসার “ধোঁকার টাটি”; আবার জ্ঞানলাভ হবার পর, তাঁকে দর্শনের পর, এই সংসার “মজার কুটি”।

যেটা ঝুপড়ি ছিল, সেটাই হয়ে গেল রাজপ্রাসাদ। যাঁরা নিয়মিত শাস্ত্র শোনেন তাঁরা সহজেই এটা বুঝতে পারবেন; কিন্তু যাঁরা প্রথম শুনছেন বা বেশি শোনেননি, তাঁরা হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না। খুব সহজে বলতে গেলে, যে কোন ধর্মগ্রন্থ যদি কেউ পাঠ করেন, যদি ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় না থাকে, তাহলে আমরা লেখা একটা ছোট্ট বই ‘The World of Religion’, সেখানে বিশ্বের আটটি মূল ধর্মের ইতিহাস থেকে শুরু করে তাদের মূল ভাব বা দর্শনকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করবেন, সমস্ত ধর্ম বলে দেবেন সাধনা করলে আপনার কি হবে। আপনি যদি ভাল খ্রীশ্চান হন বা ভাল মুসলিম হন, তাহলে কি হবে? আপনি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলেন, আপনার ইষ্টের দৃষ্টিতে মৃত্যুর পর আপনি শ্রেষ্ঠতম স্বর্গে যাবেন; সেখানে আপনার ইষ্টের দর্শন হবে, ইত্যাদি। বৌদ্ধরা বলবেন, নির্বাণলাভ হয়ে যাবে, নির্বাণ মানে সব শেষ। কি রকম? একটা প্রদীপকে যেমন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হল। এই ধারা নিয়েই মোটামুটি সব ধর্ম চলে।

আপনি যদি হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ দেখেন, সেখানে আপনি দেখবেন; এই যে মুক্তি পাওয়া, শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া, মোটামুটি সব গ্রন্থেই পাওয়া যাবে। হিন্দু ধর্মের দর্শন বলতে ষড়্দর্শন, ছটি দর্শনের মধ্যে একটা প্রধান দর্শন হল সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য দর্শন পুরুষ বা চৈতন্য আর প্রকৃতি বা জড়, এই দুটোকে আলাদা করতে শেখান। সেখানে এটাই আছে –চৈতন্য লাভ হয়ে গেলে জড় নিজে থেকে খসে পড়ে যাবে।

এর থেকে বেশি হয় যোগ, যার প্রধান গ্রন্থ রাজযোগ বা পতঞ্জলি যোগসূত্র। রাজযোগ আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক বিধিতে একেবারে সিস্টেমেটিক্যালি যোগ শিক্ষা দিচ্ছেন। যোগের শিক্ষা পাওয়ার জন্য কাউকে ঈশ্বর মানতে হবে না, শাস্ত্র মানতে হবে না, কোন কিছুই মানতে হবে না। রাজযোগ শুধু এটাই বলবে, তুমি নিজেকে মানো তো? তুমি কে? তুমি হলে তোমার মনের চিন্তা-ভাবনা। শুধু এইটুকু থেকে সব কিছুকে সুন্দর করে গুছিয়ে, বিচার করে করে এবার আপনাকে নিয়ে চলে যাবে সেই অবস্থায়, যার কথা সাংখ্য দর্শন বলছেন –চৈতন্য আর জড় আলাদা। তখন আপনি নিজেকে চৈতন্যরূপে দেখে অবাক

হয়ে ভাববেন, আরে তাই তো আমি তো চৈতন্য; এতদিন আমি নিজেকে জড়ের এলাকায় জড়িয়ে রেখেছিলাম।

ন্যায়, বৈশাষিক আরও দুটো দর্শন, ওনারাও ওই ধরণের কিছু কথা বলেন। পূর্বমীমাংসা দর্শনে বলবেন, জীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মলোক যাওয়া, অনেকটা খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মের মত। বেদান্ত দর্শনে দুটি পথ পরিষ্কার করে দেওয়া যায় –ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ। ভক্তিপথে সাধক ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে সাধনা করছেন আর জ্ঞানপথের সাধক শুদ্ধ চৈতন্যকে কেন্দ্র করে সাধনা করছেন। সিদ্ধিলাভ হওয়ার পর ভক্তিপথের সাধক ঠিক সেখানেই পৌঁছাবেন, যেখানে অন্যান্য সবাইরা পৌছাবেন। বিভিন্ন ধর্মে যে স্বর্গের কথা বলা হয়, যেখানে ইষ্টের সঙ্গে থাকা বা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা, একই জিনিস।

জ্ঞানমার্গের সাধক, যাঁরা চৈতন্যকে কেন্দ্র করে এগোবেন, তাঁরা বৌদ্ধদের যে নির্বাণ, সেখানে পৌঁছাবেন। আবার এটাও বলা যেতে পারে, যোগশাস্ত্রে বা সাংখ্য দর্শন যে মুক্তির কথা বলছেন, জ্ঞানমার্গের সাধকও সিদ্ধির পর সেইখানেই পৌঁছাবেন। অবাক করার ব্যাপার হল, দুটি পথই ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ, তার মানে সগুণ সাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে সাধনা করা হয়, আর নির্গুণ নিরাকার চৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে সাধনা করা হয়, এই দুটো পথই আর-এক ধাপ বলছেন; সমস্ত শাস্ত্রে বলছেন, বেদে বলছেন, উপনিষদে বলছেন, ভাগবতে বলছেন, ঠাকুরও বারবার বলছেন; ওই যে সিদ্ধিলাভের শেষ অবস্থা, ওই অবস্থা থেকে আবার নেমে আসা যায়।

সিদ্ধিলাভের পর ওই অবস্থা থেকে নেমে আসা ব্যাপারটা অন্যান্য ধর্মে তো আসেই না, এমনকি আমাদের সাংখ্য দর্শনেও আসে না, যোগ দর্শনেও আসে না, মীমাংসাতে আসে না, বৌদ্ধ দর্শনে আসে না। জৈনদের আসে কিন্তু একটু অন্য ভাবে আসে। বেদান্ত ছাড়া আর কোথাও এই নেমে আসা ব্যাপারটা পাওয়া যাবে না। অথচ আমাদের সমস্ত শাস্ত্রে নেমে আসার কথা রয়েছে –যিনি ভক্ত তিনি দেখবেন তাঁর যিনি ইষ্ট তিনিই সব কিছু হয়েছেন। তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন –সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু। ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন, কোথায় উনি গল্পগুলো শুনেছিলেন জানা নেই, কিন্তু খুব মজার।

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন গেছেন। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছেন, 'কি দেখছ অর্জুন'? 'দেখছি থোকা থোকা জাম হয়ে আছে'। 'কাছে গিয়ে ভাল করে দেখ'। অর্জুন দেখছেন, 'থোকা থোকা কৃষ্ণ ফলে রয়েছে'। প্রথম প্রথম আমি এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, ঠাকুর এই গল্প দিয়ে কি বলতে চাইছেন। পরে বুঝতে পারলাম, আরে তাই তো –*সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ*, কৃষ্ণ ছাড়া কোথাও কিছু নেই; তুলসীদাস বলছেন –সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু। আর বাস্তবিক তিনি এটাই দেখবেন, তখন কাকে ভালবাসবেন, কাকে ছাড়বেন, কাকে ধরবেন, সবটাই তো তিনি। আর যিনি জ্ঞানপথে গেছেন? তিনি দেখবেন, আত্মাই আছেন, আত্মাই এই সব কিছু হয়ে আছেন বলে যেটা দেখাচ্ছে, আসলে এটাই নাম আর রূপের খেলা। নাম-রূপটা মিথ্যা। যখনই বেদান্তে মিথ্যা শব্দ আসে, তার অর্থ হল, নাম আর রূপটা মিথ্যা। সংসার কি? নাম আর রূপ। লোকজন কি? নাম আর রূপ, আসলে সেই সচ্চিদানন্দই আছেন।

উদাহরণ হল, সমুদ্র আর তার ঢেউ; ঢেউ দেখলে সমুদ্র দেখা যায় না, সমুদ্র দেখলে ঢেউ দেখা যায় না। এবার যদি জিনিসটাকে এভাবে দেখেন, যত পথ, সবাই বলছেন, তুমি ঢেউএর উপরে চল। সমুদ্রকে যদি জানতে চাও, ঢেউকে ছেড়ে সমুদ্রে নেমে যাও। সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেল। বেদান্ত, তা ভক্তি বেদান্ত হোক, জ্ঞান বেদান্ত হোক; দুটোতেই বলে তুমি যদি চাও, এবার তুমি সমুদ্র থেকে আবার ঢেউতে ফেরত আসতে পারবে। তখন তুমি জানবে, সমুদ্র যা, ঢেউও তাই। আশা করি পরিষ্কার করে বলতে পারলাম, কি বলতে চাইছেন। ভাগবত পদে পদে এই কথা বলছেন, উপনিষদেও বলছেন, গীতাতে এর উপর প্রচুর শ্লোক পাওয়া যাবে। যেমন গীতায় বলছেন, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, যা কিছু আছে সব বাসুদেবই হয়েছেন। এভাবে সাধনাও করা যায়, আমি যা কিছু দেখছি সব ঠাকুরেরই রূপ দেখছি। কিন্তু সাধনা in general এভাবে হয় না।

যে কোন ধর্মে, যে কোন পথে যখন সাধনা করা হয়; সংসারে যত সাধনা আছে, সমস্ত সাধনা নেতি নেতি সাধনা। কিভাবে সব নেতি নেতি সাধনা? বলছেন, মনকে ইষ্টে কেন্দ্রিত কর, এটাই তো নেতি নেতি সাধনা হয়ে গেল। তার মানে, ইষ্ট ব্যতিরেকে যত চিন্তা আছে, যাবতীয় চিন্তাকে বাদ দাও। এটাই নেতি নেতি; মনটা একটা জায়গাতে স্থিত হয়ে গেল। আপনি ইষ্টের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন, তখন আর কিছু আপনার লাগবে না। তারপরেও যদি শরীর থাকে, চাইলে মনটাকে নামিয়ে আনতে পারবেন, তাঁর কৃপায় মনে নেমে আসবে। কারণ যে জিনিসগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোও তো তিনি। যে সংসারকে ত্যাগ করছিলাম, সেটাও তিনি। জীবকে ত্যাগ করছিলাম, সেটাও তিনি। ওই অবস্থায় ওনার গ্রহণ ত্যাগ কোনটাই থাকে না। আমাদের সমস্যা, আমাদের গ্রহণ আর ত্যাগ সব সময় পুরোদমে চলছে। আমরাও সংসারকে ছাড়তে চাই না, আমরাও সংসারকে ত্যাগ করিনা, আমরাও জীবজন্তুকে ত্যাগ করি না।

সমস্যা হল আমাদের সিলেক্টিভ ত্যাগ। যেটা আমার পছন্দের, যেটাকে আমার প্রিয় বোধ হচ্ছে, সেটাকে ধরলাম; যা পছন্দের নয়, যেটা অপ্রিয় সেটাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। যোগী আর ভোগীতে এটাই তফাৎ। যিনি সিদ্ধ পুরুষ তিনি জানেন আত্মাই সব। এটা কিন্তু সাংখ্য দর্শনে হবে না, যোগ দর্শনে হবে না, ন্যায়, বৈশাষিকে হবে না, মীমাংসাতে হবে না, হবে একমাত্র বেদান্তে; তা বেদান্তে আপনি ভক্তি পথই নিন, আর জ্ঞান পথই নিন। তফাৎ হবে এই ভাবে, ভক্ত দেখবেন তাঁর ইষ্টই সব হয়েছেন আর জ্ঞানপথে যিনি শুদ্ধ চৈতন্যকে অবলম্বন করে সাধনা করেছেন, তিনি দেখবেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। জগৎ রূপে যেটা দেখাচ্ছে, এটা নামরূপের খেলা।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, সাধনার সময় এই সংসার 'ধোঁকার টাটি'। তার মানে, যত রকম সাধনা আছে; এমনকি ভক্তিপথের সাধনা, জ্ঞানপথের সাধনাতেও সংসার ধোঁকার টাটি, পুরোদমে নেতি নেতি। জ্ঞানলাভের পর সব কিছু তিনি। আপনি বলবেন, তাহলে কি ইতি ইতি ভাবে সাধনা হতে পারে না? হতে পারে, তবে খুব কঠিন, কারণ আপনকে সব কিছু ঈশ্বররূপে দেখতে হবে বা আত্মারূপে দেখতে হবে। কঠিন কেন বলা হচ্ছে? প্রথম অবস্থায় মন কাঁচা থাকে, কাঁচা মন ইতি ইতি করতে করতে নিজের প্রিয় জিনিসের সঙ্গে ঠিক জড়িয়ে যাবে। এরপর ঠাকুর আবার বলছেন –

বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

বিশ্বাস, এই কথাগুলিতে বিশ্বাস, আর কিছুটা আপনি বলতে পারেন ইতি ইতি সাধনা। কৃষ্ণই সব হয়েছেন, কেবল এই বিশ্বাস। আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এই বিশ্বাস।

কেবল বিশ্বাস।

কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস। বৃন্দাবনে কূপ থেকে নীচ জাতি জল তুলে দিলে, তাকে বললে, তুই বল শিব। সে শিবনাম করার পর অমনি জল খেলে। সে বলত ঈশ্বরের নাম করেছে আবার কড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত! এ কি!

রোগাদি জন্য তুলসী দিচ্ছে, কৃষ্ণকিশোর দেখে অবাক্। হরি হলেন বৈদ্য, ভগবান নিজে বৈদ্য।

সাধুদর্শনের কথায় হলধারী বলেছিল, 'কি আর দেখতে যাবো –পঞ্চভূতের খোল'। কৃষ্ণকিশোর রাগ করে বললে, এমন কথা হলধারী বলেছে। সাধুর চিন্ময় দেহ জানে না। কারণ সাধুর ভিতরে, সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি, সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তন করছেন কিনা। আপনি বলতে পারতেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের আমি মানি না। তাহলে এই কথাগুলো আপনার জন্য নয়; যাঁরা সাধনা করছেন, তাঁদের জন্য বলছেন।

কালীবাড়ির ঘাটে আমাদের বলেছিল, তোমরা বলো –রাম! রাম! বলতে বলতে যেন আমার দিন কাটে।

আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যাই যেতাম, আমাকে দেখে নৃত্য।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, যেখানে দেখবে উর্জিতাভক্তি সেইখানে জানবে আমি আছি। উর্জিতাভক্তি, ভক্তিতে এমন জমে আছেন; সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখলে আনন্দ; ঈশ্বরভাবে আনন্দ; বুঝতে হয় ঈশ্বর নিজে সেখানে আছেন –ভক্ত রূপে না, ভক্তি রূপে।

যেমন চৈতন্যদেব। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। চৈতন্যদেব অবতার –ঈশ্বর অবতীর্ণ। এই কথা ঠাকুর বারবার বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতেছেনঃ

ভাব হবে বইকি রে ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের।
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। (ফুকুরি ফুকুরি কান্দে)।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বলরামের পিতা, মণি মল্লিক, বেণী পাল প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সন্ধ্যার পর কাঁসারীপাড়ার হরিসভার ভক্তেরা আসিয়াছেন।

হরিসভার ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য করছেন। যা হয়, নৃত্যের পর ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ওই অবস্থায় কিশোরী ঠাকুরের পদসেবা করতে চাইছেন। ঠাকুর কাউকে স্পর্শ করতে দিলেন না। সন্ধ্যার পর ঈশান এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে ঈশানের সঙ্গে কথা বলছেন। ঈশানের ইচ্ছা, তিনি গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করবেন। পুরশ্চরণ একটা বিধি, যেখানে প্রথমের দিকে কম কম করে গায়ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্র জপ করা হয়। সেখান থেকে সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়, একটা সংখ্যা পর্যন্ত বাড়িয়ে ওখান থেকে আবার কমিয়ে কমিয়ে নামানো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) –তোমার যা মনোগত তাই কর। মনের আর সংশয় নাই তো? ধর্মের এই কাজগুলো খুব কঠিন কাজ। কিন্তু মনে যেহেতু একটা বাসনা এসেছে, করুক।

ঈশান –আমি একরকম প্রায়শ্চিত্তের মতো সঙ্কল্প করেছিলাম। পুরশ্চরণাদি করে ঈশান আসলে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এ-পথে (আগমের পথ) কি তা হয় না? যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, কালী। 'আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'। ঠাকুরের বক্তব্য হল, প্রায়শ্চিত্ত যদি করতেই হয়, তাহলে গায়ত্রীর পুরশ্চরণ কেন করতে হবে, জপধ্যান করেও হয়।

ঈশান –চণ্ডীর স্তবে আছে, ব্রহ্মাই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এইটি মুখে বললে হয় না, ধারণা যখন হবে তখন ঠিক হবে।

সমস্যা হল ধারণা; নির্জনবাস যদি না হয়, শাস্ত্রচিন্তন যদি না করা হয়, সাধু-সন্ন্যাসীরা যাঁরা এই জিনিসগুলো জানেন, তাঁদের সঙ্গ যদি না করা হয়, ধর্মের নামে যদি শুধু মনোরঞ্জন করা হয়, কি করে ধারণা হবে, এ হয় না। সবচেয়ে জরুরী হল, শাস্ত্রের কথা নিজে চিন্তা-ভাবনা করা। আমাদের

কাছে এসে অনেকেই প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন করার পরিষ্কার নিয়ম আছে, প্রথম –এই বিষয়ে আপনি পড়াশোনা করেছেন; দ্বিতীয় –গভীরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন; তৃতীয় –যাঁকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, তাঁকে যে প্রশ্ন করবেন, সেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন? তবে গিয়ে প্রশ্ন করা যায়, তা নাহলে প্রশ্ন করা যায় না। এই এমনি একটা প্রশ্ন করে দিলাম, এভাবে প্রশ্ন করা যায় না। উত্তর যদি দিয়েও দেওয়া হয়, ধারণা করতে পারবেন না। রামকৃষ্ণ মঠে জয়েন করার পর সবাইকে কয়েক বছর পর দু-বছরের জন্য বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে থাকতে হয়। আমাকেও থাকতে হয়েছিল। সেখানে আমি একবার আচার্যকে একটা কোন প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি আগে এই বিষয়ের উপর পুরো মন দিয়ে পড়াশোনা করে ভাল করে লিখে এনে আমাকে দেখাও, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব'। লোকেরা দেখি অনেক সময় কথায় কথায় বলেন, কেন ঠাকুর তো এও বলেছিলেন। আপনি কি এই জিনিসটাকে নিয়ে স্টাডি করেছেন, চিন্তা-ভাবনা করেছেন? এগুলো করার পর যিনি গুরু তাঁর কাছে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সাধনার পর চিত্তশুদ্ধি হলে ঠিক বোধ হবে তিনিই কর্তা, তিনিই মন-প্রাণ-বুদ্ধিরূপা। আমরা কেবল যন্ত্রস্বরূপ। 'পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি'। যেটা আগে বলা হল, কিভাবে ঈশ্বর মায়া-জীব-জগৎ, সব তিনি হয়েছেন; তেমনি আমাদের ভিতরে যে মন-প্রাণ-বুদ্ধি সবটাই তিনি। মাণ্ডুক্যকারিকাতে ঠিক এই কথাই বলছেন। চণ্ডীতেও জগন্মাতা একই কথা বলছেন –আমিই সব।

চিত্তশুদ্ধি হলে বোধ হবে, পুরশ্চরণাদি কর্ম তিনিই করান। 'যাঁর কর্ম সেই করে, লোকে বলে করি আমি'। সত্যিই তো আপনি করার কে। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা ততক্ষণই যতক্ষণ আমি-তুমি ভেদ আছে। এগুলো তাদেরই জন্য, ধর্মভাব যাদের এখনও ঠিক ঠিক জাগেনি।

তাঁকে দর্শন হলে সব সংশয় মিটে যায়। তখন অনুকূল হাওয়া বয়। অনুকূল হাওয়া বইলে মাঝি যেমন পাল তুলে দিয়ে হালটি ধরে বসে থাকে, আর তামাক খায়, সেইরূপ ভক্ত নিশ্চিন্ত হয়। একবার যখন বুঝবেন, ঠাকুরই আপনাকে চালাচ্ছেন, কারণ আপনি বলে কিছু নেই, তখন সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে মন শান্ত হয়ে যায়।

ঈশানও চলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইএর সঙ্গে একান্তে কথা বলছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, **নরেন্দ্র, রাখাল, অধর, হাজরা এদের তোমার কিরূপ বোধ হয়, সরল কিনা। আর আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। মাস্টার বলিতেছেন, "আপনি সরল আবার গভীর –আপনাকে বুঝা বড় কঠিন"**। বাচ্চারা সরল হয়, কিন্তু গভীর হয় না। ঠাকুর সরল আবার গভীর। সরল বলতে, তাঁর কথাগুলো মনে হয় যেন খুব সহজ, কিন্তু সেই কথার মধ্যে আমরা যত ঢুকব, চলতেই থাকব, চলতে চলতে কোথা হারিয়ে যাব, শেষ আর পাওয়া যাবে না। আকাশকে দেখে মনে হয় ছোঁয়া যায়, উড়তেই থাকুন, উড়তেই থাকুন, কোথাও শেষ নেই। মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে ঠাকুর হাসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন। অবতার মানেই তাই। গীতা দেখুন, কত সরল অথচ কত গভীর। এটাই হল ঠিক ঠিক, যেটা দিয়ে বোঝা যায় এখানে শক্তি আছে। যাঁর মধ্যে শক্তি আছে, তিনি একাধারে সরল আবার গভীর। চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ এবং কথামৃতের চতুর্দশ পর্ব এখানেই শেষ হচ্ছে। চৌত্রিশটা পরিচ্ছেদ দিয়ে এই চতুর্দশ পর্বকে সাজানো হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ